CSSSC/KPL

RECORD NO. 11	CONDITION brittle
KPL ACC. NO (S). 618, 617, 619, 620	COLOUR illustration coloured
TITLE Suprabhat (সুপ্রভাত)	SIZE 16 x 24 cm
PERIODICITY Monthly	PLACE(S) OF PUBLICATION Calcutta.
EDITOR(S) Kumudini Mitra	VOLUMES IN RECORD Vol. 1, issues 2-3 (1314 - Bhadra - Aswin) 1907 Vol. 2, issues 2-9 (1315 : Bhadra - Caitra) 1908-09 Vol. 3, issue. 1-12 (1316 : Srabon - 1317 : Asar) — 1909-10 Vol. 7. issues. 1-12 (1320 : Srabon - 1321 : Asar) - - 1913-14

সুপ্রভাত

"নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা
আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে
প্রাচীন রজনী নাশো
নূতন উষালোকে।"

শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি,এ সম্পাদিত।

আজ

ধনীর সুপ্রভাত ! গৃহীর সুপ্রভাত !

সৌখীনের সুপ্রভাত ! মহিলার সুপ্রভাত !

কারণ,

যুক্তবঙ্গের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কারখানাজাত

বেঙ্গল সোপ

অভিনব শিল্পজগতে অভাবনীয় যুগান্তর
ঘটাইয়াছে।

কিবা আকারের নয়নাভিরাম মনোহারিত্ব, কিবা
মধুরিমাময় মন্দিত মৃণালবৎ সৌরভ !

বেঙ্গল সোপ

প্রত্যুতঃই স্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি !!!

এই বলিতেছিলাম শিল্পজগতে আজ

সুপ্রভাত !

অফিস ও কারখানা

৬৪।১ মেছুয়াবাজার রোড্, কলিকাতা।

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু।

প/১০৬

সুপ্রভাত

"যদিও মা তোর দিব্য আলো কে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর ;
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

দ্বিতীয় বর্ষ। | ভাদ্র, ১৩১৫ সাল। | ২য় সংখ্যা।

দীক্ষা।

অগ্নি-মন্ত্রে লইল দীক্ষা
হোমের আগুণ জ্বালি,
কি বজ্রানল উঠিল গর্জ্জি
হলাহল দিল ঢালি!
নিঃস্ব বেশে আসিল ভক্ত,
চিত্তে নাহিক ভয়,
কর্ম্মের ভার লইয়ে মাথে
দাঁড়াল নিঃসংশয়।
মাতার চরণে দিল আত্মদান
হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়ি,
মরণদণ্ড লইল লুফিয়া
আপন হৃদয়' পরি।
শিহরি উঠিল বিশ্ববাসী
হেরিয়া অর্ঘ্য দান,
রক্ত-পদ্মে শোভিল আজিকে
মায়ের তক্তখান।
করিছে নৃত্য মায়ের ভৃত্য
মরণ ছন্দে মাতি,
মৃত্যুর বাণ গরজি উঠিছে
রোধিবে কে তা'র গতি?

বঙ্গনারী।

নিহিলিষ্ট রমণী ভেরার কাহিনী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(৩)

আজ ক্যাথারিন ইয়ার্ডের মন্ত্রণাগৃহে এক গুপ্ত সভার অধিবেশন হইবে, তাই প্রাতঃকাল হইতেই প্রাসাদের চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরীরা দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অদ্যকার সভায় রুশিয়ায় সামরিক আইন পাশ হইবে এবং জার স্বয়ং মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিত থাকিবেন, তাই চারিদিকে সতর্ক পাহারার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রাসাদের কোন অংশেই অপরিচিত জনমানবের প্রবেশাধিকার নাই।

সভাধিবেশনের কিছু পূর্ব্বেই প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স পল, সহর কোতোয়াল কোটেম্‌কিন্, প্রিন্স পেষ্ট্রোভিচ্, কাউণ্ট রুভালফ্, ব্যারণ রাফ্ ও কাউণ্ট পিট্‌হফ্ একে একে মন্ত্রণাগৃহে আসিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। প্রধান মন্ত্রী বিষণ্ণ মুখে সকলকে জানাইলেন যে যুবরাজ জারেভিচ্ আজ মন্ত্রণা সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং সামরিক আইন পাশ রহিত করিবার জন্য জারকে অনুরোধ করিবেন। এই সংবাদ শুনিয়া সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কারণ যুবরাজের চরিত্র কাহারও নিকট অবিদিত ছিল না।

প্রধান মন্ত্রী জানিতেন যে যুবরাজ তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা করেন এবং সর্ব্বদাই জারের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাকেন—এমন কি, একবার মন্ত্রণা সভায় তিনি প্রিন্স্ পল্‌কে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান শত্রু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বেশ জানিতেন যে যুবরাজ যাহাই বলুন না কেন, জার কখনও তাঁহাদিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন না।

ব্যারণ রাফ্ বলিলেন, যুবরাজকে দেখিলেই আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। তিনি একদিন প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন যে কাউন্সিলের সভ্যেরা যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়া প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া রাজকোষ এবং নিজের নিজের বিষয় বৈভব বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া প্রজাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত।

কাউণ্ট পিট্‌হফ্ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জারের অবর্ত্তমানে আমাদিগের অদৃষ্টে কি আছে, তাহা ভগবান জানেন।

কাউণ্ট রুভালফ্ অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, ভয় কি?—দু'দিন সবুর করিতে দাও, তা'র পর নিহিলিষ্টদিগের অনুগ্রহে সব উচ্চভাব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে; তখন হয়ত এই যুবরাজই আমাদিগকে গ্রামে গ্রামে সামরিক আইন জারি করিতে বলিবেন।

এই সময় একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, যুবরাজ জারেভিচ কাউন্‌সিলে আসিতেছেন।

সভ্যেরা সকলে অমনি শশব্যস্তে আপন আপন আসন পরিত্যাগ করিয়া যুবরাজকে অভ্যর্থনা করিলেন। সভাস্থ সকলে তাঁহার চিন্তাভারাক্রান্ত বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে প্রধান মন্ত্রী কহিলেন, যুবরাজ! আপনাকে আজ এত বিমর্ষ দেখা যাইতেছে কেন?—কোনও বিপদ ঘটে নাই ত?

যুবরাজ গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, আপনাদের ন্যায় দুর্জ্জন যে রাজ্যের কর্ণধার, সে রাজ্যের আবার বিপদের অভাব কি?—আর সেখানকার রাজ পরিবারে সুখ স্বচ্ছন্দতাই বা থাকিবে কি প্রকারে?

প্রিন্স পল। যুবরাজ, আপনি ভুল করিতেছেন, সম্রাটের হুকুম ব্যতীত কোন কার্য্যইত এ রাজ্যে সম্পন্ন হয় না! আমরা শুধু মতামত দিয়াই খালাস।

যুবরাজ। আমি সব জানি। আপনি আসিবার পূর্ব্বে রাজ্যের লোক পিতাকে যথেষ্ট সম্মান করিত এবং ভাল বাসিত। তার পর আপনার কুমন্ত্রণায় পড়িয়া একে একে পিতা তাঁহার সমস্ত সদ্‌গুণরাশি বিসর্জ্জন দিলেন এবং রাজদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ঘাতকের কুঠার হস্তে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। আপনি দিন রাত তাঁহার কাণে যে বিষ ঢালিয়া দিতেছেন তাহার ফলে সমগ্র রুশিয়া দেশে আগুণ জলিয়া উঠিয়াছে এবং হয় ত সেই আগুণের শিখায় এক দিন এই রাজ পরিবার পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে!

পল। আপনি এখনও তরুণ বয়স্ক যুবক; রাজ্য শাসন যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা এখনও ধারণা করিতে পারিবেন না। আগে সিংহাসনে আরোহণ করুন, তার পর বুঝিবেন কোনটা সুপথ, আর কোনটা কুপথ।

যুবরাজ। হাঁ—আপনি যে কেমন সুদক্ষ মন্ত্রী তাহার পরিচয় পাইতে আমার আর বাকি নাই। আপনার শাসন গুণে রুশিয়ার প্রত্যেক সহরে সম্ভ্রান্ত বংশীয় সংসাহসী চরিত্রবান এক এক দল যুবক মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে এবং এই মস্কো সহরে আজ হাজার হাজার নরনারী রুশিয়ার জারের প্রাণবধ করিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আজ কি, না সামান্য চোর ডাকাতের ন্যায় প্রাণের ভয়ে গৃহের কোণে লুকাইয়া রহিয়াছেন এবং আপনার ছায়া দেখিয়া আপনিই শিহরিয়া উঠিতেছেন। এমন রাজ সিংহাসনে আমি এক দিনের জন্যও বসিতে চাহি না এবং এমন কণ্টক মুকুট এক মুহূর্ত্তের জন্যও মাথায় পরিতে ইচ্ছা করি না। যদি কোনও দিন এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করি তাহা হইলে আগে এই ছদ্মবেশী বন্ধুদিগকে রাজ্য হইতে দূরে রাখিব।

এই সময় এক জন এডিকং আসিয়া সংবাদ দিল যে মহামহিমান্বিত জার মন্ত্রণা সভায় আসিতেছেন।

পরক্ষণেই প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া জার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উপস্থিত সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া জারকে অভিবাদন করিলেন। জার সশঙ্কিত চিত্তে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া মার্কুইস পইভার্ডের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রী, এ ব্যক্তি কে? আমি ত ইহাকে চিনি না?

প্রিন্স্ পল। আজ্ঞে—

জার। আর—আমি ওসব ওজর শুনিব না। ইঁহার পোষাক পরিচ্ছদ সব ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছ?

পল। আজ্ঞে, ইনি মার্কুইস পইভার্ড। ইঁহাকে আপনি বার্লিনে দৌত্যকার্য্য করিবার নিমিত্ত নিয়োগ করিয়া পাঠাইয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে ইনি একবার সম্রাটের হস্ত চুম্বন করিতে আসিয়াছেন।

জার। না—না। আমি আজ হইতে সে প্রথা উঠাইয়া দিয়াছি; রাজভক্ত কর্ম্মচারীরা আমার পরিবর্ত্তে এখন হইতে যুবরাজের হস্ত চুম্বন করিবে।

মন্ত্রীর ইঙ্গিতে পইভার্ড মন্ত্রণা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। জার বিষণ্ণ মুখে সিংহাসনের উপর উপবেশন করিলেন; গুরুতর চিন্তাভারে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তে গুপ্ত ঘাতকের বিভীষিকায় তিনি চমকিয়া উঠিতেছিলেন। কাউন্‌সিল গৃহ নীরব, নিস্তব্ধ। এমন সময় প্রধান মন্ত্রী আসন পরিত্যাগ করিয়া জারের সিংহাসনের নিকট যাইয়া যেমন বলিয়াছেন, সম্রাট!—

আর অমনি জার চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন ওকি? তুমি অত কাছে আসিয়া কথা কহিতেছ কেন? আমার যেন মনে হইতেছে আজ এই মন্ত্রণা সভার চারি দিকে গুপ্ত ঘাতকের ছুরি আমার বুকের রক্ত পান করিবার জন্য ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তার পর হঠাৎ সভাসদ্‌দিগের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তোমরা তরবারী লইয়া মন্ত্রণা সভায় আসিয়াছ কেন? আজ হইতে আমি এই নিয়ম করিলাম যে আমার সম্মুখে আর কেহ তরবারী লইয়া আসিতে পারিবে না। মন্ত্রী, আশা করি তুমি দুঃখিত হইবে না।

মন্ত্রী। আর্কেঞ্জেল হইতে আপনাকে এক

অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছে এবং ক্রমান্বয়ে দুইবার আপনি নিহিলিষ্টদিগের ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ধার লাভ করায় সেখানকার প্রজারা গীর্জ্জায় যাইয়া উপাসনা করিয়াছে।

জার। সেখানকার শাসনকর্ত্তাকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর; শীঘ্রই তাহার পদোন্নতি করিয়া দিতে হইবে। কোটেম্‌কিন্! আজ কত জন নিহিলিষ্টকে গুলি করিয়াছ?

কোটেম্‌কিন্। আজ্ঞে, পাঁচ জনকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে।

জার। পাঁচ শত জনকে মারা উচিত ছিল। রুশিয়ার মাটীতে আমি আর নিহিলিষ্টের চিহ্ন মাত্র রাখিব না। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাদের নিকট হইতে কিছু সন্ধান বাহির করিতে পারিলে?

কোটেম্‌কিন্। আজ্ঞে কোনও রূপ যন্ত্রণাতেই তাহারা দমে না। জিহ্বা কাটিয়া ফেলিয়া দেখিয়াছি, নখের অগ্রভাগে সুতীক্ষ্ণ শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছি; সাঁড়াশী দিয়া চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিয়াছি, অ্যাসিড দিয়া সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাইয়া দিয়াছি, কিন্তু অদ্ভুত ক্ষমতা তাহাদের; একটী কথাও কাহারও মুখ হইতে নির্গত হয় না।

জার। যতদিন ভেরাকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিবে ততদিন রুশিয়ায় আর শান্তি নাই। নিহিলিষ্টদিগকে যখন গুলি করিয়া মারা হয়, তখন সেখানে জনতা হইয়াছিল?

কোটেম্‌কিন্। আজ্ঞে, প্রায় চারি হাজার লোক জমা হইয়াছিল।

জার। বেশ; যত বেশী লোকে দেখে ততই মঙ্গল; ইহারা বুঝুক যে রাজ বিদ্রোহীর শাস্তি কত কঠোর। জনতার মধ্য হইতে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়াছ?

কোটেম্‌কিন্। একজন স্ত্রীলোক আপনাকে অভিসম্পাত করিতেছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে রাখিয়াছি।

মন্ত্রী। কারাগারে হবে না—কালই তাহাকে সাইবিরিয়ায় চালান করিবে। এখন হইতে নূতন বন্দীদিগকে একেবারে সাইবিরিয়াতে পাঠাইবে। পথিমধ্যে কতক শীতে মরিবে আর অবশিষ্ট দুষ্টগণ না খাইয়া মরিয়া যাইবে।

জারেভিচ। এমনি করিয়াই তোমরা রুশিয়ায় আগুণ জ্বালাইয়া দিয়াছ।

এই সময় চিঠিহস্তে একজন এডিকং প্রবেশ করিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিল। সম্রাট মন্ত্রীকে বলিলেন, পার্শ্বের ঘর হইতে চিঠি খুলিয়া আন; উহার মধ্যে হয়ত কিছু থাকিতে পারে।

অন্য ঘর হইতে পত্র খুলিয়া আনিয়া মন্ত্রী চিঠি পড়িয়া বলিলেন, নভোগোরডের প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন যে সেখানকার শাসনকর্ত্তাকে আজ সকালে একজন স্ত্রীলোক গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

জার। এ সেই ভেরার কীর্ত্তি। উঃ, দুই মাসের মধ্যে পর পর তিনজন শাসনকর্ত্তাকে গুলি করিল—কি ভয়ানক অরাজকতা। আমরা কেহই আর নিরাপদ নহি। মন্ত্রী! মার্কুইস পইভার্ডকে আর বার্লিনে পাঠাইয়া কাজ নাই। আজই তাঁহাকে নভোগোরডে পাঠাইয়া দাও, নহিলে প্রেষ্টিজ থাকিবে না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা আজই সে ব্যবস্থা করিব।

জার। উঃ! নভোগোরডের গবর্ণরকে নিজের বাড়ীতে গুলি করিয়া মারিয়াছে! আমার যেন মনে হইতেছে ভেরা সহস্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গৃহে গৃহে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। যত দিন ভেরা মস্কোতে আছে ততদিন আমার আর সোয়াস্তি নাই। কোটেমকিন! ভেরাকে তুমি গ্রেপ্তার করিতে পারিলে না?

কোটেম্‌কিন। কাল সমস্ত রাত্রি মস্কোর প্রত্যেক বাড়ী অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। নিশ্চয়ই কোনও বিশ্বাসঘাতক তাহাকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি চারিদিকে যেরূপ জাল বিস্তার করিয়াছি তাহাতে এবার আর তাহার নিস্তার নাই।

জার। ভেরাকে যে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে তাহাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। উঃ! নিহিলিষ্ট দলপতি ভেরা মস্কো আসিয়াছে। কেন? রুশিয়ার জারকে গুলি করিবার জন্য? দুঃস্বপ্ন দেখিয়া গভীর রাত্রিতে যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় তখন মনে হয় কে যেন চুপি চুপি আমার কক্ষে আসিয়া ডিনামাইট রাখিয়া যাইতেছে, আহারের মধ্যে মনে হয় কে যেন বিষ প্রয়োগ করিয়া রাখিয়াছে, চারি দিকে যেন ষড়যন্ত্রকারীদিগের নিঃশব্দ পদ সঞ্চার শুনিতে পাই।

যুবরাজ। পিতা! আমার অনুরোধ রাখুন; প্রজাদিগকে তাহাদিগের ন্যায্য অধিকার দান করুন। অত্যাচারের দ্বারা দুই এক জন মানুষকে জব্দ করিতে পারেন, কিন্তু একটা প্রবল জাতিকে কিছুতেই দমন করিতে পারিবেন না। স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য যাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগের গতি কিছুতেই রোধ করিতে পারিবেন না।

জার। তাই তোমার বুদ্ধি শুনিয়া আমি কালই জেল খানার দরজাগুলি খুলিয়া দিই আর কি! মন্ত্রী, রুশিয়া হইতে এই নিহিলিষ্ট দলকে নির্ব্বংশ করিতে হইবে। এক জন স্ত্রীলোকের ভয়ে রুশিয়ার সম্রাট কম্পিত হইবেন, তা'র চেয়ে মৃত্যু ভাল। কোটেম্‌কিন্! এক সপ্তাহের মধ্যে ভেরা সাবুরফ্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া আনা চাই—নচেৎ বুঝিব যে রুশিয়ায় আর রাজভক্ত কর্ম্মচারী কেহ নাই, সব বিশ্বাস-ঘাতক হইয়া উঠিয়াছে। আজ দুই বৎসর ধরিয়া এই ভেরা সাবুরফ্ আমাকে হত্যা করিবার জন্য ঘুরিতেছে; দুইবার তাহার হাত হইতে ভগবানের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছি—আর আশা নাই। দেখ মন্ত্রী! কালই রুশিয়ায় মার্শাল আইন জারি করা চাই।

মন্ত্রী। মার্শাল আইন এই সব কুকুরদিগের উপযুক্ত ঔষধ।

জারেভিচ। পিতা! আর একবার চিন্তা করিয়া দেখুন—প্রজারা এমনিই মরিয়া হইয়া আছে, তাহার উপর আবার সামরিক আইন ঘোষণা করিলে যাহারা রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিল তাহারাও নিহিলিষ্ট দিগের সহিত যোগ দিবে। আপনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর—পুত্রের এই অনুরোধটী রক্ষা করুন—সকলকেই শত্রু করিয়া তুলিবেন না—মনে রাখিবেন সীজারও গুপ্ত ঘাতকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই।

মন্ত্রী। সামরিক আইন জারি হইয়া গেলে আমি সম্রাটের নিকট প্রতিশ্রুত হইতেছি, ছয়মাসের মধ্যে নিহিলিষ্ট কুল ধ্বংশ করিয়া ফেলিব। ছয় মাস পরে রুশিয়ায় আর কেহ নিহিলিষ্ট দেখিতে পাইবে না।

জার। বল, বল, মন্ত্রী, আর একবার বল—রুশিয়ার প্রত্যেক নিহিলিষ্টকে এক এক করিয়া গুলি করিয়া মারিবে—তাহাদিগের দলপতি ভেরা সাবুরফ্‌কে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে; আর গৃহে গৃহে এক একজন সশস্ত্র কশাককে পাহারা বসাইয়া দিবে। ইহাদিগের স্পর্দ্ধাটা একবার দেখত! আমার রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া আমার বুকের উপর বসিয়া আমারই প্রাণনাশ করিবার জন্য দিনরাত ষড়যন্ত্র। কই! ঘোষণাপত্র দাও, আমি এখনই স্বাক্ষর করিব।

মন্ত্রী। এই যে এইখানে স্বাক্ষর করুন। এই বলিয়া মন্ত্রী পল একখানি ঘোষণাপত্র সম্রাটের সম্মুখে ধরিলেন।

জারেভিচ দুই হাত কাগজের উপর রাখিয়া বলিলেন, জারকে আর একটু বিবেচনা করিবার সময় দিন—আর একটু অপেক্ষা করুন।

মন্ত্রী। যুবরাজ, আপনি সব পণ্ড করিয়া দিবেন দেখিতেছি।

জারেভিচ। দেখুন প্রিন্স পল! একটা বিশাল রাজ্যের অধিবাসীদিগের সমুদয় স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া কি এতই সহজ?

মন্ত্রী। প্রজার আবার স্বত্ব স্বাধীনতা কি?

জারেভিচ। রুশিয়ার প্রজার যদি কোনও অধিকার না থাকে তাহা হইলে এ রাজ্য বিধাতার অভি-

সম্পাতগ্রস্থ হইয়াছে। যাহারা জীবন দান করিয়া আমাদিগের যুদ্ধ জয় করিয়া আসিয়াছে, রণক্ষেত্রে আহত হইয়াও জারের গৌরব রক্ষা করিয়াছে—ভীষণ হিংস্র জন্তু সমাকুল অরণ্য সকল পরিষ্কার করিয়া সুন্দর সুন্দর কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে এবং বাল্‌টিকসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—তাহারা যদি আজ সামান্য অধিকারটুকু হইতেও বঞ্চিত হয় তবে জানিবেন বিধাতার সিংহাসন টলিয়া উঠিবে। তাহারা অত্যাচারের প্রতিবাদ করিত বলিয়া আপনারা আইন করিয়া তাহাদিগের মুখবন্ধ করিয়াছেন ;—আজ তাহারা বোবা হইয়া রহিয়াছে সত্য, কিন্তু জগদীশ্বর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাদিগকে যে সবল বাহু দিয়াছেন তাহা আজিও অসাড় হইয়া যায় নাই—তাই আজ দেখিতেছি গৃহে গৃহে ভীষণ প্রতিহিংসার আগুণ জলিয়া উঠিয়াছে এবং সহরময় গুপ্ত ঘাতকেরা উন্মত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

জার। দেখ অ্যালেক্‌সিস্! তোমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই—তুমি এখান হইতে যাও। উঃ! ভগবান! আমার নিজের পুত্র—সেও কিনা আমার কার্য্যের অনুমোদন করে না! দেখ মন্ত্রী, এই ঘোষণাপত্রে আমার মোহর অঙ্কিত করিয়া দাও, আর কালই সহরময় সামরিক আইন জারি কর।

এই বলিয়া জার দারুণ উত্তেজনার সহিত চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একখানা রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘর্ম্ম মুছিয়া ফেলিলেন। মন্ত্রী পল জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্রাটের কি বড় গরম বোধ হইতেছে?

জার অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, হাঁ—বড়ই ক্লান্তি বোধ করিতেছি; দেখি ওই ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াইয়া একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগাই।

জার যেমন ব্যাল্‌কনির রেলিং ধরিয়া বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছেন অমনি গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া দুইবার পিস্তলের আওয়াজ হইল। সম্রাট অর্দ্ধ জড়িতস্বরে ডাকিলেন,—অ্যালেক্‌সিস্—অ্যালেক্‌সিস্?

অ্যালেক্‌সিস্ নক্ষত্রবেগে বাহিরে ছুটিয়া যাইয়া দেখেন, রুশিয়ার সম্রাট রক্তাক্ত দেহে বারাণ্ডার উপর পড়িয়া রহিয়াছেন ;—সভাসিদেরা ধরাধরি করিয়া জারের মৃতদেহ গৃহের মধ্যে আনয়ন করিলেন। অ্যালেক্‌সিস্ পিতার মৃতদেহের উপর সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। সেই রাত্রেই সমগ্র ইউরোপে রাষ্ট্র হইয়া গেল রুশিয়ার জার নিহিলিষ্টের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

(৪)

জারের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। নূতন জার অ্যালেক্‌সিস্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পুরাতন মন্ত্রীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া নূতন মন্ত্রণাসভার গঠন করিয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রী প্রিন্‌স পলকে এক পক্ষের মধ্যেই রুশিয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার আদেশ করিয়াছেন। সামরিক আইন রদ করিয়া দেওয়ায় নাগরিকেরা শত মুখে জার অ্যালেক্‌সিসের প্রশংসা করিতেছে ; এবং কারাগার হইতে বহু রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি লাভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে সহরের উত্তেজনা অনেক কমিয়া আসিয়াছে এবং নিরীহ নাগরিকেরাও একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। চারিদিকে যখন এইরূপ শান্ত নীরবতা বিরাজ করিতেছে সেই সময় একদিন সন্ধ্যার পর হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে এবং আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে ; মস্কোনগরীর রাজপথে লোক চলাচল একরূপ বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। এমনি সময়ে একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স পলের প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া দ্বাররক্ষীর নিকট আপনার কার্ড প্রদান করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই একজন ভৃত্য আসিয়া আগন্তুককে পলএর ড্রয়িংরুমে লইয়া গিয়া বসাইল এবং একটু পরেই প্রিন্স পল কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

পলকে অতিশয় বিমর্ষ দেখিয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা

করিলেন, আপনাকে বড়ই শোকাকুল দেখিতেছি কেন?

পল। মহাশয়! আমার সমুদয় সম্পত্তি সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এবং পনের দিনের মধ্যে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার হুকুম হইয়াছে। জীবন ভরিয়া যাহা কিছু অর্জ্জন করিয়াছিলাম তাহা সমুদয় রুশিয়ায় রাখিয়া গেলাম। যা'ক, হতমান হইয়া এখানে বাস করা অপেক্ষা এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। আপনাকে দেখিয়া ভয় হইতেছে, আবার কি জার কোনও নূতন পরোয়ানা পাঠাইলেন নাকি?

আগন্তুক। হাঁ—একটা পরোয়ানা আছে বটে।

পল। কৈ, দেখি? আপনি বোধ হয় নূতন জার কর্ত্তৃক মেজর জেনারেলের পদে উন্নীত হইয়াছেন, কারণ আমার আমলে এপদে অন্য একজন লোক ছিলেন।

আগন্তুক। প্রিন্স পল! আমি রুশিয়ার জারের বেতনভোগী কর্ম্মচারী নহি—আমি মস্কোনগরীর একজন নিহিলিষ্ট—আপনার নিকট কোনও গুরুতর কার্য্যের জন্য আসিয়াছি।

সেই মুহূর্ত্তে যদি গৃহের মধ্যে বজ্রপাত হইত তাহা হইলেও পল অধিকতর স্তম্ভিত হইতেন না।

তিনি একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

আগন্তুক ক্ষিপ্রহস্তে গুলিভরা রিভলভার বাহির করিয়া পলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যদি চীৎকার কর—কি আসন ছাড়িয়া এক পাও নড় তাহা হইলে এখনই গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিব। জান, আমরা নিহিলিষ্ট—জীবনের মায়া রাখি না।

পল্ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, আমার যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন কিন্তু আমাকে প্রাণে মারিবেন না।

আগন্তুক। তোমাকে প্রাণে মারিবার জন্য আমি এখানে আসি নাই। নূতন জার তোমাকে পথের ফকীর করিয়াছে—তুমি তাহার প্রতিশোধ লইতে চাও?

পলের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল তিনি আগন্তুককে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, ইহার জন্য আমাকে যাহা করিতে বলিবেন আমি তাহাই করিবার জন্য প্রস্তুত আছি।

অতঃপর আগন্তুক পলের কাণে কাণে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি কথা বলিলেন—উভয়ে চুপি চুপি অনেক পরামর্শ হইল ; শেষে আগন্তুক বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় পুনরায় বলিয়া গেলেন—প্রিন্স পল! সাবধান, কথার যেন নড়চড় না হয়। আগামী কল্য রাত্রি একটার সময় সরকারী বাগানের গেটের নিকট তোমাকে লইবার জন্য দুইজন লোক উপস্থিত থাকিবে। যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেখানে না যাও তাহা হইলে জানিও অদ্য হইতে তিন দিনের মধ্যে তোমাকে নিহিলিষ্টের গুলিতে প্রাণ হারাইতে হইবে।

এই বলিয়াই আগন্তুক দ্রুতপদে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর প্রিন্‌স পল অবাক হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চেয়ারের উপর বসিয়া বসিয়া এই সকল কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। বাহিরে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল ; তাহার উপর আবার মেঘ ও ধোঁয়ার আতিশয্যে সমস্ত সহরটা যেন মসীমলিন হইয়া গিয়াছিল। সেই অন্ধকার এবং বৃষ্টির মধ্য দিয়া আগন্তুক সামরিক কর্ম্মচারীর বেশে মস্কোর রাজপথ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ইনিই নিহিলিষ্ট দলপতি মাইকেল সিক্‌রোফ্।

পরদিন রুইচের্ণাভস্কার প্রশস্ত কক্ষে নিহিলিষ্টদিগের এক মন্ত্রণা সভা বসিল। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী প্রিন্‌স পলকে মণ্ডলীভুক্ত করা যায় কি না প্রথমে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা হইতে লাগিল।

সভাপতি বলিলেন, মাইকেল স্বয়ং ইহাকে মণ্ডলীভুক্ত করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছে। সে নিজে একটা জরুরী কার্য্যের জন্য এখনও বাহিরে রহিয়াছে। তোমাদের সকলের এ সম্বন্ধে মত কি?

ভেরা। ইহাকে কোন মতেই বিশ্বাস নাই। রুশিয়ায় যত অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে সে সমুদয়ের জন্য এই মন্ত্রীই দায়ী।

সভাপতি। পল! তুমি কি জন্য আমাদের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছ?

পল। আমি আর কিছুই চাহি না—আমি শুধু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি—আমার যথাসর্ব্বস্ব জার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছেন; আমি তাহার প্রতিশোধ লইতে চাই।

সভাপতি। আমাদেরও জীবনের ব্রত শুধু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা।

পল। তোমাদিগের টাকার দরকার হয় আমি আমার ধন ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিব—রাজপ্রাসাদের যেখানে যে খুঁটি নাটী সংবাদ চাও তাহা আমার ন্যায় কেহই সঠিক বলিতে পারিবে না; আরও নানা উপায়ে আমি তোমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিব।

ভেরা। আমার কিন্তু এ লোককে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

সভাপতি। যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তখনই ইহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেই আপদ চুকিয়া যাইবে। আর একটা কথা আছে। ইহার দ্বারা অনেক গুপ্ত সংবাদ পাওয়া যাইবে। তা'ছাড়া সম্প্রতি আমরা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব বলিয়া স্থির করিতেছি তাহা পলএর সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না।

ভেরা। যদি তাহাই হয় তবে ইহাকে গ্রহণ করা যাক্।

পল যথারীতি শপথ গ্রহণ করিলে সভাপতি গম্ভীর স্বরে তাহাকে বলিলেন—দেখ প্রিন্স! যদি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা কর তবে জানিয়া রাখিও তোমার আর নিস্তার নাই; নিহিলিষ্টরা বিশ্বাসঘাতককে কখনও ক্ষমা করে না। পৃথিবীর যেখানে যাইয়াই আশ্রয় লও না কেন, নিহিলিষ্টের গুলিতে তোমাকে প্রাণত্যাগ করিতেই হইবে। ইতিমধ্যে বাহির হইতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। গৃহের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল,

Vœ tyrannis

বাহির হইতে তিনবার উত্তর আসিল,

Vœ Victis

পরক্ষণেই মাইকেল অন্য এক জন সঙ্গীসহ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহস্থিত সকলেই সসম্ভ্রমে মাইকেলকে অভ্যর্থনা করিলেন। সভাপতি বলিলেন তুমি জারকে হত্যা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছ এবং সমগ্র রুশিয়াকে রক্ষা করিয়াছ।

মাইকেল। কিন্তু এখনও ত রুশিয়ার উদ্ধার সাধন হয় নাই। এক জন গিয়াছে, আর এক জন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে—সিংহ মরিয়াছে কিন্তু সিংহ শিশু গর্জ্জন করিতেছে।

সভাপতি—ঠিক, ঠিক, এখনও রুশিয়ার সিংহাসন শূন্য হয় নাই।

ভেরা আপন মনে বলিতে লাগিল ইহারা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছে? অ্যালেক্সিসের কথা নয় ত? কিন্তু তিনিত আদর্শ নৃপতি, তাঁহার বিরুদ্ধে আবার ষড়যন্ত্র কেন?

মাইকেল। সভাপতি মহাশয়! আমরা মূর্খের ন্যায় সময় নষ্ট করিতেছি। সিংহকে মারিয়া ফেলিয়া সিংহ শিশুকে জীবিত রাখা মূর্খের লক্ষণ, কারণ এক দিন সেই আবার তাহার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে। আর এক দিনও বিলম্ব করা উচিত নহে; যত বিলম্ব করিব ততই আমরা সুযোগ হারাইব। আর অ্যালেক্সিস্ যেরূপ চালাক তাহাতে ইতিমধ্যেই সে হয়ত প্রজাদিগকে দুই চারিটা অধিকার দান করিয়া সমুদয় উত্তেজনা ঠাণ্ডা করিয়া দিবে এবং আমাদিগের সাধারণ-তন্ত্র স্থাপন করা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইয়া যাইবে।

পল। ঠিক বলেছ মাইকেল; সাধারণ তন্ত্র স্থাপনের পথে ভাল রাজারাই প্রধান অন্তরায়। তাহাদিগের সুশাসনের গুণে প্রজারা সকলেই রাজ ভক্ত হইয়া উঠে, সুতরাং আর জন সাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবার সুবিধা পাওয়া যায় না। মস্কো নগরীতে ইতিমধ্যেই অ্যালেক্সিসের সুযশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে; আর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই যখন তিনি আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন

তখন তোমরা নিশ্চয় জানিও যে অতি শীঘ্রই অ্যালেক্সিস্ এক জন প্রজারঞ্জক সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

মাইকেল। ও সব কেবল লোক ভুলাইবার জন্য আরম্ভ করিয়াছে;—এই ভাল মানুষ রাজা গুলাই আমাদের প্রধান শত্রু। আমরা ভাল মন্দ জানি না—যাহার মাথায় রাজ মুকুট দেখিব তাহাকেই গুলি করা আমাদিগের ধর্ম্ম। যাহা কিছু নিয়ম তন্ত্র প্রচলিত আছে সে সকলই অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সব ধ্বংশ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে ভাল মন্দ কোনও বিচার নাই।

দূরে গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল; সভাপতি টেবিলের উপর টোকা দিয়া বলিলেন আমাদিগের সভা বসিবার সময় হইয়া গিয়াছে—কেহ অনুপস্থিত আছে?

সকলে সমস্বরে উত্তর করিল—অ্যালেক্সিস্ আসে নাই।

দেখিতে দেখিতে ভেরার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

সভাপতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, মাইকেল! নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের সপ্তম নিয়মটী পাঠ কর।

মাইকেল। "যদি কোনও সভ্য সভাপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হয়েন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার আছে কি না সভাপতি সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন।"

সভাপতি। অ্যালেক্সিসের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার আছে?

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—অ্যালেক্সিস্ রাজমুকুট মাথায় পরিয়াছে!

সভাপতি। মাইকেল! বিপ্লববাদীদিগের দশম আইন পাঠ কর!

মাইকেল। "রাজ সিংহাসনের সহিত নিহিলিষ্টদিগের চিরন্তন শত্রুতা। পৃথিবীর যেখানে যত রাজা আছেন ভাল মন্দ নির্ব্বিচারে সকলকে হত্যা করাই নিহিলিষ্টদিগের এক মাত্র ব্রত।"

সভাপতি। তোমাদের সকলের মত কি? অ্যালেক্সিস্ দোষী না নির্দ্দোষী?

সকলেই এক বাক্যে বলিল, দোষী।

সভাপতি বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন, ইহার উপযুক্ত শাস্তি কি?

নিহিলিষ্টগণ অম্লানবদনে উত্তর করিল—মৃত্যু।

সভাপতি অবিচলিতকণ্ঠে কহিলেন, লটারীর সরঞ্জাম আনয়ন কর;—বন্ধুগণ! আপনারা সকলে প্রস্তুত হইয়াছেন?

এতক্ষণ পরে ভেরা তাঁহার আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার চক্ষে আর সে অনল-দীপ্তি নাই, মুখে সে ভীষণ ভ্রুকুটী নাই। রমণীসুলভ কাতরতার সহিত তিনি বলিলেন—

আর একটু অপেক্ষা করুন, সভাপতি মহাশয়। আমি এখনও প্রস্তুত হইতে পারি নাই—আমার একটা কথা বলিবার আছে।

মাইকেল মুখ ঘুরাইয়া বলিল—আমি জানিতাম তুমি ঠিক আপত্তি তুলিবে।

ভেরা কাহারও প্রতি দৃকপাত না করিয়া বলিতে লাগিলেন—অ্যালেক্সিস্কে আমরা ভাই বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। রাজার সন্তান হইয়াও প্রতিরাত্রে মুটে মজুরের ন্যায় তিনি এই সকল দুর্গম রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন এবং এতকাল ধরিয়া নানারূপে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। চিরকাল সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াও আমাদিগের সহিত কতকাল তিনি দুঃখের দিন যাপন করিয়াছেন এবং রাজ্যের অনেক গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছেন।

মাইকেল। এবং অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতাও করিয়াছেন।

ভেরা। মাইকেল! মিথ্যা কথা বলিও না। অ্যালেক্সিস্ যদি বিশ্বাসঘাতক হন, তবে তুমি আমি সকলেই বিশ্বাসঘাতক। কতবার অ্যালেকসিসের অনুগ্রহে আমরা প্রাণ পাইয়াছি সে কথা কি মনে আছে? সেদিন জেনারেল কোটেমকিনের হাত হইতে কে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল?—কে

নিহিলিষ্টদিগকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল? অ্যালেকসিস যদি বিশ্বাসঘাতক হইতেন তাহা হইলে সিংহাসনে আরোহন করিয়াই ত মস্কোনগরীকে নিহিলিষ্ট শূন্য করিয়া ফেলিতে পারিতেন? কারণ, তোমরা ত জান কোথায় কোথায় নিহিলিষ্টদিগের আড্ডা আছে তাহার খুঁটী নাটী সমুদয় সংবাদই অ্যালেক্‌সিস্ অবগত আছেন!

মাইকেল। কিন্তু সমুদয় অত্যাচারী রাজাকে নিহত করাই ত আমাদিগের ব্রত!

ভেরা। অ্যালেক্‌সিস্ ত অত্যাচারী নহে? তোমরাত সকলেই তাহার হৃদয় জান! কতদিন কতরাত্রি তাহার সহিত আমরা একত্রে কাটাইয়াছি—তাহার প্রাণের অন্তস্থল পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়া লইয়াছি—কই সেত অত্যাচারী নহে?

মাইকেল। কিন্তু আমরা নিহিলিষ্ট—আমরা কি আমাদিগের শপথ রক্ষা করিব না?

ভেরা। কিসের শপথ? যে ধার্ম্মিক, প্রজারঞ্জক এবং সুশাসক, তাহাকেও কি হত্যা করিয়া শপথ রক্ষা করিতে হইবে? আমরা অন্যায় এবং অত্যাচার দূর করিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যইত স্বেচ্ছাচারী রাজাদিগকে হত্যা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি—কিন্তু রাজা যদি অত্যাচারী না হইয়া আপনা হইতেই সুশাসন করিতে আরম্ভ করেন, তবে কেন অকারণ নরশোণিতে আপনাদিগের হস্ত কলঙ্কিত করিব? যে পাপী—পরস্বাপহারক এবং অত্যাচারী তাহাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দাও—কিন্তু যে পাপের নামে শিহরিয়া উঠে এবং চিরদিন নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাকেও কেন নিশীথ রাত্রিতে হত্যা করিয়া আসিবে? তাহা হইলে পাপ এবং পুণ্য—ন্যায় এবং অন্যায়, ইহার মধ্যে ত আর কোনও ভেদ থাকিবে না? এ যদি তোমরা না দেখ, তাহা হইলে বুঝিব যে রাজার অত্যাচার দূর করিয়া দেশের মধ্যে নিহিলিষ্টদিগের অত্যাচার প্রতিষ্ঠিত করাই তোমাদিগের ইচ্ছা।—কিন্তু অন্যায়ের দ্বারা কখনও কোন ধর্ম্মমণ্ডলী পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে পারে না।

সভাপতি। অবাক কাণ্ড! যে ভেরার নামে ইউরোপের রাজন্যবৃন্দ ঠক ঠক করিয়া কাঁপে, সেই ভেরা কি না আজ এক রাজার জীবন রক্ষার জন্য তর্ক করিতেছে!

মাইকেল। ভেরা! আমি এখনও মরি নাই—আমি তোমার সমস্ত গুপ্ত কথা জানি—প্রেম তোমাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাই আজ তুমি পথ দেখিতে পাইতেছ না;—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি একদিন যখন এই প্রেমের কথা তুলিয়াছিলাম, তুমি তখন ছেলেখেলা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলে। আর দেশের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার জন্য আমাকে কি অগ্নিময়ী বাণী শুনাইয়াছিলে—সে সকল কথা কি মনে পড়ে?—আমি পিতা মাতা ভাই ভগিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সুখের সংসারে আনন্দে দিন কাটাইতেছিলাম—কে আমার সেই সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া দিল?—কে আমাকে আমার সেই স্নিগ্ধ শান্ত পল্লী গৃহের নিভৃত কক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া এই যজ্ঞাগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল? কে আমাকে এই বেদীর উপর বসাইয়া জন্মভূমির নামে শপথ গ্রহণ করাইয়া দীক্ষা দিয়াছিল "জীবনে কাহাকেও ভাল বাসিও না কিম্বা কাহারও ভালবাসা গ্রহণ করিও না।" তুমি রুশিয়ার নগরে নগরে বিদ্রোহের রক্তপতাকা উড্ডীন করিয়াছ—গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছ, এবং সমগ্র দেশের নিকট মুক্তির বারতা প্রচার করিয়াছ।—আজ তরণী যখন মধ্যপথে উপস্থিত হইয়াছে, তখন কোন অকূলে তাহাকে ভাসাইয়া দিতেছ?—ভেরা?—ভেরা?—স্বাধীনতার বরপুত্রী?—তুমি যদি আজ প্রেমের কুসুমহার কণ্ঠে ধারণ কর, তবে আমার জন্মভূমির মুক্তিমণ্ডপ কে রচনা করিবে? দেশ দেশান্তর হইতে কেই বা এই বিশ্বত্রাস যজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করিয়া আনিবে? চাহিয়া দেখ, তোমার উৎসাহহীনতায় নিহিলিষ্ট-মণ্ডলীর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং স্বাধীনতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। ভেরা?—এমন সময় প্রেম বড়, না স্বদেশ বড়?—অ্যালেকসিস্ বড়, না জন্মভূমি বড়?

ভেরা উন্মত্তের ন্যায় মাইকেলের হস্ত ধারণ করিয়া প্রবল ভাবে নাড়া দিয়া বলিল—মাইকেল!—মাইকেল! আর না—আর না। যেদিন পিতার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসি সেদিন তোমাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম—আজ তুমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ঠা ভগ্নীকে পথ চিনাইয়া দিয়া ভাইয়ের কাজ করিয়াছ; অ্যালেকসিসের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সে তাহার শপথ ভঙ্গ করিয়াছে—নিহিলিষ্ট-মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া রাজমুকুট গ্রহণ করিয়াছে—সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মণ্ডলীর আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়াছে—মৃত্যুই তাহার উপযুক্ত শাস্তি—কিন্তু তবুও আজ নয়, কাল নয়;—মাইকেল! লক্ষ্মী ভাই আমার! তাহাকে আর এক সপ্তাহ বাঁচিতে দাও। আমরা আজ কত শতাব্দী ধরিয়া রাজার অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছি—আর একটা সপ্তাহও না হয় সহিয়া থাকি!

তার পর?—তার পর ভেরা ধীরে ধীরে আপনার চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল এবং বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আপনার মনে বলিতে লাগিল—মাইকেল! এতদিন ধরিয়া ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু পারিলাম না। স্নেহ, প্রেম ভালবাসা, ভগবদ্দত্ত সমুদয় বৃত্তিই রমণী-হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিয়া দিয়াছিলাম—ইহার জন্য প্রতিদিন সংগ্রাম করিয়া আপনার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছি, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিলাম না। তোমরা পুরুষ—তোমাদের সহিবার বল আছে—কিন্তু আমি রমণী,—ভাল বাসাই আমার জীবনের সম্বল,—অ্যালেকসিস্‌কে হত্যা কর—কিন্তু আর এক সপ্তাহ কাল তাহাকে বাঁচিতে দাও।

মাইকেল সস্নেহে ভেরার হাত ধরিয়া তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেল। তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—ভেরা! তুমি সরল হৃদয়া রমণী—তুমি কি জানিয়াছ অ্যালেকসিস সত্যসত্যই তোমাকে ভালবাসে? রুশিয়ার সিংহাসনে বসিয়া দুইদিন তোমাকে লইয়া সে খেলা করিবে, তার পর সুগন্ধি গোলাপের পাপড়ীগুলি খসিয়া গেলে লোকে যেমন তাহাকে পথের ধূলায় ফেলিয়া দেয়, তেমনি তোমারও দিন ফুরাইলে রুশিয়ার রাজপ্রাসাদে তোমার আর স্থান হইবে না।

ভেরা বাধা দিয়া বলিল—থাক্ থাক্ অ্যালেক্‌সিসের চরিত্র সম্বন্ধে তুমি আমার নিকট কিছু বলিও না। অ্যালেক্‌সিস্ দেবতা—আমি তাঁহার চরিত্রের প্রতি অনু, পরমাণুর সন্ধান রাখি। আর তিনি ত এখন মৃত্যুপথের যাত্রী; তিনি আমাকে লইয়া কি করিতেন না করিতেন সে সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার তোমার ত কোনও কারণ নাই।

মাইকেল। আচ্ছা যাক, সে কথায় আর কাজ নাই। কিন্তু অ্যালেকসিসকে আর সময় দেওয়া যাইতে পারে না। কাল রাত্রেই তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। প্রিন্স পল সমুদয় পথ পরিস্কার করিয়া রাখিয়াছেন—শুধু একবার যাইয়া তাহার সুখের স্বপ্নটী ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিতে হইবে।

ভেরা। কিছুতেই তোমরা দেরী করিবে না?

মাইকেল। ছি! ভেরা! এখনও তোমার মুখে এই কথা? তুমি কি তোমার ভাই ডিমিট্রিকে ভুলিয়া গিয়াছ? সে রাজার ছেলে নহে সত্য, কিন্তু তাহার ন্যায় সাধু, সচ্চরিত্র এবং বিদ্বান আজ কাল কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? কি দোষে আজ সে সাইবিরীয়ার মরুভূমিতে দিন কাটাইতেছে? লৌহশৃঙ্খলে তাহার হাত পা বাধিয়া কশাঘাত করিতে করিতে যখন তাহাকে তোমাদের গৃহদ্বারে আনিয়া ফেলিয়াছিল, তখন তাহার দিকে কে তাকাইয়াছিল? তোমার বৃদ্ধ পিতার কাকুতি মিনতিতে কই, তাহারা ত একদিনের জন্যও ডিমিট্রিকে তোমাদিগের কাছে রাখিল না—তোমার অশ্রুজল দেখিয়া কই, কাহারও ত প্রাণে ব্যথা লাগিল না।

ভেরা আর সহিতে পারিল না—অধৈর্য্য হইয়া মেজের উপর বসিয়া পড়িল।

মাইকেল বলিতে লাগিল, তার পর তোমার

দাদা যখন জন্মের-মত গৃহদ্বার ছাড়িয়া যায়, তখন ভগবানের নাম লইয়া তুমি কি শপথ করিয়াছিলে তাহা মনে আছে কি ভেরা?

ভেরা বসিয়াছিল, চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মাইকেল উৎসাহিত হইয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—

তা'র পর তোমার দাদার শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার ইহকালের একমাত্র আশ্রয়স্থল বৃদ্ধ পিতা যখন অন্তিম শয্যা গ্রহণ করিলেন তখনকার দৃশ্য কি ভুলিয়া গিয়াছ? ডিমিট্রির নাম করিয়া যখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলেন, তখন তুমি তোমার পিতার মৃত্যুশয্যায় বসিয়া বিধাতার নামে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে আজ তাহা কোথায় গেল? তুমি ভুলিয়া গিয়াছ,—কিন্তু আমি এই কক্ষের চারিদিকে তোমার পিতার তৃষিত আত্মার আকুল আহ্বান শুনিতে পাইতেছি;—আর দূরে,—অতি দূরে—সাইবিরীয়ার বিজন মরুভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া একজন অভুক্ত যুবক ক্ষীণকণ্ঠে বলিতেছে, ভেরা—ভেরা—অত্যাচারের প্রতিশোধ চাই। হায়! হতভাগ্য ডিমিট্রি! তোমার সাধের ভেরা আজ প্রেমের স্বপ্ন দেখিতেছে!

কটীদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা গ্রহণ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তীব্রবেগে ভেরা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল এবং অধীর হইয়া সভাপতিকে বলিল—সভাপতি মহাশয়! অ্যালেক্‌সিসের হত্যার জন্য লটারী সজ্জিত করুন। অন্যান্য নিহিলিষ্টগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

কাঠের পায়ার উপর একটী মড়ার মাথা; তাহারই মধ্যে লটারীর কাগজখণ্ড গুলি তৎক্ষণাৎ নিক্ষিপ্ত হইল; এবং একে একে সকলেই তাহার মধ্য হইতে এক এক টুক্‌রা কাগজ গ্রহণ করিল।

সভাপতি আদেশ করিলেন সকলে আপন আপন লট্ দেখাও! ভেরা অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া কহিল—সভাপতি মহাশয়! আমিই লট্ পাইয়াছি—আমার হাতে রক্তাক্ত কাগজ আসিয়াছে। তারপর ভেরা আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিল ডিমিট্রি! কাল তোমার তৃষিত আত্মার তর্পণ করিব।

মাইকেল আনন্দে অধীর হইয়া প্রিন্সপলকে সভাপতির নিকট আনিয়া বলিল, ইনিই এখন ভেরাকে সমুদয় প্রয়োজনীয় সংবাদ জানাইবেন।

পল ভেরাকে চুপি চুপি বলিলেন, রাজপ্রাসাদের উত্তরদিককার কক্ষে অ্যালেক্‌সিস্ নিদ্রা যাইবেন; তাঁহার কক্ষে কোনও প্রহরী পাহারা দেয় না,—এমন কি কোনও ভৃত্যও থাকে না। সভাপতির নিকট গুপ্ত দ্বারের চাবি দিয়াছি এবং দ্বাররক্ষীদিগের সাঙ্কেতিক কথাও বলিয়া দিয়াছি। সুতরাং অ্যালেক্‌সিসের কক্ষে যাইতে কোনওরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

সভাপতি। আর আমরা সকলেই বাহিরে রাস্তার উপর অপেক্ষা করিব। যেমন রাত্রি একটা বাজিবে আর অমনি তুমি আমাদিগকে সঙ্কেত করিয়া জানাইবে যে কুকুরকে মারিয়া ফেলিয়াছ।

ভেরা জিজ্ঞাসা করিল কি সঙ্কেত করিব?

সভাপতি। জানালা দিয়া রক্তাক্ত ছুরিকাখানি ফেলিয়া দিয়ো, তাহা হইলেই আমরা বুঝিব যে অ্যালেক্‌সিস্ আর এ পৃথিবীতে নাই। আর যদি রক্তাক্ত ছুরিকা ঠিক একটার সময় রাস্তায় না পাই তাহা হইলে বুঝিব যে তুমি ধরা পড়িয়াছ, আর আমরা সদলবলে গৃহের মধ্যে ঢুকিয়া তোমাকে ছাড়াইয়া লইয়া আসিব।

মাইকেল। আর সেইখানে অ্যালেক্‌সিস্‌কে তাহার প্রহরীদিগের মধ্যেই গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিব।

ভেরা সুতীক্ষ্ণ ছোরার উপর তীব্র বিষ মাখাইয়া লইতে গেল। সভাপতি বলিলেন আজ তবে সভা ভঙ্গ হউক।

(৫)

সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আজ ভয়ানক দুর্য্যোগ আরম্ভ হইয়াছে—আকাশ জোড়া কালোমেঘ পৃথিবীতে প্রলয়ের অভিযান আরম্ভ করিয়াছে; এবং

তমিস্রা রজনী কৃষ্ণাম্বর পরিধান করিয়া সমগ্র সহরটীকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। বাহিরে যেমন প্রবল বাতাস তেমনি মুসলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে।

এই দুর্য্যোগের দিন জার অ্যালেক্‌সিস্ আহারান্তে একখানি কোচের উপর শয়ন করিয়া প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কর্ম্মচারী আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে জার বলিলেন দেখুন, কাল মন্ত্রণা সভায় এই প্রস্তাবগুলি পাশ করিতে হইবে; আপনি যথারীতি লিখিয়া লউন।

যে সকল রাজনৈতিক বন্দী সাইবিরীয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়া আপন আপন গৃহে পৌছাইয়া দিতে হইবে।

লবণের এক চেটীয়া ব্যবসা রহিত করিয়া দিতে হইবে এবং যাহাতে দীন দুঃখীরা সস্তায় লবণ ক্রয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রুশিয়ার জনসাধারণকে লইয়া এক পার্লামেণ্ট গঠন করিতে হইবে এবং যাহাতে সকল শ্রেণীর লোক সেখানে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর যে সকল ট্যাক্সের দ্বারা গরীব দুঃখীদিগের প্রতি অত্যাচার হইতেছে তাহাও তুলিয়া দিতে হইবে।

জার জিজ্ঞাসা করিলেন সব বিষয়ের নোট নেওয়া হইয়াছে? কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন, হাঁ।

জার। আজ তবে আপনি বিশ্রাম করিতে যান।

* * * * *

একটু পরেই একজন এডিকং আসিয়া অভিবাদন করিয়া জানাইলেন যে তিনি জারের শয়ন কক্ষে পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছেন। জার হাসিয়া বলিলেন, সে সব কিছু করিবার প্রয়োজন নাই; আমি ত আর রাজনৈতিক বন্দী নই, যে রাত্রিতেও আমাকে সশস্ত্র পুলিশ ঘিরিয়া রহিবে? তুমি যাও—আমি নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে নিদ্রা যাইব। এডিকং পুনরায় অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

জার আপন মনে গুন গুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন বাহিরে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল—অ্যালেক্‌সিস উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে দণ্ডায়মান হইয়া অবিরাম বারিপতনের শব্দ শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গেলেন। বিশাল মস্কোনগরী ঝড় বৃষ্টি এবং ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে এক বিরাট দৈত্যপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল—এবং মাথার উপর বিদ্যুদ্ভাসিত মেঘাম্বর এক বিচিত্র যবনিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। কৃষ্ণাম্বর রজনীর অঞ্চল প্রান্তে দীপালোকিত নগরীর সুপ্ত প্রাসাদগুলি আলো এবং আঁধারের বিচিত্র সমবায়ে এমন এক প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছিল যে তাহা দেখিতে দেখিতে অ্যালেক্‌সিসের মুগ্ধ প্রাণ কি এক অব্যক্ত বেদনায় অস্থির হইয়া উঠিল;—তিনি ডাকিলেন, মোলান্?

পার্শ্বের কক্ষ হইতে একজন সুশোভন বালক-ভৃত্য আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল সম্রাট!

জার। এই রাত্রেই আমার তোষাখানায় যাইয়া শ্লেজ sledge প্রস্তুত করিতে বল—আমি একবার বাহিরে যাইব।

মোলান্ অ্যালেক্‌সিসের অতি বিশ্বাসী ভৃত্য;—বহুবার সে তাহার প্রভুর সহিত অনেক বিপজ্জনক স্থানে যাতায়াত করিয়াছে এবং তাঁহার প্রকৃতিও সে বিলক্ষণ জানিত—অ্যালেক্‌সিসও এই ভৃত্যকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

মোলান্ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—এই ভীষণ দুর্য্যোগে আজ আর কোথায়ও না গেলে হয় না? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—একটু বিশ্রাম করুন।

অ্যালেক্‌সিস্ কহিলেন—মোলান্, তুমি জান না, ভেরার জন্য আমার প্রাণ কত অধীর হইয়া উঠিয়াছে! কাল তাহারা আমাকে তাহাদিগের মণ্ডলীতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, কিন্তু আমি নিহিলিষ্ট হইয়া রাজমুকুট গ্রহণ করিয়াছি সুতরাং

আর কোন মুখে তাহাদের মণ্ডলীতে যাইয়া যোগ দিব? কাল যাই নাই,—আজ যাইয়া আমি আমার সমুদয় বক্তব্য তাহাদের বলিয়া আসিব—যে অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, এবং যে দুঃখের বেদনায় তাহারা এই নিহিলিষ্ট মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছে আমি কাল হইতে তাহাদিগের সেই সকল দুঃখ এবং অত্যাচার দূর করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি;—তবে কেন আর তাহারা নরশোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিবে?—ভেরার ন্যায় শুভ্র প্রস্ফুটিত কুসুম কেন লোকচক্ষুর অন্তরালে ঝরিয়া পড়িবে? মোলান্! তুমি যাও—রাত্রি দুইটার সময় আমাকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া দিও।

মোলান ভয়ে ভয়ে বেদনাজড়িত স্বরে বলিল জার! আজ আমাকে আপনার প্রকোষ্টে থাকিবার অনুমতি দিন। কি জানি, আমার মনে হইতেছে আজ এই দুর্য্যোগের মধ্যে যেন কোনও অমঙ্গল হইবে।

জার হাসিয়া বলিলেন—মোলান! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে যাও—বিশ্বপতি ভগবান্ তোমার প্রভুকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, তুমি ভাবিও না।

মোলান আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আপনার কক্ষে চলিয়া গেল।

জার ধীরে ধীরে শয্যাগ্রহণ করিয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি আর কাহাকে ভয় করিব? আমি সমুদয় অত্যাচারী কর্ম্মচারীদিগকে রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করিয়াছি—জেলখানা হইতে বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়াছি—এবং সাইবিরীয়ার মরুপ্রান্তর হইতে নির্ব্বাসিত বন্দীদিগকে আবার তাহাদিগের জননীর ক্রোড়ে ফিরাইয়া আনিয়াছি—আর সর্ব্বোপরি রুশিয়ায় পার্লামেণ্ট স্থাপন করিবার বিপুল আয়োজন করিয়াছি। কিন্তু, এততেও যদি ভেরাকে না পাই?—যদি না পাই, তাহা হইলে এ রাজসিংহাসন বৃথা—আমি ভেরাকে লইয়া কুষকের পর্ণকুটীরে সিংহাসন রচনা করিব সেও ভাল, তথাপি ভেরা শূন্য রুশিয়ার রাজসিংহাসন চাই না। যা'ক আজ রাত্রেই ভেরার কুটীরে যাইয়া ডিমিট্রির মুক্তির সংবাদ জ্ঞাপন করিব এবং তাহার দু'খানি হাত ধরিয়া বলিব যে আমি রাজত্ব করিবার জন্য সাম্রাজ্য গ্রহণ করি নাই—কোটী কোটী প্রজার মুক্তির জন্যই এই বিষময় কণ্টকমুকুট মাথায় পরিয়াছি। সে কখনও আমাকে অবিশ্বাস করিবে না—কিন্তু আমি যে শপথ ভঙ্গ করিয়াছি! তা' হউক তাহাকে বুঝাইয়া বলিব যে আর কিসের জন্য শপথ?—ইচ্ছাতন্ত্র শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ সাধন করাইত আমাদিগের উদ্দেশ্য ছিল—সে উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হইয়াছে তখন আর অনর্থক এই লোকক্ষয়কর, সমাজধর্ম্মনাশক ভীষণ প্রতিজ্ঞার আবশ্যকতা কি?—আজ রাত্রেই তবে ভেরার কুটীরে আমার জীবনের প্রথম নিশা যাপন করিব এবং তাহাকে দেখাইব যে অ্যালেক্‌সিসের হৃদয়ে সমগ্র রুশিয়ার রাজসিংহাসন অপেক্ষা ভেরার সিংহাসন কত উচ্চে স্থাপিত। এই সকল সুখের কল্পনায় ভাসিতে ভাসিতে অ্যালেক্‌সিস নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

রাজপ্রাসাদের ঘড়ীতে ১২টা বাজিয়া গেল;—অবিশ্রাম বারিপাতের মধ্যে প্রহরীদিগের সাঙ্কেতিক ধ্বনি দুই একবার শোনা গেল, তা'র পর রাজপুরীর চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল।

রজনীর অন্ধকারের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রে আপাদ মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া ভেরা অ্যালেক্‌সিসের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল তা'র পর বাহিরের আবরণ পরিত্যাগ করিয়া কটীদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিল এবং ত্রস্তে কক্ষের চতুর্দ্দিক একবার দেখিয়া লইল।

উজ্জ্বল দীপালোকে সুসজ্জিত কক্ষের চারিদিক আলোকিত হইয়া রহিয়াছে—উন্মাদিনী ভেরা চাহিয়া দেখিল, দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর তাহার জীবনের আলোক অ্যালেক্‌সিস্ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন—প্রশস্ত ললাটে বিন্দু মাত্রও চিন্তার রেখা নাই এবং মুখমণ্ডলে যেন এক দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তার পর পাগলিনীর ন্যায় কিছুক্ষণ অ্যালেক্‌সিসের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ভেরা দৃঢ় হস্তে উন্মুক্ত ছোরা গ্রহণ করিয়া জারের শয্যার দিকে অগ্রসর হইল—বাহিরে ভীম গর্জ্জনে প্রলয়ের বাতাস হুঙ্কার করিয়া উঠিল—ভেরা চমকিয়া দুইপা পিছাইয়া আসিল। তা'র পর আপন মনে বলিতে লাগিল—আস্তে,—আস্তে; চুপ,—চুপ;—নিঃশ্বাস যেন না পড়ে—বাতাস যেন টের না পায়—ভেরা আজ তাহার হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিতে আসিয়াছে।

আহা! ঘুমাও—ঘুমাও অ্যালেক্‌সিস্—পৃথিবীর নিষ্কলঙ্ক শুভ্র ফুল! তুমি ঘুমাও। তোমার প্রিয়তমা ভেরা আজ তোমার বক্ষের শোনিত পান করিতে আসিয়াছে—নিহিলিষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে রমণী যে রাক্ষসী হয় তাহাত তুমি জান না!

রমণী হৃদয়ের সার রত্ন! দুঃখিনী ভেরার জীবন-সর্ব্বস্ব! ঘুমাও—ঘুমাও—জাগিয়া উঠিলে ভেরা আর তাহার ব্রত পালন করিতে পারিবে না!

এক-পা এক-পা করিয়া ভেরা অ্যালেক্‌সিসের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল—তা'র পর কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানার উপর বসিয়া পড়িল।—পৃথিবীর সমুদয় আলো যেন একে একে তাহার চক্ষের সম্মুখে নিভিয়া গেল এবং তাহার জীবন প্রদীপও সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। রমণীর যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ আর এক মুহূর্ত্ত পরে চির জীবনের জন্য ভেরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে! তবে একবার,—এক মুহূর্ত্তের জন্য ভেরা তাহার সারা জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া লউক,—তা'রপর নিহিলিষ্টের প্রতিজ্ঞা পালন করিবে। কম্পিত হৃদয়ে ভেরা অ্যালেক্‌সিসের ললাট দেশ চুম্বন করিল। অ্যালেক্‌সিস্ চমকিয়া শয্যার উপর লাফাইয়া উঠিলেন এবং বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে ভেরার দিকে চাহিয়া বলিলেন—একি?—ভেরা?—তুমি এখানে? তবে আমি মিথ্যা স্বপ্ন দেখি নাই! আমার মনে হইতেছিল, তুমি যেন আমার সিংহাসনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া রুশিয়ার প্রজাপুঞ্জকে তাহাদিগের ন্যায্য অধিকার দান করিতেছ, আর তাহারা দুই হাত তুলিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে! ওকি?—তোমার হাতে ঘাতকের ছুরী কেন? অ্যালেক্‌সিস্‌কে হত্যা করিতে আসিয়াছ?—তাই এই গভীর রজনীতে ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়া বিপদসঙ্কুল রাজপুরীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছ?—আর একটু অপেক্ষা করিলে না কেন ভেরা?—ওই দেখ আমার ছদ্মবেশ সজ্জিত রহিয়াছে, রাত্রি দুইটার সময় তোমার নিজের কুটীরেই অ্যালেক্‌সিসকে দেখিতে পাইতে—সেইখানেই তাহার হৃদয় রক্তে প্রেমের তর্পণ করিতে পারিতে!

তার পর সস্নেহে ভেরাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া অ্যালেক্‌সিস্ কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—ভেরা! এই বক্ষে ছুরী মারিতে আসিয়াছ?—তবে আর বিলম্ব কেন?—প্রহরীরা নিদ্রা যাইতেছে,—রক্ষীরা কেহ উপস্থিত নাই—এইবার অ্যালেক্‌সিসের প্রেমের পুরস্কার দাও—তোমাকে দেখিতে দেখিতে তাহার চোক্ষের জ্যোতি নিভিয়া যাউক।

ঝন্ ঝন্ করিয়া ভেরার হস্তের কৃপাণ কক্ষতলস্থ কার্পেটের উপর পড়িয়া গেল—এবং বিশাল নয়ন যুগল দিয়া দর দর ধারে অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল—তুষার শুভ্র বাহুযুগল দ্বারা অ্যালেক্‌সিসের গলদেশ বেষ্টন করিয়া অশ্রুপ্লাবিত কণ্ঠে ভেরা কহিল অ্যালেক্‌সিস্! আমি আর নিহিলিষ্ট নহি।

অ্যালেক্‌সিস্ সস্নেহে ভেরাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন—তুমি আজ হইতে রুশিয়ার জারের সহধর্ম্মিণী। কাল সমগ্র দেশে তোপধ্বনি করিয়া আমি এই শুভ বারতা ঘোষণা করিব।

ভেরা হতাশ হইয়া কহিল—অ্যালেক্‌সিস্ আর সে উপায় নাই—আর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যদি আসিতাম তাহা হইলেও বুঝি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিতাম—কিন্তু আর উপায় নাই—আমার বিবাহিত জীবনের এই প্রথম রাত্রি,—আর বুঝি এই-ই শেষ রাত্রি।

দেওয়ালের ঘড়ীতে ঠং করিয়া একটা বাজিয়া গেল। বাহিরে বহু লোক এক সঙ্গে কোলাহল করিয়া উঠিল; অ্যালেক্‌সিস্ চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, ও কিসের কোলাহল ভেরা?

ভেরা অধীর হইয়া অ্যালেক্‌সিস্‌কে চুম্বন করিয়া বলিল—বুঝিতেছ না. ওই আমাদের বিবাহোৎসবের কোলাহল শোনা যাইতেছে।

আবার গৃহদ্বারের নিকট গভীর কোলাহল শোনা যাইতে লাগিল।

ভেরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, অ্যালেক্‌সিস্‌! জন্মাবধি এই আমার জীবনে প্রথম সুখের রাত্রি—আর এই শেষ!—তুমি আর একবার তেমনি মিষ্ট স্বরে ডাক—আর একবার তেমনি আদর করিয়া কথা কও! আজ আমার জীবনের সমস্ত সুপ্ত-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে—প্রাণ তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে।

অ্যালেক্‌সিস্‌ অধীর হইয়া বলিলেন, ভেরা অমন করিতেছ কেন?

কোলাহল ক্রমেই গভীর হইতে লাগিল। অ্যালেক্‌সিস্‌ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ভেরা বাহিরে নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হইতেছে, আমি একবার দেখি!

ভেরা সশব্যস্তে অ্যালেক্‌সিস্‌কে ধরিয়া বলিল—সর্ব্বনাশ! এখান হইতে একপাও নড়িও না—তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে—রাক্ষসেরা আর একটু অপেক্ষা কর, ভেরা তোমাদিগকে সঙ্কেত পাঠাইতেছে।

তা'র পর ক্ষিপ্র হস্তে হর্ম্মাতল হইতে শানিত ছুরিকাখানি গ্রহণ করিয়া ভেরা আপনার বক্ষে আমূল বসাইয়া দিল এবং রক্তাক্ত ছুরিকা গ্রহণ করিয়া গবাক্ষ পথে ছুটিয়া গেল।

অ্যালেক্‌সিস্‌ দুই বাহু বিস্তার করিয়া ভেরাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং রক্তাক্ত ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, ভেরা একি করিলে?

ভেরা অবিচলিত কণ্ঠে কহিল—অ্যালেক্‌সিস্‌ শীঘ্র ছোরাখানা দাও—ওই রাস্তার উপর নিহিলিষ্টগণ দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—এই রক্তাক্ত ছোরা ফেলিয়া দিলে তবে তাহারা ঠাণ্ডা হইবে, এবং বুঝিবে যে অ্যালেকসিস্‌ আর ইহ জগতে নাই।—দাও—দাও—আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না তাহা হইলে ভেরার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমার দিকে আর চাহিও না।—এই বলিতে বলিতে ক্ষিপ্র হস্তে আলেকসিসের হাত হইতে ছোরাখানা কাড়িয়া লইয়া গবাক্ষপথ দিয়া ভেরা তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বাহিরে নিহিলিষ্টগণ নৈশগগণ কম্পিত করিয়া নিহিলিষ্ট দলপতি ভেরা সাবুরফের নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

আর ভেরা হর্ম্ম্যতলে অ্যালেকসিসের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া অন্তিমশয্যা গ্রহণ করিয়া বলিল আঃ! তোমার কোলে শুইয়া মরিতে কি আরাম! অ্যালেক্‌সিস্‌ আজ আমার সাধের ফুলশয্যা।

অ্যালেক্‌সিস্‌ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন মোলান্‌—মোলান্‌?—

নক্ষত্রগতিতে মোলান্‌ প্রভুর কক্ষে ছুটিয়া আসিল।

অ্যালেক্‌সিস্‌ এক নিঃশ্বাসে বলিলেন, এই মুহূর্ত্তে ডাক্তারকে আমার কক্ষে ডাকিয়া আনো!

ভেরা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল সব চেষ্টাই বৃথা। অ্যালেক্‌সিস! ছোরায় তীব্র বিষ মাখান ছিল—আমার আর উদ্ধার নাই—এই দেখ এখনই বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে,—চোক্ষের জ্যোতি নিভিয়া যাইতেছে—অ্যালেক্‌সিস্‌! আমার চোক্ষের সম্মুখে দাঁড়াও! তোমাকে আর দেখিতে পাইতেছি না এই বলিতে বলিতে ভেরার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

অ্যালেকসিস্‌ চীৎকার করিয়া বলিলেন, ভেরা এ কি সর্ব্বনাশ করিলে?

অর্দ্ধজড়িত কণ্ঠে ভেরা বলিল আমি তোমাকে বাঁচাইয়া সমগ্র রুশিয়াকে রক্ষা করিলাম।

তা'র পর সব ফুরাইয়া গেল।

সমাপ্ত।

জাপানের রাজা ও প্রজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৭

মাৎসুয়ি-গোতো
ইদেতে কিকু মা বা
কাকু বাকারি
আৎসুকি হি নারি তো
ওমোবাজারিশি বো।

(ভাবার্থ)

রাজকার্য্যই আমার একমাত্র করণীয়। আজ যখন রাজকার্য্যে আমি গভীর ভাবে নিমগ্ন ছিলাম, তখন ভয়ানক গরম পড়িয়াছিল। কিন্তু আমি এতই নিবিষ্ট ছিলাম যে, মুহূর্ত্তের তরেও বুঝিতে পারি নাই যে, এতটা গরম পড়িয়াছে।

ইহাতে সম্রাটের রাজকার্য্য প্রিয়তার সম্যক্‌ পরিচয় পাওয়া যায়! তিনি তাঁহার কার্য্যে এত সমাহিত হইয়া পড়েন যে, নিদাঘের দারুণ উত্তাপের কথা তাঁহার কিছুই মনে থাকে না। আমাদের রাজপ্রতিনিধিগণ আপনাপন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বার্থের দিকে যতটা দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, প্রজার দিকে তাহার কিয়দংশ নিয়োগ করিলেও আজ দেশের এই জলকষ্ট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী অনেক পরিমাণে নিবারিত হইত। দেশের প্রতিপল্লী হইতে অন্নের জন্য এরূপ গভীর মর্ম্মভেদী তীব্র আর্ত্তনাদ শুনা যাইত না! অন্নপূর্ণা আজ অন্নের ভিখারী হইত না। শীতের প্রকোপ কমিতে না কমিতে আমাদের রাজপুরুষগণ শৈলাবাসে শুভযাত্রা করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠেন। প্রায় ষষ্ঠমাস কাল সেইখানেই কাটাইয়া কয়েক মাসের জন্য রাজধানীতে আগমন করেন। কিন্তু প্রাচীন রাজন্যবর্গ স্বীয় দৈহিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ প্রজার অবস্থা সন্দর্শন মানসে রাজ্যের মধ্যে অনেক সময়ে ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাহাতে প্রজাদের অবস্থা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিবার অবকাশ পাইতে না! তাঁহারা ঠিক বুঝিতে পারিতেন, দেশ মধ্যে তাঁহাদের শাসন কার্য্য কি প্রকার ফলবতী হইতেছে, কিরূপ অবস্থায় প্রজারা কাল যাপন করিতেছে। সত্য বটে, এই উদ্দেশ্যেই আমাদের বর্ত্তমান রাজ প্রতিনিধিরাও বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস মফঃস্বল ভ্রমণে বহির্গত হন। কিন্তু সে ভ্রমণে তাঁহারা প্রজার দুরবস্থা দেখার পরিবর্ত্তে দীপালোক সজ্জিত, পুষ্প পত্র শোভিত সহর দেখিয়া ফিরিয়া আসেন। প্রজার বাস্তব অবস্থা তাঁহাদের যেমন অজ্ঞাত, তেমনই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। নিম্ন কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগকে যেমন বুঝায় তেমনি বুঝেন, এই ত আমাদের অবস্থা!

৮

সুবা মোনো নো
কোকোরো তো তোমো নি
নোরু কোমা মো
সুকারুর শিরাদে
ইথা সুসুমুরণ।

(ভাবার্থ)

সৈনিকের অশ্বটিও তাহার সাহসী আরোহীর হৃদয়ভাব বেশ বুঝিতে পারিয়া উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে শত্রুর অনুসরণ করিতেছে। ভয়-ভাবনা, ক্লান্তি কিছুই জানে না।

যুদ্ধের অশ্ব স্বাভাবিকই তেজস্বী। আরোহী যখন রণরঙ্গে মত্ত হইয়া উঠে, অশ্বও সেই সঙ্গে মত্ত হইয়া উঠে। তখন পার্শ্ববর্ত্তীদের মনে হয়, অশ্ব আরোহীর মনভাব বুঝিয়াই যেন তাহার সহিত একই উন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। যুদ্ধের এই স্বাভাবিক দৃশ্য সম্রাটের চক্ষের উপর ভাসিতেছে; আর অশ্বের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ও আরোহীর প্রতি-সমমর্ম্মিতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

৯

কুনি নো তামে
তাওরেশি হিতো বো
ওশিমু নি মো
ওমু বা ওযা নো
কোকোরো নারি কেরি।

(ভাবার্থ)

দেশের জন্য যাঁহারা সমরাঙ্গনে দেহত্যাগ করিতেছেন, নির্জ্জনে যখন তাঁহাদের কথা ভাবি,—তাঁহাদের পিতামাতার মনের অবস্থা না জানি কিরূপ,—এ কথা তখন আমার মনে পুনঃ পুনঃ জাগে।

কবিতাটি যোদ্ধাদের প্রতি ও তাঁহাদের পিতা মাতার প্রতি সম্রাটের উদ্বেগের আর একটি নিদর্শন। যুদ্ধে সৈন্যদের মৃত্যু স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহারা কোন স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করেন না, কেবল দেশের মঙ্গল ও গৌরবের জন্য অথবা পরমার্থের জন্য যুদ্ধ করেন, তাঁহাদের মৃত্যুতে শোক হওয়া তেমনি স্বাভাবিক। মহারাজ শিবজী, মহাবীর নেপোলিয়ন, মহারাণা প্রতাপসিংহ প্রভৃতি মহাত্মাগণ এরূপ নিঃস্বার্থ যোদ্ধাদের মৃত্যুতে বড়ই শোক পাইতেন, কিন্তু কোন কোন নীচমনা রাজা যে তাঁহাদের মৃত্যুতে উৎফুল্ল হইতেন, ইতিহাসে তাহারও উল্লেখ দেখা যায়। অন্য স্থানের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই ভারতবর্ষেই এরূপ রাজার অভাব দেখা যায় না! গুণের আদর যেখানে নাই, সেখানে প্রজার হৃদয় আকর্ষণ করা রাজার পক্ষে সম্ভব নয়। য'াক, জাপান সম্রাট প্রজাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। তিনি কেবল যোদ্ধাদের কথা ভাবিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহাদের পিতামাতার কথা ভাবিয়াও তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত। এমন হৃদয়বান্ রাজার প্রজা যে দেশের জন্য মন প্রাণ সমর্পণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

১০

হাসি-ই শিতে
সুকি মিরু হোদো মো
তাতাকৈ নো
নিবা নো আরি সামা
ওমোই বারি সুসু।

(ভাবার্থ)

যখন আমি ঝরোকায় (বাতায়নে) বসিয়া জ্যোৎস্নাবিধৌত ধরণীর পানে চাই তখনও আমি চিন্তার আবেশে বহুদূরে—যেখানে যুদ্ধ হইতেছে, তথায় উপস্থিত হই।

মুক্ত বাতায়ন পার্শ্বে সম্রাট বসিয়া আছেন। চারিদিক্ আনন্দে উছলিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি দেবীও স্থির ও হাস্যময়ী। এরূপ বিপুল শান্তির মধ্যে বাস করিয়াও সম্রাটের হৃদয়ে শান্তি নাই। তিনি বিভোর হইয়া চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। এইরূপ থাকিতে থাকিতে কত কথা তাঁহার হৃদয়ে উঠিয়া আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। তাঁহার সৈন্যগণ দূর সমুদ্র পারে দেশের জন্য যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করিতেছে, এরূপ নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পুনঃ পুনঃ উচ্ছ্বসিত হইতেছে। সমর প্রাঙ্গণের ভীষণ দৃশ্য যেন তাঁহার সম্মুখে বিরাজমান! আহতের নৈরাশ্যপূর্ণ করুণ আর্ত্তনাদ যেন তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া প্রতি হৃদি-তন্ত্রীতে আঘাত করিতেছে! তাঁহার মনে হইতেছে, যেন সেবকদল পীড়িত আহতকে বহন করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতেছে; চন্দ্রদেব যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত যোদ্ধাদের কষ্ট দেখিয়া আর তেমন করিয়া হাসিয়া জগৎকে মাতাইতে পারিতেছেন না। আবার পরক্ষণেই জাপান-সম্রাট ভাবিতেছেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ এক দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় মানসে অগ্রসর হইতেছে; তাহারা সেই দুর্গ জয় করিয়া ফেলিয়াছে; চন্দ্রদেব যেন তাহাদের সেই বীরত্ব দেখিয়া তাহাদের আনন্দোৎফুল্ল আশাফীত বদন দেখিয়া নিজের বিষাদভাব মুছিয়া ফেলিয়া আবার স্নিগ্ধ কিরণ বিতরণ করিতেছেন। এইরূপ ভাবে সম্রাট কত কথা ভাবিতেছেন. তাঁহার শান্তি আজ দূরে পলায়ন করিয়াছে।

১১

কুনি বো ওমু
মিচি নি ফুতাৎসু বা
নাকারি কেরি
ইকৃসা নো নিবা নি
তাৎসু মো তাতামু মো!

(ভাবার্থ)

কেহ যুদ্ধ করিতেছে, কেহ এখন বিধির কৃপায় গৃহে রহিয়াছে। দেশকে ভালবাসিয়া যে যেখানেই থাকুক না কেন, সকলেই তুল্য সম্মানার্হ।

সাধারণ প্রজারা হয় ত মনে করিতে পারে যে, যাহারা যুদ্ধ করিতেছে, সম্রাটের চিন্তা কেবল তাহাদেরই জন্য। কিন্তু সম্রাটের প্রকৃত মনোভাব তাহা নহে। এই কবিতাই তাহার পরিচায়ক। যে ব্যক্তি দেশকে ভালবাসে, তিনি তাহাকেই ভালবাসেন। সে যে স্থানে বাস করুক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। তাঁহার স্থির-বিশ্বাস আছে যে, আবশ্যক হইলেই তাহারা দেশের কার্য্যে প্রাণদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। তিনি শৈশব হইতেই তাহাদিগকে সেইরূপ ভাবেই শিক্ষিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে, সে চেষ্টা কখনও ফলবতী না হইয়া থাকিতে পারে না। প্রজাদের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস কি গভীর!

১২

মাসুরাও সি
হাতা বো সাজুকেতে
ওমু কানা
হিনোমোতো নো নো বো
কাগাযাকাসু বেকু!

যখন আমি আমার বিশ্বস্ত প্রজাবর্গকে স্বহস্তে জাতীয় পতাকা প্রদান করি, তখন আমার হৃদয়-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠে। আমার মনে হয় যে, উদীয়মান সূর্য্য নিশ্চয়ই আমার দেশে আলোক ও যশঃ আনয়ন করিবে।

জাপানের পতাকায় উদীয়মান সূর্য্যের একটি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। জাপান উদীয়মান সূর্য্যের দেশ বলিয়া অনেকের নিকট খ্যাত। জাপানরাজ স্বীয় যোদ্ধাদের হস্তে এরূপ জাতীয় পতাকা প্রদান করেন। যখন সেই স্বদেশসেবক যোদ্ধারা নত মস্তকে রাজার নিকট ঐ পতাকা গ্রহণ করেই, তখন গর্ব্বে রাজার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, তাঁহার মনে হয়, উদীয়মান সূর্য্য যেমন ক্রমে ক্রমে স্বীয় আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করেন, 'উদীয়মান সূর্য্যের দেশ' জাপানও তদ্রূপ স্বীয় প্রভায় সমগ্র জগৎকে মুগ্ধ করিবে।

জাপান-রাজের এরূপ কামনা কতকাংশে সফল হইয়াছে। এক সময় শিখেরা যেরূপ দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য অকাতরে দেহত্যাগ করিয়াছিল, আজ জাপানীও তদ্রূপ দেশের জন্য অকাতরে দেহ ত্যাগ করিতে শিখিয়াছে। তাহার এ সাধনা নিস্ফল হইবে না। জাপানের প্রভায় একদিন সমগ্র এসিয়া আলোকিত হইয়া উঠিবে, ইতিমধ্যেই তাহার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গিয়াছে।

১৩

শিজুকা নি মো
যো বা ওসামারিতে
যোরোকোবি নো
সাকাজু'কি আগেন
তোকি জো মাতারুরু!

(ভাবার্থ)

সে কি সুখের দিন, যখন আবার শান্তিদেবী শান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে আগমন করিবেন! তখন আমি আবার আমার মদ্যপাত্র উত্তোলন করিব। আমি নিয়ত সেই দিনের জন্য প্রার্থনা করি।

মদ্যপানের সময়েও শান্তির বাসনা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। জাপান-রাজ শান্তির প্রয়াসী হইলেও প্রকৃতির দুর্ব্বোধ্য কারণে রুষ-জাপান যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ জাপানের আত্মাভিমানে আঘাত করায় জাপান অবসর বুঝিয়া গর্জ্জিয়া উঠে। তাহারই ফলে ঐ মহাযুদ্ধ ঘটে। বক্তৃতাকালে অনেক

রাজাই শান্তির পক্ষপাতী হইতে পারেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহারা শান্তির বিরোধী হইয়া উঠেন। জাপান-রাজ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। তিনি সরল-হৃদয়। প্রকৃত শান্তির কামনা তাঁহার স্বভাবগত। তিনি অনর্থক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে তত সম্মত নহেন। যখন রুষ-জাপান যুদ্ধের শেষ হয়, তখন জাপানই সহজে শান্তিতে মত দিয়াছিল, অথচ যুদ্ধে সেই প্রকৃত জয়ী হয়। ঐ সন্ধিতে জাপানের কতকটা ক্ষতি হইলেও জাপানরাজ শান্তিতে মত দেন। রুষরাজ স্বরাজ্যে প্রজাবিপ্লবে ব্যতিব্যস্ত হইলেও সহজে শান্তি স্থাপন করিতে চাহেন নাই। যা'ক্ সে কথা। পৃথিবীর অধুনাতন রাজন্যবর্গের মধ্যে বোধ হয় এক রুজভেল্ট্ ব্যতীত আর কেহই জাপান-রাজের ন্যায় শান্তির পক্ষপাতী নহেন।

১৪

সুবামোনো নো
কাতে মো মাগুসা মো
কাকোবুরণ
উশি মো ইকুসা নো
মিচি নি সুকাযেতে!

(ভাবার্থ)

সৈন্যদের জন্য খাদ্য ও অশ্বদের জন্য শস্য বহন করিয়া বৃষগুলি পর্য্যন্ত তাহাদের দেশহিতৈষণার পরিচয় দিতেছে।

বৃষেরা সৈন্যদের ও তাহাদের অশ্বগুলির আহার্য্য বহন করিয়া কৃতার্থ। দেশ-প্রেমোন্মত্ত সম্রাট বৃষদের এই সামান্য ও স্বাভাবিক কার্য্যেও দেশহিতৈষণার ভাব দেখিতে পাইতেছেন। তিনি এখন এরূপ ভাবোন্মত্ত যে, তাঁহার চক্ষে জাপানের পশু, পক্ষী—সর্ব্বজীবই জাপানকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে ও তাহার কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করে। কি সুন্দর!

১৫

কুনি নো তামে
ফুরুইশি ফুদে নো
ইনোচ গে নো
আতো কোসো নোকোরে
যোরোজু যো মাদে নি!

(ভাবার্থ)

স্বদেশ-ভক্তেরা স্ব স্ব লেখনী সাহায্যে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া জীবিত থাকিবে, সকলেই তাহা আদরের সহিত স্মরণ করিবে ও চিরকালই তাহা নূতন বলিয়া মনে হইতে থাকিবে।

যাঁহারা স্বীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ পরার্থে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন পরের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে, যাঁহারা দেশের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য দেশবাসীকে নৈতিকতার চরম সীমায় তুলিবার জন্য আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, দেশের গৌরব-গাথা স্মরণ করাইবার জন্য যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছেন তাঁহারা অজর, অমর; তাঁহাদের কীর্ত্তি অবিনশ্বর। তাহা পাঠে বা শ্রবণে মানবের আত্মা পুলকিত হইয়া উঠে, প্রাণে অসীম উৎসাহের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা ঋষিকল্প। তাঁহারা চিরদিনই মানবের পূজ্য। তাঁহারা অমর লোকে বাস করিয়াও মানবকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের জীবন সার্থক। তাঁহাদের কীর্ত্তিসমূহ মানুষ পরম সমাদরে রক্ষা করে, তাহাতে গৌরবানুভব করে। যে দেশে যত স্বদেশভক্ত জন্মিয়াছেন, সে দেশ তত পুণ্যশীল। জাপানরাজ বলিতেছেন, তাঁহার সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ স্বদেশভক্তদের পদচিহ্নে অঙ্কিত। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ স্বদেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ইহাকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। আর বর্ত্তমান যুগেও তাঁহার প্রজারা স্বদেশ-ভক্তিতে জগতের আদর্শ হইতে পারিয়াছেন। তাহারা দেশের সম্মান রক্ষার জন্য অকাতরে বিদেশে যুদ্ধ করিয়া দেহত্যাগ করিতেছে। প্রজাদের এরূপ মহত্বের মূল জাপানের প্রাচীন স্বদেশ-ভক্তদের কর্ম্মময় জীবন ও তাঁহাদের গ্রন্থ রাশি। এই কথা ভাবিয়া জাপান-রাজ সাহ্লাদে সেই প্রাচীন স্বদেশসেবকদের চরণে নত মস্তকে অভিবাদন করিতেছেন।

১৬

ইনিশিযে নো
ফুমি মিরু তাবি নি
ওমু কানা
ওনো গা ওসামুরু
কুনি বা ইকানি তো!

(ভাবার্থ)

যখনি আমি প্রাচীন পুঁথি খুলি, তখনি আমার মনে হয়, ইহাদের অন্তর্নিহিত সত্য না জানি আমার প্রজারা কেমন ভাবে গ্রহণ করে।

এই সব পুঁথিতে মানবজীবনের অনন্ত রহস্য লুক্কায়িত আছে। মানুষ কোন্ শক্তিবলে মুহ্যমান হইয়া পড়ে, আর কাহার প্রভাবে জগতের বরেণ্য হইতে পারে, তাহার বহুল দৃষ্টান্ত এই সব পুঁথিতে পাওয়া যায়। রাজার কিরূপ ব্যবহারে প্রজারা তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট, দেশ উন্নত বা অবসাদগ্রস্ত ও অবনত হয়, তাহা এই সকল গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। প্রকৃত রাজা হইতে হইলে ঐ সব তত্ত্ব জানা ও বুঝা দরকার। প্রকৃত আদর্শ রাজা হইবার জন্য জাপান রাজের ঐকান্তিক বাসনা। যখনই তিনি ঐ সব মূল্যবান পুঁথি পাঠে প্রবৃত্ত হন, তখনই তাঁহার প্রথম চিন্তা হয়, তাঁহার প্রজারা তাঁহার ব্যবহারে কিরূপ তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট, তিনি তাহাদের উন্নতি না অবনতির পথ পরিষ্কার করিতেছেন। নিভৃতে এরূপ চিন্তায় অনেক সত্য বুঝিতে পারা যায়। তারপর প্রকৃত পন্থা অনুসরণ করিলে তাহার ফল শুভদ হইবেই। জাপান-রাজের এরূপ চিন্তা যথেষ্ট কল্যাণময়ী। এরূপ জ্ঞানপ্রদ পুস্তক প্রায় সর্ব্ব সভ্য দেশেই আছে। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ মানবকে নিয়ত তাহার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেছে।

জাপান-রাজের হৃদয় বুঝিবার পক্ষে এই কয়টি কবিতাই যথেষ্ট। আমরা তাঁহাকে অযথা বড় করিবার চেষ্টা করি নাই। তাঁহার হৃদয় প্রজার প্রতি কিরূপ সহানুভূতি পূর্ণ, তাহাই দেখান আমাদের উদ্দেশ্য। রাজা মহৎ হইলে, প্রজারাও মহৎ হইতে পারে। জাপানী প্রজারাও তাঁহার সমভাবাপন্ন। ব্যারণ সুগেমাৎসু বলেন—'জাপান-রাজের হৃদয়োচ্ছ্বাস-জাত কবিতাগুলি প্রতি জাপানীরই মনের কথা।' অনেকে মনে করেন, জাপানের এ উন্নতি পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। তাহা সত্য নয়। বৈদেশিক সংসর্গে আসিয়া জাপান আপনার গুরুত্ব বুঝিতে পারে, তাহারই ফলে তাহার এ উন্নতি। তাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় বড় নহে, প্রাচ্য ভাবের সহিত পাশ্চাত্য নব ভাবের ও নব বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই আজ সে এসিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। যদি পাশ্চাত্য শিক্ষাই তাহাকে বড় করিত, তবে ভারত এখনও অবনত কেন? ভারতে ত পাশ্চাত্য শিক্ষা—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রচার জাপান অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সুতরাং জাপানের উন্নতির মূল পাশ্চাত্য শিক্ষা নহে। জাপান যদি নৈতিকতা হারাইয়া ফেলিত, যদি পাশ্চাত্য সংসর্গে তাহার প্রাচ্য ভাব একেবারে লোপ পাইত, তবে সে কখনও উন্নত হইতে পারিত না। প্রাচ্য জাতির উন্নতির মূল—প্রাচ্য ভাব। জগতের নব নব ভাব ও বিজ্ঞানের সহিত সেই প্রাচ্য ভাবের সুন্দর মিলন করাইতে পারিলেই প্রাচ্য জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আমরা যদি নৈতিকতা না হারাইয়া পাশ্চাত্য ভাবগুলি আমাদের উপযোগী করিয়া লইতে পারি, তবে আমরাও অচিরে জগতে মহতী কীর্ত্তি রাখিতে পারিব। ভগবান করুন, সে দিন অদূরবর্ত্তী হউক।

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত।

গুর্জ্জর ভূমি।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

ফেরিস্তা পাঠে জানা যায়,—আমেদাবাদ নগরীর প্রত্যেক মহল্লা প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, এবং সদর রাস্তাগুলি এরূপ প্রশস্ত ছিল যে, ১০টী গাড়ী এক সঙ্গে পাশাপাশি যাইতে পারিত। এই নগরী সমস্ত হিন্দুস্থান এমন কি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে তৎকালে একটী অতি শোভাময়ী ও সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল।

আমেদশাহ ১৪১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে গুজরাটে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল।

১৪১৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান আমেদ শাহের একজন কর্ম্মচারী "তাজউলমুল্ক" উপাধি প্রাপ্ত হয়। সুলতান তাহাকে গুজরাটে হিন্দুমন্দির বিধ্বংস ও মুসলমান মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ অনুমতি প্রদান করেন। ফেরিস্তা বলেন, তাজউলমুল্ক স্বীয় কর্ত্তব্য এরূপ ভাবে প্রতিপালন করে যে, সমস্ত গুজরাট প্রদেশে হিন্দু মন্দিরের নাম আর শুনা যাইত না।

সুলতান আমেদশাহ সিংহাসনারোহনের পরবর্ত্তী বৎসর সুরথের * ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুরথ হিন্দু এবং জৈনগণের কল্পনার নন্দন কানন সদৃশ অতি মনোরম স্থান। ইহা নির্ম্মল-নদী-জল-প্রবাহিনী-পরিসেবিত, সুন্দর সুশিক্ষিত অশ্বপ্রচুর স্থান; নন্দনকানন সুগন্ধ বিজড়িত অতুল লাবন্যময়ী ললনা গণের বিহারভূমি এবং দেবপাট পূত তীর্থস্থান বলিয়া বিশেষ আনন্দ ও শ্রদ্ধার স্থল। এই স্থান জৈনগণের তীর্থঙ্কর আদিনাথ ও উরিষ্ট নেমি দেবের পদরজপূত পুণ্যভূমি; হিন্দুগণের মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণের স্থান বলিয়া তাঁহাদের পক্ষেও ইহা পূতভূমি। তীর্থঙ্কর পন্থীদিগের শত্রুঞ্জয় ও গিরনর পর্ব্বত এখানে অবস্থিত।

বৈষ্ণবগণ সুরথের মৃত্তিকাদ্বারা কপালে গোপীচন্দন-চিহ্ন আঁকিয়া থাকে। সোমনাথ ও দ্বারকা তীর্থদ্বয় ও সেখানে অবস্থিত। শৈবগণ সুরথের শঙ্খ নিনাদে শঙ্করের বিজয় গীতি ঘোষণা করে। রাজপুত এবং চারণদল "ক্ষেনগার" রাজার অতুল বীরত্ব কীর্ত্তি বা রাণীক দেবীর শোকগাথা ও সতীত্ব মহিমা সন্ধ্যায় পল্লির ছায়াতলে বসিয়া কীর্ত্তন করে।

"সুরথে পাঁচটী রত্ন আছে বিদ্যমান,
অশ্ব, সুখনদী আর সুন্দরী ললনা,
সোমনাথের মন্দির-স্বর্গের সাধনা,
হরি স্বর্গলোক ছাড়ি হেথা বিদ্যমান।"

মুসলমান গণও ইহার অত্যধিক প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মিরাট ই-আমেদী লেখক আলি মহম্মদ খান লিখিয়াছেন,—"ধনদেবী, মালব, খান্দেশ ও গুর্জ্জরের অত্যুৎকৃষ্ট উর্ব্বর ভূমি সকল পরিত্যাগ করিয়া, ঐ সকল প্রদেশের সমুদয় ধনরত্ন উপহার লইয়া এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।"

আমেদ শাহ চারিদিক লুণ্ঠন করিতে করিতে গিরনর গিরিদুর্গের † নিকটবর্ত্তী হইলে তথাকার মাণ্ডলিক রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন কিন্তু রাজা পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইলে আমেদশাহ তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। তৎপর রাজা মাণ্ডলিক আমেদ শাহকে বাৎসরিক রাজকর দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং সেই স্থলে বহুতর ধনরত্ন প্রদান করিলেন। আমেদ শাহ কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ধনরত্ন প্রদান করিয়া আমেদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। পথে সোমপুর স্থলে মন্দির ধ্বংস করিয়া বহুতর অর্থ সংগ্রহ করেন।

আমেদ শাহ ইদরের রাজা রণমলের বিরুদ্ধে ৩।৪ বার যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে।

* সুরথ বর্ত্তমান কাঠীওয়ার প্রদেশ।

† গিরনর দুর্গ বর্ত্তমান জুনাগরের সন্নিকটবর্ত্তী অবস্থিত।

একদা আমেদ শাহের এক জামাতা যৌবন মদমত্ততা বশতঃ ক্রোধান্ধ হইয়া এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করে। সুলতান তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া কাজির নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করেন। কাজি নিহত ব্যক্তির মাতাকে ২২টী স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া অপরাধীকে সুলতানের নিকট আনয়ন করিলেন। সুলতান বিচার বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন—"যদিও মৃতের মাতা অর্থদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াছে; তথাপি আমি ইহাতে তাহাকে নির্দ্দোষী স্থির করিতে পারি না, এইরূপ দণ্ডদ্বারা ধনা অপরাধীকে রক্ষা করা হয় এবং ধনগর্ব্বিত শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে হত্যার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা হয়; এরূপস্থলে জরিমানা অপেক্ষা হত্যার প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ।"

তৎপর সুলতান আমেদশাহ জামাতাকে রাজ প্রাসাদের সম্মুখে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। দুইদিবস মৃতদেহ সেখানে রাখিয়া তৎপর কবর প্রদানের হুকুম দিলেন।

আমেদশাহের পর তৎপুত্র মহম্মদ শাহ ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি অত্যন্ত ভোগ-বিলাস রত ছিলেন। তাঁহার সময় ইদরের রাজা গুজরাট আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু পরাজিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং স্বীয় ভগিনীকে সুলতানের করে সমর্পণ করেন।

১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে আমেদশাহের গুরু এবং আমেদাবাদ প্রতিষ্ঠা কার্য্যের উপদেষ্টা সেখ আমেদ খাট্টুগঞ্জ বক্সের মৃত্যু হয়। সুলতান তাঁহাকে আমেদাবাদ হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী সারখেজ নামক স্থানে কবর প্রদান করতঃ তদুপরি সুদৃশ্য সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি চাম্পানীরের রাজা গঙ্গাদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া (১৪৫১ খৃষ্টাব্দে) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কুতুবদ্দিন শাহ ১৪৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

১৪৫১ খৃষ্টাব্দে মালবের সুলতান মহম্মদ খিলিজি গুজরাট আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন, সুলতান কুতুবদ্দিন মাহিস্রী (মাহী) নদীতটে খানপুর নামক স্থলে সৈন্য সমাবেশ করেন। মহম্মদ খিলিজি কপদভঙ্গ হইয়া আমেদাবাদের অবশিষ্ট সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া রাজমুকুট, কটিবন্ধ ও অন্যান্য ধনরত্ন লইয়া প্রস্থানকালে কুতুবদ্দিন কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে পরাজিত হইয়া মালবে প্রত্যাগমন করেন। কিছুদিন পরে কুতুবদ্দিন মালবের রাজা মহম্মদ খিলিজির সহিত সন্ধি-বদ্ধ হইয়া চিতোরের রাণা কুম্ভের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। রাণা কুম্ভ সেই সময় গুজরাটের অন্তর্গত নাগোর রাজ্য হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কুতুবদ্দিন প্রথম আবুর গিরি দুর্গ হস্তগত করিয়া তৎপর কুম্ভমীর হস্তগত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তৎপর সুলতান চিতোরের দিকে অগ্রসর হইলেন; রাণা কুম্ভ ৪০ হাজার অশ্বারোহী লইয়া মাসাধিককাল যুদ্ধ করিয়া দুর্ভেদ্য চিতোর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। রাণা কুম্ভ কিছুদিন পর পুনরায় নাগোর লুণ্ঠন করিতে যাত্রা করিলেন কিন্তু কুতুব অতি সত্বর কুম্ভমীর আক্রমণ করিয়া রাণার সে প্রয়াস ব্যর্থ করিলেন। কুতুব শিরোহী আক্রমণ করিয়া তত্রত্য জনপ্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন।

১৪৫২ খৃষ্টাব্দে কুতুবদ্দিন কেঙ্কেরিয়া নামক সরোবর ও তন্মধ্যস্থ নগিনাবাগ ও ঘাটমণ্ডল নির্ম্মাণ করেন। তিনি নড়িয়াদে এক রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন।

কুতুবদ্দিনের মৃত্যুর পর মন্ত্রীগণের অনুগ্রহে কুতুবের খুল্লতাত দায়ুদ ৭ দিনের জন্য রাজ্য সুখ উপভোগ করেন। দায়ুদ নিম্ন শ্রেণীস্থ নিজের বন্ধুবান্ধবকে উচ্চ পদে নিয়োগ করায় মন্ত্রীগণ কুতুবদ্দিনের বিমাতার গর্ভজাত পুত্র সুলতান মহম্মদকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করান। দায়ুদ এই সংবাদ পাইবা মাত্র রাজ-প্রাসাদস্থ বাতায়ন দ্বারা সাবরমতী নদী তটে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করেন। তৎপর এক ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল

বনে জঙ্গলে জীবন অতিবাহিত করিলে পর তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সুলতান মহম্মদের অপর নাম বেগেড়া। কেহ কেহ বলেন তিনি চম্পানীর ও গীরনর এই দুইটী গড় (দুর্গ) জয় করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে বেগেড়া বলিত। অন্য প্রবাদ এই—তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রু হরিণ শৃঙ্গের মত বঙ্কিম ছিল বলিয়া তাঁহাকে বেগেড়া বলিত।

সুলতান মহম্মদ বেগেড়া ন্যায়পরায়ণতা ও সাহসিকতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বিপুল সৈন্য বাহিনী সংগ্রহের জন্য নিম্ন লিখিত নিয়ম প্রণালী স্থির করেন;—যে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিবে তাহাদের জাইগীর তদীয় পুত্রদিগকে প্রদত্ত হইবে, পুত্র অভাবে অর্দ্ধ সম্পত্তি কন্যাকে এবং পুত্র কন্যা উভয়ের অভাবে তাহাদের আত্মীয় পরিজনকে অর্থ বৃত্তি প্রদান করা হইবে। তিনি আরও নিয়ম প্রচলন করেন যে, কোন সৈন্য ঋণ করিতে পারিবে না, অর্থের প্রয়োজন হইলে রাজ ভাণ্ডার হইতে তাহা গ্রহণ করিবে।

১৪৬৬—৬৭ খৃষ্টাব্দে (৮৭১ হিজরি) সুলতান মহম্মদ গিরনগরের মাণ্ডলিক রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৮০০টী স্বর্ণবাট যুক্ত মিসর ও আরব দেশীয় তরবারী এবং ৩৮০০০টী রৌপ্য বাট-যুক্ত আমেদাবাদ নির্ম্মিত তরবারী, বিপুল অশ্বারোহী ও পদাতিক এবং তৎসঙ্গে সৈন্যগণের বেতন প্রদানের জন্য ৫ কোটী মোহর ইত্যাদি লইয়া বিপুল আয়োজনে তিনি যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধে রাজাকে পরাজিত করিয়া অতুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন।

তৎপরবর্ত্তী বৎসর সুলতান বেগেড়া গিরনগরের মাণ্ডলিক রাজাকে বিশেষ ভাবে পরাজিত করিয়া দুর্গ অধিকার করেন। মাণ্ডলিক রাজা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অব্যাহতি পান এবং "খানজাহান" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জাইগীর প্রাপ্ত হন।

সুলতান বেগেড়া আমেদাবাদের নিকট মামেদাবাদ বলিয়া একটী নূতন নগরী নির্ম্মাণ করেন এবং ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চাম্পানীর অধিকার করিয়া তথায় মসজিদ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়া মহম্মদাবাদ চাম্পানীর নাম রাখেন। তিনি আমেদাবাদ নগরী প্রাচীর দ্বারা প্রাকারে পরিবেষ্টন করেন। ইহা নির্ম্মাণের শেষ দিনে এই কয়েকটী কথা লিখিত হয়,—"ভিতরে যাহা কিছু আছে সমুদয়ই নিরাপদ।"

আরবিক অক্ষরের ছাঁচে অনুমান হয় ইহা ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে। একদা এক দল অশ্ব বিক্রেতা সুলতান বেগেড়ার নিকট আসিয়া এই অভিযোগ করিল যে, তাহারা যখন আবুর পথে আসিতেছিল, তখন শিরোহীর রাজা তাহাদের সমুদয় অশ্ব কাড়িয়া লইয়াছেন। সুলতান সমুদয় অশ্বের দাম জিজ্ঞাসা করিয়া তদনুযায়ী অর্থ তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। তৎপর বেগেড়া শিরোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, এবং দূত মুখে বলিয়া পাঠাইলেন, যে তিনি যদি অশ্ব বিক্রেতাগণের অশ্বও ধনরত্ন প্রদান না করেন তবে তিনি শিরোহী আক্রমণ করিবেন। এই সংবাদ পাইয়া শিরোহির রাজা তাহাদিগকে সকলই প্রত্যর্পণ করিলেন।

সুলতান বেগেড়া ১৫৭৩—৭৪ খ্রীষ্টাব্দে (হিজরী ৮৭৮) সিন্ধুদেশ জয় করেন। খান্দেশের রাজা রাজকর প্রদান না করায় ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। বেগেড়া সৈন্য বাহিনী লইয়া নর্ম্মদার তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে খান্দেশের রাজা ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কর প্রেরণ করেন।

সুলতান ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে বেশীন ও মুম্বারের পুর্ত্তিগীজ ঔপনিবেশিকদিগকে শাসন করিবার জন্য তথায় গমন করেন। তিনি ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে পাটন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সারখেজে সেখ আমেদগঞ্জ খাটুবকুসের সন্নিকটবর্ত্তী স্থলে নিজের জন্য যে কবর নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন তাহা দেখিতে গেলেন, তথা হইতে আমেদাবাদে প্রত্যাগমন করিয়া অল্প কাল পরে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

সুলতান বেগেড়ার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মুজাফ্‌ফির শাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁহার সময় পারস্য দেশের রাজা শাহ ইসমাইল প্রদত্ত

নানা প্রকার ধনরত্ন উপহার লইয়া মীর ইব্রাহিম খাঁ, মুজাফ্‌ফির শাহের রাজ সভায় আগমন করেন। মুজাফ্‌ফির শাহ প্রত্যাভিনন্দনে বহু মূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি পারস্য রাজকে প্রদান করেন।

সুলতান মুজাফ্‌ফির শাহ বরদায় দৌলতাবাদ নামে একটী নগরী নির্ম্মাণ করেন। সেই সময়ে মালবের ভ্রাতৃদ্বয় সুলতান মহম্মদ ও সুলতান মামুদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। সুলতান মামুদের কর্ম্মচারী মদন রাও সবিশেষ পরাক্রমের সহিত মান্দুর যুদ্ধে মহম্মদ সুলতানকে পরাস্ত করাতে মহম্মদ সুলতান গুজরাটে পলাইয়া মুজাফ্‌ফির শার আশ্রয় লইলেন। কিন্তু তথাকার পারস্য দূতের সহিত বিবাদ হওয়ায় তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

মদন রাও এতদূর পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে মামুদ সুলতান তাঁহার হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকাবৎ হইয়া পড়েন। একদা রাত্রিতে মামুদ সুলতান গুপ্ত ভাবে পরিজনবর্গ লইয়া পলায়ন পূর্ব্বক মুজাফ্‌ফির শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্ষাকাল গত হইলে মুজাফ্‌ফির শাহ এবং মামুদ সুলতান সম্মিলিত হইয়া মদন রাওর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। মদন রাও তাঁহাদের সহিত সন্ধির দ্বারা যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া চিতোরের রাণা সঙ্গের নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ইহা জানিতে পারিয়া মুজাফ্‌ফির কতিপয় সৈন্য চিতোরের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া মান্দু অধিকার করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ভীষণ যুদ্ধে ৯০ হাজার রাজপুত সৈন্য নিহত হইলে মান্দু অধিকৃত হইল এবং মদন রাও পলায়ন করিলেন। মুজাফ্‌ফির শাহ মামুদ সুলতানের করে মান্দু সমর্পণ করিয়া আমেদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

পরবর্ত্তী বৎসর, ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে, মুজাফ্‌ফির শাহ সংবাদ পাইলেন যে, রাণা সঙ্গ কর্ত্তৃক মামুদশাহ পরাজিত হইয়া বন্দী হইয়াছেন কিন্তু পরে রাণা সঙ্গ উদারতাপূর্ব্বক তাঁহাকে মালবে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

রাণাসঙ্গ বরনগর এবং বিশাল নগর পর্য্যন্ত আসিয়া লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন পরে মুজাফ্‌ফির শার বিশাল সৈন্য বাহিনী অগ্রসর হইলে তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

১৫২৪—২৫ খ্রীষ্টাব্দে (হিজরী ৯৩১) রাজ কুমার বাহাদুর শাহ স্বীয় বৃত্তি ভোগের স্বল্পতা হেতু ও বড় ভ্রাতা সেকেন্দরের জিঘাংসা নিবন্ধন দিল্লীতে সুলতান ইব্রাহিম শাহ লোদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন।

সেই সময় ইব্রাহিম লোদী বাবরের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইব্রাহিম লোদী রাজকুমার বাহাদুরকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। দিল্লীতে ইব্রাহিম লোদী রাজকুমার বাহাদুরের মুগ্ধবিদ্যা সন্দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। দিল্লীবাসী সকলেই তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে সামন্তগণের হৃদয় হিংসায় পূর্ণ হওয়াতে বাহাদুরশাহ জোনপুরে গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

সিপাহী বিদ্রোহের অজ্ঞাত ইতিহাস।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

মিঃ রবার্টসন ও হে এই সংবাদ শুনিয়া একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেলেন এবং কাতর কণ্ঠে কহিলেন, আপনি আমাদিগকে অন্য কাহারও গৃহে লুকাইয়া রাখিয়া আসুন। আমি তাঁহাদিগকে জানাইলাম যে এ অবস্থায় স্থানান্তরে গমন করা একেবারে অসম্ভব। সমুদয় সহর বিদ্রোহীদিগের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইতেছে এবং রাস্তায় রাস্তায় উন্মত্ত সিপাহীগণ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে ঘুরিয়া বেড়াই-

তেছে। এমন অবস্থায় বাহিরে গেলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু আমার গৃহে থাকিলেও যে রক্ষা নাই একথাও সকলে বুঝিতে পারিলেন। কোতোয়ালীর বরকন্দাজ এতক্ষণ হয়ত বিদ্রোহীদিগের আড্ডায় যাইয়া সংবাদ দিয়াছে এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই সিপাহীগণ সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় ডাক্তার হে এবং ডেপুটী কলেক্টর অর ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা উভয়ে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"দয়া করিয়া আমাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া চলুন"। জজ রবার্টসন বলিলেন "যে আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক আমি আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইব না।"

আমি ইতস্ততঃ করিতেছি এমন সময় আমার বাটীর নিকটস্থ সদর রাস্তার উপর একদল বিদ্রোহী সৈন্য আসিয়া থানা গাড়িয়া বসিল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি তাঁহাদিগকে এই সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলাম এবং বলিলাম যে দিনের বেলায় দ্বিপ্রহর রৌদ্রের মধ্যে কোনরূপ ছদ্মবেশেই আমি আপনাদিগকে শত্রুর প্রখর দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে পারিব না; আর তা'র পর কোথায় আপনাদের লুকাইয়া রাখিব?—এ দুর্দ্দিনে নিরাপদ স্থানত কোথায়ও দেখিতে পাইতেছি না।

এইরূপে কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক করার পর তাঁহারা আমার গৃহেই অবস্থান করা সঙ্গত মনে করিলেন। কিন্তু তাঁহারা এমন ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আমি তাঁহাদিগকে আমার অন্দরমহলেই স্থান দিতে চাহিলাম। তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে থাকিতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে বিপদের সময় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাস করা আদৌ নিরাপদ নহে।

আমি জজ রবার্টসন সাহেবকে একটী ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার তালা বন্ধ করিয়া দিলাম এবং যদি সেখানেও শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'ন তাহা হইলে যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন সেইজন্য একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাঁহাকে দিলাম। হে এবং অরকে অন্য একটী কক্ষে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহাদের উভয়কেই এক একখানি তরবারী ও একটি করিয়া পিস্তল দিলাম। তা'র পর ত্বরিতগতিতে যাইয়া সদর রাস্তার ফটক বন্ধ করিয়া দিয়া আসিলাম। এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া সবেমাত্র গৃহে প্রবেশ করিয়াছি আর অমনি উত্তেজিত সিপাহীগণের রণডঙ্কা শুনিতে পাইলাম। তাহাদিগের ভৈরব হুঙ্কারে কর্ণ যেন বধির হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দুর্ব্বৃত্তগণ আমার বাঙ্গলা ঘিরিয়া ফেলিল এবং প্রভুত্ব ব্যঞ্জকস্বরে বলিল—"তোমার গৃহে যে সকল সাহেবদিগকে লুকাইয়া রাখিয়াছ এখনই ভালয় ভালয় তাহাদিগকে আমাদিগের নিকট অর্পণ কর, নচেৎ সমুচিত শিক্ষা পাইবে।" আমি শপথ করিয়া তাহাদিগকে বলিলাম যে আমার গৃহে কোনও ইউরোপীয়ানকে লুকাইয়া রাখি নাই। আর দ্বিতীয় বার কথা বলিতে হইল না। সিপাহীরা আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া উঠিল, পরমুহূর্ত্তেই সকলে মিলিয়া গেটের উপর চড়াও হইল। দেখিতে দেখিতে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ সদর ফটক ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং বিষম হল্লা করিতে করিতে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণের ভিতর প্রবেশ করিল। তা'র পর কয়েকজন লোক কুঠার হস্তে সদর দরজার উপর আঘাত করিতে লাগিল এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি এতক্ষণ ছাদের উপর হইতে আলিসার ছিদ্র দিয়া এই বীভৎস দৃশ্য দেখিতেছিলাম; যখন দেখিলাম যে রাক্ষসেরা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। মনে হইল কয়েকজন নিঃসহায় ইংরাজকে আমার গৃহে আজ আশ্রয় দিয়াছি, তাহাদিগের দশা না জানি এতক্ষণ কি হইয়াছে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছি, এমন সময় পার্শ্বের কক্ষ হইতে একজন সিপাহী ভীমবেগে আমার হাতে এক লগুড়ের আঘাত করিল। আমি সে দারুণ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সেইখানেই পড়িয়া

গেলাম; কয়েকজন সিপাহী আসিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে বন্দী করিল। সেই অবস্থায় দেখিলাম কয়েকজন পিশাচ প্রকৃতির সিপাহী অর এবং হের মুণ্ড বর্ষায় বিদ্ধ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গৃহ প্রাঙ্গণে ছুটাছুটি বেড়াইতেছে। ইহার একটু পরেই আর একজন সিপাহীর হস্তে জজ রবার্টসনের ছিন্ন মুণ্ড দেখিতে পাইলাম। আমার চক্ষের সম্মুখে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইয়া গেল, আর আমি হস্ত পদ বদ্ধাবস্থায় বসিয়া বসিয়া এই শোচনীয় যবনিকার পতন দেখিলাম। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড শেষ হইয়া গেলে সিপাহীরা আমাকে বন্দীর বেশে কোতোয়ালীতে লইয়া চলিল। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম কয়েকজন অসহায়া ইংরাজ রমণীকে দুর্ব্বৃত্ত সিপাহীরা বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাদিগের কাতর ক্রন্দন এবং বিলাপধ্বনি শুনিয়া বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু পিশাচেরা একটুও দমিল না। অসহায়া রমণীর উপর এই যে নিষ্ঠুর নির্য্যাতন, এই পাপে হিন্দুস্থান রসাতলে ডুবিয়া যাইবে। সিপাহীরা আমাকে কোতোয়ালীতে নবাবের সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল। নবাব আমাকে দেখিয়াই অতীব অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিলেন এবং শেষে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমি একবার কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যে নিহত ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মৃতদেহগুলি কি সমাধি করিতে পারি? তাহার উত্তরে নবাব আমাকে ইতর ভাষায় জানাইলেন যে আমি যে আমার প্রাণ লইয়া ফিরিবার অনুমতি পাইলাম ইহাই আমার বহু পুণ্যের ফল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আমি আমার কুঠীর অভিমুখে রওণা হইলাম। আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। গৃহের সমুদয় আসবাবপত্র লুণ্ঠিত হইয়াছে—কক্ষগুলি রক্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে এবং বাড়ীর সমুদয় দরজা জানালাগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে। কয়েকজন অসহায় ইংরাজের প্রাণ রক্ষা করিতে যাইয়া আমি আজ সর্ব্বস্বান্ত হইলাম এবং সত্যসত্যই পথের ফকীর হইয়া গেলাম। আমার আবাস গৃহ আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে—এতকাল ধরিয়া যে ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলাম তাহা সমুদয় লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে—অন্তঃপুরের রমণীরা পর্য্যন্ত প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারিয়াছে আপন আপন মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য পলায়ন করিয়াছে। আজ আর আমার বলিতে এ পৃথিবীতে কিছুই নাই। বহুক্ষণ ধরিয়া দগ্ধ গৃহের সম্মুখে বসিয়া বসিয়া এই ভীষণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। তা'রপর আত্মীয়স্বজনের অনুসন্ধান করিবার জন্য হতাশ হৃদয়ে সহরের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।"

এইরূপে একজন উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্ম্মচারী সিপাহী বিদ্রোহের ভীষণ দুর্দ্দিনে কয়েকজন ইংরাজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য, আপনার সমুদয় ধনসম্পত্তি হারাইয়া পথের ফকীর হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এই অদ্ভুত ত্যাগের কথা, আজ কয়জন লোক স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে?

(২)

১৮৫৭ সালের ২০শে জুলাই তারিখে বিখ্যাত টাইমস্ পত্রে জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোক দেশীয় ভদ্রলোকদিগের সহায়তায় যে অদ্ভুত পরিত্রাণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন এইখানে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"মীরাটে যখন বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল তখন আমরা সকলেই প্রমাদ গণিলাম। দেখিতে দেখিতে মীরাটের বিদ্রোহ-বহ্নি সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল এবং প্রতিদিন আমরা বিপ্লবের নানারূপ ভীষণ কাহিনী শুনিতে লাগিলাম। যদিও মীরাটে সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, তথাপি শেষে ভারতের শেষ রাজধানী দিল্লী নগরীতেই বিপ্লবের প্রধান আড্ডা স্থাপিত হইল এবং দিল্লীকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের চারিদিকে এই আগুণ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অন্যান্য হতভাগ্য ইংরাজের ন্যায় আমিও দিল্লীর রাজধানীতে বিদ্রোহী সিপাহী সৈনিকদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইলাম। আমরা কেহই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না এবং যদিও প্রতিদিন বিদ্রোহের নানা কথা শুনিতে পাইতাম, তথাপি রাজধানীর বুকের উপর সিপাহীরা সহসা কোনও বিপ্লব বাধাইতে সাহস করিবে, একথা আমরা মনেও স্থান দিতে পারি নাই। শেষে সত্য সত্যই অসম্ভব সম্ভব হইয়া উঠিল। আমরা একদিন হঠাৎ অতর্কিত ভাবে বিদ্রোহী সিপাহী সৈন্যদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। আমি যুদ্ধের জন্য কিছুমাত্রও প্রস্তুত ছিলাম না। শেষে যখন সত্য সত্যই বুঝিলাম যে এই মুহূর্ত্তেই সিপাহীদের হস্তে পশুর ন্যায় নিতান্ত নির্ম্মম ভাবে নিহত হইতে হইবে, তখন শরীরের সমুদয় রক্ত যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমার শরীর দুর্ব্বল, কিন্তু দেখিলাম সেই দুর্ব্বল শরীরেও তখন অসাধারণ বলের সঞ্চার হইল, আমি একাকী অসীম সাহস সহকারে উন্মত্ত সিপাহীদিগের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। একটু পরেই বুঝিলাম যে এরূপ পাগলামী করিলে কখনও জীবন রক্ষা করিতে পারিব না। কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় নাই; সম্মুখে গেলেও মৃত্যু এবং পশ্চাতে ফিরিলেও মৃত্যু। এই অবস্থায় হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিল। আমি যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়া পড়িয়া গেলাম এবং মৃত্যুর ভাণ করিয়া মড়ার মত আড়ষ্ট হইয়া মাটীর উপর শুইয়া রহিলাম। সিপাহীরা তখন আমার কুঠী লুঠ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে; কয়েকজন চীৎকার করিয়া বলিল, দুষ্ট মরিয়া গিয়াছে। কেহই আর আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না; উন্মত্তের ন্যায় আমার বাঙ্গলা লুণ্ঠন করিবার জন্য সকলেই ছুটিয়া গেল।

আমি প্রায় একঘণ্টা কাল সেই স্থানেই পড়িয়া রহিলাম। তা'র পর খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অতি কষ্টে এক মাইল পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গেলাম। পায়ে জুতা নাই; খালি পায়ে চলিতে বিশেষ কষ্ট বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু উপায় নাই; প্রাণের ভয়ে কোনও মতে এই পথটুকু চলিয়া গেলাম। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়; চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। আমি এক কৃষকের পর্ণকুটীরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম এবং সেই ক্ষুদ্র কুটীরেই কোনও রূপে মাথা গুজিয়া সমুদয় রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। পরদিন প্রত্যূষেই আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। কোনও স্থানে বেশীক্ষণ থাকিবার উপায় নাই; চারিদিকে যেরূপ সিপাহীদিগের চর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাতে কোনও রকমে সন্ধান পাইলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যতই কষ্ট হউক না কেন, যেমন করিয়া হউক পথ চলিতেই হইবে। এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আলীপুরে পৌঁছিলাম। এইখানে আসিয়া অতিথিবৎসল একজন গৃহস্থের বাটীতে কিছু রুটী ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম এবং আকণ্ঠ জলপান করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। কিন্তু এখানে আশ্রয় মেলা দুরূহ হইয়া উঠিল। সিপাহীদিগের অত্যাচারের ভয়ে কেহই আপনার গৃহে আমাকে আশ্রয় দিতে সাহস করিল না। আমার পরিধেয় বস্ত্রাদি এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিলে তৎক্ষণাৎ সিপাহীরা সন্ধান পাইবে এবং কোনও মতেই জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইবে না এই আশঙ্কায় জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া একখানি ছিন্ন বস্ত্রের দ্বারা কোনও মতে লজ্জা নিবারণ করিতেছিলাম। এই গৃহস্থের বাটী হইতে আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা যতদূর সম্ভব ছদ্মবেশ পরিধান করিলাম। তা'রপর আবার বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া অনির্দ্দিষ্ট ভাবে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম। পথ দিয়া যাইতে সাহস হইল না কারণ তাহা হইলে শীঘ্রই ধরা পড়িবার সম্ভাবনা; তাই বন জঙ্গল এবং পরিত্যক্ত মাঠের মধ্য দিয়াই লক্ষ্যহীন ভাবে চলিতে লাগিলাম। অনাবৃত পদে কর্দ্দিত ভূমির উপর দিয়া যাতায়াত করিতে করিতে সমুদয় পদ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। এইরূপ ভাবে চলিতে চলিতে কত গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, কিন্তু সকলে আমার দুঃখে সহানুভূতি করিলেও, সিপাহীদিগের ভয়ে কেহই আমাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিল না। শেষে এক গ্রামের মণ্ডল আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া, বহু লোকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াও আমাকে যত্নের সহিত আপনার গৃহের মধ্যে আশ্রয় দান করিলেন। সেই বিপদের দিনে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সমুদয় শরীর যখন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর বিভীষিকায় বক্ষের স্পন্দন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, তখন এই গৃহস্থ আমাকে আশ্রয় দান করিয়া আশু মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতায় আমার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। আমি ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন তাঁহার গৃহে পরম যত্নে অবস্থান করিলাম। শেষে একদিন আমার অনুসন্ধান পাইয়া নিকটস্থ গ্রাম হইতে কয়েকজন সর্দ্দার, আমাকে হত্যা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু আমার আশ্রয়দাতা নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া এই দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে সে যাত্রা আমাকে রক্ষা করিলেন। আমার আততায়ীরা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু শীঘ্রই পঞ্চাশ জন সশস্ত্র বিদ্রোহী সিপাহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া পুনরায় আমার আশ্রয়দাতার বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু আমার রক্ষক বিশেষ সাবধানী লোক ছিলেন। যেদিন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে বিদ্রোহীরা আমার সন্ধান পাইয়াছে; সেই দিন হইতেই তিনি আমাকে রক্ষা করিবার জন্য নানারূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সিপাহীদিগের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য তিনিও কয়েকজন সুদক্ষ চর নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহারাই পূর্ব্ব হইতে সিপাহীদিগের আগমন সংবাদ দিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। আমার আশ্রয়দাতা পূর্ব্বেই আমাকে গৃহ হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন। সিপাহীরা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাঁহার বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল, শেষে বিফল মনোরথ হইয়া চলিয়া গেল। আমিও আমার গুপ্ত স্থান হইতে পুনরায় আশ্রয়দাতার গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। শেষে কিছুদিন পরে একদল ইংরাজ সৈন্য আসিয়া আমাকে ইঁহার গৃহ হইতে লইয়া যায়। আমার স্ত্রী এবং শিশু সন্তানটীকে, রাণী মুজ্বা দেবী সিপাহীদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, পরম যত্নে তাহাদিগকে আপন আলয়ে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে দেশীয় লোকদিগের চেষ্টাতেই আমি আমার জীবন ফিরাইয়া পাইয়াছিলাম এবং পুনরায় পত্নী এবং পুত্রের মুখ দেখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম—এ ঋণ জন্মজন্মান্তরেও শোধ দিতে পারিব না।"

(ক্রমশঃ।)

ম্যাট্‌সিনি ও নারীজাতি।

স্বদেশ-সন্ন্যাসী, ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা ম্যাট্‌সিনি নারীজাতির উন্নতি সাধনার্থ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইটালীর উদ্ধারসাধনে রমণীরও সাহায্য প্রয়োজন তজ্জন্য তিনি রমণীদিগকেও পুরুষের তুল্য অধিকার প্রদান করিতে উপদেশ দেন। পৃথিবীর প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণের ন্যায় ম্যাট্‌সিনিও রমণীজাতির প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁহাদের হীনাবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইত। তিনি নারীজাতিকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহাদের সর্ব্ব প্রকার অধিকার প্রদান করিতে কিরূপ উন্মুখ ছিলেন তাহা তাঁহার রচনা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। তিনি লিখিয়াছেন—

"পরিবারের মধ্যে এক স্নেহময়ী, করুণার প্রতিমূর্ত্তি মহিয়সী দেবী বিরাজ করিতেছেন। তিনি

আমাদের কঠিন কণ্টকপূর্ণ কর্ত্তব্য সকলকে সরল করিতেছেন এবং আমাদের দুঃখপূর্ণ জীবনে শান্তি বিতরণ করিতেছেন। এই বিপদসঙ্কুল এবং শোকপূর্ণ পৃথিবীতে অবিমিশ্র এবং প্রকৃত সুখ মানব এই দেবীর কৃপাতে একমাত্র পরিবার মধ্যেই প্রাপ্ত হয়।"

"যিনি দুর্ভাগ্য বশতঃ এই দেবীর স্নিগ্ধ আশ্রয় লাভে বঞ্চিত, তাঁহার আত্মা, বিষাদে পূর্ণ, তাঁহার হৃদয় শূন্য; এই শূন্যতা কিছুতেই পূর্ণ হইবার নহে। আমি এ সম্বন্ধে এক ভুক্তভোগী, সুতরাং এ অবস্থার সহিত আমার সম্পূর্ণ পরিচয় আছে। যে মানব পারিবারিক আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিতেছেন তিনি এই দেবীর সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করুন। তোমরা পরিবারের বাহিরে অধিকতর উন্মাদক আনন্দ এবং ক্ষণস্থায়ী সান্ত্বনা পাইতে পার বলিয়া তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিও না; কারণ স্থায়ী সুখ এবং শান্তি একমাত্র পরিবার মধ্যেই বর্ত্তমান।"

"নারীই পরিবারের এই দেবী। মাতা, সহধর্ম্মিণী অথবা ভগ্নিরূপে নারী মানবজীবনের একমাত্র স্নেহপূর্ণ আশ্রয়। এই ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিষাদময় মানবজীবনকে নারীই কোমল, মধুর মমতায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। যে প্রেমময় বিধাতা নিরন্তর প্রাণীগণের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, নারী তাঁহারই প্রতিবিম্ব। মানবের দুঃখে সহানুভূতি করিবার জন্য, মানবকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে অসীম করুণা সঞ্চিত আছে। তিনি ভবিষ্যতের সহিত মানবজাতিকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। মাতার চুম্বন হইতে শিশু প্রেমের প্রথম শিক্ষা লাভ করে।"

"ভ্রাতৃগণ! পরিবারকে পবিত্র চক্ষে নিরীক্ষণ কর। ইহাকে জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে একটি অক্ষয় উপায় বলিয়া জ্ঞান কর। যাহারা মিথ্যা তর্ক বিতর্ক এবং পশুজনোচিত কূটবুদ্ধি দ্বারা পৃথিবী হইতে এই পরিবারের সুমধুর বন্ধন ছেদন করিতে চাহে, তাহারা ভ্রান্ত। এই সংসারে অনেক অন্যায় দেখিয়া তাহারা নিতান্ত উত্যক্ত হইয়াই মনে করে যে, পরিবারের উচ্ছেদ সাধন করিলেই অন্যায় দূরীভূত হইবে। কিন্তু পরিবার সৃষ্টি করা মানবের সাধ্য নহে, ইহা ঐশ্বরিক। কোন মানব ইহার ধ্বংস সাধনও করিতে পারে না। জন্মভূমির ন্যায়, এমন কি জন্মভূমি অপেক্ষাও বেশী, পরিবার জীবনের একটি অঙ্গ বিশেষ। এই পরিবারেই মানবজাতির উৎপত্তি স্থান। মানব এই স্থানেই লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হয়। মানবজীবনের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় ইহাও উন্নতিপ্রবণ এবং দিন দিন ইহার ভাব এবং মত উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু ইহা কখনও ধ্বংস হইবার নহে। হে মানব! পরিবারকে পবিত্র করা এবং দেশের সহিত ইহার সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর করাই তোমার কার্য্য। তোমাদিগকে প্রকৃত মনুষ্য করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া স্বদেশ-প্রেমের উদ্দেশ্য এবং তোমাদিগকে উপযুক্ত নাগরিক হইতে শিক্ষা দেওয়া পরিবারের উদ্দেশ্য। স্বদেশ এবং পরিবার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; যাহারা স্বদেশ এবং পরিবারকে পৃথক জ্ঞান করে, তাহারা আত্মাভিমানে পূর্ণ হয়।"

"নারীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা কর। তাঁহার নিকট হইতে কেবল সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরাম চাহিও না, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে তোমার জ্ঞান এবং পুণ্য লাভের শক্তি আহরণ কর। তাঁহাকে তোমার সকল সৎকার্য্যের সমভাগিণী কর। এই মহীয়সী নারীকে তোমার শক্তি স্বরূপিনী জ্ঞান কর এবং তাঁহার পুণ্য ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হও। তোমার মনে নারী জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্বের যে সমুদয় ভাব আছে তাহা দূর করিয়া দাও, কেন না তুমি তাঁহা হইতে কোন বিষয়েই শ্রেষ্ঠ নহ। বহু দিনের কুসংস্কার, হীনতর শিক্ষা, আজীবনের আইনগতঃ অসাম্য এবং তোমাদিগের অত্যাচারই তাঁহাদিগকে জ্ঞান সম্বন্ধে দৃশ্যতঃ হীন করিয়া রাখিয়াছে; এবং তোমরাও এই মিথ্যা কারণে তাঁহাদের জ্ঞানান্নতা দেখাইয়া তোমাদের আজীবনের অত্যাচারের সমর্থন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইতিহাস হইতে কি আমরা দেখিতে পাই না যে, কি প্রকারে অত্যাচারীগণ তাহাদেরই অনুষ্ঠিত কার্য্যসমূহের দ্বারা তাহাদের অত্যাচারের সমর্থন করে? পূর্ব্বে জমিদারগণ সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা লাভ করিতে দিতেন না। তাহারা যাহাতে শিক্ষা পাইতে না পারে, তজ্জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেন। অপর দিকে জনসাধারণ অশিক্ষিত এই কারণ দেখাইয়া তাহাদিগকে নাগরিকের অধিকার, আইন প্রণয়নের অধিকার এবং ভোট দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতেন। আমেরিকার দাস ব্যবসায়ীগণ নিগ্রোদিগকে হীন জাতি এবং শিক্ষার অনুপযুক্ত, শিক্ষা লাভে অক্ষম বলিয়া বর্ণন করেন, অথচ যাঁহারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ইটালীর রাজপরিবারের সমর্থকগণ বলিয়া আসিতেছেন যে, ইটালীয়ানগণ স্বাধীনতার অনুপযুক্ত; অথচ তাঁহারা আইন প্রণয়ন করিয়া এবং সৈন্য শ্রেণীর পাশবিক বল দ্বারা তাহাদের উন্নতি লাভের পথে যে বাধা বিঘ্ন আছে তাহা দূর করিবার চেষ্টার উপায় বন্ধ করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা যেন মনে করেন যে, অত্যাচারই মানবকে স্বাধীনতা শিক্ষা দিবার উপায়। আমরা—পুরুষ জাতি—নারী জাতির প্রতি এই অপরাধে অপরাধী। এই পাপের ছায়া হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে রহ। কারণ ইহা মানব পরিবারকে দুই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছে। অধিকন্তু এক শ্রেণীর উপর, অন্য শ্রেণীর একাধিপত্য এবং প্রভুত্ব, পরমেশ্বরের চক্ষে গুরুতর পাপ।"

"পরম পিতা পরমেশ্বরের সম্মুখে স্ত্রী কিংবা পুরুষ বলিয়া দুই বিভিন্ন শ্রেণী নাই। তিনি কেবল এক মানব জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি এই মানবের—তাহারা স্ত্রী অথবা পুরুষ হউক—হৃদয়ে কতকগুলি গুণ (সামাজিকতা, শিক্ষা এবং উন্নতি স্পৃহা) সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, যাহা মানবকে পশু হইতে বিভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। যেখানে এই গুণগুলি বর্ত্তমান, তথায়ই মানব প্রকৃতি বিকশিত হয়। নরনারীর অধিকার ও কর্ত্তব্য সমান। পুরুষ জাতির ন্যায় নারী জাতিও মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহাদের মধ্যেও এই গুণগুলি বিদ্যমান, সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্য এবং অধিকার পৃথক নহ। একই বৃক্ষের দুইটি বিভিন্ন শাখার ন্যায় মানব সমাজ হইতে নারী এবং পুরুষ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার অসাম্য নাই। কিন্তু পুরুষ জাতির মধ্যে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকৃতি ও তাঁহারা নানা প্রকার বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত, তদ্রূপ নারী এবং পুরুষের মধ্যে প্রকৃত কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু নারী পুরুষ হইতে পৃথক কার্য্যে নিযুক্ত এবং তাঁহাদের মানসিক ভাবও বিভিন্ন। বাদ্যযন্ত্রের দুইটি সুর কি অসমান? একটি কি অন্যটি অপেক্ষা হীন, না দুইটি সুর বিভিন্ন প্রকৃতির? নারী এবং পুরুষ দুইটি সুর; তাঁহাদিগের একটিকে পরিত্যাগ করিলে মানব-সঙ্গীত অসম্ভব হয়।"

"মনে কর দুই ব্যক্তি মানব সমাজের প্রসার বৃদ্ধি এবং তাহার উন্নতি সাধনে নিযুক্ত আছেন। এক-ব্যক্তি উপনিবেশ স্থাপন দ্বারা এই কার্য্য সাধন করিতেছেন, অপর ব্যক্তি দেশ মধ্যে নব নব সাহিত্য ও শিল্প কলা বিস্তার করিয়া মানব সমাজের উন্নতি করিতেছেন, এই দুই ব্যক্তি বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন বলিয়াই কি তাঁহাদের অধিকার এবং কর্ত্তব্যও বিভিন্ন? না, তাহা নহে। ইঁহারা দুই জনেই একই স্বর্গীয় ভাবের প্রচারক, একই কার্য্যের সহযোগী ও সহকর্ম্মী। মানব সমাজে নারী ও পুরুষ বিভিন্ন কার্য্য সাধনে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য সম-পবিত্র এবং দুইজনের কার্য্যই সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু পরমেশ্বরের প্রকাশ মাত্র। নারীকে কেবল তোমার সুখ দুঃখের সঙ্গিনী স্বরূপ জ্ঞান করিও না, তাঁহাকে তোমার চিন্তা, তোমার মহৎ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ ভাব, তোমার জ্ঞান এবং পরার্থে আত্মোৎসর্গের সহকারিণী জ্ঞান করিও। তোমার নাগরিক জীবনে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহাকে তোমার তুল্য জ্ঞান করিও এবং তুল্য অধিকার প্রদান করিও।

যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর মানবকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তোমাদের দুইজনেরই সাহায্য প্রয়োজন। আত্মাকে ঊর্দ্ধে উত্থিত করিবার জন্য, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উন্নতি সাধনের জন্য নারী এবং পুরুষের সম্মিলিত যত্ন ও তপস্যা প্রয়োজন এবং স্বদেশের হিত সাধনার্থ তাহাদের মিলিত অধ্যবসায় এবং সাধনা আবশ্যক।"

জাতীয় জাগরণের এই সুপ্রভাতে স্বদেশের সমুদয় অভাব এবং অন্ধকারের প্রতি স্বদেশহিতৈষীগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাঁহারা সামাজিক দুর্নীতি, কুসংস্কার এবং স্বদেশের অন্যান্য নানা প্রকার অধোগতি দূর করিতে অগ্রসর হইতেছেন। স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরই সহায়তা প্রয়োজন। স্বদেশের উন্নতি সাধন চেষ্টা কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকিলে তাহা সফল হওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। জনসাধারণ মূর্খতার জালে জড়িত, তাহারা স্বদেশ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে অক্ষম, নারী জাতি অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত—দেশের যখন এরূপ অবস্থা, তখন জনকত শিক্ষিত লোকের চেষ্টায় সে দেশ কখনও উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিবে না। অধিকন্তু জনসাধারণ তাঁহাদের চেষ্টার প্রতিকূলাচরণে পশ্চাদ্‌পদ হইবে না। যাঁহারা নারী জাতিকে হীনাবস্থায় রাখিয়া স্বদেশের উন্নতি করিতে উন্মুখ, তাঁহাদের স্বদেশোদ্ধারের চেষ্টা আকাশ কুসুমমাত্র, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। স্বদেশের উন্নতিকল্পে নারী যদি পুরুষের পার্শ্বে মহতী শক্তিরূপে দণ্ডায়মান হইতে না পারেন, দেশে যদি নারীকে এরূপ ভাবে শিক্ষিত হইতে না দেওয়া হয়, তবে সে দেশের উন্নতি কখনও হইবে না। নারী জাতিকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য; এ সম্বন্ধে এক্ষণে আমাদের দেশে আর দ্বিমত নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বদেশ, স্বজাতি, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যশীলা করিতে হইলে, মহীয়সী শক্তিরূপে পরিণত করিতে হইলে তাঁহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এখনও এমন বহু উচ্চ শিক্ষিত লোক আমাদের দেশে আছেন, যাঁহারা নারী জাতির শিক্ষা কেবল ধোপার হিসাব এবং বাজার হিসাবেই আবদ্ধ রাখিতে চাহেন। নারী ইহাপেক্ষা অধিক শিক্ষা পাইলে তাঁহারা বিভীষিকা দর্শন করেন, এবং উচ্চ শিক্ষিতা নারীকে তাঁহারা দয়ামায়াহীনা, গৃহ পরিবারের প্রতি উদাসীনা এক অদ্ভুত জীব বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা নিজেরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া যে জ্ঞানানন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন তাহা হইতে নারীকে বঞ্চিত রাখিতে বিবিমতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা নারী জাতিকে সর্ব্বপ্রকারে পদানতা রাখিয়া তাঁহাদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিতা রাখিয়া কি প্রকারে, কোন্ যুক্তি অনুসারে ইংরাজের নিকট স্বরাজ চাহিতেছি? আমরা নিম্ন শ্রেণীর উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিব, তাহাদিগকে কখনও মাথা তুলিতে দিব না, অথচ ইংরাজ আমাদের সহিত সমব্যবহার করে না, আমাদের সুবিচার করে না, বলিয়া প্রতিবাদ করিতেও লজ্জিত হই না। নারী জাতিকে পদে পদে দলিত করিব, তাঁহাদের আত্মার সমুচিত উন্নতি বিধান করিবার সুযোগ দিব না, সমাজে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার দান করিব না, অথচ ইংরাজ কেন আমাদিগের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে না, তাহা বলিয়া চীৎকার করিতেও কুণ্ঠিত হই না। জাতীয় জাগরণের এই সুপ্রভাতে আমরা যদি নারী জাতির হীনাবস্থা, অজ্ঞানাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করি; তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাদিগকে ফেলিয়াই যদি উঠিতে চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, আমরা নীচেই পড়িয়া থাকিব, উপরে উঠিবার চেষ্টা দুরাশায় পরিণত হইবে। রমণীকে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, পুণ্যে বিভূষিতা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, দেখিবে তোমাদের উত্থান কত সহজ হয়। এই শুভদিনে নারীকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইও না, তাঁহাকে তোমাদের সহকর্ম্মিণী করিয়া লও, তোমাদের বল দ্বিগুণিত হইবে।

নারীগণ! তোমরা জ্ঞান, ধর্ম্মে বিভূষিতা হইয়া মাতৃভূমির উপযুক্ত কন্যা হও। তোমাদের উচ্চ জীবনের মহৎ আদর্শ দ্বারা সন্তানদিগকে উন্নত করিয়া তোল! তাহারা যাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে পারে এবং প্রকৃত সাধকরূপে স্বদেশের দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে যত্নশীল হয় তদ্রূপ চেষ্টা কর। সন্তানগণ তোমাদিগেরই অনুকরণ করিবে। তোমরা সঙ্কীর্ণমনা, অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিতা, স্বদেশের প্রতি উদাসীনা হইলে, সন্তানগণ কি প্রকারে মহৎ, উন্নত, উদার, ধর্ম্মপ্রবণ, জ্ঞানী ও স্বদেশ প্রেমিক হইবে? তোমরা জীবন্ত আদর্শ; তোমাদের দৃষ্টান্তই সন্তানের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী হয়। তোমাদের দৃষ্টান্তই তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে। সন্তানগণ মাতৃভূমির প্রকৃত, ধার্ম্মিক সন্তান হইবে, কি তাহারা পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিবে, তাহা তোমাদের উপরই নির্ভর করিতেছে। সন্তানদিগকে তোমার স্বদেশের কথা বল। স্বদেশের পূর্ব্ব গৌরব, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র শিশুর কোমল হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দাও। সারাদিবসের পরিশ্রমের পর যখন তুমি বিশ্রাম করিবে তখন সন্তানের নিকট স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মাগণের জীবনচরিত এবং তাঁহাদের গুণাবলী বর্ণন কর; ঋষিগণের ধর্ম্মসাধনের কথা বিবৃত করিয়া তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রাণতা মুদ্রিত করিয়া দাও। জগতে যাঁহারা নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াও ধর্ম্ম এবং স্বদেশের জন্য প্রাণ দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই সেই সকল কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরগণের জীবনের শিক্ষাগুলি তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত কর, যাহাতে ভবিষ্যতে তাহারাও এই প্রকারে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে। অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার শক্তি এই শিশুকাল হইতেই তাহাদের হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া দাও।

মাতার নিকট হইতে তাহারা শিক্ষা করুক যে ধর্ম্মের পথই এই প্রলোভনপূর্ণ পৃথিবীতে প্রকৃত পথ; সত্যের সেবক হওয়াই মানব জীবনের সার্থকতা এবং পরার্থে আত্মোৎসর্গ করা মানবের উচ্চতম আদর্শ। অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার শক্তি যেমন তাহাদের কোমল হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে অপর দিকে শ্রদ্ধাভাজনদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেও শিক্ষাপ্রদান করিবে। সন্তানগণ যাহাতে অত্যাচার এবং অরাজকতার শত্রুরূপে এবং ধর্ম্ম ও উজ্জ্বল বিবেক বুদ্ধি সমন্বিত হইয়া বর্দ্ধিত হয় সে ভার তোমাদের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু সন্তানকে এই প্রকার উন্নত ও মহৎ ভাবে শিক্ষা দিতে হইলে, অগ্রে তোমাদিগকেই এই প্রকারে শিক্ষিত হইতে হইবে। তোমরা ক্ষুদ্রতা, নীচতা, অজ্ঞানতার কূপে পড়িয়া থাকিলে সন্তানগণ কি প্রকারে ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, তপস্বী, সন্ন্যাসী হইবে? শৈশব হইতে তাহারা এরূপ শিক্ষা না পাইলে, হঠাৎ তাহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে সমর্থ হইবে না। দেশের এই শুভ দিনে তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য বুঝিয়া লও। তোমরা ধর্ম্ম এবং জ্ঞানলাভ করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ গঠন করিবার পক্ষে প্রধান সহায় হও। তোমরা উঠ, আর এই হীনাবস্থায় পড়িয়া থাকিও না, তোমাদের জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি কর; মানবাত্মা কতদূর উন্নতিলাভ করিতে পারে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখ। তোমাদের জীবনের উচ্চ লক্ষ্যের কথা চিন্তা কর এবং মহীয়সী শক্তিরূপে পুরুষের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের সহকর্ম্মিণী ও সহযোগিনীরূপে দেশকে উন্নত করিয়া তোল।

"কি পারে রমণী?
পারে——আত্মবিসর্জ্জন।
মাতৃরূপে, কন্যারূপে, গৃহলক্ষ্মীরূপে,
দিনে দিনে, পলে, পলে, আত্মবিসর্জ্জনে,
যে নারী পালিছে ধরা জগদ্ধাত্রীরূপে,
সে নারী কি বলহীনা? সে নারী নিষ্ফলা?
সে নারী কেবল তুচ্ছ বিলাসের ছবি?
কি পারে রমণী?
পারে——আত্ম-নিবেদন।
নারী যদি নারীধর্ম্ম পালে সযতনে।
নরের মহত্ত্ব শোভে দেবত্ব কিরণে!

* * * *

বর্ষা-গাথা।

বরষার ধারা রূপে বঙ্গ-জননীর
তাপ-দগ্ধ হৃদয়ের অজস্র রুধির
মনে হয় অবিশ্রান্ত পড়িতেছে ঝরে
উদ্‌ভ্রান্ত সন্তানগণে জানায়ে কাতরে
অরুন্তুদ ব্যথা মার! নিবিড় জলদ
আবরিয়া জননীর সুহাসি-সম্পদ
ঘনতর বিষাদের কৃষ্ণ-যবনিকা
দিগ্ হতে দিগন্তরে স্বীয় জয়-টীকা
নিঃশব্দে গিয়াছে আঁকি'! করি হাহাকার
ধায় তীব্র আর্দ্র বায়ু, মনে হয় মার
মর্ম্ম-ভেদী দীর্ঘ-শ্বাস উথলে অপার
ক্ষণে ক্ষণে রহি' রহি,' সান্ত্বনা কাহার
ইঙ্গিতে বৃথায় মাগি! মাতৃ-গৃহে আর
নাহি জ্বলে রবি-চন্দ্র-গ্রহ-তারকার
বিচিত্র প্রদীপপুঞ্জ, দিবসে নিশায়
হরি' সর্ব্ব অবসাদ, অম্লান-বিভায়
উদ্ভাসি' চৌদিক হর্ষে! দেবালয়ে মার
কল-কণ্ঠ বিহঙ্গের মধুর ঝঙ্কার
উচ্ছ্বাসি' উঠে না আর, মা আমার যবে
উষায় সন্ধ্যায় নিত্য প্রশান্ত নীরবে
সন্তান-মঙ্গল আশে দেব মহেশ্বরে
অর্চ্চিতে পশেন ধীরে, স্তরে স্তরে স্তরে
সাজাইয়ে মনোরম কুসুম-সম্ভার
সুশ্যামল বন-পর্ণ-পুটে! আজি মার
বক্ষভরা দুঃখ-গীতি গাহি আর্ত্ত স্বরে
উন্মাদিনী তরঙ্গিণী ব্যাকুল অন্তরে
ব্যর্থ-রোষে চূর্ণ করি যুগ্ম-তট-ভূমি
প্লাবি লক্ষ বন-গ্রাম, মৃত্যু-স্নেহে চুমি'
কত শত তরী-যাত্রী, সাগর উদ্দেশে
ছুটে যায় যেন হায়, একান্তে প্রাণেশে
জানাইতে জননীর গুপ্ত-মর্ম্ম-জ্বালা
নিদারুণ নিরূপম; কহে যেন বালা

ক্ষুব্ধ চিত্তে নিঃশ্বাসিয়া,—"ওগো বিশ্ব-ত্রাস,
বৃথা তুমি, বৃথা তব প্রবল উচ্ছ্বাস
মদোন্মত্ত আস্ফালন, বৃথা এ গর্জ্জন—
বৃথা উর্ম্মি-নাগিনীর ভীষণ নর্ত্তন
নভঃ-চুম্বী অগ্নি-শিখা সম! প্রাণেশ্বর,
যদি নার ভাসাইতে মুহূর্ত্ত ভিতর
পুঞ্জীকৃত পলে পলে বঙ্গালয়ে যেই
নিরয়-জঞ্জাল রাশি!" সাধ্য নেই-নেই—
নিষ্ফল-আক্রোশে শুধু গরজে সাগর
গর্জ্জে যথা মন্ত্রৌষধে বশ ফণাধর
ফণী-ধর আক্রমনে!

কবি চূড়ামণি
কালীদাস কোন্ যুগে বর্ষায় এমনি
গেয়েছিলা "মেঘদূতে" বিরহী যক্ষের
মর্ম্ম-ভেদী দীর্ঘ-শ্বাস; পাগল চিত্তের
সাধ যায় সেই মত বিশ্বের জীবনে
প্রেরি আজ দূত করি সদনে সদনে
কোথা আছে জননীর প্রকৃত সন্তান
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আনন্দে মহান্
আপনা উৎসর্গ করি তুলিতে গড়িয়া
একটি অজেয় শক্তি, যথা অস্থি দিয়া
পুণ্যাত্মা দধীচি ঋষি রচিলা অশনি
দুর্দ্ধর্ষ অসুর-ধ্বংসী!

হায় মা জননি,
বরষা ধারায় মোর ক্ষুদ্র হৃদি খানি
সাধ যায় মিশাইয়ে বিলাই, কল্যাণি,
তোমারি বিশ্বের দ্বারে; কহি জনে জনে—
"এস উঠি, চূর্ণ করি মোহের স্বপনে,
রুদ্ধ করি "মেঘ দূতে", নাহিরে সময়
প্রণয়-মদিরা-রসে নির্জ্জীব হৃদয়
করিতে নির্জ্জীব তর! "মৃত্যু-দূতে" আজ
আহবান করিয়া লও সারা প্রাণ মাঝ
নবীন-জীবন-দাতা দেব-অতিথির:
বেশে হায়, হাস্য-মুখে প্রফুল্ল সুধীর
সতেজ নির্ভীক চিত্তে! মার অশ্রুজল,
মায়ের গৌরব-ধ্বজা, কনক অঞ্চল,

হের ওই অনাদরে লুণ্ঠিত ধরায় :—
তোরা যদি না মুছাবি মার আঁখি হায়,
তোরা যদি না রাখিবি জননীর মান,
কে তবে এ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মে দিবে আত্ম-দান
রে মুগ্ধ সোদর মোর ?

এস, ছুটে এস,
যে রহে পশ্চাতে পড়ি কাটি সুনিমেষ
আলস্যে কি মোহ-ঘোরে ; থাক্ অর্ব্বাচীন ;
বৃথা ডাকিও না তারে ; প্রভাত নবীন
এসেছে, উদিছে রবি ; সে ঘুমাইছে বলি
তুমি কি দেবতা-পায় দিবে না অঞ্জলি
জাগ্রত জগত সাথে ? লবে না বরিয়া
আনন্দে এ শুভক্ষণ ? দ্রুত বাহিরিয়া
এস তবে ; এস তবে কর্ম্ম-দীপ্ত-পথে
কর্ম্মঠ তপস্বী-বেশে জীবন্ত মরতে
বহায়ে অমৃত-বন্যা ! মাতৃ আঁখি-নীর
মুছে যাবে, ঘুচে যাবে বেদনা গভীর
হৃদয়-পঙ্কজ হতে, ভুলি দৈন্য-গ্লানি
সাজিবেন মা আমার পুনঃ রাজেন্দ্রাণী
সৌন্দর্য্যে সম্পদে চির ! আসিবে সুন্দর
উজ্জ্বল শরত ফিরে ; হবে মহত্তর
শারদীয়া মাতৃ-পূজা, শোণিতে চন্দনে
বিরচি বিমল অর্ঘ্য মায়ের চরণে
অনিন্দ্য শাশ্বত অতি !”—

একি বিশ্ব-নাথ !
মোর ছিন্ন চিত্ত-তন্ত্রে করিয়া আঘাত
গাহ আজি কোন গীতি—একি ‘বর্ষা-গাথা’—
এ যে সন্তানের হায়, অন্তর্য্যামী ধাতা,
অন্তরের আলো-ছায়া পূর্ণ স্বপ্ন এক
সকরুণ, নিশা-শেষে !

হোক্ অভিষেক
জননীর ! বারি-বিন্দু যেইমত আজ
এনেছে মিলন-বার্ত্তা স্বর্গ-মর্ত্ত্য মাঝ
অবিচ্ছেদ-ধারাপাতে, তেমতি হে পিতা,
তব পূত প্রেম-বিন্দু মহা প্রেম-গীতা

বিরচুক্ হৃদে হৃদে, দিক্ মিলাইয়া
তুচ্ছ স্বার্থ-তাপ-ক্লীষ্ট আট কোটী হিয়া
প্রগাঢ় নিবিড় করি ! তব আশীর্ব্বাদ
যত পাপ-দুঃখ-দৈন্য-বিবাদ-বিষাদ
ভাসাইয়া নিয়ে যাক্ অতীতের চির
নিভৃত তিমির-কক্ষে ! দাও সুগভীর
পুণ্য-শান্তি-পবিত্রতা, হে কৃপা-নির্ঝর,
বর্ষান্তে বিকাশি তুলি শরত সুন্দর !!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জীবনের প্রচ্ছন্ন চিত্র।

ব্রহ্ম শক্তি মানবের ক্ষুদ্র পরিমিত হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া দুর্ব্বল আত্মাকে এই পরিদৃশ্যমান জগতের কত উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া কল্যাণ পথে প্রবাহিত করিতে সমর্থ হয়, স্বর্গগত বসু মহাশয়ের পূতজীবনী তাহারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত। সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে ইহা কল্পনার কথা নহে। স্বর্গগত মহাপুরুষের অসীম কার্য্যশীল জীবনের গতি যাঁহারা গূঢ়ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিবেন। বিধাতার দুর্লভ বরে তিনি অতুল প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্মান ধন ও জ্ঞানের প্রখর দীপ্তি মধ্যেই চিরকাল বাস করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সকলের বলে তিনি খ্যাতি লাভ করেন নাই। তিনি আজীবন ভগবানের চরণমূলে তাঁহার শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি, জ্ঞান, বল সকলি শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে অঞ্জলীরূপে অর্পণ করিয়া কঠোর বৈরাগ্য ও দৈন্যের গৌরবপূর্ণ বর্ম্মে আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া ঈশ্বরের দাসত্বে ও জগতবাসীর সেবায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল কার্য্যক্ষেত্রের প্রত্যেক ঘটনা ইহার পরিচায়ক।

জীবনের ঊষাকালেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়াছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, ময়মনসিংহে ৭।৮ বৎসর বয়সে তিনি যখন স্কুলে পাঠ করিতেন, তখন তাঁহাদের বাটীর প্রাঙ্গণ সংলগ্ন কাল জামের গাছের ছায়ায় ইষ্টদেবের আশীষ ভিক্ষা করিতেন। গৃহে প্রত্যাগমন সময়ে আবার একটি বটবৃক্ষের ছায়ায় দিবসের কৃতকার্য্যতা জন্য ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া প্রচুর উৎসাহ লাভ করিতেন এবং বহু রাত্রি পর্য্যন্ত নিদ্রার আক্রমণ হইতে নিজকে রক্ষা করিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন। আমার স্বর্গগত পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় ঐ সময়ে ময়মনসিংহ নগরীতে প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ছাত্রগণের নৈতিক জীবন গঠন পক্ষে মনোযোগী ছিলেন। ছাত্র মণ্ডলীও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার অনুসরণ করিতে প্রয়াস পাইত। তিনি নিজ বাটীতে সাপ্তাহিক উপাসনা মণ্ডলী স্থাপন পূর্ব্বক নিজে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। পিতৃদেবের নিকটেই বসু মহাশয় গণিতে পারদর্শিতা জন্য প্রথমে উৎসাহ প্রাপ্ত হন। তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বশতঃই তিনি আমার শ্বশুর মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে অতি গোপনে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় নিয়মিতরূপে যোগদান করিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, পিতৃদেবের গম্ভীর প্রশান্ত ভাবপূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম

প্রতিপাদ্য শ্লোক, ব্যাখ্যা ও উপদেশাদি তাঁহার শৈশবের কোমল ধর্ম্মভাব উদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই শুভ সময় হইতেই তিনি নিয়মিত উপাসনাকে জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ময়মনসিংহে "জ্ঞান রঞ্জিকা" সভা স্থাপন পূর্ব্বক তথায় ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি তেজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা বসু মহাশয় অনেক সহধ্যায়ীর হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়াছিলেন। অতর্কিত ঘটনা স্রোতে পড়িয়া অতি অল্প বয়সেই তাঁহার সহিত আমার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। এ সময় হইতে সুদীর্ঘ কাল আমি পিতৃগৃহে অসীম আদর যত্নে বাস করিয়াছি। ১৮৬৯ সালে বিবাহের পর কয়েক বৎসর ফরিদপুরে খেলা ধূলায় অতিবাহিত হয়। অবশেষে পিতৃদেব বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের এসিষ্টাণ্ট রূপে নিযুক্ত হইয়া সকলকে লইয়া কলিকাতায় কিছুকাল অবস্থান করেন। ঐ সময় বসু মহাশয় "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ" বৃত্তিলাভ আশায় গুরুতর পরিশ্রম করিতেন। এই সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতিকে লইয়া প্রচারার্থে ফরিদপুর গমন ও পিতৃদেবের আতিথ্য স্বীকার করেন। ঐ উপলক্ষে আমরা তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টিতে পতিত হই। কলিকাতায় তখন ধর্ম্মভাবের প্রবল বন্যা বহিতেছিল; আমার মত নগণ্য পল্লীগ্রামে বর্দ্ধিতা বালিকাও সেই স্রোতে পড়িয়া গিয়াছিল। আমার লেখা পড়া, ধর্ম্মশিক্ষা, স্বাধীনভাবে চলা ফেরা সব একত্রেই আরম্ভ হইল। আমিও নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকিতাম। পরে নানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে করিতে মনের এ ভাব দূর হইল। ঐ সময়ে অতিরিক্ত শ্রমে বসু মহাশয়ের স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণ দেখিয়া পিতৃদেব তাঁহাকে বহু অনুরোধ করিয়াও নিজ বাটীতে আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই। পিতৃদেব তাঁহাকে নিজ বাটীতে আনিয়া দোতালার উৎকৃষ্ট গৃহ তাঁহার পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। পরে বহু চেষ্টার পর তিনি পিতৃদেবের বাটীতে আসিয়াছিলেন কিন্তু সর্ব্বদাই নিম্নতলস্থ একটী অন্ধকার গৃহে পাঠ্য পুস্তকরাশি পরিবেষ্টিত হইয়া অধ্যয়নে দিন কাটাইতেন। অল্পদিন পরেই আমরা পিতৃদেবের কর্ম্মস্থল বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলাম। কিছুদিন পরে বসু মহাশয় "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ"বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০ হাজার টাকা সম্বল করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে ইংলণ্ড যাত্রার আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন। আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার এ সঙ্কল্প অবগত হইলাম। ঐ বৎসর "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির" প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্যবর্গের মধ্যে মহা উৎসাহ স্রোত বহিয়াছিল। বসু মহাশয় অন্যান্য ব্রাহ্মবন্ধুগণসহ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত মন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া আলোক হস্তে মন্দিরের অসম্পূর্ণ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার দিন তিনি কিরূপ অপরিসীম সংযম ও নিষ্ঠার সহিত সারা দিবস উপবাসী থাকিয়া এই পবিত্র দিনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাহার স্বর্গীয় ছবি এখনও আমার চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, পরলোক গত রজনীনাথ রায় ও কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি ২০ জন কৃতবিদ্য, ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত যুবকগণের সহিত তিনি মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। বসু মহাশয় আমাকেও ধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করাইয়া দীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থাদির মধ্যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মেদিনীপুর ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা, থিয়োডোর পার্কারের প্রার্থনাবলী ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান আমাকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। আমি এই সকল গ্রন্থ গভীর রজনীযোগে আমাদের বাটীর ক্ষুদ্র ছাদটীতে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতাম। এই সকল গ্রন্থ পাঠে প্রভূত উপকৃত হইয়াছিলাম এবং আমার

হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরিত হইয়াছিল। নিস্তব্ধ, প্রশান্ত রজনীকালে অগণ্য তারকা খচিত আকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া ঈশ্বরের পবিত্র সত্তায় আমার ক্ষুদ্র প্রাণ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত; হৃদয়ে কত উচ্চ ভাব ও আশা উদিত হইত। বসু মহাশয়ের দীক্ষা দিবসে আমিও দীক্ষার্থী হইয়া স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর সহিত চিকের অন্তরালে বসিয়া এতগুলি ধর্ম্মপিপাসু দীক্ষার্থীর মুখশ্রীতে স্বর্গের দীপ্তি বিভাসিত দেখিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। সে দিনের আচার্য্য দেবের উৎসাগ্নি পূর্ণ উপদেশসমূহ সকলের হৃদয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিয়াছিল। আজও যেন তাঁহার অমৃতময়ী বাণী আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে।

বসু মহাশয় যে কার্য্য আরম্ভ করিতেন তাহাতে সমগ্র হৃদয়ের শক্তি ঢালিয়া দিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পর হইতে তাহা পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিতে—মাতার নিকট প্রচুর তিরস্কৃত হইয়াও—অণুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। নারীজাতির প্রতি তাঁহার অবর্ণনীয় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে কেবল পুরুষের সমকক্ষ জ্ঞান করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা তাঁহাদের স্বাভাবিক শক্তি প্রভাবে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত বলিয়া সম্মান করিতেন। বাল্যকাল হইতেই ভারত-নারীর সামাজিক দুর্গতি দেখিয়া আকুল হইতেন। চিরকালই তাঁহাদিগের হীনাবস্থা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি পঠদ্দশাতেই বালিকা বিদ্যালয়ে পুরস্কার দান ও স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী উত্তরপাড়া, এড়েদহ, প্রভৃতি স্থানের বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষকের কার্য্য করিতেন এবং বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় বক্তৃতা করিতেন এবং এজন্য অর্থ ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মনুষ্যকে উচ্চ ভাব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তিনি কেবল উপদেশ দ্বারা নহে কিন্তু দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকে ধর্ম্মের পথে পরিচালিত করিতে যত্ন করিতেন। তাঁহার এমনি পুণ্য প্রভাব ছিল যে হীন চরিত্রের লোকগণও তাঁহার নিকট সংযত হইয়া চলিত। ফৌজদারী মোকদ্দমায় লিপ্ত যে সকল মন্দ প্রকৃতির লোক তাঁহার সাহায্য প্রার্থী হইত তাহারাও তাঁহার পুণ্য প্রভাবের নিকট অবনত হইত। এইরূপে তিনি বহু দুর্নীতিপরায়ণ ধনীকে অধর্ম্মের পথ হইতে উদ্ধার করিয়া স্বদেশ সেবায় দীক্ষিত করিয়াছেন এবং পবিত্রতার পথে আনিয়াছেন। তিনি বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়াই জন্মভূমির সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যে ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় তিনি জীবিকা রূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার উন্নতির জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা না করিয়া এবং ধনোপার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তিনি জন্মভূমির পরিচর্য্যায় সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। ভারতের নানা প্রকার দুর্নীতি দমনার্থ তিনি ভারত-সভা, বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়, ছাত্র সমাজ, মাদকতা নিবারণী সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি আজীবন সম্পদ, খ্যাতি এবং যশের মধ্যে বাস করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার হৃদয় দীনতা, বৈরাগ্য এবং কঠোর সংযমের সুদৃঢ় কবচে সুরক্ষিত ছিল। গুরুতর শ্রমে ক্লান্ত হইয়াও তিনি গৃহে আসিয়া আরাম করিতেন না। সারা দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর নিশীথে ভগবানের চরণ প্রান্তে বসিতেন এবং তাঁহার সেবকের ন্যায় দিবসের কার্য্যাবলীর হিসাব প্রদান করিয়া তাঁহার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেন। ফৌজদারী মোকদ্দমায় নিযুক্ত হইলে, বিচারালয়ে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এবং ব্যবস্থাপক সভায় গমন করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেন। ব্রহ্ম শক্তিই তাঁহার সর্ব্ব প্রধান সম্বল ছিল। অন্তিমকাল পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত প্রার্থনাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন ছিল। তাঁহার জীবনে প্রার্থনার অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব বিকশিত হইয়াছিল।

কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইত, এ জন্য সময় সময় তাঁহাকে অভাবে পড়িতে হইত। কিন্তু আকস্মিক

ভাবে ভগবান তাঁহার অভাব পূর্ণ করিয়া এই বিশ্বাসী সন্তানকে পুরস্কৃত করিতেন। এইরূপে অনেক ঘটনায় তিনি ভগবানের অযাচিত দয়ালাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মগ্রহণের পরই তাহার কঠিন রোগ হয়। এই সময়ে আমাদের বাটীতে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রী বাস করিতেন। একটি ছাত্রী ও এই সময় দুরন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি চিন্তাভারে অবনত হইলেন। কি প্রকারে এই ব্যয় সঙ্কুলন হইবে তাহা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। ৩ বৎসর বয়স্কা কন্যা নলিনীর মুখপানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "মা, তুই স্বর্গের বাবাকে বল্, আমি যেন এত গুলি কার্য্য চালাইতে পারি।" পরে ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ময়মনসিংহ জমিদারগণের পক্ষ সমর্থনার্থ নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিলেন এবং প্রচুর অর্থ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কলিকাতার কোলাহলপূর্ণ জীবন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পক্ষে অন্তরায় জ্ঞান করিয়া এবং তৎকালীন বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালী সমাজ হইতে সন্তানদিগকে দূরে রাখিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত করিতে সঙ্কল্প করিয়া তিনি কলিকাতার বাহিরে বাস করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই উদ্দেশ্যে দমদমাস্থ "Fairy Hall" নামক উদ্যান বাটীকা ক্রয় করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু তখন উহা ক্রয়ের উপযোগী অর্থ ছিল না। তথাপি তিনি নিবৃত্ত না হইয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩।৪ দিন পরেই তিনি একটি মোকদ্দমায় নিযুক্ত হইয়া কাঁথি গমন করিলেন এবং তথায় ৮ মাস থাকিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া আনিলেন। এই অর্থ হইতে বাটী ক্রয় করিয়াও বহু সহস্র টাকা উদ্বৃত্ত হইল। পৃথিবীর বিষয়ী লোকের ন্যায় তিনি যদি সংসারের উন্নতি এবং ধন সঞ্চয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতেন তবে পরিবারের জন্য প্রভূত ঐশ্বর্য্য রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি কিছু মাত্র চেষ্টা করেন নাই। ভগবানের প্রদত্ত দান তাঁহার প্রিয় কার্য্যে মুক্ত হস্তে ঢালিয়া তিনি অসীম তৃপ্তি ভোগ করিতেন।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

শরতের গান।

আজকে আমি ধর্‌বো তোমায়
প্রাণভরে আজ বাস্‌বো ভালো,
ওগো ছিন্ন-মেঘের খেলার সাথী
মন-ভুলানো পূবের আলো!
ডুবিয়ে মাঠের এপার ওপার
এলোরে আজ কিরণ জোয়ার,
বিরাম নাইকো পূবে হাওয়ার
ভাস্‌ছে মেঘের ধবল-তরী;
যেনরে কোন্ সফল মিলন
বাজায় শঙ্খ গগন ভরি!
আজ আলো আর মাঠের সঙ্গে
পান্না সোণার মাখামাখি।

(আজ) ফুলের গন্ধে গানের ছন্দে
বিশ্বে প্রাণে ডাকা ডাকি!
ভরা ভাদ্রে জলে স্থলে
নির্ম্মল নীল আকাশ তলে
বর্ষা বিদায় অশ্রুজলে
পড়েছে আজ কি সান্ত্বনা!
কান্নাহাসি গলাগলি
হাওয়ায় করে আনাগোনা!
ধর্‌বো আমি ধর্‌বো তোমায়
প্রাণভরে আজ বাস্‌বো ভালো,
ওগো ছিন্ন-মেঘের খেলার সাথী
মন কাঁদানো পূবের আলো!

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তৃতীয় বর্ষ। আশ্বিন, ১৩১৫। ৩য় সংখ্যা।

সুপ্রভাত

"নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা
আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে
প্রাচীন রজনী নাশো
নূতন ঊষালোকে।"

শ্রীকুমুদিনী মিত্র সরস্বতী বি,এ সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৵০ টাকা।

আজ

ধনীর সুপ্রভাত ! গৃহীর সুপ্রভাত !

সৌখীনের সুপ্রভাত ! মহিলার সুপ্রভাত !

কারণ,

যুক্তবঙ্গের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কারখানাজাত

বেঙ্গল সোপ

অভিনব শিল্পজগতে অভাবনীয় যুগান্তর

ঘটাইয়াছে।

কিবা আকারের নয়নাভিরাম মনোহারিত্ব, কিবা

মধুরিমাময় মর্দ্দিত মৃণালবৎ সৌরভ !

বেঙ্গল সোপ

প্রত্যুতঃই স্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি !!!

তাই বলিতেছিলাম শিল্পজগতে আজ

সুপ্রভাত !

অফিস ও কারখানা—

৬৪।১ মেছুয়াবাজার রোড্, কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার।

সুপ্রভাত

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর ;
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

দ্বিতীয় বর্ষ। | আশ্বিন, ১৩১৫ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

চব্বিশ পরগণা জেলা সমিতির
সভাপতি
ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের বক্তৃতা।

স্বদেশবাসি বন্ধুগণ,

আপনারা আমাকে আপনাদিগের সভাপতি মনোনীত করিয়া যে সম্মানিত করিয়াছেন, আমি তজ্জন্য আপনাদিগকে মুক্তহৃদয়ে ধন্যবাদ দিতেছি। আমার নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমি নিজে যাহা জানি তাহা অপেক্ষা আর কাহারও অধিক জানিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সেই অযোগ্যতা সত্ত্বেও কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি এ কার্য্যের ভার-গ্রহণ করিয়াছি।

আমাদিগের দেশের এই চিরন্তন প্রথা আছে যে, পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই স্বাগত সম্বোধন ও কুশল প্রশ্ন করিতে হয়। কিন্তু আমি জানিয়া শুনিয়া আপনাদিগকে কি কুশল প্রশ্ন করিব! যে দেশে লোকের বার্ষিক আয় গড়ে ২৭৲ টাকা মাত্র, অথচ চাউলের মণ ৬৲ টাকা, যেখানে বিলাস সামগ্রী দূরে থাকুক, প্রাণধারণের একান্ত আবশ্যক নির্ম্মল জলও দুষ্প্রাপ্য, যেখানে ম্যালেরিয়া রোগে অনেক সময় হাজার করা ১৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে দেশে পরস্পরের সাক্ষাতে কুশল জিজ্ঞাসা কেবল শূন্যগর্ভ শিষ্টাচার মাত্র।

আমাদের এই জেলায় হিন্দু মুসলমান লইয়া প্রায় ২১ লক্ষ লোকের বাস। ইহাদের মধ্যে কয়-জনের অবস্থা সচ্ছল? ১৯০১ সালের ইন্‌কম টেক্সের তালিকায় কেবলমাত্র ৩৮৯৩ জনের নাম পাওয়া যায়। অপর সকলের বার্ষিক আয় ৫০০ টাকারও কম।

এই এতগুলির লোকের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন কৃষিকর্ম্ম দ্বারা প্রাণধারণ করে। এই জেলায় সর্ব্বসমেত প্রায় ১ কোটী বিঘা জমি আছে। তন্মধ্যে আন্দাজ ৩,০০০,০০০ ত্রিশ লক্ষ বিঘাতে

বৎসর বৎসর চাষ হয়। ইহাই আমাদের ১৭ লক্ষ চাষীর প্রধান অবলম্বন। গড়ে প্রত্যেকের অংশে ১৸০ পৌনে দুই বিঘা জমি ধরিতে পারা যায়।

এই জমির মধ্যে প্রায় ২৭ লক্ষ বিঘাতে ধান্য প্রভৃতি আহার্য্য শস্যের চাষ হয়। গড়ে প্রতি বিঘায় ৩ মণ করিয়া উপস্বত্ব হইলে, প্রত্যেক চাষীর অংশে আন্দাজ ৫ মণ ধরিতে পারা যায়। ইহাতে কোন ক্রমেই বৎসরের খরচ কুলায় না।

বাকী ৩ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট, সর্ষপ প্রভৃতি যে সকল জিনিষের চাষ হয় তাহা হইতে ইহারা কতক সাহায্য পায়। কিন্তু অনেককেই দিনমজুরের কার্য্য করিতে হয়। মজুরি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্য এত বাড়িয়াছে যে, কিছুতেই তাহাদের কুলাইয়া উঠে না। বিশেষ এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে শিল্পী মজুর নাই।

ইহাদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আহার্য্য শস্য বিক্রয়, অথবা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে পাট তুলা প্রভৃতি কোন কোন কাঁচা উপাদান বিক্রয়। কলকারখানার সাহায্য পাইলে এই সকল সামগ্রী হইতে কত বহুমূল্য ব্যবহার্য্য জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারিত। সহজ অবস্থাতেই ইহাঁদের এত টানাটানি, অজন্মা হইলে ত আর রক্ষা নাই। অনেকের ভাগ্যেই দুই সন্ধ্যা আহার জুটিয়া উঠে না।

তারপর আমাদের তাঁতি, কামার, কুমার, যোগী, কাঁসারি প্রভৃতি কারিকর জাতি। স্ত্রীপুরুষে ইহাদের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ (১৯৮০০)। পূর্ব্বে যখন এদেশে বিদেশীয় বাণিজ্যের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় নাই, তখন ইহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। নূতন ধরণের ব্যবসা বাণিজ্যের চাপ ইহাদের উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছে। পূর্ব্বে ইহারাই আমাদিগের আবশ্যকীয় কাপড়, জুতা, কুড়ুল, কোদালি, সিন্দুক, বাক্স সমস্তই প্রস্তুত করিত। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে বেশ বড় আয়তনের ব্যবসায়ও চালাইত। দমদমা জাগুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে পূর্ব্বে পাটের চট ও থলিয়া বুনন ব্যবসায় যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এই সকল জিনিষ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইত। এই অঞ্চলে জোলার কাপড় ও যথেষ্ট প্রস্তুত হইত। এখন সে সমস্তই লোপ পাইয়াছে। যে সকল শিল্পী এই সব কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহারা এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, হয়, কৃষিকার্য্য করিতেছে, না হয়, মজুরি করিতেছে।

এই সঙ্গে উচ্চ এক শ্রেণী ব্যবসায়ীর উল্লেখ করিতে হয়। আমাদিগের নবশাক ভ্রাতৃগণের পক্ষে ব্যবসায়ই প্রধান অবলম্বন। পূর্ব্বে ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় ব্যবসা চালাইতেন। গোবর ডাঙ্গার লুপ্তপ্রায় চিনির কারবার তাহার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে ১২০টি চিনির কারবার ছিল। প্রতি বৎসর প্রায় এক ক্রোর টাকার ব্যবসা হইত। এই গ্রামের রাস্তা বাঁধাইবার জন্য ইটের প্রয়োজন হইত না। এত গুড়ের আমদানি হইত যে, তাহার কলসের খোলাতেই বড় বড় পাকা রাস্তা প্রস্তুত হইত। গোবর ডাঙ্গার চিনি কেবল আমাদের এই জেলাতে নয়, প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা দেশেই প্রচলিত ছিল। এই প্রকাণ্ড ব্যবসায় একবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। গত বৎসর ১০টি মাত্র ছোট কারবার ছিল। এ বৎসর ৬টি মাত্র অবশিষ্ট আছে।

এই সকল ব্যবসায়ী ও কারিকরগণ এখন নিতান্ত কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে। যে সকল কলকারখানা স্থাপিত ও নূতন ব্যবসায়ের আরম্ভ হওয়াতে আমাদের কারিকর ও ব্যবসায়ীশ্রেণীর ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে—সেই সকল কলকারখানা অথবা ব্যবসায়ে তাহারা কোন কাজকর্ম্ম পাইতেছে না।

এখন ২৪ পরগণা জেলাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী নূতন ধরণের বৃহৎ কারখানা আছে।

গালার কারখানা	...	২
কাগজের „	...	২
বরফের „	...	৩
সাবানের „	...	১

চিনির „	...	১
রেশমের „	...	১
সোরার „	...	১
পাথরের „	...	১
গ্যাসের „	...	১
দড়ির „	...	২
ময়দার „	...	১
দুগ্ধের „	...	১
গাড়ী প্রস্তুত করিবার কারখানা		১
চামড়ার কারখানা	...	১
ট্রামওয়ে „	...	১
ডকইয়ার্ড „	...	২
লোহা ও পিত্তল ঢালাই কারখানা		১৩
তেলের কল	...	২
তেলের ডিপো	...	৩
পাটের কল	...	৩৩
তুলার কল	...	৬
পাটের গাঁটবাঁধা	...	১১
মিউনিসিপালিটির কারখানা		১
ইলেক্‌ট্রিক্ কারখানা	...	১
রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা		১

এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি ছোট ছোট কারখানা আছে।

যদি এই সকল কারিকর সামান্য মজুর হইয়া কলকারখানায় প্রবেশ করে, তবে তাহাদের অন্নের সংস্থান হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার জন্য যে নূতনরূপ শিক্ষার আবশ্যক তাহা তাহাদের নাই। কাজেই অনেকে কৃষিকার্য্য অথবা দিন মজুরের কার্য্য করিতেছে। কেহ কেহ অতি সামান্যরূপ ব্যবসা চালাইয়া কোনরূপে দিনাতিপাত করিতেছে। কেবল দুই চারিজন মাত্র বড় বড় ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে।

তার পর আমাদের মধ্যশ্রেণীর (হিন্দু মুসলমান) ভদ্রলোক। ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন শিক্ষিত ব্যবসায়,—যেমন ওকালতি, ডাক্তারি ইত্যাদি অথবা চাকুরি। এই শ্রেণীর অনেকেরই অবস্থা দিন দিন অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। জিনিষপত্র দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইতেছে। কিন্তু ইঁহাদের অনেকেরই আয় একেবারে সীমাবদ্ধ। কেবল জন কয়েকের অবস্থা একটু সচ্ছল। একে সামান্য আয়, তাহাতে পরিবারের লোকসংখ্যা অধিক, পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষা দিবার খরচও কম নয়, আবার মাঝে মাঝে কন্যাদায় প্রভৃতি ত আছেই। এইরূপ নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষে আমাদের সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকগণ একেবারে নিষ্পেষিত হইতেছেন। দুই সন্ধ্যা অন্নসংস্থান করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মনের অনেক সুসঙ্গত ইচ্ছাকে চাপিয়া রাখিয়া, ও সকলপ্রকার অভাবকে কাটিয়া ছাটিয়া ছোট করিয়া কোন রকমে তাঁহারা জীবন ধারণ করিতেছেন। মোটের উপর শতকরা ২।৩ জনে সচ্ছল অবস্থায় আছেন কি না সন্দেহ।

তৎপর আমাদের জমিদার শ্রেণী। অনেকে মনে করেন, তাঁহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। কিন্তু আপনাদিগের মধ্যে যদি কেহ জমিদার থাকেন তবে তিনিই জানেন, তাঁহার সীমাবদ্ধ আয় লইয়া নিত্যবর্দ্ধনশীল টেক্স, শতপ্রকারের চাঁদা, ষ্ট্যাটহোম্ এবং ইভিনিং পার্টির ব্যয়ভার বহন করিয়া তিনি কেমন সুখে আছেন।

দারিদ্র্যজনিত অর্দ্ধাহারে আমাদিগের অধিকাংশেরই শরীর অর্দ্ধপুষ্ট। এরূপ দুর্ব্বল শরীর, পরিষ্কার জলের অভাবে সত্বরই রোগের আধার হইয়া পড়ে। এই জেলায় কিরূপ জলকষ্ট তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ভাগীরথীর তীরে হালিসহর হইতে বজ্‌বজ্ পর্য্যন্ত যতগুলি সহর ও পল্লী ছিল তাহাতে কোনও দিনও জলকষ্ট ছিল না। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে গঙ্গার জল দূষিত হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির রাসায়নিক পরীক্ষক ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন, যে ভাগীরথীর তীরস্থ কোন কোন কলকারখানায় যে সেপটিক্ ট্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা হইতে নিকটস্থ পল্লীগুলির বিশেষ ভয়ের

কারণ আছে। কলিকাতার জল উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লওয়া হয়, তথাপিও তাহাতে এখন অনেক রোগজনক কীটাণু পাওয়া যাইতেছে। যে সকল জায়গায় জল না ছাঁকিয়া পান করা হয়, সে সকল স্থানে স্বাস্থ্যভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা।

গঙ্গা ভিন্ন এই জেলার অন্যান্য প্রায় সকল নদীর জলই পানের অনুপযুক্ত।

আমাদের যে ২৫টি মিউনিসিপ্যালিটি আছে, তাহাদের মধ্যেও অনেক স্থলেই জলকষ্ট বর্ত্তমান।

এই জেলার ৫০০০ হাজার পল্লীগ্রামের মধ্যে ভাগীরথীর সন্নিকটস্থ ন্যূনাধিক ৫০০ শত বাদ দিলে, বাকী ৪৫০০ চারি হাজার পাঁচ শত পল্লীর অধিবাসীদিগকে পানীয় জলের জন্য পুরাতন পুষ্করিণী, ডোবা, মজা নদী, নালা ও খাল বিলের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই জলাশয়গুলি প্রায়ই গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। তখন পিপাসা নিবারণের জন্য সকলকে যে কি ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। বর্ষাকালে নূতন জলে সেইগুলি পরিপূর্ণ হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহা পানের উপযুক্ত নহে, এবং তাহা হইতে নানাপ্রকার রোগেরও সৃষ্টি হয়। ইহার উপর অজ্ঞতাবশতঃ লোকে পাট, শণ ইত্যাদি ভিজাইয়া এই জল বিষাক্ত করে। এই দারুণ জলকষ্ট নিবারণের উপযুক্ত উপায় আপনাদিগকে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

তার পর আমাদের এই জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই নিম্ন ও সমতল। সেই জন্য বর্ষার জল সহজে নিকাশ হইতে পারে না। বিশেষতঃ অনেকগুলি নদীর মুখ একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলপথ কতকগুলি নদী, নালা ও ঢালু জমীর উপর দিয়া অনুপ্রস্থভাবে চলিয়া যাওয়াতে, আবশ্যকানুযায়ী পয়ঃপ্রণালীর অভাবে বর্ষার জল নানাস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং অনেকগুলি ক্ষুদ্র ডোবা, খাল, বিল বৎসরের তিন চারি মাস অপরিষ্কার জলে পরিপূর্ণ থাকে এবং ম্যালেরিয়াবাহক মশক ও অন্যান্য নানাপ্রকার কীট পতঙ্গের জন্মের হেতুস্বরূপ হয়। অথচ এই জলই আমাদের ব্যবহার্য্য।

এই ম্যালেরিয়া আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বে যখন দেশের লোকের অবস্থা সচ্ছল ছিল, তখন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের সহিত তাহারা কিছুদিন যুঝিতে পারিত। কিন্তু এখন অন্নকষ্ট ও জলকষ্টে শরীর দুর্ব্বল হওয়াতে লোকে সেরূপ যুদ্ধে একবারে অসমর্থ। গত ১৯০১—১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত কেবল জ্বররোগে এই জেলায় প্রত্যেক ১০০০ হাজার লোকের মধ্যে ১৮ জন মারা পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, এই জ্বরের প্রায় সমস্তই ম্যালেরিয়া জ্বর। ভাবিয়া দেখুন, অন্ততঃ ২০০ জন পীড়িত হইলে তবে ১৮ জন মারা পড়ে; এক হাজারের মধ্যে ২০০ জন পীড়িত হইলে দেশের কি শোচনীয় অবস্থা হয়! এইরূপে কোন কোন পল্লী একবারে জনশূন্য হইয়াছে। ১৮৭২ হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত আমাদের এই জেলার লোক সংখ্যা ১৬ লক্ষ হইতে ২১ লক্ষ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির অধিকাংশই ভাগীরথী তীরস্থ কলকারখানার সন্নিকটস্থ পল্লীতে। যেখানে কলকারখানা নাই এরূপ অনেক স্থানে এই ১০ বৎসরে লোকসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। (যেমন দেগঙ্গা, হাবড়া-০-৯) কোন কোন স্থলে অতি অল্পমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে (যেমন দমদমা, বারাসত-১-৩)।

এই ম্যালেরিয়ার জন্যই কোন কোন পল্লীগ্রামের অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকে ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যখন তাঁহারা নিজ গ্রামে ছিলেন, তখন স্কুল পাঠশালা প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্যে নিয়োজিত থাকিতেন। এখন তাঁহাদের অভাবে গ্রামের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে।

এইত গেল আমাদের প্রধান প্রধান দুর্দ্দশার তালিকা—দারিদ্র্য, জলকষ্ট ও ম্যালেরিয়া। এই সকল আপদের সহিত যুঝিতে হইলে যে বলের প্রয়োজন, এখন দেখা যাউক, আমাদের সে বল আছে কি না! শিক্ষাই মানবহৃদয়ে বলসঞ্চার করে! কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে কি?

১৮৯৪ খ্রীঃ অঃ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৯২৭ ও ছাত্র সংখ্যা ৭৩,৫৬৬ ছিল। ১৯০২ খ্রীঃ অঃ আমাদের এই জেলার সকল রকম বিদ্যালয়ের সমষ্টি ১৭৬৮ এবং ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৭৪ হাজার হইয়াছে। স্কুলের সংখ্যা এই ৭ বৎসরে অনেক কমিয়াছে, ছাত্রসংখ্যাও বেশী বাড়ে নাই। ১৮৯২ সালে বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়স্ক বালকের মধ্যে শতকরা ৪৩ জন লেখাপড়া শিখিত; ১৯০১ সালে শতকরা ৪২ জন লেখাপড়া করে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, লোকশিক্ষা আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতেছে না বরং কিছু কিছু অবনতির দিকে চলিয়াছে।

কোন জাতির উন্নতি একমাত্র পুরুষদিগের শিক্ষার উপর নির্ভর করে না। স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। প্রাচীনকাল অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে জীবন-সংগ্রাম অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই আন্তর্জাতিক জীবন সংগ্রামের দিনে আমরা যদি দশ লক্ষ স্ত্রীলোককে আমাদের গলগ্রহ করিয়া রাখি, তাহা হইলে আমাদের উন্নতির কোন আশাই নাই। স্বাভাবিক মেধা, স্মৃতিশক্তি, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণে আমাদের জননী, ভগ্নী, সহধর্ম্মিণী ও কন্যাগণ কিছুতেই আমাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন। কিন্তু আলস্য, ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্য দ্বারা আমরা তাঁহাদের ও ভবিষ্যবংশীয়দিগের সর্ব্বনাশ করিতেছি। অর্থাভাব ইহার একটী কারণ হইলেও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষিত করিতে না পারিলে, আমরা কোনরূপেই অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইতে পারিব না। ১৯০১—২ সালে বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়স্কা বালিকাদিগের মধ্যে শতকরা ৩½ জন মাত্র লেখাপড়া করিত। দশ বৎসর পূর্ব্বেও বিদ্যার্থিনী বালিকার সংখ্যা ঐরূপই ছিল। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ১৮৯৭ সালে বিদ্যালাভের উপযুক্ত বয়স্কাদিগের মধ্যে বিদ্যার্থিনীর সংখ্যা শতকরা ৪ জন হইয়াও এখন ক্রমশঃ আবার কমিতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই জেলায় লোক সংখ্যার অনুপাতে, লিখিতে পড়িতে জানে এমন লোকের সংখ্যা বড়ই নিরাশাজনক। আমাদের জেলার ২১ লক্ষ লোকের মধ্যে কেবল ২৩০,০০০ দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১১ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে সক্ষম। যে জেলায় ভারতের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত, সে জেলারই যখন এই দশা, তখন আর দেশের আশা ভরসা কোথায়!

তারপর কার্য্যকরী বিদ্যার চর্চ্চা ত একবারেই নাই। এই জেলার মধ্যে বালীগঞ্জ ও কাওরাপুকুরে স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্য মিস্‌নারী সাহেবদিগের প্রতিষ্ঠিত দুইটি কারিকরী বিদ্যালয় আছে। তদ্ভিন্ন কল কারখানায় শিক্ষানবিশ থাকিয়া কতকগুলি লোকে মিস্ত্রীর কার্য্য শিক্ষা করে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই জন্য এখনও যে দুই চারি ঘর তাঁতি, কামার, কুমার, মুচি ও অন্যান্য শিল্পী জাতীয় লোক জ্যাতি-ব্যবসা দ্বারা কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করে, তাহারা কোন প্রকার নূতন উন্নত প্রক্রিয়া দ্বারা ভালরূপ কাজ করিতে সক্ষম নহে।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি ভিন্ন দেশের যে কোন আশাই নাই, একথা আমরা সকলেই জানি। কৃষিই আমাদের ১৭ লক্ষ লোকের উপজীবিকা। অন্যান্য দেশে কত নূতন উপায়ে ফল শস্যাদির উন্নতি সাধিত হইতেছে, আমাদের কৃষকগণ সে সকল প্রথা বুঝিতে অক্ষম। আজকাল কৃষিকার্য্য যে কেবল বর্ষার জল আর মাটীর উপর নির্ভর করে না, প্রত্যুত উপযুক্ত রূপ সারাদি ব্যবহার ও অন্যান্য প্রক্রিয়া দ্বারা জমী হইতে নানা প্রকার নূতন নূতন ফল ও শস্য উৎপাদন করা যাইতে পারে, একথা আমাদের কৃষকদের চিন্তারও অগোচর। কৃষকশ্রেণীর উপযুক্তরূপ শিক্ষার অভাবে চাষের উন্নতি সম্ভবপর হইতেছে না। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিতর কার্য্যকরী বিদ্যার বহুল বিস্তার ব্যতীত শ্রমশিল্পের উন্নতির কোন আশাই নাই।

মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকের শিক্ষার গতি এখন কেবল ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি ব্যবসায়ের, আর

না হয়, চাকুরির দিকে। কিন্তু এই সকল কাজে আর সুবিধা নাই বলিলেই হয়। কাজেই এখন আমাদের দুর্দ্দশার একশেষ। ক্রমে নূতন নূতন বাধাবিপত্তি আমাদের পথে উপস্থিত হইতেছে। এই সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে আমাদের শিক্ষার গতিকে ভিন্ন দিকে ফিরাইতে হইবে। কিন্তু নানাপ্রকার কলকারখানার জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন কয় জন? আর তদুপযোগী শিক্ষার আয়োজনই বা কোথায়?

অন্নকষ্টের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন দেখা যাউক, জীবনধারণের অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য আমাদের কত খরচ হয়।

২১ লক্ষ লোকের পরিধেয় বস্ত্রের জন্য প্রত্যেকের অন্ততঃ ২০ গজ অর্থাৎ ২৲ টাকা মূল্যের বস্ত্র ধরিলে, মোট ৪২ লক্ষ টাকা খরচ হয় ইহার মধ্যে আমাদের ১২০০০ বার হাজার তাঁতী ও কয়েক সহস্র জোলা কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়।

২১ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ২২৫০০০ দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার লোকে লিখিতে ও পড়িতে পারে। ধরিয়া লওয়া যাউক, যাহারা লেখা পড়া জানে তাহারা সকলেই জুতা ব্যবহার করে। প্রত্যেকের জন্য বৎসরে ২৲ টাকা ধরিলে আমাদিগের জুতার খরচ বৎসরে অন্যূন ৪৷৷০ লক্ষ টাকা। ইহার কতকাংশ বিদেশে যায়।

২১ লক্ষ লোকের প্রত্যেকের জন্য বৎসরে অন্ততঃ ৫ সের করিয়া গুড় বা চিনি ধরিলে একুনে ২৫০০০০ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মণ খরচ হয়। ইহার মূল্য প্রায় ২০০০০০ কুড়ি লক্ষ টাকা। এই জেলাতে এখন প্রায় ১৩০০০ তের হাজার বিঘা জমীতে ইক্ষুর চাষ হয়। তাহাতে মোট ১৩০০০০ ১ লক্ষ ৩০ হাজার মণ গুড় বা চিনি হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত খেঁজুরগাছেরও অভাব নাই। কিন্তু গোবরডাঙ্গার চিনির কারখানাগুলি বন্ধ হওয়া অবধি আমাদিগকে অন্য স্থান হইতে চিনি আনাইতে হইতেছে। এবং তাহাতে অনর্থক অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হইতেছে। আমাদের এই জেলাতেই যথেষ্ট গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইতে পারে।

২১ লক্ষ লোকের জন্য বৎসরে প্রায় ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকার লবণ খরচ হয়। পূর্ব্বে আমাদের এই জেলাতেই অনেক লবণ প্রস্তুত হইত। এখনও হইতে পারে। অনেকের ধারণা আছে, গবর্ণমেণ্ট লবণ প্রস্তুত করিবার ব্যবসা চালাইতে অনুমতি দিবেন না, ইহা নিতান্তই অমূলক। তবে বর্ত্তমান অবস্থায় লবণ প্রস্তুত করিবার ব্যবসায় লাভজনক হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বিষয়।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্যও অনেক অর্থ ব্যয় হয়।

আমরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই, আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থব্যয় হইতেছে, অথচ দেশের অর্থাগমের উপায় কিছুই হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের প্রধান বিবেচ্য, দেশের ধন বৃদ্ধির উপায় কি?

প্রথমতঃ—উন্নত প্রণালীতে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দেশের লোককে দিয়া, আমাদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। এরূপ কলকারখানায় অনেক লোকে কাজকর্ম্ম পাইতে পারিবে; এবং তাহাতে একমাত্র কৃষির উপর যাহারা নির্ভর করিয়া আছে, তাহাদের সংখ্যা কমিবে। প্রত্যুত যে সকল কৃষিজাত সামগ্রী অল্পমূল্যে এখন বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, সেগুলি কল কারখানায় ব্যবহৃত হইলে, এই দেশেই অধিক লাভে বিক্রয় হইতে পারিবে।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল্প-বিভাগের পরামর্শদাতা শ্রীযুক্ত জে জি কমিং মহোদয় যে ব্যবসা গুলি বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার তালিকা এই; (১) বস্ত্র ও কারপেট বয়ন (২) চীনা বাসন (৩) কাঠের জিনিষ (৪) মাদুর (৫) চমড়া (৬) ছুরি কাঁচি (৭) পিতলের বাসন (৮) কাচের জিনিষ (৯) নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য, (১০) দেশলাই (১১) সাবান (১২) সুগন্ধি

দ্রব্য (১৩) গালা (১৪) ও নানাবিধ উদ্ভিজ তৈল প্রস্তুত করা এবং (১৫) তুলা ও রেশম-জাতসূত্র ও বস্ত্র রঞ্জন। এতদ্ব্যতীত ছাতা, রং মোজা, চামড়ার জিনিষ এবং ফলের মোরব্বা ও চাট্‌নি প্রস্তুত করিবার প্রস্তাবও তিনি অনুমোদন করেন।

উল্লিখিত তালিকার মধ্যে অনেক গুলি শ্রমশিল্পই এ জেলাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কাপড় ও চামড়ার কারবার বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন নূতন উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিবার জন্যও এই জেলার নানা স্থান উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এইরূপ কল কারখানা চালাইতে হইলে মূলধন চাই, অভিজ্ঞতা চাই ও সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। আপাততঃ আমাদিগের এ তিনটীরই অভাব। কিন্তু আমরা যদি মানুষ হই, তবে এ সকলই জুটিয়া যাইবে। আমরা যদি আত্মনির্ভরশীল হই, পরমেশ্বর আমাদের সহায় হইবেন। আমাদিগকে এই কার্য্যের উপযুক্ত হইতেই হইবে। মাতৃদৈন্য মোচনের জন্য প্রথম আহ্বান যে আমাদিগের কর্ণে ধ্বনিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের উন্নতির নব পন্থা নির্দ্দেশের ভার যে আমাদের উপরেই পড়িয়াছে, ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে! কিন্তু এ ভার বহন করিবার জন্য সাধনা চাই, সংযম চাই, সাধুতা চাই, সত্যনিষ্ঠা চাই, অধ্যবসায় ও উৎসাহ চাই এবং সর্ব্বোপরি ভগবানের উপর অটল বিশ্বাস চাই। তবেই আমরা উপযুক্ত শক্তিলাভ করিতে পারিব। অবিশ্বাস এবং বিলাসিতা একেবারে পরিহার করিতে হইবে।

যোগ্য লোকের হস্তে ব্যবসা বাণিজ্যের ভার পড়িলেও মধ্যে মধ্যে ক্ষতির আশঙ্কা একবারে যায় না। কিন্তু এই সকল সাময়িক ক্ষতিতে অভিভূত হইলে চলিবে না। ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং দৃঢ়তা সহকারে সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিতে হইবে। মাতৃদৈন্য মোচনের ভার সকলকেই যথাযোগ্যভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহার ধন আছে তিনি একদিকে যেমন নিজের ধন বৃদ্ধির জন্য, অপর দিকে তেমনই মাতৃদৈন্য মোচনের মহৎ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন। যাঁহার ধন নাই কিন্তু শরীর ও মনের শক্তি আছে, তিনি সেই সেই শক্তিকেই এই কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। আর যাঁহাদের ধনবল বা জ্ঞানবল কিছুই নাই তাহাদেরও নিরাশ হইবার কারণ নাই। তাঁহারাও মাতৃদৈন্য মোচনের অধিকারী, কারণ উপযুক্ত শ্রমজীবি ব্যতীত কোন কলকারখানাই চলিতে পারে না। এই সাধনায় যদি কাহারও ধনক্ষয় হয় তিনি তাহার পরিবর্ত্তে মাতৃসেবার বিমল আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন! যদি কাহারও শরীরপাত হয় তিনিও মাতৃসেবার পুণ্যবলে উন্নত লোকের অধিকারী হইবেন! প্রাণপণ চেষ্টায় এইরূপ নানা প্রকার নূতন শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই এ দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে। আমাদের প্রাণের এই গভীর আকাঙ্ক্ষা কি চরিতার্থ হইবে না?

দ্বিতীয়তঃ—স্বদেশীয় বস্তুর বহুল প্রচার ও ব্যবহার দ্বারা দেশের ধন দেশে রক্ষা করিতে হইবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালীর কাছে কোন কথাই নূতন নহে। মাতৃভূমির দৈন্য নিবারণের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যাঁহারা নূতন নূতন ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাঁহারা যে সাধ্যানুসারে স্বদেশীয় বস্তু ব্যবহার করিবেন ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। আমি যদি আমার তন্তুবায় ভ্রাতার কাপড় ক্রয় না করি তবে মাতৃচরণে আমি অপরাধী। একমাত্র স্বদেশী বস্তু ব্যবহারে আমার কিঞ্চিৎ আর্থিক ক্ষতি হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মাতৃচরণে অপরাধ জনিত আত্মগ্লানি অপেক্ষা এরূপ ক্ষতি স্বীকার কি সহস্রগুণে শ্রেয় নহে? আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয়কালে আমি কি আমার অনশনপীড়িত, রোগক্লিষ্ট শ্রমশিল্পী ভ্রাতৃগণের নিরাশাব্যঞ্জক মুখ ভুলিতে পারি? ঐ ব্যবসায়জীবীর সহিত আমাদের যে কি রক্তসম্বন্ধ, বঙ্গজননী প্রতিজনের কর্ণে অতি করুণ-

স্বরে তাহা ব্যক্ত করিতেছেন। নিতান্ত কঠোর হৃদয় না হইলে জননীর সে কাতরস্বর বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব।

আর একটী কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। ম্যালেরিয়া নিবারণই বলুন, জলকষ্ট নিবারণই বলুন, জলনিকাশের নূতন বন্দোবস্তই বলুন, আর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারই বলুন, সকল কার্য্যই আমাদিগের সমবেত শক্তি ও চেষ্টার উপর নির্ভর করে। আত্মনির্ভর ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায়, জাতিগত জীবনের পক্ষেও নিতান্ত আবশ্যকীয়। কিন্তু জাতিগত আত্মনির্ভর ব্যক্তিগত আত্মনির্ভরের সমষ্টিমাত্র। আমাদিগের এই জেলার অধিবাসীদিগের মনকে এমন করিয়া গড়িতে হইবে যে, কেহ যেন অন্যের মুখাপেক্ষী না হন। আমরা সকলেই যেন একমন একপ্রাণ হইয়া স্বদেশের যে কোন মঙ্গলকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারি।

যে সকল কারণে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, আমাদের মধ্যে তাহার অভাব নাই। কিন্তু মাতৃভক্তির দ্বারা সে সকল অন্তরায় দূর করিতে হইবে। মাতৃভূমির কোন মঙ্গলকর কার্য্যের ইঙ্গিত পাইবামাত্র আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা, ঔদাসীন্য ও অসূয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে একত্র হইতে হইবে।

জেলার সমস্ত না হউক, অন্ততঃ অধিকাংশ লোককে এক চিন্তা ও এক কার্য্যে নিরত করিতে না পারিলে, আমাদের উন্নতির উপায় নাই। কি উপায়ে সকলকে এক মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, একই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত করিতে পারা যায়, ইহাই এখন আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয়। আমার মনে হয়, আমাদের যে যে পল্লীতে ডাকঘর আছে, সেই পল্লীগুলিকে কেন্দ্র স্বরূপ করিয়া আমরা সবডিভিসন কমিটীর অধীনে কতকগুলি শাখা কমিটি গঠন করিতে পারি। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের ৫০০০ পাঁচ হাজার পল্লীর প্রত্যেকটিতে এক একটি সমিতি গঠন করিবার আশা করিতে পারি না। কিন্তু আমাদের যে ১৭৬৮ পল্লীতে এক একটি বিদ্যালয় আছে তাহার প্রত্যেকটীতে এক একটী প্রশাখা কমিটি গঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। জলকষ্ট হইলে, জল নিকাশের আবশ্যক হইলে, অথবা কোন সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব হইলে স্থানীয় কমিটি নিকটস্থ কেন্দ্রে সংবাদ দিতে পারেন। তাঁহারা আবার সবডিভিসন কমিটিতে সংবাদ দিবেন এবং জেলা কমিটি তাঁহাদের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন।

এরূপ একটি মহৎ কার্য্যে অনেক লোককে অনেক দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে। কিছুই একদিনে গড়ে না। যাঁহারা এ কার্য্যে ব্রতী হইবেন তাঁহাদিগকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। প্রচারক ব্রত-গ্রহণ করিয়া গ্রামে গ্রামে লোকের নিকট এই সকল সমিতির আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে; এবং সর্ব্বসাধারণকে এজন্য প্রস্তুত হইবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে যে সাহায্য লাভের সম্ভাবনা আছে, আমি তাহার উল্লেখ করি নাই, কারণ আমরা যতই আত্মশক্তির উপর নিভর করিতে পারিব ততই আমাদিগের মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদিগের কার্য্য সুপ্রণালীতে চালিত হইলে আমরা গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইব না।

আমাদের দেশের কার্য্যের একটা প্রধান অন্তরায় এই যে, আমরা আশু ফল প্রত্যাশা করি। কিন্তু জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা এক দিনের কার্য্য নহে। যুগ যুগান্তের পরিশ্রম ও সাধনা ব্যতীত তাহা সিদ্ধ হইবার নয়। আর একটি বিঘ্ন এই যে, আমরা প্রত্যেকেই নেতা হইতে চাই, অপরের নেতৃত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু শুরু হইতে হইলে যে প্রথমে শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হই। যাঁহারা আমার প্রস্তাবিত পল্লী-সমিতির নেতা হইবেন, হয় ত তাঁহাদিগের নাম, তাঁহাদিগের কার্য্য, সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, নীরবে বিনা আড়ম্বরে তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু সেজন্য যেন

শ্রীক্ষুদিরাম বসু।
(মোজাফরপুর যাইবার পূর্ব্বের চিত্র)

তাঁহারা নিরুৎসাহিত না হন। সমুদ্র মধ্যে ফল-শস্য-সুশোভিত মনুষ্যবাসের উপযুক্ত যে মহাদ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অসংখ্য কীটাণুর যুগ যুগান্তরব্যাপী ধারাবাহিক অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও দেহ বিসর্জ্জনের নিদর্শন। ঐ ক্ষুদ্র কীটাণুর ন্যায় আমাদিগকেও যুগ যুগান্তর ধরিয়া, তিল তিল করিয়া দেহপাত করিয়া, জননী জন্মভূমির গৌরবের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কোন কার্য্যই জগতে আকস্মিক নয়। আমাদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা সমস্তই আমাদিগের কার্য্যের ফল। কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্ম-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমরা যদি উপযুক্ত হই, যিনি কর্ম্মফলদাতা—তিনি যে আমাদিগের কল্যাণ করিবেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আবার আসিও ফিরে!

(১)

হে অমর নব সন্ন্যাসী, তব
গৌরব গাথা হ'বেনা নীরব;
কালের বিষাণ,
গাহিয়া সে গান,
জাগা'বে আবার ধীরে;
চিতার আগুণ,
জ্বলিবে দ্বিগুণ;
আবার আসিও ফিরে!

(২)

বিস্ময়ে চাহি' দেখিছে বিশ্ব,
অভূতপূর্ব্ব নবীন দৃশ্য,
কর্ম্ম ক্ষেত্র,
আকুল নেত্র,
চাহিতেছে ধীরে ধীরে;
বহ্নি জ্বালায়ে,
গেলে কি পলায়ে?
আবার আসিও ফিরে!

(৩)

অপূর্ণ নর-জনমের সাধ,
ল'য়ে বুক ভরা তীব্র বিষাদ,
যৌবন নব,
স্তব্ধ, নীরব,
প্রেত দল ছিল ঘিরে;
হইলে মুক্ত,
বিজয় যুক্ত,
আবার আসিও ফিরে!

(৪)

সতীর্থ দল রহিল জাগিয়া,
শ্মশান বক্ষে, সাধনা লাগিয়া,
গৌরব ভরা,
কীর্ত্তি পসরা,
রাখিয়া গঙ্গা তীরে;
ঊর্দ্ধ অক্ষি
রয়েছে লক্ষি';
আবার আসিও ফিরে!

(৫)

দৈন্য দুঃখ বক্ষে চাপিয়া,
কেঁদেছ কেবল পরের লাগিয়া;
দূরিতে দুঃখ,
সাধন মুখ্য,
বিশ্বাস নিজ শিরে।
পুণ্য ভূমির
সন্তান বীর,
আবার আসিও ফিরে!

(৬)

নব-জীবনের পুণ্য প্রভাত,
প্রতি বুকে বুকে ঘাত প্রতিঘাত,
বক্ষে ধরিয়া
বজ্র চাপিয়া,
মুছিয়া নয়ন নীরে;
জেগেছে সকল
সন্তান দল,
আবার আসিও ফিরে!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ।

তৃতীয় প্রস্তাব।

চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ানের নাম ভারত ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত। দুর্গম বৌদ্ধ যুগের অনেক অপরিজ্ঞাত কাহিনী ইঁহার ভ্রমণ-কাহিনী পাঠে অবগত হওয়া যায়। আমাদের প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাবে বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ সম্বন্ধে আমরা কতিপয় প্রাচীন গ্রন্থকারের মতামত প্রকাশ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে ফাহিয়ানের কি মত সে সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথার অবতারণা করিব।

ফাহিয়ান যে খৃঃ ৩০৯—৪১৪ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এতদ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে যে অমিতাভের মহানির্ব্বাণের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে তিনি ভারতবর্ষ পরিদর্শণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষের উপর যে আটটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাদের দুইটি ছাড়া আর কাহারও উল্লেখ আমরা ফাহিয়ানের পুস্তকে দেখিতে পাই না। অপিচ, অশোক নির্ম্মিত ৮৪০০০ স্তূপেরও কোনও কথা দেখিতে পাই না। সত্য বটে উহাদের নির্ম্মাণের পর বহু শত বৎসর অতীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন ভারতে স্থপতি-বিদ্যার উৎকর্ষের কথা কে না অবগত আছেন? শত শত বৎসরের ইতিহাস কাহিনী হৃদয়ে লুক্কায়িত রাখিয়া আজ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ইমারত ও স্তূপ ভারতের নানাস্থানে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অথচ, উপরোক্ত ৮৪০০০ স্তূপের মধ্যে ফাহিয়াণ দুইটি মাত্র দেখিতে পাইলেন। ইহার কোনও প্রকার সন্তোষজনক মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। ইহার একমাত্র এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে বৌদ্ধ স্তূপের ঐ সকল কাহিনী নিতান্ত অলীক, অথবা ফাহিয়ান ঘোর মিথ্যাবাদী। এ সম্বন্ধে কোনও প্রকার মতামত প্রকাশ করিতে হইলে অত্যন্ত সাবধানে অগ্রসর হইতে হয়। আমরা এস্থানে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে ফাহিয়ান ভারতবর্ষ বিষয়ে যে সমস্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই যে সত্য তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি।

বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর তাঁহার ভস্মাবশিষ্ট যে যে স্থানে নীত হইয়া স্তূপ নির্ম্মিত হয় তাহা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি। *

ফাহিয়ান ইহাদের মধ্যে বৈশালী, কপিল বস্তু ও কুশীনগর দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাদের কোনও স্থানে তিনি কোনও প্রকার স্তূপ দেখেন নাই। †

ফাহিয়ান রামগ্রাম ও কুশী নগরের মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে এক অঙ্গার স্তূপ দর্শন করিয়াছিলেন। * অনেকে এই স্থানটীকেই পিপ্পলী বন বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু ফাহিয়ানকে যদি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে এই মতের বড় অধিক মূল্য থাকে না। তিনি উক্ত স্থানকে আদৌ পিপ্পলী বন নামে অভিহিত করেন নাই। এই স্থানকে তিনি কুশী নগরের বার যোজন পশ্চিমে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গ ও এই স্থানটীকে অবিকল ঐরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থানটীকে যদি আমরা পিপ্পলী বন বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রের বর্ণনার সহিত ও আমরা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারি না। আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি যে পিপ্পলী বনের মৌর্য্যেরা বুদ্ধদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পরেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার সমস্ত ভস্মাবশেষ ছয় জনের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। এই ঘটনা দ্বারা এই রূপ অনুমান করিতে পারি যে পিপ্পলী বন হইতে কুশী নগরের দূরত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না। রাজগৃহ হইতে কুশী নগরের দূরত্ব প্রায় ২৫ যোজন। কুশী নগর হইতে পিপ্পলী বনের দূরত্ব যদি উহা হইতে অধিক না হইত তাহা হইলে পিপ্পলীবনের মৌর্য্যেরা রাজগৃহের অজাতশত্রু হইতে অনেক পূর্ব্বে কুশী নগরে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইত। এক্ষণে আমরা হয়ত অনেকটা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে ফাহিয়ান রামগ্রাম ও কুশী নগরের মধ্যে যে অঙ্গার স্তূপ দর্শন করিয়াছিলেন তাহা কুশী নগর হইতে যখন মোটে দ্বাদশ যোজন তখন ইহা পিপ্পলী বনের স্তূপ হইতে পারে না!

ফাহিয়ান ইহার পর রাজগৃহে গমন করিয়াছিলেন। এইস্থানে তিনি একটি উচ্চ, সুবিস্তৃত ও সুন্দর স্তম্ভ দর্শন করেন। এই স্তম্ভ নির্ম্মাতা সম্বন্ধে তিনি কোনও কথা উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের ধারণা ইহা মহারাজ অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফাহিয়ান বলেন, "এই স্তূপ নূতন রাজগৃহের পশ্চিম তোরণ দ্বারের তিন শত পদ দূরে অবস্থিত।" হুয়েনসাঙ্গের মতে ইহা প্রথমে মহারাজ অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, পরে মহারাজ অশোক ইহা পুনঃ নির্ম্মাণ করেন।

ইহার পর ফাহিয়ান রামগ্রামে উপস্থিত হয়েন। এই প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান সম্বন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"এই স্থানের নরপতি বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষের এক অংশ প্রাপ্ত হয়েন ও তাহার উপর এক সুবৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এই স্তূপের পার্শ্বে এক সুবিস্তৃত সরোবর আছে। উহার মধ্যে এক যক্ষ দিন রাত্রি উপস্থিত থাকিয়া ভগবানের এই পবিত্র স্তূপকে রক্ষা করিতেছে।

"ভগবানের ভস্মাবশেষের উপর যে আটটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, মহারাজ অশোক তাহা ধ্বংশ করিয়া ৮৪০০০ নূতন স্তূপ নির্ম্মাণ করিতে কৃতসংকল্প হয়েন। সাতটি স্তূপ ধ্বংশ করিয়া অশোক যখন রামগ্রাম স্তূপ ধ্বংশ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন উক্ত যক্ষ এক ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহেন, 'মহারাজ! আমি দেবপ্রিয় নামক যক্ষ। এই স্তূপের প্রথম নির্ম্মাণ দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি সর্ব্বদা এইস্থানে উপস্থিত থাকিয়া ভগবানের উপাসনা করিতেছি।' তাহার পর যক্ষ উপাসনা করিবার দ্রব্যাদি মহারাজাকে প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি যদি ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিতে পারেন তবেই আমা কর্ত্তৃক রক্ষিত এই স্তূপ ধ্বংশ করুন। নতুবা অন্যত্র প্রস্থান করুন।' অশোক দেখিলেন যক্ষের সমস্ত দ্রব্য দেব-নির্ম্মিত। তাঁহার দ্বারা ঐ প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। অতএব তিনি যক্ষকে আশ্বস্ত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

ফাহিয়ান বলেন, "উক্ত ঘটনার পর রামগ্রাম

* (ক) অল্লকপ্প (খ) বেথ দ্বীপ, (গ) পাভা (ঘ) বৈশালী, (ঙ) কপিল বস্তু, (চ) কুশী নগর, (ছ) রামগ্রাম।]

† ফাহিয়ানের এই কথাটি বিবেচনা করিবার যোগ্য। তিনি যে তিনটি স্থান দর্শন করিয়াছিলেন তাহারা বৌদ্ধ সমাজে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মুসলমানদিগের মক্কা, মদিনা এবং হিন্দুদিগের মধ্যে বারানসী ও প্রয়াগ যে স্থান ভুক্ত বৌদ্ধদিগের ভিতর কপিল বস্তু ও কুশী নগর সেই স্থান অধিকার করিয়া আছে। বৌদ্ধগণ স্তূপ নির্ম্মাণ কার্য্যে যে কি প্রকার অনুরক্ত তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা যে তাঁহারা ভারতের আর সর্ব্বত্র স্তূপ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কেবল মাত্র তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুই প্রসিদ্ধ স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই দুর্জ্ঞেয় প্রশ্নের মীমাংসা কি? অনেকে বলিতে পারেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন ভারত হইতে তাড়িত হয়, তখন হিন্দুগণ উহার উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন। কুশী নগর ও কপিলবস্তু বৌদ্ধগণের প্রিয়তম স্থান বলিয়া অত্যাচারের মাত্রা তথায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, কথাটা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ফাহিয়ান যখন ভারতে উপনীত হয়েন, তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কুশীনগর, কপিলবস্তু, বৈশালী প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ নগর সকল এ প্রকার নির্ম্মম ভাবে বিনষ্ট হইয়াছিল যে ফাহিয়ানকে উহাদের চিনিয়া লইবার জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

* Legge, Travels of Fa hien, 70 ; Beal, Records I, Intr., 51.

ক্রমে ক্রমে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু ভগবানের উপাসনা এক দিনের জন্যও বন্ধ হয় নাই। প্রত্যেক দিন প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে এক হস্তীযুথ নানাপ্রকার পুষ্প ও গন্ধোদকসহ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া বিধিমতে ভগবানের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিত।"

এইবার আমরা প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষের মতামত উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে, বুদ্ধ ঘোষ খ্রীঃ ৪৭০-৯০ সিংহলাধিপতি মহারাজ মহানামের নিকট অবস্থিতি করিতেন। ইহাঁর মতে মহারাজা অশোক শুশুনাগের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। অশোককে তিনি কখনও 'ধর্ম্মাশোক' এবং কখনও বা 'মহারাজ অশোক ধর্ম্ম' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি বলেন, অশোক ভগবান অমিতাভের তিরোভাবের ২১৮ বৎসর পর পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আধুনিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমূহে অশোককে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে 'চণ্ডাশোক' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রাচীন লেখক এ সম্বন্ধে কি জন্য যে একবারে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই তাহা ভাবিবার কথা। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ Vincent Smith বলেন, "এই 'চণ্ডাশোক' কাহিনীর কোনও মূল্য নাই। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা স্বীয় ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রচার করিবার উদ্দেশে এই উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছেন। বুদ্ধ ঘোষ একজন প্রাচীন বৌদ্ধ লেখক। তিনি যখন এ সম্বন্ধে একবারে নীরব, তখন আমাদের এই ধারণা নিতান্ত অসম্ভব বলা যায় না।" আমাদের বিশ্বাস, বৌদ্ধ সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে এই কাহিনীর মূল নির্ণয় করা অসম্ভব হইবে না। এই স্থানে আর একটী আবশ্যকীয় কথার উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। বুদ্ধ ঘোষ অশোকের 'ধর্ম্মাশোক' নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কি জন্য যে তিনি ঐ উপাধিলাভ করেন সে সম্বন্ধে তিনি একবারে নীরব। অশোক যে সমগ্র জম্বুদ্বীপে ৮৪০০০ নগর ও উক্ত সংখ্যক বিহার সংস্থাপন করেন, তাহা বুদ্ধ ঘোষও উল্লেখ করিয়াছেন। *

সিংহলাধিপতি মহারাজ তিস্পের ভগবানের ভস্মাবশেষ লাভ করিবার জন্য স্বীয় গুরুকে মহারাজ অশোকের নিকট প্রেরণ করিবার কাহিনী আমরা এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাবে বর্ণনা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে বুদ্ধ ঘোষের কাহিনী আমরা নিম্নে সংক্ষেপে প্রদান করিলাম।

"সুমন (তিস্পের গুরু) সিংহল হইতে ব্যোমপথে পাটলিপুত্রে আগমন করিলেন। মহারাজ অশোক তাঁহার প্রার্থনায় নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহার ভিক্ষা পাত্র তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন, এবং উহা সুগন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা প্রথমে পরিষ্কৃত করিয়া উহার মধ্যে ভগবানের ভস্মাবশেষ রক্ষা করিলেন। তাহার পর (বহুমূল্য শুক্তিকার ন্যায় ঐ ভস্মাবশেষ পূর্ণ) ভিক্ষাপাত্র সুমনকে প্রত্যর্পণ করিলেন। †

"ইহার পর সুমন দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ভগবানের একটি দন্ত ও দক্ষিণ গ্রীবাস্থি লাভ করিলেন। তখন তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে ব্যোমপথে চৈত্যগিরির উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে সিংহল রাজের প্রধান অমাত্য মহেন্দ্র তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। ইহার পর সকলে উক্ত দক্ষিণ গ্রীবাস্থি সমভিব্যাহারে মহানগরন নামক উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে মহারাজ তিস্প তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। মহারাজ প্রথমে

* আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি যে, মহারাজ অশোক ৮৪০০০ 'স্তূপ' স্থাপন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ঘোষ কিন্তু 'স্তূপ' শব্দের স্থানে 'বিহার' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব।

† মহাবংশ মতে ঐ ভিক্ষাপাত্র সুমন ভগবান অমিতাভের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ঘোষ কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও কথা উল্লেখ করেন নাই।

গ্রীবাস্থির সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দেহ যুক্ত ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার রাজছত্র উহার সম্মুখে স্বতঃই অবনত হইয়া পড়িল, তখন তিনি একেবারে নিঃসন্দেহ হইলেন। ইহার পর গ্রীবাস্থি লইয়া তাঁহারা সকলে সহরের পূর্ব্ব তোরণ পথে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ পথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং এক পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া উহাকে রক্ষা করিলেন। তৎপরে তাহার উপর এক সুবৃহৎ স্তূপ নির্ম্মিত হইল।"

মহারাজ অশোক যে প্রকারে ভগবানের ভস্মরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা বুদ্ধঘোষ এই প্রকারে করিয়াছেন :—

"মহারাজ অজাতশত্রু ভগবানের তিরোধানের সংবাদে প্রথমে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন তাহার পর তাঁহার চিতাভস্ম গ্রহণ করিবার জন্য কুশীনগরে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতের প্রতি আদেশ রহিল তিনি যেন সঙ্গে এক বৃহৎ বাহিনী লইয়া গমন করেন। যদি কেহ ভস্মদানে অসম্মত হয় তবে বল প্রকাশে যেন তাহা গ্রহণ করা হয়। এইরূপে আরও ছয় স্থান হইতে দূত সকল সৈন্যাদি সহ উপস্থিত হইয়া কুশীনগর বেষ্টন করিয়া রহিল।

কুশীনগরবাসী মল্লেরা কিন্তু ঐ পবিত্র ভস্ম হস্তান্তর করিতে অসম্মত হইল। কাহার বলে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা উপরোক্ত সপ্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছিলেন? বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষকে পূজা করিবার জন্য সমস্ত দেবতা কুশীনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয় ইহাঁরা কুশীনগরবাসীদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, অবশেষে ব্রাহ্মণ দ্রোণ এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। *

ইহার পর সকলে যখন ঐ পবিত্র ভস্মের চতুর্দ্দিকে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁহারা সকলে বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ দ্রোণ সকলকে শোকাভিভূত দেখিয়া ভগবানের একটি দক্ষিণ দন্ত অপহরণ করিয়া স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত করিলেন। তাহার পর তিনি ভস্মাবশেষকে যথাযথ ভাবে বিভক্ত করিয়া দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দ্রোণের ঐ চৌর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তিনি জানিতেন যে দরিদ্র দ্রোণের পক্ষে ঐ বহুমূল্য দন্তের যথাযোগ্য সমাদর করা একবারে অসম্ভব। এই জন্য তিনি ঐ দন্ত দ্রোণের অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়া অমরাবতীতে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় 'চূড়ামণি চৈত্যে' উহা রক্ষা করিলেন।

রাজগৃহ হইতে কুশীনগরের দূরত্ব পঞ্চবিংশতি যোজন। † মহারাজ অজাত শত্রু আদেশ দিলেন যে উক্ত ২৫ যোজন ব্যাপী ব্যবধানের মধ্যে অষ্ট উষভ (প্রায় ৭০ গজ) প্রশস্ত এক রাজপথ নির্ম্মিত হইবে। এই সুপ্রশস্ত পথের উপর দিয়া ভগবানের ভস্ম অতি সমারোহের সহিত রাজগৃহে আনীত হইল। কথিত আছে, কুশীনগরবাসী মল্লেরা ভগবানের ভস্ম যে প্রকার সার্ব্বভৌম সম্রাটের ন্যায় মুকুট বন্ধন চৈত্যে লইয়া গিয়াছিলেন, রাজগৃহাধিপও ঠিক সেই প্রকার আড়ম্বরের সহিত ভগবানের ভস্মাবশিষ্ট কুশীনগর হইতে রাজগৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন। উহার সহিত এত অধিক লোক গমন করিয়াছিল যে তাহারা প্রায় ৫০০ যোজন পরিমিত ভূমি অধিকার করিয়াছিল। পথিমধ্যে তাহারা যে যে স্থানে সুবর্ণ বর্ণ বিশিষ্ট পুষ্প দেখিতে পাইত সে সেস্থানে তাহারা যাত্রা স্থগিত রাখিয়া উৎসবে মগ্ন হইত। এত ধীর গতিতে উহা আনীত হইতেছিল যে কুশীনগর হইতে রাজগৃহে উপস্থিত হইতে

* এই বিবাদ নিষ্পত্তি কাহিনী আমরা প্রথম প্রস্তাবে বর্ণনা করিয়াছি। এই স্থানে মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রের সহিত বুদ্ধঘোষের বর্ণনার বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই।

† এই দূরত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। বুদ্ধঘোষের যে পুস্তক হইতে আমরা এই সকল কাহিনী সংগ্রহ করিতেছি তাহার নাম 'সুমঙ্গল বিলাসিনী'। এই পুস্তক সিংহলী ও ব্রহ্মভাষায় বিদ্যমান আছে। উভয় দেশীয় পুস্তকেই আমরা এই দূরত্ব ২৫ যোজন দেখিতে পাই। এই বর্ণনা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রাচীন কুশীনগর আধুনিক ছাপরার ৩২ মাইল, উত্তর পশ্চিমে যে অবস্থিত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সাত বৎসর সাত মাস ও সাত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

স্তূপ স্থাপিত হইবার পর অজাতশত্রুর ইষ্টগুরু মহাকশ্যপ ধ্যানযোগে অবগত হইলেন যে ভগবানের সমস্ত ভস্মাবশেষ একস্থানে স্থাপিত না হইলে শীঘ্রই কোনও অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। রাজগৃহাধিপতি এই সংবাদ শ্রবণে নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং উহা সমস্ত একত্র করিবার জন্য গুরুকে অনুরোধ করিলেন। তদনুযায়ী তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সকলেই ঐ ভস্ম তাঁহাকে অর্পণ করিলেন, কেবল রামগ্রামের নাগেরা উহা প্রদান করিলেন না।

ইহার পর মহাকশ্যপ ঐ সকল ভস্মাবশেষ হইতে ইষ্টক প্রস্তুত করাইলেন। কেহ যাহাতে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি জনসমাজে প্রচার করিলেন যে তিনি ভগবানের আশীজন প্রধান শিষ্যের জন্য স্মরণ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

ইহার পর তিনি আটটি বাক্স ও আটটি চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত স্তূপ নির্ম্মাণ করাইলেন। ঐ ভস্ম তিনি একটি বাক্সের মধ্যে রক্ষা করিয়া ঐ বাক্স আর একটি বাক্সের মধ্যে রাখিলেন। এই রূপে বাক্সের মধ্যে বাক্স রাখিতে রাখিতে অবশেষে সপ্তম বাক্সটি অষ্টম বাক্সের মধ্যে রক্ষা করিলেন। তাহার পর অষ্টম বাক্সটি চন্দন কাষ্ঠের একটি স্তম্ভের মধ্যে স্থাপন করিলেন। উপরোক্ত প্রকারে একটির মধ্যে আর একটি রক্ষা করিতে করিতে সপ্তমটি অষ্টমের মধ্যে স্থাপিত করিলেন। এই রূপে উহা আবার আটটি হস্তী দন্ত নির্ম্মিত বাক্সের মধ্যে রক্ষিত হইল। ঐ দন্ত নির্ম্মিত বাক্স সকল আটটি অষ্টধাতু নির্ম্মিত বাক্সের ভিতর রক্ষিত হইল। কথিত আছে এইরূপে উহারা আবার স্বর্ণ নির্ম্মিত বাক্সের মধ্যে ও স্বর্ণ বাক্স ও রৌপ্য বাক্সের মধ্যে ও রৌপ্য বাক্স হীরক নির্ম্মিত বাক্সের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ শেষ হীরণ্ময় বাক্সের উপর তিনি একটি কাচনির্ম্মিত স্তূপ নির্ম্মাণ করাইলেন। ঐ স্তূপের উপর অষ্টধাতু বিনির্ম্মিত এক গৃহ প্রস্তুত হইল। ইহার উপর ক্রমান্বয়ে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ভবন নির্ম্মিত হইল।

তৎপরে মহারাজ অজাতশত্রু ৫৫০ জাতকের (বুদ্ধদেবের পূর্ব্বতন অবতার) স্বর্ণনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইলেন। তাহার পর শুদ্ধোদন মহামায়া ও সমসাময়িক সপ্ত মহাপুরুষের মূর্ত্তিও সুবর্ণদ্বারা নির্ম্মিত হইল। * ইহার পর ৫০০ সলিলপূর্ণ স্বর্ণ ও ৫০০ সলিলপূর্ণ রৌপ্য কলস, ৫০০ ধ্বজা, ৫০০ স্বর্ণ ও ৫০০ রৌপ্য প্রদীপ স্থাপিত করিলেন।

রাজগুরু মহাকশ্যপ ইচ্ছা করিলেন যে, স্তূপের উপর রক্ষিত পুষ্প সকল যেন কখনও শুষ্ক না হয় ও প্রদীপ সকল যেন কখনও নির্ব্বাপিত না হয়। দেবতারা তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তাহার পর একখানি সুবর্ণ ফলকের উপর তিনি এই কথাগুলি মুদ্রিত করাইয়া দিলেন। "ভবিষ্যতে অশোক নামধেয় এক সার্ব্বভৌম নরপতি জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক নৃপতি হইবেন। তিনি এই ভস্মাবশেষকে জম্বুদ্বীপের চতুর্দ্দিকে স্থাপিত করাইবেন।"

ইহার পর দেবরাজ ইন্দ্র দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে আদেশ দিলেন, "ভগবানের এই পবিত্র ভস্মকে বিশেষ সাবধানের সহিত রক্ষা কর।" বিশ্বকর্ম্মা তদনুযায়ী ঐ ভস্মের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া এক ঘূর্ণায়মান চক্র স্থাপিত করিলেন। ঐ চক্রের চারিদিকে অসিধারী বীর পুরুষ সকল অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদা ঐ ভস্মকে রক্ষা করিতে লাগিল।

এই ঘটনার অনেক দিন পরে মহারাজ অজাতশত্রুর বংশে অশোক জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি অবিলম্বে সার্ব্বভৌম সম্রাট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ভগবানের নাম জগতে প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ৮৪০০০ বিহার নির্ম্মাণ করাইলেন।

* সমসাময়িক সপ্ত মহাপুরুষ—the Seven who were born all at the same time. ইঁহাদের নাম :—[১] শেষ বুদ্ধদেব। [২] তাঁহার পত্নী ও তাঁহার পুত্র রাহুলের জননী। [৩] রাজমন্ত্রী ছন্ন। [৪] রাজমন্ত্রী কালুদাই। [৫] কণ্ঠক অশ্বাধিপতি। [৬] মহাবোধি বৃক্ষ। [৭] বুদ্ধদেবের ব্যবহৃত পানপাত্র।

তাহার পর তিনি ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি প্রকারে তিনি ভগবানের ভস্মাবশেষ প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমরা জ্ঞাত আছি, জম্বুদ্বীপের কোনও স্থানে ভগবানের ভস্ম রক্ষিত আছে। কিন্তু তাহা যে কোথায় আছে তাহা আমরা সবিশেষ অবগত নহি।" ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি রাজগৃহের চৈত্য ভগ্ন করাইলেন। কিন্তু তথায় প্রার্থিত বস্তু না পাইয়া ঐ চৈত্য পুনঃ নির্ম্মাণ করাইয়া, তিনি বৈশালী গমন করিলেন। তথায়ও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তিনি কপিলবস্তু গমন করিলেন। ইহার পর তিনি রামগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় নাগেরা তাঁহাকে চৈত্য ভগ্ন করিতে না দেওয়ায় তিনি অল্লকল্প, পাভকা এবং বেথ দ্বীপে গমন করিলেন। সর্ব্বত্র বিফল প্রযত্ন হইয়া তিনি রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় তিনি স্বপ্নে প্রকৃত স্থানের কথা অবগত হইয়া অজাতশত্রু নির্ম্মিত চৈত্য ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন এবং অশেষবিধ যত্ন ও চেষ্টার পর ঐ ভস্ম প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর তিনি পূর্ব্বোক্ত ৮৪০০০ বিহারে ৮৪০০০ চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

আলপাকা বৃত্তান্ত।

যে আলপাকা কাপড়ের কোট পরিয়া আমরা বাবু সাজিয়া থাকি, তাহার উৎপত্তিটা বেশ একটু রহস্যজনক।

পূর্ব্বে একমাত্র পেরু দেশের আলপাকা ছাগলের রোমই অন্য সকল ছাগ রোম অপেক্ষা দীর্ঘ কোমল ও চিক্কণ হইত। আলপাকা ছাগ রোমের এই সকল গুণ দেখিয়া পশ্চিম বণিক সম্প্রদায় এ দ্রব্যটাকে ব্যবহারে আনিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আলপাকা রোমের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪২ ইঞ্চি পরিমাণ হইত এবং সেই কারণে তখনকার প্রচলিত পশম বুনিবার কলে সে গুলাকে বুনিয়া উঠিবার সুবিধা হইত না, তাঁতে চড়াইয়া বুনিবার সময় রোমগুলি জট পাকাইয়া, নয় ত ছিঁড়িয়া যাইত। কাজেই পেরু হইতে যে সকল আলপাকা রোমের গাঁট বিলাতের লিভারপুল কারখানা সকলে চালান আসিয়াছিল, সে গুলি অব্যবহার্য্য বলিয়া অমনি বস্তাবন্দি হইয়া পড়িয়া রহিল। ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে টাইটাস্ সল্ট লিড্‌সের এক পশম ব্যবসায়ীর পুত্র দীর্ঘ রোম বুনিবার এক নূতন কল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি বিলাতের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডিকিন্স লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কোন এক সময়ে লিভারপুল্ বন্দরে দেখিতে অতি কদর্য্য, দীর্ঘ দীর্ঘ রোমপূর্ণ বিকটাকার কয়েকটা বস্তা চালান আসিয়াছিল। এ বস্তা গুলা কবে আসিল কি কারণেই বা আসিল, কোন জাহাজই বা এই কদাকার বস্তাগুলাকে সমুদ্র পার হইতে বহিয়া আনিয়াছিল, তাহা বন্দরের প্রাচীনতম কুলি সর্দ্দারেরও ঠিক জানা ছিল না। একটা গুজব ছিল যে, সে গুলা এক সময়ে আমেরিকা হইতে C. W. and F. Foozle & Co.র নামে চালান আসিয়াছিল, কিন্তু গুজবটাও সকলে বিশ্বাস করিত না। তবে এটা সকলেই স্বীকার করিত যে, এই তিনশ কয়েকটা কদাকার পশমের গাঁট সহরের একটা মহা উৎপাত। কেবল বন্দরের ইন্দুর মণ্ডলী এই চালানটাকে ইন্দুর বংশের এই সহরে আগমন অবধি ইস্তনাগাদের মধ্যে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও লাভজনক ব্যাপার বলিয়া ঘোষণা করিতে ছাড়ে নাই। যাহা হউক, এই বস্তাগুলির দিনে দিনে পচিয়া ধূলিসাৎ অথবা ইন্দুর সংসারে টুক্‌রা হইয়া বিশেষ কাজে

গায়া ছাড়া আর কোন গাত ছিল না। পাট পশমের দালাল সেগুলার দিকে চাহিয়াও দেখত না। সওদাগর সে গুলার কথাই কাণে তুলিত না। গাইকের সেগুলা যে কি পদার্থ তাহাই চিনিত না। কারবারি লোক সে গুলার নাম শুনিলে ঘাড় নাড়িত। ফুজুল্ কোম্পানীর কর্ত্তারা নিরুপায় হইয়া হেড্ কেরাণীকে বিল্‌লেডিং মিলাইয়া বস্তাগুলা পুনরায় দক্ষিণ আমেরিকায় ফেরৎ দিবার বন্দোবস্ত করিতে হুকুম দিলেন।

একদিন কোন্ মাসের কোন্ সপ্তাহের কোন্ দিনে তাহার ঠিক নাই, যদিও এর চেয়ে ঢের ছোট খাটো ঘটনার দিন, এমন কি মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে—একজন সামান্য গোছের কারবারি লোক ফুজুল্ কোম্পানির গুদাম ঘরের ভিতরে ধীরে ধীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। লোকটির চেহারা দেখিলেই বুদ্ধিমান ও ধীর প্রকৃতির লোক বলিয়া চেনা যায়। গাঁঠের পর গাঁঠ, দেখিতে অতি কদর্য্য লম্বা লম্বা আলপাকা রোম কতকটা লোকটির চোখে পড়িল। হয়তো কোন সৌখিন ইন্দুর গেহিনীর এই কদর্য্য লোম শয্যার কঠিন স্পর্শ অসহ্য হওয়াতে তিনি কর্ত্তাকে বলিয়া ঘর হইতে এগুলা টানমারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুবর সেই রোম একমুঠা উঠাইয়া সেটুকু নাড়িয়া চাড়িয়া, নাকে ধরিয়া, হাতে ঘসিয়া, টিপিয়া, টানিয়া টুনিয়া কেবল চাখিয়া দেখিতে বাকি রাখিয়া অভিনিবেশ সহকারে পদার্থটার পরীক্ষা লইতে লাগিলেন। যদি চাখিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইত তবে হয়তো তিনি তাহাতেও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি সেই কদর্য্য লোমগুলাকে কখন আলোয় ধরিয়া, কখন আলো হইতে দূরে রাখিয়া পাকাইয়া জড়াইয়া, মহা শত্রুর মত সেটার উপর নানা অত্যাচার করিয়া শেষে নিজের পকেটে পুরিয়া ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। হয়তো বাড়ী গিয়া পদার্থটার উপরে আরও কিছু অত্যাচারের মৎলব ছিল, কে জানে। এই এতকালের গুদামে ঠাসা অপদার্থ পদার্থটা ঘরে আনিয়া তিনি দিনকতক ধরিয়া না আহার, না নিদ্রা, কি করিতে লাগিলেন তাহা আমরা বলিতে পারিনা কিন্তু কিছুদিন পরেই সেই সাদাসিধে গোছের মানুষটি ফুজুল্ কোম্পানির আফিসে দেখা দিলেন এবং বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলেন। এই সাদা লোকটি আঠার আনা পাউণ্ডে যখন সেই তিন শত গাঁট আলপাকা রোম কিনিয়া লইতে চাহিলেন, তখন ফুজুল্ আফিসের বড় সাহেব একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তাঁর বাক্‌রোধ হইবার জোগাড়। মনে হইল এলোকটা নিশ্চয়ই দুষ্ট, নয়তো পাগলা গারদের পলাতক; তিনি পুলিস ডাকিবেন কি না সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, শেষে এই দামে গাঁঠগুলা ছাড়িয়া দেওয়াই স্থির হইল।

সে দিন লিভারপুলের অন্ধকার গলির মোড়ে ফুজুল্ কোম্পানিতে একটা মহা ব্যাপার বাধিয়া গেল। কোম্পানীর কেরাণী হইতে টিক্‌টিকিটি পর্য্যন্ত উঁকি মারিয়া সেই দক্ষিণ আমেরিকার চালান ক্রেতাকে একবার দেখিয়া লইল। আফিসের হেড্ ক্লার্ক লোকটার সঙ্গে কোন ছুতায় একবার কথা কহিয়া, কেশিয়ার একবার লোকটার কোটের কাপড় ছুঁইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল, বুড়ো বুক্‌কিপার চশমা লাগাইয়া সেই লোকটার টুপি ও দস্তানা জোড়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। আফিসের দরওয়ানটা পর্য্যন্ত লোকটির দিকে চাহিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিল। ক্রেতা বিদায় হইলে ফুজুল্ কোম্পানি দিনটাকে স্মরণীয় করিতে একদিনের জন্য আফিস বন্ধ করিলেন।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে সল্ট সাহেব এই আলপাকা পশমের গাঁট ক্রয় করেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে, একমাত্র সল্ট সাহেবের কারখানায় আলপাকা উলের আমদানি ২,০০০,০০০ পাউণ্ডসের ও অধিক হইল; ইহাতে তাঁহার কারবার এমন ফলাও হইয়া উঠিল যে ঐ বৎসরেই তিনি ব্রেডফোর্ডের নিকটে সল্টেয়ার মিল নামে প্রসিদ্ধ কারখানা ও পাঁচ হাজার কারিগর থাকিবার জন্য এক সহর স্থাপন করিতে সমর্থ

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল।

হইলেন। আলপাকার থান সুন্দরীগণের অঙ্গে, ছাতার আবরণে ও আরও কত কি ব্যবহারে আসিতে লাগিল। ক্রমশঃ পেরুর আলপাকা বাণিজ্য এত লাভজনক হইয়া উঠিল যে, অষ্ট্রেলিয়াবাসী সওদাগরগণ সেদিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে চার্লস্ লেজার সাহেব ২৭৬টি আলপাকা ছাগল সিড্‌নী দেশে লইয়া গেলেন ও তাহাদের পশম ইংলণ্ডে চালান দিতে লাগিলেন। যে আলপাকা একদিন বণিকের বিপনিতে উৎপাত স্বরূপ হইয়াছিল, আজ তাহা স্বর্ণখনি হইয়াছে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার মা।

[('Home Sweet Home' সুর)

(১)

দাস হয়ে রব আমি মুক্তি না চাই,
যেন জনমে জনমে তোরে মা পাই ;
গৌরব—গরব যাক্ দূরে যাক্,
তুই কাছে ডাক্, শুধু তুই কোলে রাখ্!
মা, আমার—আমার মা!
তোর নাই তুলনা, তোর নাই উপমা।

(২)

যাক্ আঁধারে নিভে ও আলোক লেশ,
হোক্ পাথার ঘোরে এ জীবন শেষ ;
চাই না সে সুখ, যাতে তোর নাই সুখ,
আমার সে দুখই ভালো, যাতে যায় তোর দুখ।
মা, আমার—আমার মা!
তোর নাই তুলনা, তোর নাই উপমা।

(৩)

কে চায় সে প্রাসাদ যাহে নাই তোর ঠাঁই,
আমার কুটীরই ভালো, যদি তোরে সেথা পাই ;
কে চায় সে প্রাসাদ যাহে কিছু নাই তোর,
দে চরণের ধূল, সে যে মাথার মণি মোর।
মা, আমার—আমার মা!
তোর নাই তুলনা, তোর নাই উপমা।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

কবি ও বৈজ্ঞানিক।

মানুষের মনে দয়া, মায়া, ভক্তি, প্রণয়, স্বদেশ-বাৎসল্য ও স্নেহ প্রভৃতি কতকগুলি মনোবৃত্তি আছে। আবার পর্য্যবেক্ষণ, একীকরণ, বিশ্লেষণ ও সত্য নির্ণয় প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী কতকগুলি মানসিক ক্ষমতাও আছে। কাব্যের সহিত মনোবৃত্তিগণের ঘনিষ্ট সম্পর্ক, আর বিজ্ঞানের সহিত মানসিক ক্ষমতা নিচয়ের নিকট সম্পর্ক। দয়া মায়া প্রভৃতি অন্তর্লীনাবস্থায় সর্ব্বদাই আমাদিগের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। ঘটনা বশে সময়ে সময়ে উহার কোনও কোনটি প্রবল হইয়া উঠে। কাব্য, সুপ্ত মনোবৃত্তি জাগরিত করিবার এক প্রধান সাধন। যাহা পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠকের হৃদয় দয়ায় ভরপুর হইয়া উঠে, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি, স্বদেশ-বাৎসল্য বা স্নেহের বন্যা বহিতে থাকে, তাহাই কাব্য। পক্ষান্তরে যাহা পাঠ করিতে পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচালনা করিতে হয়, মনে মনে পর্য্যবেক্ষিত বিষয়গুলি একত্র করিয়া তাহাদিগের মধ্যে তুলনা করিয়া শ্রেণী বিভাগ করিতে হয় এবং এইরূপে সত্য নির্দ্ধারণের উপযোগী অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার চর্চ্চা হইয়া থাকে তাহাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান

মনোবৃত্তির ধার না ধারিয়া জ্ঞানাহরণ লইয়াই ব্যস্ত, পাঠকের হৃদয়ে জ্ঞান-পীযূষধারা সিঞ্চন এবং তদুপযোগী ক্ষমতা নিচয়ের বিকাশ সাধনই বিজ্ঞানের কাজ। আর, কাব্য জ্ঞানাহরণের দিকে লক্ষ্য করে না, মনোবৃত্তি নিচয়ের তুষ্টি ও পুষ্টি সাধনই কাব্যের কাজ। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিতে কাব্য ও বিজ্ঞানে যথেষ্ট বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কবি কল্পনা রাজ্যের জীব, আর বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ জগতের জীব। যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, যাহার একটা বাস্তব সত্তা আছে, বৈজ্ঞানিকের তাহাই উপকরণ, আর যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, যাহার কোনও বাস্তব সত্তা নাই, যাহা কবির স্বকপোল কল্পিত কল্পনা মাত্র তাহাই কবির উপাদান। কিন্তু এ কথাটি কি সত্য? প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিক যাহাকে কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, তাহাকেও পদে পদেই উক্ত কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। নিউটন যখন বৃক্ষ হইতে একটি ফল পড়িতে দেখিলেন, তখন কি তিনি কেবল ফলটি, গাছটি এবং ভূপৃষ্ঠ মাত্রই অবলোকন করিয়াছিলেন? কেবল তাহাই দেখিলে তিনি মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা হইতে পারিতেন না। তাঁহার মানস-ফলকে মাধ্যাকর্ষণের একটি জীবন্ত প্রতিকৃতি অবশ্যই প্রতিফলিত হইয়াছিল। তৎপর বহুল প্রয়াস সহকারে উহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোনও নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে আবিষ্কর্ত্তার মনে কি তাহার একটা কল্পনা খেলে না? প্রত্যুত যেমন একখানা চিত্র দেখিয়া আর একখানা চিত্র অঙ্কিত করা যায়, তেমনই আবিষ্কর্ত্তা তাঁহার কল্পনা রাজ্যের চিত্র অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করিয়াই সেই নমুনায় বাহেন্দ্রিয় গ্রাহ্য উপাদান সমূহের সমবায়ে একটী যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এঞ্জিনিয়ার কোনও সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে মনে মনে তাহার একটা চিত্র আঁকিয়া লন, পরে সেই মানস-চিত্রের অনুরূপ করিয়া প্রকৃত বাটী প্রস্তুত করেন। তারপর বিজ্ঞান রাজ্যে Theory বলিয়া একটা কথা আছে; এক একটি Theory দিয়া কত কত প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা হয়। ঐ Theory গুলি কি? ঐ গুলি কি অবিমিশ্র কল্পনা নয়? বাস্তবিক, কবির ন্যায় বৈজ্ঞানিকেরও কল্পনা ছাড়া অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই।

তারপর আর একটি প্রবাদ এই যে, বৈজ্ঞানিকের পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কবির উক্ত ক্ষমতা হইতে অনেক উচ্চ শ্রেণীর। যখনই কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হয়, বৈজ্ঞানিক তাঁহার চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতিকে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করিয়া বস্তুটিকে তন্ন তন্ন করিয়া যাহা কিছু দেখিবার শুনিবার থাকে দেখিয়া শুনিয়া লন্ এবং ঐ সমগ্র দর্শন-শ্রবণাদি-লব্ধজ্ঞান ভবিষ্যতে ব্যবহার করিবার জন্য একত্র করিয়া সযত্নে মনের এককোণে রাখিয়া দেন। পক্ষান্তরে, কবির দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় থাকিলেও তিনি উহাদিগকে বৈজ্ঞানিকের মত খাটাইতে জানেন না। তিনি অতটা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারেন না। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি পথে একটি নূতন বৃক্ষ পতিত হইল, আর অমনি তিনি গাছটির আয়তন, দৈর্ঘ্য, শাখাসমষ্টি ও ও গঠন প্রণালী শিখিয়া লইলেন, গাছের ফল ও পাতার বর্ণ, আকৃতি, গুণাগুণ সমুদয় জানিয়া লইলেন, জ্ঞাত পূর্ব্ব অন্য কোনও বৃক্ষের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে কিনা বাহির করিলেন অথবা বাহির করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিলেন। আর, কবির চক্ষে ও যদি সেই গাছটিই পড়ে তাহা হইলে তাঁহার মনেও এই সব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকিবে বটে কিন্তু তাহা বৈজ্ঞানিকের ধারণার মত তত সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট নয়। অতএব পর্য্যবেক্ষিত বিষয় সম্বন্ধে কবির জ্ঞান, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান হইতে অনেক নীচে পড়িয়া থাকিবে। ইহাই কি সত্য? তবে কি কবি দেখিতে জানেন না?

আমরা বলি কবির জ্ঞান বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান হইতে কখনও নিকৃষ্টতর নহে। কবি ও বৈজ্ঞানিক উভয়েই দেখিতে জানেন। তবে কথা এই, কবি যাহা ভাল করিয়া দেখিয়াছেন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি সেদিকে যায় নাই; আবার বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি যেদিকে বিশেষ

ভাবে পড়িয়াছে, কবি সেদিকে ভাল করিয়া তাকান্ নাই। বৃহদায়তন, বহুদূর প্রসারি শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত বৃক্ষটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই কবি উহার ভিতর এক অপূর্ব্ব উদারতা ও মহত্ত্ব দেখিতে পাইয়াছেন। নীরব নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান বৃক্ষটি দেখিয়াই তিনি তাহার ভিতরে মনোহর গাম্ভীর্য্য, আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করিয়াছেন, বায়ুভরে ঈষদান্দোলিত নবীন পত্রাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি বালক-সুলভ সারল্য ও ক্রীড়াপ্রবণতা দেখিতে পাইয়াছেন, বিটপীর ভিন্ন শাখায় পক্ষিকুলায় দেখিয়াই হিমালয় প্রত্যন্ত প্রদেশস্থ পবিত্র ও শান্তরসাস্পদ ঋষিগণের আশ্রমের কথা তাহার মনে পড়িয়াছে। কবি, বৃক্ষটি দেখিয়া এই সমুদয়ভাবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। গাছের কয়টি পাতা, গাছটি কয় হাত উচ্চ এই সব দেখিবার দিকে তাঁহার মন আদৌ ধায় নাই। তাই বলি, কবিও দেখেন আর বৈজ্ঞানিক ও দেখেন; কবির দৃষ্টি একদিকে আর বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আর একদিকে। এই কথার উপর আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন, বৈজ্ঞানিক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ করিলেন তাহা প্রকৃত সত্য, এবং কবি যাহা দেখিলেন তাহা মিথ্যা, তাহার প্রকৃত সত্তা নাই, ঐরূপ কল্পনা প্রসূত মিথ্যা জ্ঞানের কোনও মূল্য নাই। ইহার উত্তরে বলিতে চাই সত্য মিথ্যা জ্ঞান কিসে ঠিক হইল? যাহা আছে তাহাই সত্য, আর যাহা নাই তাহাই অসত্য বা মিথ্যা। কবি যাহা দেখিলেন তাহা যদি মোটেই না থাকিবে তবে গাছটি দেখিয়াই তাঁহার মনে ঐ সমুদয় ভাবের আবির্ভাব হইল কেমন করিয়া? "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।" যদি বলিতে চাই কেন, আমি বা অন্যে ত তাহা দেখিতে পাই না; যাহা অন্যে আমি বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, তাহার বাস্তব সত্তা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু তাহাও ঠিক নয়। যদি কোথাও সুচারু কারুকার্য্য-খচিত হারমোনিয়াম যন্ত্র সংযোগে সুমধুর গান হইতে থাকে আর সেখানে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে একটি অন্ধ ও একটি বধির উপস্থিত থাকেন, অন্ধ হয়তো নিজের জ্ঞানানুসারে বলিবেন স্থানটি মানব সমাগম শূন্য, স্বয়ং তিনি ব্যতীত সেখানে অন্য কোনও মানব বা কোনও বস্তু নাই, তবে কোথা হইতে যেন এক শ্রুতিমধুর ধ্বনি হইতেছে। আবার বধিরও হয়তো কেবল নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া বলিবেন—স্থানটি সাড়াশব্দহীন, কেবল একটি মনোরম কারুকার্য্যখচিত যন্ত্র ও কতিপয় মানব নিঃশব্দে সেখানে উপবিষ্ট আছেন। এই উভয়ের মধ্যে কাহার কথা সত্য? উভয়ের কথাই কতক সত্য ও কতক মিথ্যা। প্রত্যেকেই যাহা আছে বলিতেছেন তাহাতো আছেই, আবার যাহা নাই বলিতেছেন তাহাও আছে। তবে কথা এই, একজনে যাহা অনুভব করিয়াছেন, অন্যে তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। এই লইয়াই যত গোল। বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিক সাজিয়া কবিকে মিথ্যুক বলা, এই অন্ধও বধিরের ঝগড়ার মত। প্রত্যুত কবি যাহা দেখিয়াছেন তাহাও সত্য, আর বৈজ্ঞানিক যাহা দেখিয়াছেন তাহাও সত্য। এই জগতের প্রত্যেক বস্তুরই দুই প্রকার সত্তা আছে, একটি বাস্তব সত্তা আর একটি ভাবগত সত্তা। প্রথমোক্ত সত্তা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়, আর দ্বিতীয়টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনের ও মনোবৃত্তির বিষয়। যে কোনও দৃষ্টান্ত দ্বারাই কথাটি পরিস্ফুট হইতে পারে। একটি বালক মাঠে খেলিতেছে, এই দৃশ্যটি যখন কাহারও সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন তিনি মনোযোগ প্রদান করিলে কি দেখিতে পাইবেন?

এক ভাবে তাঁহার দেখিবার শুনিবার বিষয় হইবে, বালকের বর্ণ, তাহার বদন মণ্ডল, তাহার নেত্রযুগল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং তাহাদের পরস্পর সমাবেশ, তাহার দেহের কাঠিন্য বা কোমলতা, তাহার শারীরিক শক্তি, তাহার কণ্ঠস্বর ইত্যাদি। তিনি বিচক্ষণ দর্শক হইলে এই সমুদায়ের সমবায়-সম্ভূত একটী প্রতিকৃতি তাঁহার মনে আঁকিয়া লইবেন। হয়তো সেই বালকটীর সহিত দৃষ্টপূর্ব্ব আর একটী বালকের সাদৃশ্যের কথা তাঁহার মনে

পড়িবে। দর্শকের এই সমুদয় জ্ঞানের কারণ বালকটির বাস্তব সত্তা; বহিরিন্দ্রিয়গণের আহৃত জ্ঞানসম্ভারই ইহার উপাদান সামগ্রী।

পক্ষান্তরে ঐ ক্রীড়াশীল বালকই দর্শকের হৃদয়ে আর এক শ্রেণীর ভাব জাগাইয়া দিবে। ভাবুক দর্শক ক্রীড়াসক্ত বালকটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখিতে পাইবেন তাহার স্ফূর্ত্তি, তাহার অদম্য উৎসাহ, তাহার সন্তোষ, তাহার সরলতা, খেলার সাথীগণের সহিত সখ্য, তাহার বুকভরা আশা ইত্যাদি। বহিরিন্দ্রিয়গণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে এই সমুদয় জ্ঞান প্রদান করে নাই। তাঁহার মন ও মনোবৃত্তি নিচয় তাঁহাকে এই সমুদয় জ্ঞান প্রদান করিয়াছে। তাই দর্শকের মনোমন্দিরের এক প্রান্তে তিনি যেমন বহিরিন্দ্রিয়গণের আহৃত জ্ঞান সম্ভার সাজাইয়া একটী প্রতিকৃতি গড়িয়া রাখেন, তেমনি মন ও মনোবৃত্তি নিচয়ের সংগৃহীত জ্ঞানরাশি তাঁহার হৃদয়ের এক প্রান্তে এক অভিনব চিত্র উৎপাদন করে। এতদুভয়ের প্রথম চিত্র বৈজ্ঞানিকের বিষয়, আর দ্বিতীয়টি কবির বিষয়। কাজ সহজে করিবার জন্য কার্য্যবিভাগ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য একত্র করিলে কার্য্যটি পূর্ণাঙ্গ হয়। কবি ও বৈজ্ঞানিক ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা মাত্র। উভয়ের কার্য্য একত্র হইয়া একটি বৃত্তের কার্য্যের অঙ্গ পুষ্টি করিতেছে।

আপাততঃ দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক অলঙ্কারের ধার ধারেন না, কিন্তু কবি অলঙ্কার লইয়া বড়ই ব্যস্ত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয়েই বিভিন্ন নামে উহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অলঙ্কারের মূলভিত্তি তুলনা অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দর্শন। কবি সুন্দর মুখের সহিত পূর্ণচন্দ্রের উপমা দেন। ইহার অর্থ এই সুন্দর মুখ দর্শন করিলে সহৃদয় পাঠকের মনে যে কতকগুলি ভাবের উদয় হয়, আর পূর্ণচন্দ্রের দিকে চাহিলে তাঁহার মনে যে ভাবাবলীর আবির্ভাব হয়, এই উভয় ভাবরাজির মধ্যে কতকগুলি বিষয় সাধারণ আছে। তাই ঐ সাধারণ ভাবগুলির দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে কবির চক্ষে সুন্দর মুখ ও পূর্ণচন্দ্র এক বলিয়া প্রতিভাত হয়। সেই জন্যই কবি স্বচ্ছ সরোবরে উদার ও বিমল মনের ছায়া দেখিতে পান, প্রভাত তপনে বালকের উৎসাহ দেখেন, জন্মভূমিতে জননী দেখিতে পান, সুস্নিগ্ধ সমীরণ-হিল্লোলে মাতৃস্নেহ অনুভব করেন। আবার বৈজ্ঞানিকও অলঙ্কারের ভিত্তিভূমি সাদৃশ্য লইয়াই ব্যস্ত। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্ভূত জ্ঞান বিশ্লেষণ করিয়া যখনই তিনি কতকগুলি সাধারণ গুণ দেখিতে পান তখনই তিনি তাহাদিগকে একসূত্রে গাঁথিয়া ফেলেন। আমগাছে, কাঁটা গাছে, বেলগাছে কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে, তাই বৈজ্ঞানিক উহাদিগকে এক নাম দিয়া একত্র করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন—সকলকেই বলিতেছেন গাছ। ভিন্ন ভিন্ন আম গাছে আরও কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে, তাই তাহাদের সাধারণ নাম আম গাছ। কবির উপমাও যাহা, বৈজ্ঞানিকের এই নামকরণও তাহাই; উভয়েরই মূলভিত্তি সাদৃশ্য দর্শন। কবি ভাবরাজ্যের জীব—ভাবের সাদৃশ্য দেখেন, বাস্তব সত্তায় বিশেষ বৈলক্ষণ্য থাকিলেও তিনি উভয়কে একই দেখেন, আর বৈজ্ঞানিক, বাস্তব সত্তায় যে সাদৃশ্য, কেবল তাহা দেখিলেই উভয় পদার্থকে এক বলিয়া ফেলেন, ভাবের প্রতি লক্ষ্য করেন না, এই মাত্র প্রভেদ।

বৈজ্ঞানিকের যেমন ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা, কবিরও তেমন। বৈজ্ঞানিকের দর্শনাদি শক্তির ব্যত্যয় ঘটিতে পারে—তিনি দেখা শুনায় ভুল করিতে পারেন—তাহা হইলে তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বও ভুল হইয়া যায়, তাঁহার সিদ্ধান্তের সঙ্গে বাস্তব জগতের ঘটনার অসামঞ্জস্য ঘটে, তাই তাঁহার ভুল সহজেই ধরা পড়ে। দর্শন শক্তি বিকৃত হইলে অনেক সময় লালকে সাদা দেখা যায়, এককে দুই দেখা যায়। এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও ভুল ভ্রান্তি ঘটে। অন্যান্য লোকের চক্ষে যাহা লাল বলিয়া প্রতিভাত হয়, আমি যদি তাহাকে সাদা

দেখি তবেই বলিতে হইবে আমার ভুল হইয়াছে—আমার দর্শন শক্তির কোনও অপচয় সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং আমি যদি এই বিকৃত-দর্শনশক্তি লব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হই, সেই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক। কবির পক্ষেও ঠিক তাহাই। এই জগতের এক এক পদার্থ, স্থান, সময় ও অবস্থা ভেদে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবের উদ্বোধন করে। বিজন-শ্বাপদ-সঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশস্থিতা, খরস্রোতা স্রোতস্বতী, আর সুরম্য বহুজনাকীর্ণ নগরোপকণ্ঠ প্রবাহিতা তটিনী; বিগত সংসারাসক্ত তাপস কুটীর, আর যৌবনৈশ্বর্য্য প্রভুত্ব সম্পন্ন ভোগবাসনা পূর্ণ মানবের বিলাস ভবন; শান্তি-সচ্ছলতা পূর্ণস্বাধীনতা-রসাস্বাদ গ্রাহী মানব সমাজ, আর দৈন্য-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অধীনতা নিগড়ক্লিষ্ট মনুষ্যগণ; কোকিল-কাকলী, আর বজ্রনি র্ঘোষ; পতিপুত্রহীনা হতাদৃতা নিঃসহায়া বিধবা আর ঐশ্বর্য্য সম্পন্না পতি-পুত্রবতী বিলাসময়ী রমণী; হর্ষোৎফুল্ল বালক আর সংসার-ভারগ্রস্ত-কুঞ্চিত ভ্রূ বৃদ্ধ; ইহাদের প্রত্যেকেই দর্শকের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবাবলী জাগাইয়া দেয়। যদি কবির অন্তশ্চক্ষুর দর্শন ক্ষমতার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে, তবে তিনি হয়ত একভাবের বিষয় সম্মুখে পাইয়া অন্যভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন, হয়তো ধান্ ভানিতে শিবের গীত আরম্ভ করিয়া দিবেন। সহৃদয় পাঠক কবির বিষয় ও ভাবের অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়া বিরক্তি বোধ করিবেন, তবেই বুঝিতে হইবে কবির ভুল হইয়াছে। সময়ে সময়ে এই ভুল হয় বলিয়াই সকলে কবি হইতে পারে না এবং কবির সকল লেখাই কাব্য আখ্যা পাইবার যোগ্য হয় না।

এক দিকে যেমন কবি ও বৈজ্ঞানিক উভয়েরই ভুল ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভব, অপর দিকে আবার তাঁহাদিগের অসাধারণ শক্তির বলে আবিষ্কৃত তত্ত্ব সাধারণ মানব সমাজের চক্ষে ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও বাস্তবিক তাহা অভ্রান্ত সত্য। কালক্রমে ও সুযোগ্য পাত্র মিলিলে উহার সত্যমূলকতা জাজ্বল্যমান ভাবে প্রতীয়মান হয়। যাঁহার দৃষ্টিশক্তি প্রবল হয় তিনি বহুদূর হইতে ঠিক করিতে পারেন একটি মানুষ আসিতেছে। কিন্তু যিনি ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন তিনি বড় জোর কুয়াসার মত একটা কিছু দেখেন; কিন্তু উহাকে মানুষ বলিয়া ঠিক করিতে পারেন না। তবে তিনি ঐ মানুষটির অতি নিকটে গেলে অথবা ঐ মানুষটী তাহার অতি নিকটে আসিলে বুঝিতে পারেন, মানুষই বটে। গ্যালিলিও যখন অসাধারণ মানসিক শক্তির বলে বুঝিতে পারিলেন পৃথিবীটা ঘুরিতেছে আর সেই কথা তৎকালিক জনসমাজে প্রচার করিলেন, সে কালের মানব সমাজ তাঁহার সে তত্ত্ব বুঝিতে পারিল না, তাঁহাকে বিশ্বাস করিলনা এবং তাঁহাকে কতই নির্য্যাতন করিল। কিন্তু কালক্রমে যখন মানব সমাজ জ্ঞানানুশীলনে অগ্রসর হইল তখন অল্পে অল্পে তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের যাথার্থ্য অনুভব করিতে লাগিল এবং অল্পে অল্পে সেই তত্ত্ব মানব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল। কাব্য জগতেও মাঝে মাঝে এইরূপ ঘটনা ঘটে। কবির সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি বিষয় বিশেষের সহিত এমন কোনও একটা ভাবের সমন্বয় দেখিতে পান, যে সাধারণের চক্ষে সে সমন্বয় অনুভূত হয় না তাই তাহারা হাত তালি দিয়া কবির নিন্দা করিতে থাকে। কিন্তু কালক্রমে যখন এমন কোনও লোকের আবির্ভাব হয় যে তাহার চক্ষে সে সমন্বয় প্রতিভাত হয় তখন তিনি মুক্ত কণ্ঠে কবির প্রশংসা করিতে থাকেন এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মানব সমাজকে বুঝাইয়া দেন, কোন্ দিক্ দিয়া চাহিলে কবির সত্য অনুভূত হইবে। পরে জন সমাজও তাহা দেখিয়া কৃতার্থম্মন্য হয় এবং কবির জয় গান করিতে থাকে। Milton যখন Paradise Lost লিখিলেন, তখন প্রথম প্রথম মোটেই প্রশংসা লাভ করেন নাই; পরে Addison আবির্ভূত হইয়া যখন Miltonএর ভাবমাধুর্য্য অনুভব করিলেন তখন তিনি লোক সমাজে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, Milton কি এক অপূর্ব্ব গাথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তার পর হইতেই Milton এর আদর হইতে লাগিল এবং কালক্রমে Milton সাহিত্য জগতে এক প্রধান স্থান লাভ করিলেন।

এক্ষণে মোটের উপর বক্তব্য এই যে, কবি ও বৈজ্ঞানিকে আপাততঃ বিরুদ্ধভাব দৃষ্টি গোচর হইলেও তাহা ঠিক নহে ; বরং প্রধান প্রধান বিষয়ে উহাদিগের মধ্যে সৌসাদৃশ্যই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফলতঃ উহারা যেন একই পিতা মাতার দুইটি সন্তান, উহাদের প্রকৃতি ও কার্য্য প্রণালীর মূল সূত্র একই প্রকারের। দুই জনে দুই বিষয়ে নিযুক্ত কিন্তু উভয়ের অনুষ্ঠিত কার্য্য একত্র হইয়া এক মহদুদ্দেশ্যই সাধন করিতেছে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী হার।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

"প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের কি সম্বন্ধ, এই বিষয়ে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। বিষয়টিও গুরুতর। আজ কাল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘাতে তুমুল বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। ইহাতে অচিরে পৃথিবীর কতই পরিবর্ত্তন হইবে।

যদি এই সমস্যার মানে মোটামুটী বুঝিয়া দেখা যায়, তবে তাহা বোধ হয় স্থূলতঃ এই, "নূতন ও পুরাতনের বিবাদ"। ভাল মন্দ বিচারের কোনও কথাই এখন এখানে আনিবার আবশ্যক নাই। অবস্থা বিশেষে যেটি যোগ্যতর সেইটিই ভাল। সেইটিই স্থায়ী হইবে।

তবে এ প্রশ্ন নূতন নয়। "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" এই দুইয়ের সংঘাত আজ কালকার ভাবে নূতন বটে, কিন্তু চিরকালই এই উভয়ের বিবাদ হইয়া আসিতেছে। পাশাপাশি দুই জিনিষের আকর্ষণ ও প্রত্যাকর্ষণের মত সে ক্রিয়া বরাবরই চলিতেছিল। আজ কাল যাতায়াতের ও খবরাখবরের সুবিধায় দ্বন্দ্ব আরও কঠিন ও বহুদূর ব্যাপী হইয়াছে। আর নূতন ধরণের জ্ঞানের আবির্ভাবে নূতন প্রথায় নূতন যুদ্ধ চলিতেছে।

দিনে দিনে জীব সংখ্যা বাড়িয়া থাকে। দুইটি প্রাণী হইতে যদি ছয়টি সন্তানের উৎপত্তি হয়, আর মরিয়া গিয়া হরেদরে চারিটি বাঁচিয়া যায়—তবে দিনে দিনে লোক সংখ্যা বাড়িতেই চলিল। কিছু দিন পরে তাহারা এত অধিক হইবে যে সে স্থানে আহার বিহার হিসাবে তাহাদের আর সংকুলান হইবে না। তখনই তাহাদের মধ্যে যাহারা সবল, তাহারা দুর্ব্বলকে হয় মারিয়া, নয় সে স্থান হইতে তাড়াইয়া নিজেদের স্থান করিবে। এই রূপেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি হইয়া পড়িয়াছে।

স্থান বিশেষে জল হাওয়া মনুষ্য জীবনের অল্প বিস্তর উপযোগী ; ও দেশ কালের অবস্থা বিশেষে ক্রমে ক্রমে মানুষের শরীর মনও সেইমত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। যাহারা সেইমত পরিবর্ত্তন হইতে পারে না তাহারা ক্রমে নষ্ট হয় ও যাহারা পারে তাহারাই জীবিত থাকে। সুতরাং দেশ বিশেষে লোকেরও শরীর মন এক এক রকম ভাবের উপযোগী।

জল জীবন ধারণের একটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। যেখানে তাহার সংস্থিতি, সেই স্থানেই বসবাস ও লোক বৃদ্ধির বেশী সম্ভাবনা ; সেই স্থান গুলিই সচরাচর বেশী উর্ব্বরা হয়, সেখানে প্রচুর খাদ্য দ্রব্যও পাওয়া যায়। সেই সুবিধা ও সেই অবসরে সে স্থানেই প্রথমে সভ্যতার উদয় হয় এবং লোকের মানসিক বৃত্তি সকল ফুটে ও মনের উন্নতি হয়। কিন্তু এই সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা কমিয়া যায় ও শরীরের বলবিক্রম ও হ্রাস হইতে থাকে।

আবার যাহারা অসুবিধা ও কষ্টকর স্থানে সরিয়া পড়িয়াছে তাহাদের ভিন্ন অবস্থা। তাহাদের অনেকে প্রথম প্রথম সেখানে অসুবিধায় পড়িয়া মারা যায় ও অপরে অতিশয় চেষ্টায় বাঁচিয়া থাকে। জীবন ধারণের উপায় চেষ্টায় তাহারা এত ব্যস্ত হয় যে ধীরে সুস্থে, মানসিক চর্চ্চার আর তাহাদের অবসর থাকে না। তাহারা তাই বহুদিন অসভ্য অবস্থাতেই থাকে। অথচ সকলেই সচেষ্ট বলিয়া উদ্যমশীল হয় এবং শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান হয়। কিন্তু

গায়ের জোরে যাহা সমাধা না হয়—বুদ্ধির সাহায্যে তাহা হইতে পারে। দিনে দিনে লোকের বুদ্ধির প্রাধান্যই বাড়িতেছে। যে পটু ও সুবুদ্ধি, সেই বলবান ও দুর্দ্ধর্ষ। সেই সুবিধাতেই বুদ্ধিজীবী, অসভ্য জাতিদের সহজেই জয় করে। অসভ্যের প্রভূত শারীরিক বল আছে কিন্তু শৃঙ্খলা নাই ; তাই অসংযত ভাবে লড়াই করে বা দূর ভবিষ্যৎ না দেখিয়া আপাতমধুর প্ররোচনায় পড়িয়া ঘুস খাইয়া নিজের লোকের ও নিজের দেশের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করে। এই কৌশলেই রোম বৃটেন জয় করিয়াছিল, এই কৌশলেই বৃটেন অন্য দেশ জয় করিয়াছে।

সভ্যতর জাতি যখন নূতন নূতন দেশ জয় করে, তখন আপনার সভ্যতা ও মানসিক ও সামাজিক অবস্থা গুলিও তাহাদের মধ্যে আনে। এই রূপে দেশে দেশে সভ্যতার প্রচার হইয়াছে। কিন্তু এইটিই সভ্যতা প্রচারের এক মাত্র উপায় নহে। ব্যবসা সূত্রেও বিপুল সভ্যতা বিস্তার হইয়া থাকে। ফিনিসীয়দের সাহায্যে এই শুভ কার্য্য ইউরোপে বিশিষ্ট প্রকারে হইয়াছিল। আবার ধর্ম্ম প্রচারকেরাও এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করেন। তাঁহারা বিভিন্ন দেশে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া সভ্যতার প্রচারেও সাহায্য করেন। পুরাকালিন হিন্দু ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাসে এই উদাহরণ ভূরি ভূরি দেখা যায়।

আবার উল্টা ঘটনার দৃষ্টান্তও আছে। অর্থাৎ এমন উদাহরণ আছে, যেখানে জেতাই সভ্যতর বিজিতদের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ ও মিসরের আদি ইতিহাসে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। রোম গ্রীস জয় করিয়া, গ্রীসের সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছেন।

মানসিক প্রাধান্যের এমনই ক্ষমতা যে দৈহিক বল ও প্রতাপ তাহার কাছে মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা পাতে।

আজ কাল যতই নিবিড় তমসাচ্ছন্ন অতীতের ইতিহাস গুলি আলোচিত হইতেছে, ততই দেখা যায় পুরাকালেরই স্রোত কেমন ভাবে ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধমান ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক স্রোতে মিশিয়াছে। এখন যাহা দেখা যায় সকলেরই বীজ অস্পষ্ট ভাবে পূর্ব্বেও ছিল। আধুনিক অবস্থা তাহারই বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি মাত্র। এক হিসাবে কিছুই নূতন নহে। অভিব্যক্তিবাদের ইহাই মূল মন্ত্র ; তাহাতে আর দ্রব্য বিশেষের চিরভিন্নতা রাখে নাই। সকল অবস্থা, সকল দ্রব্য, সকল ঘটনা, একই সূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছে। সামাজিক অভিব্যক্তিতেও সেই কথা সমভাবে প্রযুজ্য।

আমরা সর্ব্বদা ঠিক স্পষ্ট বুঝিতে পারি না, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় সকলেই ধার করা অর্থে ব্যবসা করিয়া অর্থ বাড়ায়। পৃথিবীর সকল জাতিই পরস্পরের কাছে ঋণী। পূর্ব্ববর্ত্তীদের ধন পরবর্ত্তী লোকেরা লইয়া বাড়াইয়াছে, বিভিন্ন জাতির পুরাতন ও আধুনিক ইতিহাসেও এই কথা প্রযুজ্য।

বাইবেলের মতে মানুষ প্রথমে এসিয়াতেই সৃষ্ট হইয়া বসবাস ও বংশ বৃদ্ধি করে। আদম ও ইব যে ইদেন উদ্যানে বাস করিতেন সে স্থান মধ্য এসিয়াতে নির্দ্দেশ করা হয়। এটি গল্পের মত প্রমাণহীন কথা হইলেও ইহার ভিতর কিছু সত্য থাকিতে পারে।

কিন্তু নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, যে আর্য্য জাতি আজকাল ইয়ুরোপীয় সভ্য জগতের অধিবাসী সেই জাতির আদি বাস স্থান মধ্য এসিয়া ভূমেই ছিল। সেখান হইতে বংশ বৃদ্ধি হইলে তাঁহারা দলে দলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। সে গমনের বিভিন্ন পথ অবধি কতকটা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তার রেখা ক্রমাগত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে।

পরে যখন সভ্যতার অভ্যুত্থান হয়—তখনও দেখা যায়—তাহারও বিকাশ প্রাচ্য স্থানেই হইয়াছিল। মিশরই আদি সভ্য দেশ বলিয়াই যদি ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলেও পরে পরে দেখা যায় গ্রীস্ মিশর হইতে, ও রোম গ্রীস্ হইতে ও ক্রমে পশ্চিম দিকের সমগ্র ইউরোপ রোম হইতে সভ্যতা

গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে স্পেনই ইউরোপে প্রধান ছিল,এক্ষণে সেই প্রাধান্য পাশ্চাত্য ব্রীটনেই হইয়াছে। এক্ষণেও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সভ্যতার গতি।

আবার পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় তাহা সবই প্রাচ্য দেশেই উদ্ভূত। সব ধর্ম্মেরই প্রাচ্য দেশে অভ্যুত্থান। পুরাতন হিন্দু-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম শস্যশ্যামলা ভারত-ক্ষেত্রে, ও খৃষ্টধর্ম্ম পালেস্তাইন ও ইসলাম ধর্ম্ম আরবের মরুময় দেশে উদ্ভূত। শেষ দুইটীর মধ্যে অনেকটা পাশ্চাত্য ভাব আছে, তাহারা সব কর্ম্মকরী ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় অন্তর্মুখী ধর্ম্ম নহে। এই সব বার্ত্তা ও নির্দ্দেশ পাশ্চাত্য দেশ, প্রাচ্য জাতির কাছ হইতে মাথা পাতিয়া লইয়াছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহাদের প্রাধান্য নতশির হইয়া স্বীকার করে। কিন্তু অন্য দিকে অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্রে দেখ তা'দের কত প্রাধান্য। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তাপ ও আবহাওয়ার জন্যই এই প্রকারের বিশেষত্ব জন্মিয়াছে। কতকটা অনিবার্য্য রকমের অভিব্যক্তি—অর্থাৎ পশ্চিম দেশ বা প্রাচ্য দেশের অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্য শীতলতম স্থানের বহির্ম্মুখী কর্ম্মশীলতা যেন ভিন্ন ভিন্ন দেশেরই ফুল ফলের মত।

আবার আধুনিক সভ্যতার আবির্ভাবের সময়েও প্রকারান্তরে প্রাচ্য দেশের সাহায্য আবশ্যক হইয়াছিল। মধ্য-যুগের অন্ধকার কিসে ঘুচাইল? পূর্ব্বাকাশ হইতেই আলো আসিয়া। রোমের পূর্ব্বদেশ যখন মুসলমানেরা জয় করিলেন তখন তত্রস্থ যত গ্রীক পণ্ডিতগণ সে বিজিত রাজ্য ছাড়িয়া ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে আসিয়া বাস করিলেন। তাঁহাদের দ্বারাই জ্ঞান ভাণ্ডার চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই বীজ হইতেই স্বাধীন চিন্তা মূলক আধুনিক সভ্যতার উৎপত্তি। মুসলমান বিজয়েরও ইহা অমৃত ফল।

সুতরাং দেখা গেল, আদি মধ্য-যুগের ইতিহাসে প্রাচ্য জাতি কত বিশিষ্ট প্রকারে প্রতীচ্য জাতিকে গরিষ্ঠ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, মানব জাতির উৎপত্তি পূর্ব্ব দেশে হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আর্য্য জাতির উৎপত্তিও সেখানে। তৃতীয়তঃ—সে দিক হইতেই প্রথম সভ্যতার বিকাশ। চতুর্থতঃ—সেই স্থান হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চমতঃ—আধুনিক নূতন সভ্যতার আরম্ভও সেখান হইতে। এ সকল বিষয়গুলিই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে। এই সকলের সহিত তুলনায়, যুদ্ধ জয় ও দেশ জয়—এক হিসাবে লঘু কথা।

এই গেল পুরাকাল ও মধ্যযুগের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির সম্বন্ধ। তখন প্রাচ্যই আগে চলিয়াছে ও সকল বিষয়ের প্রথম অনুষ্ঠান করাইয়া দিয়াছে। যেমন পূর্ব্ব দিকে সূর্য্য উঠে তেমনি সেই পথ হইতেই সকল শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠানের প্রথম আবির্ভাব আবার বৃদ্ধ লোক যেমন ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে তেমনি সেই সকল পুরাতন জাতিরও এখন অবসাদ আসিয়াছে। তাহাদের এখন আর সে তেজ নাই, সে ক্ষমতা নাই।

এখন আবার তাহাদেরই উত্তরাধিকারীরা নূতন বয়সে পাশ্চাত্য দেশে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞানের ত অন্ত নাই, অভিব্যক্তিরও শেষ নাই; দিনে দিনে যুগে যুগে ক্রমিক অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মবীরদের হাতে সেই ভার ন্যস্ত। আজকাল ক্রমিক পরিবর্দ্ধিত ও সন্মার্জ্জিত হইয়া সেই আদি জ্ঞান কত পরিপুষ্ট হইয়াছে। প্রবৃত্তির এই স্রোতের সহিত যে না চলিতে পারিবে, বিনাশ তার অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য।

এই অবস্থাতেই আমরা এখন আমাদেরই পূর্ব্ব সভ্যতা সন্মার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত ভাবে ফিরাইয়া পাইতেছি। যেমন হইয়া থাকে, আমাদের বিশ্রামের কালে পাশ্চাত্য দেশের হাতে থাকিয়া ইহা অনেক পরিবর্দ্ধিত হইয়া আবার আমাদের কাছে আসিয়াছে—আমরা ইহা নতশিরে গ্রহণ করিব। আধ্যাত্মিকতার আতিশয্যে আমাদের পতন হইয়াছিল, তেমনি অনেকটা বেশী বহির্ম্মুখী ও কর্ম্মপালন ভাবে

সে সভ্যতা ফিরিয়া আসিয়াছে। ঐ দুইটির সমন্বয়েই মানব জাতির চরম উৎকর্ষ। অনেক ভয় দেখাইয়া ও লাঞ্ছনা দিয়া দূর ভবিষ্যতে প্রকৃতিদেবী এমনি করিয়াই দুই জাতিকে মিলাইবেন। দেশ কাল গুণে বিভিন্ন স্থানে অভিব্যক্তির বিভিন্ন কার্য্য বিভাগ হইয়াছিল, এখন তার সমন্বয় হইবে। এটি হইত না, যদি এই স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর মনোবৃত্তির অসম্ভাবী বিকাশ না থাকিত।

এখন দেখি, প্রধানতঃ কি কি হিসাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে আজকালকার জাতিগত বিভিন্নতা দাঁড়াইয়াছে। সে বিভিন্নতা প্রথমেই মনে হয় অনেক দিনকার অভ্যাস দোষে দূরপনেয়, কিন্তু কালে সব ঠিক হইয়া যাইবে এবং চেষ্টায় দিন ও বেলা হ্রস্ব করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে প্রধান বিভিন্নতা এ দুটি দেশে "রমণী জাতির" অবস্থা। সেই অবস্থাটুকু সংশোধিত হইলেই অর্দ্ধেক উৎপাত অচিরেই ঘুচিবে।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

ফরাসী-বিপ্লবের একটী আলেখ্য।

(১)

বেলজিয়ামের অন্তর্গত বারবাণ্ট্ প্রদেশে ওয়েল্‌ডিগ্‌হাম একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। নানা জাতীয় বৃক্ষবল্লরী শোভিত এক বিশাল বনভূমির উপান্তে অবস্থিত বলিয়া গ্রামখানি দূর হইতে একখানি ক্ষুদ্র চিত্রপটের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে লতাকুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়ায় পল্লীবাসীগণের উপাসনা-মন্দির, সাধুজনের পদরেণু স্পর্শে পবিত্র হইয়া যেন কত যুগ ধরিয়া পাপানুতপ্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা বিধানের জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার নিকটে মন্দিরাধ্যক্ষ, গ্রামের বৃদ্ধ পুরোহিত, গ্রাম্য জমিদার এবং আরও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পল্লীবাসীগণের আবাস গৃহ এবং কিছুদূরে গ্রামের সীমান্ত প্রদেশে নানা জাতীয় ফলবান বৃক্ষ ও শ্যামল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে কৃষকদিগের পল্লী শোভিত রহিয়াছে।

আজ বাৎসরিক মেলা উপলক্ষে উৎসবের দিন; সকলেই তাই আনন্দে উৎফুল্ল। মন্দিরের সম্মুখে বিস্তৃত ময়দানে মেলার আয়োজন হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ ও সহর হইতে দোকানী পসারীরা নানাজাতীয় পণ্য দ্রব্য লইয়া উৎসব ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে, বেলা দ্বিপ্রহরের পর গ্রামের সমুদয় নরনারী সুসজ্জিত হইয়া একে একে উপাসনা মন্দিরে সমবেত হইলেন; তখনও পুরোহিত আসেন নাই দেখিয়া সকলে নানাপ্রকার সরল আলাপে সময় কাটাইতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র উপাসনা মন্দির;—এবং পল্লীর জনসংখ্যাও খুব বেশী নহে; নানারূপ আলোচনা হইতে হইতে কথায় কথায় গ্রাম্য পঞ্চায়েতের পুত্র ক্রণোর কথা উঠিল। নিকটস্থ সহরে ব্রণো কলেজে অধ্যয়ন করে; ছুটীতে উৎসবে যোগদান করিবার জন্য গৃহে আসিয়াছে; গ্রামের মধ্যে সেই সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র বলিয়া ছেলে বেলা হইতে গ্রামবাসী সকলেই তাহাকে ভালবাসে। গত বৎসর উৎসবের সময় উপাসনা মন্দিরে সঙ্গীতের ভার ক্রণোর উপর অর্পিত ছিল। তাহার গান এত সুন্দর এবং প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল যে আজও পর্য্যন্ত গ্রামবাসীগণ তাহা ভুলিতে পারে নাই। এবারের উপাসনাতেও ক্রণো ও তাহার সঙ্গীগণ গান করিবে, এই আশায় গ্রামবাসীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল, এবং এই প্রসঙ্গে ক্রণোর নির্ম্মল চরিত্রের কথা লইয়া মন্দিরের চারিদিকেই আলোচনা হইতেছিল। কিন্তু এই সকল প্রশংসা বাক্য একটী উদ্ধত যুবকের প্রাণে অসহ্য বোধ হইতেছিল। সে মাঝে মাঝে বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া ক্রণোর নিন্দা করিতেছিল। মন্দিরের চারিদিকে যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন একজন অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "ঐ যে ক্রণো আসিতেছে।" সকলে চাহিয়া দেখিল, দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক ক্রণো এক

সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকার হাত ধরিয়া মন্দিরের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতেছে, তাহাদিগের উভয়ের হস্তে পুষ্পমাল্য ও কুসুমস্তবক। বালিকার অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি দেখিয়া কেহ কেহ বলিল, "ওই যে আমাদের মন্দিরাধ্যক্ষের কন্যা ভেবাও আসিয়াছে; আহা! উভয়েই কি সুন্দর!—যেন বিধাতা একটীকে অপরটীর জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।" ক্রণো ও ভেবা ধীরে ধীরে বেদীর পার্শ্বে গমন করিয়া সেণ্ট সিবাষ্টানের মূর্ত্তিকে কুসুমস্তবক ও পুষ্পমাল্য দ্বারা ভূষিত করিল; তা'র পর ভেবা তাহার পিতার পার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিল এবং ক্রণো অর্গানের নিকট যাইয়া তাহার অনুরক্ত সঙ্গীগণের মধ্য আসন গ্রহণ করিল। একটু পরেই বৃদ্ধ পুরোহিত মন্দির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ক্রণো গান আরম্ভ করিল, তাহার সুস্বর লহরীতে সকলের হৃদয়তন্ত্রী একতানে বাজিয়া উঠিল। সেই প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত শুনিয়া কেহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। সঙ্গীতান্তে আচার্য্য উপাসনা করিলেন। তাঁহার উপদেশে পাপীর তনুতপ্ত হৃদয় আশ্বস্ত হইল, পুণ্যাত্মারা অপার শান্তি লাভ করিলেন এবং সরল স্বভাব নিরক্ষর কৃষককুল মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কেবল একজনের হৃদয় এই ধর্ম্মমন্দিরের পুণ্য প্রভাবে একটুও বিচলিত হইল না। সঙ্গীতের সময় সে অনর্থক খক্ খক্ করিয়া কাশিতে লাগিল, এবং উপাসনার সময় মেজের উপর জুতার দ্বারা খস্ খস্ শব্দ করিতে লাগিল। এই যুবকটী গ্রামস্থ জমিদার—মৌলমিনের পুত্র সাইমন। অতিরিক্ত আদরে এবং শিক্ষার অভাবে শৈশবকাল হইতেই তাহার চরিত্র গঠিত হয় নাই; তাহার উপর আবার অত্যন্ত অহঙ্কারী এবং উদ্ধত স্বভাবের লোক বলিয়া গ্রামের সকলেই তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিত, শুধু ধনীর সন্তান বলিয়া প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না।

উপাসনা মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রণো ও ভেবা তাহাদিগের পিতার সহিত মেলা দেখিতে বাহির হইল। সাইমন্ কিছু দূরে পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভেবার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। যেই ভেবা ক্রণোর একটু পশ্চাতে পড়িল, অমনি সাইমন্ অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"ভেবা কেমন আছ?"

ভেবা প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না, ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। পল্লীর জনহীন রাস্তায় মাঝে মাঝে সাইমনের সহিত ভেবার এইরূপ সাক্ষাৎ হইত এবং সেই নির্জ্জন অবসরে ধনীর সন্তান সাইমন ভেবার নিকট কত আকাশকুসুম রচনা করিয়া তাহার চিত্তবিনোদন করিবার চেষ্টা করিত—কিন্তু যাহার জন্য সে এত আয়োজন করিত, সে নিতান্ত উদাসীনের ন্যায় শুধু নীরবেই শুনিয়া যাইত; কখনও এই সকল কথার প্রতি বিন্দুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করিত না। পরিপূর্ণ আগ্রহের সহিত সাইমন কতবার ভেবার নিকট আপনাকে দান করিতে গিয়াছে, কিন্তু যখনই কম্পিত কণ্ঠে সে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিত তখনই অত্যন্ত বিরক্তির সহিত একটা না একটা অছিলা করিয়া ভেবা সেখান হইতে প্রস্থান করিত, আর আশাহত যুবক ভগ্নহৃদয় লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। তাহার বিপুল ধন সম্পত্তি এবং বিলাস বৈভব কিছুই বালিকার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত না। ভেবাকে উপলক্ষ করিয়া কতবার এই পুরোহিত পরিবারকে সাইমন উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই মূল্যবান উপঢৌকন গুলি অশেষ ধন্যবাদের সহিত জমিদার বাড়ী ফিরিয়া আসিত এবং বৃদ্ধ পুরোহিত সাইমনকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়া পাঠাইতেন যে স্বচ্ছন্দ-বনজাত দ্রব্যেই তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র পরিবারের সমুদয় অভাব সঙ্কুলান হয়, সুতরাং তাঁহাদিগের এ সকল দ্রব্যে কোনও প্রয়োজন নাই; এই পল্লীতে যাহারা দুঃস্থ আছে তাহাদিগের মধ্যেই এ সকল দ্রব্য বিতরণ করিয়া দিও। ভেবার জন্য বিশেষ ভাবে যে সকল উপঢৌকন আসিত সে গুলি সে একবার স্পর্শ করিয়াও দেখিত না; পুরোহিত যদি পীড়াপীড়ি করিতেন তাহা হইলে সে গম্ভীর ভাবে বলিত

আপনিই চিরদিন শিক্ষা দিয়াছেন যে ধনীর বিলাস মন্দিরে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা যায় না—আমরা চিরদিন দুঃখী কাঙ্গালের সহিত বাস করিয়াছি—এই সকল বিলাসভোগ্য দ্রব্য দিয়া আমরা কি করিব?

তপস্বিনী কন্যার এই সকল কথা শুনিয়া পুরোহিতের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তিনি কন্যার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিতেন, ভগবান চিরদিন তোমাকে এই শুভমতি দান করুন।

সাইমন বার বার উপেক্ষিত হইয়া এক একবার অধীর হইয়া উঠিত; কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করিয়া বুঝিত যে ক্রোধের দ্বারা এখানে কোনও ফল হইবে না। তাই সে প্রতিদিন নূতন নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া ভেবার মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিত। এক একদিন বেদনাপ্লুত হৃদয় লইয়া সে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিত, "তুমি আমার শ্রদ্ধার দান উপেক্ষা কর কেন?"

ভেবা নিতান্ত সহজ ভাবে বলিত, "আমাদিগের ত কোনও অভাব নাই, তবে অনর্থক কেন আপনার দান গ্রহণ করিব?"

এমনি করিয়া সাইমনের অনেক সুখের কল্পনা ভেবার এক একটী হৃদয়হীন কথায় ভাঙ্গিয়া যাইত। তাই আজ অনেক দিন পরে উৎসবক্ষেত্রে সাইমনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় কি জানি কেন হঠাৎ তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। সে সাইমনের কথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না। শুধু দ্রুত পদে হাঁটিয়া গিয়া ক্রণোর সহিত মিলিত হইল এবং উভয়ে নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে মেলার জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল। সাইমন পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অপলকনেত্রে এই দৃশ্য দেখিল, তা'র পর সন্ধ্যার অন্ধকারে নক্ষত্রালোকিত আকাশের দিকে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে একবার বলিল, আচ্ছা এ অপমানের আজই প্রতিশোধ দিব।

উৎসব ক্ষেত্রের চারিদিকে ক্রীড়ারত বালক বালিকাগণ ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে—ক্রেতা এবং বিক্রেতাগণ আপন আপন কর্ম্মকোলাহলের দ্বারা মেলাভূমিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে এবং স্থানে স্থানে পল্লীর বয়োবৃদ্ধ মণ্ডলেরা একত্র হইয়া নানাবিধ আলোচনা করিতেছেন—কিন্তু এ সকলের প্রতি আজ আর সাইমনের কোনও দৃষ্টি ছিল না। সে মেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কয়েকজন সঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তাহাদিগের সহিত কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়া আবার একাকী সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

এদিকে বহুদিনের পর ক্রণো ও ভেবা একত্র মিলিত হইয়াছিল—তাই তাহাদিগের কথা আর ফুরাইতেছিল না। ফরাসী বিপ্লবে সমগ্র ইউরোপ তখন টলমল করিতেছে;—চারিদিকেই শুধু বিপ্লবের কাহিনী আর অরাজকতার দৃশ্য। ক্রণো সবে মাত্র সহর হইতে আসিয়াছে তাই ভেবা তাহার নিকট হইতে বিপ্লবের সমুদয় সংবাদ শ্রবণ করিতেছিল। রিপাবলিক্ সৈন্যদলের লোমহর্ষণ অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিয়া বালিকা শিহরিয়া উঠিল এবং ভীতি-ব্যাকুল কণ্ঠে ক্রণোর দিকে চাহিয়া কহিল—

"তুমি আর সহরে যাইও না।"

ক্রণো হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

ভেবার বিশাল নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল—সে কহিল "কি জানি কেন, আমার যেন মনে হয়, তোমাকে রিপাব্লিক্ সৈন্যেরা ধরিয়া লইয়া যাইবে।"

ক্রণো ভেবাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "ভয় কি? সাধু যাহাদিগের সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাহাদিগের সহায়।"

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সমুদয় মেলা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। তা'র পর একস্থানে আসিয়া তাহারা দেখিতে পাইল একজন বৃদ্ধ সৈনিক একখানি বৃহৎ চিত্রপটে অনেকগুলি ছবি সাজাইয়া একটা ড্রাম্ বাজাইয়া দর্শকগণকে আহ্বান করিতেছে। যখন দুই একজন দর্শক আসিয়া জুটিল তখন সে আরও জোরে ড্রাম বাজাইয়া বলিতে লাগিল "আসুন, আসুন, আপনারা আমার অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া যান।"

ক্রণো ও ভেবা সেইখানে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল। বৃদ্ধ সৈনিক একখানা চিত্র দেখাইয়া বলিল

"এই দেখুন ইহা একখানি ফরাসী বিপ্লবের চিত্র। আপনারা এই চিত্র দেখিয়া ভীত হইবেন না। প্রাণকে পাষাণের মত কঠিন করুন,—উদ্গত অশ্রু-ধারা দমন করিয়া সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করুন, দেখিবেন ইহার পরিণাম কি সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক।

"এই ছবিতে দেখুন বিপ্লবের অন্যতম নেতা রক্তপিপাসু ম্যারাট্ অরণ্য মধ্যে এক যাদুকরী রমণীর যত্নে পরিপুষ্ট হইতেছে। এই চিত্রে দেখুন সে তাহার পিতাকে হত্যা করিবার জন্য ছুরিকা হস্তে গোপনে তাহার অনুসরণ করিতেছে। এই দেখুন প্যারিসের দুর্ব্বৃত্ত জেকোবিন্‌গণ নিরীহ বন্দীদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিতেছে। দেখুন, দেখুন, আকণ্ঠ রক্তে নিমজ্জিত হইয়াও পাপিষ্ঠগণ 'রক্ত' চাই, আরও রক্ত চাই" বলিয়া চীৎকার করিতেছে।"

এমন সময়ে সাইমন কোথা হইতে আসিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল "বাঃ! কি উর্ব্বর কল্পনা-শক্তি তোমার?—তুমি এইরূপে গ্রামবাসিগণের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিতেছ, আর তাহাদিগের সরলমনে বিপ্লববাদীদিগের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ ও ঘৃণা বদ্ধমূল করিয়া দিতেছ? বৃদ্ধ সৈনিক বলিল, "যাঁহারা আমার কথা শুনিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা ত অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারেন।" এই বলিয়া সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল "এই ছবিতে দেখুন ম্যারাট্ আসিয়া রোবাস্পায়ারের সহিত মিলিত হইয়াছে। রোবাস্পায়ার ক্রোধোন্মত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "আজ এখনও পর্য্যন্ত গিলটিনে একটিও নরবলি হয় নাই কেন? মুহূর্ত্তের জন্যও যেন হত্যাকারীর কুঠার নিশ্চল হইয়া না থাকে এই আমার আদেশ।"

এই কথা শুনিয়া দর্শকগণ শিহরিয়া উঠিল। সৈনিক বলিতে লাগিল "এই ছবিতে দেখুন ফ্রান্সের নিরাশ্রয় অসহায় জনগণ অত্যাচারীর নিপীড়নে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন তাহারা শুধু ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া সমুদয় অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদ তাহাদিগের শোকসন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করিল না; বিধবা রমণীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে, পিতৃ-মাতৃহীন শিশুর করুণ ক্রন্দনে এবং পুত্রহারা জননীর কাতর বিলাপে জগদীশ্বরের সিংহাসন বিচলিত হইল না। শেষে যখন মর্ম্মভেদী হাহা-কারের পরিবর্ত্তে সকলে একবার হুঙ্কার করিয়া প্রতীকারের জন্য ব্যাকুল হইল, তখন ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ঐ দেখুন একটী ক্ষুদ্র বালিকার প্রফুল্ল মুখকান্তিতে বিধাতার আশীর্ব্বাদ মূর্ত্তিমান হইয়া ফ্রান্সের একটা ক্ষুদ্রপল্লী আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে; এই চিত্রে দেখুন বালিকা নিভৃতে বসিয়া চরকায় সুতা কাটিতেছে। পার্শ্বে একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বালিকার প্রাণ নিদারুণ বেদনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। প্রাণের ভিতরে কাহার আদেশ-বাণী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া ছুরিকাখানি আপনার বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিল। অপর চিত্রে দেখুন, বালিকা তাহার স্নেহ কাতর জনক জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করি-তেছে। আহা কি সুন্দর! যেখানে স্বদেশ জননীর আহ্বানে মায়ার বন্ধন টুটিয়া যায় সে দৃশ্য কি মহান্! স্বর্গীয় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া যে এক-বার আকুল হইয়া ছুটীয়া চলিয়াছে পিতা মাতার বাহু-বেষ্টন কি তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে?"

"এই দেখুন বালিকা ম্যারাটের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ম্যারাট্ তখন গিলটিনের উষ্ণ রক্তধারায় স্নান করিতেছিল। বালিকা করযোড়ে বলিল 'মহাশয় উচ্ছৃঙ্খল রিপাব্‌লিক সৈন্যগণের উৎপীড়নে আমাদিগের ক্ষুদ্রপল্লী ধ্বংস হইয়া যাই-তেছে; স্বাধীনতার নামে ন্যায় ও ধর্ম্মের গৌরব পদদলিত হইতেছে। আপনি ইহার প্রতিকার করুন।' তখন ম্যারাট্ কর্কশ কণ্ঠে বলিল 'হাঁ প্রতীকার চাই বইকি! যেদিন বালক বৃদ্ধ সকলের মস্তক গিলটিনের শাণিত কুঠারে অর্পিত হইবে, সেই দিন বিপ্লবের শান্তি হইবে—জানিও, সেই দিন ইহার প্রতিকারও হইবে।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে বালিকার মুখমণ্ডলে বিদ্যুদ্দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল এবং আরক্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফু-লিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। বালিকা উন্মত্তের ন্যায় ছুরিকা উত্তোলন করিয়া বলিল, 'পাপিষ্ঠ! তবে আজ তোমার রক্তেই সে শান্তির সূচনা হউক।'

"ঐ দেখুন ম্যারাটের বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ হইয়াছে। বালিকা নির্ভয়ে এবং নির্ব্বিকার চিত্তে সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। ম্যারাট্ আপনার রক্তে আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।"

"এই চিত্রে দানবপ্রকৃতি ম্যারাটের অনুচরগণ ক্ষুদ্র বালিকাকে ধৃত করিয়া গিলটিনের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। রোবাস্পায়ারের আদেশে বালিকার শিরশ্ছেদন হইবে।"

সাইমন উল্লাসে বলিয়া উঠিল "বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"

সৈনিক বিরক্তির সহিত বলিল "মহাশয়, আপনি কেন বার বার গোলমাল করিতেছেন? আমি যদি এখানে রোবাস্পায়ার, ম্যারাট্, কিম্বা জেকোবিন্‌গণের প্রশংসা করিতাম তাহা হইলে আপনার বোধ হয় বেশ মনঃপূত হইত। কিন্তু জানিবেন, যাহারা আমাদের স্বদেশের শত্রু তাহাদের প্রশংসা গান করিয়া জীবিকার্জ্জন করা অপেক্ষা ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন ধারণ করাও শ্রেয়ঃ।"

সাইমন এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "তুমি কাহার সহিত তর্ক করিতেছ তাহা জান? ইচ্ছা করিলে আমি এই মুহূর্ত্তে তোমাকে এই মেলা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারি?"

সৈনিক বলিল "জানি আপনি ওয়েল্ডিগ্‌হামের জমীদারের পুত্র; কিন্তু তিন মাস পূর্ব্বে আপনাকে একবার ব্রসেল্‌স্ সহরে দেখিয়াছি না?"

সৈনিকের কথা শুনিয়া সাইমন থতমত খাইয়া গেল। তাহার মুখে একটা ভীতি ও চাঞ্চল্যের ভাব দেখা গেল। আর বেশী বাড়াবাড়ি করিতে গেলে তাহার জীবনের অনেক গুপ্ত কাহিনী হয়ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে সাইমন আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সৈনিক বলিতে লাগিল—"দেখুন গিলটিনের কুঠার বালিকার মস্তক লক্ষ্য করিয়া উত্থিত হই-য়াছে। কিন্তু সেই নির্ম্মল মুখশ্রীতে কিছুমাত্র ভীতির কালিমা সঞ্চার হয় নাই। আত্মপ্রসাদের বিমল জ্যোতিঃতে সে দীপ্তি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেশভক্ত যেখানে আত্মদান করে সেখানে এমনি করিয়া ঘাতকের তীক্ষ্ণ তরবারী অমৃতময় হইয়া উঠে। চোখের পলকে বালিকার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার পবিত্র রক্তলেখা দেশবাসীর প্রাণে চিরদিনের মত একটী পুণ্য স্মৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া গেল। 'সার্লট্ কর্ডে' জগতের ইতি-হাসে অমর হইয়া রহিল।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ সৈনিক তাহার কাহিনী শেষ করিল। ক্রণো ও ভেবা এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, যে তাহারা আত্মবিস্মৃতের মত অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গেল। কতক্ষণ পরে ভেবা জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, ক্রণো, সার্লট্ কর্ডের কার্য্য তোমার নিকট কিরূপ বোধ হয়?

ক্রণো বলিল, "আমিও তাই ভাবিতেছিলাম; তুমি কি মনে কর?"

ভেবা বলিল "তোমার মতটাই আগে শুনি। তোমার কি মনে হয়, সার্লট অন্যায় করিয়াছিল?"

ক্রণো বলিল "দেখ ভেবা! হত্যা মাত্রই পাপ। যাহারা নরশোণিত পাত করে, তাহারা ঈশ্বরের কৃপা হইতে বঞ্চিত হয়। আমার বোধ হয়, সার্লট্ ভগবানের নিকট অপরাধী।"

ভেবা বলিল, "ক্রণো, তবে তোমার মতের সহিত আমার মিল হইল না। হত্যা কি কখনও ন্যায় ও ধর্ম্মের আশ্রয়ে আপনাকে সমর্থন করিতে পারে না? মানুষই যদি পাপ পুণ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তবে দেশ কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে কি সেই সীমা রেখার পরিবর্ত্তন মানুষের চোখে উপলব্ধি হইবে না? সার্লট্ কর্ডে যদি পাপই করিয়া

থাকে, তবে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, সে বালিকা কাহার জন্য আপনার পবিত্র হস্ত নররক্তে কলঙ্কিত করিয়াছিল? সেত আমাদেরি মত সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতে পারিত; কাহার জন্য সে সংসারের সমুদয় আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া বালিকা বয়সে আপনার মরণ আপনি ডাকিয়া আনিল? একমাত্র দেশের জন্য ও ন্যায় ধর্ম্মের রক্ষার জন্য নহে কি? তুমি যদি কার্য্যের বিভীষিকাটাকেই বড় করিয়া তোল এবং উদ্দেশ্যকে একেবারেই অস্বীকার কর, তাহা হইলে অবশ্য সার্লট্‌কে অপরাধী বলিতে পার। আর এক কথা। যাহারা পাপী তাহারা মৃত্যুকে ভয় করে। কিন্তু সেই তেজস্বিনী বালিকা যেভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহাকে আর দোষী বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। পুণ্যকর্ম্মের সঙ্গে যদি স্বার্থ জড়িত থাকে তবে ঈশ্বরের বিধানে তাহার পুরস্কার নাই, তিরস্কার আছে। ভগবানের কাছে স্বার্থ শূন্য পাপের শাস্তি নাই, ক্ষমা আছে। বালিকা অপরাধী হইলেও ঈশ্বর তাহাকে মার্জ্জনা করিবেন।"

ক্রণো বলিল, "দেখ, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের সকল অত্যাচার সহ্য করা উচিত। সহিষ্ণুতাও কম বীরত্ব নয়। অত্যাচারীর শাস্তি বিধান ভগবান করিবেন। তাঁহার ন্যায়ের দণ্ড মানুষ কিরূপে গ্রহণ করিতে সাহসী হইবে?"

ভেবা বলিল "নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে, ভগবান কি স্বয়ং তরবারি হস্তে সমরে অবতীর্ণ হইয়া দুর্ব্বৃত্ত দমন করিবেন? মানুষই মানুষের শাস্তি বিধান করে। তবে ভগবানের আদেশ চাই। আর সহিষ্ণুতাকে যে তুমি বীরত্ব বলিলে যাহারা প্রতীকার করিতে সমর্থ, তাহারাই সেই বীরত্বের গৌরব করিতে পারে।"

ক্রণো বলিল "ভেবা, সংযম সকল অবস্থাতেই ভাল; যদি আমরা সংসারকে সুখের করিতে চাই তবে কি তাহা রক্তপাতে সাধিত হইবে? একটা সংহারলীলার সূচনা করিয়া যদি আমরা ঈশ্বর দত্ত জীবনগুলি রক্তস্রোতেই ভাসাইয়া দিলাম তবে আমরা এক পাপকে দমন করিতে যাইয়া কি শত শত পাপ সৃষ্টি করিব না? আর্ত্তজনের অশ্রুবিন্দু মুছাইতে যাইয়া কি আমরা সমগ্র দেশে অশ্রুধারার প্রবল প্লাবন উপস্থিত করিব না? থাক্, আর আমাদের বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই; এ সব কথার কোন মীমাংসা আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। আমি যতই ভাবি ততই নূতন নূতন প্রশ্নে আমার মাথা ঘুরিয়া যায়।"

ক্রণো ও ভেবা যখন এইরূপ কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল, তখন তাহাদের পিতা একটু অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য ক্রণো একটু তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল, ভেবা একটু পশ্চাতে পড়িল। এমন সময় সাইমন অতিরিক্ত মদ্যপানে মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে ভেবার নিকটে আসিয়া তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিল—"ভেবা, চল আমার সঙ্গে একবার প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে বেড়াইতে যাইবে?"

মদ্যপায়ীর রুক্ষস্বরে ক্রণো চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, নির্লজ্জ সাইমন ভেবার হস্ত আকর্ষণ করিতেছে, আর লজ্জাবনতমুখী ভেবা ব্যাঘ্রকবলিত হরিণীর মত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে বার বার ক্রণোর মুখ পানে চাহিতেছে।

ক্রণোর রক্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল; সে রোষে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে সাইমনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক ঘুষি মারিল। সাইমন আহত অবস্থায় চীৎকার করিয়া ভূপতিত হইল। সে উঠিয়া পুনর্ব্বার ক্রণোকে আক্রমণ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে পুলিসের লোক আসিয়া সাইমনকে ধরিয়া ফেলিল এবং অধ্যক্ষের আদেশে তাহাকে কারাগারে লইয়া চলিল।

সাইমন উত্তেজিত স্বরে ক্রণোকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "ক্রণো, আজ বহু দিনের ধূমায়মান্ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছ। নিশ্চয় জানিও, এই আগুণে আমাদের মধ্যে একজনকে পুড়িয়া মরিতে হইবে। এই পৃথিবীতে তোমার আমার দুই জনের স্থান হইতে পারে না। সাইমনের প্রতিহিংসা অতৃপ্ত

থাকিবে না। আজ চলিলাম, যে দিন আমার উন্মুক্ত তরবারির তলে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইবে সেই দিন আবার দেখা হইবে।"

ক্রণো অস্থির চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সে দেখিল তাহার জীবনে যে এক নূতন শিক্ষার সূচনা হইতেছে, তাহা তাহার চিরন্তন শান্তপ্রকৃতির প্রতিকূল।

পর দিন প্রভাতে সকলে বিস্ময়ের সহিত শুনিল সাইমন কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছে। ক্ষুদ্র ওয়েন্ডিগ্‌হাম পল্লীতে এই ব্যাপার লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

(২)

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের ১৬ই জুন ফ্লিউরাসের যুদ্ধে সমস্ত বেলজিয়াম্ ফরাসী রিপাব্‌লিকের অধীন হইয়া গেল। বেলজিয়ামের আর সে শান্তি নাই। ফরাসী সৈন্যগণের অত্যাচারে সমগ্রদেশের অর্থ ও শ্রীসম্পদ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে উপাসনা মন্দির ভগ্ন, পুণ্য স্থান কলুষিত ও উচ্চতম শিল্পকলার নিদর্শন সমূহ বিনষ্ট হইল। গ্রামবাসিগণ কন্‌স্ক্রিপ্‌সনের * ভয়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ফরাসীগণ বেলজিয়াম্ অধিকার করিয়াই এই আইন প্রবর্ত্তিত করিল যে, যাহারা কন্‌স্ক্রিপ্‌সন্ অমান্য করিবে, গিলটিনে প্রাণ দণ্ডই তাহাদের একমাত্র শাস্তি। নিরুইস্তেনের যুদ্ধে যাহারা ফরাসীদের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল, তাহাদের নামে পরওয়ানা প্রস্তুত হইল। এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে সৈন্যদল প্রেরিত হইল।

নিরীহ মেষপালের মত ধৃত হইয়া মাতৃভূমির সুসন্তানগণ দলে দলে গিলটিনে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিতগণ অম্লানবদনে নির্ব্বাসন দণ্ড মাথায় করিয়া লইলেন, তথাপি আপনাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস বিধর্ম্মীর পায়ে বিসর্জ্জন দিলেন না।

ওয়েল্ডিগ্‌হামের নিকট দিয়া এক বৃহৎ রাজপথ সহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই পথের পার্শ্বে একখানা হোটেল এবং তাহার পশ্চাতেই বিস্তৃত অরণ্যভূমি। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হোটেলের অধ্যক্ষ তাঁহার ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,

"আজ রবিবার, কি করিতে হইবে মনে আছে ত?"

ভৃত্য বলিল "আজ্ঞে হাঁ; বেশ মনে আছে।"

অধ্যক্ষ বলিলেন "তবে শীঘ্র যাও, সময় হইয়াছে।"

ভৃত্য তখন আস্তে আস্তে ছাদের উপর উঠিয়া অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতকগুলি গুপ্ত ছিদ্র পথে বহুদূর পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। তার পর একখানা পতাকা বাহির করিয়া একটি উচ্চ দণ্ডের উপর উড়াইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য মধ্য হইতে দুই একটী মনুষ্য মূর্ত্তি বাহির হইয়া হোটেলে প্রবেশ করিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে প্রায় ত্রিশ জন লোক সমবেত হইল। তাহাদের সকলেরই রুক্ষ কেশ, মুখে উদ্বেগের লক্ষণ। ইহারা কন্‌স্ক্রিপ্‌সনের আসামী। পরওয়ানা বাহির হইবার পরই সকলে পলায়ন করিয়াছে; দিনের বেলা জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রিতে বাড়ীতে যাইয়া আহারাদি করিয়া আসে। রবিবার হোটেলের উপরে পতাকা উড়িতে দেখিলেই বিপদের কোন আশঙ্কা নাই জানিয়া তাহারা সেখানে আসিয়া মিলিত হইত এবং সংবাদাদি গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিত।

এক প্রশস্ত ঘরের মধ্যে একখানা বৃহৎ টেবিলের চারি পার্শ্বে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল। ক্রণো তাহাদিগের নেতা। কয়েক জন কৃষক উত্তেজিত স্বরে কহিল "আর কতদিন আমরা এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিব? ফরাসী দস্যুরা অরণ্য বেষ্টন করিয়া আমাদিগকে বন্য পশুর মত গুলি করিয়া মারিবে, আমরা কদাচ তাহা সহ্য করিতে পারিব না। অন্যান্য গ্রামের সমস্ত কৃষকগণ অস্ত্রধারণ করিয়া বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছে। অনেক স্থলে ফরাসীরা পরাজিত হইয়াছে। এসময়ে

* বলপূর্ব্বক সৈন্যদলভুক্ত করার ন্যায় Conscription.

আমরাও যদি তাহাদের সহিত যোগদান করি, তবে বোধ হয় মাতৃ ভূমির স্বাধীনতা আবার ফিরিয়া পাইব।"

ক্রণো বলিল "ভ্রাতৃগণ! দেশের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া কাহার প্রাণে না প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠে? কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত আমরা সকলে প্রস্তুত হইতে না পারি, ততদিন ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। আমরা বিচ্ছিন্ন থাকিয়া কিরূপে মিলিত শত্রুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম হইব? জানিও, একজন দেশদ্রোহী থাকিতে এ কঠিন দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন হইবে না। শত্রুর উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র অথবা অগণিত সৈন্য সংখ্যাই তাহার এক মাত্র বল নহে, আমাদের মধ্যে অনৈক্যই তাহার প্রধান শক্তি এবং আমাদের বিশ্বাসঘাতকতাই তাহার প্রধান সহায়।"

হঠাৎ বাহির হইতে দরজায় মৃদু আঘাত পড়িল। এক জন যাইয়া আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া দিলে, জনৈক কৃষক উৎফুল্লচিত্তে গৃহে প্রবেশ করিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া উদ্বেগপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ?"

গুপ্তচর বলিল—"সুসংবাদ; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!"

"ফ্লেণ্ডারের কৃষকেরা বিদ্রোহী হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছে। রুপেলমণ্ডে ফরাসী সৈন্য পরাজিত হইয়াছে। ওয়েজ প্রদেশের কৃষকেরাও বিদ্রোহী হইয়াছে। দুর্দ্দান্ত রিপাব্‌লিক সৈন্যদল স্কেল্ট নদীর পরপারে বিতাড়িত হইয়াছে। হেরেন্থেল সহরে এক বিশাল কৃষকবাহিনী সম্মিলিত হইয়াছে। আগামী কল্য সেখানে যুদ্ধ হইবে।"

এই সংবাদে সকলেই আনন্দিত হইয়া পরস্পর করমর্দ্দন করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রণো তথাপি নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। এই সময়ে গ্রাম্য জমিদারের একজন ভৃত্য আসিয়া ক্রণোর হস্তে একখানি খোলা চিঠি দিয়া বলিল, "আজ কয়েক দিন হইল, আস্তোয়ার্প হইতে আমাদের জমিদারের নামে এই চিঠি আসিয়াছে। পত্রের উপরে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের মোহরের ছাপ্ রহিয়াছে।" সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া ক্রণোকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। ক্রণো পত্র পড়িতে লাগিল। পত্রের উপরে লেখা ছিল—

"Liberty, Equality, Fraternity
or
Death.

ওয়েল্ডিগ্‌হামের নাগরিকগণ!

কনস্ক্রিপসনের অনেক আসামী আপনাদিগের গ্রামে লুকাইয়া আছে। ক্রণো তাহাদিগের নেতা। উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া রিপাব্‌লিক গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করা প্রত্যেক বিশ্বস্ত নাগরিকের কর্ত্তব্য; কিন্তু আপনারা এতদিন এ কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিয়াছেন। এজন্য শীঘ্রই ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আপনাদের গ্রামে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিবেন এবং যতদিন আসামীগণ গ্রেপ্তার না হয়, ততদিন এই সকল অতিরিক্ত সৈন্যের ব্যয়ভার গ্রামবাসীদিগকে বহন করিতে হইবে।

এতদ্দ্বারা ইহাও ঘোষণা করা যাইতেছে যে, সমগ্র দেশ এখন রিপাব্‌লিক গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে আসিয়াছে। সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করাই বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়—যদি গ্রামবাসিগণ এই সদুদ্দেশ্যের সহায়তা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং বাধ্য হইয়া কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে হইবে।"

পত্র পড়িয়া সকলে ম্রিয়মান হইয়া উঠিল। চিঠির তারিখ দেখিয়া ক্রণো বলিল যে, "শীঘ্রই হয় ত রিপাব্‌লিক সৈন্য গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং আমাদিগের সুখের সংসারে আগুন লাগাইয়া দিবে।" কৃষকদিগের দুঃখকাতর মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল; সকলে হতাশ হইয়া ক্রণোর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তবে উপায়?"

ক্রণো সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "উপায় আবার কি?—উপায় ভগবান, আর তোমাদিগের সমবেত চেষ্টা। দেখ, আর আমাদিগের চিন্তার সময় নাই—আজ কার্য্যের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এতদিন আমরা গুপ্ত সমিতিতে যে সকল অস্ত্র কৌশল শিক্ষা করিয়াছি, আজ তাহার পরীক্ষার দিন আসিয়াছে। অসহায় গ্রামবাসীদিগকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার ভার আজ আমাদিগের উপর। পল্লী রমণীদিগের সম্ভ্রম এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য আজ তবে মরিবার জন্য সকলে প্রস্তুত হও; ফরাসী সৈন্যেরা বুঝিয়া যাউক যে, বেলজিয়ামের একজনও অধিবাসী জীবিত থাকিতে তাহারা কোনও অসহায়া রমণীর কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমাদিগের সম্মুখে আমাদের মাতা এবং ভগিনীর লাঞ্ছনা হইবে—তাহার পূর্ব্বে ওয়েল্ডিগ্‌হাম যেন শ্মশান হইয়া যায়—আজ ওই ধর্ম্ম মন্দিরের সম্মুখে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিজ্ঞা কর—বিধর্ম্মীর গর্ব্বিত পদবিক্ষেপে আমাদিগের গৃহ প্রাঙ্গণ কলুষিত হইতে দিব না।"

ক্রণোর উৎসাহ বাক্যে সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এইরূপ আলোচনা হইতেছে, এমন সময় অদূরে গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। উপাসনা মন্দিরের আহ্বান ধ্বনি শুনিয়া মাতৃভক্ত সন্তানেরা আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং ধীরে ধীরে গির্জ্জার অভিমুখে সকলে প্রস্থান করিল। ক্রণো তাহার ক্ষুদ্র কৃষক মণ্ডলীকে লইয়া গির্জ্জার দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, গ্রামের সমস্ত নরনারী উপাসনা মন্দিরে সমবেত হইয়াছে। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার রেখা এবং একটা বেদনার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নিরন্ন শ্রমজীবিদল আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া ভগবানের চরণে হৃদয়ের ব্যথা জানাইতে আসিয়াছে। তাহাদিগের শস্যশ্যামল প্রান্তর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে—ছায়া শীতল পল্লীগৃহগুলি শ্মশান হইয়া গিয়াছে এবং ওয়েল্ডিগ্‌হামের সে অনাবিল আনন্দোচ্ছ্বাস বুঝি চিরদিনের জন্য থামিয়া গিয়াছে।

ক্রণো এবং তাহার সহচরদিগকে মন্দির দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া গির্জ্জার সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কতদিন তাহারা এই পল্লীর আশাবাহিনী সেবক মণ্ডলীকে দেখে নাই—কতদিন তাহাদিগের উৎসাহ দীপ্ত মুখমণ্ডল হইতে আশার বাণী শুনে নাই—শুধু দূর হইতে তাহাদিগের মঙ্গল কামনায় দেবতার চরণে করুণা ভিক্ষা করিয়াছে। আজ এই স্বদেশভক্ত বীরদিগকে ধর্ম্মমন্দিরে দেখিতে পাইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আশায় এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সকলের আলাপ পরিচয় শেষ হইয়া গেলে ক্রণো দেখিতে পাইল, মন্দিরের এক পার্শ্বে ব্রীড়াবনতামুখী ভেবা অধীর হইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দারুণ দুশ্চিন্তায় তাহার সুন্দর মুখকান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে—আয়তলোচনদ্বয় নববর্ষার বারিধারাসিক্ত নীলোৎপলদলের ন্যায় জলভারাক্রান্ত হইয়া ছল ছল করিতেছে এবং তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে ধীরে ধীরে গাম্ভীর্য্যের ছায়া পতিত হইয়াছে।

ক্রণো ভেবার নিকটে যাইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত মলিন হইয়া গিয়াছ কেন ভেবা?"

ভেবা এ কথার কোনও উত্তর দিল না; শুধু একবার পলকহীন নেত্রে ক্রণোর দিকে চাহিল, তাহাতেই সে ভেবার হৃদয়ের সমুদয় ব্যথা বুঝিতে পারিল। একটু পরে ভেবা জিজ্ঞাসা করিল, "আর কতদিন এমনি করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইবে? প্রতিদিন যেরূপ গুজব শুনিতে পাইতেছি, তাহাতে বোধ হয় আর বেশী দিন তোমাকে দেখিতে পাইব না—তারপর কি হবে?"

ক্রণো আশ্বাস দিয়া কহিল, "তুমি আগেই এত অধীর হইয়া পড়িতেছ কেন? আমরা চিরদিন ঈশ্বরকে ডাকিয়াছি—তিনি কখনই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না।"

ভেবা! "কিন্তু তোমার কষ্ট ত আর দেখিতে পারি না। গৃহহীন, আশ্রয়হীন হইয়া আজ কতদিন তুমি বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ—চারিদিকে গুপ্তচরেরা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তোমার অনুসন্ধানে

ফিরিতেছে, তবে কোন অজ্ঞাত বনের ভিতর পাখিরা তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে, জগতের কেহ তাহার সন্ধান পাইবে না।" বলিতে বলিতে ভেরার চক্ষু আবার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

ক্রণো সস্নেহে ভেবার দুই হাত ধরিয়া বলিল, "ছি, কাঁদিও না। আমি সব দুঃখ কষ্ট তোমার মুখের দিকে চাহিয়া অম্লানবদনে সহিতে পারি, কিন্তু তোমার অশ্রুজল সহিতে পারি না। তুমিই আমার জীবনের আলোক—আমার দক্ষিণ হস্তের বল। আজ যদি তুমি অধীর হইয়া পড়, তবে আমার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে—আর যে সকল যুবক আমার মুখের দিকে চাহিয়া এই কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও হতাশ হইয়া পড়িবে। ভেবা! তুমি ভগবানের চরণে আত্মসমাধান করিয়া সবল হও।"

ভেবা দুই হাত দিয়া আপনার মুখ ঢাকিয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল; তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—

"আমি ত কাঁদি না—শুধু তোমার এই শুষ্ক মুখ এবং মলিন বেশ দেখিলেই কি জানি কেন আমার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে। তুমি বীর—তুমি কেন আমার দুর্ব্বলতা দেখিয়া অবসন্ন হও? স্বদেশের কল্যাণ কামনায় তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহার অপেক্ষা মহত্তর ব্রত আর নাই—তোমার মহত্বের কথা চিন্তা করিয়া আমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমার কাতরতায় তুমি বিচলিত হইও না। হে স্বদেশভক্ত! পৃথিবীতে আমার বড় সুখ যে তুমি আমাকে ভালবাস—কিন্তু আমার জন্য তুমি তোমার বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না—আমি বরং সে সুখ চাই না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিও না—এই অসহায় পল্লীবাসীদিগকে রক্ষা করিও।"

বলিতে বলিতে ভেবার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তাহার বিশাল নয়নে এক বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলা করিতে লাগিল। ক্রণো মুগ্ধ হইয়া সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গেল। উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে ভেবা ব্যগ্র ভাবে ক্রণোর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি ভাবিতেছ,—আমাকে বল।"

ক্রণো। "নাঃ—কিছু না।"

ভেবা।—"অমন করিয়া আমার কাছে লুকাইও না। তোমার মুখ বর্ষার মেঘের মত গম্ভীর হইয়াছে—নিশ্চয়ই তোমার প্রাণে কি এক গভীর দুশ্চিন্তা জাগিয়া উঠিয়াছে—আমায় বলিয়া যাও—আমি তোমার কাতর মুখ দেখিতে পারি না, আমার হৃদ্‌পিণ্ড যেন ছিঁড়িয়া যায়।"

ক্রণো বলিল "তবে শোন; ফরাসী গবর্ণমেণ্ট হইতে আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পত্র আসিয়াছে; দুই এক দিনের মধ্যেই রিপাব্‌লিক্ সৈন্যেরা হয় ত গ্রামে আসিবে। আমি কখনও জীবিতাবস্থায় শত্রু হস্তে বন্দী হইব না সঙ্কল্প করিয়াছি। আমরা মরিব; কিন্তু ভয় হয় যে, মরিয়াও হয়ত তোমাদিগের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিব না।

ভেবা অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "আমি আমার সম্ভ্রম রক্ষা করিবার আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।"

ক্রণো চমকিয়া উঠিল; বলিল, "সে কি?"

ভেবা ধীরে ধীরে গাত্রাবরণের ভিতর হইতে এক শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল, "এই দেখ অসহায়া রমণীর সম্ভ্রম রক্ষার শেষ সম্বল আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।"

ক্রণো কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তার পর বলিল, "বেশ—দেবতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

এই সময় ক্রণোর সহচর জেন্ আসিয়া বলিল, "আচার্য্য মন্দিরে আসিয়াছেন, তোমরা এস এখনই উপাসনা আরম্ভ হইবে।"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—পূর্ণিমার রাত্রি বলিয়া সমস্ত পল্লী জ্যোৎস্না লোকে ধব্ ধব্ করিতেছে—চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। শুধু গির্জ্জার অভ্যন্তরে পলিত কেশ বৃদ্ধ পুরোহিতের প্রার্থনা ধ্বনি শুনা যাইতেছিল এবং মাঝে মাঝে সমবেত

নরনারীর কণ্ঠোত্থিত উপাসনা সঙ্গীত সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্যকে আরও গম্ভীর করিয়া তুলিতেছিল।

হঠাৎ গির্জ্জার বাহিরে গুড়ুম গুড়ুম করিয়া এক সঙ্গে অনেকগুলি বন্দুকের আওয়াজ হইল। উপাসনা রত নরনারী সকলেই চমকিত হইয়া আপন আপন আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। আবার বাহিরে প্রায় একশত বন্দুক হইতে আওয়াজ হইল, গুড়ুম গুড়ুম।

পর মুহূর্ত্তে সকলে বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, এক জন দীর্ঘাকৃতি ফরাসী সৈনিক পুরুষ গির্জ্জার প্রবেশ দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে বন্দী করিবার জন্য হুকুম দিতেছে। আদেশ মাত্র ফরাসী সৈন্যেরা বন্দুক এবং তরবারী লইয়া গির্জ্জার মধ্যে প্রবেশ করিল; জ্যোৎস্নালোকে তাহাদিগের উন্মুক্ত কৃপাণ ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। সৈন্যদিগের নেতা পৌরুষ কণ্ঠে বলিল—

"দূরে ওই যে যুবককে দেখিতে পাইতেছ, উহারই নাম ক্রণো; সর্ব্বাগ্রে উহাকে গ্রেপ্তার কর।"

গির্জ্জাস্থ নরনারী সকলে স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, এই দীর্ঘাকৃতি ফরাসী সৈনিক তাহাদিগেরই স্বগ্রামবাসী—সাইমন ব্রুটাস। (ক্রমশঃ)

মাতৃ পূজার দান।

(গল্প)

অভয়চরণ মৃত্যুশয্যায়। নির্জ্জন রাত্রি। প্রবল বায়ু আর্ত্তনাদ করিয়া করিয়া ফিরিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ খণ্ড খণ্ড মেঘ মাঝে মাঝে চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে—বায়ুর তাড়নায় জমাট হইতে পারিতেছে না!

মুমূর্ষু শয্যায় শুইয়া হরিনামের মালা জপিতেছিলেন। পদতলে বসিয়া পত্নী কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"আমাদের ফেলে কোথায় চল্‌লে?"

কথা কয়টি অভয়চরণের কানে পৌঁছিল না; বায়ু অট্টহাস্য ভরে ক্ষীণকণ্ঠের এই দুচারিটি কাতরবাণী কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল।

স্বামীর মুখের উপর নত হইয়া শিশু পুত্রকে দেখাইয়া পত্নী পুনরায় কহিলেন—"তোমার ছেলেকে কার কাছে রেখে যাবে? আমাদের কি হবে?"

মুমূর্ষু চোখ মেলিলেন। মালা জপিতে জপিতে ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। "ভগবান আছেন।"

কিছুক্ষণ পরে নিদ্রিত শিশুর মাথায় হাত রাখিয়া অভয়চরণ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"ভয় কোরোনা। দুঃখী অসহায়ের একমাত্র গতি পরমেশ্বর আছেন। আমার এই এক মাত্র ধন—একে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। এ ধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার তুমি কোরো।"

শিশু ঘুমের মধ্যে হাসিয়া উঠিল; মেঘমুক্ত হইয়া চাঁদ আর একবার সমস্ত ধরণীকে আলোকিত করিয়া দিল। অভয়চরণ পরমপিতার অভয়চরণ স্মরণ করিতে করিতে লোকান্তরে চলিয়া গেলেন।

যে সামান্য জমি ছিল তাহার আয় হইতে এবং চরকায় সূতা কাটিয়া, লাবণ্যময়ী পুত্র সুকুমারের ও আপনার ক্ষুদ্র সংসারের ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। পাঁচ ছয় বৎসরের হইলে পুত্রকে পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন।

ক্ষুদ্র একটি বালক প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নগ্নপদে শ্লেট পুস্তক হস্তে পাঠশালার পথে যাতায়াত করিত। বালক-স্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য-চাপল্য কিছু নাই; শিশুকাল হইতেই সুকুমারের হৃদয়ে গাম্ভীর্য্যের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল। মায়ের সুখ দুঃখ যেন এখন হইতেই তাহাকে বুঝিয়া চলিতে হইবে!

পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া সুকুমার ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। মায়ের হাতের শাক অন্ন খাইয়া ও মোটা বস্ত্র পরিয়া লেখাপড়ায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল।

যখন গ্রামখানির উপর আঁধারের আবরণ ফেলিয়া সন্ধ্যা-সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ডুবিয়া যাইত, সারাদিনের কর্ম্মবৈচিত্র শান্ত হইয়া যাইত, মাথার উপরে অসংখ্য তারকা বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে নিদ্রিত পল্লীর পরে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিত, তখন লাবণ্যময়ী আপন কাজ সারিয়া আসিয়া শয্যায় শুইতেন এবং সুকুমার প্রদীপ লইয়া এককোণে পড়িতে বসিত। তাহারই মঙ্গল কামনায় ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে মা ঘুমাইয়া পড়িতেন; পড়া হইয়া গেলে প্রদীপ নিভাইয়া সুকুমার মার কোলের কাছে আসিয়া শুইয়া পড়িত।

সহপাঠী নগেন ও আবদুল্লার সহিত সুকুমারের বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। পণ্ডিত মহাশয়কে বিড়ম্বিত করিয়া তোলা ও নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করা নগেনের সর্ব্বপ্রধান কায ছিল। পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে আসিবার আগে সে তাঁহার চেয়ারের চারি পায়ের নীচে চারিটী সুপারী রাখিয়া দিত। অতর্কিত পণ্ডিত মহাশয় চেয়ারে বসিতেই বিষম একটা কাণ্ডে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়া পড়িতেন এবং একেবারে যাইয়া নগেনের কান ধরিতেন।

"বল্ তোর এ কাজ? তুই ছাড়া এ কাজ আর কেউ করে নাই।"

নগেন বলিত—"বাঃ পণ্ডিত মহাশয়, সব দোষ আমারই!"

পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন—"বল্ তুই করেছিস্ কি না? তোর বাপ আমাকে জ্বালিয়েছে, এখন তুই জ্বালাচ্ছিস্।"

নগেন্—"তা আমি বল্‌ব না, পণ্ডিত মহাশয়। আপনার যা ইচ্ছা করুন। হেড মাষ্টারের কাছে আপিল আছে।"

পণ্ডিত মহাশয়ের পড়া নগেনের একদিনও তৈয়ারী হইত না। মাঝে মাঝে তিনি ক্লাসে আসিতেই, সে বলিয়া উঠিত—"আমি সংস্কৃত ছেড়ে দিয়েছি, পণ্ডিত মশায়! আমি মৌলবী সাহেবের ক্লাসে পার্সী পড়্‌তে যাব।" মৌলবীর ক্লাসে যাবার কথা শুনিয়া, পণ্ডিত মহাশয় তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিতেন।

সুধীর উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক। নগেন্‌কে প্রতিদিন তাহার আগে স্কুলে পৌঁছিতেই হইবে। দূর হইতে তাহাকে আসিতে দেখিয়াই নগেন্ টেবিলের উপর চড়িয়া ব্রাহ্ম আচার্য্যের অনুকরণে করযোড়ে মুদিত নেত্রে বসিত।

ধর্ম্মের নামে এইরূপ ঠাট্টায় ব্যথিত বিরক্ত হইয়া সুধীর নগেন্‌কে টেবিল হইতে টানিয়া নামাইয়া তাহাকে সজোরে চপেটাঘাত করিত। চোখ মেলিয়া নগেন্ বলিত—"আঃ! আমার উপাসনা ভঙ্গ করলে!"

আবদুল্লা বুদ্ধিমান্ সচ্চরিত্র বালক; লেখাপড়ায় নিবিষ্টচিত্ত; নির্ভীক স্বদেশ-প্রেমে তাহার বালক-হৃদয় পূর্ণ।

বালক সুকুমার ধীর গম্ভীর পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু। বন্ধু নগেনের অনুরোধে একদিন মুসলমানের পাঁউরুটি খাইয়া তাহাকে সমস্তরাত অনুতাপে কাঁদিয়া কাটাইতে হইয়াছিল।

বিভিন্ন প্রকৃতি এই চারিটি বালকের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি অকপট প্রণয় জন্মিয়াছিল।

(২)

অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বিধাতার আশীর্ব্বাদে স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্গ আজ অনুপ্রাণিত;—শুধু বঙ্গ নয়—সমগ্র ভারত আজ জাগরণের মহাসঙ্গীতে উদ্বোধিত হইয়া উঠিয়াছে। যে জাতি এতদিন পাষাণ স্তূপের ন্যায় মৃতবৎ পড়িয়াছিল, ঈশ্বরের ইঙ্গিতে আজ সে জাতি মাতার অপমানক্ষত ঘুচাইবার জন্য ব্যস্ত।

এতদিন যে লক্ষ্যহারা হইয়া জীবন পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, আজ এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে—সে জীবনের লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইল; নিরাশার অবসাদ যাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, আশার আলোকে সে আপন কর্ম্মপথ দেখিয়া লইল। নগেনের সেই চাপল্য দৌরাত্ম্য আর নাই। মাতৃপূজার এই শুভ সময়ে আজ সেও সকল ভ্রাতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আবদুল্লা ও নগেন্ পাঠ সাঙ্গ করিয়া 'মাতৃপূজা' নামক মাসিক-পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন। সুকুমারের পাঠ এখনও শেষ হয় নাই।

আবদুল্লা বলিলেন—'মাতৃপূজা'র কতকগুলো পরিবর্ত্তন করতে হবে।"

নগেন্ বলিলেন—"কি?"

"এই যে কেশতৈল, এসেন্স ইত্যাদির বিজ্ঞাপন—এর পরিবর্ত্তন।

নগেন বলিলেন—"কি পরিবর্ত্তন?"

তিনটি বিজ্ঞাপন পড়িয়া শুনাইয়া আবদুল্লা বলিলেন—"আমাদের কাগজে তিন রকম কেশতৈলের বিজ্ঞাপন আছে, আর তিনটিতেই লেখা আছে, "সর্ব্বোৎকৃষ্ট" বা "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ"। তিনটে কখনও "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" হ'তে পারে না, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একটাই হয়। কিন্তু পাঠকরা কেমন করে বুঝবেন, কোন্‌টা "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?" নিরীহ পাঠকদের নিশ্চয়ই এমন ধাঁধার মধ্যে ফেলা উচিত নয়?

"আর এই দেখ—মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপন। একটাতে আছে—"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ," আর একটাতে—"একমাত্র স্ত্রীপাঠ্য—সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা।" "একমাত্র স্ত্রীপাঠ্য" মানে কি? আর সমস্ত মাসিক পত্রিকা স্ত্রীলোকদের অপাঠ্য? আরও কত রকমের বিজ্ঞাপন দেখ।"

নগেন বিস্মিতনেত্রে আবদুল্লার মুখের দিকে চাহিলেন।

আবদুল্লা বলিলেন—"আমি ঠাট্টা কর্‌ছি না—সত্যিই বল্‌ছি। এতে কাগজের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়। আর মাতৃপূজার ঋত্বিক যাঁরা, তাঁদের আতর এসেন্স দিয়ে বিলাসিতা করবার অবসর কোথায়? 'মাতৃপূজা'য় কি এ সবের স্থান হওয়া উচিত?'

নগেন বলিলেন—"ঠিক বলেছ, ভাই। আমি এতদিন এসব লক্ষ্য করি নাই। দেখে বড় দুঃখ হচ্ছে। এ যে একরকম সভ্যরকমের প্রতারণা তাতে আর সন্দেহ কি?"

আবদুল্লা বলিলেন—"বিলাস-সামগ্রীর যত বিজ্ঞাপন 'মাতৃ-পূজা' থেকে উঠিয়ে দেওয়া যাক্, আর সম্পাদকদের অনুমতি নিয়ে তাঁদের বিজ্ঞাপন থেকে আত্ম-প্রশংসাসূচক কথাগুলি উঠিয়ে দেওয়া যাক্—একটা সম্পাদকীয় ভব্যতাও তো আছে—কি বল?"

নগেন বলিলেন—"অবিলম্বে। আরও একটা কথা আমার মনে হয়েছে।—'বাবু'কে বয়কট করতে হবে।

আবদুল্লা বলিলেন—"কেন বল দেখি? 'বাবু'টা বিলাতি জিনিষ নাকি?"

"প্রায়।"

"ইংরাজ আস্‌বার আগে আমাদের দেশে 'বাবু' কথাটা ছিল না?"

"না। ইংরাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 'বাবু'র শুভাগমন হয়েছে। আমাদের প্রাচীন কোনও গ্রন্থে 'বাবু' কথাটা পাওয়া যায় না। সেদিনকার ভারতচন্দ্রেও না। ভেবে দেখ তো—'কৃত্তিবাস বাবু, কাশীরাম বাবু, ভারতচন্দ্র বাবু'—কথাগুলো কেমন হাস্যকর! এক সময় 'বাবু'র খুব পশার হয়েছিল। বোধ হয় শ্বেতমুখ নিঃসৃত বলেই ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ নির্ব্বিশেষে আমরা 'বাবুকে আমাদের মাথায় স্থান দিয়েছিলাম। এই 'বাবু' দেশকে বিলাসিতায় ডুবিয়েছে, এখন একে বর্জ্জন করবার সময় এসেছে।"

আবদুল্লা বলিলেন—"আচ্ছা, লেখবার সময় না হয় 'শ্রীযুক্ত' লিখ্‌লাম, কিন্তু বলবার সময়?"

একটু চিন্তা করিয়া নগেন বলিলেন—"মহাশয়।"

আবদুল্লা—"মহাশয়? বাঁড়ুয্যে মহাশয়, ঘোষ মহাশয়, সেন মশায়? কিন্তু তাহলে বোঝা যাবে কি করে? এক বাঁড়ুয্যেই যে আমাদের পরিচিত লোকের মধ্যে পনেরো জন হবেন।"

"আচ্ছা নামের পরে 'মশায়' দেওয়া যাবে।—যোগেন্দ্র মশায়, হেমেন্দ্র মশায়, রজনী মশায়।"

আবদুল্লা উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

নগেন বলিলেন—"এখন হাস্‌ছ, কিন্তু কিছুদিন পরে আর হাস্‌বে না। একদিন 'বাবু' শুনেও লোকে এম্‌নি হেসেছিল, কিন্তু 'মশায়' আমাদের

চিরদিনের কথা। আচ্ছা. নামের পরে একটা 'বাবু' দিলে কি বড় সম্মান প্রকাশ করা হয়? আমরা তো যাঁকে খুব বেশী শ্রদ্ধা করি তাঁর নামের পিছনে একটা 'বাবু' লাগাই না, যেমন—রামমোহন, দেবেন্দ্র-নাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ—এঁদের নামের পরে 'বাবু' শুন্‌তে, সত্যিই বলছি, মনে লাগে।"

"আর যদিইবা 'বাবু' নামে বড় সম্মান পাওয়া যায়, তবু এ'কে আমাদের বর্জ্জন করতে হবে। এখন 'বাবু' সম্প্রদায় থেকে নেমে আমাদের ঐ তাঁতী, ধোপা, নাপিতের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এমন এক সময় ছিল, যখন একজন স্বাধীন দোকানদারকে আমরা ঘৃণার চোখে দেখ্‌তে শিখ্‌তাম; আর যে কোন পনেরো টাকার গবর্ণমেণ্টের চাকরকে তাঁর চেয়ে সম্মান করতাম; কিন্তু এখন যদি কেউ আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দোকান করছেন শুনি, তাঁকে প্রণাম করতে ইচ্ছা হয়। আগে কৃষকদের আমরা 'চাষা' বলে তাচ্ছিল্য করতাম, কিন্তু এখন আমরা বুঝ্‌ছি সেই চাষাভাইদেরই আমাদের মাথায় তুলে নিতে হবে। চল, ভাই, আমরা 'বাবুত্বের বাঁধন ছিঁড়ে সহরের উত্তেজনার বাইরে এই নির্জ্জন পল্লীগুলিতে মায়ের কাজ আরম্ভ করি। উত্তেজনা যে অন্যায় তা আমি বল্‌ছি না; উত্তেজনা স্বাভাবিক, তার শুভফল আছে। কিন্তু এখন এমন একদল লোক চাই যাঁরা উত্তেজনায় শত কারণ সত্ত্বেও বিচলিত না হয়ে এই সব নীরব পল্লীতে পল্লীতে স্বদেশকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। পল্লীই তো আসল স্বদেশ; কোটি কোটি দরিদ্র শিক্ষাহীন কৃষক, তারাই তো আসল স্বদেশী। আমরা দুজনে, চল, ঐ বক্সীপুর গ্রামখানিকে কেন্দ্র করে আমাদের কাজ আরম্ভ করি। চারিদিকের বিশখানি গ্রাম আমাদের কার্য্যক্ষেত্র হবে। পাঠশালা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, রোগীদের ঔষধ দেওয়া, সেবা করা, দুই তিন হাজার লোককে একত্র করে মাঝে মাঝে তাহাদের কাছে সরল ভাবে সব কথা বলা, —স্বাস্থ্যরক্ষা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, কৃষির উন্নতি, আপোষে বিবাদভঞ্জন, রাস্তা ঘাটের উন্নতি, ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রচুর শস্য ঘরে মজুত রাখা, স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন, নৈতিক বল সঞ্চয়, একতা সংস্থাপন, চরিত্র গঠন প্রভৃতি সব রকম উন্নতি করা। এক কথায় সুখে দুঃখে তাহাদের হয়ে যাওয়া এই আমাদের কাজ। এই পল্লীর উপর আমাদের দেশের উন্নতি নির্ভর করছে। নেতারা সহরে থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন করবেন, আমাদের উপদেশ দেবেন, বল দেবেন, উৎসাহ দেবেন অর্থ সংগ্রহ করে দেবেন আর আমরা দলে দলে বেরিয়ে সমস্ত পল্লী সংস্কারে ব্রতী হব। এই ভাবে কাজ করলে দশ বছরের মধ্যে কি শুভফল ফলতে পারে!"

আবদুল্লা বলিলেন—"চল ভাই, চল। আজ মায়ের নামে সব ভাইদের ডেকে নিয়ে আমরা বেরোই। দেশের এই দুর্দ্দিনে, ভাইয়ের এই লাঞ্ছনা উৎপীড়নের দিনে মন অস্থির হয়ে ওঠে, ভাইদের সমস্ত দুঃখ, লাঞ্ছনা নিজে বহন করবার জন্য মনের মধ্যে ব্যথা জেগে ওঠে; কিন্তু আমাদের কার্য্যক্ষেত্র ঐ পল্লিগ্রামের মাঝখানে। ঐ গ্রামগুলির প্রাণরক্ষা ক'রে, ওদের শিক্ষিত করে, চল, আমরা পল্লীর প্রত্যেক কুটীর, প্রত্যেক প্রান্তর স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বোধিত করে তুলি। কেউ যদি আমাদের ডাকে সাড়া নাও দেন—আমাদের যেতেই হবে।"

রিক্তহস্তে একমাত্র ধর্ম্মকে পাথেয় করিয়া মোসলেম যুবক আবদুল্লা ও হিন্দু-সন্তান নগেন মায়ের কাজে বাহির হইলেন। তাঁহাদের আহ্বানে তাঁহাদের সঙ্গে পুরাতন বন্ধু যুবক সুধীর ছুটিয়া আসিলেন।

(৩)

স্বদেশী আন্দোলন যুগে সুকুমার দেখিলেন যে আমাদের সামাজিক বিধি মধ্যে এমন সকল পাপ রহিয়াছে যাহা আমাদিগকে এক হইতে দিতেছে না। হিন্দু মুসলমানে বিদ্বেষ, ব্রাহ্মণ চণ্ডালের মধ্যে নির্ম্মম ঘৃণা, আজ সর্ব্ব প্রথম তাঁহার বুকে বড় নিদারুণ বলিয়া বাজিল। তিনি বুঝিলেন জাতি-বৈষম্য দূর করিয়া দিয়া মায়ের সকল সন্তান এক হইতে না পারিলে মায়ের দুঃখ আর ঘুচিতেছে না।

এই সত্য বুঝিবা মাত্র সুকুমার, এতদিন ধর্ম্মভাবে যাহা করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন। সেই দিনই বন্ধু আবদুল্লার সহিত একত্রে আহার করিয়া তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন।

আষাঢ় মাস চলিয়া যায়—আজ পর্য্যন্ত একবিন্দু বৃষ্টি পড়িল না। হিন্দু ও মুসলমান কৃষককূল তৃষিত মেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিরাশ হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। দুর্ভিক্ষ ভীষণবেশে দেখা দিল।

দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই জীর্ণ শীর্ণ অনাহার ক্লিষ্ট মুখ গুলিতে অন্ন তুলিয়া দিবার জন্য সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী দ্বিগুণ তেজে প্রত্যুত্তর দিল। খালে বিলে জল নাই, ঘরে অন্ন নাই, সরল পল্লিবাসীর মুখে হাসি নাই, মনে সুখ নাই।

এই নিদারুণ দিনে সুকুমারের মুখে অন্নের গ্রাস আর উঠিতে চাহিত না। কোন কোন দিন আহারে বসিবামাত্র প্রতিবেশী বালক বালিকাদের ক্ষুধাকাতরকণ্ঠের আকুল ধ্বনি শুনিয়াই তিনি আহার্য্য ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িতেন। সজল নয়নে ক্ষুধিত শিশুদিগকে আহার করাইয়া লাবণ্যময়ী পুনর্ব্বার সুকুমারের জন্য রন্ধন করিতে যাইতেন। সুকুমার বলিতেন—"থাক্, মা, এরা কতদিন না খেয়ে কাটায়; এক দিন না খেলে আমার কিছু হবে না।" পুত্রের মনের ভাব বুঝিয়া লাবণ্যময়ী আর কিছু বলিতেন না। এইরূপে কতদিন মাতা-পুত্রের অনাহারে কাটিয়া যাইত।

১৩১৪ সালের রাখি বন্ধনের আগে সুকুমার লাবণ্যময়ীকে বলিলেন—"মা এবার ৩০এ আশ্বিনের উৎসবে কল্‌কাতায় যাব। আমাদের নেতাদের একবার চোখে দেখে, তাঁদের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ধন্য হয়ে আসি।"

স্নেহ দৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া লাবণ্যময়ী সুকুমারকে বিদায় দিলেন।

আবদুল্লা, নগেন ও সুধীর, কৃষক ভাইদের অগণ্য কর প্রকোষ্ঠে রাখী বাঁধিয়া দিয়া নীরব মূক পল্লীতে ৩০এ আশ্বিনের মাতৃপূজা সমাপন করিলেন।

কিছুদিন পরে বঙ্গে "'সেবকাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইল। লাবণ্যময়ী সেবকাশ্রমের বিষয় পুত্রকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। সুকুমার বলিলেন—"মা, যাঁরা কেবলমাত্র দেশের সেবায় জীবন কাটাতে প্রস্তুত আছেন, তাঁ'দের জন্য এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল।" শুনিয়া লাবণ্যময়ী কি এক চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

এতদিনে সুকুমারের পাঠ-সাধনা শেষ হইয়াছে। না খাইয়া বহুকষ্টে লাবণ্যময়ী পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন—এতদিনে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। সুকুমার এবার এম, এ পাশ করিয়াছেন।

সকলে বলিল এতদিনে লাবণ্যময়ীর দুঃখ ঘুচিল এবং সুকুমারের প্রতি অশেষ স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাহার জন্য ',টুক্‌টুকে বউ" আনিবার পরামর্শও অনেকে দিলেন।

প'তির মৃত্যুশয্যার অনুরোধ, আদেশ লাবণ্যময়ী তিলেকের জন্যও ভোলেন নাই; এখন সেই চিন্তা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অধিকার করিয়া বসিল। অনেক চিন্তার পর তিনি সুকুমারের সহিত এবিষয়ে কথা বলিলেন।

লাবণ্যময়ী বলিলেন—"তুমি আমার জন্য ভাব্‌ছ, বাবা? তুমি ভাব্‌ছ আমার প্রতি তোমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হবে? আমার জন্য ভেবোনা—ভগবান আছেন। আমার যদি আজ পাঁচটী ছেলে থাক্‌তো, তার একটিকে যদি আমি দেশের কাজে দিতাম, তাহ'লে তো "ত্যাগ" করা হ'ত না। যে ত্যাগে দুঃখ সহ্য কর্‌তে না হয়, সে ত্যাগ তো "ত্যাগ" নয়। আজ আমি ত্যাগ-স্বীকার কর্‌তে চাই,—জন্মভূমির জন্য ত্যাগ কর্‌তে চাই, তোমার বাবার শেষ আদেশ পালন কর্‌তে চাই। আজ যাও, বাবা, তুমি জন্মভূমির কাজে। তোমার মায়ের সমস্ত ভার ভগবানের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে যাও, নির্ভয়ে যাও।"

সুকুমার কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার পর্ণকুটীরের চির দরিদ্রা মাতাকে আজ অতুল মহিমায় মণ্ডিতা দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ভক্তি-অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আজ মাতার মধ্যে তিনি জননী জন্মভূমির অপরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইলেন। ভক্তিভরে মাতাকে প্রণাম করিয়া অশ্রু-ভরা হৃদয়ে ধীরে ধীরে বলিলেন—"বন্দে মাতরম্!"

আজ ১৩১৫ সালের ৩০এ আশ্বিন। আজ বাঙ্গলা দেশের শক্তি-উদ্বোধনের দিন—ভাই ভাই মিলিয়া মাতৃপূজার দিন। ত্যাগের মহাসঙ্গীতে আজ লাবণ্যময়ীর পুণ্যকুটীর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্নানান্তে সুকুমার আসিয়া মার কাছে দাঁড়াইলেন। লাবণ্যময়ী করযোড়ে মনে মনে বলিলেন—"আজ দেখ, প্রভু, তোমাকে সাক্ষী করে, আজ আমার সর্ব্বস্ব, ইহজীবনের আমার একমাত্র ধনকে জন্মভূমির চরণে অর্পণ করলাম। আমার জন্মভূমির তুমি কল্যাণ কর,—এর কল্যাণ হোক্।"

"আর আজ পরলোক থেকে তুমি চেয়ে দেখ—তোমার আদেশ আমি পালন করলাম, তোমার ধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার আমি করলাম।"

৩০এ আশ্বিন রাখিবন্ধনের সুপ্রভাতে জননীর চরণের ধূলি মাথায় লইয়া শুচিস্নাত দেহে, নগ্নপদে সুকুমার "সেবকাশ্রমে" সেবাব্রত লইতে চলিলেন।

বন্দে মাতরম্!!

শ্রীনির্ঝারণী ঘোষ।

সেবক।

জন্মভূমির স্বাধীন সেবক, মুক্ত
বিহঙ্গ সম ফিরে,
ধরণীর যত বরণীয় ধন, দিয়েছে
সে তুচ্ছ ক'রে।
আমি সরে যাই, তুমি সুখে থাক,
দাসের সেই মহৎ লক্ষ্য,
সুখ শান্তিতে দেশ পূর্ণ হোক,
জন্মভূমির তাপিত বক্ষ।
প্রভু পরমেশ, তোমার জগতে, ভক্ত
তোমার, তুমি তাহার।
তোমার সেবকে তোমার প্রেমে
বন্দী করেছ হৃদয় তা'র।
বিদূরিত কর সকল দুর্গতি, আন
শৌর্য্য, বীর্য্য বল,
তোমার শক্তি আসুক বঙ্গে,
নবশ্রী হোক্ মহীতল।
ভেদাভেদ সব ভুলিয়া যাক্, ঘরে
ঘরে হোক্ উদার মন,
এক অন্নছত্রে সবার বাস, এক
রবি বর্ষে কিরণ।
প্রভু পরমেশ, তোমার পতাকা
তোমার সেবকে কর দান,
তব গৌরবে দেশের গৌরব,
এক লক্ষ্যে দিক্ প্রাণ।
যাঁহার কৃপায় হৃদয়ে উপ্ত, দৃপ্ত
হয় অমর বল,
যাঁ'র নির্ঝর নদী পাষাণ ভেদি
উর্ব্বর করে মহীতল।
তাঁহার চরণ করিলে বরণ,
জগতে তুমি অমিত বল,
তব লাঞ্ছিত শির, বিজয় গর্ব্বে
দুঃখে দৈন্যে হ'বে অটল।
প্রভু পরমেশ, তোমারি সেবক,
জন্মভূমির দাসের দাস,
তুমি রেখ তা'রে:জগতের দ্বারে,
পুরাও তা'র উচ্চ-আশ।

তোমার অন্নে, তোমার জলে,
তৃপ্ত জগৎবাসী চয়,
তোমার নিয়ম যাহারা মানে
শত্রুর কাছে অজেয় হয়।
তোমার ঋদ্ধি যারে দিয়াছ,
সাধ্য কার হরিবে তার,
তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় তুমি,
অমৃতের পুত্র তোমারে চায়।
প্রভু পরমেশ, তোমার কাছে,
উচ্চ নীচ সবই সমান,
তবে কেন প্রভু, তা'দের দুঃখে,
কাঁদিবেনা দাসের প্রাণ?
জন্মভূমির শ্যামল বক্ষে,
তুমি দিয়েছ যা'দের স্থান,
তা'দের দৈন্যে হৃদয় পূর্ণ,
সেই কি হ'বে হতমান?
তোমার ন্যায়, ধর্ম্মে যদি,
হৃদয় প্রাণ পূর্ণিত হয়।
অজেয় বর্ম্মে তারে ঢেকেছ,
বিশাল বিশ্বে তার কি ভয়?
প্রভু পরমেশ, তোমার বিধান,
"যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"
যেন প্রাণান্তে লক্ষ্য না ছাড়ি,
হউক তোমার ইচ্ছার জয়।
মুক্ত কর দেব, প্রাণের দুয়ার,
মানব এসেছে কাছে,
বিরোধ সংশয় সব হোক্ ক্ষয়,
তোমার প্রেমের মাঝে।
জগতে প্রকাশ নব সুপ্রভাত,
বন্ধন ভাবনা-হীন,
সাম্যের বিষাণ, ভেরীর নিনাদে,
ঝঙ্কারিত নবদিন।
প্রভু পরমেশ, তোমার আশীষে,
তৃষ্ণা বিশুষ্ক মুখে,
তোমার কৃপায় অমিয় নির্ঝর
পাষাণ ধরিছে বুকে।
সে কি এসেছে ন্যায়ের রাজ্যে,
যুগান্ত লাঞ্ছনা ল'য়ে,
ঘৃণার পঙ্কে সে কি নিমজ্জিত,
রবে কি ধিক্কৃত হয়ে?
উঠ উঠ ওগো জগতবাসী,
আহ্বান এসেছে আজ,
যুগান্তের ঘৃণ্য কালিমা ধুইয়ে,
প'রে এস নব সাজ।
হে বরদাতা, বর দান কর,
তোমার চরণ সেবি,
তোমার ন্যায়, ধর্ম্ম, মানিয়া,
তোমার চরণ লভি।
প্রভু আমাদের বিশ্ব মহেশ্বর,
আমরা ভৃত্য তাঁরি,
যাত্রা মোদের অনন্তের পথে,
চল গেয়ে যাই সারি।
এস কর্ম্মি, ভক্ত মানব, এস,
কল্যাণময়ী নারী,
ধর্ম্মে কর্ম্মে এক হ'য়ে সব,
সাম্যের জয় উচ্চারি।
নব সুপ্রভাতে গাহি বিভু জয়,
শকতি আনগো ফিরে,
হারায়েছ যাহা যুগান্তের পথে,
আনগো সাধনা ক'রে।
উর্দ্ধ হ'তে এসেছে মন্ত্র,
বিভুরে ধরিয়া বুকে,
লক্ষ্য সুখে ভাসাও তরণী,
অসীম সিন্ধু মুখে।

বঙ্গনারী।

সুকুমার কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার পর্ণকুটীরের চির দরিদ্রা মাতাকে আজ অতুল মহিমায় মণ্ডিতা দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ভক্তি-অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আজ মাতার মধ্যে তিনি জননী জন্মভূমির অপরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইলেন। ভক্তিভরে মাতাকে প্রণাম করিয়া অশ্রু-ভরা হৃদয়ে ধীরে ধীরে বলিলেন—"বন্দে মাতরম্!"

আজ ১৩১৫ সালের ৩০এ আশ্বিন। আজ বাঙ্গলা দেশের শক্তি-উদ্বোধনের দিন—ভাই ভাই মিলিয়া মাতৃপূজার দিন। ত্যাগের মহাসঙ্গীতে আজ লাবণ্যময়ীর পুণ্যকুটীর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে!

স্নানান্তে সুকুমার আসিয়া মার কাছে দাঁড়াইলেন। লাবণ্যময়ী করযোড়ে মনে মনে বলিলেন—"আজ দেখ, প্রভু, তোমাকে সাক্ষী করে, আজ আমার সর্ব্বস্ব, ইহজীবনের আমার একমাত্র ধনকে জন্মভূমির চরণে অর্পণ করলাম। আমার জন্মভূমির তুমি কল্যাণ কর,—এর কল্যাণ হোক্।"

"আর আজ পরলোক থেকে তুমি চেয়ে দেখ—তোমার আদেশ আমি পালন করলাম, তোমার ধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার আমি করলাম।"

৩০এ আশ্বিন রাখিবন্ধনের সুপ্রভাতে জননীর চরণের ধূলি মাথায় লইয়া শুচিস্নাত দেহে, নগ্নপদে সুকুমার "সেবকাশ্রমে" সেবাব্রত লইতে চলিলেন।

বন্দে মাতরম্!!

শ্রীনির্ঝারণী ঘোষ।

সেবক।

জন্মভূমির স্বাধীন সেবক, মুক্ত
বিহঙ্গ সম ফিরে,
ধরণীর যত বরণীয় ধন, দিয়েছে
সে তুচ্ছ ক'রে।
আমি সরে যাই, তুমি সুখে থাক,
দাসের সেই মহৎ লক্ষ্য,
সুখ শান্তিতে দেশ পূর্ণ হোক,
জন্মভূমির তাপিত বক্ষ।
প্রভু পরমেশ, তোমার জগতে, ভক্ত
তোমার. তুমি তাহার।
তোমার সেবকে তোমার প্রেমে
বন্দী করেছ হৃদয় তা'র।
বিদূরিত কর সকল দুর্গতি, আন
শৌর্য্য, বীর্য্য বল,
তোমার শক্তি আসুক বঙ্গে,
নবশ্রী হোক্ মহীতল।
ভেদাভেদ সব ভুলিয়া যাক্, ঘরে
ঘরে হোক্ উদার মন,
এক অন্নছত্রে সবার বাস, এক
ঋষি বর্ষে কিরণ!
প্রভু পরমেশ, তোমার পতাকা
তোমার সেবকে কর দান,
তব গৌরবে দেশের গৌরব,
এক লক্ষ্যে দিক্ প্রাণ।
যাঁহার কৃপায় হৃদয়ে উপ্ত, দৃপ্ত
হয় অমর বল,
যাঁ'র নির্ঝর নদী পাষাণ ভেদি
উর্ব্বর করে মহীতল।
তাঁহার চরণ করিলে বরণ,
জগতে তুমি অমিত বল,
তব লাঞ্ছিত শির, বিজয় গর্ব্বে
দুঃখে দৈন্যে হ'বে অটল।
প্রভু পরমেশ, তোমারি সেবক,
জন্মভূমির দাসের দাস,
তুমি রেখ তা'রে:জগতের দ্বারে,
পুরাও তা'র উচ্চ-আশ!

তোমার অন্নে, তোমার জলে,
তৃপ্ত জগৎবাসী চয়,
তোমার নিয়ম যাহারা মানে
শত্রুর কাছে অজেয় হয়।
তোমার ঋদ্ধি যারে দিয়াছ,
সাধ্য কার হরিবে তার,
তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় তুমি,
অমৃতের পুত্র তোমারে চায়।
প্রভু পরমেশ, তোমার কাছে,
উচ্চ নীচ সবই সমান,
তবে কেন প্রভু, তা'দের দুঃখে,
কাঁদিবেনা দাসের প্রাণ?
জন্মভূমির শ্যামল বক্ষে,
তুমি দিয়েছ যা'দের স্থান,
তা'দের দৈন্যে হৃদয় পূর্ণ,
সেই কি হ'বে হতমান?
তোমার ন্যায়, ধর্ম্মে যদি,
হৃদয় প্রাণ পূর্ণিত হয়।
অজেয় বর্ম্মে তারে ঢেকেছ,
বিশাল বিশ্বে তার কি ভয়?
প্রভু পরমেশ, তোমার বিধান,
"যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"
যেন প্রাণান্তে লক্ষ্য না ছাড়ি,
হউক তোমার ইচ্ছার জয়।
মুক্ত কর দেব, প্রাণের দুয়ার,
মানব এসেছে কাছে,
বিরোধ সংশয় সব হোক্ ক্ষয়,
তোমার প্রেমের মাঝে।
জগতে প্রকাশ নব সুপ্রভাত,
বন্ধন ভাবনা-হীন,
সাম্যের বিষাণ, ভেরীর নিনাদে,
ঝঙ্কারিত নবদিন।
প্রভু পরমেশ, তোমার আশীষে,
তৃষ্ণা বিশুষ্ক মুখে,
তোমার কৃপায় অমিয় নির্ঝর
পাষাণ ধরিছে বুকে।
সে কি এসেছে ন্যায়ের রাজ্যে,
যুগান্ত লাঞ্ছনা ল'য়ে,
ঘৃণার পঙ্কে সে কি নিমজ্জিত,
রবে কি ধিক্কৃত হয়ে?
উঠ উঠ ওগো জগতবাসী,
আহ্বান এসেছে আজ,
যুগান্তের ঘৃণ্য কালিমা ধুইয়ে,
প'রে এস নব সাজ।
হে বরদাতা, বর দান কর,
তোমার চরণ সেবি,
তোমার ন্যায়, ধর্ম্ম, মানিয়া,
তোমার চরণ লভি।
প্রভু আমাদের বিশ্ব মহেশ্বর,
আমরা ভৃত্য তাঁরি,
যাত্রা মোদের অনন্তের পথে,
চল গেয়ে যাই সারি।
এস কর্ম্মি, ভক্ত মানব, এস,
কল্যাণময়ী নারী,
ধর্ম্মে কর্ম্মে এক হ'য়ে সব,
সাম্যের জয় উচ্চারি।
নব সুপ্রভাতে গাহি বিভু জয়,
শকতি আনগো ফিরে,
হারায়েছ যাহা যুগান্তের পথে,
আনগো সাধনা ক'রে।
উর্দ্ধ হ'তে এসেছে মন্ত্র,
বিভুরে ধরিয়া বুকে,
লক্ষ্য সুখে ভাসাও তরণী,
অসীম সিন্ধু মুখে।

বঙ্গনারী।

রাখী বন্ধন।

সেই কাল দিন আজি ;
ভাই বোন সবে,
মায়ের বিচ্ছিন্ন দেহ
এস বাঁধি সবে।
ভুলিও না এই দিন—
এ মহা মিলন,
মোহ ভঙ্গ জাগরণ,
মাতৃ আরাধন।
ভুলিও না কেহ আজি,
মায়ের যাতনা,
উত্থিষ্ঠ—জাগ্রত হও,
লভহে চেতনা।
একসূত্রে বাঁধি এস
বিশকোটী প্রাণ,
এক ধ্যান, এক পণ,
কর সবে জ্ঞান।
"মুছাইব জননীর,
অশ্রুসিক্ত আঁখি"
এ মহা প্রতিজ্ঞা করি,
এস বাঁধি রাখী।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত
শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত

অঞ্জলি।

কবিগুণাকর
শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস, এম,এ, বি,এল,
মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা।

এই গীতিকাব্যখানি সুধীসমাজে এবং বহুতর সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র পত্রিকায় বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইয়াছে।

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

—"* * * 'অঞ্জলি' জননী শ্বেতাব্জ-বাসিনী সরস্বতীর চরণাশ্রিত একটি শ্বেতপদ্ম কোরক, উহার কবিতাগুলি তেমনি পবিত্র, তেমনি সুন্দর, তেমনি ভক্তিমধুপূর্ণ। এমন পবিত্র ভাবপূর্ণ সরল কবিতা বড় বেশী পড়িয়াছি, স্মরণ হয় না।" * * *

মূল্য বার আনা। কলিকাতা, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে এবং ২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট মজুমদার লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

নানা মাসিক পত্রের প্রসিদ্ধ লেখক
শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, প্রণীত
দুইখানি সর্ব্বজন প্রশংসিত
স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক!

১। কয়েকখানি পত্র।

ইহাতে স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর নিকট পত্রচ্ছলে বিবাহিত জীবনের সুখশান্তি বিধায়ক এবং স্ত্রী চরিত্রের উৎকর্ষ সম্পাদক গুণাবলীর বিকাশের উপদেশ অতি সহজ ও বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। লেখা পড়া, গৃহকর্ম্ম, লজ্জা, সহিষ্ণুতা, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বহু বিষয়ের উপদেশ সরলভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। নব্যভারত, বসুমতী, আলোচনা, প্রদীপ, অনুসন্ধান, প্রবাসী, জন্মভূমি বেঙ্গলী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় এবং ময়ুরভঞ্জের মহারাজা, রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর, স্কুল ইনস্পেক্টার মৌলবী আবদুল করিম, বি, এ, স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ, বি, এল, জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ইত্যাদি বহুবিধ শিক্ষিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত। বিবাহযোগ্যা বালিকাকে উপহার দিবার অমূল্য গ্রন্থ। প্রত্যেক পিতা কন্যাকে, স্বামী স্ত্রীকে, ভ্রাতা ভগিনীকে দিতে পারেন। মূল্য আবাঁধা ৷৵০, বাঁধাই ৸০ আনা।

২। সতী প্রশস্তি।

ইহাতে সতীর পরলোক গমন বর্ণনাচ্ছলে জন্ম-মৃত্যু রহস্য, পরলোক তত্ত্ব, কর্ম্মফল, রমণী জীবনের কর্ত্তব্য, শ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি অতি সুন্দর পদ্যে বর্ণিত। মাননীয় ময়ূরভঞ্জের মহারাজ বাহাদুর ইহা পড়িয়া সন্তুষ্ট হইয়া ইহার মুদ্রণ ব্যয় প্রদান করিয়া লেখককে উৎসাহিত করিয়াছেন। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর প্রভৃতি বহু সুধীগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত। মূল্য ৷৹ আনা।

প্রকাশক—দত্ত, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং।
৭০নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজুমদার লাইব্রেরী ২০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটেও পাওয়াযায়।

নববর্ষের ভারতী।

১৩১৫ সালের বৈশাখ হইতে ভারতী নূতন ভাবে, নূতন আকারে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনে সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের রচিত সুখপাঠ্য উপন্যাস, ছোট গল্প কবিতা এবং নানাবিধ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পূর্ণ হইয়া বাহির হইয়াছে।

ভাদ্রের ভারতী ১লা ভাদ্রেই প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত সংখ্যার বিষয়ঃ—

বিষয়	...	শ্রীকুলদাকুমার সেন রায় বি, এ,
চন্দ্রে জীব আছে কিনা?	...	শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
হ্যাম্বির ...	...	শ্রীমতী অনুপমা দেবী
বিস্মৃত স্মৃতি ...	...	শ্রীতরুণরাম ফুকণ
সন্ধ্যা ...	...	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ
সন্ধ্যায় ...	...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
মিলনের আশা ...	...	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
আধুনিক জাপান ...	...	শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
আদর্শ জননী ...	...	শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী
ভারতে ডাক প্রথা ...	...	শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী
মেয়েযজ্ঞি ...	...	শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ-জায়া
দূরে অতি দূরে ...	...	
আমাদের কর্ত্তব্য ...	...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
নির্ভর ...	...	
রাজ্যের কথা ...	...	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পূর্ব্ব ও পশ্চিম ...	...	
সমালোচনা ...	...	

স্নেহলতা। সামাজিক উপন্যাস—দুই খণ্ড। মূল্য ২৲ টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই উপন্যাস গ্রন্থ যেমন ঘটনাবহুল-তেমনই কৌতুহলোদ্দীপক ও সকরুণ। বঙ্গসমাজের ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বিচিত্র চিত্র। যিনিই পাঠ করিবেন তিনিই মুগ্ধ হইবেন।

পুরাতন ভারতী।

পুরাতন ভারতী সমস্ত বিক্রয় করিয়া ফেলা হইতেছে। যদি কোন সংখ্যা কাহারও আবশ্যক থাকে। এই বেলা লিখিবেন। একখানির মূল্য ৶৹ ছয় আনা।

১৩১১ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতী সম্পূর্ণ খণ্ড ৪৲ চারি টাকা। ১৩১১ সাল হইতে সম্পূর্ণ খণ্ড ৩৲ তিন টাকা। যে সালের দু একখানি কম আছে তাহার অর্দ্ধমূল্য।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড।

...ীয় বর্ষ। কার্ত্তিক, ১৩১৫। ৪র্থ সংখ্যা।

সুপ্রভাত

"নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা
আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে
প্রাচীন রজনী নাশো
নূতন উষালোকে।"

শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি.এ সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৶৹ টাকা।

আজ

ধনীর সুপ্রভাত !
গৃহীর সুপ্রভাত !
সৌখীনের সুপ্রভাত !
মহিলার সুপ্রভাত !

কারণ,

যুক্তবঙ্গের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কারখানাজাত

বেঙ্গল সোপ

অভিনব শিল্পজগতে অভাবনীয় যুগান্তর
ঘটাইয়াছে !

কিবা আকারের নয়নাভিরাম মনোহারিত্ব, কিবা
মধুরিমাময় মর্দ্দিত মৃণালবৎ সৌরভ !

বেঙ্গল সোপ

প্রত্যুতঃই স্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি !!!

তাই বলিতেছিলাম শিল্পজগতে আজ

সুপ্রভাত !

অফিস ও কারখানা—

৬৪।১ মেছুয়াবাজার রোড্, কলিকাতা।

আনন্দমোহন বসু।
(এম,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর)

সুপ্রভাত

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর ;
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

দ্বিতীয় বর্ষ। | কার্ত্তিক, ১৩১৫ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

মা'র প্রতি।

করিলি দান আমার প্রাণ
আপন হৃদি-রুধিরে,
রাখিলি মোরে বুকের' পরে
তুলিয়া!—
আমি যে দীন ; সে মহা ঋণ
কেমনে মাগো, শুধিরে ?
যাইব কোথা তোমার কথা
ভুলিয়া!—

নাহি গো যদি সে রূপ-জ্যোতি,
কি আছে তাহে ক্ষতি মা ?—
ও হিয়া মাঝে স্নেহতো রাজে
তেমনি!
বিগত সব তব বিভব,
অতীত তব গরিমা ;—
তবুতো তুমি জনম-ভূমি
জননী!

এমন করে,' স্নেহের তরে
বাঁচা'লি সুধা পিয়ায়ে
কেন মা,—যদি না পারি ক্ষতি
পূরা'তে ?
সহি' এ হেন যাতনা, কেন
রাখিলি বুকে জীয়ায়ে—
যদি না পারি, ও আঁখি-বারি
মুছাতে ?

দুঃখিনী বলে' উঠে'ছে জ্বলে'
আজি এ প্রাণে বেদনা ;
নয়ন ভরি' পড়েগো ঝরি
ভকতি !
মিনতি করি চরণে ধরি—
কেঁদনা মাগো, কেঁদনা !
তব এ দুঃখে জেগে'ছে বুকে
শকতি !

আজি মা, তোরে বেসেছি ওরে—
দ্বিগুণ ভালো বেসেছি ;
ভকতি সনে জেগেছে মনে
বেদনা !
কেটে'ছে মোর তন্দ্রা-ঘোর,
এসেছি—ছুটে' এসেছি ;
কেঁদনা মাগো, কেঁদনা, আর
কেঁদনা !

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

প্লিনির ভারত বিবরণী।

সুবিখ্যাত লেখক প্লিনি ২৩ খৃষ্টাব্দে কোমো নগরে জন্ম পরিগ্রহ করেন। কোমো নগরে তাঁহার ভূসম্পত্তি ছিল। নৃপতি কুলকলঙ্ক নিরোর মৃত্যুর পর তিনি রোম নগরে গমন করেন। অতঃপর তাঁহার উপর অজস্রধারে রাজানুগ্রহ বর্ষিত হয়; তিনি সম্রাট ভেস পাসিয়ান এবং রাজকুমার টিটাসের শ্রদ্ধা ও প্রীতির আস্পদ ছিলেন। প্লিনি তাঁহাদের অধীনে বিশিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং অবসর কা সাহিত্য চর্চ্চায় যাপন করেন। ৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহা সুবিখ্যাত প্রাকৃতিক ইতিহাস পরিসমাপ্ত হয়; তি এই গ্রন্থ স্বীয় পৃষ্ঠপোষক টিটাসের নামে উৎস করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন। ইহা পর তিনি মাত্র দুই বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহা মৃত্যু অতি শোচনীয় হইয়াছিল। আগ্নেয় গি

ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পি এবং হারকুলিয়ান নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত কালে প্লিনি শ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। প্লিনির গ্রন্থে তাদৃশ মৌলিকতা পরিদৃষ্ট না হইলেও তাহা নানা বিষয়ক বহু তত্ত্বের সমাবেশ জন্য মূল্যবান। বস্তুত তদীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে উপলব্ধি হয় যে, তাঁহার অধ্যয়ন স্পৃহা অতিশয় বলবতী ছিল। প্লিনির ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃব্যের এক সংক্ষিপ্ত জীবনী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা এই জীবনী পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, আহার অথবা ভ্রমণ কালে তাঁহার নিকট গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য পাঠক নিযুক্ত রাখিবার নিয়ম ছিল। প্লিনি সর্ব্ববিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন এবং অতি অসার গ্রন্থ হইতেও সার সংগ্রহ করিয়া লইতেন। তিনি অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে অনেক অপ্রাকৃত বিষয় লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্লিনির ইতিহাস সুবৃহৎ পুস্তক, সপ্তত্রিংশতি খণ্ডে বিভক্ত। ষষ্ঠ খণ্ডে ভারতবর্ষীয় ভূগোলবৃত্তান্ত সম্পর্কীয় প্রস্তাব সন্নিবদ্ধ আছে।

প্লিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ;—ভারতবর্ষে অসংখ্য জাতি ও নগর দেখিতে পাওয়া যায়। আলেকজাণ্ডারের বিজয় বাহু পাশ্চাত্য জাতি সমূহের সমক্ষে এই দেশের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিল, তার পর তদীয় পরবর্ত্তী সিলিকাস এবং এণ্টিওকাস ভারতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য দেশ সমূহের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন সম্পর্কে সহায়তা করেন। নৌসেনাপতি পাট্রোক্লেস এবং মেগাস্থিনিস ও ডিওনিসাস প্রভৃতি রাজদূত তারতীয় জাতি ও রাজন্যবৃন্দের সর্ব্ববিধ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। আলেকজেণ্ডারের সহচরগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের গ্রীক-বিজিত অংশেই পঞ্চ সহস্র সুদৃশ্য নগর বিদ্যমান ছিল, এই সকল নগরের কোনটিরই পরিমাণ এক ক্রোশের কম ছিল না। ঐ ভূমিতে নয়টি বিভিন্ন জাতির বাস ছিল; ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর তৃতীয় অংশ বলিয়া পরিগণিত; ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা অগণ্য ছিল। ভারত বর্ষের লোক সংখ্যা অগণ্য হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, পৃথিবীর নানা দেশবাসী মধ্যে এক মাত্র ভারতবাসীই স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে অভ্যস্থ হয়। সোনসা নামক আমাদের এক জন প্রতিবাসী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক খানি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, ভারতবর্ষের নদীর সংখ্যা ৩০ এবং জাতির সংখ্যা ১১৮।

ভারতভূমি চিরকাল ধনশালিনী ; অতি প্রাচীন কাল হইতেই বৈদেশিকগণ ধনলোভে ভারতবর্ষে উপনীত হইতেন, ভারতবাসীও পরদেশ হইতে ধন আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে বিদেশে গমন করিতেন। প্লিনির গ্রন্থ হইতে আমরা এতৎসম্বন্ধীয় তত্ত্ব অবগত হইতে পারি। একদা কতিপয় ভারতবাসী বাণিজ্য পোতারোহণে ইউরোপ গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হওয়াতে, তাঁহাদের পোত জর্ম্মণীর উপকূলে নীত হয়! সুয়েভির অধিপতি তাঁহাদিগকে নিঃসহায় অবস্থায় দেখিয়া ধৃত করেন এবং উপঢৌকন রূপে গলের শাসনপতি মেটিলাস সেনারের নিকট পাঠান। বণিকগণ ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক এক সপ্তাহকাল পথ অতিবাহিত করিয়া ইয়ারবাস নদীতে উপনীত হইতেন. এই নদীর সহিত সর্ব্বজন পরিচিত অক্সাস নদীর সংযোগ ছিল। তাঁহারা ইয়ারকাস ও অক্সাস উত্তীর্ণ হইয়া কাস্পিয়ানের কূলে উপনীত হইতেন। এই স্থান হইতে স্থলপথে ভারতীয় পণ্যরাজি ইউরোপের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িত। প্লিনির গ্রন্থে ঈদৃশ একাধিক বাণিজ্য পথের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ ভারতীয় বাণিজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যগত বাণিজ্যের অনেক পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। অনুকূল বায়ু প্রবাহিত থাকিলে ইউরোপীয় বণিকগণ চল্লিশ দিনে মুজিরিস নামক বন্দরে উপনীত হইতেন। ভারতবর্ষের বন্দরসমূহের মধ্যে মুজিরিসই ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা

নিকটবর্ত্তী ছিল। ভারতসমুদ্র জলদস্যু পূর্ণ ছিল। এই কারণ বাণিজ্য পোত সকলে উৎকৃষ্ট তীরন্দাজ-গণ অবস্থিতি করিত। মুজিরিস বন্দর বাণিজ্যের পক্ষে নানা প্রকার অসুবিধাজনক ছিল। মুজিরিসের অদূরবর্ত্তী নাইট্রিয়াস (বর্ত্তমান ম্যাঙ্গালোর) নামক স্থানে দস্যুরা বাস করিত, মুজিরিসে রপ্তানীর জন্য বিক্রেয় মালের আমদানী অল্প হইত; মুজিরিসের কূল হইতে বাণিজ্য পোত সকল দূরে থাকিত বলিয়া পণ্য সকল পোত হইতে তীরে এবং তীর হইতে পোতে উত্তোলন করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার প্রয়োজন ছিল। (ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত) নিসিনভন বা বেকার বন্দর বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল স্থান ছিল। কোওনারা (বর্ত্তমান টেলিচারি) নামক স্থান হইতে বেকার বন্দরে বহুল পরিমাণে গোল মরিচ আগত হইত। ইউরোপীয় বণিকগণ ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ফলতঃ তাঁহারা এক বৎসরেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়া স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিতেন।

তাদৃশ প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে বর্ণভেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল। প্লিনির গ্রন্থেও তাহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত বর্ণনা মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া আমার তৎসংকলনে বিরত রহিলাম।

প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের কি বৃক্ষ-লতা, কি পশুপক্ষী, সমস্তই বলিষ্ঠ ও বৃহদাকার। আমরা এই প্রসঙ্গে তাঁহার গ্রন্থ হইতে কিয়দংশের অনুবাদ প্রদান করিতেছি। "ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার পশু পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা উল্লেখ করিতেছি যে, ভারতীয় কুকুর অন্য দেশের কুকুর অপেক্ষা বৃহৎ এবং ভারতীয় বৃক্ষ সকল এত উচ্চ যে, তাহার উপর দিয়া তীর নিক্ষেপ করা সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষের ভূমি উর্ব্বরা, আর হাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং জল পর্য্যাপ্ত বলিয়া (বৃক্ষাদি এতদূর বৃহদাকার হইয়া থাকে যে) একটি মাত্র ডুম্বর বৃক্ষের তলে একদল অশ্বারোহী সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, এই বিষয় অবিশ্বাস্য হইতে পারে, কিন্তু এই রূপই কথিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নল খাগড়া দ্বারা ডিঙ্গি নৌকা প্রস্তুত করা হয়; এই নল খাগড়া অতি দীর্ঘ বলিয়া উহার একটি গাঁইট পরিমিত লম্বা ডিঙ্গি নৌকা প্রস্তুত করিলেই তাহাতে তিন জন পর্য্যন্ত লোক আরোহণ করিয়া গমনাগমন করিতে পারে।"

অতঃপর প্লিনি ভারতবাসী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহা সর্ব্ববাদী স্বীকার্য্য যে, অনেক ভারতবাসী দৈর্ঘে পাঁচ হাত; তাহারা নিষ্ঠীবন ফেলে না এবং মস্তিষ্ক, চক্ষু ও কর্ণের বেদনায় পীড়িত হয় না, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশে কখন কখন ব্যথা অনুভব করে; ভারতবাসী সূর্য্যের নাতিশীতোষ্ণ তাপে শারীরিক বলিষ্ঠতা লাভ করে। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় দার্শনিকগণ সূর্য্যাভিমুখে নিশ্চল রূপে চক্ষু স্থাপন করিয়া একভাবে অথবা উত্তপ্ত বালুকার উপরে একপদে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন। * * * তোরণ কোরামণ্ডি নামক একটী ভারতীয় জাতির উল্লেখ করিয়াছেন; ইহারা জঙ্গলে বাস করে; ইহাদের বাক্‌শক্তি অতি সামান্য স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারা পেচকের মত এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করে, ইহাদের এই চীৎকার শুনিতে ভয়াবহ। কোরোমণ্ডিদের শরীর লোমাবৃত, তাহাদের চক্ষু নীলাভ ধূসরবর্ণ এবং দন্ত কুকুরের ন্যায়। ইউডো সাক্স লিখিয়া গিয়াছেন যে, দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী পুরুষের পায়ের পাতা একহাত লম্বা, কিন্তু রমণীগণের পায়ের পাতা এত ক্ষুদ্র যে তাহা চড়াই পক্ষীর পা নামে কথিত হয়। (১) * * * ভারতবাসী একশত ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। তাহারা জরাগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পায় না। মৃত্যুকালে তাহাদের শরীরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যেন অর্দ্ধ বয়সে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

(১) The reference may be to the Chinese. J. W. Mc Rindle.

ভারতবর্ষে কলিঙ্গ নামে এক জাতির বাস। পঞ্চম বৎসরে কলিঙ্গ রমণী অন্তর্ব্বত্নী হয়; অষ্টম বর্ষেই তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে। (১) অন্যান্য স্থানে এরূপ লোক দেখা যায়, যাহাদের লেজ জন্মাবধি লম্বা চুলে আবৃত। এই সকল লোক অতি দ্রুতগামী। অন্য এক জাতীয় লোকের কর্ণ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। ভারতবর্ষের সীমান্তবর্ত্তিনী নদীর অপরতীরে ওরাইটি নামক জাতির বাস। ওরাইটীরা কেবল মৎস্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহারা মৎস্য নখ দ্বারা খণ্ড খণ্ড পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রুটী প্রস্তুত করে; ক্লিটারকাস এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। * * * আলেকজেণ্ডারের রণতরীর অধ্যক্ষগণ আরাবিস নদীর তীরবাসী গিড্রোসিয়ান জাতির সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাহারা মৎস্যের হনুস্থি (jawbones) দ্বারা গৃহের ছাদ নির্ম্মাণ করে। এই সকল মৎস্যের অনেকগুলি চল্লিশ হাত পর্য্যন্ত লম্বা থাকে।"

ভারত ভূমি প্রকৃতির রম্য কানন; এই স্থানে নানা জাতীয় বিচিত্র দৃশ্য বৃক্ষ লতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। প্লিনির গ্রন্থেও ইহার সাক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তদীয় গ্রন্থে বহু জাতীয় বৃক্ষ লতার বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু তৎসমুদয়ের ভারতীয় নাম প্রদত্ত না হওয়াতে পাঠকগণের কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করিবার উপায় নাই। যাহা হউক, প্লিনি বর্ণিত কোন কোন বৃক্ষ লতার বিষয় আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। আবলুস বৃক্ষ কেবল ভারতবর্ষেই জন্মিত; ভার্জ্জিল লিখিয়া গিয়াছেন যে, আবলুস কাঠ কেবল ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইত। প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে ভারতবাসী এক শত আবলুস কাঠের তক্তা এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমিত স্বর্ণ ও গজদন্ত রাজকর স্বরূপ পারস্যাধিপতির নিকট প্রেরণ করিত। ভারতবর্ষে ডুম্বর বৃক্ষ অতি ঘনভাবে জন্মিত বলিয়া তাহার তলে লতামণ্ডপের মত হইত; তৎস্থানে মেষপালকেরা গ্রীষ্মকাল যাপন করিত। ভারতবর্ষে এক প্রকার বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিত; এই বৃক্ষের ফল অতি সুমিষ্ট ছিল। ভারতীয় চাষিগণ উহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। ঐ ফল বৃক্ষের ত্বকে জন্মিত এবং অত্যন্ত সুস্বাদ রসের জন্য খ্যাত ছিল। এক একটী ফল এত বড় হইত যে, একটী ফলেই চারিজন ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারিত। প্রাগুক্ত বৃক্ষের ন্যায় আর এক প্রকার বৃক্ষ জন্মিত। এই বৃক্ষের ফল উক্ত ফল অপেক্ষা সুমিষ্ট ছিল। কিন্তু তদাহারে পেটের পীড়া উপস্থিত হইত; এই কারণ আলেক্‌জেণ্ডার তদীয় সৈন্যবৃন্দকে উহা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আর এক জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইত। ভারতবাসী এই বৃক্ষ হইতে এক প্রকার ক্ষৌম বস্ত্র প্রস্তুত করিত। ভারতবর্ষের জলপাই গাছ ফলহীন ছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গোলমরিচের গাছ জন্মিত। এক জাতীয় বৃক্ষের ত্বক জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ মধুসহ সেবন করিলে আমাশয় রোগ নিবৃত্তি পাইত। আরব দেশেও চিনি প্রস্তুত হইত; কিন্তু ভারতীয় চিনিই লোকের অধিকতর প্রিয় ছিল। ভারতজাত চিনি এক প্রকার নলের রস হইতে প্রস্তুত হইত। এই রস নির্য্যাসের মত সাদা ছিল। ভারত সীমান্তে এরাইন নামক দেশে এক প্রকার বিষাক্ত গুল্ম জন্মিত; ইহার মূল মূলার মত এবং পাতা Laurel গুল্মের (পূর্ব্বে এই গুল্মের পত্রে সম্মান সূচক মুকুট প্রস্তুত হইত) মত ছিল। এই গুল্মের গন্ধ অশ্বের চিত্ত আকর্ষণ করিত। এই কারণ আলেক্‌জেণ্ডার ভারত সীমান্তে পৌঁছিলে তাঁহার অধিকাংশ অশ্বারোহী সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়; গেড্রোসিয়া প্রদেশেও আলেকজেণ্ডারের রণতরীর যে সকল অধ্যক্ষ ভারত সমুদ্রে নৌ পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা এক প্রকার জলজ বৃক্ষ দর্শন করেন। এই বৃক্ষ জলে থাকিলে উহার পাতা সবুজ দেখাইত, কিন্তু জল হইতে উত্তোলন

(১) The calingal lived along the more northern shore of Bengal. Their Capital was Purthalis. G. W. Mc Rindle.

নিকটবর্ত্তী ছিল। ভারতসমুদ্র জলদস্যু পূর্ণ ছিল। এই কারণ বাণিজ্য পোত সকলে উৎকৃষ্ট তীরন্দাজ-গণ অবস্থিতি করিত। মুজিরিস বন্দর বাণিজ্যের পক্ষে নানা প্রকার অসুবিধাজনক ছিল। মুজিরিসের অদূরবর্ত্তী নাইট্রিয়াস (বর্ত্তমান ম্যাঙ্গালোর) নামক স্থানে দস্যুরা বাস করিত, মুজিরিসে রপ্তানীর জন্য বিক্রেয় মালের আমদানী অল্প হইত; মুজিরিসের কূল হইতে বাণিজ্য পোত সকল দূরে থাকিত বলিয়া পণ্য সকল পোত হইতে তীরে এবং তীর হইতে পোতে উত্তোলন করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার প্রয়োজন ছিল। (ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত) নিসিনভন বা বেকার বন্দর বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল স্থান ছিল। কোওনারা (বর্ত্তমান টেলিচারি) নামক স্থান হইতে বেকার বন্দরে বহুল পরিমাণে গোল মরিচ আগত হইত। ইউরোপীয় বণিকগণ ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ফলতঃ তাঁহারা এক বৎসরেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়া স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিতেন।

তাদৃশ প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে বর্ণভেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল। প্লিনির গ্রন্থেও তাহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত বর্ণনা মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া আমার তৎসংকলনে বিরত রহিলাম।

প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের কি বৃক্ষ-লতা, কি পশুপক্ষী, সমস্তই বলিষ্ঠ ও বৃহদাকার। আমরা এই প্রসঙ্গে তাঁহার গ্রন্থ হইতে কিয়দংশের অনুবাদ প্রদান করিতেছি। "ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার পশু পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা উল্লেখ করিতেছি যে, ভারতীয় কুকুর অন্য দেশের কুকুর অপেক্ষা বৃহৎ এবং ভারতীয় বৃক্ষ সকল এত উচ্চ যে, তাহার উপর দিয়া তীর নিক্ষেপ করা সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষের ভূমি উর্ব্বরা, আর হাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং জল পর্য্যাপ্ত বলিয়া (বৃক্ষাদি এতদূর বৃহদাকার হইয়া থাকে যে) একটি মাত্র ডুম্বর বৃক্ষের তলে একদল অশ্বারোহী সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, এই বিষয় অবিশ্বাস্য হইতে পারে, কিন্তু এই রূপই কথিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নল খাগড়া দ্বারা ডিঙ্গি নৌকা প্রস্তুত করা হয়; এই নল খাগড়া অতি দীর্ঘ বলিয়া উহার একটি গাঁইট পরিমিত লম্বা ডিঙ্গি নৌকা প্রস্তুত করিলেই তাহাতে তিন জন পর্য্যন্ত লোক আরোহণ করিয়া গমনাগমন করিতে পারে।"

অতঃপর প্লিনি ভারতবাসী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহা সর্ব্ববাদী স্বীকার্য্য যে, অনেক ভারতবাসী দৈর্ঘে পাঁচ হাত; তাহারা নিষ্ঠীবন ফেলে না এবং মস্তিষ্ক, চক্ষু ও কর্ণের বেদনায় পীড়িত হয় না, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশে কখন কখন ব্যথা অনুভব করে; ভারতবাসী সূর্য্যের নাতিশীতোষ্ণ তাপে শারীরিক বলিষ্ঠতা লাভ করে। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় দার্শনিকগণ সূর্য্যাভিমুখে নিশ্চল রূপে চক্ষু স্থাপন করিয়া একভাবে অথবা উত্তপ্ত বালুকার উপরে একপদে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন। * * * তোরণ কোরামণ্ডি নামক একটী ভারতীয় জাতির উল্লেখ করিয়াছেন; ইহারা জঙ্গলে বাস করে; ইহাদের বাক্‌শক্তি অতি সামান্য স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারা পেচকের মত এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করে, ইহাদের এই চীৎকার শুনিতে ভয়াবহ। কোরোমণ্ডিদের শরীর লোমাবৃত, তাহাদের চক্ষু নীলাভ ধূসরবর্ণ এবং দন্ত কুকুরের ন্যায়। ইউডো সাক্স লিখিয়া গিয়াছেন যে, দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী পুরুষের পায়ের পাতা একহাত লম্বা, কিন্তু রমণীগণের পায়ের পাতা এত ক্ষুদ্র যে তাহা চড়াই পক্ষীর পা নামে কথিত হয়। (১) * * * ভারতবাসী একশত ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। তাহারা জরাগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পায় না। মৃত্যুকালে তাহাদের শরীরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যেন অর্দ্ধ বয়সে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

(১) The reference may be to the Chinese. J. W. Mc Rindle.

ভারতবর্ষে কলিঙ্গ নামে এক জাতির বাস। পঞ্চম বৎসরে কলিঙ্গ রমণী অন্তর্ব্বত্নী হয়; অষ্টম বর্ষেই তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে। (১) অন্যান্য স্থানে এরূপ লোক দেখা যায়, যাহাদের লেজ জন্মাবধি লম্বা চুলে আবৃত। এই সকল লোক অতি দ্রুতগামী। অন্য এক জাতীয় লোকের কর্ণ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। ভারতবর্ষের সীমান্তবর্ত্তিনী নদীর অপরতীরে ওরাইটি নামক জাতির বাস। ওরাইটীরা কেবল মৎস্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহারা মৎস্য নখ দ্বারা খণ্ড খণ্ড পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রুটী প্রস্তুত করে; ক্লিটারকাস এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। * * * আলেকজেণ্ডারের রণতরীর অধ্যক্ষগণ আরাবিস নদীর তীরবাসী গিড্রোসিয়ান জাতির সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাহারা মৎস্যের হনুস্থি (jawbones) দ্বারা গৃহের ছাদ নির্ম্মাণ করে। এই সকল মৎস্যের অনেকগুলি চল্লিশ হাত পর্য্যন্ত লম্বা থাকে।"

ভারত ভূমি প্রকৃতির রম্য কানন; এই স্থানে নানা জাতীয় বিচিত্র দৃশ্য বৃক্ষ লতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। প্লিনির গ্রন্থেও ইহার সাক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তদীয় গ্রন্থে বহু জাতীয় বৃক্ষ লতার বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু তৎসমুদয়ের ভারতীয় নাম প্রদত্ত না হওয়াতে পাঠকগণের কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করিবার উপায় নাই। যাহা হউক, প্লিনি বর্ণিত কোন কোন বৃক্ষ লতার বিষয় আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। আবলুস বৃক্ষ কেবল ভারতবর্ষেই জন্মিত; ভার্জ্জিল লিখিয়া গিয়াছেন যে, আবলুস কাঠ কেবল ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইত। প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে ভারতবাসী এক শত আবলুস কাঠের তক্তা এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমিত স্বর্ণ ও গজদন্ত রাজকর স্বরূপ পারস্যাধিপতির নিকট প্রেরণ করিত। ভারতবর্ষে ডুম্বর বৃক্ষ অতি ঘনভাবে জন্মিত বলিয়া তাহার তলে লতামণ্ডপের মত হইত; তৎস্থানে মেষপালকেরা গ্রীষ্মকাল যাপন করিত। ভারতবর্ষে এক প্রকার বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিত, এই বৃক্ষের ফল অতি সুমিষ্ট ছিল। ভারতীয় চাষিগণ উহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। ঐ ফল বৃক্ষের ত্বকে জন্মিত এবং অত্যন্ত সুস্বাদ রসের জন্য খ্যাত ছিল। এক একটী ফল এত বড় হইত যে, একটী ফলেই চারিজন ব্যক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারিত। প্রাগুক্ত বৃক্ষের ন্যায় আর এক প্রকার বৃক্ষ জন্মিত। এই বৃক্ষের ফল উক্ত ফল অপেক্ষা সুমিষ্ট ছিল। কিন্তু তদাহারে পেটের পীড়া উপস্থিত হইত; এই কারণ আলেক্‌জেণ্ডার তদীয় সৈন্যবৃন্দকে উহা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আর এক জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইত। ভারতবাসী এই বৃক্ষ হইতে এক প্রকার ক্ষৌম বস্ত্র প্রস্তুত করিত। ভারতবর্ষের জলপাই গাছ ফলহীন ছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গোলমরিচের গাছ জন্মিত। এক জাতীয় বৃক্ষের ত্বক জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ মধুসহ সেবন করিলে আমাশয় রোগ নিবৃত্তি পাইত। আরব দেশেও চিনি প্রস্তুত হইত; কিন্তু ভারতীয় চিনিই লোকের অধিকতর প্রিয় ছিল। ভারতজাত চিনি এক প্রকার নলের রস হইতে প্রস্তুত হইত। এই রস নির্য্যাসের মত সাদা ছিল। ভারত সীমান্তে এরাইন নামক দেশে এক প্রকার বিষাক্ত গুল্ম জন্মিত; ইহার মূল মূলার মত এবং পাতা Laurel গুল্মের (পূর্ব্বে এই গুল্মের পত্রে সম্মান সূচক মুকুট প্রস্তুত হইত) মত ছিল। এই গুল্মের গন্ধ অশ্বের চিত্ত আকর্ষণ করিত। এই কারণ আলেক্‌জেণ্ডার ভারত সীমান্তে পৌঁছিলে তাঁহার অধিকাংশ অশ্বারোহী সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়; গেড্রোসিয়া প্রদেশেও আলেকজেণ্ডারের রণতরীর যে সকল অধ্যক্ষ ভারত সমুদ্রে নৌ পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা এক প্রকার জলজ বৃক্ষ দর্শন করেন। এই বৃক্ষ জলে থাকিলে উহার পাতা সবুজ দেখাইত, কিন্তু জল হইতে উত্তোলন

(১) The calingal lived along the more northern shore of Bengal. Their Capital was Purthalis. G. W. Mc Rindle.

করিলেই উহা লবণে পরিণত হইত। ভারতীয়গণ তালের রস দ্বারা সুরা প্রস্তুত করিত। বস্তুতঃ সমগ্র প্রাচ্য দেশেই তালের রস দ্বারা সুরা প্রস্তুত করিবার প্রথা বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষে বাদাম, তিল এবং চাউল হইতে তৈল প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষ কর্ষণজাত এবং স্বজাত,—এই দুই প্রকার যব জন্মিত। ভারতবাসী যবচূর্ণ দ্বারা উৎকৃষ্ট রুটী এবং মণ্ড প্রস্তুত করিত। কিন্তু অন্নই তাহাদের প্রিয় খাদ্য বস্তু ছিল। ইউরোপের আতা ফলের ন্যায় এক প্রকার ফল ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যাইত। এই ফল হইতে ভারতবাসী এক প্রকার সূত্র প্রস্তুত করিত।

ভারত ভূমি বহুবিধ রত্ন প্রসবিনী; ভারতজাত বহু রত্ন পৃথিবীর অন্য স্থানে অপ্রাপ্য। প্লিনি স্বীয় ভারত বৃত্তান্তের একাংশ রত্নাদির বিস্তৃত বর্ণনায় পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু তাদৃশ বিস্তৃত বর্ণনা পাঠকগণের প্রীতিপ্রদ হইবে না বিবেচনা করিয়া আমরা তৎসঙ্কলনে বিরত রহিলাম। ভারতবর্ষীয় মহাত্মা এবং গণৎকারগণের বিশ্বাস ছিল যে, প্রবালের মাদুলী ধারণ করিলে সর্ব্ব প্রকার বিপদ দূর হয়। এই কারণ প্রবালের নামে ভারতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

বোপদেব গোস্বামী।

ইতিহাস ও ভূগোলের মরুভূমি ভারতবর্ষে কোন ঐতিহ্য বিষয়ের অবতারণা করা বিড়ম্বনা বিশেষ। এদেশে যে কেবল প্রকৃত ইতিহাস ও প্রকৃত ভূগোল নাই তাহা নহে, এদেশের কোন গ্রন্থকারও আপনার প্রকৃত পরিচয় দান করিতে যেন কুণ্ঠিত ছিলেন। মহাকবি কালিদাস, শঙ্কু (১) বেতাল ভট্ট, ঘটকর্পর ও বররুচি-প্রভৃতি খ্যাতনামা কোবিদবৃন্দের মধ্যেও কে জাতিতে কি ছিলেন, কে কোন্ দেশের অধিবাসী, কে কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাও কেহ বিবৃত করিয়া যান নাই। অন্যেরাও কেহ ইহাঁদিগের জীবন-চরিত লিখিয়া উহাঁদিগের পরিচয় প্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দেন নাই। যাঁহারা বা কিছু কিছু পরিচয় দান করিয়াছেন, তাঁহারাও তাহাতে এরূপ অলঙ্কারচ্ছটা বা বাক্‌চাতুর্য্যের বাণ্ডরা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, যে উহা হইতে প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা সুদূর পরাহত। তাই আজি সুযোগ-প্রয়াসী কেহ কেহ দ্বিসহস্র বৎসরের পুরাতন কালিদাসকে অর্ব্বাচীন খৃষ্টেরও অবরজ করিতে লোলজিহ্ব, কেহ কেহ বা পরিচিত ও পরিজ্ঞাত বৈদ্য রাজা বল্লালাদিকেও ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ জাতিতে পরিণত করিতে সজ্জক্রম এবং কেহ কেহ বা বঙ্গদেশের অত্যুজ্জ্বল মহারত্ন বোপদেবের জন্মভূমি ও জাতিতত্ত্ব লইয়া অকারণ বিবদমান। "অন্যে পরে কা কথা?" যে রাজা রামমোহন বেদ ও উপনিষৎসমূহের একমাত্র পুনরুজ্জীবয়িতা, জগতের একমাত্র অবলম্বন ভূমি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা, মৃত্যুকালেও ব্রিষ্টলের সমাধিক্ষেত্রে যাঁহার গলদেশে জাতীয় যজ্ঞোপবীত আলম্বিত ছিল, সেই সদ্যোমৃত তরতাজা ব্রহ্মবাদী হিন্দু রামমোহনকেই যখন মুসলমানেরা মৌলবী রামমোহন ও খৃষ্টানেরা খৃষ্টান রামমোহন বলিয়া দাবি করিতে বদ্ধপরিকর, তখন এমন হতভাগ্য দেশে সাত আট শতাব্দীর শটিত গলিত বোপদেবের পদার্থ নির্ণয় লইয়া কেন মানুষ বিসংবাদের অবতারণা করিবে না। স্বয়ং বোপদেবও তাঁহার যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন উহাও যেন "যোগিনামপ্যগম্যঃ ব্যাসকূটবিশেষঃ।" উহার অভ্যন্তরে একটা হতইতি গজ" এরূপ ভাবে পথ আগুলিয়া বসিয়াছে যে, কাহার সাধ্য এক পা এগোয়। বোপদেব তাঁহার প্রথম গ্রন্থ মুগ্ধবোধে বলিতেছেন—

(১) কোলাপুরের সংস্কৃত চন্দ্রিকা বলেন শঙ্কু জাতিতেঅষ্টঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বিদ্বজ্জনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্‌কেশবনন্দনঃ।
বোপদেব শ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্॥

অর্থাৎ বিদ্বান্ ধনেশ্বরের শিষ্য চিকিৎসক কেশবের পুত্র বিপ্র বোপদেব বেদপদের আস্পদস্বরূপ ইহার প্রণয়ন করেন। কবিকল্পদ্রুমের পরিসমাপ্তি কালে বলিয়াছেন।

বিদ্বজ্জনেশশিষ্যেণ ভিষক্‌কেশবসূনুনা।
তেনে বেদপদজ্ঞেন বোপদেবদ্বিজেন যঃ॥

যস্তীর্ণঃ শব্দপাথোনিধিমখিলমিমং গোষ্পদং বা সুরাদ্রৌ, শিষ্যোঽকার্ষীৎ ধনেশঃ কবিকুলতিলকঃ কৈশবি র্বোপদেবঃ॥

ইত্যাচার্য্যচক্রচূড়ামণি শ্রীবোপদেব গোস্বামি বিরচিতঃ কবিকল্পদ্রুমো নাম ধাতুপাঠঃ সমাপ্তঃ।

অর্থাৎ বিদ্বান্ ধনেশ্বরের শিষ্য ভিষক কেশবের সুহৃ বেদপদজ্ঞ দ্বিজ বোপদেব এই কবিকল্প দ্রুম গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। যিনি সমস্ত শব্দ মহার্ণব গোষ্পদের ন্যায় পার হইয়াছেন, যিনি কবিসমূহের তিলক, যাঁহার অধ্যাপক ধনেশ ও পিতা কেশব সেই বোপদেব ইহার প্রণেতা। তিনি সুরাদ্রি বা দেবগিরি নগরে অবস্থিতিকালে ইহার প্রণয়ন করেন। তিনি তদানীন্তন আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং তাঁহার উপাধি গোস্বামী। শতশ্লোকী গ্রন্থে বলিয়াছেন।

দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানংমহা-
স্থানং দেবপদাস্পদাগ্রজগণাগ্রণ্যং সহস্রং দ্বিজাঃ।
তত্রাসীযু ধনেশকেশববিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাৎ
চক্রে শিষ্যসুত স্তয়োঃ কৃতি মিমাং শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥

অর্থাৎ সকল দেশের মধ্যে বরদা তট অতি শ্রেষ্ঠ তথায় অন্বর্থনামা মহাস্থান নামে (কেহ বলেন সার্থ নামে) একটী জনপদ আছে। উক্ত জনপদে দেবপদের আস্পদ ব্রাহ্মণগণের অগ্রণী সহস্র দ্বিজ বাস করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ধনেশ ও কেশব নামে দুই জন বিদ্বান্ বৈদ্য আছেন। তাঁহাদিগের শিষ্য ও পুত্র কবি বোপদেব এই গ্রন্থের প্রণয়ন করেন। ভাগবতের হরিলীলা টীকায় বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥

মন্ত্রী হেমাদ্রি পরিতুষ্টির নিমিত্ত বিদ্বান্ বোপদেব আমি শ্রীমদ্‌ভাগবতের স্কন্ধ ও অধ্যায়াদি নিরূপণ করিতেছি। মুক্তাফল গ্রন্থে বলা হইয়াছে।

বিদ্বজ্জনেশশিষ্যেণ ভিষক্‌কেশব সূনুনা।
হেমাদ্রি র্বোপদেবেন মুক্তাফল মচীকরৎ॥

বিদ্বান্ ধনেশের শিষ্য ভিষক্ কেশবের পুত্র বোপদেব দ্বারা মন্ত্রী হেমাদ্রি এই মুক্তাফল গ্রন্থ রচনা করাইলেন।

এই পরিচয়দ্বারা জানা গেল বোপদেবের অধ্যাপকের নাম ধনেশ্বর, পিতার নাম কেশব এবং তাঁহারা উভয়েই কৃতবিদ্য ও চিকিৎসক ছিলেন। এবং বোপদেবের উপাধি গোস্বামী ছিল। তাঁহারা বেদপদজ্ঞ দ্বিজ ও বিপ্র বা ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জন্মভূমি কোন্ স্থান এবং মুগ্ধবোধ কোন্ স্থানে রচিত হয়, তাহার কোন নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কবিকল্পদ্রুম দেবগিরিতে ও শত শ্লোকচন্দ্রিকা মহাস্থান গ্রাম কিংবা সার্থাখ্য কোন প্রখ্যাতস্থানে বিরচিত হয়। বোপদেব, ধনেশ ও কেশব এই স্থানে বাস করিতেন। বোপদেব মন্ত্রী হেমাদ্রির রোষতোষের ধার ধারিতেন।

ভৌগোলিকেরা বলেন দেবগিরির বর্ত্তমান নাম দৌলতাবাদ। এই দেবগিরির রাজার নাম মহাদেব ও মন্ত্রীর নাম হেমাদ্রি। বোপদেব হেমাদ্রির সভাসদ ছিলেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই দেবগিরিকে (সুরাদ্রি) দেবগিরি পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বলা বাহুল্য উহা সমীচীন হয় নাই। বোপদেব ছন্দের জন্য দেবগিরিকে সুরাদ্রি করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে এই গিরি শব্দে কোন পর্ব্বতকে লক্ষ্য করা হইয়াছিল না।

যাহা হউক আমরা জানিলাম যে বোপদেব মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বরতা-নদী-তটে কোন গ্রামে পিতা ও অধ্যাপক সহ অথবা সপরিবারে বাস করিতেন। তাঁহাকে কার্য্যোপলক্ষে কিয়ৎকাল দেবগিরিতেও বাস করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার জন্ম-

স্থান কোথায় তাহা বোপদেব কদাপি অভিব্যক্ত করেন নাই। বাসস্থান ও জন্মভূমি সকল সময়ে এক জিনিষ হয় না। অতএব শ্রদ্ধেয় সখারাম বাবু যে বলিতেছেন "মহারাষ্ট্র দেশে বোপদেবের জন্মহয়" (১৩১৩ সাল ভাদ্র সাহিত্য ২৫৭পৃঃ দেখ) এবং শ্রদ্ধেয় অক্ষয় বাবু যে বলিয়াছেন—"দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দৌলত্যবাদের নিকটবর্ত্তী দেবগিরি পর্ব্বতে বোপদেবের জন্ম হয়"—ইহা বিসংবাদ-শূন্য সিদ্ধ সত্য নহে। সখারাম বাবু অক্ষয় বাবুর প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন—"কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি (অক্ষয় বাবু) একথা বলিয়াছেন, জানিনা"—সখারাম বাবুও কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মহারাষ্ট্রকে বোপদেবের জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহারও কি আমরা কৈফিয়ত তলপ করিতে পারি না? সখারাম বাবুও নিজে এখন সপুত্র কলিকাতায় বাস করিতেছেন। অথচ তিনি মহারাষ্ট্রের লোক। এখন কি আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লইব যে তাঁহাদিগের সকলের জন্মভূমিই বঙ্গদেশ?

আমরা ১৩০৮ সালের নির্ম্মাল্য পত্রিকায় বোপদেবকে বাঙ্গালী ও বৈদ্য এবং মুগ্ধবোধ ও কলাপ ব্যাকরণকে বঙ্গদেশের সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করায় সখারাম বাবু আমাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতন সুশিক্ষিত লোকের পক্ষে কি কোন অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হওয়া অসমীচীন হয় নাই? আমরা কেন বোপদেবকে বাঙ্গালী মনে করি?

১। বোপদেবের গোস্বামী উপাধি বঙ্গদেশের একমাত্র এক চেটিয়া সম্পত্তি। এই উপাধিটী বোপদেব নিজ হস্তে ব্যবহার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে বাঙ্গালী মনে করা অসঙ্গত হয় নাই।

২। বোপদেব, ধনেশ্বর ও কেশব, এই নাম ত্রিতয় জলদগম্ভীরস্বরেই বলিতেছে যে, এই নামগণ কখনই মহারাষ্ট্রবাসী নহেন ও হইতে পারেন না। ইহাঁরা বঙ্গদেশবাসী অথবা মহারাষ্ট্রদেশেতর অন্য কোন দেশনিবাসী। কেন না মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণগণ কখনই কেবল নিজ নাম দ্বারা পরিচয় দান করিয়া থাকেন না।

ক। সখারাম গণেশ দেউসকার।
খ। বলবন্ত রাও গঙ্গাধর তিলক।
গ। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডার কার।
ঘ। কাশীনাথ ত্রৈলঙ্গ ত্র্যম্বক।
ঙ। বিট্ঠল বাসুদেব (আপদেব)।

এই নামগুলির প্রকৃতি লইয়া পর্য্যালোচনা করিলে আমরা অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইব যে, বোপদেব, ধনেশ্বর ও কেশব অন্ততঃ এরূপ দেশে জন্ম গ্রহণ ও নামকরণ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া ছিলেন যে, যেখানে মানুষ কেবল নিজ নামেই পরিচয় দান করে।

৩। বোপদেবকে বাঙ্গালী মনে করার অন্যতর কারণ তাঁহার মুগ্ধবোধ। একমাত্র বঙ্গদেশেরও সামান্য কতিপয় স্থান ভিন্ন মুগ্ধবোধের পঠন পাঠনা ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা ভারতের আর কুত্রাপি দেখা যায় না। পাণিনির জন্মভূমি অপর স্থানের ন্যায় মহারাষ্ট্রদেশ মুসলমান হইয়া যায় নাই। উহা হিন্দুর দেশ। এখানে কোন দিন মুগ্ধবোধের অধ্যয়ন অধ্যাপনা হওয়ার কথা ইতিহাস অবগত নহে। ইংরাজের অনুগ্রহে মুদ্রাযন্ত্র ও কেটেলগের সৃষ্টি না হইলে মহারাষ্ট্রের অধ্যায়নবৃন্দ মুগ্ধবোধের নাম জানিতেন কি না গভীর সন্দেহের কথা। আমরা তাই ভাবিতে ও মনে করিতে অধিকারী যে মুগ্ধবোধ, মহারাষ্ট্রের সম্পৎ নহে। বোপদেব অন্য কোন দেশে উহার রচনা করিয়া পরে মহারাষ্ট্রে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশের ইহা নির্ব্যূঢ় পরিজ্ঞান যে বোপদেব গোস্বামী বাঙ্গালী ও তাঁহার মুগ্ধবোধ বাঙ্গলার জিনিষ।

কেবল মূল মুগ্ধবোধ নহে। উহার টীকা টিপ্পনী ও পরিশিষ্টও একমাত্র বাঙ্গালিগণের লেখনী হইতে বিনির্গত। যে বোপদেব মহারাষ্ট্রে অতীব মান্যগণ্য ছিলেন তত্রত্য লোকদিগকে শুদ্ধিপত্র ও ব্যবস্থা দান করিতেন, তাঁহার মুগ্ধবোধ কেন মহারাষ্ট্রে অবগীত ও

একখানীও হস্তলিখিত মুগ্ধবোধ বাহির করিতে?

বাঙ্গালী কাশীশ্বর ও নন্দকিশোর ভট্টাচার্য্য মুগ্ধবোধের পরিশিষ্টপ্রণেতা। এবং বাঙ্গালী দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ, শ্রীরাম তর্কবাগীশ, দেবিদাস চক্রবর্ত্তী, বিদ্যানিবাস, রামানন্দ, কার্ত্তিক সিদ্ধান্ত, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, দয়ারাম বাচস্পতি, গোবিন্দ আচার্য্য শ্রীবল্লভ আচার্য্য, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, ন্যায়বাগীশ, ভরতসেন মল্লিক ও প্রখ্যাতনামা গঙ্গাধর রায় কবিরত্ন, মুগ্ধবোধের টীকাকার। কেন মহারাষ্ট্রবাসী মুগ্ধবোধ ছুঁইলেন না, কেন উহার টীকা টিপ্পনী পর্য্যন্ত করিতে নারাজ হইলেন? বোপদেব পাছে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিয়া ধরা পড়েন, এই ভয়েই উহার (মুগ্ধবোধের) কোন কথাই মহারাষ্ট্রে প্রকাশিত হইতে দেন নাই। বোপদেব হেমাদ্রির নিকট তাঁহার মুগ্ধবোধের নাম করিলে হেমাদ্রি কি কেবল

"যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ
স্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ"

এই কথাটী লিখিয়াই নিরস্ত হইতেন? পক্ষান্তরে বোপদেব বাঙ্গালী বৈদ্য তাঁহার মুগ্ধবোধ বাঙ্গলায়ই প্রণীত এই কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি আবহমানকাল প্রচলিত রহিয়াছে। "ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"—কোন ভিত্তি না পাইয়া জনশ্রুতি দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। অবশ্য অক্ষয় বাবু বলিয়াছেন যে "মহারাষ্ট্রের চতুর্বর্গ চিন্তামণি (ইহা কার্য্যতঃ বোপদেবকৃত) গ্রন্থের ন্যায় মহারাষ্ট্রের মুগ্ধবোধও অচিরে বঙ্গদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু উহাও বোপদেবের কৌশল বিশেষ মাত্র। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করিতেন না, তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়া নানা প্রকারে খাট করিয়া রাখিতে চেষ্টা পাইতেন, তাই তিনি চতুর্বর্গ চিন্তামণি গ্রন্থ এদেশে পাঠাইয়া বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণের নিকট আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি জাহির করেন। তাই উহা মহারাষ্ট্র ও বাঙ্গলা অথবা সর্ব্বত্র পরিচিত। পক্ষান্তরে মুগ্ধবোধের পরিচয় স্থল একমাত্র বঙ্গভূমি। যদি তাহাই না হইবে তাহা হইলে মুগ্ধবোধ কেন মহারাষ্ট্র বা কাশ্যাদি জনপদে পরিচিত হইল না? কাশ্যাদি পুণ্যক্ষেত্রে কি লঘুকৌমুদী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ব্যাকরণ প্রচলিত দেখা যায় না? ফলতঃ মুগ্ধবোধ একমাত্র বাঙ্গলারই জিনিষ, বোপদেব উহা বাঙ্গলায় রাখিয়া মহারাষ্ট্রে যাইয়া ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েন। সুতরাং বঙ্গদেশ মুগ্ধবোধের একমাত্র ক্রীড়াভূমি বলিয়া আমরা বোপদেবকে বাঙ্গালী বলিতেই উন্নতকন্ধর। এই উদ্ভট শ্লোকটীও বোপদেব ও তাঁহার মুগ্ধবোধকে বাঙ্গালী ও বাঙ্গলার বলিয়া সপ্রমাণ করে—

জাতে ব্যাকরণং হতং কলিযুগে শ্রীবোপদেবে কলৌ
জীমূতপ্রভৃতৌ কলৌ কলিভটে নষ্টা স্মৃতিঃ শাশ্বতী।
গঙ্গেশপ্রভৃতৌ কুতার্কিকগণে ন্যায়োবিনষ্টো মহান্,
শ্রীমদ্ভাগবতে কুবিন্দকবিতো জাতে পুরাণং হতম্॥

কেমন ইহা দ্বারাও কি বোপদেবের বাঙ্গালীত্ব স্তোতিত হইতেছে না? আমরা বোপদেবকে বৈদ্য বলিয়া মনে করি কেন?

১। বোপদেব ও কেশবপ্রভৃতি বাঙ্গালী বৈদ্য ছিলেন, ইহা বঙ্গদেশের বংশপরম্পরাগত পরিজ্ঞান। ইহার মূলে কোন সত্য না থাকিলে বঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও আপামর সর্ব্ব সাধারণ কেন মহারাষ্ট্রের এক জন লোককে ধরিয়া আপন বলিয়া টানাটানি করিবেন? মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কাশী, কাঞ্চী অবন্তী ও অযোধ্যাপ্রভৃতি কত শত শত জনপদের লোকের প্রণীত গ্রন্থ বঙ্গদেশে অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছে। কই বাঙ্গালীরা ত আর কোন লোককেই বাঙ্গালী বলিয়া দাবি করেন নাই? শ্রদ্ধেয় অক্ষয়বাবুও বলিয়াছেন—

"ধনেশের শিষ্য ভিষক্ কেশবের পুত্র বেদপদজ্ঞ বোপদেব আপনাকে দ্বিজ বলিয়া উল্লেখ করিলেও তিনি যে বৈদ্য ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত।"

১৩১৩ সাল সাহিত্য ভাদ্র ২৬৪ পৃঃ।

এই কথা গুলি সখারাম বাবুই সাহিত্যে গ্রহণ করিয়াছেন, আমরাও বলি অক্ষয় বাবুর ন্যায় বঙ্গ দেশের প্রত্যেক সাক্ষর ব্যক্তিই বোপদেব গোস্বামীকে মুগ্ধবোধপ্রণেতা বাঙ্গালী বৈদ্য বলিয়াই অবগত আছেন। এখনও এই আলোকের যুগে অনেক

গোঁড়া ব্রাহ্মণ বৈদ্যকৃত বলিয়া মুগ্ধবোধের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। রামদাস বাবু এক দ্বিতীয় বোপদেবের কথাও বলিয়াছেন, আমাদিগের গোস্বামী বোপদেব ছাড়া মহারাষ্ট্রে, আরও একজন বোপদেব থাকিতে পারেন। হয় ত বিট্ঠল বাসুদেবের পূর্ব্ব পুরুষ তিনিই, কিন্তু যিনি মুগ্ধবোধ, শতশ্লোকী চন্দ্রিকা, কবিকল্পদ্রুম ও ভাগবতপ্রণেতা, তিনি আমাদিগের গোস্বামী বোপদেব ভিন্ন অন্য কেহই নহেন।

২। বোপদেবকে বাঙ্গালী বৈদ্য ভাবিবার আর এক কারণ তাঁহার পিতার "ভিষক্" বিশেষণ ও পিতা কেশব ও অধ্যাপক ধনেশ্বরের "বৈদ্য" খ্যাতি। মুখ্য ব্রাহ্মণগণ অতি পূর্ব্বে চিকিৎসাবৃত্তিক ছিলেন। কিন্তু অম্বষ্ঠগণের উৎপত্তির পরে উক্ত বৈদ্যবৃত্তি অম্বষ্ঠগণকে প্রদত্ত হয়। যদুক্তং ভগবতা মনুনা—

'স্তানামশ্বসারথ্য মম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।

৪৭—১০অ

এবং মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য-প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ তদবধি এই বিধির প্রণয়ন করেন যে, অতঃপর কোন মুখ্য ব্রাহ্মণ বৈদ্যত্ব করিলে তাঁহার পাতিত্য ও অপাংক্তেয়ত্ব ঘটিবে। উক্তঞ্চ প্রাঞ্চৈঃ—

ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং জলমাবিশেৎ

মুখ্য ব্রাহ্মণ চিকিৎসককে দেখিলে দ্রষ্টা পরিহিত বস্ত্র সহ জলে অবগাহন করিবেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কেশব ও বোপদেব চিকিৎসা করিলেও তাহা নিজের কলমে লিখিয়া স্বীকার করিতে যাইতেন না। প্রকৃত পক্ষে বোপদেব অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, বৈদ্যত্ব তাঁহার গৌরবের বৃত্তি ছিল, তজ্জন্য তিনি আগ্রহের সহিতই উহার খ্যাপন করিয়াছেন। নিরক্ষর রুটিওয়ালা ও মুড়ীপোড়া ব্রাহ্মণেরাও যখন বলেন না যে, আমরা রুটিওয়ালা ব্রাহ্মণ বা মুড়ীপোড়া ব্রাহ্মণ, তখন বোপদেব মুখ্য ব্রাহ্মণ ও স্মার্ত্ত হইয়াও যে অতি পাতিত্যকর বৈদ্যত্বের কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্লোকে লিখিয়া বলিবেন, ইহা হইতেই পায় না। ইহার খণ্ডন করিতে যাইয়া সখারাম বাবু বলিতেছেন যে—

"মহারাষ্ট্র দেশে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠনামে কোন জাতি নাই। সম্ভবতঃ কোনও কালেও ছিল না। বৈদ্য যে একটী জাতিবাচক শব্দ, একথা শুনিলে মহারাষ্ট্র জাতিমাত্রই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অম্বষ্ঠ শব্দের অস্তিত্বও মহারাষ্ট্রের কেহ অবগত নহেন। ঐ দেশে মুখ্য ব্রাহ্মণেরা অবিচলিতচিত্তে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। উত্তর ভারতে যেরূপ মুখ্য ব্রাহ্মণেরা অপসদ পুত্রের উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে চিকিৎসা বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্রে, সেরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। সেখানকার বিলাসবিমুখ ব্রাহ্মণেরা অম্বষ্ঠ জাতির সৃষ্টি করেন নাই, এই কারণে তাঁহাদিগকে সনাতন চিকিৎসা বৃত্তি পরিহার করিতেও হয় নাই॥ ২৬৫—৬৬পৃ

বঙ্গদেশেও সকলে জানেন বৈদ্য ও কায়স্থ কোন জাতিবাচক শব্দ নহে। উহা বৃত্তিবাচক শব্দ। তবে যে প্রকার সাহা (সাধু বণিক্) ও নুনিয়া (লাবণিক) শব্দ বৃত্তিবাচক হইয়াও জাতিবাচক হইয়া পড়িয়াছে, তদ্রূপ সমুদায় ভারতে বৈদ্য ও কায়স্থ শব্দ (কায়স্থের প্রকৃত জাতির নাম করণ) জাতিবাচক হইয়া গিয়াছে ও বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও নিয়ত বৈদ্যবৃত্তিকত্ব হেতু জাতিতে বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া পড়িয়াছেন। কবিরাজ শব্দও চিকিৎসক অর্থের দ্যোতক নহে, কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকগণ কবিশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগের কবিরাজ শব্দও ঐরূপ চিকিৎসকার্থের দ্যোতক হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্রই এখনও বহুমুখ্য ব্রাহ্মণ চিকিৎসা করিতেছেন, ইহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু তাহা ছাড়া মিছির ও শাকদ্বীপী খ্যাতিধারী যে সকল ব্রাহ্মণ চিকিৎসা করিয়া বেড়াইতেছেন, সখারাম বাবুর দল যাঁহাদিগকে মুখ ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত, উহাঁরা কেহই মুখ্য ব্রাহ্মণ নহেন। মহারাষ্ট্রের শাস্ত্রজ্ঞগণ ত অম্বষ্ঠের তত্ত্ব রাখিবেনই। আবার অন্য দেশের যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ ও ইতিহাসবিৎ তাঁহারা যেমন অম্বষ্ঠের তত্ত্ব অবগত আছেন, তেমনই তাঁহারা ইহাও জানেন যে, চিকিৎসক ব্রাহ্মণের মধ্যে অধিকাংশই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ

বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাহইতে জাত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা অম্বষ্ঠদেশবাসী ছিলেন, তাঁহারাই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করেন। আর যাঁহারা শাকদ্বীপ হইতে সমাগত, তাঁহারাই শাকদ্বীপিনামের বিষয়ীভূত হয়েন। প্রকৃত পক্ষে ইহাঁরা উভয়েই মিছির বা মিশ্র ব্রাহ্মণ। মিশ্র ব্রাহ্মণ কে কে? ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা পত্নী হইতে মূর্দ্ধাব সিক্ত, অম্বষ্ঠ ও পারশব নামে যে গৌণ ব্রাহ্মণগণ প্রসূত হয়েন, তাঁহারাই ভারতে মিশ্র বা মিছির (দুই বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন) ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। তবে এই মিছির ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেবল অম্বষ্ঠ বা শাকদ্বীপিপ্রভৃতিই চিকিৎসাবৃত্তিক। সমুদায় ভারতবর্ষ, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির শাসন মানিয়া চলেন। আর্য্যাবর্ত্ত হইতেই মনু যাজ্ঞবল্ক্যভক্ত ব্রাহ্মণ যাইয়া কর্দ্দমক্লিন্ন অনার্য্যকলুষিত দাক্ষিণাত্যে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এরূপ অবস্থায় আমরা কখনই ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে উত্তর ভারতের রীতি নীতি ও ধর্ম্মাধর্ম্ম দক্ষিণ ভারত হইতে পৃথক ছিল। আমরা ভূয়োদর্শনবলে অবগত আছি যে, এখনও দাক্ষিণাত্যের মুখ্য ব্রাহ্মণেরা শূদ্র কন্যাও বিবাহ করিয়া থাকেন। তাহাতে পুত্র হইলে সে দাক্ষিণাত্যের মুখ্য ব্রাহ্মণ হইয়া পড়ে ও কন্যা হইলে সে কন্যা শূদ্র হইয়া থাকে। স্বয়ং সখারাম বাবুও সম্ভবতঃ অতর্কিত ভাবে বলিয়া ফেলিয়াছেন যে—

"অহম্মদাবাদের নিকটেও এই বংশের একটী শাখা বাস করিতেছে। ইঁহারা বোপদেবের ক্ষত্রিয় ভার্য্যার সন্ততিতে শাকলসূত্রীয় (দ্বাপী) ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিয়া থাকেন।" ২৫৮ পৃষ্ঠা।

সুতরাং ইহা দ্বারা উত্তর ভারতীয় নগণ্য ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় স্বয়ং বোপদেবেরও বিলাস পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইতেছে কি না, তাহা ন্যায়নিষ্ঠ জুরিগণ নির্ণয় করুন। যদি এই শাখাটীও দ্বিবর্ণ সম্ভূত অনুলোমজ সন্তান হয়েন,তাহা হইলে এই শাখাটীও অপসদসংজ্ঞা ভাক্ হইয়া পড়েন কি না? বিলাস-বিভ্রম-পরিশূন্য বোপদেব কি শাকদ্বীপ হইতে ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, না মহারাষ্ট্রেই এ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছিল? বোপদেব নিজেই শাকদ্বীপী (অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের শাখা বিশেষ) ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই কি তৎসন্ততিগণ এই শাকদ্বীপী সংজ্ঞা ভজনা করিয়াছিলেন না? তাঁহাদের মাতৃকুল ক্ষত্রিয়,সুতরাং সে দিক্ দিয়া এ সংজ্ঞা সমাগত হইতে পারে না। আমরা মনে করি বোপদেব স্বয়ং অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা অপসদ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই তৎসন্ততিগণের উক্ত পদবী লাভ হয়। তবে বোপদেব অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়াও কেবল নিজগুণে বিদ্যাবুদ্ধিবলে মুখ্য ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশেও ধর ও কর উপাধির বহু অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ মুখ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। গয়ার গয়ালিরা, যাঁহাদের উপাধি সেনশর্ম্মা, দত্তশর্ম্মা ও গুপ্তশর্ম্মা, উহারাও কি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ নহেন? উহারা কি তারতের সমগ্র মুখ্য ব্রাহ্মণের সপর্য্যালাভ করিয়া থাকেন না? সুতরাং অপসদ ব্রাহ্মণ বিলাস হইতে উৎপন্ন,সুতরাং নিকৃষ্ট, একথা বলা কতদূর অসামাজিকতা হইয়াছে, তাহা সহৃদয় সাধারণে বিচার করিয়া দেখুন। আমরা ইহাও মনে করি যে, যে দাক্ষিণাত্যে অপসদ ব্রাহ্মণ শস্ত্রী ও শাস্ত্রী পরশুরামের কল্পিত ব্রাহ্মণেরাও (কৈবর্ত্তেরা) মুখ্য ব্রাহ্মণ হইয়া যাইতে পারে, সে দেশে বোপদেবের মতন অভিজাত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব লাভ কঠিন ব্যাপার নহে। এখনও কি উৎকলের "ধরশর্ম্মা, করশর্ম্মা, সেনশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা ও গুপ্তশর্ম্মাখ্য" অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত ও স্বীকৃত রহিয়াছেন না?

করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ।
মৌদ্গল্যো দাশশর্ম্মা চ গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ॥
ধন্বন্তরিঃ সেনশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ।
শাণ্ডিল্যশ্চ চন্দ্রশর্ম্মা অম্বষ্ঠব্রাহ্মণা ইমে॥

উৎকলে এখনও ইঁহারা বৈদ্যের শ্রেণী ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রথিত, এবং বঙ্গদেশের মুখ্য ব্রাহ্মণের ন্যায়ই ইঁহারা গৃহীত ও সম্মানিত হইয়া থাকেন। সুতরাং অপসদ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া মুখ্য ব্রাহ্মণের স্থান লাভ করিবেন ইহা একটা বেশী কথা নহে। মথুরা ও

গোয়ালিয়রের সেন, মিশ্র ও সেনাঢ্য ব্রাহ্মণগণ অযোধ্যার অসুতসেনী ব্রাহ্মণেরা, মাগধ ব্রাহ্মণগণ, এবং মহারাষ্ট্রের সেনবী ব্রাহ্মণ ইঁহারা কেহই মুখ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন না, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণই ছিলেন। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লন মিশ্র প্রভৃতিও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কিছু ছিলেন না। পূর্ব্বকালে উত্তর ভারতে অসবর্ণ বিবাহ ছিল এবং মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদির সংহিতাতেও উহার পবিত্রত্ব ও বৈধত্ব বর্ণিত রহিয়াছে। ব্যাস ও বশিষ্ঠাদি এবং তৎসন্ততিগণের ন্যায় ব্রাহ্মণ্য অপেক্ষা অপসদ যে কোন ব্রাহ্মণের মুখ্য ব্রাহ্মণ্য লাভে যেন অধিকতর দাবির কথা। উত্তর ভারতের লোক যাইয়াই দক্ষিণ ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। উহা পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ন্যায় অনার্য্য দেশই ছিল। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের মুখ্য ব্রাহ্মণাদি আর্য্য সন্তানেরা উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণগণেরই যে অনন্তরবংশ্য ও শাখাবিশেষ, এবং দাক্ষিণাত্যে এখনও যে মন্বাদি সংহিতার শাসন সাদরে ও সভয়ে অনুসৃত হইতেছে, তাহাতেও কোন সন্দেহ মাত্রই নাই।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

সিপাহী বিদ্রোহের অজ্ঞাত ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে বিখ্যাত টাইম্‌স পত্রিকায় অষ্টাত্রিংশত সংখ্যক পদাতিক সৈন্যদলের নায়ক একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন; এই পত্রের মধ্যে কয়েকজন এ দেশীয় ব্রাহ্মণ সন্তানের অদ্ভুত ত্যাগ ও দয়ার কথা বিবৃত আছে। কেমন করিয়া কয়েকজন অসহায় ইংরাজ নরনারীকে এই নিরক্ষর হিন্দুস্থানিগণ রক্ষা করিয়াছিল, এই পত্রে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এইখানে তাঁহার পত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

বিদ্রোহী সিপাহী সৈন্যেরা দিল্লী নগরী যখন বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল এবং চারিদিকেই অবাধে লুঠপাট চলিতে লাগিল, তখন মেজর অ্যাবট্ একদল ইংরেজ সৈন্য লইয়া কাশ্মীর গেটের নিকট উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দিন নানা স্থানে খণ্ডযুদ্ধ করিয়া এই মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্যদল ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার উপর আবার অনেকগুলি অসহায়া ইংরাজ রমণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইহাদিগের উপর অর্পিত ছিল; মেজর অ্যাবট এই রমণীদিগকে লইয়া যখন কাশ্মীর গেটের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; লুণ্ঠনরত সিপাহী সৈন্যেরা দিল্লী নগরীর চারিদিকে উন্মত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং সর্ব্বত্রই অবিরাম গোলা গুলি বৃষ্টি হইতেছে। মেজর অ্যাবট্ অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে এখনই স্থানান্তরিত করিতে না পারিলে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। যদি ইঁহারা আমাদিগের সহিত অবস্থান করেন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বেই হয় শত্রুর অলক্ষ্য গুলিতে আর না হয় সিপাহীদিগের তরবারীর আঘাতে সকলকেই নিহত হইতে হইবে; সুতরাং এরূপ বিপদসঙ্কুল স্থানে আর তিলমাত্রও অবস্থান করা সঙ্গত নহে। মেজর অ্যাবট্ সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, ইহাঁদিগকে আপাততঃ ক্যাণ্টনমেণ্টে রাখিয়া আইস; সেখানে বরং কিছুকাল ইহাঁরা নিরাপদে থাকিতে পারিবেন; উপায় যদিও স্থির হইল, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যাইবার উপযোগী, কোনও প্রকার যান বাহনাদি মিলিল না; অগত্যা কামান টানিবার জন্য যে সকল গাড়ী প্রস্তুত ছিল, তাহাতেই স্ত্রীলোক এবং শিশু সন্তানদিগকে উঠাইয়া দেওয়া হইল; সকলেই যখন রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত, তখন হঠাৎ সম্মুখ হইতে শত্রু সৈন্যগণ গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে এইরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ায় আমাদিগের সৈন্যেরা কিছু হটিয়া আসিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে সিপাহীদিগের বন্দুক হইতে অজস্র গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হইল; আমরা সকলে কামানের গাড়ী পরিত্যাগ করিয়া গেটের অভ্যন্তরে আসিয়া আশ্রয় লইলাম; পশ্চাতে অসংখ্য সিপাহী সৈন্য মার মার রবে ছুটিয়া আসিতে লাগিল; মিঃ অস্‌বোর্ণ উরুদেশে সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন; মুহূর্ত্ত মধ্যেই সিপাহীরা গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে, এই চিন্তায় আমরা যখন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি, তখন দেখিলাম, মিঃ অস্‌বোর্ণ আহত অবস্থাতেই দুর্গ প্রাচীরের শীর্ষদেশে আরোহণ করিলেন এবং সেইখান হইতে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

আমি সিপাহীদিগের হস্তে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় কিছুতেই মরিব না—তা'র চেয়ে এই দুর্গ প্রাচীরের উপর হইতে নিম্নস্থ গভীর খাদের মধ্যে লাফাইয়া পড়ি, তাহাতে মরি বাঁচি ক্ষতি নাই; এই বলিয়াই তিনি দুর্গের বাহিরে খাদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন; তাঁহার দেখা দেখি অন্যান্য সকলেও প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া লাফাইয়া পড়িল; সন্ধ্যার অন্ধকারে সিপাহীরা কিছুই বুঝিতে পারিল না; তাহাতে আবার খাদের মধ্যে গভীর অন্ধকার, সুতরাং কেহ আমাদিগের সন্ধান পাইল না।

এই খান হইতে আমরা পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম; কারণ যে যেখানে পড়িয়াছিল, নিতান্ত চলৎশক্তি রহিত না হইলে সে সেই খান হইতেই পলায়ন আরম্ভ করিল; আমরা এক দলে অতি অল্প কয়েক জন রহিলাম; আর যে কে কোথায় গেলেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খাদ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম, শেষে অতি কষ্টে কয়েক জন ব্রাহ্মণের সহায়তায় আমরা যমুনার পরপারে উত্তীর্ণ হইলাম, তখন ভোর হইয়া গিয়াছে; দিনের বেলায় পথ চলা বিপজ্জনক মনে করিয়া আমরা একটি নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিলাম; কিছুকাল পরে দেখিলাম শ্রমজীবিরা মাঠে কাজ করিবার জন্য আমাদিগের দিকেই আসিতেছে; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগকে তাহারা দেখিতে পাইল না; ইহার একটু পরেই আর একদল লোক আসিল, এবং তাহারা দূর হইতেই আমাদিগকে দেখিতে পাইল, আমরা ভাবিলাম যে এবার আর কোনমতেই নিস্তার নাই, কিন্তু ভগবানের কি অসীম করুণা, তাহারা যখন আমাদিগের নিকটে আসিল, তখন প্রথমেই তাহারা আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিল, বিদেশী কোনও ভয় নাই, ইহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের সরল ব্যবহারে এবং স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমরা বুঝিলাম যে মুষ্টিমেয় সিপাহী সৈন্য ব্যতীত ভারতের অগণ্য প্রজাপুঞ্জের গৃহে এখনও আমাদিগের মাথা গুঁজিয়া দাঁড়াইবার স্থান আছে। আমরা সকলেই ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ইহারা আমাদিগকে তাহাদিগের গ্রামে লইয়া গেল, এবং গৃহে থাকিলে পাছে লোকমুখে আমাদিগের পলায়নের কথা শত্রুদিগের কর্ণগোচর হয়, এই জন্য তাহারা আমাদিগকে একটী বনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া চাপাটী এবং দুধ আনিতে গেল. কিছুক্ষণ পরে আমাদিগের জন্য প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী প্রেরিত হইল। আহারান্তে সেদিন সেই খানেই বাস করিলাম। সন্ধ্যার সময় গ্রামবাসী বন্ধুগণ আমাদিগকে বলিলেন যে, শত্রুসৈন্যের এত নিকটে অধিকক্ষণ অবস্থান করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কোন না কোনক্রমে একথা রাষ্ট্র হইয়া যাইবে, তখন আর পলায়নের উপায়ান্তর থাকিবে না। আমরা তখন তাঁহাদিগের সহিত মাঠ জঙ্গল দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পথে অকস্মাৎ এক ঝোপের অন্তরালে দিল্লীর প্রসিদ্ধ সওদাগর মিঃ মার্শালের সহিত সাক্ষাৎ হইল,—তাঁহার নিকট শুনিলাম যে তাঁহারা তিন জন একত্রে খাদে লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু অন্য দুইজন যে কোথায় গেলেন—তাঁহারা

এখনও জীবিত কি মৃত সে সংবাদ কিছুই তিনি বলিতে পারেন না; আমরা এইরূপে একজন স্বদেশবাসীর সাক্ষাৎ পাইয়া পরম পুলকিত হইলাম এবং সকলে মিলিয়া আমাদিগের পথ পরিদর্শকের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি পথ হাঁটিয়া যখন ভোর হইল, তখন যমুনার তীরে লম্বা লম্বা বুনো ঘাসের ভিতর লুকাইয়া রহিলাম; বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় উলুবনের মধ্য দিয়া একজন হিন্দুস্থানী আসিয়া আমাদিগকে বলিল যে আর এক দল ইংরাজ এখান হইতে কিছু দূরে লুকাইয়া রহিয়াছে; আমরা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলাম; প্রায় দুই মাইল আসিবার পর সত্য সত্যই দেখিলাম আমাদিগের সহিত যে সকল ইংরাজ রমণী ছিলেন, তাঁহাদিগেরই কয়েকজন এবং জনকতক ইংরাজ সেইখানে লুকাইয়া রহিয়াছেন; সর্ব্ব প্রথমেই আমি আমার প্রিয় সুহৃৎ মিঃ প্রোক্টরকে দেখিতে পাইলাম; আমি ভাবিয়াছিলাম কাশ্মীর গেটেই তিনি নিহত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে এক্ষণে জীবিত দেখিয়া এবং এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হওয়ায় আমার আনন্দের সীমা রহিল না; আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস কাটিয়া গেলে দেখিলাম মিঃ ফরেষ্ট, তাঁহার স্ত্রী এবং তিনটী কন্যা, ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ফ্রেজারের পত্নী মেসার্স সাল্‌ফেড, ভাইব্রাট্ ও উইলসন এই দলে রহিয়াছেন। এইবার আমরা একটী ক্ষুদ্র দলে পরিণত হইলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম যে এখন আমরা তরবারী এবং বন্দুকের সাহায্যে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যেও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইব; আমাদিগের হিন্দুস্থানী সঙ্গীদিগকে এইবার আমরা যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া বিদায় দিতে চাহিলাম; কিন্তু তাহারা আমাদিগের সহিত আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে চাহিল এবং যতক্ষণ আমরা বিপদসঙ্কুল স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারি, ততক্ষণ আমাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। আমরা তাহাদিগের এই সদাশয়তা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম; সমস্ত দিন সেই ঘাস বনের মধ্যে কোনওরূপে কাটাইয়া দিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা আমাদিগের দেশীয় বন্ধুদিগকে বলিলাম যে, আমরা আর এই ঘাস বনে তিষ্ঠাইতে পারিতেছি না; তখন পুনরায় আমরা যমুনার তীর দিয়া চলিতে লাগিলাম; কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্বোক্ত গ্রামের একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল যে, শত্রু সৈন্যেরা তোমাদিগের সন্ধান পাইয়াছে এবং একদল অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতগতিতে ইহাদিগের পশ্চাদানুসরণ করিতেছে; শীঘ্রই তাহারা তোমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে; ইহার কথা শেষ হইতে না হইতেই আমাদিগের অগ্রগামী চর আসিয়া সংবাদ দিল যে সম্মুখের দিক হইতেও একদল বিদ্রোহী সৈন্য পলায়িত ইংরাজদিগকে অনুসন্ধান করিতে আসিতেছে। আমরা এই সংবাদ শুনিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িলাম; আমাদিগের সম্মুখে শত্রু, পশ্চাতে শত্রু, দক্ষিণে খরস্রোতা বিশাল যমুনা নদী আর বামে সামান্য একটা উলুবনের ঝোপ তা'র পরে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ; কোথায়ও আশ্রয় স্থল নাই; কিছুক্ষণের জন্য লুকাইয়া থাকিবার মত একটা ভাল রকমের জঙ্গলও নাই; অনাহারে, অনিদ্রায় এবং দুশ্চিন্তায় আমাদিগের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; তাহার উপর অনাবৃত পদে বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া ক্রমাগত হাঁটিয়া হাঁটিয়া শরীর এমন আসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই সংবাদ শুনিয়া আমরা সকলেই হতাশ হইয়া একেবারে বসিয়া পড়িলাম, এই সকল বিপদের উপর আবার কতকগুলি স্ত্রীলোক আমাদিগের সঙ্গিনী ছিলেন; আমাদিগকে ভগ্নোদ্যম দেখিয়া দেশীয় লোকেরা অনেক আশা ও উৎসাহ দিতে লাগিল; তাহারা বলিল যে এই নদীর স্রোত খুব প্রবল হইলেও অধিকাংশ স্থলেই জল খুব অল্প; যেখানে ডুবজল সেখানে আমরা সাঁতার দিয়া আপনাদিগকে পার করিয়া দিব; আপনারা যদি অধীর হইয়া পড়েন তাহা হইলে এখনই আমরা সকলেই মারা পড়িব।

আসুন ভগবানের নাম লইয়া এই নদীর মধ্যে আমরা ঝাঁপাইয়া পড়ি এবং তাঁহার কৃপায় নিশ্চয়ই আমরা আপনাদিগকে পর পারে লইয়া যাইতে পারিব।

সম্মুখে বিশাল যমুনা নদী তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছে; তাহার খরস্রোত এবং লহরী লীলা দর্শন করিয়া আমাদিগের শরীর শিহরিয়া উঠিল; আমরা ভাবিয়া দেখিলাম যে এবার আর কোন মতেই নিস্তার নাই; এখানে থাকিলে সিপাহীদিগের তরবারীর মুখে সকলকেই বিনষ্ট হইতে হইবে। আর নদীতে নামিলেও যমুনার নীল জলের মধ্যে সকলের সমাধি হইবে—এবার আর কোন দিকেই উপায় নাই। সঙ্গিনী স্ত্রীলোকেরা সজল নয়নে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; ইতিমধ্যে দূরে যেন বহু অশ্বের পদধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল; নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় যমুনার তটভূমি হইতে সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি আসিতে লাগিল—স্ত্রীলোকেরা ক্রন্দনের রোল তুলিয়া বলিলেন, ওই তাহারা আসিতেছে এইবার উপায়? মিস্ ফরেষ্ট তাঁহার জননীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, সিপাহীরা যদি শুধু মারিয়া ফেলিত, তাহা হইলে আপশোষ ছিল না—কিন্তু আমাদিগকে তাহারা মৃত্যুর অধিক লাঞ্ছনা দিবে—তার চেয়ে যমুনা ঝাপাইয়া পড়ি—সেখানে শান্তিতে মরিতে পারিব। এই বলিয়াই মিস্ ফরেষ্ট তাঁহার মাতাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন আমি চলিলাম; পরমুহূর্ত্তে তিনি যমুনায় ঝাঁপ দিলেন; তাঁহার দেখা দেখি আমরা সকলেই যমুনায় নামিলাম, আমাদিগের হিন্দুস্থানী চালকগণ আগে আগে যাইতে লাগিলেন; তাহারা নানা দিক ঘুরিয়া যে দিকে জল অল্প সেই দিক দিয়াই চলিতে লাগিল; ক্রমে আসরা সকলে যখন গলাজলে উপস্থিত হইলাম তখন সকলে সেইখানে দাঁড়াইলাম; এইবার সাঁতার দিয়া পরপারে যাইতে হইবে; আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সাঁতার জানিতেন কিন্তু ভয়ে এবং ভাবনায় কাহারও শরীরে তেমন জোর ছিল না; দুই একবার যাতায়ত করিতেই তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন; তখন এ দেশীয় লোকেরাই এক একজনকে পিঠে করিয়া সাতার দিয়া পর পারে লইয়া যাইতে লাগিল; আমরা যখন সকলেই প্রায় পার হইয়াছি এমন সময় শত্রু সৈন্যেরা নদী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল; চারি দিকে তখন জন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আসিয়াছে সুতরাং আমাদিগকে তাহারা দেখিতে পাইল না; তবু জলের আলোড়ন শুনিয়া সেই দিক লক্ষ্য করিয়া কয়েক জন গুলি করিল; একটা গুলি মিসেস্ ফরেষ্টের কানের কাছ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু কেহই আহত হয় নাই। ভগবানের কৃপায় এবং এ দেশীয় লোকদিগের অদ্ভুত আত্মত্যাগের ফলে আমরা উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম; তখন শীত কাল; তীরে উঠিয়া খোলা মাঠের হাওয়ায় আমরা অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলাম; সঙ্গে আর কোনও পরিচ্ছদ নাই; শীতে সকলে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম; একটু বিশ্রাম করিয়াই আবার সকলে পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম; সমস্ত রাত্রি হাঁটিয়া প্রাতঃকালে আমাদিগের হিন্দুস্থানী সহচরগণ আমাদিগকে একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে লইয়া আসিল এবং সেখানে এক ফকীরের বাটীতে তিন দিন আমাদিগকে লুকাইয়া রাখিল; তার পর এই গ্রামস্থ ভদ্র সন্তানদিগের চেষ্টাতেই হরচাঁদ পুরের জমিদার আমাদিগকে তাঁহার আবাস বাটীতে লইয়া গেলেন এবং সেইখানে সকলকেই পরম যত্নে রাখিয়া দিলেন; গোলযোগ একটু থামিয়া গেলে এই জমিদারের অনুগ্রহেই আমরা নীরাটে নিরাপদে পৌঁছাইয়া পুনরায় স্বদেশীয় লোকদিগকে দেখিতে পাইয়া নব জীবন পাইলাম। এই নিরক্ষর গ্রামবাসিগণ আপনাদিগের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কত বিপদের মধ্য দিয়া যে আমাদিগকে নিরাপদ স্থানে আসিয়া পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, তাহা যখন ভাবি, হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া যায়। এই রূপে জীবন দিয়া যদি তাহারা আমাদিগকে রক্ষা না করিত, তাহা হইলে সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে থাকিত কিনা সন্দেহ!

আরতি।

জননী, জননী, আঁধার রজনী
গেল যে ঘুচি—
তনয় তোমার হাসিছে আবার
নয়ন মুছি!
জাগে কোলাহল দিকে দিকে তব
বিহগের শুভ-উষা-কলরব
আশার বাণী,—
বলহীন বায়ু লভিয়াছে বল,
ফুটিয়া উঠেছে হিয়া শতদল,
হরষ মানি।
জননী, জননী, আঁধার রজনী
গেল যে ঘুচি—
তনয় তোমার হাসিছে আবার
নয়ন মুছি!
ভীরু বাঙালীর অপবাদ চির
কোথা মা আজ—
তব জয় গানে মরণে না জানে
পাশরে লাজ!
দেব-শিশুকুল দেয় করতালি
থরে থরে ধরে সাজে পূজা-ডালি
মরম-লোরে।—
বাজে দেবালয়ে আবাহন-ভেরী
নাহি অবহেলা, নাহি সহে দেরী
পূজিতে তোরে!
ভীরু বাঙালীর অপবাদ চির
কোথা মা আজ—
তব জয় গানে মরণে না জানে
পাশরে লাজ

আজি মা উথলে তব পদতলে
প্রাণের মেলা,—
আলোক-সাগরে ভাসে মা যেন রে,
হাজার ভেলা!
বিবাদ বিষাদ ছোট বড় ভুলি
ভা'য়ে ভা'য়ে ওই করে কোলাকুলি
পুলক ভরে—
কে আপন পর চিনা নাহি যায়,
একাকার সবে সম-বেদনায়,
সুচির তরে।
আজি মা উথলে, তব পদতলে
প্রাণের মেলা,—
আলোক-সাগরে ভাসে মা যেন রে
হাজার ভেলা!
অয়ি মা আমার তোমার উদার
পূজার ঘরে
পশিল সবাই রাখিয়াছ ঠাঁই
আমারো তরে!
শিখাইলে যেই অনল-মন্ত্র
বাজে সেই সুরে মানস-তন্ত্র
বিরামহারা,—
সকল হীনতা করি পরিহার,
তুমি রচিনিও নব উপচার
অমিয় পারা!
অয়ি মা আমার তোমার উদার
পূজার ঘরে,
পশিল সবাই রাখিয়াছ ঠাঁই
আমারো তরে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

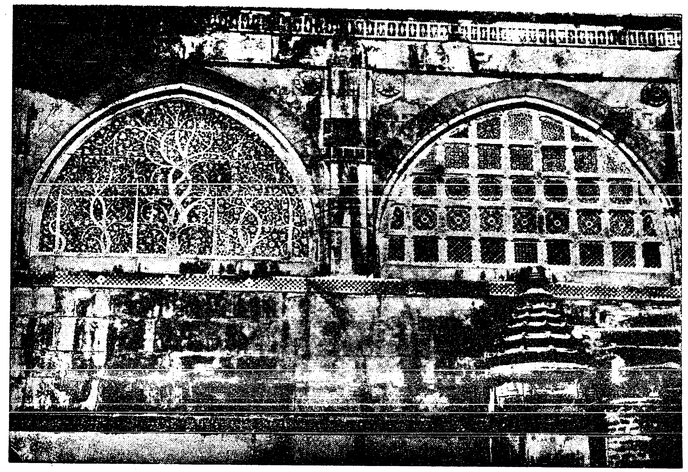

আহাম্মদাবাদের কোন প্রাসাদের কারুকার্য্য সমন্বিত জানালা।

'আইবুড়' তত্ত্ব।

প্রায় ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় 'আইবড়' শব্দের নিদানতত্ত্ব নব্যভারতে আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই তত্ত্বটি আমার নিকট ভ্রমসঙ্কুল বোধ হওয়ায় আমি তাহার একটি প্রতিবাদ নব্যভারত সম্পাদক মহাশয়কে দিয়াছিলাম, তিনি আবার তাহা বিদ্যানিধি মহাশয়কে দিয়াছিলেন, বিদ্যানিধি মহাশয়ও একদিন আমার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে ঐ ভ্রম সংশোধন করিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিনা। তার পর নানা কারণে এবিষয়ে আর কিছু বলা আবশ্যক বোধ করি নাই। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে পত্রিকাদিতেও 'আইবড় ভাতের' সংস্কৃত নাম 'আয়ুর্দ্ধান্ন' প্রযুক্ত হইত এবং অনেকেরই ধারণা ছিল যে 'আইবড় ভাত' 'আয়ুর্দ্ধান্ন' শব্দেরই অপভ্রংশজাত। এমন কি শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের ন্যায় সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মহাশয়ও সেই মতাবলম্বী হইয়া নানাপ্রকারে আয়ুর্বৃদ্ধি হইতে 'আইবড়'র পরিণতি নব্যভারতে প্রমাণ করিয়াছিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, শিক্ষিত সমাজে আজকাল আর ঐ ভ্রমপূর্ণ তত্ত্বের আদর নাই। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকজন শিক্ষিত মহোদয়ের সহিত আলাপপ্রসঙ্গে বুঝিলাম যে তাঁহারা এখনও ঐ মতই পোষণ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত ঐ প্রবন্ধকেই প্রামাণ্যস্বরূপ উপস্থাপিত করিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইহাঁদের এবিষয়ে যে ভ্রম এখনও আছে, আরও অনেকেরই সেইরূপ ভ্রম থাকিতে পারে, এই মনে করিয়া এই 'আইবড়' শব্দের উৎপত্তি তত্ত্ব সম্বন্ধে ক্ষুদ্র আমার অভিপ্রায় এস্থলে প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিতেছি।

সুপণ্ডিত সাহিত্যিকগণ আমার এ সিদ্ধান্তের সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার করিবেন আশা করি। বলা বাহুল্য আমি পূর্ব্বে যে সমুদয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতের প্রতিবাদ করিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধেও তাহাই প্রদর্শিত হইবে। কিন্তু সে প্রবন্ধ যখন প্রকাশিতই হয় নাই, তখন আমার এ প্রবন্ধ পৌনরুক্তি দোষদুষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যানিধি মহাশয় দেখাইয়াছিলেন যে, 'আয়ুর্বৃদ্ধি'ই 'আইবুড়' বা 'আইবড়'র জননী। 'আয়ুঃ' কথাটির অপভ্রষ্ট শব্দ 'আই' এবং 'বৃদ্ধি' কথার অপভ্রষ্ট 'বড়' এই উভয়ে মিলিয়া 'আইবড়' সৃষ্ট হইয়াছে। যে পুত্র বা কন্যার বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে, তাহাদের আয়ুর্বৃদ্ধি কামনা করিয়া তাহাদিগকে যে অন্ন আহারার্থে দেওয়া যায়, তাহাই 'আয়ুর্দ্ধান্ন' অথবা চলিত কথায় 'আইবড়' ভাত। আইবড় ভাতের এ ব্যাখ্যাটি যেরূপ যুক্তি আবরণে আবৃত করা হইয়াছে, তাহাতে ইহার অসঙ্গতি বড় উপলব্ধ হইবার কারণ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই সিদ্ধান্ত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নিতান্তই ভ্রমসঙ্কুল এবং মিথ্যা সাদৃশ্যের অনুমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'আই' এবং 'বড়' 'আয়ু' এবং 'বৃদ্ধি'র অপভ্রংশজাত হইলেও উভয়ের একত্র যোগ সামঞ্জস্য বিধানে অভীষ্টসিদ্ধি হইবার নহে। আমাদের মতে 'আয়ুর্বৃদ্ধির' সহিত 'আইবড়'র কোনই সংশ্রব বা সম্বন্ধ নাই, ইহাদের জ্ঞাতিগোত্র সবই পৃথক। সংস্কৃত বহ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন উঢ় শব্দের অর্থ 'বিবাহিত' ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। বি উপসর্গ যোগে উঢ় শব্দ 'ব্যূঢ়' শব্দে পরিণত হইয়া বিবাহিতার্থই প্রকাশ করে, ইহাও সকলেরই বিদিত। তাহার পর নঞ যোগে যে বিবাহিত নহে সে 'অব্যূঢ়' বলিয়া পরিচিত হয়। এই 'অব্যূঢ়'ই 'আইবড়'র জনক। অব্যূঢ়ায় যৎ অন্নং তৎ অব্যূঢ়ান্নং এই হইল-অব্যূঢ়ান্নের ব্যুৎপত্তি। অর্থাৎ অবিবাহিত পুরুষ বা রমণীকে যে অন্ন মঙ্গল কামনায় দেওয়া যায়, তাহাই অব্যূঢ়ান্ন। বলিতে গেলে

অবিবাহিত অবস্থার অন্ন গ্রহণ এই তাহাদের শেষ। কারণ বিবাহ হইয়া গেলে আর সে অব্যূঢ়ত্বের দাবী করিতে পারিবে না; অথবা কুমার এবং কুমারী জীবনের শেষ অংশে সেই কৌমারকে বিদায় দিয়া নব বিবাহিত জীবনকে বরণ করিয়া আনিবার ব্যপদেশে কুমার কুমারীর কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ তাহাকে যে অন্ন পানবস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সংবর্দ্ধনা করেন, তাহাই অব্যূঢ়ান্ন প্রথা নামে প্রচলিত।

এই 'অব্যূঢ়' কথাই ক্রমে উচ্চারণ বৈধর্য্যে রূপান্তরিত হইয়া 'আইবড়' হইয়া দাঁড়াইয়া এমনই পরিবর্ত্তিত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছে যে, তাহার নিকট হইতে তাহার জনক অথবা বংশের পরিচয় পাওয়া বড় দুরূহ। সে অন্যের সন্তান বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। এ সংসারে মানব জাতির মধ্যেই যখন এইরূপ জীব দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বেচারা 'আইবড়'কেই দোষী করা কেন?

এখন দেখা যাউক এমন সুসংস্কৃত অব্যূঢ় শব্দ কিরূপে আত্মবংশ চিহ্ন-বিলুপ্ত হইয়া আইবড় হইয়া পড়িয়াছে।

'অব্যূঢ়' যকার, উকার এবং ঢকার সমাকুল হইয়া কিছু কটমট হইয়াছে সন্দেহ নাই।

এই কটমটত্ব তাহার এ দুর্গতির হেতু। গ্রাম্য জনগণ এবং ললনাকুল 'অব্যূঢ়' উচ্চারণের কঠোরতা একটু একটু করিয়া কোমলত্বে পরিণত করিয়া লইয়াছেন।

অব্যূঢ়র 'ব্' সংযুক্ত এবং 'উ' যুক্ত হওয়ায় অতি গুরু হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তৎসাহচর্য্যে গরীব 'অ' বড় কিছু গুরুত্ব বাড়িয়া গেল; সংসারেও অনেক লঘু ব্যক্তি গুরুগণের সংসর্গে গুরু হইয়া গিয়াছেন দেখা যায়। সুতরাং অব্যূঢ় ক্রমে 'আব্যূঢ়' হইল, কিন্তু 'ব্যূ'র 'য'কারটা বড়ই গণ্ডগোল করিতে লাগিল; এজন্য ক্রমে 'আব্যূঢ়' উচ্চারিত হইবার কালে আকারের পর একটু 'য'কারেরও পরে একটু 'ই'কারের আভাস দেখাইতে লাগিল; ক্রমে উকার সংযোগে 'য'কারে পরিণত 'ই'কার স্বমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক 'আ'কারের পার্শ্বে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিল; 'আইব্যূঢ়' রূপে পরিণত হইল; তারপর 'ঢ়'কার ছিল, সেও ক্রমে অসহনীয় হইয়া তদপেক্ষা কোমল 'ড়'কারে পরিণত হইয়া 'আইবুড়' হইয়া গেল। এই 'আইবুড' বহুকাল বহু প্রদেশে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু শেষে সে দেখিল যে 'ব'এর শেষে যে 'উ'কার স্বরূপ লাঙ্গুলটি রহিয়াছে, উহা অভিজ্ঞের নিকটে তাহার বংশ পরিচয় পাইবার প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে; অতএব লেজকাটা সিপাহী না হইলে আর মান বাঁচান দায়! অতএব গোপনে গোপনে পরামর্শ পূর্ব্বক বংশ পরিচায়ক শেষ চিহ্ন লাঙ্গুলটি অব্যবহারূপ অস্ত্র সাহায্যে কর্ত্তন করিয়া একেবারে ঠাট কাঠাম বদলাইয়া 'আইবড়' হইয়া 'আয়ুঃ' এবং 'বৃদ্ধি'র সহিত স্বীয় জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধের ভাণ করিয়া লোকের মনে বৃথা ধারণা জন্মাইয়া দিল। এই হইতেছে 'আইবড়'র জন্মের বংশ তালিকা! এখন সকলে ইহার প্রকৃত বংশ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে সেই চক্ষেই দেখিতে থাকিবেন; বাহ্য দৃশ্যে ভুলিয়া অন্য বংশীয় বলিয়া মনে করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার যেন না করেন; করিলে নিশ্চয়ই প্রত্যবায় ভাগী হইবেন এবং ইহার আদি পুরুষ 'অব্যূঢ়ের' অভিশাপের হাত এড়াইতে পারিবেন না নিশ্চয়।

'অব্যূঢ়'ই যে 'আইবড়র' জনক তৎবিষয়ে আরও দুই একটি ব্যবহার গত প্রমাণও প্রত্যয়ার্থে উপস্থাপিত করিতেছি।

বঙ্গসাহিত্যে যেখানে 'আইবড়' কথাটির প্রয়োগ আছে, সেখানে তৎপরিবর্ত্তে 'অব্যূঢ়' শব্দের প্রয়োগে বেশ অর্থ সঙ্গতি হয়, কিন্তু 'আয়ুর্বৃদ্ধি' প্রয়োগে তাহা হয় না।

দৃষ্টান্ত স্থলে—

'ঘরে আইবড় মেয়ে, দেখ না বারেক চেয়ে' উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে "ঘরে অব্যূঢ়া মেয়ে" বলিলে ঠিক অর্থ সঙ্গতি হয়, কিন্তু "ঘরে আয়ুর্বৃদ্ধি মেয়ে" করিলে কোন সঙ্গতিই হয় না। অবিবাহিত বা অবিবাহিতা অর্থেই সাহিত্যে এবং

বাক্য কথনে আইবড় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আয়ুর্বৃদ্ধি অর্থে ইহার প্রয়োগ কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে যে আইবড় ভাতের সঙ্গে মিশিয়া তার আয়ুর্বৃদ্ধির কল্পনা, সেটা কেবল জোর করিয়া টানিয়া আনা মাত্র।

পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় এই আইবড় ভাত খাওয়াকে 'থুবড়া' বা 'খুবুড়া' খাওয়া বলে এবং অবিবাহিতা একটু বয়স্থা কন্যাকে থুবড়া মেয়ে বলে। আমাদের বোধ হয় যে, এই 'থুবড়া' ও 'অব্যূঢ়া'রই বহু পুরুষ দূরসম্পর্কিত জ্ঞাতি। অব্যূঢ়াই উচ্চারণ বৈষম্যে "অদ্‌বুড়া" হইয়া থুবুড়ায় পরিণত হইয়াছে; ইহা কষ্ট কল্পনা নহে। 'দ'কারের বা 'থ'কারের আগমটা নিতান্তই অধিকন্তু হইলেও দেশভেদে জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে এইরূপ আগম অসম্ভব নহে, তাহা ভাষা তত্ত্ব পর্য্যালোচনায় প্রতিপন্ন হইবে।

উড়িষ্যা দেশে এই আইবড় ভাতের নাম "অবড়া খিয়া।" এই 'অবড়া' বা 'অবঢ়া' যে 'আইবড়' অপেক্ষাও 'অব্যূঢ়ে'র অতি নিকটতর জ্ঞাতি, প্রায় দশ রাত্রির অশৌচের ভাগী তাহা উভয়ের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই পরিস্ফুট হইবে।

তারপর অনেক স্থানে (সর্ব্বত্র কি না ঠিক জানি না) মৃতদার ব্যক্তির দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ কালে যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে আর 'আইবড় ভাত' দেওয়া হয় না। 'আইবড়'র যদি আয়ুর্বৃদ্ধির সহিতই সম্বন্ধ হইত, তাহা হইলে মৃতদারের বিবাহে সে অনুষ্ঠানের বাদ পড়ার কারণ ছিল না, কারণ তাহার আয়ুর্বৃদ্ধি কামনা বরং আরও বেশী প্রয়োজনীয়। কিন্তু 'অব্যূঢ়' সহিত সম্বন্ধে এটা বেশ পরিষ্কার হয়, কারণ প্রথম বিবাহ হইতেই তাহার অব্যূঢ়ত্ব দূর হইয়াছে, সুতরাং কুমারের প্রাপ্য আইবড় ভাতে আর তাহার দাবী নাই। সে আর আইবড় নহে; সে নাম প্রথম বিবাহেই ঘুচিয়া গিয়াছে। অনেক কুলীন পিতৃগৃহে নিবাসিনী বিবাহিতা কন্যার বিষয় বলা হয় যে, কেবল আইবড় নাম ঘুচান হইয়াছে; এখানেও 'অব্যূঢ়ে' সঙ্গতি পরিস্ফুট। অতএব প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ হইয়া বলা যাইতে পারে যে, আইবড় অব্যূঢ়েরই সন্তান, আয়ু বৃদ্ধির সহিত তার কোনও সম্পর্ক নাই।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিজয়া।

(গল্প।)

তারার বয়স আট বৎসর অতীত না হইতেই তাহার পিতা লক্ষ্মীকান্ত বাবু গৌরীদানের ফল লাভ করিবার আশায় একজন জমাদারের ঘরে তারার বিবাহ দিলেন। একমুখ পান চিবাইয়া কচি ঠোঁট দুখানি লাল করিয়া এলো চুলে যে তারা শীতকালের সারা দুপুর পুকুর পাড়ে আমগাছের তলে সহচরীগণের সহিত মাটীর অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধনে ব্যস্ত থাকিত, ও সন্ধ্যা হইলে ঠাকুরমার কোলে মাথা রাখিয়া 'শুয়োরাণী ও দুয়োরাণী' 'মরণকাটি জীবনকাটি' 'সাত ভাই চম্পা' প্রভৃতি মনোরম উপকথা শুনিতে শুনিতে নিদ্রা যাইত, আজ শ্বশুরবাড়ীতে সেই তারার মুখখানি দেখিবার যো নাই; তাহার মুখের উপর অর্দ্ধহস্ত দীর্ঘ অবগুণ্ঠন বিলম্বিত।

শ্বশুরবাড়ীতেও তারার আদরের অভাব নাই বটে, কিন্তু তাহার হাসি মুখখানি একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে। শ্বশুর বাড়ীর আদর যত্নের মধ্যে সে যেন কেমন প্রাণের অভাব অনুভব করিত। তাহাকে দেখিলেই মনে হইত তাহাকে শৈশবের ক্রীড়াকুঞ্জ হইতে টানিয়া আনিয়া কে যেন অকাল বিজ্ঞতার রাজ্যে ফেলিয়া গিয়াছে, তাহার স্বাধীন

প্রাণকে সোণার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়াছে, তাই বুঝি তাহার কোমল হাসি বিষাদের মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, তাহার সদাচঞ্চল চরণ দুখানি তাই এখন দুই পা চলিতেই বাধিয়া যাইতেছে!

তারা পিতার বড় আদরের মেয়ে। একমাত্র কন্যা বলিয়া লক্ষ্মীকান্ত বাবু তাহার নাম রাখিয়াছিলেন নয়ন তারা। কিন্তু সকলে তাহাকে তারা বলিয়াই ডাকে। জমীদারের ঘরে কন্যার বিবাহ দিয়া লক্ষ্মীকান্ত বাবুকে সময়ে সময়ে গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত, কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে; আমার বিশ্বাস ধনী জামাতার নির্ধন শ্বশুরের এরূপ গঞ্জনা কায়েমী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। তাহার পিতা ধনাঢ্য লোক ছিলেন না, তথাপি তিনি কন্যার বিবাহে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু বেয়ান নাম্নী সর্ব্বগ্রাসিনী দেবতাটিকে সন্তুষ্ট রাখা তাহার পক্ষে সহজ হইল না। কিন্তু পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াও তিনি সন্তুষ্ট; কারণ তিনি বলিতেন, "আমি গালিগালাজ খাই ক্ষতি কি? মেয়েত আমার চির জীবন সুখে থাকবে!"

কিন্তু ধনীর পুত্রবধু হইয়াও তারার মনে সুখ ছিল না; মা বাপের মুখ মনে পড়িলেই চোখের জলে তাহার ফুলের মত কোমল গাল দুখানি ভাসিয়া যাইত, এবং বাহিরের উত্তাপে তাহার অন্তর পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। বিশেষতঃ কর্ম্মহীন অপরাহ্ণে যখন তাহার শাশুড়ী প্রকাণ্ড বারান্দায় তাঁহার প্রসাদাকাঙ্ক্ষিনী সমবেত প্রতিবেশিনী মণ্ডলীর মধ্যে নবরত্নের সভাধিষ্ঠিত রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বসিয়া বসিয়া আপনার মুক্ত হস্তত্ব ও নগণ্য বৈবাহিকের কৃপণতা সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত নানা কথার আলোচনায় মধুর অবসর কালের সদ্ব্যয় করিতেন, তখন সেই সভাশীনা রমণী সমাজের পশ্চাতে একটি সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে দুই খানি বড় বড় চক্ষু হইতে অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিয়া তারার বসন সিক্ত করিত, এবং দুঃখে ও অভিমানে সেই ক্ষুদ্র বালিকার ব্যথিত হৃদয়ের উদ্ভাসিত দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে বাতাসে মিশাইয়া যাইত।

লক্ষ্মীকান্ত বাবু নিষ্ঠাপরায়ণ হিন্দু। তাঁহার বাড়ীতে চারি পুরুষ ধরিয়া দুর্গোৎসব চলিয়া আসিতেছে; এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে সেই পারিবারের উপর দিয়া অনেক বাধা বিঘ্ন ও বিপদ গিয়াছে বটে কিন্তু পূজা কোন দিন বন্ধ হয় নাই; লক্ষ্মীকান্ত ও সাংসারিক অসচ্ছলতা সত্বেও মাথায় সংসারের ভার পড়িবার পর হইতে সমান ভাবে পূজা চালাইয়া আসিতেছেন; ইহাতে তাঁহার কিছু কষ্ট হইতেছে সত্য, কিন্তু তিনি 'মা ঘরে আসিতেছেন, ভাবিয়া প্রসন্ন মনে সেই কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছেন।

আজ দুই বৎসরের অধিক হইল তারার বিবাহ হইয়াছে এবং বিবাহের অল্প দিন পরেই সে স্বামী গৃহে আসিয়াছে, সুতরাং বিবাহের পর আর সে পিতৃগৃহে পূজার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে নাই, দুইটি বৎসর সে মায়ের মুখখানি দেখিতে পায় নাই, দশ বৎসরের মেয়ের প্রাণে এ কষ্ট কি সহ্য হয়?

গত বৎসর লক্ষ্মীকান্ত বাবু পূজা উপলক্ষে তারাকে গৃহে লইয়া যাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কারণে তারার শাশুড়ীর মত হয় নাই; তিনি যুক্তিহীন সংক্ষিপ্ত রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, বৌমা সেদিন বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছে, এত শীঘ্র তাহাকে পাঠান হইবে না।'

কিন্তু স্নেহমুগ্ধ নির্লজ্জ লক্ষ্মীকান্ত মেয়ে আনিবার জন্য বৈবাহিকের নিকট উমেদারি করিতে কোন দিন কুণ্ঠিত হইতেন না; বৈবাহিক লোকটি মন্দ নহেন, কিন্তু তাঁহার বাস্তুদেবতা সহধর্ম্মিনীর আদেশ বহির্ভূত কোন কাজ করা তাঁহার অসাধ্য —অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লেখার পর, লক্ষ্মীকান্ত সংবাদ পাইলেন বৈবাহিকের বাস্তুদেবতা প্রসন্ন হইয়াছে, আদেশ হইয়াছে, লক্ষ্মীকান্ত বাবু পূজার সময় তাঁহার কন্যাকে লইয়া যাইতে পারেন।

এই সংবাদে লক্ষ্মীকান্তের নিরানন্দময় গৃহে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল, তারার জননী দীর্ঘ কাল কন্যার অদর্শনে মনের দুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন, কতদিন পরে কন্যাকে দেখিতে

পাইবেন এই আশায় তাঁহার মুখে আবার হাসি ফুটিল। তারাও এক একটি করিয়া পূজার দিন গণিতে লাগিল। আহা কতদিন সে মাকে দেখে নাই, ঠাকুর মার উপকথা শোনে নাই, সঙ্গিনীদের সঙ্গে খেলা করিতে পায় নাই; তাহারা কি এখনও সেইরূপ আছে? সেই নদীর তীর, সেই আম বাগান, বকুলের ছায়ায় বসিয়া বনলতা দিয়া মালা গাঁথা, বাড়ীর পাশে দেবালয়ে সন্ধ্যাকালের সেই কাঁসর ঘণ্টার রব, এবং বাঁস বনের আড়াল হইতে পূর্ণিমার চাঁদের সেই মধুর শোভা একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

তৃতীয়ার দিন পাল্কী বেহারা লইয়া লক্ষ্মীকান্তের দাসী চাটুর্য্যে জমীদারদের সিং দরজায় প্রবেশ করিল। অনেক দিন পরে পুরাতন দাসীকে দেখিয়া আনন্দে তারার শিশু হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, অতি শৈশবের বিস্মৃত প্রায় স্মৃতির তরঙ্গ উঠিয়া তাহার হৃদয়ের সকল ভাব ওলট পালট করিয়া দিল।

আহারাদির পর ঝি তারার শাশুড়ীর নিকট তারাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। তারার শাশুড়ী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "মুখ থাকতে কে নাকে ভাত খায়! আমি ত বাড়ীর কর্ত্তা নই; বৌমার শ্বশুর কি বলেন তা না জেনে কোন কথা বল্‌তে পারবো না।"

অপরাহ্ণে নাকে ও মুখে কি পরামর্শ হইল, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু তারার শাশুড়ী বৈবাহিকের দাসীর নিকট তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপনে বিলম্ব করিলেন না, চোক চিপিয়া, মুখ অন্ধকার করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোমাদের এ কিরকম ব্যাভার গো! আমাদের কি যেসে ঘর? চাটুয্যে বংশের বৌ যাবে একটা ঝির সঙ্গে বাপের বাড়ী?—কেন, আমাদের কি মানসম্ভ্রম কিছুই নেই? তোমাদের কর্ত্তা পূর্ব্বজন্মে অনেক 'পুণ্যি' করে ছিলেন, সেই ফলে আমার সীতেনাথকে জামাই পেয়েছেন, আমরা তাঁর মেয়ে নিয়েছি, কিন্তু সে কথা তাঁর মনে নেই; নিজে কি ঘুমুচ্ছেন যে, মেয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ঝি পাঠিয়েছেন? না বাছা, ঝির সঙ্গে আমাদের বৌ পাঠানো হবে না, তোমাদের কর্ত্তাকে বল গিয়ে, পাল্‌কী বেহারা ফিরে নিয়ে যাও।"

ঝি লক্ষ্মীকান্তের অনেক দিনের পরিচারিকা, লক্ষ্মীকান্তের পত্নীর সুখদুঃখের চিরসঙ্গিনী, তারার শাশুড়ীর কথা শুনিয়া তাহার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিল, সে কি একটা কড়া জবাব করিতে যাইতেছিল, কিন্তু তারার মুখখানি হঠাৎ মনে পড়ায় সে হঠাৎ থামিয়া গেল; মৃদুস্বরে বলিল, "বাড়ীতে পুজো, কর্ত্তা একলা মানুষ, কি করে মেয়ে নিতে আসেন? আপনাদের ত তিনি কুটুম্ব, তাঁর সুবিধে অসুবিধের কথা আপনাদেরও ত একটু বুঝতে হয়!—প্রতিবাদে অসহিষ্ণু হইয়া তারার শাশুড়ী সক্রোধে বলিলেন, "তা বুঝ্‌তে হয় বইকি, হারামজাদী মাগী, ছোট লোকের বেটী, যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! বাড়ীতে পুজো দেখাচ্ছিস্, পুজো কি আর কেউ করে না?—তোর মনিবই এ ভুভারতে একা পুজো কর্‌চে?—একা মানুষ না আস্‌তে পারবেন ত মেয়ে নিয়ে যাবার সখ কেন?"

তারা উপর হইতে নীচে আসিতেছিল, সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া তাহার 'সারদা পিসি'র প্রতি তাহার শাশুড়ীর এই ভৎর্সনা তাহার কর্ণগোচর হইল; সে আর নামিতে পারিল না, কম্পিত পদে ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেল। তাহার চক্ষুদুটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, ক্ষোভে দুঃখে অধীরা বালিকা ঘরের মেঝেতে বসিয়া পড়িল! যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়া তাহার দীর্ঘ সঞ্জীবিত আশালতা নির্ম্মূল হইল!

অল্পক্ষণ পরে তাহার শাশুড়ী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বৌমা, তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ঝি পাঠিয়াছেন! চাটুয্যেরা এখনও এত ছোটলোক হয়নি যে ঝি চাকরের সঙ্গে ঘরের বৌ পাঠাবে। তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী পাঠানো আমার অসাধ ছিল না, কিন্তু কি করব বল? ওর সঙ্গে তোমার যাওয়া হবে না,

তোমার বাপকে যদি কিছু বলবার থাকে ওকে দিয়ে বরং বলে পাঠাও।"—গৃহিণী প্রস্থান করিলেন, তারা চোখের জলে কিছুই দেখিতে পাইল না, মেঝেতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঝি আসিয়া তারাকে কোলে লইল; তাহার অশ্রুপ্রবাহে ঝির অঞ্চল সিক্ত হইল। শাশুড়ীর কথা শুনিয়া তারার মনে হইল, তাহার পিতা বুঝি তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। নতুবা সকল কথা জানিয়াও তিনি নিজে না আসিয়া কেন দাসী পাঠাইলেন? দাসীর কোলে অভিমানিনী বালিকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সারদা দাসীর সঙ্গে পাল্কী বেহারা ফিরিয়া গেল। তারা আসিল না দেখিয়া তারার মা শয্যা গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চমীর দিন লক্ষ্মীকান্ত বাবু আবার পাল্কী বেহারা লইয়া বৈবাহিক গৃহে উপস্থিত হইলেন। নূতন বৈবাহিকের আদর যত্নের সীমা রহিল না, কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত বাবুর ন্যায় গরীবের নিকট এত সম্মান ও আদর অসঙ্গত বিদ্রূপ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অপরাহ্নে তাঁহার জলযোগ শেষ হইলে খানসামা যখন রূপার গাড়ুতে জল আনিয়া তাঁহার হাতে ঢালিয়া দিতে গেল, তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের ও সকল অভ্যাস নাই বাপু, গাড়ুটা রাখিয়া যাও"

পিতাকে দেখিয়া তারার অন্ধকার মুখে আবার হাসি ফুটিল। কন্যাকে নানা কথায় আশ্বস্ত করিয়া তিনি সন্ধ্যার পর বেয়ানের নিকট কন্যা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন; তারার শাশুড়ী দাসীর মুখ দিয়া বলাইলেন, সেই ত এলেন, তা দুদিন আগে এলেই ত মেয়ে নিয়ে যেতে পারতেন, যখন পাঠাব বলেছি, তখন কি আর কথার কিছু নড়চড় ঃহ'তো, তবে কি না কাল রাত পোয়ালে ষষ্ঠী, ষষ্ঠীর দিন কি করে ঘরের বৌ পাঠাই?'

তারার পিতা অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, "মা জগদম্বাই যখন ষষ্ঠীতে বাপের বাড়ী আসেন, তখন মানুষের তাহাতে দোষ কি?"—গিন্নি বলিলেন, "আমরা স্ত্রীলোক, অত শত কথা বুঝিনে, দেবতার সঙ্গে কি মানুষের তুলনা?—ষষ্ঠীর দিন বৌ পাঠাবো না, নিয়ে যেতে হয় পুজোর পর নিয়ে যাবেন।"

তারার পিতা দেখিলেন, সকল চেষ্টাই বৃথা হইল, সকল কাজ নষ্ট করিয়া, অনর্থক কতকগুলি অর্থ ব্যয় করিয়া, তিনি কি কেবল অপমান সঞ্চয় করিতে আসিয়াছিলেন? ক্রোধে ক্ষোভে ও অপমানে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, নিজের দরিদ্রতা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অতি কঠোর ভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। বাঙ্গলা দেশে হিন্দুর গৃহে কন্যার পিতা হওয়া তিনি বিধাতার দারুণ অভিশাপ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে এক দাসী তারার শয়ন কক্ষে আলো দিতে আসিয়া গৃহিণীর সহিত তারার পিতার কথা-বার্ত্তার মর্ম্ম তাহার গোচর করিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে; পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রালোকে পশ্চিম আকাশের এক খণ্ড অতি শুভ্র লঘু মেঘের ভিতর দিয়া ভাগিরথী তীরস্থ সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা প্লাবিত করিতেছিল। সেই সময়ে লক্ষ্মীকান্ত বাবু কন্যার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ম্লান দিবালোকে দেখিতে পাইলেন, তারা বিছানায় পড়িয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। দশম বর্ষীয়া মাতৃক্রোড় বিচ্যুতা, নির্ব্বাসিতা কন্যার ক্রন্দনে তাঁহার পিতৃ হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি তারাকে কোলে লইলেন। তারা তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া অশ্রুধারায় তাহার বুক ভাসাইতে লাগিল, লক্ষ্মীকান্ত বাবুরও অশ্রু সংবরণ করা সহজ হইল না।

নানা কথায় কন্যাকে বুঝাইয়া লক্ষ্মীকান্ত বাবু সেই রাত্রেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সমস্ত রাত্রি তারার চক্ষে ঘুম আসিল না, সে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

রাত্রি শেষে সুশীতল নৈশ সমীরণ স্পর্শে বালিকা নিদ্রিত হইল। অল্পক্ষণ পরেই প্রভাত হইল, কিন্তু তখনও বিহঙ্গকুল প্রভাতের আবাহন সঙ্গীত আরম্ভ করে নাই, অরুণের কণক কিরণধারা তারার শয়ন

প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ পথে প্রবেশ করে নাই; এমন সময় কি এক করুণ সঙ্গীতে তারার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে রাত্রি শেষে যে মধুর স্বপ্ন দেখিতেছিল এ সঙ্গীত বুঝি তাহারই পরিশিষ্ট—তাহার স্বপ্ন সত্য, কি স্বপ্ন, সে ঠিক বুঝিতে পারিল না, চোখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি জানালার কাছে আসিয়া শুনিল, একজন ভিখারী উষালোকিত নির্জ্জন রাজপথ দিয়া মধুর স্বরে গাহিয়া যাইতেছে,—

"সারা বরষ দেখিনি মা,
মা তুই আমার কেমন ধারা!
নয়ন তারা হারিয়ে আমার
অন্ধ হ'ল নয়ন তারা।
এলি কি পাষাণী ওরে,
দেখ্‌বো তোরে নয়ন ভোরে,
কিছুতে থামে না যে মা!
পোড়া এ নয়নের ধারা।"

এ যে তাহারই মাতৃ হৃদয়ের আকুলতা পূর্ণ আহ্বান সঙ্গীত! বালিকার মনে পূর্ব্ব দিনের সকল কথা জাগিয়া উঠিল, শয্যায় শয়ন করিয়া মায়ের জন্য আবার সে কাঁদিতে লাগিল। একটু বেলা হইলে নিকটস্থ পূজা বাড়ীতে শানাই বাজিয়া বাজিয়া আগমনীর আনন্দ বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। সেই শানাইয়ের গানে ও কাঁচাসোনার মত প্রাতঃ সূর্য্যের কিরণে মনে হইতে লাগিল যেন পৃথিবীতে শোক দুঃখ কিছু নাই, চরাচরে কেবল আনন্দের স্রোত বহিতেছে। কিন্তু তারার নিকট তাহা বিজয়ার ক্ষোভের বিদায় গীতি বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে পূজার তিন দিন কাটিয়া গেল; লক্ষ্মীকান্তের গৃহে পূজা—কিন্তু তাঁহার ও তারার মায়ের মনে কিছুমাত্র আনন্দ বা উৎসাহ নাই, মৃন্ময়ী দশভুজা মূর্ত্তি তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া দাঁড়াইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে কন্যামূর্ত্তি কৈ?—প্রতিমা দেখিয়া লক্ষ্মীকান্তের মনে কন্যার অশ্রু-সজল মুখখানিই পুনঃ পুনঃ জাগিতে লাগিল।

দশমীর দিন প্রভাতে পূজামণ্ডপে বসিয়া লক্ষ্মীকান্ত একান্ত মনে দুর্গার বন্দনা করিতেছেন,—কিন্তু মন কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছেন না, এক একবার তাঁহার মনে হইতেছে, "সকলই যদি মায়ার বিকার—তবে পৃথিবীতে এত স্নেহ প্রেম, এত আত্ম বিসর্জ্জন, এত মিলন বিরহ কেন?—মা, আমি নিতান্ত মোহান্ধ, মৃত্তিকায় তোমার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমাকে লইয়া ছেলেখেলা করিতে বসিয়াছি, হৃদয়ের এ দুর্ব্বলতা, এ মোহ. এ অবিশ্বাস কি তুমি দূর করিতে পার না? আজ বিজয়া, আজ তোমার সিংহবাহিনী মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিব, কিন্তু ঐ তিন দিন তোমাকে পূজা করিয়া কৈ কোন তৃপ্তিই ত লাভ করিতে পারিলাম না! মা, আমি অতি নির্ব্বোধ, নিতান্ত শিশু, তোমার রহস্য বুঝিবার আমার শক্তি নাই।"

একজন সন্ন্যাসী কখন পূজার দালানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, লক্ষ্মীকান্ত তাহা দেখিতে পান নাই; সন্ন্যাসী অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিমার দিকে চাহিয়া করযোড়ে গাহিতে লাগিল,—

"প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে
এ বিশ্ব নিখিল তোমারই প্রতিমা;
মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো!
মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি
সাগর নিঝর ভূধর অটবী,
নিকুঞ্জ ভবন, বসন্ত পবন,
তরু, লতা, ফল, ফুল মাধুরিমা।
সতীর পবিত্র প্রণয় মধু,—মা!
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা;
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
তোমারই মাধুরী তোমারই মহিমা;
যেদিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মাগো বিরাজিত তুমি,
বসন্তে কি শীতে, দিবসে নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব গরিমা।

তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি',
তোমারে পূজিতে চাই, মা ঈশ্বরী!
অমর কবির, হৃদয় গভীর,
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা;
খুঁজিয়া বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে,
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা!"

গান শুনিয়া লক্ষ্মীকান্তের নয়নে অশ্রু সঞ্চার হইল, তিনি মনে শান্তি পাইলেন।

কিন্তু এ চারিদিন তারার মনে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। দশমীর দিন সন্ধ্যাকালে ছাদে দাঁড়াইয়া সে অদূরবর্ত্তী নদীজলে প্রতিমার ভাসান দেখিতে ছিল, কিন্তু তাহার উদ্ভ্রান্ত চিত্ত কোন দূরে কাহার বেদনা-ভরা অশ্রু সজল দুইখানি আঁখির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা সে বোধ হয় নিজেই বলিতে পারিত না—তখন সে এতই অন্যমনস্ক ছিল! অবশেষে সন্ধ্যার পর নদীজলে প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইলে যখন সমস্ত প্রকৃতি মুগ্ধ করিয়া করুণ রাগিণীতে গান ধরিল, তখন সেই প্রাণস্পর্শী করুণ স্বর-লহরী তাহার সুকোমল হৃদয়-তন্ত্রীতে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। চরাচর তাহার মনকে দুঃখে পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। বিজয়ার আলিঙ্গন ও প্রণামাশীর্ব্বাদের প্রফুল্লতায় যখন সমস্ত নগরী পূর্ণ, দশমীর চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্বল রজত কিরণ-সম্পাতে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত, সেই সময় নদীকূলে একখানি অট্টালিকার একটি অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে একটি ক্লিষ্ট হৃদয় দুঃখে ও অভিমানে বিদীর্ণ হইতেছিল, এবং একটি মর্ম্মপীড়িতা বালিকার উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে তাহার পিতামাতার স্নেহময় মুখখানি ও সুখপূর্ণ শৈশব জীবনের আনন্দ কোলাহলের স্মৃতি ধীরে ধীরে ভাসিয়া আসিতেছিল; বিজয়ার দুঃখ ও বিষাদ আর কেহ সেদিন তাহার মত অনুভব করে নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রকৃতির বিরহ।

মরি, মরি—
মধুময়ী প্রকৃতি-সুন্দরী!
রজত চন্দ্রিকারাশি সর্ব্বাঙ্গে পড়ে'ছে আসি;
মাধুর্য্য পাথারে যেন রয়েছে ডুবিয়া;
'ঝিরি ঝিরি মৃদু বায় শ্বাসসম বহে' যায়;
শিহরিছে ক্ষণে ক্ষণে যোগ মগ্ন হিয়া!
নিস্তব্ধ, বাসন্তী নিশি;— নিদ্রা-মগ্ন দশ দিশি!
কা'র তরে জেগে' আছে লাবণ্যের রাণী
এবে, এই নিরজনে?—স্থির নাহি জানি।

আমিও ছিলাম অচেতন।
সহসা কোকিল কেন করিল ঝঙ্কার হেন?
—কেন সেগো ডাকিল এমন?
চমকি' জাগিয়া উঠি' বাহিরে এলাম ছুটি;
হেরিলাম—স্বপ্নের সাগরে
একাকিনী এ কল্যাণী ত্রিলোক-বাঞ্ছিতা রাণী
জেগে' আছে যেন কা'র তরে!
তা'র ক্ষুণ্ণ হৃদি' হ'তে মলয়-মারুত-স্রোতে
মুহুর্মুহু পড়ি'ছে নিশ্বাস;
চিন্তাভরে, অযতনে অঙ্গ হতে ক্ষণে ক্ষণে
খসিয়া পড়িছে লজ্জা-বাস;
আবরণ পড়ে খসি,— কার হেন ধ্যানে বসি
অসময়ে দীর্ঘশ্বাসে বালা?
মরি, মরি—কি বিরহ! কি সাধনা, কি আগ্রহ!
কি দুঃসহ এ অন্তর জ্বালা!

ভ্রান্তি নাহি, শান্তি নাহি যা'র—
সে বিরহ অনন্ত, অপার!
প্রকৃতির মাঝে, তাই, হেরি—আজ বেদনাই
ফুটিয়া উঠি'ছে চারিধার!—
কোকিল করুণ তানে ব্যথিত, উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে
কহে—"নাহি সীমা বেদনার,'
'উঁহু' বলে তাই পাখী ডাকে এবে থাকি' থাকি,'
"উঁ উঁ' আর সহা নাহি যায়।"
সমীর নিশ্বাসি' কহে— 'বহিতে না শক্তি রহে;—
কোথা তুমি? কোথায়—কোথায়?'
নারিলেক-নিম্ব-শাখা (পরিম্লাত, জ্যো'স্না-মাখা,)
শিহরি' উঠিছে ক্ষণে ক্ষণে;
বেদনার অশ্রুজলে তটিনী কল্লোলি' চলে
তাই হেন বিরহ প্লাবনে,
ঝাউ বৃক্ষ শ্বাসি' কহে— সন্তাপে অন্তর দহে,
তাই আমি হ'য়েছি উদাসী;
তাই, যেন কা'র তরে মুক্ত গগনের' পরে
লঘু, শুভ্র, খণ্ড মেঘ রাশি—
কিসের সন্ধান করি,' সর্ব্ব শ্রান্তি পরিহরি'
ফিরিতেছে বিরহ-বিভোর;
পাপিয়াও কহে—"হায়, সে বিহনে প্রাণ যায়,—
কেঁদে কেঁদে 'চোক্ গেল' মোর।"
কেন? কেন?—কা'র তরে এ যাতনা চরাচরে?
কা'রে চাহে বিশ্ব নিরন্তর?
এসবের যিনি প্রাণ— প্রকৃতি, তিনিও চা'ন
—কা'রে লভি পূরা'তে অন্তর?
এ বিশ্ব প্রকৃতি আজি এহেন সুন্দরী সাজি,'
কিবিরহে হয়েছে এমন?
—নাহি জানি, নাহি বুঝি; তবু, তবু আমি খুঁজি
তারি মাঝে রহস্য-কারণ!

প্রকৃতি নিয়ত রহে আবরণ অন্তরালে;
তাই, তা'রে দেখিয়াও বুঝি নাই 'এতকালে।
আজ যেই এ নিশীথে ক্লান্ত; নিদ্রালস চিতে
বাহিরিয়া হেরিলাম—প্রকৃতি মুরতি,
অমনি চমকি মোর ভেঙে' গেল ঘুম ঘোর;
বুঝিলাম—সে-ও হায়, অসহায়া অতি;
জানিলাম—বেদনায় তা'রো বুক ফেটে যায়;
সে-ও চাহে—পূরিবারে অভাব আপন!
আজি তাই, নিরজনে, নিদ্রা ত্যজি,' সঙ্গোপনে
জানিয়া লইল কবি প্রকৃতির মন।

নিখিল-প্রকৃতি-রাণী বিরহিণী অতি!
চারিদিকে শুধু ব্যথা,—পরিপূর্ণ ক্ষতি!
কি যেন সবাই চাহে, তবু নাহি পায়,
বিশ্বভরা হাহাকার,—শুধু "হায়, হায়"!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

আধুনিক ওড়িয়া কবিতা।

গত আষাঢ় সংখ্যা "সুপ্রভাতে" আমরা ওড়িষ্যার আধুনিক সময়ের মহাকবি ৺ রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়া তাঁহার কবিতার সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাদিগকে কিছু জানাইবার বাসনা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি কবিবরের "মহাযাত্রা" কাব্য হইতে ভারতের অধঃপতনের চিত্রের একাংশ দেখাইতে মনঃস্থ করিয়াছি। ভরসা করি, কবিতার ভাষা বুঝিতে কাহাকেও বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে না।

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের "মহাপ্রস্থান" অবলম্বন করিয়াই এই কাব্য রচিত হইয়াছে। কলির প্রারম্ভে এই মহাপ্রস্থান অথবা মহাযাত্রা সংঘটিত হয়। অগ্নিদেব যুধিষ্ঠিরকে ভারতের ভাবী দুর্দ্দশার বিষয় অবগত করাইলে যুধিষ্ঠির ও অগ্নিদেব পরস্পরে তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। আমরা এই কথোপকথন হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"অগ্নি।" "বীর," ঘটিব নিকর (১)
কহিলি যা, কেবে তাহা নোহিব অন্যথা ; (২)
স্বাধীনতা বোলি যাহা বোলই আপণে, (৩)
সে কেবল ষড়রিপু প্রভুতার ছায়া ; (৪)
সে প্রভুতা চালি গেলে কলির কৌশলে, (৫)
চলে যিব স্বাধীনতা, পিণ্ড সঙ্গে যথা (৬)
চালি যাএ, পাণ্ডুনাথ, সে পিণ্ডর ছায়া। (৭)
রিপু অধীনতা সঙ্গে পর অধীনতা
আসিব স্বভাবে, রোগে উপসর্গ পরি। (৮)
সারস্বত ব্রাহ্মণের বাণী আরাধনা (৯)
চিরব্রত, এবে সেহি দেবী তিরোভাবে, (১০)
ব্রহ্মচর্য্য তেজি বিপ্রে হেবে কলিযুগে (১১)
লোভ মোহ জালে পড়ি অবিদ্যা সেবক।
চন্দ্রিকা পীযূষপায়ী চকোর ঔরসে
জন্মিবে উলূক,—অমা তিমির প্রণয়ী।
অকর্ম্মণ্য দ্বিজাতির হেব অবশেষে
ষটকর্ম্মে ষষ্ঠকর্ম্ম একমাত্র ব্রত। (১২)
তপ, দম, নিয়মাদি সব দূরে যাই,
একমাত্র যজ্ঞসূত্রগুণ থিব গুণে ! (১৩)
ধর্ম্মকু করিবে বিপ্রে জীবন জীবিকা!
মূঢ়পণে এতি জাতি এমর্ত্তামণ্ডলে
(কূপকু সে কূপবাসী মণ্ডুক যেমন) (১৪)
একমাত্র দেশ এতি ভারতকু মণি, (১৫)

(১) ঘটিব—ঘটিবে। নিকর—সকল।
(২) কহিলি—কহিলাম। কেবে—কখন। নোহিব—নাহবে।
(৩) বোলি—বলিয়া। বোলই—বলিতেছেন। আপণে—আপনি।
(৪) ষড়রিপু—রিপুদিগের উপর প্রভুতা।
(৫) চালি গেলে—চলিয়া গেলে।
(৬) যিব—যাইবে। পিণ্ড—দেহ।
(৭) চালি যাএ—চলিয়া যায়।
(৮) আসিব—আসিবে। পরি—মত।
(৯) সারস্বত—সরস্বতীভক্ত।
(১০) সেহি—সেই।
(১১) বিপ্রে—বিপ্রগণ। হেবে—হইবে।
(১২) ষটকর্ম্ম—যজন যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ। ষষ্ঠকর্ম্ম—প্রতিগ্রহ বা ভিক্ষা।
(১৩) যজ্ঞসূত্র গুণ—পৈতা। থিব—থাকিবে।
(১৪) কূপকু—কূপকে। মণ্ডুক—ভেক। যেমন—যেমন।
(১৫) ভারতকু—ভারতকে। মণি—মনে ভাবিয়া।

ভারত বাসিকি দৃঢ় কর্ম্মকাণ্ডজালে
ছন্দিবে, সে জালে পুণি নিজে হেবে ছন্দি ! (১৬)
সে জটিল কর্ম্মকাণ্ডে হোই বিজড়িত,
ধর্ম্মর যে সার, তাকু ছড়ি আর্য্যসুতে (১৭)
যাপিবে জীবন ধর্ম্ম-তুষে তুষ্ট হোই !
* * * *
অক্ষুণ্ণ রাখিবা লাগি স্বজাতি প্রভুতা (১৮)
যজমান জাতিঙ্কর ঐক্য ভাঙ্গি দেই (১৯)
শত শত উপজাতি সৃজিবে ব্রাহ্মণে,
ভেদ বুদ্ধি উপজাই মানবে মানবে।
সমাজে এ হীন ভাব ঘুণরূপে পশি,
অস্থিমজ্জা শোষি, তাকু করিব জর্জ্জর।
এক আরেকর স্পর্শে মনিব অশুচি (২০)
আপনাকু, অপবিত্র পশু ঠারু পুণি (২১)
হীন করি মানবকু মণিবে মানবে।
ক্রমে গৃহ বিগ্রহর সূত্রপাত হোই
এহিরূপে ছিন্ন ভিন্ন হেলে আর্য্য জাতি,
বিশ্বপূজ্য আর্য্যঙ্কর এই পুরাতনী
ভূমি হেব ছিদ্রান্বেষী শত্রুর আমিষ। (২২)
ব্রাহ্মণর তপঃফলে হোইথিলা যেহু
ভারতীর লীলাক্ষেত্র, সে ভারত এবে
হেবে পরিণত সেহি ব্রাহ্মণর পাপে
অজ্ঞান অঙ্গারময় ভীষণ শ্মশানে।
'মদন' 'আলস্য' ঈর্ষা তিনি সেনাপতি (২৩)
পশিবে রাজন্য গৃহে কলি আজ্ঞা মতে। (২৪)
আমন্ত্র সাধন সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা,
সে সাহস তৃণ প্রাণ দেশ রক্ষা ব্রতে,

(১৬) ছন্দিবে—বাঁধিবে। পুণি—পুনরায়। নিজে হেবে ছন্দি—নিজে বদ্ধ হবে।
(১৭) তাকু—তাহাকে। ছড়ি—ত্যাগ করিয়া।
(১৮) রাখিবা লাগি—রাখিবার নিমিত্ত।
(১৯) যজমানজাতিঙ্কর—ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণদিগের যজমান, সেই জাতিগুলির।
(২০) মনিব—বোধ করিবে।
(২১) পশুঠারু—পশু হইতে। পুণি—পুনশ্চ।
(২২) আমিষ—লোভনীয় দ্রব্য।
(২৩) তিনি—তিন।
(২৪) রাজন্য—ক্ষত্রিয়।

সে প্রভাব দীপ্তিমন্ত যেহ্নে মোর শিখা, (১)
বজ্রসার সেহি বীর্য্য, থিলা আজ মাত্র (২)
ক্ষত্রর যা প্রিয় ধর্ম্ম, সবু যিব চলি,
সবু যাই অভিমান রহিব কেবল,—
সরসে কর্দ্দম যথা রহে অবশেষে
কমল কুমুদ সঙ্গে জল গলে শুখি।
জীবন্ত-ভারত-দুর্গরূপী এই জাতি (৩)
বীর্য্য হীন অকর্ম্মণ্য হেবে অল্প দিনে,
অল্প দিনে দ্রোণাচার্য্য শিষ্য বংশধরে
আচরিবে যুদ্ধ বিধি কেবল গল্পে !
ধনু, গজাঙ্কুশ, অসি, গদা আস্ফালনে
কর্কশ যাঙ্কর হস্ত, তাঙ্কর সন্ততি
ভীরু, প্রাণরঙ্ক, আহা হোই কালবশ (৪)
হস্তী দেখি দশ শত, অশ্ব দেখি শত—
হস্ত দূরে যাই উভ হেবে মহাত্রাসে !
নিজ সন্ততিকি পুণি আচার্য্য অনাই
শ্লোকরূপে শিখাইবে এই ভীরুনীতি ! (৫)
এ মহা প্রতাপী জাতি হীনু হীনতর (৬
হোই যিবে দিনে দিনে কলি উৎপীড়নে।
পূর্ব্বতেজু অবশিষ্ট থিব যাহা কিছি, (৭)
ভিজাইব সেহি তেজে বুদ্ধ পরস্পরে (৮)
"ঈর্ষা"আসি, রত হোই সে বৃথা বিগ্রহে !
বহিরাক্রমণ ভয় প্রতিকার বিধি
ভালিবাকু ন থিবটি অবসর তিলে ; (৯)
উপরে উড্ডীয়মান যবন গরুড়ে
দেখি সুদ্ধা, যুঝুথিবে গজকূর্ম্মপরি, (১০)
ভাবি অন্ধ ; বর্ত্তমান সর্ব্বস্ব বর্ব্বরে।

(১) যেহ্নে—যেন। মোর—আমার অর্থাৎ বক্তা অগ্রর।
(২) থিলা—ছিল। আজ মাত্র—আজ পর্য্যন্ত।
(৩) জীবন্ত ভারতদুর্গরূপী—ক্ষত্রিয় জাতি।
(৪) প্রাণরঙ্ক—প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল।
(৫) চাণক্যশ্লোকে আছে হস্তী দেখিয়া সহস্র হস্ত ও অশ্ব দেখিয়া শত হস্ত সরিয়া যাইবে।
(৬) হীনু হীনতর—হীন হইতে হীনতর।
(৭) তেজু—তেজ হইতে। কিছি—কিছু।
(৮) ভিজাইব—গড়িবে।
(৯) ভালিবাকু—দেখিবার, চিন্তা করিবার।
(১০) দেখি সুদ্ধা—দেখিয়াও। যুঝুথিবে—যুদ্ধ করিবে। গজকূর্ম্মপরি—গজ কচ্ছপ মত।

সর্ব্বে আত্মচিন্তারত, সর্ব্বে জাতিদ্রোহী,
আত্মরক্ষা ব্রতী জন্মভূম অধঃপাতে !
ভারতর নানা অংশে ছন্তি আর্য্য যেতে, (১১)
ভিন্ন ভিন্ন নাম বহি, আর্য্যটি সরবে। (১২)
হোমানল, দাবানল, বাড়ব অনল,
এ আদি বিবিধ নামে প্রসিদ্ধ জগতে
যথা মুঁহি, কুরুবর্ষে, পাঞ্চালে, আউধ, (১৩)
কাশ্মীরে, নেপালে, পুণি কলিঙ্গ, দ্রাবিড়ে,
কর্ণাটে, কেরলে, পাণ্ড্যে মহারাষ্ট্রে, চোলে,
বিদর্ভে, নিষধে মৎসে, ত্রিগর্ত্তে, গুর্জ্জরে,
গান্ধারাদি করি 'সন্ধুযাতৃক প্রদেশে,
নিবসন্তি, কুরুবর্য্য, আর্য্যসুত যেতে,
আখ্যারে পৃথক মাত্র, রক্তে সর্ব্বে একা।
ঈর্য্যার কুহকে আহা পাসোরি এ কথা,
আর্য্য রক্তস্রোতে আর্য্যে প্লাবিবে অবনী
কলির আত্মহানীতি-ক্রীড়নক হোই।
ফণিনীর শিরোমণি কাঢ়ি নেবা পাই (১৪)
ন লোড়ে কে ? মাত্র তার বিষদন্ত বেণি (১৫)
কৃতান্তর দূত মণি, কন্তি পশিবাকু (১৬)
ভরসি পারে কি কেহি ? রাজন্য ব্রাহ্মণে (১৭)
ভূতলে অতুলরূপ রতনকুন্তলা—
ভারত তুঙ্গশীর এ থিলে সিনা বেণি (১৭)
বিষদন্ত, সর্ব্ব অগ্রে ভাঙ্গিব তা কলি।
নির্বিষ ভারতে দেখি, আসিবে দউড়ি
দূরু বৈদেশিকদল শিরোমণি লোভে
পলে পলে, শস্যক্ষেত্রে শলভ যেপরি। (১৮)
বিরাজে যাবত, বীর, মো তেজ অঙ্গারে
পারে কি পরশি কেহি ? হেলে তা নির্ব্বাণ
অবজ্ঞারে লোকে তাহা দলন্তি চরণে।

(১১) ছন্তি—আছেন। সংস্কৃত সন্তির রূপান্তর। যেতে—যত।
(১২) বহি—ধরিয়া। সরবে—সকলে. সর্ব্বে।
(১৩) কাঢ়ি নেবাপাই—কাড়িয়া লইবার জন্য।
(১৪) লোড়ে—চাহে। বেণি—যুগ্ম।
(১৫) মণি—ভাবিয়া।
(১৬) ভরসি পারে—সাহস করিতে পারে কি ?
(১৭ সিনা—সত্যই।
(১৮) পলে পলে—পালে পালে।

বিজাতির তেজঃপুঞ্জ নিভিলে সেরূপে (১)
এ আর্য্য সমাজ তথা দলি বৈদেশিকে
* * * *
নিয়োজিবে নিজ ভোগে ভারত অবনী।
শক্তিরে সিংহার যাহা, শক্তি গেলে চালি, (২)
পার্থ, সে সিংহার ছত্র অনর্থর হেতু, (৩)
অনর্থর হেতু তেণু (৪) হেব কলিযুগে
ভারতভূমির এহি অনুপম শোভা।"

বারান্তরে অন্যান্য অংশ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া আমাদের ভাবিবার বিষয় অনেক আছে, সন্দেহ নাই।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

(১) নিভিলে—নিভিলে।
(২) সিংহার—শোভা, সজ্জা।
(৩) হএ—হয়।
(৪) তেণু—সেইজন্য।

শম্ভুজীর পরিণাম।

মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশে এক অত্যাচারের যুগ আরম্ভ হয়। সে অত্যাচার কাহিনী যেমনই ভীষণ, তেমনি শোকাবহ। ইতিহাসের কঠোর পৃষ্ঠা হইতে মোগলের সে কলঙ্ক কখনও অপনীত হইবে না। আকবর শাহ যে মিলনের মোহন মন্ত্রে হিন্দু মুসলমানকে মুগ্ধ করিয়া ভারতবর্ষে মোগল রাজলক্ষ্মীর আবাস সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রপৌত্র সম্রাট ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধতার প্রভাবে ন্যায়ান্যায় জ্ঞান বিরহিত হইয়া সেই মিলন মন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি পবিত্র ইসলামের দোহাই দিয়া যে অত্যাচার-স্রোতে ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়াছিলেন, সে অত্যাচার বলে হিন্দুদিগের রুদ্ধনেত্র বহুদিন পরে উন্মিলিত হইয়া গেল। হিন্দুরা দেশের, জাতির ও ধর্ম্মের অপমান নিরীক্ষণ করিয়া বাহুবলের উপর নির্ভর করিলেন। দেখিতে দেখিতে দেশের মাটী ভেদ করিয়া জ্বলন্ত বহ্নিরূপ স্বদেশসেবিগণের আবির্ভাব হইতে লাগিল। অত্যাচারে একজন, দুইজন, দশজনকে দমন করিয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু একটি সমগ্র জাতিকে যে জাতির প্রাণে প্রাণে স্তরে স্তরে ধর্ম্মের স্রোত বহিতেছে, এমনতর কোন জাতিকে বহুদিন ধরিয়া নিষ্পেষিত করিয়া রাখিবার শক্তি আজও বিধাতা কাহাকেও দান করেন নাই। ঔরঙ্গজেব অদূরদর্শন বলে এই সত্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি অত্যাচার বলে হিন্দুদিগকে মুষ্টিবদ্ধ রাখিবার জন্য দৃঢ়কর হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে পঞ্জাবের গহন কানন ও পর্ব্বত কন্দর ধ্বনিত করিয়া শিখশক্তি "বাহ্ গুরুজীকী ফতে" শব্দে চতুর্দ্দিক্ স্তম্ভিত করিয়া দেয়; সুচিরযৌবনা রাজবারার মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে রাজপুতেরা ভীমরবে মোগল কুল লক্ষ্মীকে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল, সুপ্ত মহারাষ্ট্র শক্তি দস্যুতার 'বাঁধ' ভঙ্গ করিয়া শিবাজীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কন্দরে কন্দরে স্বাধীনতার ভেরী নিনাদিত করিলেন। চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগল-রাজ-লক্ষ্মী বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ঔরঙ্গজেবেরও সেই সঙ্গে সঙ্গে মোগল রাজবংশের পতনের যুগ আরম্ভ হইল। ঔরঙ্গজেব যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও তাহার দ্রুতগতি রুদ্ধ করিতে পারিলেন না।

মোগল দ্রোহী স্বদেশ প্রাণ ধর্ম্মবীর মহারাজ ছত্রপতি শিবাজী মারাঠার শুষ্ক প্রাণে স্বদেশ প্রেম-বহ্নি জাগাইয়া দিয়া, মোগল রাজ-লক্ষ্মীর বিজয়-স্তম্ভ চূর্ণ করিবার প্রধান উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রসন্ন মনে দেহত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 'পার্ব্বত্য মূষিক'

শিবাজীই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শত্রু। তাঁহার সর্ব্বনাশে মোগলের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে, এজন্য তিনি পুনঃ পুনঃ বল প্রয়োগ ও কৌশল জাল বিস্তার করিয়া শিবাজীর দম্ভনাশে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর কৌশলের নিকট ধর্ম্মান্ধ মোগলের সকল কৌশল নষ্ট হইয়াছিল। ছত্রপতি শিবাজীর দেহাবসানের পর তদীয় পুত্র শম্ভুজী মহারাষ্ট্র সম্প্রদায়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। যে কর্ম্মকারিতা মে কঠোর অধ্যবসার বলে সাধারণ জায়গীরদার-সন্তান শিবাজী 'ছত্রপতি শিবাজী' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন যে অদম্য উৎসাহ, দুর্ভেদ্য ও অজ্ঞেয় কৌশল এবং অলৌকিক বীরত্ব বলে তিনি মহারাষ্ট্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন, শম্ভুজী বীরত্ব ও সাহস ব্যতীত পিতার সেই সমস্ত গুণগ্রামের কোনটিরই অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু তথাপি শিবাজী নিজ চরিত্র বলে মহারাষ্ট্র সম্প্রদায়ে যে উদ্দীপনার প্রেরণা করিয়া যান, শম্ভুজীর শাসন কালের প্রথমভাগে তাহা পূর্ণ-মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মোগল বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার সে তেজের নিকট মোগল বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। মারাঠারা বিভিন্ন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে নানা স্থানে মোগলকে পরাজিত করিয়া বিজয়মাল্যে মহারাষ্ট্র কুললক্ষ্মীর পদদ্বয় সুশোভিত করিতে লাগিল মোগল একদিকে প্রবল মহারাষ্ট্র শক্তি, অপরদিকে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার নবাবদিগকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া একান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। এক যোগে ত্রি-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা আর মোগলের রহিল না। তখন সম্রাট কৌশলের আশ্রয় লইলেন। একে একে ত্রিশক্তির বিষদন্ত ভঙ্গ করিবার জন্য তিনি উদ্গ্রীব হইয়া উঠিলেন।

এই ক্রুদ্ধ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সম্রাট আপনাকেই মোগল-বাহিনীর সৈনাপত্যে বৃত করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি নানা কৌশলের পর গোলকুণ্ডার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহারই সাহায্যে বিজাপুরের প্রবল রাজ্য চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে, তার পর সামান্য ত্রুটিতে সন্ধিভঙ্গের অছিলায় সম্রাট গোলকুণ্ডার শক্তি নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধকর হইলেন। গোলকুণ্ডার কপট বন্ধুর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বৃথা। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডায় স্বাধীনতা-সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইল। দেখিতে দেখিতে কয়েক বর্ষ মধ্যে দুই প্রবল-শক্তি নষ্ট হইয়া গেল। এইবার ঔরঙ্গজেব মারাঠা শক্তি দমনের জন্য তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিলেন। সে শক্তির গতি প্রতিরোধ করা মারাঠার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। শম্ভুজী অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত মোগলের সে সকল দুর্গ জয় করিয়াছিলেন, এখন একে একে সে সকলই তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। মারাঠারা অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও সে সমুদয় রক্ষা করিতে পারিল না। ক্রমেই তাহাদের সকল শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। শম্ভুজী তখন উপায়ন্তর না দেখিয়া প্যানেলা দুর্গেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঔরঙ্গজেব অদম্য উৎসাহের সহিত সেই দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু সে সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গের কিছুই করিতে না পারায় তাঁহার জয়েচ্ছা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বলবীর্য্য হতগর্ব্ব হইয়া পড়ায় ঔরঙ্গজেব কৌশলের আশ্রয় লইলেন। কৌশলে প্যানেলার অধিকার সাধন ও শম্ভুজীকে ধৃত করাই তখন তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল। অচিরেই তাঁহার সে ব্রত উদ্‌যাপিত হইল। শম্ভুজীর চরিত্রহীনতাই তাহার কারণ।

শম্ভুজী আবাল্য আলস্যপরায়ণ ও কুক্রিয়াসক্ত। বিলাসিতাই তাঁহার জীবনের চির সহায় হইয়া উটিয়াছিল। তিনি সংযমী পিতার অসংযম সন্তান। তাই তাঁহার সিংহাসনারোহণের সময় মারাঠাদের দুই দলের উৎপত্তি হয়। একদল তাঁহারই পক্ষপাতী হইয়া উঠে। অপর পক্ষ

শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামকে নেতৃত্বে বরণের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর কৌশলে রাজারাম কারারুদ্ধ হন ও দ্বিতীয় দল হতগর্ব্ব হইয়া পড়ে। তখন শম্ভুজী নিরুদ্বেগ সিংহাসনারোহণ করেন। রাজ্য প্রাপ্তির পর তাঁহার চরিত্র কিছু সংশোধিত হইয়াছিল! রাজ্যের গুরু চিন্তাতেই তাঁহার সমস্ত অবসর নষ্ট হইত। পাপ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দানের আর সুযোগ হইয়া উঠিত না। তার পর স্বীয় প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখাই তখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মারাঠার সর্ব্ববাদী সম্মত নেতা নহেন। তাঁহার অসংযম দৃষ্টে মারাঠারা উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে, তিনি রাজ্যচ্যুত হইতে পারেন। এজন্য তিনি মারহাঠার হৃদয় জয় করিবার জন্য কয়েক বর্ষ অদম্য উৎসাহের সহিত তাহাদের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করেন। এই সময় মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়া দুর্গের পর দুর্গ জয় করেন। এই সময় পর্টুগিজদের দৌরাত্ম্য যথেষ্ট প্রবল হইয়া উঠে। তিনি তাহাদিগকেও দমন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু এরূপ চেষ্টায় তাঁহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এই সময় তিনি আপনাকে শিবাজীর যোগ্য পুত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই সব কারণে তাঁহার প্রতি লোকের যে অশ্রদ্ধা ছিল, তাহা দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল।

কিন্তু পাপ একবার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা সহজে উন্মূলিত হইতে চাহে না। কয়েকবার উপর্য্যুপরি মোগল জয়ে উদ্রিক্ত হইয়া শম্ভুজী অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তার পর মোগলেরা যখন মধ্যে কিছু কালের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ-গতি কিছু শিথিল করিয়া দেয়, তখন তাঁহার গর্ব্ব আরও অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। তিনি অত্যন্ত অসাবধান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চির-প্রিয় আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার চরিত্রে যে পাপের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এখন সেগুলি আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি তোষামোদকারী দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া নিজ মনুষ্যত্ব হারাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার এরূপ অধঃপতন হইল যে, তিনি কেবল নর্ত্তকীর নৃত্যগীতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেন না, তাঁহার হৃদয় বৃত্তি আরও নিম্নগামী হইল। যখনই কোন রূপসম্পন্না মধ্যমার কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইত, তখনই তাঁহার হৃদয়ে পাপ বাসনা জাগিয়া উঠিত; তিনি সেই মধ্যমাকে স্বীয় অঙ্কগতা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। লোকনিন্দা, আত্মীয়-স্বজনের বিরাগ কিছুতেই তিনি বিচলিত হইতেন না। মন্ত্রীদের সকল অনুরোধ উপরোধ তিনি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেন। কবলিস খাঁ * নামে এক ব্যক্তি তাঁহার এই পাপাচরণের সহায় হইয়াছিল। এই নীচমনা ব্যক্তি তাঁহাকে মধ্যমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া তাঁহার পাপকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দান করিত। এইরূপে সে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। কবলিস কোন কালেই সাহসী ছিল না। বীরত্বের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। রাজনীতির কূটতত্ত্ব তাহার মস্তিষ্কে কখন স্থান পাইত না। সৈনিকবৃত্তি তাহার সহজ বৃত্তি ছিল না। পাপেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া সে পাপের সহচর হইয়াছিল। সে পাপকেই ভাল চিনিত, ভালবাসিত। ধর্ম্মের সহিত-মনুষ্যত্বের সহিত তাহার কোন কালেই পরিচয় ছিল না। তথাপি শম্ভুজী তাহাকে মন্ত্রীপদে বৃত করিয়া একদল সৈন্যের নায়কত্বে নিযুক্ত করিলেন। কবলিসই যেন মারাঠা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিল! ফল যাহা হইবার, তাহা হইল। মারহাঠারা দিন দিন হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও শম্ভুজীর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না।

* এই হীন-মনা ব্যক্তির প্রকৃত নাম কি, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের কিছু গোলযোগ দেখা যায়। কেহ কেহ তাহাকে কবলিস খাঁ কেহ বা কুলষা অভিধানে তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন।

চারচক্ষু ঔরঙ্গজেব শম্ভুজীর প্রকৃতির সকল তত্ত্বই অবগত ছিলেন। কবলিস খাঁ যে তাঁহার প্রিয় সহচর ইহাও সম্রাটের অজ্ঞাত রহিল না। সম্রাট গুপ্ত কার্য্য সাধনে বড়ই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার গুপ্ত মন্ত্রণা বলে দেশের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তি অকালে দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তিনি স্বীয় প্রকৃতির পরিচয় দানে বিরত হইলেন না। বারম্বার চেষ্টা করিয়াও শম্ভুজীকে নিহত করিতে না পারায় তাঁহার হৃদয়ে যে জিঘাংসা-বহ্নি প্রধূমিত হইতে ছিল, আজ তাহাতে শেষ ইন্ধন প্রদানের জন্য তিনি বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি নানা সুখ-প্রলোভনে দুর্ব্বল-প্রকৃতি পাপমতি কবলিস খাঁকে হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। কবলিস সম্রাটের কূটবুদ্ধির নিকট পরাজিত হইয়া স্বীয় প্রভুর অনিষ্টসাধনে কৃতসংকল্প হইল। সে ঔরঙ্গজেবের ক্রীড়নক হইয়া উঠিল। শম্ভু বন্ধুর এরূপ প্রকৃতি পরিবর্ত্তনে কিছুই লক্ষ্য করিলেন না। তিনি পূর্ব্ববৎ আত্মসুখে মগ্ন রহিলেন।

সন্ন্যাসী সংযতাত্মা মহারাজ শিবাজীর পুত্রের এতটা অবনতি বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু অবিশ্বাস করিতেও সাহস জন্মে না। একদিন সায়ংকালে শম্ভুজী বিলাস ভবনে আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিলেন, এমন সময় কবলিস খাঁ তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে জানাইল যে, কোন সুন্দরী যুবতী মহাসমারোহে শ্বশুরালয়ে যাইতেছে; তাহার রূপের তুলনা নাই, সে নিজে সেই যুবতীকে দেখিয়া আসিয়াছে। সে পাপ কথা শুনিতে শুনিতে শম্ভুজীর আত্মমর্য্যাদা একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। তিনি তখনই কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে হিন্দুকুল-ললনা হরণ করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। প্রভুর আদেশমত কবলিসও স্বীয় সৈন্যদের লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল, কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহা হইতে যথেষ্ট দূরে অবস্থান করিতে লাগিল।

এ রমণীর বার্ত্তা বোধ হয় সম্পূর্ণ অমূলক। ইহা কাপুরুষের—বিশ্বাসঘাতকের চাতুরি। শীঘ্রই সে চাতুরী প্রকাশিত হইয়া পড়িল। হঠাৎ একদল মোগল সৈন্য কোথা হইতে অতর্কিত ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া শম্ভুজীকে আক্রমন করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে মোহনিদ্রা টুটিয়া গেল। হঠাৎ চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া পড়ায় তাঁহার হৃদয় আবার মারাঠা-সুলভ শৌর্য্যের প্রভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, এইবার শত্রুর হস্তে মৃত্যু অনিবার্য্য। তবু বীর টলিল না। অনুচরবর্গের সহিত তিনিও বিশেষ শৌর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে বীরত্ব দর্শনে মোগলেরা ক্ষণতরে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা আবার দ্বিগুণ সাহসে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ফলে শীঘ্রই তিনি হত বীর্য্য হইয়া মোগল হস্তে বন্দীকৃত হইলেন। কবলিস খাঁও সামান্য যুদ্ধের অভিনয় করিয়া অচিরেই আত্ম সমর্পণ করিল।*

এই সময় ঔরঙ্গজেব বিজাপুরের সন্নিহিত এক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। অচিরেই সানুচর শম্ভুজী বন্দী অবস্থায় তৎ সমক্ষে নীত হইলেন। তাঁহার এই দীনাবস্থা দেখিয়া সম্রাটের নয়ন আনন্দে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু মারাঠাপতিও এই সময় যে বীরত্ব দেখান, তাহা ইতিহাসে অতুলনীয় না হইলেও বিরল বটে। তাঁহার সেই গম্ভীর অবিচলিত ভাব দেখিয়া মোগল সভাসদবর্গ আশ্চর্য্য হইয়া গেল! এই সময় বন্দী কবলিস খাঁ সসম্মানে স্বীয় মুক্তি ও পুরস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করিল। তাহার সেই প্রস্তাবে সম্রাটের কোনরূপ ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি অবিচলিত কঠোর কণ্ঠে তাহাকে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা

* শম্ভুজী কোন স্থানে ধৃত হন তৎ সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। অস্মি বলেন, বোধহয় প্যানেলাতে বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানে তিনি ধৃত হন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন ও টেলর বলেন, সঙ্গমেশ্বর নগরে তিনি ধৃত হন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলেন, কবলিস বা কুলষা বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই। সে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু বিধির বৈগুণ্যে পরাজিত হইয়া বন্দীকৃত হয়। এ কথা কত দূর সত্য, তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ।

ও পাপাচরণের জন্য তিরস্কার করিলেন, বলিলেন যে ব্যক্তি স্বীয় অসদুদ্দেশ্য সংশাধনের জন্য স্বীয় প্রভুর চরিত্রের অনিষ্ট করিতে পারে, একটি জাতির সর্ব্বনাশ করিতে পারে মৃত্যুই তাহার একমাত্র যোগ্য পুরস্কার। এই অভিনব পুরস্কারে কবলিস স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তখনই তাহাকে তথা হইতে বধাভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল।

বীরপুত্র বীর-হৃদয় শম্ভুজীকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য সম্রাট যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেন। মুক্তি, ধন, রত্ন, সুন্দরী ললনা, উচ্চপদ সকল প্রলোভনই" বৃথা হইল। মৃত্যুকালে বীরের হৃদয়ে স্বাভাবিক তেজ ফিরিয়া আসিল। তিনি অকম্পিত কণ্ঠে হিন্দুধর্ম্মের গুণগান ও মুসলমান ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া সম্রাটকে কটুক্তি করিলেন তাহাতে সম্রাটের ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখনই তাঁহার কঠোর আদেশে শম্ভুজীর শরীর হইতে রাজ্যাভরণ অপহৃত হইল। সামান্য ফকিরের বেশে তাঁহাকে সুসজ্জিত করিয়া দেওয়া হইল। পরে একটি উষ্ট্রের পশ্চাদ্দিকে মুখ করাইয়া তাঁহাকে তদোপরি বসাইয়া দেওয়া হইল। এইরূপে রাজদেহের অবমাননা করিতে করিতে তাঁহাকে শিবিরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করান হইল। এই সময় রাজপুত সৈন্যদের প্রতি সম্রাট আদেশ করেন যে, তাঁহারা নির্ব্বিচারে শম্ভুজীকে নিহত করুক। কিন্তু কোন রাজপুতই সেই আদেশ পালনে সম্মত হইল না। তখন সম্রাটের আদেশ ক্রমে মোগলেরা তাঁহার 'ইস্‌লাম নিন্দুক' জিহ্বা কাটিয়া ফেলিল। তথাপি বীর নীরবে সে অত্যাচার সহ্য করিলেন। তাঁহার মুখে সামান্য মাত্রও কাতরভাব পরিদৃষ্ট হইল না। তখন আবার সম্রাট তাঁহাকে মুক্তির আশ্বাস দিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, 'এখনও মুসলমান হইলে তাহার প্রাণ নষ্ট করা হইবে না।' বীর ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন একখণ্ড কাগজে তিনি লিখিয়া দিলেন—'যদি তোমার প্রিয়তমা কন্যার সহিতও বিবাহ দাও, তথাপি ধর্ম্মত্যাগ করিব না।'

এরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর পাঠে সম্রাটের হৃদয় 'পাষাণাদপি' কঠোর হইয়া উঠিল। তখনই তাঁহারই আদেশে তাঁহারই সমক্ষে মারাঠা বীরের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত হইল; শরীরের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গ ছেদিত হইল; অবশেষে হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলা হইল। সেই সব ছিন্ন অঙ্গগুলি তখনই মাংসাশি সারমেয়কুলের আহারার্থ প্রদত্ত হইল। বীর হাসিতে হাসিতে দেহত্যাগ করিলেন।

আজন্ম পাপের সেবায় যে কলঙ্ক অর্জ্জিত হইয়াছিল, আজিকার এই ভীষণ প্রায়শ্চিত্তে শম্ভুজীর সে সকল কলঙ্ক বিধৌত হইয়া গেল। তিনি সেই প্রায়শ্চিত্ত বলে প্রজার হৃদয়ের লুপ্ত সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সকল পাপ, সকল দুর্ব্বলতা লোকে ভুলিয়া গেল। তাঁহার সে অপরূপ আত্মদানে মারাঠা সমাজ নবজীবন প্রাপ্ত হইল। তাহারা আবার নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। ঘরে ঘরে শম্ভুজীর বিজয় গাথা গীত হইতে লাগিল।

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত।

হত্যার চেষ্টা।

প্রিয় স্বদেশবাসিগণ! কয়েকমাস হইতে আলিপুরের মোকদ্দামার সংশ্রবে শুনিয়া আসিতেছি, সার এণ্ড্রু ফ্রেজার ও আর দুই একজন রাজপুরুষকে হত্যা করিবার জন্য কতিপয় লোক চেষ্টা করিয়াছে। এই সংবাদ সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না। কিন্তু ইহা শুনিয়া আমাদের প্রাণ গুরুতর চিন্তা ভারে আক্রান্ত হইয়াছে। গত শনিবার পুনরায় যখন শুনিলাম, একটী বালক শত লোকের সম্মুখে প্রকাশ্য সভায় সার এণ্ড ফ্রেজারকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন সেই চিন্তা গুরুতর হইয়াছে। যখন শুনিলাম, বালকটীর বয়স ১৭ বৎসর, সে জেনারেল এসেম্বিলী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, অতি ধীর ও সচ্চরিত্র, ভদ্রবংশজাত, পাঠাভ্যাসে মনোযোগী, তখন চিন্তাভার আরও গুরুতর হইল। বাঙ্গলা দেশের এমন সোণার চাঁদ ছেলের কেন নরহত্যা করিতে প্রবৃত্তি হইল? যাহার দ্বারা দেশের গৌরব হইত, সে কেন সারা জীবন কারাগারের নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে প্রস্তুত হইল?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যাহারা নরহত্যা করিয়া দেশের কল্যাণ কামনা করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ। তবু বাঙ্গলা দেশের একজন যুবকের প্রাণেও নরহত্যার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল কেন, এই চিন্তা প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিতেছে।

জানি, ইহাদের উত্তেজনার কারণ আছে। সেই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, বরিশাল, জামালপুর, কুমিল্লার ভীষণ কাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতার পুলিসের দাঙ্গা, পুলিস কর্ত্তৃক কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকদের অন্তঃপুর অনুসন্ধান, স্বদেশ প্রেমিক লোকদের কারাবরোধ, মুখ ফুটিয়া মনের দুঃখ প্রকাশের উপায় বন্ধ, গুরুতর বিচার বিভ্রাট, নানাপ্রকার কঠোর নিয়ম প্রচলন, দেশবাসীর আবেদনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, মেদিনীপুরের সম্ভ্রান্ত লোকদের অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার কাহিনী লোকের প্রাণ অতীব চঞ্চল করিয়াছে।

বিশেষতঃ যে সকল বালক ও যুবক সহৃদয় ও চিন্তাশীল, তাহারা চক্ষের সম্মুখে এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখিয়া চারিদিকে কেবল নিরাশার মূর্ত্তি দেখিতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হত্যাই সকল যন্ত্রণা উপশমের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছে এবং আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

আমাদের এই সঙ্কল্প ছিল যে, যুবকদের চিন্তাস্রোত সুপথে পরিচালিত করিব, কিন্তু সে পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। অপরাহ্নে প্রকাশ্য স্থানে সভা করিবার উপায় বন্ধ করাতে আমাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। বহুদিন হইতে আর বৃহতী সভা হইতেছে না। যখন যুবকগণকে সুপথে পরিচালিত করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল, সেই সময় রাজপুরুষগণ আমাদের সঙ্কল্প সাধনে বাধা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং যুবকগণ গৃহে বসিয়া কেবল স্বদেশবাসীর লাঞ্ছনার কথা চিন্তা করিতেছে, এবং যে যাহা ভাল মনে করিতেছে, তাহাই করিতেছে।

পথে অপরিসীম বিঘ্ন, তবু আমাদের কর্ত্তব্য আছে। এদেশ আমাদের, ইহার কল্যাণ অকল্যাণে যেমন আমাদের পায়, আর কাহারও তেমন পায় না। যুবকগণ আমাদেরই সন্তান, তাহারা সৎকর্ম্মশীল হইলে আমাদের প্রাণ উৎফুল্ল হয়, তাহারা অন্যায় কার্য্য করিলে আমরা চক্ষের জলে ভাসিতে থাকি। কিন্তু চক্ষের জলে কেবল ভাসিলে হইবে না, আমাদের প্রিয় যুবকদিগকে চিরদিন ধর্ম্মপথে রাখিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

সন্তানসম যুবকগণ! শোন, নরহত্যার দ্বারা কোন দেশের কল্যাণ হয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাস পাঠ কর, যাহারা নরহত্যা করিয়া

ও পাপাচরণের জন্য তিরস্কার করিলেন, বলিলেন যে ব্যক্তি স্বীয় অসদুদ্দেশ্য সংশাধনের জন্য স্বীয় প্রভুর চরিত্রের অনিষ্ট করিতে পারে, একটি জাতির সর্ব্বনাশ করিতে পারে মৃত্যুই তাহার একমাত্র যোগ্য পুরস্কার। এই অভিনব পুরস্কারে কবলিস স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তখনই তাহাকে তথা হইতে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল।

বীরপুত্র বীর-হৃদয় শম্ভুজীকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য সম্রাট যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেন। মুক্তি, ধন, রত্ন, সুন্দরী ললনা, উচ্চপদ সকল প্রলোভনই বৃথা হইল। মৃত্যুকালে বীরের হৃদয়ে স্বাভাবিক তেজ ফিরিয়া আসিল। তিনি অকম্পিত কণ্ঠে হিন্দুধর্ম্মের গুণগান ও মুসলমান ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া সম্রাটকে কটূক্তি করিলেন তাহাতে সম্রাটের ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখনই তাঁহার কঠোর আদেশে শম্ভুজীর শরীর হইতে রাজ্যাভরণ অপহৃত হইল। সামান্য ফকিরের বেশে তাঁহাকে সুসজ্জিত করিয়া দেওয়া হইল। পরে একটি উষ্ট্রের শৃঙ্গাদ্দিকে মুখ করাইয়া তাঁহাকে তদোপরি বসাইয়া দেওয়া হইল। এইরূপে রাজদেহের অবমাননা করিতে করিতে তাঁহাকে শিবিরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করান হইল। এই সময় রাজপুত সৈন্যদের প্রতি সম্রাট আদেশ করেন যে, তাঁহারা নির্ব্বিচারে শম্ভুজীকে নিহত করুক। কিন্তু কোন রাজপুতই সেই আদেশ পালনে সম্মত হইল না। তখন সম্রাটের আদেশ ক্রমে মোগলেরা তাঁহার 'ইস্‌লাম নিন্দুক' জিহ্বা কাটিয়া ফেলিল। তথাপি বীর নীরবে সে অত্যাচার সহ্য করিলেন। তাঁহার মুখে সামান্য মাত্রও কাতরভাব পরিদৃষ্ট হইল না। তখন আবার সম্রাট তাঁহাকে মুক্তির আশ্বাস দিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, 'এখনও মুসলমান হইলে তাহার প্রাণ নষ্ট করা হইবে না।' বীর ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন একখণ্ড কাগজে তিনি লিখিয়া দিলেন—'যদি তোমার প্রিয়তমা কন্যার সহিতও বিবাহ দাও, তথাপি ধর্ম্মত্যাগ করিব না।'

এরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর পাঠে সম্রাটের হৃদয় 'পাষাণাদপি' কঠোর হইয়া উঠিল। তখনই তাঁহারই আদেশে তাঁহারই সমক্ষে মারাঠা বীরের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত হইল; শরীরের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গ ছেদিত হইল; অবশেষে হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলা হইল। সেই সব ছিন্ন অঙ্গগুলি তখনই মাংসাশি সারমেয়কুলের আহারার্থ প্রদত্ত হইল। বীর হাসিতে হাসিতে দেহত্যাগ করিলেন।

আজন্ম পাপের সেবায় যে কলঙ্ক অর্জ্জিত হইয়াছিল, আজিকার এই ভীষণ প্রায়শ্চিত্তে শম্ভুজীর সে সকল কলঙ্ক বিধৌত হইয়া গেল। তিনি সেই প্রায়শ্চিত্ত বলে প্রজার হৃদয়ের লুপ্ত সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সকল পাপ, সকল দুর্ব্বলতা লোকে ভুলিয়া গেল। তাঁহার সে অপরূপ আত্মদানে মারাঠা সমাজ নবজীবন প্রাপ্ত হইল। তাহারা আবার নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। ঘরে ঘরে শম্ভুজীর বিজয় গাথা গীত হইতে লাগিল।

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত।

হত্যার চেষ্টা।

প্রিয় স্বদেশবাসিগণ! কয়েকমাস হইতে আলিপুরের মোকদ্দামার সংশ্রবে শুনিয়া আসিতেছি, সার এণ্ড্রু ফ্রেজার ও আর দুই একজন রাজপুরুষকে হত্যা করিবার জন্য কতিপয় লোক চেষ্টা করিয়াছে। এই সংবাদ সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না। কিন্তু ইহা শুনিয়া আমাদের প্রাণ গুরুতর চিন্তা ভারে আক্রান্ত হইয়াছে। গত শনিবার পুনরায় যখন শুনিলাম, একটী বালক শত লোকের সম্মুখে প্রকাশ্য সভায় সার এণ্ড্রু ফ্রেজারকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন সেই চিন্তা গুরুতর হইয়াছে। যখন শুনিলাম, বালকটীর বয়স ১৭ বৎসর, সে জেনারেল এসেম্বিলী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, অতি ধীর ও সচ্চরিত্র, ভদ্রবংশজাত, পাঠাভ্যাসে মনোযোগী, তখন চিন্তাভার আরও গুরুতর হইল। বাঙ্গলা দেশের এমন সোণার চাঁদ ছেলের কেন নরহত্যা করিতে প্রবৃত্তি হইল? যাহার দ্বারা দেশের গৌরব হইত, সে কেন সারা জীবন কারাগারের নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে প্রস্তুত হইল?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যাহারা নরহত্যা করিয়া দেশের কল্যাণ কামনা করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ। তবু বাঙ্গলা দেশের একজন যুবকের প্রাণেও নরহত্যার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল কেন, এই চিন্তা প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিতেছে।

জানি, ইহাদের উত্তেজনার কারণ আছে। সেই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, বরিশাল, জামালপুর, কুমিল্লার ভীষণ কাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতার পুলিসের দাঙ্গা, পুলিস কর্ত্তৃক কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকদের অন্তঃপুর অনুসন্ধান, স্বদেশ প্রেমিক লোকদের কারাবরোধ, মুখ ফুটিয়া মনের দুঃখ প্রকাশের উপায় বন্ধ, গুরুতর বিচার বিভ্রাট, নানাপ্রকার কঠোর নিয়ম প্রচলন, দেশবাসীর আবেদনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, মেদিনীপুরের সম্ভ্রান্ত লোকদের অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার কাহিনী লোকের প্রাণ অতীব চঞ্চল করিয়াছে।

বিশেষতঃ যে সকল বালক ও যুবক সহৃদয় ও চিন্তাশীল, তাহারা চক্ষের সম্মুখে এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখিয়া চারিদিকে কেবল নিরাশার মূর্ত্তি দেখিতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হত্যাই সকল যন্ত্রণা উপশমের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছে এবং আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

আমাদের এই সঙ্কল্প ছিল যে, যুবকদের চিন্তাস্রোত সুপথে পরিচালিত করিব, কিন্তু সে পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। অপরাহ্নে প্রকাশ্য স্থানে সভা করিবার উপায় বন্ধ করাতে আমাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। বহুদিন হইতে আর বৃহতী সভা হইতেছে না। যখন যুবকগণকে সুপথে পরিচালিত করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল, সেই সময় রাজপুরুষগণ আমাদের সঙ্কল্প সাধনে বাধা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং যুবকগণ গৃহে বসিয়া কেবল স্বদেশবাসীর লাঞ্ছনার কথা চিন্তা করিতেছে, এবং যে যাহা ভাল মনে করিতেছে, তাহাই করিতেছে।

পথে অপরিসীম বিঘ্ন, তবু আমাদের কর্ত্তব্য আছে। এদেশ আমাদের, ইহার কল্যাণ অকল্যাণে যেমন আমাদের পায়, আর কাহারও তেমন পায় না। যুবকগণ আমাদেরই সন্তান, তাহারা সৎকর্ম্মশীল হইলে আমাদের প্রাণ উৎফুল্ল হয়, তাহারা অন্যায় কার্য্য করিলে আমরা চক্ষের জলে ভাসিতে থাকি। কিন্তু চক্ষের জলে কেবল ভাসিলে হইবে না, আমাদের প্রিয় যুবকদিগকে চিরদিন ধর্ম্মপথে রাখিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

সন্তানসম যুবকগণ! শোন, নরহত্যার দ্বারা কোন দেশের কল্যাণ হয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাস পাঠ কর, যাহারা নরহত্যা করিয়া

বড় হইতে চেষ্টা করিয়াছে—নরহত্যা স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহারা নিজে ছোট হইয়াছে, স্বদেশের বন্ধন আরও গুরুতর হইয়াছে। প্রাচীনকালে যতুগৃহে পাণ্ডবদিগকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া কৌরবেরা রাজ্য নিষ্কণ্টক করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু জান, সেই মহাপাপে কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে—কেবল কুরুকুল কেন, কুরুক্ষেত্র সমরে ভারতের অধীনতার শৃঙ্খল নির্ম্মিত হইয়াছে—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজও ফুরাইল না!

নরহত্যার পাপে পাঠান ও মোগল রাজকুল ধ্বংস হইয়াছে। নরহত্যা করিয়া যাহারা রাজ্য লাভের আশা করে, চিরদিনই দেখিতেছি, তাহাদের সে আশা নিষ্ফল হইয়াছে।

মানব জাতির ইতিহাসের মধ্য দিয়া ভগবান চিরদিন আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডপতি, তিনি লোকপালক। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কার্য্য করে, সে নিষ্পেষিত হয়। অধর্ম্ম দ্বারা তাঁহার রাজ্যে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা হয় না। ইহাই সনাতন সত্য।

রাজা অত্যাচার বা নরহত্যা দ্বারা কুশল সংস্থাপন করিতে পারেন না। প্রজাও অত্যাচার বা নরহত্যার দ্বারা কুশল স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না।

মোগল সম্রাট শিখ গুরু তেগ্ বাহাদুরকে হত্যা করিয়া নিজরাজ্য নিরাপদ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। সে নিদারুণ হত্যার ফলে শিখজাতি আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল—মোগল সাম্রাজ্য ধসিয়া পড়িয়াছিল। মোগলদের অত্যাচারে যখন শিখগণ দলে দলে হত হইতে ছিল, তখন শিখগণ শত্রুহত্যা দ্বারা আপনাদিগকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করে নাই। শিখগুরু তাহাদিগকে জ্ঞানী, সংযমী, আত্মত্যাগী, ধর্ম্মপরায়ণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টার ফলে মহাপরাক্রমশালী শিখ জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। আবার দেখ, যখন তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইল, শিখ প্রবৃত্তির দাস হইয়া নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইল, তখনই আবার তাহাদের পতন হইল।

খৃষ্টানদের অভ্যুদয়ের কথা স্মরণ কর। রোম রাজ্যে তাহাদের উপর কি অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল। এমন অত্যাচার কোন দেশে কোন কালে কাহার উপর হয় নাই। তাহাদের গাত্র আল্‌কাতরা ও তুলা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইত। তাহাদিগকে উদ্যানের চারিদিকে স্তম্ভের সহিত বাঁধিয়া রাখা হইত। মশালের ন্যায় তাহারা জ্বলিয়া চারিদিক আলোকিত করিত। সে আলোকে রোমাণগণ আনন্দে ক্রীড়া কৌতুকে নিমগ্ন হইত।

যে খৃষ্টানদের উপর এমন অত্যাচার হইয়াছিল, তাহারা ক্রমে রাজ্যেশ্বর হইল কিরূপে? তাহারা জলন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিল, তাহারা জানিত, ঈশ্বরের রাজ্যে অন্যায় অসৎ কখনও জয় লাভ করিবে না। সুতরাং কিছুতেই অধীর হইত না। বরং আপনাদিগকে সুমাতা, সুপিতা, সুভ্রাতা করিবার জন্য প্রাণপণ সাধনা করিত। আপনাদিগকে ন্যায়পরায়ণ গৃহস্থ, কর্ত্তব্যপরায়ণ নাগরিক করিবার জন্য সাধনা করিত। ইহার ফল স্বরূপ পাপময় রোমরাজ্যে এক নির্ম্মল চরিত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। ইহার ফল স্বরূপ স্বার্থ মোহান্ধ রোমরাজ্যে নিস্বার্থ সর্ব্বত্যাগী একপ্রাণতায় সঞ্জীবিত খ্রীষ্টান সমাজের অভ্যুদয় হইল। ধন, জন ও বিলাসপূর্ণ রোমরাজ্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের করতলগত হইল।

তবে বিধাতার ইঙ্গিত দেখ, ভাল করিয়া বোঝ, আপনাদিগকে বিশ্বাসী, পবিত্র, ত্যাগী, সংযমী ও কর্ম্মশীল পুরুষ করিবার জন্য মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হও। যখন তোমরা মানুষ হইবে, তখন বিধাতার আশীর্ব্বাদ তোমাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকিবে না।

জুলিয়াস সিজারকে বধ করিয়া কয়েকজন রোমাণ আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াস করিয়াছিল। তখন রোম রাজ্যের প্রায় সকল লোক স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়াছিল। তাহারা দুইটা টাকার জন্য আপনাদের গলায় দাসত্বের ফাঁসী পরিতে কুণ্ঠিত হইত না। দেশের জনসাধারণের যখন এইরূপ দশা, তখন স্বাধীনতা হরণ প্রয়াসী জুলিয়াস সিজারকে বধ করা হইল। বধ করা সহজ কথা, কিন্তু দেশের কল্যাণ সাধন করা দুরূহ ব্যাপার। জুলিয়াস হত হইলেন, কিন্তু পতিত প্রজাকুল স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিল না। অন্তর্দ্দোহে তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইল, রোমরাজ্যের উপর নির্ম্মম দুর্দ্দান্ত সম্রাটগণ এক ক্ষুদ্র অধিকার স্থাপন করিলেন। রোমের পতনের সূত্রপাত হইল।

পৃথিবীর ইতিহাস বিধাতার ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। স্বদেশবাসীকে আমরা তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি এবং সেই ইঙ্গিত অনুসারে কার্য্য করিতে বলি।

সকলে সৎ হও, অপরকে সৎ করিবার জন্য চেষ্টা কর। সকলে কর্ম্মশীল হও, অপরকে কর্ম্মশীল করিবার জন্য চেষ্টা কর। বালক বৃদ্ধ সকলে এই কার্য্যে ব্রতী হও, দেশের কল্যাণ হইবে।

সার এণ্ড্রু ফ্রেজার বৃদ্ধ হইয়াছেন, কয়েক দিন পরে এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন। বিচারাধীন মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু যদি এ কথা সত্য হয় যে, জিতেন্দ্রনাথ রায় তাহাকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তবে আমাদের দুঃখের সীমা থাকিবে না। বঙ্গের একজন সুশীল সন্তান এমন কার্য্য করিতে গিয়া আমাদের পাপ বৃদ্ধি করিয়াছে—ইহা চিন্তা করিয়া প্রাণ ভারাক্রান্ত হইয়াছে। আর নয়, সংযত হও। যাহাদের প্রাণে প্রতিহিংসা প্রবল হইয়াছে, তাহারা সংযত হও। বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বদেশকে ডুবাইও না। জন্মভূমিকে অনেকেই ভাল বাসিতে শিখিয়াছে, তাহা জানি। প্রিয় জন্মভূমির কল্যাণ যদি করিতে চাও, তবে পাপ বাসনা পরিত্যাগ কর, এই অভিশপ্ত-দেশে বিধাতার অভিশাপ আর পুঞ্জীকৃত করিও না।

গুর্জ্জর ভূমি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাহাদুর সাহ মুজাফর শাহের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া পিতৃরাজ্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যেদিন সুলতান মুজাফ্‌ফর শাহের মৃত্যু হইল, সেই দিনই সুলতান সেকেন্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যেই মন্ত্রী ইমাদউল মুল্ক কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হন। মন্ত্রী ইমাদউলমুল্ক সুলতান মুজাফ্‌ফরের ৫ বৎসর বয়স্ক এক পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য পরিচালন করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বাহাদুর সাহ জোনপুর হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গুজরাটে মুকরেজ নামক স্থলে আমীর ওমরাহ গনের সহিত মিলিত হইয়া আমেদাবাদ নগরে প্রবেশ করিলেন এবং মন্ত্রী ইমাদউলমুল্ককে ফাঁসিকাষ্ঠে বধ করিলেন।

বাহাদুর সাহ দক্ষিণাপথের কয়েকটী নগর লুণ্ঠন করেন। তৎপর উজ্জয়নীর রাজা শিলহদ্দিকে পরাজিত করিয়া বন্দি করেন। বাহাদুর সাহ কিছুকাল চিতোর দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখেন, তৎপর রাণারত্নের নিকট হইতে ৫ লক্ষ টাকা ১৮০ অশ্ব ও ১০টী হস্তী উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া সৈন্য উঠাইয়া লন।

ডিউ ও সুরাট বন্দরে পোর্ত্তুগীজগণ অনেক যুদ্ধ জাহাজ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া বাহাদুর সাহ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। পোর্ত্তুগীজগণ পলায়ন করিলে বাহাদুর সাহ কয়েকটী বড় কামান ও অনেক ছোট কামান হস্তগত করেন।

(১) রাণা সঙ্গের মালব জয়ের পর ইহা চিতোর সাম্রাজ্যের অধিকার ভুক্ত ছিল। বাহাদুর

সাহ মালব জয় করিয়া গুজরাট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তৎপর চিতোর গড় অধিকার করিবার জন্য বহুতর সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

(২) সেই সময় হুমায়ুন বাদসাহ গুজরাট বিজয় মানসে গোয়ালিয়রে আসিয়া উপনিত হইলেন।

(৩) সুলতান বাহাদুর সে সময় চিতোরের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে সংলিপ্ত ছিল, হুমায়ুন তাহার পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন।

হুমায়ুনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বাহাদুর সাহ তাতারখান লোদীকে একদল সৈন্য সমভিব্যবহারে বিয়ানার পথে দিল্লি অধিকার করিবার জন্য পাঠাইলেন। যদি হুমায়ুন গুজরাট আক্রমণ করে, তবে বাহাদুর দিল্লির বাদসাহ হইবে, অথবা হুমায়ুন বিপদ বুঝিতে পারিয়া সৈন্য উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাতার খানলোদীর ভুল ক্রমে তাহার এই অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না;—হুমায়ুনের ভ্রাতা হিনদলমির্জা কর্ত্তৃক গুজরাট সৈন্যদল পরাজিত হইল।

ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর বাহাদুর সাহ চিতোর অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে চিতোরের ৩২ হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইল, এবং প্রায় ১৩ হাজার রাজপুত রমণী 'জহরব্রতে' অনলকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিল।

বাহাদুর সাহ হুমায়ুনের অরাতি ইব্রাহিম লোদী—তাহার অবিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, ও ভগ্নিপতি মহম্মদ জামাল মির্জাকে, গুজরাটে স্থান প্রদান করিয়াছে বলিয়া, হুমায়ুন বাহাদুর সাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

রুমিখান নামক বাহাদুর সাহের একজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় হুমায়ুন সহজেই চিতোর গড় অধিকার করিলেন। বাহাদুর সাহ সেখান হইতে পলাইয়া মান্দুর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। মান্দু হুমায়ুনের হস্তগত হইলে বাহাদুর সাহ চাম্পানীরে ও তথা হইতে ডিউতে পলায়ন করিলেন। হুমায়ুন চাম্পানীর অধিকার করিয়া আমেদাবাদে আসিলেন, সেখান হইতে সেরসাহ আফগানের আক্রমনের সংবাদ পাইয়া আগ্রায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

হুমায়ুন তদীয় ভ্রাতা মির্জ্জা আসকারীকে আমেদাবাদের, কাসাম বেগকে ব্রোচ প্রদেশের, সাদগড় নাসীরমির্জাকে পাটনের, বরবেগজালরীকে চাম্পানারের শাসন ভার প্রদান করিল। প্রায় ৯ মাসকাল ইহারা গুজরাটে শাসন কার্য্য করিল। ইতিমধ্যে বাহাদুর সাহ ৪০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। তাহারা গুজরাট পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে হুমায়ুনের সাহায্যার্থ রওনা হইল।

পোর্ত্তুগীজগণ ডিউকে একটী বন্দর করিতেছে শুনিয়া বাহাদুর সাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য গমন করিলেন। বাহাদুর সাহ কয়েকটী পারিষদ সহ পোর্ত্তুগীজ সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে জাহাজে গমন করিলেন। বিশ্বাসঘাতক পোর্ত্তুগীজগণ জাহাজ হইতে তাহাদিগকেও ফেলিয়া দিয়া হত্যা করিল।

বাহাদুর সাহের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান মহম্মদ সাহ (তৃতীয়) গুজরাট সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহম্মদ সাহ ১১ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

মহম্মদ সাহ আমেদাবাদে—গভীর নিশীথে তাহার এক ভৃত্য কর্ত্তৃক নিহত হন। তৎপর মন্ত্রী আসফ্ খানকেও প্রাতঃকালে সেস্থলে ডাকিয়া আনিয়া হত্যা করে। ইহার পর সেই ভৃত্য তাহার অনুগামী কতক সৈন্যের সাহায্যে রাজপুরীর অনেককে নিহত করিয়া রাজপোষাক পরিধান করিয়া সিংহাসনে আসিয়া উপবিষ্ট হয়।

ইতিমধ্যে এই সংবাদ সকলের মধ্যে প্রচারিত হইলে সুলতানের বিশ্বস্ত সৈন্যগণ রাজপুরীতে যাইয়া তাহাকে হত্যা করিল।

মহম্মদ সাহের পুত্রাদি কেহই ছিল না এবং রাজপুরীর অনেকে হত হইয়াছে, কাজেই মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিয়া সুলতানের এক দূর-সম্পর্কীয় বালককে সিংহাসনে অভিসিক্ত করিল।

মন্ত্রিগণ পরস্পরের মধ্যে গুজরাট সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লয়। সেই সময় ইতামদখান মন্ত্রী এতদূর প্রাধান্য লাভ করে যে, সুলতানের সঙ্গে সামান্য কারণে বিবাদ হওয়ায় মন্ত্রী তাহাকে হত্যা করে।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে বৈরাম খাঁ মক্কা যাইবার পথে পাটনে আসিয়া কিছুদিন বিশ্রামের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে, মোবারিক খাঁ লোহানী নামে একজন আফগানের পিতা মাচিবারা ক্ষেত্রে বৈরাম খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হয়, সে পিতৃ প্রতিশোধ লইতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং আরো কয়েক জন আফগান সৈন্যকে সঙ্গী করিল।

বিশেষতঃ সেই সময় বৈরাম খাঁর সঙ্গে মেসিম খাঁর সুন্দরী কাশ্মীরি স্ত্রী ও কন্যা ছিল। কন্যাটী বৈরাম খাঁর পুত্রের সহিত বাক্‌দত্তা ছিল। আফগান সহজেই বশীভূত হইল।

একদিন বৈরাম খাঁ সহরের সন্নিকটস্থ কোন হ্রদের মধ্যস্থ উদ্যান হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তীরে অশ্বারোহণ করিতেছিলেন। সেই সময় ঐ আফগান আরো ২৫।৩০টী আফগানকে সঙ্গে করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল।

বৈরাম খাঁ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বন্ধুগণ! তোমরা নিকটে আসিয়া আমার পৃষ্ঠে অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া দেও—যেন আমি তোমাদের বক্ষের উপর ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি।

এইরূপ কথা শুনিয়া দস্যুগণ নিতান্ত বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু ইতিমধ্যে কয়েক জন দস্যুর উদ্যত তরবারী—বৈরাম খাঁর রক্তঝলকে নাচিয়া উঠিল;—অব শষ্ট আফগানগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিল।

দস্যুগণ বৈরাম খাঁর সন্দিগনের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইল।

খোয়াজী মালিক ও আরো কয়েকজন বীরপুরুষের ঐকান্তিক যত্নে ও সাহসিকতায় বৈরাম খাঁর একমাত্র পুত্র আবদুল করিম ও তাহার মাতা নিরাপদে আমেদাবাদে পৌছিল, এখানে তাহারা ৪ মাস অবস্থান করিয়া আকবরবাদসাহের অভিপ্রায় অনুযায়ী দিল্লীতে উপনিত হইল।

সুলতান আমেদ সাহেব (দ্বিতীয়) মন্ত্রী ইতামদ খাঁন রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িল। সে অল্প একটী বালককে সুলতান মহম্মদ সাহার (তৃতীয়) পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিল ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে এই বালক মুজাফির সাহ (দ্বিতীয়) উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিল। আমীর ওমরাহগণ ইতামদ খাঁনকে সুলতান আমেদ সাহের (দ্বিতীয়) হত্যাকারী জানিতে পারিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল।

আকবর বাদসাহ গুজরাটের আভ্যন্তরিক অবস্থা অবগত হইয়া কয়েকজন মির্জাকে সৈন্যবাহিনীর সহিত গুজরাট বিজয়ে প্রেরণ করিলেন। কিছু দিন পরে আকবর সাহ স্বয়ংই একদল সৈন্যবাহিনী লইয়া গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অত্যল্প চেষ্টায়ই গুজরাট আকবরের শাসনাধীনে আসিল, মন্ত্রী ও আমীর ওমরাহগণ বশ্যতা স্বীকার করিল। সুলতান মুজাফ্‌ফর ও আমেদাবাদের শাসনকর্ত্তা সুরথে পলায়ন করিল। আকবরের সৈন্যগণ সুলতান মুজাফ্‌ফরকে শস্যক্ষেত্রে লুক্কায়িত অবস্থায় পাইয়া ধৃত করিয়া আকবরের নিকটে লইয়া আসিল। আকবর তাহাকে একজন মির্জ্জার অধীনে রাখিয়া দিল। কিছুকাল যুদ্ধের পর ব্রোচ এবং অন্যান্য স্থলের শাসনকর্ত্তারা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিল। আকবর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মির্জা আজিজ কোকাকে সমুদয় গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া আগ্রায় প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছু দিন পরে সেরখাঁন ইদরের রাণা নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া রাজ্যে নানা প্রকার অশান্তি উৎপাদন করিতে লাগিল। মির্জা মহম্মদ হোসেন প্রথমতঃ সুরাট অধিকার করিবার জন্য

কিছুকাল ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ব্রোচ্ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া ব্রোচ্ এবং কাম্বে হস্তগত করিল, তৎপর সৈন্যবাহিনী লইয়া আমেদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইল।

মির্জা আজিম কোকা অবিলম্বে সম্রাটের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। সম্রাট আকবরসাহ সৈন্যদল লইয়া এক সপ্তাহে ডিমার সন্নিকটবর্ত্তী স্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথা হইতে পাটনের সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমেদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঝোটানা নামক স্থলে সেরখাঁনের সৈন্যদল তাহাদের আক্রমণে বাধা প্রদান করিল, কিন্তু বিশেষ ভাবে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ৩১এ আগষ্ট বুধবার (১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে) আকবর আমেদাবাদ হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থলে উপনীত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং মির্জা আজিজ কোকাকে তাহার আগমনের সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্রাট আকবর সাহকে আমেদাবাদের এত সন্নিকটে উপনীত হইতে দেখিয়া শত্রুদল ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। সেরখাঁন ও অন্যান্য বিদ্রোহী মির্জাগণ সাবরমতী নদীর অপর পারে বিপুল সৈন্যদল লইয়া সম্মিলিত হইল। আকবরসাহ সৈন্যদলের ন্যূনতা সত্ত্বেও নদীপার হইয়া বিপক্ষ সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে আকবরসাহ তিনবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলেন। ভীষণ সংঘর্ষণের পর শত্রুদল পরাজিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

মহম্মদ হোসেন মির্জা নিহত হইল। আকবর পক্ষে মাত্র ১০০ লোক এবং শত্রু পক্ষে ১২ শত লোকের মৃত্যু ঘটিল।

আকবরসাহ বিজয়ী হইয়া আমেদাবাদ নগরে প্রবেশ করিলেন। তৎপর পাটনে যাইয়া এ যাবৎ বিশ্বস্ত মন্ত্রী ইতামদ খাঁনকে উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

আকবরসাহ রাজা ভগবান দাসকে ইদমের রাণা নারায়ণ দাসকে শাসন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এবং রাজা টোডর মলকে গুজরাটের রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের উন্নতি বিধানের জন্য রাখিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

দুই বৎসর পর মির্জা আজিজ কোকার পদত্যাগ ঘটিলে পর, বৈরামখাঁর পুত্র মির্জা খাঁনকে গুজরাটের শাসন ভার অর্পণ করিলেন। মির্জা খাঁন অল্প বয়স্ক; কাজেই উজির খাঁন উপাধিধারী এক ব্যক্তিকে তাহার সহকারী রাখিলেন এবং প্রাগদাস নামক একজন হিন্দু দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইলেন।

উজির খাঁনের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া আকবরসাহ তৎস্থলে মালবের শাসনকর্ত্তা সাহিবদ্দিন আমদ খাঁনকে নিযুক্ত করিলেন। সেই সময় সুরথের শাসনকর্ত্তার সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সাহিউদ্দিন অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিলে, মির্জা খাঁন সে স্থলে গমন করিয়া আহত হইয়া আমেদাবাদ প্রত্যাগমন করিল।

তখন আকবরসাহ ভূতপূর্ব্ব সুলতানের মন্ত্রী ইতামদ খাঁনকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা রূপে বরণ করিলেন।

এ পর্য্যন্ত সুলতান মুজাফ্ফর রাজবন্দি রূপে বাস করিতেছিল, আকবরসাহ দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে কিছু জাইগীর প্রদান করিলেন। মুজাফ্ফর সুলতান কিছুকাল রাজ্ পিপ্লায় অবস্থান করিলেন, তৎপর সুরথে পলায়ন পূর্ব্বক মন্ত্রী ইতামদ খাঁন কর্ত্তৃক বরখাস্ত ৭০০ শত বিদ্রোহী সৈন্য দলের সহিত যোগ দান করিলেন।

সুলতান মুজাফ্ফর ৩ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া আমেদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তথায় ইতামদ খানের পুত্র দ্বারা পরিচালিত সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া আমেদাবাদ অধিকার করিলেন। ইতামদ খাঁ সেই সময় পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা সাহিবউদ্দিনের সাহায্য গ্রহণ করিতে কান্দিতে গিয়াছিল, সেখান হইতে উভয়ের সম্মিলিত সৈন্যদল লইয়া আমেদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইল, কিন্তু সুলতান মুজাফ্ফরের সৈন্য দলের নিকট সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া পাটনে পলায়ন করিল।

বিপক্ষ পক্ষের বহুতর সৈন্য ভূতপূর্ব্ব সুলতানের শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হইল। এই বিপুল সৈন্যদল লইয়া সুলতান প্রথমতঃ বড়োদা ও তৎপর ব্রোচ অধিকার করিলেন।

এই সংবাদ শুনিবা মাত্র সম্রাট আকবর সাহ পুনরায় মির্জাখানকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার সাহায্যার্থ আরো কয়েকজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন। মালবের শাসনকর্ত্তাকেও সৈন্যদল লইয়া মির্জাখানের সহিত সম্মিলিত হইতে আদেশ করিলেন।

মির্জাখান আগ্রা হইতে সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া সুলতান মুজাফ্ফর আমেদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সহিবউদ্দিন পাটনে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি মির্জাখানের সহিত আসিয়া সংযুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে সুলতান মুজাফ্ফর সাবরমতী নদীর তীরবর্ত্তী ওসমানপুর স্থলে আসিয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন, মির্জাখান সৈন্যদল লইয়া সারখেজ নামক স্থলে মালব সৈন্যের অপেক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সুলতান মুজাফ্ফর অনতিবিলম্বে তথায় আসিয়া আক্রমণ করিলেন—কিন্তু সুলতানের হস্তী তদীয় সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সংঘটন করায় সুলতানের সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। সুলতান প্রথম মহম্মদাবাদ তৎপর তথা হইতে কাম্বে পলায়ন করিলেন।

সেই দিন মালবের সৈন্যদল বড়োদায় আসিয়া পৌঁছিল। এবং তাহা হইতে কিছু সৈন্য ব্রোচে প্রেরিত হইল, কিন্তু ব্রোচ দুর্গস্বামী তাহাদের বিরুদ্ধে দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়ায় তাহারা দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল।

মির্জাখান আমেদাবাদের একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া কাম্বে অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং তাহার আদেশ অনুযায়ী মালবের সৈন্যদল 'বরিয়া' নামক স্থলে আসিয়া সম্মিলিত হইল। এই সংবাদ পাইয়া সুলতান মুজাফ্ফর কাম্বে পরিত্যাগ করিয়া বড়োদায় যাত্রা করিলেন, তথায় মির্জা খানের সৈন্যদল তাহাকে অনুসরণ করিয়া পরাজিত করিল।

অগত্যা সুলতান মুজাফ্ফর পর্ব্বতাভিমুখে পলায়ন করিলেন কিন্তু নান্‌ড়োড এর সৈন্যদল তাহাদিগের অনেককে হত্যা করিল।

এই জয় সংবাদ যখন সম্রাট আকবরের কর্ণে পৌঁছিল, সম্রাট মির্জাখানকে তাহার পিতৃ পদবী খান খানানে উন্নীত করিলেন। মির্জাখান সারখেজের যেস্থলে প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তথায় ফতেবাগ নামক একটী উদ্যান নির্ম্মাণ করেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমীর এবং ওমরাহদিগকে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিবার পর খসরুর পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আমার আস্তাবলের ৪০ হাজার অশ্ব বিশ্বস্ত এবং সাহসী পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিতরণ করিলাম। বহু আমীরকে ১ শত হইতে ২ শত অশ্ব প্রদান করিলাম এবং একজন উষ্ট্র সজ্জিত করিতে আদেশ দিলাম। যেসকল সৈন্যের উষ্ট্র ছিল না, তাহাদিগকে সুসজ্জিত উষ্ট্র প্রদান করিয়া সকলকে যাত্রার আয়োজন করিতে বলিলাম। যে সকল আমির এবং মনসবদার দূরস্থানে অন্য কার্য্যে রত ছিলেন, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আমার অনুসরণ করিতে আদেশ দিলাম। দোস্ত মহম্মদ এবং কাবুলি মহম্মদ বেগকে আমি সম্প্রতি রাজকার্য্যে কাবুল এবং পঞ্জাবে যাইতে আদেশ দিয়াছিলাম।

তাঁহারা তথায় যাইবার পূর্ব্বে সেকেন্দরার কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা আমার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া এই সংবাদ দিলেন যে, সাহজাদা খসরু ত্রিশহাজার অনুচর লইয়া দ্রুতগতিতে পঞ্জাবাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে দ্রুতগামী অশ্ব এবং উষ্ট্র প্রদান করিয়া আমি আমার অশ্বে আরোহণ করিলাম। নানা ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত সংবাদ দ্বারা জানিতে পারিলাম, যে, খসরু বামদিকে গমন করিয়াছে। পথে যত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সকলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, সে সিন্ধু নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের অভিমুখে গমন করিয়াছে। উষাকালে আগ্রা হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী সেকেন্দরা নগরে আগমন করিলাম, এই স্থানে আমার পিতার সমাধি মন্দির অবস্থিতি করিতেছে। মির্জা সারোখের পুত্র মির্জা হোসেন খসরুর সহিত যোগদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে তাহা করিতে পারে নাই। এই স্থানে সে আমার সম্মুখে নীত হইল। সে অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বন্ধন করিয়া তাঁহাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে চড়াইয়া আমার অনুসরণ করিতে আদেশ প্রদান করিলাম। আমার পিতার আত্মার শুভ ইচ্ছার প্রভাবে আমি এই সময় একটি শুভচিহ্ন দেখিলাম, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য জনক। আমার পিতামহ হুমায়ুনও একদা এই প্রকার এক শুভচিহ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ১৫ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার পিতা বাবরের সমাধি দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে গগনমার্গে একটি পক্ষীকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তাঁহার অনুচর বৃন্দকে বলিলেন যে, যদি তিনি সাম্রাজ্যের অধিপতি হন,তাহা হইলে এই তীর দ্বারা ঐ পক্ষীকে বধ করিতে সক্ষম হইবেন, ইহা বলিয়াই তিনি তীর নিক্ষেপ করিলেন। পরক্ষণেই গভীর আনন্দের সহিত দেখিলেন যে, পক্ষীটি রক্তাক্ত কলেবরে তাঁহার পদতলে আসিয়া পড়িল। এই ঘটনার পর হইতে তিনি স্থির করিলেন, যে সমুদয় অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বে এই প্রকারে ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া তবে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। আমিও এক্ষণে নিম্নলিখিত ঘটনার দ্বারা আমার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিলাম। পিতার সমাধি মন্দির হইতে এক ক্রোশ দূরে একটি অপরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে, তাহার নাম মুরাদ খাজা। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সম্রাট বাবরের সমাধির নিকট আর একটি অপরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। এ ব্যক্তি একটি গাধার পৃষ্ঠে জ্বালানী কাষ্ঠের বোঝা চাপাইয়া দিয়া এবং নিজে এক বোঝা কাঁটা লইয়া যাইতেছিল। তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে,তাহার নাম দৌলত খাজা (সৌভাগ্যবান)। আমি তাহারই নাম শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং অনুচর বৃন্দকে বলিলাম যে ইহার পরে যে ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহার নাম যদি সাদেৎ (মঙ্গলজনক) হয়, তবে আমাদের যাত্রা শুভ হইবে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে,একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে একটি ছোট বালক গরু চরাইতেছে। আমরা তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, তাহার নাম সাদেত খাজা। ইহা শুনিয়া আমরা সকলে যারপর নাই বিস্মিত হইলাম এবং অনুচরবৃন্দের মধ্যে এক আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। আমিও ইহাকে আমার ভবিষ্যতের এক শুভচিহ্ন জ্ঞান করিয়া আমার রাজ্যের সমুদয় কার্য্য এই তিন মঙ্গলজনক চিহ্ন অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে মনস্থ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

দ্বিতীয় বর্ষ। অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। ৫ম সংখ্যা।

সুপ্রভাত

"নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা
আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে
প্রাচীন রজনী নাশো
নূতন উষালোকে।"

শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি,এ সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৵০ টাকা।

আজ

ধনীর সুপ্রভাত ! গৃহীর সুপ্রভাত !

সৌখীনের সুপ্রভাত ! মহিলার সুপ্রভাত !

কারণ,

বঙ্গ-দেশের কারখানাজাত সাবানের মধ্যে

ন্যাশন্যাল সোপ

অভিনব শিল্পজগতে অভাবনীয় যুগান্তর

ঘটাইয়াছে।

আকারে ও গন্ধের স্থায়িত্বে

ন্যাশন্যাল সোপ

বিলাতী সাবানকে পরাস্ত করিয়াছে !

মূল্যও যথাসম্ভব সস্তা করা হইয়াছে !!

তাই বলিতেছিলাম শিল্পজগতে আজ

সুপ্রভাত !

বাজারে সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য।

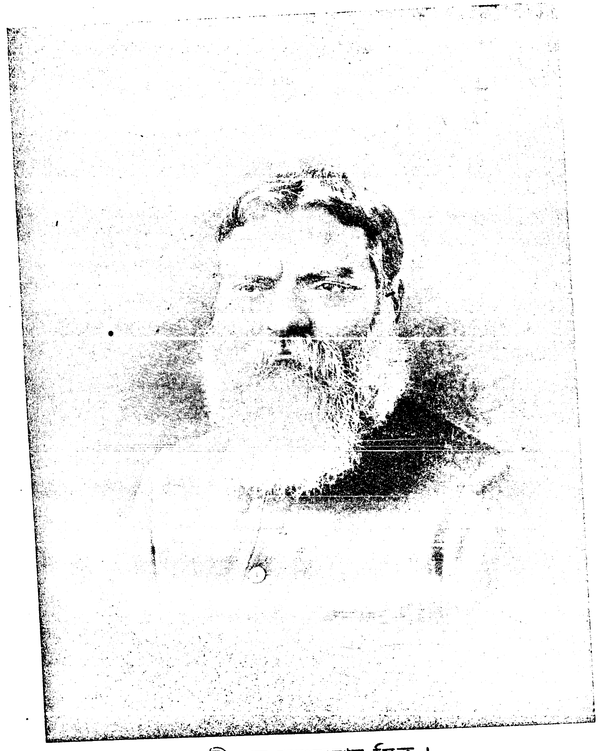

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

সুপ্রভাত

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর;
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

দ্বিতীয় বর্ষ। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

মৃত্যুর বরণ।

ইহার লাগিয়া এতেক ভাবনা
ইহার লাগিয়া শঙ্কা?
বল গিয়া সখি, ধরিয়া পিতার চরণ,
পুণ্য কুলের চির গৌরব
রাখিবারে জানে কৃষ্ণা—
ক্ষত্রিয় নারী ডরেনাক' কভু মরণ!

লুব্ধ যবন মুগ্ধ মোহেতে—
ঘুচাব তাহার স্পর্দ্ধা,
আন হলাহল সকল বিঘ্ন-তরণ!
বুঝাইয়ো সখি পিতারে আমার—
মুছাইয়ো মার আঁখি,
ক্ষত্রিয় বালা আদরেতে বরে মরণ!

মস্তক মণি কাল নাগিনীর
কে করেছে আশা লভিতে?
কেশরীর শিরে কে চাহে ধরিতে চরণ
অশনির শিখা ধরিবার লাগি
কাহার জেগেছে প্রয়াস?
বাড়ব-অনল হৃদয়ে করিতে ধারণ!

পুণ্য যে দেশ বীরের রক্তে
সতীর ভস্মে ধন্য—
অঙ্কে তাহার কোরেছি জনম গ্রহণ!
দেখাব জগতে কেমনে রমণী
আপনারে করে রক্ষা—
মরণেরে করে হাসিয়া কেমনে বরণ!

নয়নের নীর মুছে ফেল সখি—
ছি ছি দিয়োনাকো লাজ!
জ্বাল—জ্বাল চিতা বিঘ্ন-বিপদ-তরণ
পুণ্য কুলের চির গৌরব
রাখিবারে জানে কৃষ্ণা—
ক্ষত্রিয় বালা আদরেতে বরে মরণ!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

বোপদেব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাহা হউক, যে প্রকার দাক্ষিণাত্যের অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেনরাজগণ বঙ্গে আসিয়া বৈদ্য-জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন, সেইরূপ বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বোপদেবও দাক্ষিণাত্যে যাইয়া মুখ্য ব্রাহ্মণে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিবে, বঙ্গদেশ হইতে একদল বৈদ্য যে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ কি ? প্রমাণ মহামহোপাধ্যায় ভরত সেন মল্লিক। তিনি তাঁহার চন্দ্রপ্রভা নামক বৈদ্যকুল পঞ্জিকা গ্রন্থে বলিতেছেন—

রাঢ়ীয়া ভিষজো যে যে প্রায়স্তে বঙ্গগা অপি।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে, নিবসন্তি চ কেচন॥ ৯ পৃ

অর্থাৎ রাঢ়ীয় বৈদ্যগণই অনেকে পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া বঙ্গজ শ্রেণীর বৈদ্যে পরিণত হইয়াছেন। আর নন্দি প্রভৃতি উপাধিধারী কতিপয় অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণও মহারাষ্ট্রে যাইয়া বাস করিতেছেন। বলিবে তবে মহারাষ্ট্রগত অম্বষ্ঠগণের সে নন্দিপ্রভৃতি উপাধি দেখা যায় না কেন ? তথান্তত্র—

অষ্টৌ সেনাদয়োরাঢ়ে বঙ্গেষ্বপি বসন্ত্যমী।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে লুপ্তপদ্ধতয়োঽপিচ॥ ৯ পৃ

সেন, দাশ, গুপ্ত, ধর, কর ও দত্ত প্রভৃতি আট ঘর বৈদ্য রাঢ়ে বাস করেন। পূর্ব্ববঙ্গেও তাঁহারা বাস করিয়া থাকেন। নন্দিপ্রভৃতি উপাধিধারা কতিপয় বৈদ্যসন্তান মহারাষ্ট্রে যাইয়া বাস করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অম্বষ্ঠোচিত পদ্ধতির বিলোপ ঘটিয়াছে।

অতএব বঙ্গদেশ হইতে মহারাষ্ট্রে যে একদল বৈদ্য গমন করিয়াছিলেন, তাহা প্রামাণ্য গ্রন্থকার ভরত মল্লিকের দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। সখারাম বাবু কি মনে করেন যে এই কথাগুলি ভরতের মনঃকল্পিত গল্পিকালীলা ? যদি এই ঐতিহাসিকতত্ত্ব প্রকৃত হয়, তাহা হইলে কি আমরা মনে করিতে পারিব না যে, নন্দি বা সেন-উপাধিধারী বোপদেব এই দলের নেতা ছিলেন। তাঁহারা মহারাষ্ট্রে যাইয়াই তথায় সেনবী ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তবে বোপদেব প্রতিভাবলে দেশস্থদলে প্রবেশ লাভ করেন। বিক্রমপুরের সাধারণ লোকেরা তত্রত্য বৈদ্যগণকে "সেন-বৈদ্য" বলিয়া থাকে। বোপদেব-প্রভৃতিও মহারাষ্ট্রে যাইয়া আপনাদিগকে সেনাহ্ব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকিবেন। উক্ত সেনাহ্ব শব্দই কালে ভাষার বিকারে সেনওই বা সেনবী হইয়া গিয়াছে। সখারাম বাবু আমাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—

"প্রকৃত পক্ষে সারস্বত ব্রাহ্মণেরা মহারাষ্ট্র দেশে সেনবী নামে পরিচিত। ইহাঁদিগকে মৎস্যাহারী ব্রাহ্মণও বলে। বঙ্গদেশ হইতে ইহাঁরা মহারাষ্ট্রে গমন করিয়াছিলেন, ইহাই অধিকতর সম্ভবপর।" ২৬৬

এখন চেতস্বান্ পাঠকেরা বলুন. ইহা আমার প্রতিবাদ, না অনুকূল গলহস্ত ? তবে আমি বলিতেছি, এই ঔপনিবেশিকগণ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আর সখারাম বাবু বলিতেছেন সারস্বত ব্রাহ্মণ। ভাল বঙ্গদেশে কি কোন দিন সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন ব্রাহ্মণশ্রেণী ছিলেন বা রহিয়াছেন ? বঙ্গদেশে সপ্তশতী, কান্যকুব্জ এবং বৈদিকগণই বসবাস করেন। সপ্তশতীগণের নামান্তরই যে সারস্বত, তাহাও ইতিহাস বলে না। আর সারস্বতগণ মহারাষ্ট্রে যাইয়া সেনবি নাম ধারণ করিবেন, মহারাষ্ট্রের মৃত্তিকার এমনই বা কি একটা শক্তি চিত্র্য আছে ! এ যুক্তি অপেক্ষা আমাদিগের যুক্তিই কি সাধীয়সী নহে ? "সেনবী" কথাটীর সঙ্গে "সারস্বত" ও "সেনাহ্ব" এই কথা দুইটীর মধ্যে কাহার সাগন্ধ্য সমধিক ! বঙ্গদেশের মুখ্য ব্রাহ্মণেরাও মৎস্য ও মাংস খাইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা চিকিৎসাব্যবসায়ীও নহেন,

তাঁহাদিগের আখ্যা সেন-সনাথ হওয়াও সম্ভবের কথা হইতে পারে না। পরম শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বোম্বাই বাসকালে উহার যে ঐতিহ্যতত্ত্বের সমাহার করিয়াছেন, উহাতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে—

"সেনওয়ী নামে একজাতীয় ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে গৌড় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। যদিও তাঁহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণের দেখাদেখি শুদ্ধাচারের ভাণ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের জাতিতে আমিষভক্ষণ বিশেষতঃ মৎস্যাহার নিষিদ্ধ নহে। সম্ভবতঃ তাঁহারা বাঙ্গলা দেশ হইতে এদেশে আসিয়া পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা সেনওইকে আমিষভোজী আচারহীন বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাদের চক্ষে সেনওই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নয়।" বোম্বাই চিত্র—৪১৯২০ পৃ।

এখন সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন, এদেশের ব্রাহ্মণেরা যেমন অম্বষ্ঠগণের ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করিতে নারাজ (অবশ্য সেটী অন্যায়, কেননা শাস্ত্রে অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই কথিত, বৈদ্যগণ অব্রাহ্মণ হইলে তাঁহাদিগের অধ্যাপনায় অধিকার থাকিত না) তদ্রূপ সেনবীগণকেও মহারাষ্ট্রের মুখ্য ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে অনগ্রসর। কেন ? সেনবীগণ এক আমিষভোজী, তাহাতে গৌণব্রাহ্মণ। এখানে আরও একটী কথা পরিচিন্তনীয়। সখারাম বাবু বলেন যে সেনবীগণ সারস্বত ব্রাহ্মণ, পক্ষান্তরে সত্যেন্দ্র বাবু বলিতেছেন যে "না না উঁহারা গৌড় ব্রাহ্মণ।" এ মতদ্বৈধ ঘটিবার কারণ কি ? সত্যেন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই একথা সেনবীগণের নিকট জানিয়াই লিখিয়াছেন। সুতরাং আমরা সত্যেন্দ্র বাবুর কথা অবিশ্বাস করিতে সমর্থ নহি। ফলতঃ সারস্বত বা গৌড় ব্রাহ্মণ বলিয়া বাঙ্গলায় কোন ব্রাহ্মণশ্রেণী নাই। খুব সম্ভব অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ মহারাষ্ট্রে যাইয়া নিদানে পড়িয়া আপনাদিগকে গৌড় (বঙ্গীয়) ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। আমরা সেনবীগণের অন্য কোন নিদান দেখিতে পাই না। বঙ্গ হইতে যে সকল বৈদ্য মহারাষ্ট্রে গমন করিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের সকলেরই বংশধ্বংস ঘটিয়াছে, বংশে বাতি দিতে একজনও নাই, আমরা এরূপ ভাবিতেও অসমর্থ, তাই আমরা সেনবীগণকেই বোপদেবপ্রতিষ্ঠাপিত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিতে অভিলাষী।

৩। আমরা বোপদেবকে যে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিয়া মনে করি তাহার অন্যতর কারণ বোপদেবের বিশেষণকদম্বক। বোপদেব আপনাকে যে "বিপ্র" "দ্বিজ, ও "বেদপদজ্ঞ" বলিয়া সংসূচিত করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বৈদ্যত্বের অমোঘ কারণ। কেননা বাল্মীকি ও কালিদাসপ্রভৃতি প্রকৃত ব্রাহ্মণগণ কুত্রাপি আপনাদিগকে ঐ সকল বিশেষণের বিষয়ীভূত করেন নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গলার মুখ্য ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গলার অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে শাস্ত্রে থাকিলেও কার্য্যতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেন না, তাই গঙ্গাধর কবিরাজের অপেক্ষা সহস্র গুণে পণ্ডিত ও অভিমানদৃপ্ত জ্বলন্ত বহ্নি বোপদেব আপনাকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করেন। ঠিক এই কারণেই সুপদ্মব্যাকরণপ্রণেতা বৈদ্য পদ্মনাভ দত্ত ও চক্রপাণি দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র ক্রমদীশ্বর এ... রামপ্রসাদ সেন আপনাদিগকে দ্বিজ বলি... গিয়াছেন। এখানে আমাদিগকে প্রসঙ্গতঃ স্ব... রামদাস বাবু ও শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শাস্ত্রী কবি... মহাশয়ের দুইটী কথার প্রতিবাদ করিতে হই... রামদাস বাবু বলিতেছেন যে—

"বোপদেব বৈদ্যকুলে জন্মিলে তিনি ক... বিপ্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না। ... দ্বিজ বলিলেও বলিতে পারিতেন।" ২৯ পৃষ্ঠা।

ঐতিহাসিক রহস্য ১ম ভাগ।

কিন্তু রামদাস বাবুর এ আপত্তি সমীচান ... ব্রাহ্মণসন্তান অম্বষ্ঠগণ যে একতর ব্রাহ্মণ ... মন্বাদি সংহিতা ও মহাভারতাদি প্রামাণ্য ... সমূহ অবগত আছেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অ... পর্ব্বে বলিতেছেন—

ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণে...

ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা—এই তিন স্ত্রীতে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। সুতরাং এতাবতা ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য নির্ব্যূঢ়ই হইতেছে। আর যিনি ব্রাহ্মণ তিনি কেন আপনাকে বিপ্র বলিতে অসমর্থ হইবেন? অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণ না হইলে কি সর্ব্বগ্রাসী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে অধ্যাপনা করিতে দিতেন? বেদে ব্রাহ্মণ ও বিপ্রশব্দ মেধাবী ও স্তোতৃ অর্থে ব্যবহৃত হইত। ত্রেতাযুগে জাতি প্রথার প্রবর্ত্তন কালে বৈদিক বিপ্র ও ব্রাহ্মণগণ লইয়াই ব্রাহ্মণ জাতির গঠন হয়। সুতরাং—

যেন জাতঃ সএব সঃ

এই মহাভারতীয় প্রমাণানুসারে ব্রাহ্মণ সন্তান অম্বষ্ঠগণও কেন বিপ্র বলিয়া সমাখ্যাত হইতে পারিবেন না? আচার্য্যেরা বলিয়া গিয়াছেন—

জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈ র্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় এব হি॥

সুতরাং কৃতবিদ্য অম্বষ্ঠগণ যেমন ব্রাহ্মণপদবাচ্য, তেমনই বিপ্রপদবাচ্যও বটেন। জন্মাষ্টমী ব্রতের বিবৃতি দৃষ্টে জানা যায় যে, কৃষ্ণের পিতা ক্ষত্রিয় বসুদেবও বিপ্র বলিয়া আহূত হইয়াছিলেন।—

বিরাটং গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র! পুত্রং প্রত্যর্পিতুং প্রভো।
সুতং দত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়॥

১১০ পৃঃ—হিন্দু সৎকর্ম্মমালা।

বোপদেবচরিতপ্রণেতা অঘোরবাবু বোপদেবের বৈদ্যত্বের নিরসন জন্য বলিতেছেন যে—

বোপদেব যে ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব, তাহা এই শ্লোকের বিপ্রশব্দে প্রকাশমান।

"বেদপাঠাৎ ভবেৎ বিপ্রঃ॥"

এই প্রসিদ্ধ প্রমাণ-বচন-অনুসারে বোধ হয়, তিনি বেদপাঠী ব্রাহ্মণ ছিলেন।" ৩ পৃঃ।

অঘোরবাবু এই প্রামাণ্য প্রমাণবচন কোথায় পাইলেন, তাহা আমরা জানি না। এই চরণটী কাহার নিজের তাঁতে বোনা, ইহাই আমাদিগের ধারণা। ফলকথা অঘোর বাবুর মনের ধারণা এই যে যখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহার বেদপাঠের অধিকার নাই, তখন বেদপাঠী বিপ্র বোপদেবকে বৈদ্য ভাবা যায় না। কিন্তু অঘোর বাবুর জানা উচিত ছিল যে বেদপাঠের অধিকার কেবল মুখ্য ব্রাহ্মণের একচেটিয়া ছিল না। মনু বলিয়া গিয়াছেন—

অধীয়ীরন্ ত্রয়োবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াৎ ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরৌ ইতি নিশ্চয়ঃ॥

১—১০ অ।

ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কুল্লুক বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণাদয়ঃ ত্রয়োবর্ণাঃ অধীয়ীরন্ বেদং পঠেযুঃ।

সুতরাং যেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজের বেদপাঠে অধিকার থাকা দৃষ্ট হয়, তথায় ক্ষাত্রিয় ও বৈশ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জাতি একতর ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠের কেন সে অধিকার থাকিবে না? মনুই বলিতেছেন—ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অধ্যাপনা করিতে পারিবে না। কিন্তু পক্ষান্তরে বৈদ্যগণ যেমন অধ্যয়নে অধিকারী, তেমনই আবহমানকাল চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ অধ্যাপনাতেও অধিকারবান্ রহিয়াছেন। সুতরাং অঘোরবাবুর কথা অমূলক হইতেছে। বৈদ্যগণ যেমন বেদ পাঠে অধিকারী তেমনই বিপ্রপদবাচ্যও বটে। অথবা অত্যুচ্চ জাতি অম্বষ্ঠের কথাই বা বলা কেন? পূর্ব্বকালে শূদ্রাতে ক্ষেত্রজভাবে জাত পারশব কবষ ও কক্ষীবান্‌ও ঋষি ও বিপ্র বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদুক্তং বামদেবেন—

অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং কক্ষীবান্ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।

১—২৬সূ—৪ম

অত্র সায়ণভাষ্যং—অহং বামদেবঃ মনুরভবম্ অহমেব সূর্য্যশ্চ, বিপ্রো মেধাবী কক্ষীবান্ দীর্ঘতমসঃ পুত্রঃ এতৎসংজ্ঞক ঋষি রপি অহমেব অস্মি।

বামদেব বলিতেছেন—আমি মনু হইয়াছি, সূর্য্য হইয়াছি ও বিপ্র এবং ঋষি কক্ষীবান্ হইয়াছি। সুতরাং কি মুখ্য ব্রাহ্মণ, কি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয় কিংবা কি পারশব ব্রাহ্মণ, কৃতবিদ্য হইলে প্রত্যেকেই বিপ্র বলিতে অধিকারী হইতেন। কিন্তু মুখ্য ব্রাহ্মণ বাল্মীকি ও কালিদাসাদি অবিনয়াশঙ্কায় আপনাদিগকে দ্বিজ বা বিপ্রাদি বলিতেন না ও বলেন নাই।

বোপদেব উহা বলাতেই আমরা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্যের দাবিদার গৌণ ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য বলিতে চাহি।

৪। আমরা বোপদেবকে যে বাঙ্গালী বৈদ্য ভাবিয়া থাকি তাহার অন্যতর কারণ এই যে বিশ্বপ্রকাশ অভিধানপ্রণেতা বৈদ্য মহেশ্বর কবীন্দ্র বোপদেবের পিতা কেশবকে আপনার পিতৃব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।—

শ্রীসাহসাঙ্ক নৃপতে রনবদ্যবিদ্য—
বৈদ্যান্তরঙ্গপদপঙ্কতিমেব বিভ্রৎ।
যশ্চন্দ্রচারুচরিতো হরিচন্দ্রনামা
সদ্ব্যাখ্যয়া চরকতন্ত্র মলঙ্কার ॥৫
আসীদশেষবসুধাধিপবন্দনীয়ে
তস্যান্বয়ে সকলবৈদ্যকুলাবতংসঃ।
শক্রস্য দস্রইব গাধিপুরাধিপস্য
শ্রীকৃষ্ণ ইত্যমলকীর্ত্তিলতাবিতানঃ ॥৬
সংকল্পসম্মিলদনল্পবিকল্পজল্প—
কল্পানলাকুলিতবাদিসহস্রসিন্ধুঃ।
তর্কত্রয়ত্রিনয়ন স্তনয় স্তদীয়ো
দামোদরঃ সমভবৎ ভিষজাং বরেণ্যঃ ॥৭
তস্যাভবৎ সূনুরুদারবাচো
বাচস্পতিঃ শ্রীললনাবিলাসী।
সদ্বৈদ্যবিদ্যানলিনীদিনেশঃ
কৃষ্ণ স্ততঃ সৎকুমুদাকরেন্দুঃ ॥৮
যদ্‌ভ্রাতৃজঃ সকলবৈদ্যকতন্ত্ররত্ন
রত্নাকরশ্রিয় মবাপ্য চ কেশবোঽভূৎ।
কীর্ত্তেনিকেতন মনিন্দ্যপদপ্রমাণ
বাক্যপ্রপঞ্চরচনাচতুরাননশ্রীঃ ॥৯
কৃষ্ণস্য তস্য চ সুতঃ স্মিতপুণ্ডরীক
দণ্ডাতপত্রপরভাগযশঃপরাগঃ।
শ্রীব্রহ্মইত্যবিকলাত্মমুখারবিন্দ—
সোল্লাসলাসিতরসাদ্র সরস্বতীকঃ ॥১০
তস্যাত্মজঃ সরসকৈরবকান্তকীর্ত্তিঃ।
শ্রীমন্ মহেশ্বর ইতি প্রথিতঃ কবীন্দ্রঃ।
যোঽশেষবাঙ্ময়মহার্ণবপারদৃশ্বা
শব্দাগমাম্বুরুহষণ্ডরবির্বভূব ॥ ১১

বিশ্বপ্রকাশ প্রারম্ভঃ।

ইতি সকলবৈদ্যরাজচক্রমুক্তাশেখরস্য
গদ্যপদ্যবিদ্যানিধেঃ শ্রীমহেশ্বরাচার্য্যস্য
কৃতৌ বিশ্বপ্রকাশে অনেকার্থাব্যয় পরিচ্ছেদো
দ্বিতীয়ঃ। পরিসমাপ্তিঃ।

অর্থাৎ মহেশ্বর কবীন্দ্রের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ হরিচন্দ্র, কান্যকুব্জরাজের রাজবৈদ্য ছিলেন। তাঁহার উপাধি বৈদ্যান্তরঙ্গ। তিনি চরকের একখানী ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ঔরসে সকল বৈদ্যবংশের অবতংস শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও উক্ত রাজার সভাসদ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম দামোদর। দামোদরের পুত্র কৃষ্ণ বাচস্পতি, কৃষ্ণ বাচস্পতির ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম কেশব। তিনি বৈদ্যক শাস্ত্রের পারদৃশ্বা ছিলেন। কৃষ্ণের পুত্র শ্রীব্রহ্ম, শ্রীব্রহ্মের পুত্র আচার্য্য মহেশ্বর কবীন্দ্র। তিনি সকল বৈদ্যের রাজা ছিলেন।

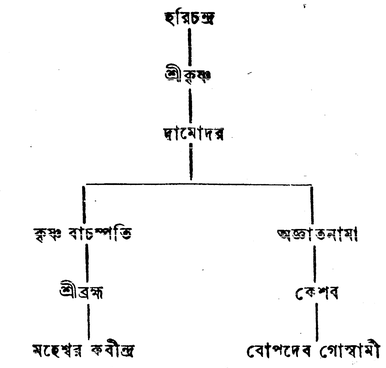

হরিচন্দ্র
|
শ্রীকৃষ্ণ
|
দামোদর
|—————————————|
কৃষ্ণ বাচস্পতি — অজ্ঞাতনামা
শ্রীব্রহ্ম — কেশব
মহেশ্বর কবীন্দ্র — বোপদেব গোস্বামী

এখানে ৬ষ্ঠ শ্লোকে "সকলবৈদ্যকুলাবতংসঃ" এই বিশেষণ হইতে আমরা মহেশ্বরপ্রভৃতিকে জাতি বৈদ্য বলিতে অভিলাষী। বৈদ্যকুল বলিতে বৈদ্য বংশ ভিন্ন অন্যার্থ হইতে পারে না। কেন না কুলশব্দের সমূহ অর্থ থাকিলেও এখানে সমূহার্থ বাচক একটী স্বতন্ত্র "সকল" শব্দ বিশেষণরূপে পূর্ব্বে থাকায় পরবর্ত্তী কুলশব্দের পুনরায় সমূহার্থ করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। অপিচ জাতিবৈদ্য ভিন্ন তৎকালে বৈদ্যান্তরঙ্গ বা কবীন্দ্র প্রভৃতি উপাধিও অন্য কোন

জাতিই প্রাপ্ত হইতেন না। যদি এতাবতা মহেশ্বরে বৈদ্যত্ব অব্যাহত হয়, তাহা হইলে তাঁহার পিতৃব্য অশেষ-বৈদ্যক-শাস্ত্রকোবিদ কেশব ও ভ্রাতৃব্য ভিষক্ কেশবনন্দন বোপদেব গোস্বামীর বৈদ্যত্বও নির্ব্যূঢ় বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। বলিতে পার এই কেশবই যে বোপদেবের পিতা ভিষক্ কেশব তাহার প্রমাণ কি? চক্রপাণি দত্ত, শ্রীপতি দত্ত, মেদিনীকর ও মাধবকর যেমন দশ বিশটী থাকা জানা যায় না, তেমনই বোপদেবের পিতা ভিষক্ কেশব ভিন্নও পরিচয়দানযোগ্য বৈদ্যকে কৃতশ্রম আর কেহ কেশবনামা ছিলেন, ইহাও সাহিত্য জগৎ অনবগত। তাই আমরা এই কেশবকেই বোপদেবের পিতা বলিতে বদ্ধপরিকর। যাহা হউক বেশ দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশ হইতে একদল লোক মহারাষ্ট্রে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহাদিগের নেদিষ্ঠ দায়াদ অন্য একদল লোক কার্য্যোপলক্ষে গাধিপুর বা কান্যকুব্জে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। অতএব বাঙ্গালী বৈদ্য বোপদেব গোস্বামী মহারাষ্ট্রে যাইয়া মুখ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়াছিলেন ইহাই যেন প্রকৃত কথা। এইক্ষণ আমরা বোপদেবের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে দু-চার কথা বলিব। সখারাম বাবু বলিতেছেন যে তাঁহাদিগের শুদ্ধিপত্রের নির্দ্দেশানুসারে বোপদেব ১২০৯ শকাব্দার লোক।

> নিধ্যম্বরযমক্ষৌণীসংযুতে শালিবাহনে।
> মাঘে শুক্লে পঞ্চম্যাং সর্বজিন্নামবৎসরে। ২৪
> শ্রীমদ্ জ্ঞানেশচরণযুগলে সুরসেবিতে।
> বোপদেবেন গ্রথিতং শুদ্ধিপত্রং সমর্পিতম্॥ ২৫

আমরা যথাদৃষ্ট প্রতিলিপি লইলাম। চ্যুত সংস্কৃতি-ভূয়িষ্ঠ এই কাঁচা সংস্কৃত, শাব্দিকচূড়ামণি বোপদেবের লেখনী বিনির্গত, ইহা মনে হয় না। সখারাম বাবুও বলিতেছেন যে—"বোপদেব জ্ঞানেশ্বরকে যে শুদ্ধিপত্র দান করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা বিনষ্ট হওয়ায়, পরবর্ত্তিকালে সম্প্রদায়স্থ কোন ব্যক্তি আলোচ্য পত্রখানি রচনা করিয়া মূলপত্রের অভাব পূরণ করিয়াছেন।" ২৬৪ পৃঃ

সুতরাং ইহা অপ্রামাণ্য।—যাঁহাকে শুদ্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থা দান করা হইবে তাহা তাঁহারই চরণে কেন সমর্পিত হইবে? বরং করযুগলে হওয়াই সম্ভব। ফলতঃ যেমন এখানে মূলের বিধ্বংস ঘটিয়াছে, তেমনই শকাব্দের সংখ্যা ঘটিত অঙ্কের অক্ষরাবলীও লিপিকরপ্রমাদে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। বিশ্বপ্রকাশ অভিধানপ্রণেতা মহেশ্বর বোপদেবের সমসাময়িক। তিনি এইরূপে আপনার সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

> রামানলব্যোমরূপৈঃ শককালেঽভিলক্ষিতে।
> কোশং বিশ্বপ্রকাশাখ্যং নিরমাৎশ্রীমহেশ্বরঃ॥

রাম = ১; অনল = ৩; ব্যোম = ০; রূপ ১, অতএব শাকসংখ্যা ১০৩১। বোপদেব ১২০৯ শকের হইলে অত্যন্ত অর্ব্বাচীন হইয়া পড়েন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ১০৩১ শকাব্দের লোকই ঠিক করিয়া লইলাম। তাহা হইলেই জানাগেল বোপদেব বর্ত্তমান সময়ের ১৮৩০—১০৩১ = ৭৯৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

এই বোপদেবের কোন দায়াদ আছেন কি না তাহা আমরা জানি না। থাকিলেও তিনি আমাদিগের অন্তরঙ্গ ভিন্ন বহিরঙ্গ নহেন, সুতরাং যাহা সরল প্রাণে লিখিলাম, তৎপাঠে তাঁহারা কেহ বিচলিত হইবেন না। সখারাম বাবু বলিতেছেন যে "বোপদেবের এক বংশধরের নাম বাসুদেব আপদেব, অন্যের নাম বিট্টল বাসুদেব আপদেব।" আমরা মনে করি উহাদিগের আদি বীজীই বোপদেব। উক্ত বোপদেব নাম অপভ্রষ্ট হইয়া আপদেবে পরিণত হইয়াছে। যদি বল যে না এই "আপদেব" নাম বোপদেব শব্দের পরিণতি নহে, ইহা ঐ বংশের Sur name, কিন্তু তাহা হইলে বোপদেব ও কেশবাদি কেন স্ব স্ব নামের শেষে উক্ত আপদেব নাম ব্যবহার করিতে বিরত থাকিলেন? কেন বোপদেবের নাম "বোপদেব কেশব আপদেব" বলিয়া লিখিত হইল না? ফলতঃ উঁহারা কোন আপদেবের অনন্তর বংশ্য হইলে অবশ্যই স্ব স্ব নামান্তে আপদেবের নাম যোজনা করিতেন। কিন্তু বোপদেব ও কেশ

বাদি একনামা, পক্ষান্তরে বিট্টলাদি দ্বিত্রি নামা কেন? ইহার কারণ ইহাই, যেরূপ একনামা পারসিকগণ বোম্বে আসিয়া মহারাষ্ট্রের প্রথানুসারে "মাণিকজী রস্তমজী" প্রভৃতি যুগ্মনামের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তেমনই মহারাষ্ট্রে নবাগত একনামা বোপদেবের অনন্তর বংশ্য বিট্টল বাসুদেবাদিও নূতন দেশের নূতন প্রথানুসারে বাসুদেব আপদেব, বিট্টল বাসুদেব আপদেব প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। আমরা এইখানেই বোপদেবের পালা শেষ করিলাম। এইক্ষণ প্রবীণগণ সকল কথার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া সত্যের অনুসরণ করিবেন।

অতঃপর আমরা প্রবন্ধের উপসংহারে আমাদিগের সখারাম বাবুর আর একটী ভ্রান্তির নিরসন জন্য আরও কিছু বলিতে বাধ্য হইব। তিনি বলিতেছেন—

"উমেশ বাবুর দুর্ভাগ্য কলাপ বা মুগ্ধবোধের সূতিকাগৃহ বঙ্গদেশ নহে। কলাপ মহারাষ্ট্রপতি শালিবাহনের আদেশে তদীয় মন্ত্রীর দ্বারা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, একথা সর্ব্বত্র বিশ্রুত। সর্ব্ববর্ম্মার জন্মস্থান কি বঙ্গদেশ? মহারাষ্ট্র রাজমন্ত্রী কলাপরচয়িতা সর্ববর্ম্মাকে চীনপরিব্রাজক হোয়ান সাং "দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (Beals life of Hwan Thoang. P P 122). এরূপ স্থলে সর্ববর্ম্মাকে বাঙ্গলী বলা সামান্য দুঃসাহস নহে।

২৬০ পৃ সাহিত্য।

বিলাতের Beal সাহেব ও চীনের হোয়ান সাং কি বলিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী আমরা গ্রাহ্য করি না। পূর্ণ সভ্য পূর্ণপ্রজ্ঞ লেথব্রিজ সাহেব তাঁহার গোলডেন বুকে লিখিয়াছেন যে দ্বারভাঙ্গার রাজারা রাজপুত্র (বস্তুতঃ উঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ)। দিল্লীর দরবারে গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছিলেন সুসঙ্গের রাজগণ ক্ষত্রিয় (কার্য্যতঃ তাঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অপরাধ উপাধি সিংহ আছে,) বিলাতের সাহেবেরা ঠিক করিয়াছিলেন কেশব বাবু কুলীন কায়স্থ, জর্ম্মানীর শর্ম্মারা বুঝিয়াছিলেন মিত্র রাজেন্দ্রলাল কুলীন ব্রাহ্মণ। আর আইন আকবরীয় খোদাবকশ লিখিয়া গিয়াছেন সেনরাজগণ "কয়েথ"। অতএব বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপতলপকরীরা কে কি বলিয়াছেন তাহা না দেখা ও না শুনাই মঙ্গলের কথা। পক্ষান্তরে আমাদিগের দেশের কুলপঞ্জিকা চতুর্ভুজ বলিতেছেন যে—

> বঙ্গে শ্রীশালবান্ নাম ভূপো বিখ্যাতবিক্রমঃ।
> শালাব্দো নির্ণয়ো যস্য সর্ব্বলোকাবগোচরঃ॥
> বৈদ্যবংশসমুদ্ভূতঃ সচ ভূপঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
> যস্যাজ্ঞয়া সর্ব্ববর্ম্মা চকার শব্দশাসনং।
> ব্যাকরণং কলাপাখ্যং মূলসূত্রং বিচক্ষণঃ॥ ১৪পৃঃ

অর্থাৎ বঙ্গদেশে শালবান্ নামে এক বৈদ্য রাজা ছিলেন। তাঁহারই আদেশে সর্ব্ববর্ম্মা কলাপ ব্যাকরণ রচনা করেন। কলাপের অবতরণীতে লিখিত আছে—জলকেলিকালে রাজমহিষী "মোদকং দেহি" বলাতে রাজা মোদক আনাইয়া দেন, পরে নিজের মূর্খতা বুঝিতে পারিয়া আপনার গুরু উক্ত সর্ব্ববর্ম্মার নিকটে অধ্যয়ন করেন। রাজার শিক্ষার জন্যই কলাপ ব্যাকরণ বিরচিত হয়। এখন শাল ১৩১৪—১৫, সুতরাং কলাপের বয়ঃক্রমও তৎপরিমাণ কিংবা কিছু ন্যূন। সখারাম বাবু স্বকর্ণে বা পরকর্ণে শুনিয়াছেন, আর আমরা দেখাইতেছি যে কলাপের জন্ম বর্ত্তমান সময়ের ১৩১৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫৯৪ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল পরন্তু খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নহে। ভারতবর্ষে যে দুইজন শালিবাহন রাজা ছিলেন, তাহা স্বর্গত রামদাস বাবুও বলিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি ২য় শালিবাহনকে ভ্রমক্রমে মগধের রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ফলতঃ তিনি বাঙ্গলারই বৈদ্য রাজা ছিলেন। কেবল চতুর্ভুজ পঞ্জী নহে, ব্রাহ্মণবিরচিত বিপ্রকুলকল্পলতাও বলিতেছেন—

> আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্য্যঃ শালবান্ নাম ভূপতিঃ।
> বঙ্গরাজ্যাধিরাজঃ স স্বধর্ম্মপরিপালকঃ॥

তবে মহারাষ্ট্রদেশেও যে শালিবাহননামে আর একজন মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন, তাহাও আমরা অনবগত নহি। তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠান

নগরী ছিল এবং তিনিই শকাব্দার প্রবর্ত্তয়িতা। পক্ষান্তরে বাঙ্গলায় শালিবাহনের প্রচলিত শকের নাম—শাল। সকলে এখন ভ্রমক্রমে উহাকেই হিজিরা সন বলিয়া ভাবিতেছেন। ফলতঃ হিজিরার বয়ঃক্রম চান্দ্রমাসানুসারে ১৩২৫—২৬ ও এলাহি সনের বয়ঃক্রম—১৩১৫—১৬। সৌর গণনামতে হিজিরার বয়স ১২৭৬ ও সনের বয়স ১২৬৬ বৎসর। আর শালের বয়ঃক্রম ১৩১৪—১৫। সর্ব্ববর্ম্মা এই বাঙ্গলার শালিবাহনের মন্ত্রী নন্ গুরু ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন,পরন্তু দাক্ষিণাত্যবাসীও ছিলেন না। তবে তিনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। হোয়ান সাং তাহা না বুঝিতে পারিয়া কি লিখিয়া গিয়াছেন ও বিলাতী ভট্টাচার্য্য বিল সাহেব আবার উহার শৃঙ্গপুচ্ছভেদ ঘটাইয়া কি কি খাড়া করিয়াছেন, স্বাধীনচেতা বাঙ্গালী আমরা তাহা প্রাণে দেওয়া দূরে আস্তাং কাণে দিতেও সম্মত নহি। বঙ্গদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণ দুই শ্রেণীর, পাশ্চাত্য বৈদিক ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক। তবে ইহাঁদিগের বীজীরা ভূতপূর্ব্বদাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম প্রদেশবাসী বটেন। কিন্তু এদেশের কোন মুখোপাধ্যায়কে কি আর কেহ কান্যকুব্জের অধিবাসী বলিয়া ঠাওরাইতে বা নির্দ্দেশ করিতে পারেন? কলাপের বৃত্তিকার দুর্গসিংহ কে, তাহা আমরা ঠিক জানি না, ইহা কোন লোকের উপনাম। অবশ্য কেহ কেহ অমরসিংহকেই দুর্গসিংহ ভাবিয়া থাকেন, কিন্তু ১৯৭৪ বৎসরের প্রাচীন তম অমর কেমন করিয়া ১৮৩০ বৎসরের কলাপের বৃত্তিকার হইতে পারেন? ফলতঃ এ দুর্গসিংহ ১৩১৪ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ব্যক্তি হইবেন। যাহা হউক এই বৃত্তিকার ও কৃৎপ্রকরণকর্ত্তা অবাঙ্গালী হইতে পারেন। কিন্তু উক্ত বৃত্তি বা কৃৎ যে উজ্জয়নী কিংবা মহারাষ্ট্রে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। কোন বিদেশী পণ্ডিত, বাঙ্গালার রাজা শালিবাহনের রাজধানীতে বসিয়া রাজার আদেশে উহা রচিয়া দেওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু উহার পরিশিষ্টকার বাঙ্গালী বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্ত,পঞ্জিকাকার বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় ত্রিলোচন দাশ এবং পরিশিষ্টের ও মূল কলাপের টীকা টিপ্পনীকার বহু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। কলাপের পঠন পাঠনাও মুগ্ধবোধের ন্যায় একমাত্র বাঙ্গলার সীমার মধ্যেই সমাবদ্ধ। তবে ইংরাজের কৃপায় মুদ্রাযন্ত্র ও কেটেলগ এবং ডাক ঘরের সৃষ্ট হওয়ায় এখন মুগ্ধবোধ ও কলাপের অস্তিত্বের কথা মহারাষ্ট্রাদি দেশেও যে না পৌঁছিয়াছে তাহা নহে। যাহা হউক আমরা সরলজ্ঞানে বোপদেবকে বাঙ্গালার গোঁসাই বৈদ্য বলিয়াই জানি,তাই এত কথা বলিলাম। সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন। এখন সকলে সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া বলুন যে বোপদেব ও কলাপ ব্যাকরণের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমার দুর্ভাগ্য, কি দেউস্কর মহাশয়ের দুর্ভাগ্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই প্রকারে দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে প্রখর রৌদ্রতাপ অসহ্য হওয়াতে আমি বিশ্রাম লাভের জন্য একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসিলাম। এই স্থানে বসিয়া বসিয়া আমার হৃদয় বিষাদভারে অবনত হইয়া পড়িল। আমি খান-ই-আজিমকে বলিলাম, যে আমার এত ঐশ্বর্য্য, সাজসজ্জা থাকা সত্ত্বেও এক্ষণে আমার বহু অসুবিধা রহিয়াছে। কিন্তু আমার হতভাগ্য পুত্র এক্ষণে কি ভীষণ কষ্টের মধ্যে দেশ হইতে দেশান্তরে পলায়ন করিতেছে, তাহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অধিকন্তু তাহার অপরাধ এবং বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া আমি ম্রিয়মাণ হইতেছি। তাহার এই সকল নানা

প্রকার কষ্টের নিকট আমাদের এই সামান্য অসুবিধা অতি তুচ্ছ। আমারই পুত্র এবং বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ যে এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিল, সেজন্য আমি অধিকতর ক্রুদ্ধ হই নাই। আমি যে এত শীঘ্র এই দুর্ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া তাহার প্রতিকারার্থে উপায় অবলম্বন করিতে পারিয়াছি, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি যদি খসরুর অন্বেষণ করিতে আরও বিলম্ব করিতাম, তাহা হইলে সে হয় ত এতক্ষণে কোন সীমান্ত প্রদেশ দখল করিয়া অন্যান্য বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিত। তাহাকে এই কার্য্যে সফলতার সহিত বাধা প্রদান করিবার জন্যই আমি স্বয়ং তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বহু পুষ্করিণী এবং নয়নানন্দকর বনরাজিপূর্ণ একটি গ্রামে আসিয়া আমরা তাঁবু গাড়িলাম। এই স্থানে আমরা সংবাদ পাইলাম যে খসরু হিন্দুদিগের তীর্থস্থান মুত্রা নগরে উপস্থিত হইলে বদ্‌কসানাধিবাসী হোসান বেগ একদল সৈন্য লইয়া ঐ নগরে প্রবেশ করেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াই নিরীহ নগরবাসীর প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং তাহাদের সমুদয় ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করেন। তিনি নগরবাসীর উপর এপ্রকার নৃশংস অত্যাচার করেন যে তাহা দেখিয়া খসরু অতিশয় দুঃখিত এবং বিরক্ত হয়। সে আপনাকে এই সকল অত্যাচার ও সর্ব্বনাশের কারণ বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিয়া অনুচরদিগকে বলে যে "হায়, আমি কোন্ পাপের পথে আসিয়া পড়িলাম। আমার সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া কেন আমি আমার পিতাকে পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণে আমার পূর্ব্বগৌরব, সম্ভ্রম, এবং মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া সমাজের হীনচরিত্রের লোকদিগকে আমীর নামে অভিবাদন করিতে বাধ্য হইতেছি। আমার এতদূর অধঃপতন হইয়াছে যে পিতার প্রজার উপর এই দুষ্টলোকগণের অত্যাচার দমন করিতেও আমি অক্ষম।" ঘৃণা ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া খসরু এই কথা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু যিনি তাঁহাকে অধঃপতন এবং ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন, সেই পিতার নিকট নির্ব্বুদ্ধিতা এবং লজ্জাবশতঃ ফিরিয়া আসিল না। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে এখনও হতভাগা খসরু অনুতপ্ত হইয়া আমার নিকট আসিলে আমি তাহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিতাম এবং তাহাকে তাহার পূর্ব্বগৌরব এবং সম্ভ্রমের মধ্যে স্থাপিত করিতাম। আমি যে তাহাকে ক্ষমা করিতাম তাহা সে নিশ্চয়ই অবগত আছে। আমার পিতার অসুখের সময় সে একবার আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহার ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম।

পিতার অসুখের সময় কয়েকজন দুর্দ্দান্ত আমীর আমার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে বিনা আয়াসেই ঈশ্বর হিন্দুস্থানের সিংহাসন আমাকে অর্পণ করেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর পিতার পীড়া বৃদ্ধি হয়। রোগের উপশমের জন্য আত্মীয়গণ ঔষধ সেবন করাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে কয়েকটি সুস্বাদু ফল আহার করিতে দেন। এই ফল আহার করিয়া তাহার রোগ বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি পরের দিন জলস্পর্শও করেন নাই; অধিকন্তু, সেদিন আমিনদ্দিনের জুয়াখেলার জন্য তাহাকে তিরস্কার করাতে তাঁহার রোগ অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছিল। পরের দিন ডাক্তারগণ তাঁহাকে সুরুয়ার মধ্যে উপর্য্যুক্ত ঔষধ সেবন করাইল। কয়েকদিন পর তাঁহাকে খিচুড়ী খাইতে দেওয়া হয়। শরীরে বল পাইবার জন্য পিতা তাহা আহার করেন; কিন্তু, তাঁহার হজমশক্তি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে ইহা আহার করিবার পর তাঁহার ভয়ঙ্কর পেটের পীড়া হয়। হাকিম মুজাফর নামক তাঁহার এক ডাক্তার বলিলেন যে তাঁহার সহযোগী ডাক্তার হাকিম আলি ঔষধ ও পথ্য দিতে ভুল করিয়া সম্রাটের রোগ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। পাছে ইহাতে হাকিম আলির কোন ক্ষতি হয় এজন্য আমি বলিলাম যে ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং চিকিৎসকের এই প্রকার ভুল না হইলে আমাদের কখনও মৃত্যু

হইত না। হাকিম আলির চিকিৎসা ব্যবসায় ও প্রতিপত্তির ক্ষতি হইবে বিবেচনা করিয়া প্রকাশ্যে তাঁহাকে এইরূপ বলিলাম, কিন্তু তাঁহার চিকিৎসার প্রতি আমার বিশ্বাস দূরীভূত হইল। পিতার মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে আমি দশ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ বৈকালে দুই, তিন ঘণ্টা তাঁহার পরিচর্য্যায় যাপন করিতাম। পীড়িতাবস্থায় একদা তিনি অনুচরবর্গ না লইয়া আমাকে প্রাসাদে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কয়েকটি কারণে বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহার এই উপদেশ উপেক্ষা করা আমার উচিত হইতেছে না। সুতরাং একাদশ দিবসে আমি আমার সৈন্য এবং অনুচরসহ প্রাসাদে গমন করিলাম। পরদিবসই সম্রাটের অনুমতি না লইয়াই তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ আমাকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিলেন না। আমাকে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহারা প্রাসাদের এবং সমুদয় দুর্গের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরে আমি আর প্রাসাদে গমন করিলাম না। এই সময়ে মকারেব খাঁ আমাকে মানসিংহের একখানি পত্র প্রদান করিলেন। তাহাতে মানসিংহ আমাকে লিখিয়াছেন যে তিনি আশা করেন আমি সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত হইব। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমার এই বিপদের সময় মকারেব খাঁ প্রাসাদের ভিতরে থাকিয়া আমার বিরুদ্ধভাবাপন্ন আমীরদিগের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তার করিতে বিধিমত চেষ্টা করিতেন। মকারেব খাঁ আমার পিতার অধীনে দুই হাজার সৈন্যের অধিনায়ক আমীরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পিতা আমকে ১২ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক পদ প্রদান করিলে, আমি মকারেব খাঁর কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে তিন হাজারের পদ প্রদান করিলাম এবং আমার মুনেসবদার নিযুক্ত করিলাম। পিতার শেষাবস্থায় তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও দর্শন হইতে এই প্রকারে বঞ্চিত হইয়া, আমি দারুণ মনোকষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলাম। এই দুঃখের দিনে আমি একমাত্র পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া রহিয়াছিলাম। আমার তিনটি বিশ্বস্ত এবং বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে আমার এই দুঃখের বিষয় জানাইয়াছিলাম। তাঁহাদের নাম মিরাণ সদরজাহান, মির রেজাউদ্দিন, এবং খাজা উইস্। পারস্যের সম্রাট সা তামাস্পের মৃত্যুর রাত্রিতে সুলতান হাইদার মির্জা এবং সা ইস্মাইলের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহার সহিত আমার বর্ত্তমান অবস্থার সাদৃশ্য আছে বলিয়া তাঁহারা সেই ঘটনার সবিশেষ বর্ণন করেন। সা তামাস্পের মৃত্যুর পর ইসমাইল মির্জাকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য কয়েকজন আমীর মন্ত্রণা করেন। ইসমাইল মির্জা রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন। এই আমীরগণ ইসমাইল মির্জার ভগিনীর সহিত ও এই বিষয়ে পরামর্শ করেন এবং তাঁহারা অবগত হন যে অপর কয়েকজন আমীর তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে বাধাপ্রদান করিয়া হাইদার মির্জাকে পারস্যের সিংহাসন প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সা তামাস্পের মৃত্যু হইলে হাইদার মির্জার পক্ষীয় আমীরগণ এবং হুসেনি বেগ তাহার ভ্রাতা মুস্তাফা মির্জাকে লইয়া রাজধানী আক্রমণ করেন। রাজধানীর সৈন্যগণ ক্রমাগত পরাজিত হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া হাইদার মির্জার মস্তকচ্ছেদন করিয়া দুর্গের দেওয়ালের উপর দিয়া শত্রু পক্ষের মধ্যে ফেলিয়া দিল। এই দৃশ্য দেখিয়া মুস্তাফা মির্জা তাহার দশ সহস্র সৈন্য লইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। শীঘ্রই হোসেনি বেগ ও তাঁহার ভ্রাতাগণ ব্যতীত সমুদয় সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। পরিশেষে এই হোসেনি বেগই নব সম্রাট সা ইস্মাইলের হস্তে মুস্তাফা মির্জাকে অর্পণ করেন। সা ইস্মাইল মুস্তাফার প্রাণ দণ্ড করেন।

আমার বিশ্বস্ত বন্ধুদের পরামর্শে আমি স্বয়ং প্রাসাদে গমন না করিয়া আমার পুত্র পারভিজের দ্বারা পিতাকে সংবাদ প্রেরণ করিলাম যে আমার শিরঃপীড়া হওয়াতে আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না। পিতা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া

আমার আরোগ্যলাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া খাজা-উইস্কে বলেন যে তাঁহার জীবনের আর আশা নাই, তিনি আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, এবং আমার উদ্দেশে এই বলিয়া বিলাপ করিয়া উঠেন যে "হায়! এসময়ে তুমি কেন আমা হইতে দূরে রহিয়াছ? তুমি জান যে আমার মৃত্যুর পর বিনা প্রতিবাদে তুমি আমার সিংহাসন লাভ করিবে।" পিতার মৃত্যু নিকট জানিয়া অবিশ্বাসী, কৃতঘ্ন আমীরগণ খসরুকে সিংহাসন প্রদান করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তাহাতে হিন্দু এবং মুসলমানের সম্মতি এবং সহায়তা লাভের জন্য তাহাদিগকে শপথ করাইল। বোখারা অধিবাসী সেখ ফরীদ সর্ব্বদা সম্রাটের সেবা করিতেন। তিনি বিশ্বস্ত মোকারেব খাঁকে প্রাসাদের সমুদয় সংবাদ প্রদান করেন। হিন্দু এবং মুসলমানের শপথ গ্রহণের পর "খান-ই-আজিম" উপাধিধারী মির্জা কোকা আমার অকৃতজ্ঞ পুত্র খসরুর ভবিষ্যৎ সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া দূত প্রেরণ করেন। মির্জা কোকা খসরুকে বলিয়া পাঠান যে তাঁহার যাহাতে কোন বিপদ না হয় সে বিষয়ে খসরু যেন দৃষ্টি রাখেন। ইহার উত্তরে খসরু বলে যে সে যখন সিংহাসন নিশ্চয়ই লাভ করিবে তখন এ বিষয়ে তাহার কোন চিন্তা নাই। ইতিপূর্ব্বে পিতার স্বাস্থ্যলাভের জন্য তাঁহাকে স্থানান্তরে প্রেরণের কথা হইয়াছিল। এক্ষণে মির্জা কোকা এবং খসরু রাজ্যলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া রাজা মানসিংহকে বলিলেন যে সম্রাটের এই অবস্থায় তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। এই দুর্ব্বলাবস্থায় তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইলেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা। তথাপি রাজা সম্রাটকে বলিলেন যে সাহজাদা সেলিম সৈন্য সামন্ত লইয়া প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিয়াছেন; এমতাবস্থায়, এক্ষণে তিনি ইচ্ছা করিলে যমুনার অপর পারে অবস্থান করিতে পারেন; পরে পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিলে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। ইহাতে সম্রাট জিজ্ঞাসা করেন যে "কি কারণে সেলিম সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিয়াছেন? আমীরগণ কি সেলিমকে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না?" এই কথা বলিয়া সম্রাট পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করেন। ঘোর মিথ্যাবাদী মির্জা কোকা সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া খসরুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কি প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছেন তাহা জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে পীড়িত সম্রাট বলেন, "তুমি এই কথা বলিয়া আমাকে মৃত্যুর দ্বারে নিক্ষেপ করিতেছ। আমার এখনও জীবনের আশা আছে বলিয়া মনে হইতেছে। তথাপি ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি অনন্তধামে যাত্রা করিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে, তবে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম সার রণকৌশল, রাজনৈতিক বুদ্ধি, এবং অন্যান্য রাজোচিত গুণ কি আমি বিস্মৃত হইব? দুষ্ট লোকের মন্দ পরামর্শে সে কখনও আমার অবাধ্য হইয়া থাকিলেও, সে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র; সুতরাং সেই সাম্রাজ্যের এক মাত্র উত্তরাধিকারী। আমাদের বংশের চিরপ্রথা এই যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসন লাভ করে। বঙ্গদেশের শাসনভার আমি খসরুর হস্তে অর্পণ করিলাম।" পিতার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রবঞ্চক তোষামোদকারিগণ দলে দলে আমার নিকট আগমন করিল। তাহারা বলিল "সম্রাট, আপনার পুত্র খসরুকে সর্ব্ববিধ উচ্চপদে ভূষিত করিয়াছেন এবং আপনাকে "সা ভাই" নামে অভিহিত করিতে তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন। আশা করি, আপনি তাঁহাকে পিতার সমুদয় স্নেহ, যত্ন প্রদান করিবেন।" প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম, "পিতা আমাকে "বাবা" ব্যতীত আর কখনও অন্য নামে ডাকেন নাই। সুতরাং তোমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে আমিই তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্রাট।" আমার এই উত্তর শুনিয়া আমীরগণ যেন কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল এবং তাহারা আমার বাক্যের কোন উত্তর দিতে সক্ষম হইল না। তাহারা আমার বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দান করিয়া অতিশয় অন্যায় ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান

করিয়াছে, এই বলিয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিল এবং আমার সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইল। মির্জা কোকা ব্যতীত আর সমুদয় আমীর আমার বশ্যতা স্বীকার করিতে ও আমার পক্ষাবলম্বন করিতে সম্মত হইল। মির্জা কোকা আমার সহিত গোপনীয় ভাবে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে তিনি ইতিপূর্ব্বে রাজপরিবারের যে সমুদয় উপকার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমি তাঁহার বহু গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছি। তিনি আমার গোপনীয় কথা সকল অবগত আছেন। আমি তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিয়াছি। আমার এত দয়া প্রদর্শনের পরও তিনি আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। সুতরাং এই সাক্ষাতের পর যদি তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে আমি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি। ইহার পরে সর্ব্বাগ্রে বোখারা অধিবাসী সেখ ফরীদ আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে একটী তরবারী, বহুমূল্য সাজে সজ্জিত অশ্ব, এবং এক লক্ষ টাকা উপহার দিলাম। তাঁহার পরে রাজা মানসিংহ আসিলেন। তাঁহাকেও আমি তরবারী, অশ্ব এবং নানা প্রকার উপঢৌকন প্রদান করিলাম। পরের দিন রাজা মানসিংহ * এবং মির্জা আজিজ কোকাকে সঙ্গে লইয়া খসরু আমার নিকট আসিলেন। খসরুকে বঙ্গদেশ অর্পণ করিবার জন্য এবং মহম্মদ তেহেম্মলকে তাহার কার্য্যে সাহায্যের নিমিত্ত মির্জা কোকা আমাকে অতিশয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমার রাজত্বের প্রারম্ভেই খসরুর অনুপস্থিতি আমার নিকট নিতান্ত অসঙ্গত মনে হইল। তথাপি আমি তাহার প্রস্তাবেই সম্মতি দিলাম। আমি তাহাদিগকে আপাততঃ যমুনার পরপারে বাস করিতে বলিলাম এবং পিতার মৃত্যু হইলেই তাহাদিগকে বঙ্গদেশে যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলাম।

এই দারুণ দুশ্চিন্তার সময় পিতা আমাকে তাঁহার উষ্ণীষ ও পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন এবং দূতমুখে সংবাদ পাঠাইলেন যে আমার অদর্শনে তিনি নিরতিশয় অশান্তিতে কালযাপন করিতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র আমি তাঁহার প্রদত্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রাসাদে গমন করিলাম। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর পিতা অতি কষ্টে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শেষ সময় নিকটবর্ত্তী জানিয়া, তিনি সমুদয় আমীরকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য আমাকে আদেশ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "যাঁহারা এই সুদীর্ঘ কাল আমার রাজ্যশাসন কার্য্যে বিশ্বস্ততা এবং সততার সহিত আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং আমার গৌরবের যাঁহারা অংশীদার, তাঁহারা তোমার সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব পোষণ করিবেন, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের সহিত তোমার মিত্রতা স্থাপনের জন্য তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ করিতেছি।" তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আমি খাজা উইস্‌কে সমুদয় আমীরকে এই সংবাদ দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিলাম।

আমীরগণ পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, তিনি চতুর্দ্দিকে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সকলের নিকট তাঁহার অপরাধের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন এবং আমীরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"যে শান্তি, যে ঐশ্বর্য্য বিরাজিত মমরাজ্যে
তাহা স্মরণে রাখিও; কি সম্পদ ঘিরিয়া
রহিত মোর শোভনীয় রাজতক্তখানি!
যাহার ছায়ায় কোটি কোটি প্রজা মোর
সুখে ও শান্তিতে কাটায়েছে নিশিদিন।
আজ শেষ দিনে, এই ভিক্ষা মাগিতেছি
তোমা সবা কাছে, প্রার্থনা করিও মোর
আত্মার কল্যাণ তরে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়।
আমার সমাধি'পরে ফেলো এক ফোঁটা
প্রেমপূর্ণ অশ্রুজল! যবে, সুখদিনে,
তোমরা রহিবে মগ্ন বিলাসে, আনন্দে,

* খসরুর মাম।

মনে ক'রো মোরে, যাহার দক্ষিণ হস্ত
বিতরিত ধনরত্ন সদা তোমা সবে।
আজ মোর আত্মা ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহে
এ দেহ-পিঞ্জর; এ ধরার দুঃখ ত্যাগি,
লভিতে চাহে গো সে যে অনন্ত বিশ্রাম।"

পিতার মৃত্যু সময় নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া, আমি পুত্রের শেষ কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহার শয্যার পার্শ্বে গিয়া তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। তিনবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিবার পর তিনি আমাকে তাঁহার নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার প্রিয় তরবারী "ফতাউল-মুল্‌ক" * আমাকে প্রদান করিলেন এবং উহা তখনি আমার কটি দেশে বন্ধন করিতে বলিলেন। তৎপরে আমি পুনরায় তাঁহার পদবন্দনা করিলাম। আমি দুঃখে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমার নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্টবোধ হইতেছিল। ৯ই তারিখে রাত্রি এক প্রহরের পর পিতা স্বর্গধামে গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মিরাণ সদর জাহানকে তাঁহার নিকট কল্‌মা † পড়িবার জন্য আমাকে ডাকিতে আদেশ দিলেন। তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আশা করিয়াছিলেন যে ঈশ্বর তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবেন। সদর জাহান আসিলে আমি তাঁহাকে পিতার শয্যাপার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে বলিলাম। এই সময়ে পিতা আমার কণ্ঠদেশ দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "প্রিয় পুত্র, শেষ বিদায় দাও; কেননা, ইহলোকে আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না। আমার অন্দরের সমুদয় স্ত্রীলোককে তুমি রক্ষণাবেক্ষণ করিও এবং তাঁহাদের মাসিক বৃত্তি নিয়মিতরূপে প্রদান করিও। আমার মৃত্যুতে তুমি শোকাকুল হইয়া পড়িবে, তথাপি আমি তোমাকে এতদিন যে সমুদয় উপদেশ দিয়াছি তাহা বিস্মৃত হইও না। তুমি আমার নিকট বহু প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা ভুলিও না। তোমার উপর আমার অনেক দাবী আছে; তাহা বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র হউক, পালন করিতে কখনও অবহেলা করিবে না। আমার সাময়িক গৌরব স্মরণ করিও। আমার দয়া, দাক্ষিণ্য ভুলিয়া যাইও না এবং চিরদিন আমার ভৃত্যবর্গ ও পোষ্যদিগকে সযত্নে প্রতিপালন করিও। এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয়ে আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহার প্রত্যেক বাক্যের মূল্য চিন্তা করিয়া দেখিও এবং তদনুসারে কার্য্য করিও। আমাকে বিস্মৃত হইও না।" তিনি আমাকে এইরূপে সম্বোধন করিয়া সদর জাহানকে কল্‌মা পড়িতে বলিলেন। সদর জাহান পরিষ্কার এবং গম্ভীর স্বরে উহা পাঠ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পিতা তাঁহার বালিশের নিকটে যাইয়া সৌরানিসা এবং কোরাণের আর এক অধ্যায় ও আদিলা প্রার্থনা তাঁহাকে পাঠ করিতে বলিলেন। তাঁহার আত্মাকে ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য তিনি উহা পাঠ করিতে বলিলেন। সদর জাহান সৌরানিসা সম্পূর্ণ করিয়া প্রার্থনার শেষ বাক্য যখন উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন পিতার নয়ন কোণে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল এবং তাঁহার আত্মা অনন্তধামে প্রয়াণ করিল। "ঐ যে দীর্ঘ সাইপ্রেস বৃক্ষ আজ জীর্ণাবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে উহা একদা উদ্যানের অলঙ্কার-স্বরূপ ছিল। চিরপরিবর্ত্তনশীল পৃথিবি! তোমার মোহমন্ত্রে তুমি সকলকেই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। এই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস হইতে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, কেহই নিস্তার পায় না। এ জগতে অদৃষ্ট ব্যতীত আর কিছুই নিশ্চয় নহে। অদৃষ্টের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন দেওয়া ব্যতীত মানবের আর অন্য উপায় নাই।"

রাজা এবং ভিখারীর যে শয্যা তাহাতেই পিতার দেহ রক্ষিত হইল। উহা নানাপ্রকার সুগন্ধি, কর্পূর, মৃগনাভী, এবং গোলাপের আতরে ধৌত করিবার পর একখানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া কফিনে রাখা হইল। তৎপরে প্রাসাদের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আমার তিন পুত্র এবং আমি উহা বহন করিয়া লইয়া চলিলাম। সিংহদ্বার অতিক্রম করি-

* সাম্রাজ্যজয়ী। † মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান মন্ত্র "এক ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই।"

বার পর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ কন্ধিন স্কন্ধে ধারণ করিয়া সেকেন্দরা অভিমুখে গমন করিলেন। তথায় প্রসিদ্ধ আকবরের নশ্বর দেহ অনন্ত নীলাকাশ তলে সমাধিস্থ হইল। এ পৃথিবী যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন চিরকালই এই প্রকার ঘটিবে। পিতার পবিত্র সমাধির উপর বসিয়া আমরা সাতদিন তাঁহার জন্য শোকানুষ্ঠান করিলাম। আমি কুড়ি জন পাঠককে সারারাত্রি সমাধির পার্শ্বে কোরাণ পাঠ করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম এবং সমাধির উপর একটি মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করিলাম। আমি আদেশ করিলাম, এই সাতদিন প্রতি প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় দরিদ্রদিগকে দুই শত প্রকার মিষ্টান্ন ও দুই শত প্রকার খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিতে হইবে। এই সকল অনুষ্ঠানের পর সমুদয় আমীর এবং আমার রাজসভার প্রধান প্রধান পারিষদগণ আগ্রা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই প্রকারে ৭৫ বৎসর ১১ মাস ৯ দিনে আমার পিতার মরজীবনের পরিসমাপ্তি হইল। এস্থলে পুনর্ব্বার এই কথার উল্লেখ করিতেছি যে, আমার পিতার মৃত্যু সময়ে রাজ্যের অধিকাংশ আমীরগণ খসরুকে হিন্দুস্থানের সিংহাসন প্রদান করিবার জন্য আমার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে, তাহারাই সাম্রাজ্য শাসন করিতে মনস্থ করিয়াছিল; খসরুকে "সম্রাট" উপাধিমাত্র প্রদান করিবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর আমার পক্ষে থাকাতে, আমিই জয়লাভ করিয়াছিলাম; কোন মানবের সাহায্যে আমি এই রাজমুকুট প্রাপ্ত হই নাই। যে অজর, অমর ভগবান আমার হস্তে এই গুরুতর কর্ত্তব্য প্রদান করিয়াছেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার সর্ব্ববিধ শাসনকার্য্যে অসহায়, অনাথ, এবং দরিদ্রদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন প্রভৃতি কার্য্যে আমি তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করিব এবং তাঁহার দিকেই আমার দৃষ্টি স্থির রাখিব; আত্মীয় স্বজন অথবা সন্তান সন্ততির প্রতি দৃষ্টি করিব না। আমি শুনিয়াছি যে, কোন এক উৎসবের প্রাতঃকালে সেখ বায়জিদ যখন তাঁহার স্নানাগার হইতে বাহির হইতেছিলেন, তখন কেহ অজানিতভাবে তাঁহার মস্তকের উপর ছাই নিক্ষেপ করে। তাঁহার শ্মশ্রু হইতে ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া প্রসন্ন চিত্তে বলিয়া উঠেন, "হে আমার আত্মা, আমি এবার আমার মূল্য বুঝিলাম, আমার এই অশুভ মুখ কি একরাশি ছাইয়ের উপযুক্ত? প্রকৃত মহত্ত্ব সুখ্যাতির উপর নির্ভর করে না। অহঙ্কারী এবং দাম্ভিকের মনে মহত্ত্ব এবং উচ্চভাব নাই। দীনতা তোমার সহযোগীদের মধ্যে তোমার মস্তক উন্নীত করিবে; কিন্তু অহঙ্কার তোমাকে ধূলিসাৎ করিবে। উদ্ধত এবং দাম্ভিকেরা মাথা নীচু কর। যদি খ্যাতি আকাঙ্ক্ষা কর, তবে তাহা অন্বেষণ করিও না।"

এক্ষণে আমি পুনরায় খসরুর পলায়নের বৃত্তান্ত বর্ণন করিব। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল আমরা হাউডেল নগরে তাঁবু স্থাপন করিলাম। বোখারা অধিবাসী সেখ ফরীদ একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আমাদের অগ্রে যাইতে লাগিলেন। অনেকের পরামর্শে আমি বিশ্বস্ত মির মোয়েজ উল মৌলককে আগ্রার প্রাসাদ এবং ঐ প্রাসাদস্থিত খাজা জাহানের ঘরের সমুদয় ধনরত্নের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলাম। আমি আদেশ করিলাম যে আমার যে পুত্রগণ আমার প্রতি অনুরক্ত, বিশ্বস্ত আছে, তাহারা অবিলম্বে আমার পশ্চাদনুসরণ করুক। ৪ঠা তারিখে আমরা ফেরিদাবাদে উপস্থিত হইলাম এবং পরদিন দিল্লী পৌছিলাম। এই নগরে উপস্থিত হইয়াই আমি সর্ব্বপ্রথমে আমার পিতামহ সুবিখ্যাত সম্রাট হুমায়ুনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য তাঁহার সমাধি মন্দিরে গমন করিলাম। তথায় দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য ৩০ হাজার টাকা প্রদান করিলাম। আমি নিজ হস্তে তাহাদিগকে বস্ত্র এবং টাকা দান করিলাম। এই স্থান হইতে আমি সেখ নিজামুদ্দিনের সমাধিমন্দির দর্শন করিতে গমন করিলাম। সমাধির চতুর্পার্শ্বস্থ পল্লীর দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য আমি আমীর জয়নুদ্দিনের হস্তে ৫০ হাজার এবং হাকিম মোজাফরের

হস্তে ২০ হাজার টাকা প্রদান করিলাম এই সময়ে আমি আহাম্মদাবাদ নগরে সংবাদ প্রেরণ করিলাম যে গুজরাটের রাজস্ব যাহা রাজা বিক্রমজিতের প্রাপ্য হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে প্রদান করিয়া এবং কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া অবশিষ্ট খাজনা রাজকীয় তোষাখানায় প্রেরণ করিতে হইবে। ৬ই এপ্রিল আমরা বেইরানগরে তাঁবু স্থাপন করিলাম। দেখিলাম, এই নগর পলাতক খসরু কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছে। এই স্থানে আমি আগা মৌলাকে এক হাজারের পদ হইতে ১৫ শতের পদ প্রদান করিলাম এবং বদকশানঅধিবাসী জেমিল বেগকে তাহার স্বজাতির মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য ৯ লক্ষ টাকা প্রদান করিলাম। তাহাদিগকে ভবিষ্যত সম্বন্ধে অধিকতর আশান্বিত হইবার জন্য জেমিল বেগকে বলিতে বলিলাম। তাহারা খসরুর অত্যাচারে নিতান্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আজমীর নগরে মইনুদ্দিনের সমাধির চতুর্পার্শ্বস্থ দরবেশদিগকে বিতরণ করিবার জন্য আমি রাজা মানসিংহের হস্তে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করিলাম। ৮ই এপ্রিল আমরা পাণিপথে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান চিরকালই তৈমুর বংশের পক্ষে শুভজনক হইয়াছে; কেননা, এখানেই আমার পিতা আকবর দুইটী ভীষণ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই পাণিপথেই আমার পিতামহ হুমায়ুন সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি সেই যুদ্ধের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব।

আফগান বেলাওয়েলের পুত্র এবং ইব্রাহিমের পিতা সেকেন্দর লোদি তাতার খাঁর পুত্র দৌলত খাঁকে পাণিপথের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সেকেন্দর লোদির মৃত্যুর পর দৌলত খাঁ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে, ইব্রাহিম তাঁহার ভয়ে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে দমনের জন্য রাজধানী দিল্লী নগরীতে আহ্বান করেন। দৌলত খাঁ ইহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং তথায় না গিয়া তাঁহার পুত্র দিলওয়ার খাঁকে দিল্লী প্রেরণ করেন। দৌলত খাঁকে না দেখিয়া ইব্রাহিম দিলওয়ারকে লেখেন যে তাঁহার পিতা যদি অবিলম্বে রাজসমীপে উপস্থিত না হন, তাহা হইলে অন্যান্য বিদ্রোহী আমীরদের যে দশা ঘটিয়াছে তাঁহারও সেই অবস্থা হইবে। দিলওয়ার খাঁ তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ তাঁহার পিতাকে জ্ঞাপন করেন। দৌলতা খাঁ ইহার উত্তরে লিখিয়া পাঠান যে বর্ত্তমান সময়ে দিল্লী গমন করা সুবিধাজনক হইল না। এই উত্তর প্রেরণ করিয়াই তিনি কাবুলে পলায়ন করেন এবং আমার পিতামহের দলে যোগদান করেন। এই ঘটনা হইতে পরে কয়েকটি ঘটনা উৎপত্তি হওয়াতে, আমি ইব্রাহিম খাঁ গগরকে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিলাম এবং দিলওয়ে খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিলাম। দিলওয়ার খাঁর পরিবর্ত্তে বোখারা অধিবাসী সয়েদ হামিদের পুত্র সয়েদ কমল যদি পাণিপথে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে খসরু কখনও এই স্থান দিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইত না। অধিকন্তু, আমরা ক্রমাগত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করাতে সে অতিশয় শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; আমার সৈন্যগণ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিতেছিল। পরিশেষে দিলওয়ার খাঁ, এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, লাহোর নগর যাহাতে খসরুর হস্তগত না হয়, তজ্জন্য বিধিমত চেষ্টা করে। সয়েদ কমলও এই বিষয়ে চেষ্টা করেন। পাণিপথে, এক কলেক্টর খসরুকে একটি পাল্কী প্রদান করিয়াছিল। সে ইহাতে আরোহণ করিয়া পাণিপথ হইতে পলায়ন করে। এই স্থান হইতে কিছু দূরে দিলওয়ার খাঁর সহিত খসরুর সৈন্যদের সংঘর্ষণ হয়। পঞ্জাবের দেওয়ান আবদার রহিমন দিলওয়ার খাঁর নিকট হইতে খসরুর আগমনের সংবাদ পাইয়া তাহাকে বাধা প্রদানের জন্য ৮ হাজার অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য লাহোর দুর্গে রাখেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া খসরুর সম্মুখীন হন। কিন্তু খসরুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তিনি তাহার অধীনতা স্বীকার

করেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য খসরু তাঁহাকে মেলেক আলওয়ার উপাধি প্রদান করেন। খসরু পরাজিত হইলে আমি তাহার এই কার্য্যের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম। তাঁহাকে বন্দী করিয়া একটি কাল গাধার চামড়ার মধ্যে তাঁহার দেহ সেলাই করিয়া লাহোরের সমগ্র প্রধান রাস্তা ও বাজারের মধ্যে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে আদেশ দিলাম। পরে জানিতে পারিলাম যে তাঁহার বহু অসহায় সন্তান, সন্ততি আছে। ইহা শ্রবণ করিয়া আমার দয়ার উদ্রেক হয়। আমি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তাঁহার জীবন রক্ষা করিলাম। তাঁহার অপরাধের ক্ষমা নাই; তথাপি আমার হৃদয় এত দয়াপ্রবণ যে সামান্য কোন কারণ দর্শাইতে পারিলেই আমি লোকের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদের প্রাণদান করিয়া থাকি এবং এইরূপ করিতে পারিলেই আমি অতিশয় আনন্দিত হই। কিন্তু যাহার হস্তে সাম্রাজ্য শাসনের গুরুভার ন্যাস্ত আছে সে দুইটি অপরাধ কখনও ক্ষমা করিতে পারে না। সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং হারেমের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা।

৯ই এপ্রিল, মঙ্গলবার, কার্ণেল উপস্থিত হইলাম। এই স্থলে ইদি খাজাকে দুই হাজার সৈন্যের অধিনায়ক আমীরের পদ প্রদান করিলাম এবং সেখ নোজামকে ছয় হাজার টাকা পুরস্কার দিলাম। এই স্থলে সংবাদ পাইলাম যে একজন দোকানদার জনসাধারণকে এই বলিয়া প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছে যে সে ঈশ্বরকে মনুষ্যের সম্মুখে আনয়ন করিয়া দিতে সমর্থ। এই মিথ্যা বাক্য দ্বারা সে বহু লোকের মনে তাহার এই অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিল। তাহার এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আমি তাহাকে হিন্দুস্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলাম এবং তাহাকে মক্কা যাইবার অনুমতি দিলাম। ১১ই এপ্রিল আমরা সাহাবাদে তাঁবু স্থাপন করিলাম। এই স্থানে পানীয় জলাভাবে আমরা তীব্র কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি ভগবানের নিকট কাতরভাবে জলের জন্য প্রার্থনা করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দিনই মুষলধারে বারিপাত হইল। ইহাতে আমার সহিত যে বৃহৎ সৈন্যদল ছিল, তাহাদের জলাভাব দূরীকৃত হইল। তাহারা ঈশ্বরের এই বহু মূল্যবান আশীর্ব্বাদ পাইয়া প্রাণ পাইল। অগণিত সৈন্য দলের মধ্যে জলের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি হইয়া থাকে। সৈন্যদলের মধ্যে অনেক সময় এরূপ ঘটিয়াছে যে যাহারা স্ফটিকের ন্যায় পরিষ্কার জল পান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে নাই, তাহারাই পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত অতিশয় কদর্য্য, অপরিষ্কার জল প্রাণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পান করিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বিত রাজ্যেশ্বরেরও সময় সময় এইরূপ ঘটিয়াছে যে হীরক খণ্ড দিয়াও তিনি সামান্য একটু জল পান নাই। আমারও একবার এই অবস্থা ঘটিয়াছিল।

আমি একবার পিতার সহিত কাশ্মীরের উপত্যকায় শীকারে গিয়াছিলাম। তথাকার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া আমি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পিরেনতেহল পাসে প্রবেশ করিয়া আমি আমার সঙ্গচরগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। ক্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া চতুর্দ্দিকে কোন প্রকার ফল অথবা পানীয় অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। এই পাসের মধ্যে বহু লোক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল; কিন্তু আমার অনুচরদের মধ্যে কাহাকেও তথায় দেখিতে পাইলাম না। প্রবল ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আসফ খাঁর কয়েকটি ভেড়া দেখিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আমি একটী ভেড়া ধরিলাম এবং পার্শ্বের একটী লোককে ইহার কাবাব প্রস্তুত করিতে বলিলাম। এক্ষণে আমার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর; কিন্তু আমি দৃঢ়রূপে স্বীকার করিতেছি যে প্রবল ক্ষুধার সময় এই সামান্য খাদ্য আহার করিয়া যে প্রকার অসীম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম, এই বয়স পর্য্যন্ত নানা প্রকার সুখাদ্য আহার করিয়া কখনও সে প্রকার তৃপ্তি পাই নাই! ক্ষুধা এবং

তৃষ্ণা দূর করিবার দ্রব্য নিকটে না রাখাতে কি শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা তখন বুঝিয়াছিলাম। তদবধি আমি আদেশ করিয়াছিলাম যে অনুচরদিগকে সকল সময়েই খাদ্য এবং পানীয় জল সঙ্গে রাখিতে হইবে। কিন্তু যতদিন আমরা কাশ্মীরে ছিলাম ততদিন আমি স্বয়ং সর্ব্বত্রই রুটি সঙ্গে লইয়া যাইতাম। এই সময়ে কাশ্মীরিগণ বলিয়াছিল যে পেরেনতেহল পাসের চতুর্পার্শ্বে মনুষ্য অথবা পশু হত্যা করিলে কোন ভীষণ প্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। আমি এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতে দেখি নাই। সাহাবাদ নগরে আমি সেখ আমেদ লাহোরীকে মির আদিল অর্থাৎ প্রধান বিচারকের কার্য্য প্রদান করিলাম। আমার রাজত্বের পূর্ব্বেও তিনি এই কার্য্য করিতেন এবং আমি তাঁহার কার্য্যকুশলতা বিস্মৃত হই নাই। তিনি আমার সাহায্যে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমি এই প্রকার ৬৬ জন যুবককে আমার অধীনে রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষার জন্য সাহায্য প্রদান করিতেছি। এই যুবকদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়া প্রকৃত মনুষ্য প্রস্তুত করিবার জন্য আমি কয়েকটি নিয়ম করিয়া দিয়াছি। তন্মধ্যে কয়েকটী নিম্নে লিখিতেছি। "যুবকগণ কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের প্রতি সর্ব্বদা বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাঁহার আশ্রয়ে নিজকে রাখিবে। যুদ্ধ এবং মৃগয়া ব্যতীত নিজ হস্তে কখনও প্রাণী হত্যা করিবে না। আলোককে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের প্রধান শক্তি বলিয়া গণ্য করিবে। প্রকৃতিতে অনন্ত ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে। প্রবৃত্তিকে সর্ব্বদা দমন করিয়া রাখিবে। ঈশ্বরকে কখনও বিস্মৃত হইবে না। ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন করিবে, সর্ব্বকার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ করিবে।"

(ক্রমশঃ।)

পূজার উপহার।

আমি জনৈক নব্য উকীল।

নব্য হইলেও আমার পশার যথেষ্ট; মক্কেলের অভাব নাই। এই ব্যবসায়ে পাছে সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়, শুধু এই ভয়েই আমি সশঙ্ক। জানিয়া শুনিয়া কখনও ধর্ম্মের পথ পরিত্যাগ করি নাই।

জীবনের এই মধ্যাহ্নে কলিকাতার চাকচিক্য, কোলাহলের মধ্যে বাস করিয়া, আমার প্রায়ই বাল্যের শত স্মৃতিজড়িত আমাদের শান্তিময়ী পল্লীগ্রাম খানির কথা মনে পড়িয়া যায়।

ছয় সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি লেখাপড়ার ধার ধারি নাই। পিসীমা, ঠাকুরমার আদরে আমার দিন অতি সুখে কাটিতেছিল।

আমার বেশ মনে আছে, গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলায় সকলে যখন ঘুমাইতেন এবং অদূরে জামরুল গাছের মধ্যে অলক্ষে বসিয়া একটা ঘুঘু ঘু-ঘু—ঘু করিত, তখন আমি সেইদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া অন্যমনে বারান্দার উপরে বসিয়া থাকিতাম। নিদাঘ মধ্যাহ্নের এই উদাস সুরটুকু আমার শিশুহৃদয়ের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।

ক্রমে বর্ষা আসিত। চারিদিক অন্ধকার করিয়া স্নিগ্ধ, সজল মেঘ আকাশ জুড়িয়া উঠিত; বিদ্যুৎ চঞ্চল হইয়া উঠিত, বজ্র গর্জ্জন করিত, ঝড় বহিত; প্রকৃতির সেই ভৈরবমূর্ত্তির মধ্যে আমরা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে বড় ভালবাসিতাম। তাহারপর জলধারা পৃথিবীকে সিঞ্চিত, প্লাবিত করিয়া দিত। গাছপালা, লতার উপরে, নববর্ষা একটি সজীব নিবীড়তা ঢালিয়া দিত। খালবিলগুলি জলে ভরিয়া উঠিত। আর সূর্য্যের জ্যোতি নাই, কোকিলের কুহুরব নাই; কেবল বর্ষণ, বর্ষণ, বর্ষণ। ইহার

সহিত ভেকের অবিরাম কলরব ঘনবর্ষার এই বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে সুরকে সম্পূর্ণতা দান করিত।

তাহার পর শিশিরের হার পরিয়া শরৎ আসিত। শিশিরশীতল, কোমল, সুন্দর শেফালিফুলগুলি বৃক্ষতল আচ্ছন্ন করিয়া পড়িয়া থাকিত; স্থলপদ্মের গাছ সমস্ত দেহে লোহিত ফুল পরিয়া হাসিয়া হাসিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিত; সাদা, পাতলা মেঘখণ্ড আকাশে ভাসিয়া বেড়াইত।

শেষে পূজার হাস্যউৎসবের স্মৃতিটুকুমাত্র বুকে লইয়া শরৎ অতীতে মিশিয়া যাইত। শীতের আগমনে তরুলতা বসনভূষণ খুলিয়া ফেলিয়া ধীর, গম্ভীর যোগীর ন্যায় গৈরিকবসনে দাঁড়াইয়া থাকিত। হিমান্তে হাস্যমুখী বসন্ত আসিয়া পল্লীকে আবার হাস্যশ্রীতে উজ্জ্বল করিয়া দিত। কোকিল ডাকিত, ফুল ফুটিত। আমাদের বাগানের কামিনী গাছটী গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে ভরিয়া উঠিত। আর সাদা প্রজাপতির দল কতকগুলি সচল ফুলের মত কম্পিতপক্ষে গুচ্ছ হইতে গুচ্ছান্তরে উড়িয়া বসিত।

প্রত্যেক ঋতু পল্লিদেহে যেমন পরিপূর্ণ শ্রীতে ফুটিয়া ওঠে, আজন্ম সহরবাসীর তাহা কল্পনাদ্বারা অনুভাব্য নহে।

প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাস করিয়া পল্লিশিশু আমরা, সহরের সুসভ্য, মার্জ্জিত বালকবালিকা হইতে যেন এক বিভিন্ন জীব ছিলাম। তখনকার পাড়াগেঁয়ে আমাদিগকে দেখিলে এখনকার মার্জ্জিতরুচি সহরবাসিগণ সম্ভবতঃ "অভদ্র" বলিতেন; কিন্তু আমরা পল্লিজননীর সরল, স্বাভাবিক সন্তান ছিলাম,—কোন প্রকার কৃত্রিমতা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই।

আমার বয়স যখন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, অথচ মা সরস্বতীর সঙ্গে কিছুমাত্র সদ্ভাব হইল না, তখন পিতামাতা হাতে খড়ি দিয়া আমাকে পাঠশালায় পাঠাইলেন। নিশ্চিন্ত মনে, নির্ব্বিঘ্নে খেলিয়া বেড়াইয়া সময় কাটাইয়া দিবার যে একান্ত লোভনীয় সুখ তাহা এখন হইতে আমার চলিয়া গেল!

বলা বাহুল্য, আমি নিতান্ত "সুবোধ" বালক ছিলাম না; সুতরাং গুরুমশায়ের কেশশূন্য মস্তক-উদ্ভূত নানা প্রকার বিচিত্র দণ্ড বিধানের একটির হস্ত হইতেও আমি অব্যাহতি লাভ করিতে পারি নাই। মাঝে মাঝে গুরুমশায় ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া চটি জুতা ও চাদরখানা স্বস্থানে ফেলিয়াই দৌড়িয়া আমার কাছে আসিতেন এবং আমার শ্রীদেহের উপর তাঁহার করকমলদ্বয় সজোরে চালনা করিতে আরম্ভ করিতেন, তাহার পর আমার দুই কাণ ধরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে ঝাঁকাইতেন এবং দুই হাতে আমার চুল ধরিয়া তৃণগুচ্ছের ন্যায় তাহা উপড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেন।

যদিবা আমার সৌভাগ্যক্রমে প্রহার শেষ করিয়া তিনি ফিরিতেন, কি কারণে বলিতে পারি না, আবার হঠাৎ তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত এবং মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া পুনর্ব্বার নবোৎসাহে আমাকে মারিতে আরম্ভ করিতেন।

বেদনায় আমার কর্ণমূল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, পিঠ ফুলিয়া যাইত, কিন্তু তবু আমার চোখ হইতে এক ফোঁটা জল বাহির হইত না; এমন কি, গুরুমশায় ফিরিলেই—সেই দুঃখের সময়েও—অন্য কোন বালকের চোখে চোখ পড়িলেই আমি হাসিয়া ফেলিতাম।

সেই গুরুমশায়ের "পোড়ো" আমি—এখন উকীল হইয়া সহরে বসিয়া ওকালতী করিতেছি! বছরকয়েক আগে একবার আমার গুরুমশায়ের শ্রীচরণ দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। তিনি আমাকে খুব আদর যত্ন করিলেন এবং বিশেষভাবে সকলকে জানাইয়া দিলেন যে আমি তাঁরই 'পড়ুয়া' ছিলাম।

আমাদের গ্রামখানির এখন আর সে শোভা-সম্পদ নাই। যাঁহাদের স্নেহের বুকে মাথা রাখিয়া একদিন সংসারের দুঃখ, তাপ অনুভব মাত্র করিতে পারি নাই, তাঁহারা সকলেই এখন দেবলোকে; যাহাদের সঙ্গে শিশু হৃদয়ের ছোট ছোট সুখ, দুঃখ, হাসি, অশ্রুর মধ্যে বাল্যজীবন জড়িত হইয়াছিল, সেই সব ভাই, বোন, বাল্যসঙ্গীরা সংসারের স্রোতে ভাসিয়া কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

গ্রামের তাঁতী, কামারদের ব্যবসায় এখন বন্ধপ্রায়; তাহাদের অন্ন জোটে না। এই নির্জ্জন, অতি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামগুলিও বিলাতী বণিকের ক্রূর, লোলুপ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তাহার পর, অজন্মা, অনাবৃষ্টি লাগিয়াই আছে। যদি কোন সুবৎসর পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার উপযোগী শস্য জন্মে, দেখিতে দেখিতে তাহার অধিকাংশ চালান হইয়া বিদেশে চলিয়া যায়। এখনও কোন কোন বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়া বলিয়া থাকেন—"রেলের গাড়ী দেশের সর্ব্বনাশ করলে।"

আমাদের সেই চির-পুরাতন গ্রামে এখন যে কয়েক ঘর নূতন বাসিন্দা আসিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদের জীবন সেই সরল, বাহুল্যবর্জ্জিত পল্লীজীবনের পুরাতন সুরের সঙ্গে যেন খাপ খায় না। তাঁহারা সুসভ্য, সুমার্জ্জিত ব্যক্তি; সম্ভবতঃ, অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। দরিদ্র, অশিক্ষিত গ্রাম্যকৃষককুলের সহিত তাঁহাদের কোন প্রকার মিষ্ট সম্বন্ধ নাই। গ্রামের ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ নির্ব্বিশেষে সকলকে 'মাসী,' 'পিসী', 'দিদি' ডাকিবার যে সুমিষ্ট প্রথা, তাহা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সেকালে, পল্লীমাতা আপনার সকল সন্তানকে একটি স্নেহের বাঁধনে বাঁধিয়া যেন এক করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবস্থার তারতম্যে এমন সুগভীর ব্যবধান তখনকার পল্লীজীবনে ছিল না। তাঁতী, ধোপা, নাপিত সকলেই যেন আপনার জন। এই সহজ একতাকে তখন সাধ্য সাধনা করিয়া আনিতে হইত না—ইহা স্নেহমুগ্ধা পল্লীজননীর স্বহস্তের দান।

সকলই হারাইয়া, শুধু তখনকার সুখ, দুঃখ, আশা, ভয়, হাসি, কান্নার শতস্মৃতি বুকে ধরিয়া, আমাদের গ্রামখানি যেন নীরবে দাঁড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার পশার যথেষ্ট; বিধাতার কৃপায়, আমার অর্থের কোন অভাব নাই। সৎকার্য্যে মুক্তহস্তে দান করিতে, আমি কখন কুণ্ঠিত হই না; এবং জনসমাজে আমি "স্বদেশ-হিতৈষী" বলিয়া প্রখ্যাত।

কলিকাতায় আমি একাকীই আছি। আমার নব-পরিণীতা পত্নী পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে আমি অনেক স্বদেশী মোকদ্দমা লইয়াছি এবং অজাত-গুম্ফ অনেক বালক আসামীর পক্ষে আমি দাঁড়াইয়াছি।

একবার আমি এক পুলিসমারা মোকদ্দমায় আসামীর পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলাম। আসামী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে সে কোন মেলাতে জনৈক লবণ বিক্রেতার বিলাতী লবণ জোর করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে এবং পুলিস বাধা দেওয়াতে সে পুলিসকে "নির্দ্দয়রূপে" প্রহার করিয়াছে।

আসামী মুক্তকণ্ঠে, দৃঢ়স্বরে বলিল—"আমি জোর করে বিলাতী নুন ফেলে দিই নাই। লবণবিক্রেতাকে আমাদের অনুরোধে সম্মত করে, তার সমস্ত নুনের দাম তাকে দিয়ে, আমরা বিলাতী নুন ফেলে ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলাম। পুলিস আমাদের বাধা দেয়। আমরা তার কথায় কর্ণপাত না করে মেলায় যা'তে বিলাতী জিনিস বিক্রী না হয়, তার চেষ্টা করি। পুলিস আমাদের অভদ্রভাবে গালি দেয়, আর আমাদের মধ্যে একটি ছোট ছেলেকে মারে। আমি তখন পুলিসকে উচিত শিক্ষা দিতে চেষ্টা করি। পুলিস বালকটিকে একবার মেরেছিল, আমি তাকে তিনবার মেরেছিলাম। আমার তিন ঘা খেয়েই পুলিস পড়ে গেল এবং উঠেই দৌড় দিল। আমার সঙ্গীরা তখন কিছু দূরে ছিলেন।" ইহা বলিয়া বালক নির্ভীকভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল।

আমি বুঝিলাম, এই মিথ্যা মোকদ্দমা হইতে আমার মক্কেলকে রক্ষা করিতে পারিব না। বালকও তাহা জানিত। পুলিস বহু সাক্ষী যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল। তবু, যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম; কিন্তু হায়! পারিলাম না। সেই সরল, নির্ভীক বালক হাস্যমুখে শুনিল—তাহার তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

সকলে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া লাহিড়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। আমি বালকের জন্ম হৃদয়ে বেদনা ও শুভকামনা লইয়া, ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম। আমার মনের মধ্যে গানের সেই পদটি গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে;
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।"

(২)

গতবৎসর পূজার আগে আমার শাশুড়ীঠাকুরাণীর পত্র পাইলাম। এবার পূজায় বাড়ী যাইবার জন্ম তিনি বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার স্নেহের অনুরোধে আমি যাওয়াই ঠিক করিলাম।

শ্বশুরালয়ের সকলের জন্ম যথোপযুক্ত দ্রব্যাদি লইয়া এবং আমার শ্বশুর-কন্যার জন্ম স্বদেশী দোকান হইতে বহুমূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, এসেন্স আদিতে বাক্স পূর্ণ করিয়া, আমি শুভ-যাত্রা করিলাম।

পূজার উৎসবে গ্রামখানি আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে। ধনী, দরিদ্র, ছোট, বড় সকলের মুখই হাস্যোজ্জ্বল।

যথাসময়ে শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়া, গুরুজনের পদধূলি লইলাম। আমার শ্বশুর-পুত্র-পুত্রিগণ আমাকে ঘিরিয়া গল্প করিতে বসিয়া গেলেন। সকলেই আগ্রহের সহিত 'স্বদেশীর' কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রভাবতী বলিলেন—"আচ্ছা, স্কুলের ছাত্র, শিক্ষকদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেবার নিষেধসূচক যে সার্কুলার জারি করেছে, তার কি হল? আমাদের কোন কোন মাননীয় নেতা তো স্কুল, কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন। তাঁরা—আশা করি সমস্ত শিক্ষকই—এই অন্যায় জুলুম অবশ্যই মানেন না। তাঁদের ধরে জেলে পুরছে না যে?"

আমি বলিলাম—"কোন স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে হুকুম এসেছিল যে সেই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন; সুতরাং কেন তাঁরা তাড়িত হবেন না তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ উচিত কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন; একান্ত বিনীতভাবে তাঁরা এই জবাব দিয়েছিলেন যে কোন ব্যক্তির চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সমুচিত মনে করেন না; বরং তাঁরা বিদ্যালয় তুলে দেবেন, তবুও এমন লজ্জাকর কার্য্য করবেন না। তার পর থেকে সব চুপ।"

প্রভাবতী হাসিয়া বলিলেন—"বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা থেকে স্কুলের নাম কাটিয়ে দেয় না কেন?"

আমি বলিলাম—"তাতে তাদের কোন লাভ নেই। তা করলে, ন্যাশানাল য়ুনিভার্সিটি দ্বারা আঁকিয়ে উঠ্‌বে।"

সকলে হাসিতে লাগিলেন।

সুবোধ বলিল—"তবু করে কেন? ওদের এ জুলুম তো কেউই মানে না—দিন দিন আরো মানবেনা। তবু করে লাভ কি?"

আমি বলিলাম—"যখন করে রাখ্‌বার চেষ্টা। ঈশ্বরের ইঙ্গিতে দেশে যখন জাগরণ আসে, তখন যে তার বিরুদ্ধে শত অত্যাচার ব্যর্থ হয়ে যায়, সে জ্ঞান নাই। এই অত্যাচারেই দেশের লোকের সাহস বাড়্‌ছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি জন্মাছে।"

সুবোধ—"আচ্ছা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না কেন? এখন তো জেলায় জেলায় জাতীয় বিদ্যালয় হওয়া উচিত।"

আমি বলিলাম—"হচ্ছে,—অনেক জায়গায় হয়েছে—হবে। জাতীয় বিদ্যালয়কে সফল করে তোলা—এই তো নেতাদের এখন একটা প্রধান কাজ।"

সন্ধ্যা হইল। কুললক্ষ্মিগণ মঙ্গলশঙ্খ বাজাইয়া ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিলেন। আমরা কয়েকজন উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। মেয়েরা আপন কাজে চলিয়া গেলেন।

আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম, স্বদেশী আন্দোলনে গ্রামখানি বেশ সজীব। দরিদ্র কেহ এক পয়সার বিদেশী দ্রব্য কেনেন না এবং তাঁহারা যা করেন, তা ধর্ম্মভাব হইতে করেন। এই সব শিক্ষাহীন পল্লিসন্তানগণ বুঝিয়াছেন যে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিলে তাঁহাদের অধর্ম্ম হইবে; সুতরাং স্বদেশী আন্দোলনকে তাঁহারা সরল বিশ্বাস হইতে আপনাদের ধর্ম্মের মধ্যে স্থান দিয়া লইয়াছেন।

তাঁদের দুটি ভাব খুব দৃঢ় দেখিলাম। বিলাতী নুন ও চিনি পরিষ্কার করিতে যে হিন্দু, মুসলমানের অস্পৃশ্য গরু, শূকরের অস্থি ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন। আর, বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার করিলে দেশের গরীব তাঁতী, শিল্পিকে মারা হয়, তাহাও তাঁহারা সরলভাবে বুঝিয়া, ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া, স্বদেশী প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন।

একবার কোন দোকানদার "স্বদেশী" বলিয়া বিলাতী চিনি বিক্রয় করিয়াছিল। সেই হইতে গ্রামবাসী সকলে চিনি পরিত্যাগ করিয়া গুড় ধরিয়াছেন। দেখিলাম, ধনীর গৃহিণীরাও তাঁহাদের অতি সাধের "ক্ষীরের চাঁচ," "চন্দ্রপুলি" "নারিকেলনাড়ু" প্রভৃতি গুড়যোগে প্রস্তুত করিয়া, হাসিমুখে, অতিথি, আত্মীয়, গরীব, দুঃখীকে খাওয়াইতেছেন এবং প্রতিবেশীর ঘরে বিতরণ করিতেছেন।

গ্রামের যুবকদল একটী ব্যায়ামসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গ্রামের উচ্চশিক্ষিত যুবকদল, কৃষক, তাঁতী, ধোপা, নাপিত প্রত্যেকের গৃহ হইতে বলবান ব্যক্তিকে এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

সূর্য্যের প্রখর তেজে একটু স্নিগ্ধতার ছায়া পড়িলেই, সকলে আসিয়া খোলা মাঠে দাঁড়াইলেন। আমি যখন দেখিলাম যে দরিদ্র কৃষকসন্তান এবং বি,এ, উপাধীধারী ধনীসন্তান সকলে একসঙ্গে, একই বেশে, অনাবৃত দেহে, মালকোঁচা বাঁধিয়া, লাঠি খেলিতেছেন, কুস্তি করিতেছেন, তখন একই কালে আমার মনে একটি আনন্দ ও ধিক্কার জাগিয়া উঠিল। আমার "বাবু" জনোচিত, কোমল দেহে রেশমের চাদরখানা, সোণার চেন, স্বর্ণাঙ্গুরী প্রভৃতি জামাতৃবেশ আমাকে ক্রমাগত ধিক্কার দিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

এই সব শিক্ষিত যুবকদল পাঠ সমাপনান্তে, পূজার বন্ধে, স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া পল্লিসংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন। গ্রামের কোথাও আগুণ লাগিলে, ব্যায়ামসমিতির সভ্যদল আগুণ নিভাইতে ছুটিয়া যান। দুর্ভিক্ষপীড়িত আর্ত্তের ইহারা বন্ধু, শিক্ষাহীন দরিদ্রের ইঁহারা শিক্ষক। প্রয়োজন হইলে, স্বহস্তে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, কূপ খনন প্রভৃতি কার্য্য করিতে ইঁহারা সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাহাতে তাঁহাদের গ্রাজুয়েটত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না। কারণ বি-এ, এম-এ, উপাধিধারী এই সকল যুবকগণ "বাবু" নহেন,—ইঁহারা দীনা ভারতমাতার সন্তান মাত্র।

অন্ধকারের আবরণ একটু গাঢ় হইলে আমরা সকলে বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। পথে সেই সকল গ্রাম্য যুবকদের চোখের দিকে তাকাইতেও আমি কেমন লজ্জিত হইতেছিলাম। নানা কথার পর একজন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"শুনুন, জামাই "বাবু", 'বাবু' কথাটা আমাদের দেশে কেমন করে এল বলতে পারেন?"

একেত আমি বালকের কৌতুকদৃষ্টির নীচে কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় এক রহস্যপ্রিয় যুবক বলিতে লাগিলেন—

"কোন শুভক্ষণে এক দীর্ঘ কাছাকোঁচাধারী, শিখাবিশিষ্ট, তৈলচিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালীকে দেখে জনৈক সাহেব নন্দন বলে' উঠেছিল—"বেবুন! বেবুন!" সেই হ'তে শ্রীমুখের সেই বাণীকে আমরা অঙ্গের ভূষণ করেছি। কালক্রমে বেবুনের "ন"টা ক্ষয়ে গিয়েছে এবং সে "বাবু" রূপ ধারণ করেছে।"

আর একজন বলিয়া উঠিলেন—"আমি একজন খুব বিজ্ঞলোকের মুখে আর এক কথা শুনেছি। ইংরেজ আগমনের সেই প্রথম যুগে, কোন শ্বেতাঙ্গ এক সহরবাসী ধনীসন্তানের বিলাসীজনোচিত, সুচিক্কণ বেশভূষা দেখে বলেছিলেন—"Bah! beau!" "বাহবা রসিকছোক্‌রা!" শ্বেতমুখনিঃসৃত সেই বিদ্রূপ বা

ঘৃণার বাণী পরম গৌরবান্বিত রাজটীকা স্বরূপ আমাদের ললাটে শোভা পাচ্ছে! ইংরেজ ঘৃণা করে দেশীয়দিগকে 'বাবু' বলে, আর গরীব স্বদেশিগণ নিজেদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক জীব মনে করে, সুন্দর বেশভূষাধারীদের 'বাবু' বলে। এখন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে তফাৎ করছে এই 'বাবু' আখ্যা।"

নির্জ্জন রাত্রিতে, সকলে শুইলে, আমি আমার পত্নীর সাক্ষাৎ পাইলাম। আজ তাঁহার বেশ দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। একখানি সাদাসিধে কাপড় পরিয়া, বস্ত্রাঞ্চল মাথায় টানিয়া, তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন। আজ কেহ তাঁহাকে বহু ধীরে, বহু যত্নে সাজাইয়া দেয় নাই; সযত্নে কবরী বাঁধিয়া দিয়া, ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগের মধ্যে কেহ একটি সিন্দুরের বিন্দু আঁকিয়া দেয় নাই, আজ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারের ভারে প্রপীড়িত নহে।

প্রথম সম্ভাষণের পর, আমি তাঁহার জন্য আনীত উপহারগুলি একে একে বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলাম। উপহারগুলি দেখিয়া তাঁহার চোখ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আমি সস্নেহে চোখের জল মুছাইয়া দিয়া, তাঁহার অশ্রু বিসর্জ্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—"তুমি কেন এসব আন্‌লে? দুর্ভিক্ষে লোক না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, দেশের কত দুঃখ, দুর্দ্দশা, তুমি তো সবই জান। এখন কি বিলাসিতা কর্‌বার সময়? দুমুঠো অন্নের জন্য শত শত লোক মারা যাচ্ছে—আমি কি করে এসব পর্‌ব?"

হঠাৎ একটা লজ্জা আসিয়া আমার বুকে ঘা মারিল। আমি বলিলাম—"তুমি কি করতে বল? তুমি যা বল্‌বে আমি তাই কর্‌ব।"

বালিকা ধীরে ধীরে বলিলেন—"এগুলি দুর্ভিক্ষ তহবিলে পাঠিয়ে দাও। আমার তো এতে কোন দরকার নেই।"

তাহাই হইল। পরদিন অতি সঙ্গোপনে তাঁহার অলঙ্কারাদি দুর্ভিক্ষপীড়িতের সেবার্থে পাঠাইয়া দিলাম; আর সেই দিন আমার দেহ হইতে স্বর্ণ চেন, সোণার আংটি ইত্যাদি অন্তর্হিত হইল।

অলঙ্কারগুলি পাঠাইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কে প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী,—আমি; না শিক্ষা, সভ্যতাহীনা এই সরলা পল্লিবালিকা!

এবার আবার পূজা আসিয়াছিল। ঘনকৃষ্ণ মেঘ দেশের মাথার উপরে ভ্রূকুটিকুটিললোচনে তাকাইয়া আছে, ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্র ভারতবাসীর সম্মুখে বিস্তৃত, দেশের হৃদয়ে আজ বেদনা পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আবার শরৎ আসিল, শেফালিরাজি আবার মাতার কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া দিল, আনন্দ উৎসব লইয়া, পূজা আসিতে দ্বিধা করিল না।

এবার আমি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম। সহর ছাড়িয়া পূজার উৎসবে যাইবার অবসর হয় নাই। আর, এই দিনে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিবার স্পৃহাও ছিল না। আমি শুধু ভাবিয়াছি, এবার আমার পত্নীকে পূজার কোন্ উহার দিব।

মাতৃসেবার জন্য জাতীয় পতাকাতলে যাঁহারা আহূত, যাঁহাদের জন্য শত হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা জাগিতেছে, দেশকে যাঁহারা মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন, সেই সেবকাশ্রমের সেবকদলের সেবার্থে এবারকার সমস্ত অর্থ পাঠাইয়া দিলাম।

ইহাই এবার সেই বালিকার প্রতি আমার পূজার উপহার।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

সিপাহী বিদ্রোহের অজ্ঞাত ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৮৫৭ সালের ভীষণ বিপ্লবের সময় চতুঃসপ্ততি সংখ্যক সৈন্য দলের সার্জ্জন মিঃ ব্যাট্‌সন এদেশীয় লোকদিগের সহায়তায় তাঁহার পরিত্রাণের সম্বন্ধে যে অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন তাহা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই চিত্তাকর্ষক। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই সকল নিরক্ষর গ্রামবাসীগণ জানিত না যে এইরূপ দুর্দ্দিনে বিপন্ন ইংরাজদিগকে আশ্রয় দান করিলে তদানীন্তন কালের গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন; কারণ তখন সমগ্র দেশ অরাজকতায় পরিপূর্ণ; বর্ত্তমান কালের ন্যায় তখন সংবাদপত্রের কোনও প্রচলন ছিল না; জনসাধারণ রাজনীতি কি তাহা বুঝিত না এবং তাহার সহিত কোনও প্রকার সংস্রবও রাখিত না; তাহারা সোজাসুজি বুঝিত যে "জোর যা'র মুল্লুক তা'র"। মোগল বাদসাহদিগের সৈন্য বল ছিল তাই তাহারা একদিন হিন্দুদিগের নিকট হইতে রাজতক্তখানা কাড়িয়া লইয়াছিল; কিছুদিন মোগলেরা তাহা ভোগ করিল বটে, কিন্তু শেষে সাগরপার হইতে অধিকতর বলশালী ইংরাজ আসিয়া মোগলদিগের নিকট হইতে দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া লইল; আবার আজ ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে এ দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাজসিংহাসন দখল করিয়া বসিয়াছে। এই ভাবেই সে সময় রাজনীতির মীমাংসা হইত।

এইরূপ গোলমালের মধ্যে গ্রাম্য লোকেরা একদিন অবাক হইয়া শুনিল যে কোম্পানীর মুল্লুক গিয়াছে এবং হিন্দুস্থান বিদ্রোহী সিপাহী সৈন্যদিগের দখলে আসিয়াছে; দিল্লীর সিংহাসনে জরাজীর্ণ বাহাদুর সাহ পুনরায় অধিষ্ঠিত হইয়া দেশ শাসনের বিধি ব্যবস্থা করিতেছেন। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, মহলায় মহল্লায় বৈঠক বসিল এবং সেই বৈঠকে সকলে নিঃশব্দে শুনিয়া গেল যে কোম্পানীর রাজত্ব গিয়াছে; গোঁড়াদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, "আঃ—কেরেস্তানের রাজ্য গেল না বাঁচা গেল।

অনুসন্ধিৎসু যদি কেহ এই বিষয় লইয়া একটু অধিক আলোচনার প্রবৃত্তি দেখাইত তাহা হইলে গ্রামের অতি-বুদ্ধির দল তাড়া দিয়া বলিতেন যে দেশে অরাজকতা আসিয়াছে, বেশী গোল করিলে সিপাহীরা সকলকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। সমগ্র দেশের যখন এই অবস্থা তখনও এ দেশের লোক বিপদাপন্ন ইংরাজ নরনারীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদিগের সম্মুখে পুরস্কারের কোনও প্রলোভন ছিল না; কারণ যাহাদিগকে তাহারা রক্ষা করিত তাহাদিগের অধিকাংশই হয়ত কপর্দ্দকশূন্য পথের ফকীর এবং তন্মধ্যে অনেকেই হয়ত আবার উলঙ্গ অথবা একবস্ত্র পরিহিত। কোম্পানীর নিকট হইতেও কোন পুরস্কার লাভের আশা ছিল না; কারণ তখন হিন্দুস্থানে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হইয়াছিল এবং মুসলমানগণ পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়া লইয়াছিলেন; এমন অবস্থাতেও কেন যে হিন্দুস্থানের সমগ্র লোক বিপন্ন এবং বিতাড়িত ইংরাজদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার একটী গূঢ় কারণ আছে।

আবহমান কাল হইতে অতিথিপরায়ণ ভারতবর্ষে শরণাগতকে রক্ষা করা এবং নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং এই ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য কোন বিপদকেই হিন্দুস্থানের লোক বিপদ বলিয়া গ্রাহ্য করে নাই। শরণাগতকে রক্ষা করিতে যাইয়া যদি সর্ব্বস্ব যায়—এমন কি প্রাণও যদি বিপন্ন হয়—তাহা হইলে জীবন দিয়াও তাহা করিতে হইবে, ইহাই হিন্দুদিগের চিরন্তন শিক্ষা। তাই, বিপন্ন হইয়া যখন কেহ

হিন্দুর গৃহে আসিয়া আশ্রয় লয়, তখন কেমন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে গৃহের সকলের তখন তাহাই একমাত্র ধ্যান ও ধারণার বিষয় হইয়া উঠে; এই প্রকৃতিগত ধর্ম্মভাবের জন্য অতীত কালে একদিন শিবি রাজা শরণাগত কপোতকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার শরীরের মাংস কাটিয়া অতিথিকে দান করিয়াছিলেন এবং সেই হইতে এই হিন্দুস্থানের গৃহে গৃহে কত অতিথিবৎসল নরনারী আর্ত্তজনকে রক্ষা করিবার জন্য নিজেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, কেহ তাহার সংবাদ রাখে না এবং জগতের নিকট সে সকল কাহিনী ঢাক, ঢোল বাজাইয়া প্রচার করিবার প্রয়োজনীয়তাও এদেশের লোক এতদিন বুঝে নাই। কিন্তু আজ যখন ঐতিহাসিকের নিকট সব বিষয়েরই একটা বুঝ-সমুঝ হইতেছে এবং নজীর ব্যতীত কোন প্রমাণই তাঁহার দরবারে মঞ্জুর হইতেছে না, তখন এ সকল কথা প্রমাণ, প্রয়োগ সহিত জনসমাজে প্রচার করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে নজীরাদি সহ অনেকগুলি কাহিনী সুপ্রভাতের পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছি। এবার আর একটী ঘটনা জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

সার্জ্জন মিঃ ব্যাট্‌সন ১৮৫৭ সালের আগষ্ট মাসে বিখ্যাত টাইমস্ পত্রে লিখিয়াছেন :—

অবরুদ্ধ দিল্লীর তোরণ দ্বার হইতে বাহির হইয়া আমি কর্ণালের অভিমুখে দ্রুতগতি দৌড়িতে লাগিলাম; পথে অনেকের নিকট হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমি ক্রমাগতই চলিতে লাগিলাম; হঠাৎ কয়েকজন পরিচিত কর্ম্মকারের সহিত সাক্ষাৎ হইল; ইহারা দিল্লীর বারুদের কারখানায় কাজ করিত। ইহাদিগের মধ্যে একজন আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সাহেব! আর এপথে বেশী অগ্রসর হইও না। সম্মুখের গ্রামে যে সকল মুসলমান আছে তাহারা সুযোগ পাইয়া চারি দিকে লুঠপাঠ করিতেছে এবং আবার নবাবী আমল ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া অনেকে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; এ সময় তোমাকে দেখিতে পাইলেই তাহারা হত্যা করিয়া ফেলিবে।"

ভয়ে আমার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল; আমি হতাশ হইয়া বলিলাম, "তাহা হইলে এখন উপায়?" সেই লোকটী বলিল—

সাহেব! তুমি ভয় করিও না; আমার সহিত আমাদিগের গ্রামে চল, আমি তোমাকে খাওয়াইব এবং আশ্রয় দিব। আমি আনন্দের সহিত তাহার ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। যখন তাহাদিগের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, তখন গ্রামস্থ সকলে আসিয়া আমার বিপদের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিল এবং বিশেষ দয়ার্দ্রচিত্তে আমার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিতে লাগিল। একজন আমার পরিধেয় বস্ত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া একখানি ধুতি আনিয়া দিল; অপর একজন একটী শিরস্ত্রাণ জুটাইয়া দিল এবং অবশিষ্ট লোকেরা আমার আহারের আয়োজন করিতে লাগিল; খাদ্যাদির বিশেষ কোনও আড়ম্বর ছিলনা; কারণ দরিদ্র পল্লীবাসীরা মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য কোথায় পাইবে? আমার জন্য কিছু দুধ ও রুটী আনিয়া দিল; তাহাই তখন আমার নিকট অমূল্য বলিয়া মনে হইল। এতক্ষণ পরে আমার যেন মনে হইল যে এইবার আমি নিরাপদ হইয়াছি; সমস্ত দিনের দারুণ উত্তেজনায় এবং দুর্ভাবনায় আমার শরীর ও মন উভয়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; আমার আর কথা বলিবারও সামর্থ্য ছিল না; আমার আশ্রয়-দাতাগণ আমাকে একখানি খাট আনিয়া দিল এবং আমি তাহার উপর শুইয়া পড়িলাম; কিন্তু নানারূপ চিন্তায় সে রাত্রি আর নিদ্রা যাইতে পারিলাম না।

পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বেই চারিদিক হইতে লোক জমা হইতে লাগিল; আমি যে ডাক্তার, একথাও গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং সেই গ্রামের চৌধুরীও এই ফিরিঙ্গী ডাক্তারকে একবার দেখিতে আসিলেন। পথশ্রম জনিত ক্লান্তিতে এবং নানারূপ দুশ্চিন্তা একেই আমি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা

উপর আবার নানাদিক হইতে সমাগত লোকদিগের উপর্য্যুপরি প্রশ্নে একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। যখন তাহারা দেখিল যে আমি তাহাদিগের ভাষা বেশ স্বচ্ছন্দে বলিতে ও বুঝিতে পারি এবং তাহাদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি সম্বন্ধেও সমুদয় সংবাদ রাখি, তখন তাহাদিগের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। সর্ব্বোপরি, আমি যখন আবার তাহাদিগের বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্মের সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, তখন তাহারা একেবারেই গলিয়া গেল এবং বলিল যে যেমন করিয়াই হউক তাহারা আমাকে রক্ষা করিবে। আমি যখন এই গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলাম তখন শুনিলাম যে অষ্টাত্রিংশত সংখ্যক পদাতিক সৈন্যদলের সার্জ্জন ডাক্তার উড্ পাঁচ ছয় মাইল দূরে সমরপুর নামক গ্রামে আহতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। আমি তাঁহার জন্য কিছু সময়োপযোগী ঔষধ পাঠাইয়া দিলাম; কিন্তু তিনি পাইলেন কিনা তাহা আর বুঝিতে পারি নাই। এইখানে থাকিতে আরও শুনিলাম যে কর্ণেল রিপ্‌লিও সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া অন্য এক স্থানে পড়িয়া রহিয়াছেন। আমি গ্রামবাসীদিগকে বলিলাম যে কর্ণেল রিপ্‌লি একজন বিখ্যাত যোদ্ধা; যদি তাহারা কোনরূপে তাঁহাকে খাদ্যাদি দিয়া আসিতে পারে, তবে গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে প্রভূত পুরস্কার দিবেন এবং ভগবান বিশেষরূপে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। গ্রামস্থ লোকজন কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহাকে খাদ্যাদি দিয়া আসিয়াছিল; তাহার পর আমি স্থানান্তরে গমন করায়, তাঁহার আর কোনরূপ সংবাদ লইতে পারি নাই। কয়েক দিন পরে বিপদের আশঙ্কা হওয়ায় আমি বদরী নামক গ্রামে প্রস্থান করিলাম। এইখানে থাকিবার কালে শুনিলাম যে বিদ্রোহিগণ মীরাট, আম্বালা, ও কলিকাতার সমুদয় ইংরেজদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহ রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন; এবং চারিদিকে ঘোষণা জারী হইয়াছে যে যদি কেহ কোনও ইংরাজকে গৃহে আশ্রয় দেয় অথবা লুকাইয়া রাখে, তাহা হইলে তাহার ত সর্ব্বনাশ হইবেই, পরন্তু সে গ্রামও ধ্বংস করিয়া ফেলা হইবে।

বদরী গ্রামের অধিবাসিগণ এই ঘোষণার কথা শুনিয়া আমার জীবনের জন্য বড়ই ভীত হইয়া পড়িল; তাহাদিগের পরামর্শানুসারে রাত্রির অন্ধকারে আমি তাহাদিগের গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম। সঙ্গীরা বহু দূরে আমাকে এক আম্র কাননের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন এবং সেইখানেই গাছের ঝোপের মধ্যে বসিয়া বসিয়া আমি দিন কাটাইতে লাগিলাম। সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতাম; সন্ধ্যার পর সুদূর পল্লী হইতে গ্রামবাসিগণ আমার জন্য খাদ্যাদি আনিয়া দিয়া যাইত এবং ঘড়ায় করিয়া পানীয় জল বহিয়া আনিত। এ কয়েক দিন আমি যে কি ঘোরতর মানসিক দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিয়াছি, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করিতে পারি না। সমুদয় দিন রৌদ্রে অনাবৃত স্থানে গাছের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিতাম। আবার রাত্রিতে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতাম; কিন্তু তখনও নিস্তার ছিল না। একটু অধিক রাত্রি হইলেই শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি নিশাচর জন্তুগণ স্বচ্ছন্দমনে এই সকল স্থানে বিচরণ করিতে আসিত; সুতরাং আমাকে আবার বাধ্য হইয়া আমার পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিতে হইত। এইরূপে ক্রমাগত পাঁচ দিন, পাঁচ রাত্রি আমি আম্র বৃক্ষের ঝোপের মধ্যে কাটাইয়া দিলাম। আমি যে কি কষ্টে এই কয় দিন কাটাইয়াছিলাম, তাহা এক ভগবান ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারিবে না।

পাঁচ দিন লুকাইয়া থাকিবার পর, গ্রামবাসিগণ পুনরায় আমাকে গৃহে লইয়া গেল এবং ভূষি পরিপূর্ণ এক ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল; কারণ তখনও সিপাহীদিগের গুপ্তচর গ্রামে গ্রামে ইংরাজদিগের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল। এই ঘরের মধ্যে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। সে যন্ত্রণা আমি জীবনে কখনও ভুলিব না। হিন্দুস্থানীদিগের গৃহ একে ত অতীব ক্ষুদ্র; তাহাতে আবার দরজা জানালার বাহুল্য একেবারেই নাই। এইরূপ এক ক্ষুদ্র দেশ-

য়ালের ঘরে বিস্তর ভূষি সঞ্চিত ছিল; তাহারই মধ্যে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। অতিরিক্ত গরমে এবং বদ্ধ বাতাসে আমার নিঃশ্বাস এক একবার বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল; এক এক সময় মনে হইতে লাগিল যে এই স্থান অপেক্ষা আমবাগান আমার পক্ষে শতগুণে ভাল ছিল। যাহা হউক, এই ঘরের ভিতর একদিন বদ্ধ থাকার পর আমি পুনরায় আলো এবং বাতাসের মধ্যে আনীত হইলাম। পৃথিবীর আলোকরশ্মি পুনরায় দেখিতে পাইয়া আমি যেন নবজীবন লাভ করিলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। হঠাৎ এক গুজব শুনিতে পাইলাম যে পলাতক ফিরিঙ্গীদিগকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য চারিদিকে সিপাহীরা ঘুরিতেছে এবং এই গুজব বাহির হইবার পর দিনই শুনিলাম যে এক দল সওয়ার সত্য সত্যই এই গ্রামে আসিতেছে। গ্রামস্থ সকলেই স্থির করিলেন যে অতঃপর আমার পক্ষে বদরী গ্রামে থাকা আর কোনও মতেই নিরাপদ নহে; তখন আমাকে বদরী হইতে স্থানান্তর করিবার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। এই গ্রামে একজন ফকীর বাস করিতেন; সকলে পরামর্শ করিয়া সেই ফকীরের সহিত আমাকে পাঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। বন্ধুগণ আমার জন্য যে বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাই গেরুয়া রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া ফকীরের বেশ প্রস্তুত করা হইল; তা'রপর রুদ্রাক্ষের মালা আনা হইল; সকলে মিলিয়া আমাকে একজন সাধুর বেশ পরাইয়া দিলেন। এইরূপে সন্ন্যাসীর বেশে সজ্জিত হইবার পর আমি আমার পথপ্রদর্শক ফকীরের সহিত রওনা হইলাম। আমরা গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হইলে, চারিদিক হইতে বালক, বৃদ্ধ, যুবক সকলে আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিত এবং নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। অনেকেই আমাদিগকে সাধু, সন্ন্যাসী ভাবিয়া যথেষ্ট সম্ভ্রমের সহিত কথাবার্ত্তা বলিত; গ্রামের কেহ বা খাবার, আবার কেহ বা পয়সা আনিয়া দিত এবং এইরূপে স্বচ্ছন্দে আমাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত। আমাকে সকলে সাধারণতঃ কাশ্মিরী যোগী বলিয়া জানিত; যাহাদিগের নিকট অধিক পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িত, তাহাদিগকে বলিতাম যে আমি একজন দাদুপন্থী ফকির। সন্ন্যাসীর বেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইবার ফলে পল্লীর সাধারণ লোকদিগের মনের ভাব জানিবার আমার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এইরূপ অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে হিন্দু আছে তাহারা সকলেই মুসলমানদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করে এবং ফিরিঙ্গীদিগের আচার, ব্যবহার, এবং ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের কোন সহানুভূতি না থাকিলেও ইংরাজ রাজ্য যাহাতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সমুদয় হিন্দু প্রাণে প্রাণে তাহাই আকাঙ্ক্ষা করে। পরন্তু যেখানেই মুসলমানদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে সেইখানেই দেখিয়াছি তাহারা আমাদিগের এই সর্ব্বনাশে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছে এবং এই সকল মুসলমান, অসহায় ইংরাজদিগের প্রতি কোনরূপ ঘৃণিত অত্যাচার করিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করে না। আমি একজন সন্ন্যাসী হইলেও আমার নিকট এই সকল মুসলমান ইংরাজদিগের প্রতি যেরূপ জঘন্য অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, তাহা মনে হইলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে।

এইরূপ ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন এক গ্রামে উপস্থিত হইলে সেখানকার কয়েকজন লোক আমাকে এক কবীরপন্থী সাধুর আশ্রমে লইয়া গেল; এই সাধুর নাম সেবক দাস; ইনি আমাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। আমি তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া বলিলাম যে আমি একজন কাশ্মির-দেশীয় দাদুপন্থী যোগী। কিন্তু তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন কাশ্মীরদেশীয় লোকের চক্ষু কি নীলবর্ণ হয়? অতঃপর আমাকে আর কথা বলিবার অবসর না দিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ! তোমার হাবভাব কথাবার্ত্তা, পোষাক, পরিচ্ছদ ইত্যাদি সবই ঠিক

হইয়াছে; কিন্তু, তোমার ঐ সুনীল চক্ষু দুটীই তোমাকে ধরাইয়া দিয়াছে। আমার নিকট গোপন করিতে চেষ্টা করিও না—তুমি নিশ্চয়ই একজন পলাতক ফিরিঙ্গী।"

সেই মূহুর্ত্তে সেখানে যদি বজ্রপাত হইত তাহা হইলেও আমি অধিকতর বিস্মিত হইতাম না। আমার অবস্থা দেখিয়া সেবকদাস আমাকে অভয় দিয়া বলিলেন—"আমার নিকট আসিয়া যখন পৌছিয়াছ, তখন তোমার আর কোন ভয় নাই।" আমি তাঁহার স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বরে এবং সদয় ব্যবহারে আশ্বস্ত হইলাম এবং সমুদয় কথা তাঁহার নিকট অকপটে খুলিয়া বলিলাম এই সন্ন্যাসীর আশ্রমে কিছুদিন পূজা, অর্চ্চনা, এবং সেবা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কাটাইলাম; কত লোক এই দাদুপন্থী ফকীরের নিকট হইতে নানাবিধ আশীর্ব্বাদ মাগিয়া লইয়া যাইত।

এইখানে থাকিতে থাকিতে শুনিলাম যে ভাগ্যলক্ষ্মী আবার ইংরাজদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন; সিপাহীরা চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে এবং এক বিরাট ইংরাজবাহিনী মীরাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত, ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক অন্নের সন্ধান পাইলে যেমন তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, আমিও তেমনি বহুকাল স্বজাতি এবং আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার পর হঠাৎ অতর্কিত ভাবে তাহাদিগের সন্ধান পাওয়ায়, সকলের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। উঃ! সে যে কি ব্যগ্রতা, তাহা আমি কাহাকেও এখন বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। সন্ন্যাসী আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একজন চেলাকে আমার সঙ্গে পাঠাইলেন; সেই আমার পথপ্রদর্শক হইল। আমি এই ফকীরের সহিত হরচাঁদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং এইখানে এক জমীদারের বাড়ীতে পরম যত্নে অবস্থান করিতে লাগিলাম। শুনিলাম যে রাহু নামক স্থানে ইংরাজ সৈন্যদের হেড্ কোয়ার্টার স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহারই চারিদিকে ইংরাজ সৈন্যগণ শিবির সন্নিবেশ করিয়া আছে। হরচাঁদপুরের জমিদার এইখান হইতে ক্যাপ্টেন এণ্ড্রুর নিকট আমার আগমনের সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং পর দিনই ঝিন্দ্এর রাজার একশত ফৌজ আসিয়া আমাকে রাহুতে লইয়া গেল। আমি ইংরাজ শিবিরে পৌছিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গোরার বেশ পরিধান করিলাম এবং পরক্ষণেই বন্দুক হস্তে করিয়া নেটিভ বধ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হইলাম।

(ক্রমশঃ।)

ভারতের অধঃপতন।

[আজমীরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ সর্দার B A., M. R. A. S. &c. মহাশয় সম্প্রতি Hindu Superiority নামে একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের আর্য্যগণ যে পুরাকালে জগতের অপর সকল জাতি অপেক্ষা কি সাহিত্যে সভ্যতায়, কি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কি আচার ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহারা যে জগতের গুরুস্থানীয় ছিলেন, এই পুস্তকে তাহা বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে গ্রন্থকার য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ হইতে রাশি রাশি প্রমাণ উদ্ধার করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, এই পুস্তক ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত। শুনিতে পাইতেছি, জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই পুস্তক শিক্ষকদিগের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী গ্রন্থকারের সদয় অনুমত্যনুসারে এই গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া দিলাম।]

প্রাচীন ভারতবর্ষের বিষয়ে যাঁহারা কিছুমাত্র অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে এই ভারতভূমি প্রকৃতই বীরপ্রসবিনী ছিল। ভারতের ক্ষত্রিয় জাতি শৌর্য্য, বীর্য্য, ও সাহসে জগতে অতুলনীয় ছিলেন। অথচ এই দেশ বিদেশীয় কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বিজিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল, দেখা যায়। ইহার কারণ কি?

বলিতে কষ্ট হয় যে আত্মদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতাই চিরকাল ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে গ্রীস-দেশীয় দিগ্বিজয়ী মহাবীর সেকন্দর সাহ (আলেকজাণ্ডার) খৃঃ পূঃ তিন শতাব্দীতে ভারতাক্রমণ করিয়া পঞ্চনদ-প্রদেশের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। ভারতীয় আর্য্যের পক্ষে বিদেশীর হস্তে এই প্রথম পরাজয়। যদি আর্য্য নরপতিদিগের মধ্যে একতা থাকিত, যদি তাঁহাদিগের মধ্যে মিত্রতা থাকিত, তাহাহইলে সেকন্দর সাহ কদাপি একটী যুদ্ধেও জয়লাভ করিতে পারিতেন না। জর্ম্মান-দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত অধ্যাপক মক্ষ ডাঙ্কার (Max Dunker) বলিয়াছেন যে পঞ্চনদ প্রদেশের ভূস্বামিগণের পরস্পর বৈরিতা ও মনোমালিন্য থাকায়, সেকন্দর সাহের পক্ষে জয়লাভ করা অধিকতর সহজ ও সম্ভবপর হইয়াছিল। * ভারত ইতিহাসে সুবিজ্ঞ সার উইলিয়ম হাণ্টার লিখিয়াছেন যে তক্ষশীলার হিন্দুনরপতি মফীশ নিজের পঞ্চসহস্র সুশিক্ষিত সৈনিক সমভিব্যাহারে সেকন্দর সাহর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। † মক্ষ ডাঙ্কার লিখিয়াছেন যে পঞ্চনদ প্রদেশের ক্ষুদ্রক এবং মালব দলপতিদ্বয় প্রথমে নিজ নিজ পূর্ব্ববৈরিতা বিস্মৃত হইয়া সাধারণ দেশ-শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন ; কিন্তু অনতিবিলম্বেই ক্ষুদ্রকগণ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক পলায়ন করেন। মালবগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের ধনুর্মুক্ত শরজালদ্বারা সেকন্দর ও তদীয় সেনাপতি আব্রিয়ল আহত হন। ‡ তক্ষশীলার রাজা মফীশ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তের সহিত সেকন্দরের দল পুষ্ট করিয়া পঞ্জাবপতি মহাবীর পুরুরাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। একেইত পুরুরাজের সৈন্য-সংখ্যা অপেক্ষা সেকন্দরের সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণ ছিল ; তদুপরি, তক্ষশীলাধীপতি এবং তাঁহার অনুগত সামন্ত রাজগণের অগণ্য সেনা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করায়, সেকন্দর সাহ পুরুরাজকে সহজেই পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পঞ্চনদের ভূপতিবৃন্দ যদি আত্মকলহে ও পরস্পর শত্রুতায় মত্ত না হইতেন, তাহা হইলে ভারতের সর্ব্বনাশ হইত না। পুরাকালে মহাবলপরাক্রমশালিনী, এসিরিয়াধীশ্বরী, অতিগর্ব্বিতা সেমিরামিশ ভারতাক্রমণ করিতে আসিয়া যেরূপ লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইয়াছিলেন, এ সময়ে ভারতে একতা থাকিলে, সেকন্দর সাহকে ও তদ্রূপ দুর্গতি ভোগ করিতে হইত, সন্দেহ নাই। আর্য্যবীরগণ চিরকাল সাহসী ও সরল ছিলেন। শত্রুর সহিত ও বঞ্চনা অথবা নিষ্ঠুরতা করিতেন না। সেকন্দর সাহ এই বিজয়-ব্যাপারে অতিশয় ঘৃণিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ ও তাঁহার এই আচরণের যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। বঞ্চনা দ্বারা তিনি দেশজয় করিয়াছিলেন। পরাজিত নাগরিকগণ তাঁহার নিকট সন্ধি ও আশ্রয় ভিক্ষা করিলে, তিনি তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরে সেই বিশ্বস্ত ও নিরস্ত্র নাগরিকদিগকে সহসা আক্রমণ করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে বধ করিয়া, তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠণ করেন।

সেকন্দর সাহর ভারতবিজয়ের পর ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অতুল বিক্রম, অদ্ভুত পরাক্রম, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহস, ও শৌর্য্য ইত্যাদি গুণগ্রাম যেন ভারতীয় আর্য্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইয়া অপর জাতিকে আশ্রয় করিল। অবশেষে, অনেক দিন পরে, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেমন একবার বেগে জ্বলিয়া উঠে, আসন্নমৃত্যু মানবের মুখে যেমন মৃদুহাস্যরেখা ক্ষণতরে ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ আর একবার আর্য্য-গৌরবশ্রী শেষ উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছিল। উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় আর্য্যজাতির গৌরব

* Max Dunker's History of Antiquity, Vol. IV. P. 391.
† Imperial Gazetteer, "India" P. 262.
‡ Max Dunker's History of Antiquity, Vol. IV. P. 404.

তেজোবীর্য্য পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর চোহান-কুল-তিলক পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের সহিত আর্য্য সূর্য্য চিরাস্তমিত হইল এবং ভারত চির অধীনতাপাশে বদ্ধ হইল।

বাস্তবিকপক্ষে, বীর-গৌরব পৃথ্বীরাজ শেষ স্বাধীন হিন্দু সম্রাট। ইতিহাস তাঁহার বীরত্বের প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার গৌরবময়ী শৌর্য্যকাহিনী কবির অমর লেখনীতে অঙ্কিত রহিয়াছে। মুসলমান আক্রমণকারিগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছিলেন। সুলতান মুজীদ্দীন সাম বহুবার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন ; কিন্তু প্রত্যেকবারেই পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। * রাজপুতানায় প্রবাদ আছে যে পৃথ্বীরাজ প্রবলপ্রতাপ সাহেবউদ্দীন ঘোরীকে পরাস্ত ও কারারুদ্ধ করিয়া রাজধানীতে আনয়ন করেন এবং রমণীর পরিচ্ছদে তাঁহাকে নগর পরিভ্রমণ করাইয়া মুক্তি প্রদান করেন। †

সম্মুখ সংগ্রামে এই মহাবীরের পতন হয় নাই। আত্মদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা হইতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। যদি রাঠোর জয়চাঁদ, অনহলওয়ারা পত্তনের নাচাশয় ভূপতি, এবং হাওলীরাও হামীর বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক শত্রুপক্ষ অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস বিভিন্নরূপে লিখিত হইত, সন্দেহ নাই। ঐ সকল মাতৃদ্রোহী পাপাত্মারাই পরামর্শ করিয়া জননী জন্মভূমির পদে দাসত্বশৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছিল। বসুন্ধরে! তোমার সর্ব্বংসহা নাম সার্থক, সন্দেহ নাই।

কান্যকুব্জাধীশ্বর, রাঠোর-কুল-পাংশুল জয়চন্দ্রের অলোক-সামান্য দুহিতা সংযুক্তাদেবীর স্বয়ম্বরের উপাখ্যান এখন পৃথিবী বিখ্যাত হইয়াছে। সাম্রাজ্য-মদমত্ত, গর্ব্বিত জয়চন্দ্র যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় 'রাজচক্রবর্ত্তী' উপাধীলাভের নিমিত্ত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে অসামান্যা সুন্দরী, ললনাকুল-ললাম, সংযুক্তার স্বয়ম্বরের আয়োজন করেন। সংযুক্তাদেবীর অলোক-সামান্য রূপলাবণ্য ও গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া ভারতের অসংখ্য নরপতি জয়চন্দ্রের সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকারও করেন নাই এবং সভাস্থও হন নাই। সংযুক্তাদেবী পৃথ্বীরাজের প্রতি অনুরাগবতী ছিলেন ; পৃথ্বীরাজও তাঁহাকে লাভ করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। পৃথ্বীরাজ রাজসূয়ে অনুপস্থিত হওয়ায় পাছে রাজসূয় যজ্ঞে বিঘ্ন আপতিত হয়, তন্নিমিত্ত জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের এক কাঞ্চনময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া ঐ যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং নিজ অবিমৃষ্যকারিতা ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পৃথ্বীরাজের প্রতি অবহেলা ও অবমাননা প্রদর্শনাভিপ্রায়ে ঐ কাঞ্চন প্রতিমা সভার দ্বারদেশে দৌবারিকের আসনে স্থাপিত করেন।

যথাকালে স্বয়ম্বরোৎসব উপস্থিত হইল। পুরাকালে বৈদর্ভী দময়ন্তী যেমন ইন্দ্রাদি দিক্পালবর্গকে উপেক্ষা করিয়া নিজ অভিমত পাত্র নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মীর-অবতার রুক্মিণী দেবী যেমন পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির অনুজ্ঞায় কর্ণপাত না করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সংযুক্তাও তদ্রূপ স্বয়ম্বর সভায় সমবেত নৃপতিগণকে উপেক্ষা করিয়া সভার দ্বারদেশে অবস্থিত পৃথ্বীরাজের সুবর্ণময়ী প্রতিমার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। ক্ষোভে, রোষে, ও অপমানে উপস্থিত রাজগণ কোলাহল করিয়া উঠিলেন— জয়চন্দ্র কোপে জ্বলিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পৃথ্বীরাজ রুক্মিণী-স্বয়ম্বরে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, সুভদ্রা-পরিণয়ে অর্জ্জুনের ন্যায়, অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া সংযুক্তাকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থিত হইলেন। জয়চন্দ্র ও সমবেত রাজগণ এই বিষম অবমাননার প্রতিশোধ মানসে সসৈন্যে পৃথ্বীরাজের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। দ্রৌপদীস্বয়ম্বরে লক্ষ রাজগণের সহিত অর্জ্জুনের যাদৃশ ভয়াবহ সংগ্রাম হইয়াছিল, কান্য-

* Ayeen Akbari, Gladwin's Edition P 97.
† Tod's Rajsthan, Vol. I, P. 257.

কুক্ষে সেই ভীষণ সমর-নাটকের পুনরভিনয় হইল। একদিকে সম্রাট্-পদবী-লোলুপ, প্রবলপ্রতাপ কান্যকুব্জাধিপতি ও স্বয়ম্বর সভায় সমবেত ভারতের প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ; অপর দিকে কতিপয় অনুচরমাত্র সমভিব্যাহারে একাকী পৃথ্বীরাজ। কেশরী যেমন নিজ বিক্রমে গজযূথকে পরাস্ত ও বিদ্রাবিত করে, পৃথ্বীরাজও তদ্রূপ নিজ অসামান্য বীরত্বে ও অতি দুর্দ্দম বাহুবলে সমস্ত শত্রুব্যূহকে ছিন্নভিন্ন ও পরাস্ত করিয়া নবপত্নীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু, হায়! এই বিজয়ই তাঁহার কালস্বরূপ হইল। বীরত্বের এই অতুলনীয় উদাহরণ দেখাইয়া তিনি জগতে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন হারাইতে হইল। পাঁচদিন ধরিয়া এই লোমহর্ষণ সংগ্রাম চলিয়াছিল এবং এই কালসমরে তাঁহার সাম্রাজ্যের সুদূর-স্তম্ভ-স্বরূপ চতুরঙ্গিনী সেনার সেনাপতি শতাধিক সামন্ত-রাজ ভূশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আত্মদ্রোহ ও গৃহবিবাদরূপ বিষবৃক্ষ অচিরকাল মধ্যেই মুকুলিত হইয়া উঠিল। জয়চন্দ্রের চক্রবর্ত্তীত্ব লাভের আশা সমূলে বিনষ্ট হইল, কন্যা শত্রু-হস্তগত হইল। রোষে, ক্ষোভে, ঈর্ষ্যায় জয়চন্দ্র আগ্নেয় পর্ব্বতের ন্যায় অন্তরে অন্তরে পুড়িতে লাগিলেন এবং পরিশেষে যে ভীষণ অগ্নি উদ্গীরণ করিলেন, তাহাতে শত্রু, মিত্র, ও স্বদেশ সমস্ত ভস্মীভূত করিয়া পরিশেষে তাহাকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিল। সংযুক্তা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীরাজ নাগোর নামক স্থানে প্রায় এক কোটী সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হন। তাঁহার শত্রুপক্ষ জয়চন্দ্র, পত্তনের রাজা, ও হাম্মীর ষড়যন্ত্র করিয়া আফগান ভূপতি সাহেবউদ্দীন ঘোরীকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। পরিশেষে, বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মবিবাদের ফলে, বিজয়লক্ষ্মী পর অঙ্কগত হইল। কিছুদিন পরে জয়চন্দ্র "খাল কাটিয়া কুমীর আনার" ফলভোগ করিলেন।

মোগলকুলপতি বাবর যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখনও গৃহবিবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার সহায়তা করিল। রাণা সংগ্রাম সিংহকে পরাস্ত করিয়া ভারতের সিংহাসন অধিকার করা বাবরের অসম্ভব অপেক্ষাও অসম্ভব ছিল। তাঁহার পক্ষাবলম্বী একজন সৈনিকও কিছুমাত্র জয়ের আশা মনে স্থান দেন নাই। কিন্তু কয়েক শত বৎসর পরে পলাশী ক্ষেত্রে মিরজাফর যে নীতি অবলম্বন করিয়া নিজ দেশ, জাতি, ও বংশের মুখে কলঙ্ক কালিমা লেপিয়াছিল; পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক তুয়ার-সামন্ত শীলাইদী ঠিক সেই লীলা অবলম্বন করিয়া প্রভুর সর্ব্বনাশ করিল। সংগ্রামসিংহের অঙ্কগত-প্রায় বিজয়লক্ষ্মী বাবরের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলেন। ভারতের পদে শৃঙ্খলের উপর শৃঙ্খল পড়িল!

মহাভারতে এই আত্মদ্রোহের আরম্ভ,—এই আত্মদ্রোহের ফলেই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পুরুরাজ, পৃথ্বীরাজ, সংগ্রাম সিংহ বিদেশীর হস্তে পরাস্ত হন নাই; স্বদেশী, স্বজাতি, সহোদরই তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। হায় মা! আত্মহত্যাই কি তোর নিয়তি!

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

গুর্জ্জর ভূমি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

খানখানানের সৈন্যদল ব্রোচ অধিকার করিল। সুলতান মুজাফ্ফর অল্প সৈন্যদল লইয়া নানাস্থানে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপর নবনগরে জামের (রাজা) আশ্রয় লাভ করিলেন। কিন্তু যখন খানখানানের সৈন্যদল অগ্রসর হইল, সুলতান নবনগরের জামের আশ্রয় বিচ্যুত হইলেন। জাম (রাজা) খানখানানকে একটী হস্তী এবং অনেক অশ্ব উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন।

এত বিপদেও সুলতান উদ্যম বিহীন হইলেন না। তিনি পরাস্তিজে যাইয়া আশ্রয় লাভের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তথা হইতেও তিনি বিদূরিত হইলেন এবং তাঁহার অবশিষ্ট অনুচরবর্গের মধ্যে অনেকের প্রাণনাশ ঘটিল।

ইতিমধ্যে খানখানান দিল্লী গমন পূর্ব্বক সম্রাট আকবরের নিকট সম্মানসূচক অনেক উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া গুজরাটে প্রত্যাগমন করিলেন। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে খানখানান পুনরায় সম্রাটের পুত্র মুরাদের বিবাহ উপলক্ষে দিল্লী গমন করেন। সেই সময় মির্জা আজিজ কোকা মালবের শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া গুজরাটের শাসনভার প্রাপ্ত হন।

সুলতান মুজাফ্ফর ইতিমধ্যে নবনগরের জামের ও অন্যান্য কয়েকটী রাজার সাহায্যে কাঠিওয়ার প্রদেশ হস্তগত করিতেছিলেন।

মির্জা আজিজ কোকা ধ্রোল নামক স্থানে তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। মির্জা আজিজ কোকার সৈন্যদল নবনগর লুণ্ঠন করিয়া জুনাগর অভিমুখে যাত্রা করিল। অল্প আয়াসেই ঘোগী, মঙ্গলুর, সোমনাথ ইত্যাদি ১৯টী উপকূল-বন্দর অধিকার করিল। সেই সময় সংবাদ আসিল, সুলতান ওখা নামক স্থানে লুক্কায়িত আছেন। মির্জা আজিজ কোকার পুত্র কিছু সৈন্য লইয়া শত্রুর আশ্রয়দাতা, তথাকার অধীপতি সজা জাগীলকে হত্যা করিল। সুলতান কাচে পলায়ন করিলেন।

মির্জা আজিজ কোকার পুত্র যখন কাচে গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় কাচের রাজা বরমলজীর সৈন্যদল সুলতান মুজাফ্ফরকে বন্দী করিয়া তাঁহার করে সমর্পণ করিল। সুলতানকে লইয়া তিনি রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেদিন সমস্ত রাত্রি সৈন্যদল অগ্রসর হইয়া ধ্রোল নামক স্থলে আসিয়া পৌছিল। সেখানে সুলতান কোন বিশেষ কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বৃক্ষান্তরালবর্ত্তী হইয়া ছুরিকা দ্বারা গলদেশ ছিন্ন করিয়া জীবনলীলা পরিসমাপ্ত করিলেন (১৫৯২ খৃষ্টাব্দ)।

ছিন্ন মস্তক সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইল। ইহার পর হইতে গুজরাটে স্বাধীন সুলতানবংশের অবসান হইল। প্রথম যে মুজাফ্ফর সাহ কর্ত্তৃক গুজরাটে স্বাধীন সুলতান সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হয়, তাহা হইতে শেষ মুজাফ্ফর সাহ তৃতীয় মুজাফ্ফর সুলতান বলিয়া পরিচিত। ইনি আমেদাবাদ সিংহাসনে আরূঢ় সুলতানগণের মধ্যে দ্বিতীয় মুজাফ্ফর।

কিছুকাল পরে মির্জা আজিজ কোকা মক্কা চলিয়া গেলে, সম্রাট্ তদীয় পুত্র মুরাদকে গুজরাটের শাসনভার অর্পণ করিলেন। মুরাদ যখন গুজরাট এবং মালবের সৈন্যবাহিনী লইয়া দাক্ষিণাত্য-জয়ে প্রবৃত্ত ছিলেন—সেই সময় যোধপুরের রাজা সূর্য্যমল্ল গুজরাটের শাসনকার্য্য পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে, শেষ সুলতান মুজাফ্ফর সাহর পুত্র বাহাদুর তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনী দুটীকে লইয়া প্রমার বংশীয় একজন জমিদারের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। রাজকুমার মুরাদ গুজরাটের অধিকাংশ সৈন্য লইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছেন শুনিয়া, বাহাদুর অল্প কিছু সৈন্য লইয়া গুজরাট আক্রমণে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু সূর্য্যমল্লের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ণ করিলেন। ইহার পর ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর কাম্বে ধ্বংস করিয়া ১৪ দিনের জন্য অধিকার করিয়া রাখেন। তৎপর, ইহাদের সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর সম্রাট আকবর সাহ পরলোক গমন করিলেন।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজগণ আকবর বাদসাহের নিকট হইতে সুরাট এবং কাম্বে উপকূলের অধিকার প্রাপ্ত হয়।

১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি Best এর অধিনায়কতায় ৪ খানি যুদ্ধ জাহাজ সুরাট বন্দরে উপনীত হইয়া পোর্ত্তুগীজদিগকে পরাভূত করিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজদিগকে ক্ষমতাশালী বুঝিয়া তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধি অনুযায়ী ইংরেজগণ সুরাট, কাম্বে, ঘোগী, ও আমেদাবাদে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল এবং একজন ইংরেজ দূত দিল্লীর রাজদরবারে অবস্থান করিবে এই নিয়ম স্থির হয়।

১৬১৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর "সার টমাস্ রো" ইংরেজরাজ জেম্‌সের (I) দূত স্বরূপ সুরাটে উপনীত হন এবং ইহার কিছুদিন পরে আজমীরে যাইয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর গুজরাটে আগমন পূর্ব্বক ৯ মাস অবস্থান করেন। সেই সময় নূরজাহান বেগম কিছুকাল গুজরাটের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আগ্রা প্রত্যাগমন কালে সাজাহান গুজরাটের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হন। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে গুজরাটে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময়, সাহায্যকল্পে, তিনি সাহীবাগে একটি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করেন।

ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে, সাজাহান হস্তী আরোহণ করিয়া ইহা দেখিতে গেলেন; কিন্তু রাজপ্রাসাদের বহিঃস্থ সিংহদ্বার নিম্ন হওয়ায় তাঁহার প্রকাণ্ড হস্তী তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। সাজাহান হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া আর এ রাজ-প্রাসাদ দেখিলেন না। ইহা অব্যবহার্য্য অবস্থায়ই পড়িয়া রহিল। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সাজাহান দিল্লীর তক্তে সম্রাট পদাভিষিক্ত হইলেন।

১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আজিমখান গুজরাটের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি একটী প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন।

সম্রাট সাজাহানের সময় গুজরাটের বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা "সাতআশীরাকাল" বা ১৬৮৭ সম্বতের (১৬৩১—৩২ খ্রীষ্টাব্দের) ভীষণ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষে গুজরাটের ভীষণ লোকক্ষয় সংঘটিত হইয়াছিল। সম্রাট এই সময় ৫০ সহস্র টাকা বিতরণ করেন এবং ভিক্ষা বিতরণের জন্য স্থানে স্থানে শস্য ভাণ্ডার খোলেন। তবুও স্থানে স্থানে রাস্তাঘাট মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার আরংজেব গুজরাটের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তাহার সময় সিয়া এবং সুন্নি মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হওয়ায় এবং সারসপুরে জৈনগণের চিন্তামণি মন্দির ধ্বংস করায়, ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সাজাহান তাহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন।

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে, রাজকুমার মুরাদ গুজরাটের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহান বিশেষরূপ পীড়িত, এই সংবাদ পাইবা মাত্র রাজকুমার মুরাদবক্স তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং সুরাটে যাইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা ও করসী বেগমের গৃহ লুণ্ঠণ করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তৎপর আমেদাবাদের ধনী শান্তিদাসের নিকট হইতে ৫৫০,০০০ টাকা ও তাহার সহকারীর নিকট হইতে ৪০০০ টাকা এবং শমল প্রভৃতি অনেক লোকের নিকট হইতে ৮৮,০০ টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রভূত সৈন্যবল লইয়া ভ্রাতা আরঙ্গেবের সহিত সম্মিলিতসূত্রে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আজমীরের যুদ্ধে রাজকুমার দারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক স্ত্রী, পুত্র সহিত অত্যল্প সৈন্য লইয়া, ৮ দিন ৮ রাত্রি কঠোর পরিশ্রম ও বিপদ সহ্য করিয়া, আমেদাবাদে আশ্রয়লাভার্থ আসিয়া উপনীত হইলেন। দারা এবং আরংজেব উভয়ের শ্বশুর সাহ নওয়াজ খান আমেদাবাদের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত ছিলেন। সাহ নওয়াজ খান কনিষ্ঠ জামাতার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক নগরীর দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন।

দারা নিরুপায় হইয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে পাঞ্জাব অভিমুখে পলায়ন করিলেন। (১)

সম্রাট আরঙ্গেবের রাজত্ব কালে গুজরাটের শাসনকার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইত। আরঙ্গেবের অত্যাচারমূলক শাসনকার্য্যে কেহই সন্তুষ্ট ছিলেন না। দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র শক্তির অভ্যুত্থান সংঘটিত হইলে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী মহাত্মা শিবাজী, ৪ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ৬ দিবস ক্রমাগত সুরাট লুণ্ঠণ পূর্ব্বক ১০ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া চলিয়া গেলেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় শিবাজী সুরাট লুণ্ঠণ করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান।

মহারাষ্ট্রদিগের শক্তি সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা স্বায়ত্বাধিকার বিস্তারে প্রবৃত্ত হন। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ সুরাট হইতে ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী পারনীরা নামক দুর্গ অধিকার করেন। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি হাম্বির রাও এবং ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর পুত্র শম্ভূজী ব্রোচ লুণ্ঠণ করিলেন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া বালাজী আমেদাবাদ হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী বটোয়া নামক স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া লুণ্ঠণ করিয়া যান।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ও সেনাপতি খান্দেরাও ধাবাড়ের প্রযত্নে মহম্মদ সাহকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া গুজরাটের কোন কোন স্থানের চৌথ ও কোন কোন স্থানের সরদেশমুখী প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধে দামাজী গাইয়োকাড় খুব কৃতীত্ব দেখাইয়াছিলেন বলিয়া মহারাজা শাহু তাঁহাকে গুজরাটের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের ভার প্রদান করেন। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে দামাজীর মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পিলাজী গাইয়োকাড় তৎপদে অভিষিক্ত হন।

সেই সময় নিজাম-উল-মুল্ক সম্রাট মহম্মদ সাহকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্ত হইতে মুক্তিদান করিয়া মন্ত্রীপদ এবং মালব ও গুজরাটের শাসনভার প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে নিজাম্-উল্ মুল্ক্ মন্ত্রীপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হায়দ্রাবাদে আসিয়া নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে, মহম্মদ শাহ ফারমান দ্বারা শিরবুলন্দ নামক এক ব্যক্তিকে গুজরাটের শাসনভার প্রদান করেন। শিরবুলন্দ সুজাতখান নামক এক ব্যক্তিকে গুজরাটে প্রেরণ করেন। সুজাতখান আমেদাবাদের সন্নিকটবর্ত্তীস্থলে নিজাম্-উল্ মুল্ক্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা হামিদ খান কর্ত্তৃক নিহত হন এবং তদীয় ভ্রাতা রস্তম আলী পিলাজীর বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধে পরাজিত হন। সেই সময় পিলাজী এবং শাহুর অন্য একজন কর্ম্মচারী কান্থোজী কদম উভয়ে গুজরাটের চৌথ * এবং সরদেশমুখী † উপভোগ করিতে লাগিলেন।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে শিরবুলন্দ স্বয়ং সকলকে পরাজিত করিয়া গুজরাটের শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

বর্ষাকাল গত হইলে মহারাষ্ট্র সৈন্য ক্রমাগত গুজরাটের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। তখন শিরবুলন্দ পিলাজীকে মাহী নদীর দক্ষিণস্থ সমুদয় স্থানের চৌথ এবং সরদেশমুখী প্রদান করিলেন। সেই সময় পেশোয়া বাজীরাও পিলাজীকে দমন করিবার জন্য তদীয় ভ্রাতা চিমনজী আপাকে বিপুল সৈন্যবাহিনী সহিত প্রেরণ করিলেন। চিমনজী আপা পেটলাভ ও চোলকা ইত্যাদি স্থল অধিকার করিলে, শিরবুলন্দ পেশোয়াকেই চৌথ এবং সরদেশমুখী প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। পেশোয়া গুজরাটের শান্তিরক্ষাকল্পে ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়োগ করিলেন। পিলাজী গাইয়োকাড় পরবর্ত্তী দুই বৎসর পর্য্যন্ত বড়োদা এবং ধবই অধিকার করিয়া রহিলেন। কন্থোজী কদম চাম্পানীর অধিকার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

(১) বারনিয়ার (Bernier) সাহেব তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়াছেন। তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

* চৌথ—রাজস্বের এক চতুর্থাংশ।

† সরদেশমুখী—রাজস্বের এক দশমাংশ।

শিরবুলন্দ মহারাষ্ট্রদিগের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিলেন। দিল্লীর সম্রাট যোধপুরের রাণা অভয়সিংহকে গুজরাটের শাসনভার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করিলেন।

রাণা অভয়সিংহ দুইবারই শিরবুলন্দের নিকট পরাজিত হইয়া সন্ধি অনুযায়ী একলক্ষ টাকা শিরবুলন্দকে পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক গুজরাটের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। সেই সময় মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে আত্মকলহ সূচিত হয়। পিলাজী গাইয়োকাড়, ত্রৈম্ব্যক রাও ধাবাড়ে, এবং কন্থোজী কদম পেশোয়া শক্তির বর্দ্ধিষ্ণুতার প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া বাজীরাওএর বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিতে প্রস্তত হন। বাজীরাও অবিলম্বে সৈন্যবাহিনী লইয়া গুজরাট অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি নর্ম্মদা নদী পার হইয়াই পিলাজীর পুত্র দামাজীকে পরাজিত করেন। তৎপর ভিলাপুরের নিকটবর্ত্তীস্থলে ত্রৈম্ব্যক ধাবাড়ের সৈন্যদল, কন্থোজীর সৈন্যদল, ও পিলাজীর সৈন্যদল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এই যুদ্ধে ধাবাড়ে নিহত এবং পিলাজী ও তৎপুত্র দামাজী আহত হন। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এই যুদ্ধে বাজীরাও গুজরাট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি ধাবাড়ের শিশুপুত্র যশোবন্ত রাওকে তদীয় পিতৃপদে অভিষিক্ত করিলেন। গুজরাটের চৌথের অর্দ্ধাংশ মহারাজা শাহুর নিকট প্রেরিত হইবে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল ; এবং পিলাজী যশোবন্ত রাওয়ের সহকারী পদে নিযুক্ত হইলেন এবং "সেনা খাসখেল" এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

অভয়সিংহ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক পিলাজীকে হত্যা করিলে, ত্রৈম্ব্যক ধাবাড়ের বিধবা পত্নী উমাবাই কন্থোজী কদম ও পিলাজীর পুত্র দামাজীকে সঙ্গে করিয়া অভয়সিংহের বিরুদ্ধে আমেদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে নগরী আক্রমণ পূর্ব্বক অত্যাচার আরম্ভ করিলে, অভয়সিংহ চৌথ এবং সরদেশমুখী ব্যতীত আরও ৮০হাজার টাকা প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। সেই সময় পিলাজীর ভ্রাতা মহারাজজী গাইয়োকাড় বরোদা অধিকার করেন। তদবধি ইহা গাইয়োকাড়ের শাসনাধীনে আছে।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট রাণা অভয়সিংহের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কাম্বের শাসনকর্ত্তা মমিন খাঁকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করেন। মমিন খাঁ দামাজী গাইয়োকাড় ও রঙ্গজীর সাহায্যে অভয়সিংহের নিযুক্ত কর্ম্মচারী রতনসিংজীকে পরাস্ত করিয়া আমেদাবাদ অধিকার করিলেন। মমিন খাঁ দামাজীকে আমেদাবাদ ও তৎসন্নিকটস্থ স্থান ব্যতীত অন্য স্থানের রাজস্বের অর্দ্ধাংশ দিতে স্বীকৃত হইল। মমিন খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে বলিয়া, দিল্লীর সম্রাট নিজাম্-উল্-মুল্ক্‌কে মালব এবং গুজরাটের বন্দোবস্ত ঠিক করিবার জন্য আহ্বান করেন। নিজাম-উল-মুল্ক বাজীরাওয়ের সহিত যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে মালব সাম্রাজ্যের এবং চম্বেল ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী সমুদয় স্থানের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কিছুকাল পরে মমিন খাঁর মৃত্যু হইল।

ফকিরুদ্দৌল্লা দিল্লী হইতে আমেদাবাদের শাসনভার গ্রহণের জন্য প্রেরিত হইলেন। দামাজী সে সময় সেতারায় ছিলেন। তাহার অবর্ত্তমানে তদীয় ভ্রাতা খান্দেরাও ফকিরুদ্দৌল্লাকে সাহায্য করিয়া রঙ্গাজী রাওএর স্থলে তদীয় একজন কর্ম্মচারীকে আমেদাবাদে রাজস্বভাগ গ্রহণের জন্য নিযুক্ত করিলেন।

দামাজী অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তদীয় অসন্তুষ্ট ভ্রাতা খান্দেরাওকে বর্ষাদ দুর্গ ও নড়িয়াদ জিলা প্রদান করিয়া বিবাদ আপোষে নিষ্পত্তি করিলেন। তৎপর ফকিরুদ্দৌল্লাকে শাসনকর্ত্তা বলিয়া অস্বীকার পূর্ব্বক, মমিন খাঁর ভ্রাতা ও পুত্রের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে বাজীরাও এর মৃত্যু হইল। তৎস্থলে বালাজীবাজীরাও পেশোয়া নিযুক্ত হইলেন। মহারাজা শাহুর মৃত্যু হইলে, শিবাজীর পুত্র রাজারামের বিধবা স্ত্রী শাহুর দত্তক পুত্রকে পেশোয়ার অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য দামাজীকে আহ্বান করিলেন।

বালাজী বাজিরাও দামাজীকে পরাস্ত পূর্ব্বক বন্দি করিয়া পুনার দুর্গে প্রেরণ করিলেন এবং বিগত কয়েক বৎসরের প্রাপ্য মহারাজার চৌথ স্বরূপ চাহিলেন। দামাজী ১৫ লক্ষ টাকা প্রদান পূর্ব্বক নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। অতঃপর এই স্থির হইল যে দামাজী এবং পেশোয়া গুজরাট অর্দ্ধেক হিসাবে ভোগ করিবেন এবং দামাজী ১০ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা পোশোয়াকে সাহায্য করিবেন।

তৎপর ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে পেশোয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ রাও ও দামাজী সম্মিলিত হইয়া মহিমখাঁর ভ্রাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে আমেদাবাদ অধিকার করিয়া লইলেন। দামাজী ক্রমে ক্রমে খেরা, পাটন, বিজাপুর, বড়নগর, বিশালনগর ইত্যাদি হস্তগত করেন।

মহারাষ্ট্রশক্তি বিধ্বংশী পাণিপথের যুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্বে রঘুনাথ রাওএর সহিত তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব রাওএর বিবাদ আরম্ভ হয়। দামাজী রঘুনাথকে সৈন্যদল দ্বারা সাহায্য করাতে পেশোয়ার সৈন্যদল সে যুদ্ধে পরাস্ত হয়।

পেশোয়া দামাজীর প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া গুজরাটের দুইটী জেলা দামাজীর শাসন হইতে কাড়িয়া লইলেন। অতঃপর পেশোয়ার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রঘুনাথ ও দামাজীর পুত্র গোবিন্দরাও বন্দি হইলেন।

ইহার অত্যল্প কাল পরেই দামাজীর মৃত্যু ঘটিল।

দামাজীর মৃত্যু সময়ে দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দরাও পুনায় বন্দি অবস্থায় ছিলেন। গোবিন্দরাও, পেশোয়াকে অর্থদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া গুজরাটের শাসনভার গ্রহণ করেন। সেই সময় দামাজার অন্য পুত্র ফতেসিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিয়াজীর পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক বড়োদা অধিকার করিয়া লইলেন। কিছুকাল পর পুনার বিচারালয়ের শাস্ত্রী, সিয়াজীকেই দামাজীর ন্যায়তঃ উত্তরাধিকারী জানিয়া গোবিন্দরাওএর স্থলে সিয়াজীকে পুনঃ নিয়োগ করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফতেসিংহ সিয়াজীর কর্ম্মচারী রূপে গুজরাটে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

এদিকে বোম্বাইর ইংরেজগণ অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরেজগণ সুরাটে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করে। তথাকার নবাব ইংরেজদিগের হস্তে ক্রীড়াকন্দুকরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ব্রোচে ইংরেজগণ পরাজিত হয় ; পরবর্ত্তী বৎসর নবেম্বর মাসে তাহারা ব্রোচ অধিকার করিয়া লয়।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মাধবরাও পেশোয়ার ২৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু ঘটিলে, তদীয় একমাত্র পুত্র নারায়ণরাও খুল্লতাত রঘুনাথ রাও কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হন। রঘুনাথ রাও পেশোয়া পদে অভিষিক্ত হইয়া গোবিন্দরাও গাইকোয়াড়কে গুজরাটের গদিতে অভিষিক্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন। সেই সময় নারায়ণ রাওএর বিধবা স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রঘুনাথ রাও পুনা হইতে অল্প সৈন্য লইয়া পলায়ণপূর্ব্বক বরোদায় উপনীত হইলেন। ফতেসিং এবং গোবিন্দরাওএর সহিত বিবাদ আরম্ভ হইল। রঘুনাথরাও গোবিন্দরাওয়ের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন ; অধিকন্তু তিনি ইংরেজদিগের সাহায্য লাভ করিলেন। রঘুনাথরাও যুদ্ধে জয়লাভ করিলে মালসেতি, বেশিপ ও সুরাটের সন্নিকটবর্ত্তী কতকগুলি স্থান ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিবেন এবং ইংরেজগণ সৈন্য এবং অর্থ দ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করিবেন, এই মর্ম্মে সন্ধি স্থিরীকৃত হইল। ইতিমধ্যে পেশোয়ার সৈন্যদল হোলকার এবং সিন্ধিয়ার সাহায্য লইয়া রঘুনাথ রাওকে বরোদা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। রঘুনাথ কাম্বে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথাকার ইংরেজগণ তাঁহাকে সুরাটে প্রেরণ করিলেন। চারি দিন পরেই বোম্বাই হইতে ইংরেজের সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রঘুনাথ নড়িয়াদে আসিয়া অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে গোবিন্দরাও ও তদীয় খুল্লতাত খান্দেরাও ধাবাড়ের সম্মিলিত সৈন্যদল, পরাজিত হইয়া পালনপুরে পলায়ন করিল। এভাসয়ে আসিয়া ইংরেজ সৈন্যদলের সহিত পেশোয়া সৈন্যদলের যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পর রঘুনাথ রাও ও ইংরেজগণ পরা-

জিত হইয়া ব্রোচে আশ্রয় লইলেন। বর্ষাকাল সমাগত বলিয়া ইংরেজ সৈন্যদল বোম্বাই নগরে প্রত্যাগত হইল। রঘুনাথ রাও বিলাসপুরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থলে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক বর্ষাকাল যাপনে মনস্থ করিলেন।

ইতি মধ্যে পত্রদ্বারা ফতেসিংহ এর সহিত রঘুনাথ রাও ও ইংরেজদিগের সন্ধি বন্ধন স্থির হইল। সেই সময় রঘুনাথ রাও এবং ইংরেজদিগের সন্ধি বন্ধনসূত্রে কলিকাতা গবর্ণরজেনারেল সভা ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টএর সহিত মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। অতঃপর রঘুনাথ রাও সুরাটে যাইয়া ইংরেজদিগের সহিত নূতন সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হন;—রঘুনাথ রাও ইংরেজদিগকে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের রাজস্বের একদশমাংশ প্রদানে স্বীকৃত হইলেন; ইংরেজগণ তাঁহাকে শিশু পেশোয়ারের অভিভাবক পদে নিযুক্ত করিতে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল।

সেই সময় ইংরেজ এবং ফরাসিতে যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হয়। পেশোয়া ফরাসিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল, এবং বোম্বাই হইতে আগত ইংরেজ সৈন্যদল রঘুনাথ রাওকে পেশোয়ার অভিভাবক পদে নিযুক্ত করিতে গমন করিল। সেই সময় নানা ফরনবিশ শিশু পেশোয়ার পক্ষ হইয়া এই সন্ধি লইয়া ইংরেজদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন যে পেশোয়া, মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যে ফরাসীদিগকে স্থান দিবেন না, অপর পক্ষে—ইংরেজগণ রঘুনাথ রাওকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ইংরেজগণ ইহাতে স্বীকৃত হইল না। সেই সময় সংবাদ আসিল, নিজাম এবং মহিসুরের হায়দার আলি ফরাসিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। অবিলম্বে ইংরেজগণ গুজরাটে পেশোয়ার অধিকার খর্ব্ব করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা প্রথম সুরাটের সন্নিকটবর্ত্তী পেশোয়ার স্থান সকল অধিকার করিল, তৎপর ফতেসিংহ গাইকোয়াড়ের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমেদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী আমেদাবাদে পেশোয়ার নিযুক্ত সুবার নিকট হইতে নগরী অধিকার করিয়া লইল। এই হইতে প্রথম মহারাষ্ট্র সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই সময় সংবাদ আসিল, মহারাজজী সিন্ধিয়া এবং তুকাজী হোলকার ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া নর্ম্মদা পার হইয়া বরোদার নিকটবর্ত্তী স্থলে উপনীত হইয়াছে; ইংরেজ সেনাপতি সেদিকে অগ্রসর হইলে; সিন্ধিয়া ও হোলকার দুইবার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। ইংরেজ সেনাপতি গুজরাট রক্ষার্থ ফতেসিংহের অধিনায়কতায় কিছু সৈন্য রাখিয়া দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে পেশোয়ার সৈন্যদল ইংরেজদিগের হস্ত হইতে আমেদাবাদ অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়া পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইংরেজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের কিছুকাল যুদ্ধ চলিল। সিন্ধিয়া ও হোলকার পরাজিত হইয়া সন্ধি করিল। হায়দার আলি পরাজিত হইল। সিন্ধিয়া পেশোয়ার অভিভাবক নানা ফরনবিশের পক্ষ হইয়া গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্এর প্রতিনিধি ডেভিট এণ্ডারসনের সহিত সন্ধি বন্ধন স্থির করিলেন।

এই সন্ধি মর্ম্মে ইংরেজগণ সালমতি, এলিফেণ্টা কারনজা, হগদ্বীপ এবং ব্রোচ প্রাপ্ত হইলেন এবং বেসিন এবং অন্যান্য স্থান প্রত্যর্পণ করিলেন। রঘুনাথ রাও পেশোয়ার নিকট হইতে ২৫ হাজার টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং সিন্ধিয়ার সহিত তাঁহাকে বাস করিতে হইবে, স্থির হইল।

এই সন্ধিবন্ধনের কিছুকাল পরে রঘুনাথ রাওয়ের মৃত্যু ঘটিল।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শিশু পেশোয়া মাধোরাও নারায়ণের মৃত্যু হইলে রঘুনাথ রাওএর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজিরাও (দ্বিতীয়) পেশোয়া পদে অভিষিক্ত হইলেন।

ফতেসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মানাজী গাইকোয়াড় তৎপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু কিছুকাল পরে মহারাজজী সিন্ধিয়ার আনুকূল্যে অপর ভ্রাতা গোবিন্দরাও গাইকোয়াড় পেশোয়া দ্বারা সেই পদে অভিষিক্ত হন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দরাওএর মৃত্যু ঘটিলে

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দরাও তৎপদে অভিষিক্ত হন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগের হস্তে কিরকির যুদ্ধে বাজিরাওয়ের সম্পূর্ণ পরাভব সাধিত হইলে পেশোয়া শক্তির সম্পূর্ণ অবসান হয়। সমুদয় দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদিগের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইল। আমেদাবাদ, সুরাট, ব্রোচ, খেরা প্রভৃতি গুজরাটের সমুদয় স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একাধিপত্য সংস্থাপিত হয় এবং গাইয়োকাড়ের সহিত ইংরেজদিগের নূতন সন্ধি বদ্ধ হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

নক্ষত্র পরিবর্ত্তনশীল।

নক্ষত্রমণ্ডলী প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশূন্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। জগতে সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। মানবের কার্য্যকলাপেই কত পরিবর্ত্তন। মানবের জন্ম, মৃত্যু, মানব সাম্রাজ্যের উৎপত্তি, নিষ্পত্তি, এমন কি, মানবসভ্যতা-জ্যোতিঃ চরম বিকাশ লাভ করিয়াও আবার নিষ্প্রভ হইয়া যায়। কিন্তু, এত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও নক্ষত্র-দল সুদূর আকাশে, কাল এবং ধ্বংসকে অবজ্ঞা করিয়া, যুগ, যুগান্তর, হাসির কিরণ-ছটায়, জগত মুগ্ধ করিতেছে। মানুষের, শতাব্দীর পর শতাব্দী, কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছ; কিন্তু, উহাদের কোন পরিবর্ত্তন, স্থান-চ্যুতি, ও প্রভাব হ্রাস দৃষ্ট হইতেছে না; যেন উহারা অনন্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সমুদ্র এবং মহাদ্রির ন্যায়, অনন্ত যৌবনের অধিকারী। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে উহারা চিরকাল মানব-হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, এই দৃশ্যমান স্থান-নির্দ্দিষ্টতা এবং প্রভা সমতা বাস্তবের ঘটনা নহে। নক্ষত্র মণ্ডলী অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের ন্যায়, জন্ম, অভিব্যক্তি, ও পতন, এই বিশ্ব-নিয়ামক নীতি হইতে অব্যাহতি পায় নাই। স্থায়ুতা ও একভাবের পরিবর্ত্তে ভীষণ সঞ্চালন এবং পরিবর্ত্তনের ঘটনা আমাদের পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় না। নক্ষত্র সমূহের দূরত্ব এবং আয়তন বশতঃ, সাধারণতঃ, এই সকল সঞ্চালন এবং পরিবর্ত্তনের প্রকাশ এত সময় সাপেক্ষ যে, সমুদ্রোপকুল এবং পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায়, ব্যক্তিবিশেষ ও জাতিবিশেষের নিকট আকাশ-চিত্র অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া প্রতীত হয়। যুগ, যুগান্তরের অসমানে, সমুদ্রোপকুল, পর্ব্বতশ্রেণীর সীমা-রেখা, তারকা-সমূহের অবস্থিতি, বর্ণ, প্রভা, সবই পরিবর্ত্তিত হয়।

এই ঘটনাটীর আরও একটু আলোচনা করা যাক্। যদিও সমুদ্রের মুখমণ্ডল এবং পর্ব্বতের অবনতি (slope), সমগ্রভাবে, একই অপরিবর্ত্তনীয় দৃশ্য প্রদান করে, তথাপি যেমন তাহাদের স্থানে স্থানে, সাগরের তরঙ্গাবলীতে, জলরাশিতে, নদীসঙ্গমে, পর্ব্বতের অধোগামী ভূমিতে, সানু-প্রদেশে, পত্রদলের উজ্জ্বলতায়, দিনের সহিত, বৎসরের সহিত পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তেমনই যদিও সমগ্র নভোমণ্ডল একই উজ্জ্বল স্বর্গ-চিত্র প্রদর্শন করে, তথাপি এই দৃশ্যতঃ অপরিবর্ত্তনশীল স্বর্গচিত্রের মূলীভূত তারকা-সমূহের অন্যূন সংখ্যা মনুষ্যজীবনের স্বল্পকাল মধ্যেও এত দ্রুততা এবং শৃঙ্খলার সহিত অবস্থিতি ও দীপ্তিতে পরিবর্ত্তিত হয় যে পণ্ডিতগণ উহাদের পরিবর্ত্তন-নিয়ামক নীতি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

খৃঃ পূঃ ১৩০ অব্দে, পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের জন্মদাতা হিপারকাশ (Hipparchus) তাঁহার আকাশ-মান-চিত্রের সহিত এবং উজ্জ্বলতম নক্ষত্র-তালিকার সহিত, শতাব্দী-পূর্ব্ব তদ্রূপ মানচিত্রের তুলনা করিয়া, নক্ষত্রসমূহের উজ্জ্বলতা এবং অবস্থিতিতে বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনকাল মধ্যে, বৃশ্চিক মণ্ডলীতে (Scorpion Constellation) একটী নক্ষত্র হঠাৎ উদিত এবং তৎপরে ধীরে ধীরে পুনঃ নিষ্প্রভ হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এবম্প্রকার অত্যাশ্চর্য্য অসাধারণ ব্যাপার (যথা নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব এবং পুরাতনের তিরোভাব) প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে একের পর অন্য নক্ষত্রের এক একখানি মানচিত্র কিংবা তালিকা তৈয়ার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম নিষ্ফল হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত চারিটী "নূতন" অর্থাৎ অস্থায়ী (চলৎপ্রভ) নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল; এবং যদি 'ব্যাথেলহেম্' (Bethlehem) কতিপয় পণ্ডিতের মতানুসারে অস্থায়ী, উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে গৃহীত হয়, তাহা হইলে প্রাচীন জ্যোতিষের অভ্যুদয় হইতে নূতন জ্যোতিষের জন্মের মধ্যে, সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটী জাজ্বল্যমান নাক্ষত্রিক ব্যাপার পরিলক্ষিত হইয়াছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার এবং মানমন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতেও "নূতন" নক্ষত্রের সংখ্যা বড় বাড়ে নাই। এখন ঐন্দ্রজালিক ফটোগ্রাফীর আশীর্ব্বাদে, আর "নূতন" নক্ষত্র মানুষের হাত এড়াইতে পারিতেছে না; প্রায় প্রতি বৎসরই আবিষ্কৃত নক্ষত্রের সংখ্যা এক একটী করিয়া বাড়িতেছে। সেদিন যে পার্শিয়াস্ (Perseus) মণ্ডলীতে একটী বিখ্যাত নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ইহারাও ঐ নক্ষত্রের সমপ্রকৃতি এবং, সম্ভবতঃ, সমকারণ-সম্ভূত।

কখন একটী "নূতন" নক্ষত্র আকাশে উদিত হইবে, বলা অসম্ভব। তদ্রূপ, "নূতন" নক্ষত্রের উদয়ের পর, উহার ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্ণয় করা অসম্ভব। একটী "নূতন" নক্ষত্র বহুকাল পর্য্যন্ত উজ্জ্বল থাকিতে পারে, অথবা অচিরেই যে তিমির হইতে আসিয়াছিল, সেই তিমিরেই আবার ডুবিয়া যাইতে পারে কিংবা দক্ষিণ গগণস্থ বিখ্যাত 'ইটা আর্গাসে'র (Eta Argus) মত সময়ে সময়ে ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠিতে পারে। দেখিলে বোধ হইবে, যেন কোন "হনুমন্ত বিভীষণ" মধ্যে মধ্যে স্বীয় ফুৎকারে নাক্ষত্রিক বহ্নি সংক্ষুব্ধ করিতেছে। অথবা, কয়েকমাস ব্যাপিয়া ইহার জ্যোতিঃ হ্রাস হইতে থাকিবে; তৎপর হঠাৎ থামিয়া যাইবে। 'নূতন' নক্ষত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে পারেন না। অজ্ঞাতকুলশীলের ন্যায় ইহারা আসিতেছে, যাইতেছে, এবং ইহাদের অজ্ঞাতকুলশীলত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য মানবজাতি লালায়িত। প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া মানবমণ্ডলী নূতন নক্ষত্রের অনুসন্ধান এবং পুরাতনের বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে আর এক জাতীয় আশ্চর্য্যতর নক্ষত্রসমূহ দেখিতে পাইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ফেব্রিকাস্ (Fabricus) নামক জনৈক পণ্ডিত দেখিলেন, তিমি (Whale) মণ্ডলীতে একটী নক্ষত্রের জ্যোতিঃ কখন বা ভয়ঙ্কররূপে বাড়িতেছে এবং পরক্ষণেই কমিতেছে। সময় সময় নক্ষত্রটী আকাশে জাজ্বল্যমান হইয়া দাঁড়াইত, আবার সময় সময় অদৃশ্য হইয়া যাইত। তিনি ইহার পরিবর্ত্তন কয়েক বৎসর নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার পর, অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাঁহার অনুসরণ করেন। আমরা এখন জানি যে মীরা—অর্থাৎ "অদ্ভুত"—নক্ষত্রটীর আলো-পরিবর্ত্তনকাল তিনশত বত্রিশ দিন; অর্থাৎ তাহার আলো-পরিবর্ত্তনে এই সময় ব্যয়িত হয়। একবার জ্বলিয়া একবার নিভিয়া—"জ্বলা"র চেয়ে 'নিভা'টা অপেক্ষাকৃত ধীরে—যুগ যুগান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোপরিবর্ত্তনের কারণ কি? কোন্ দৈত্যবংশাবতংশই বা এই মহাযজ্ঞের ইন্ধন যোগাইতেছে? প্রশ্নটী নিতান্ত আবশ্যকীয়। কারণ, তিনশতের উপর মীরাজাতীয় নক্ষত্র পণ্ডিতগণের দৃষ্টিভূত হইয়াছে। "কেন" অনুসন্ধানের পূর্ব্বে, আলো-পরিবর্ত্তনের আকৃতি এবং প্রকৃতি আলোচনা করা যাক্।

এই মীরাজাতীয় নক্ষত্রের বিশেষ চিহ্ন কি কি? প্রথমতঃ, অধিকাংশের আলো-পরিবর্ত্তন প্রায় এক বৎসরে নিষ্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, উহাদের বর্ণ সর্ব্বদা লোহিত। তৃতীয়তঃ, উহাদের পরিবর্ত্তন-

মাত্রা অতি বিশাল এবং প্রায় সর্ব্বদা অনির্দ্দিষ্ট। 'মীরা' নক্ষত্রটীকে আমাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক্। যখন ইহার উজ্জ্বলতা চরম বৃদ্ধি লাভ করে, তখন ইহার জ্যোতিঃ, যখন ইহার উজ্জ্বলতা চরম হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহার চেয়ে ন্যূনকল্পে শতগুণ বেশী। শুধু মীরাই এরূপ বিশাল পরিবর্ত্তনের একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে; দক্ষিণ গগণের একটী নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি সহস্রগুণের কম নহে। এরূপ নক্ষত্র আরো অনেক আছে।

এইস্থলে পণ্ডিতগণ এক বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। যদি মীরা ২।৩ বার সহস্রগুণ প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পর, অন্তঃসার-শূন্য হইয়া গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইত, তবে মনে করিতাম, একটী স্বর্গীয় দাহ দেখিতেছি মাত্র। কিন্তু এমন শত শত নক্ষত্র আছে, যে সব, নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভয়ঙ্করভাবে জ্বলিয়া উঠে; অথচ, এরূপ প্রজ্জ্বলনের পর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ, এইরূপ অসাধারণ ব্যাপার, যুগ যুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু, এমন কিছু ঘটে নাই, যদ্দ্বারা একটা অন্তিম প্রলয় সূচিত হইতে পারে।

এই ঘটনাগুলির অনেক মীমাংসা যুগপৎ মনে উদিত হয়। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি তর্কবিতর্ক না করিয়াই অগ্রাহ্য করা যায়। এই শ্রেণীস্থ নক্ষত্রের পরিবর্ত্তন-কারণ 'গ্রহণ' নহে। "লোকালোক পর্ব্বতের" ন্যায় কতকভাগ উজ্জ্বল, কতকভাগ অন্ধকারময় পদার্থের আবর্ত্তনও বলা যাইতে পারে না। কল্পনা করুন, একটী নক্ষত্র যাহার গোলকার্দ্ধ অন্য গোলকার্দ্ধ অপেক্ষা সহস্রগুণ উজ্জ্বল। তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার স্থান কোথায়? যে রাসায়নিকক্রিয়া কোন নক্ষত্রপৃষ্ঠে এরূপ আলোবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে (যথা মীরার উপরে আলোবৃদ্ধি) সে রাসায়নিকক্রিয়া নক্ষত্রটীকে চূর্ণ, বিচূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে। সম্ভবতঃ, মীরাজাতীয় নক্ষত্রের পরিবর্ত্তনের প্রাথমিক কারণ 'তাড়িতোৎপাত'। ভূমেরুসম্ভূত দিবালোক (Aurora Borealis)—উৎপাদক সময়-নির্দ্দিষ্ট ডিস্‌চার্জ্জের অনুরূপ। কিন্তু এস্থলে বরং সৎসাহসী হইয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে এই দীর্ঘকালীন্ পরিবর্ত্তনের কারণ, বলিতে গেলে, আমরা প্রায় কিছুই জানি না। আমরা কারণ জানি না বটে; কিন্তু, কার্য্য জানি। যেহেতু, আমরা তাহা দেখিতে পারি, মাপিতে এবং শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি। কিন্তু এ সকল দৃষ্ট বস্তুর পিছনে কি আছে, তাহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে স্থির করা আমাদের শক্তির বহির্ভূত বর্ত্তমানে, মীরা জাতীয় নক্ষত্রের পরিবর্ত্তনসন্দর্শনই যথেষ্ট—কারণের মীমাংসা ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, তৃতীয় শ্রেণীর এক নক্ষত্র প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই জাতির বিশেষত্ব স্বল্পকালে পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশেষত্ব দীর্ঘকাল পরিবর্ত্তন। এই সকল নক্ষত্রের পরিবর্ত্তন অল্পকালের মধ্যে, সাধারণতঃ অল্প দিনের মধ্যে, কখন কখন কতিপয় ঘণ্টার মধ্যে, সম্পাদিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দক্ষিণ গগণের একটী নক্ষত্রের আলো পরিবর্ত্তন সাত ঘণ্টায় সম্পন্ন হয়। এই শ্রেণীস্থ নক্ষত্রের পরিবর্ত্তনমাত্রা সকল সময়ই অল্প; কিন্তু, পরিবর্ত্তনকাল অতি নির্দ্দিষ্ট। স্বল্পকালে পরিবর্ত্তনশীল প্রায় সমস্ত নক্ষত্রই যুগ্ম অর্থাৎ প্রত্যেক স্বল্পকালপরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র, দুইটী নক্ষত্রে গঠিত। এই আবিষ্কার, জ্যোতিষ-প্রাকৃত বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতির অন্যতম কারণ। এই যুগ্ম গঠনের সহিত ইহার পরিবর্ত্তনের কোন সংশ্রব থাকিবে। সাধারণতঃ মনে হয়, ইহার পরিবর্ত্তন, নক্ষত্রদ্বয়ের একটীর উপর অন্যটীর "গ্রহণের"(Eclipse র) কার্য্য। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীস্থ নক্ষত্রের আলোপরিবর্ত্তনের পদ্ধতি হইতে নিঃসন্দেহ-ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, উহাদের পরিবর্ত্তন-কারণ "গ্রহণ" নহে, কিন্তু কোনপ্রকার প্রাবাহিক কার্য্য। সম্ভবতঃ, একটী নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে অন্যটীর আবর্ত্তন নাক্ষত্রিক প্রবাহ উৎপন্ন করে; এবং নক্ষত্রস্থ তরল কিংবা বায়বিক পদার্থের এই সকল বহ্বাড়ম্বর উত্থান ব্যাপার এত উত্তাপ জন্মায় যে যুগ্মের আলোকেতে রূপান্তর করিতে

সমর্থ হয়। অনুমানটী এই বিভাগস্থ মনীষিগণ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন। এখানে বলা উচিত যে তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যা দ্বিতীয় শ্রেণীর অপেক্ষা অল্প; কারণ তাহাদের পরিবর্ত্তনমাত্রা অল্প বলিয়া, আবিষ্কার দুরূহ। তৃতীয় শ্রেণীস্থ প্রায় শতেক নক্ষত্র জ্যোতির্ব্বিদের নিকট পরিচিত। যাহা হৌক, পর্য্যবেক্ষণ যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে।

হয়ত, চতুর্থ শ্রেণীস্থ পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক; যেহেতু,ইহাদের পরিবর্ত্তন কারণ অবগত হওয়া গিয়াছে এবং এই জন্য ইহাদের দূরত্ব, গতিবিধি নির্ণয় করা গিয়াছে। এই শ্রেণীস্থ আল্‌গোল (Algol) নক্ষত্রটী প্রথম আবিষ্কৃত এবং প্রথম স্থানীয় বলিয়া, চতুর্থ শ্রেণীকে সাধারণতঃ "আল্‌গোল্‌ পরিবর্ত্তনশীল" বলা হয়। কোন উন্নত যন্ত্রের সাহায্য বিনাও এই সকল নক্ষত্রবিষয়ে বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়। আল্‌গোল্‌ নক্ষত্রটী এত উজ্জ্বল যে উহা আমাদের চর্ম্মচক্ষুতে দৃষ্টিগোচর হয়। অশিক্ষিত চক্ষুও উহার আলো-পরিবর্ত্তন অনুসরণ করিতে পারে। বিলাতের ভালরকমের পঞ্জিকাতে উহাদের গ্রহণকাল যথাযথভাবে লিখিত হইয়া থাকে।

এই শ্রেণীস্থ প্রায় সমুদয় নক্ষত্রের একটী নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য উজ্জ্বলতা অপরিবর্ত্তিত থাকে; তদ্রূপ একটী নির্দ্দিষ্ট কালে, দ্রুতবেগে, জ্যোতির হ্রাস হয় কিংবা, তদ্রূপ দ্রুতবেগে, হ্রাস-প্রাপ্ত জ্যোতিঃ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিপদসঙ্কুল অন্তরীপস্থ আলোকস্তম্ভের সহিত আল্‌গোল জাতির তুলনা হইতে পারে—তবে প্রভেদ এই যে আলোক-স্তম্ভের আলো প্রতি নিমেষে নিষ্প্রভ হইয়া যায়; কিন্তু, আল্‌গোলের নিষ্প্রভতা (গ্রহণ) ২।৩ দিন অন্তর ঘটিয়া থাকে এবং কয়েক ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হয়। 'গ্রহণ'ই আল্‌গোল্‌ শ্রেণীর পরিবর্ত্তনের কারণ। এই শ্রেণীস্থ সমস্ত নক্ষত্রই যুগ্ম এবং একটী অন্যটীর সম্মুখে আসিয়া আলো পরিবর্ত্তন করে।

আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই শ্রেণীস্থ নক্ষত্রের পরিবর্ত্তন-পদ্ধতি হইতে অনেক মনোগত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অন্য কথায় বলিতে গেলে, একটী আল্‌গোল্‌ যুগ্মের দুইটীর মধ্যে একটী যেরূপে অন্যটীর আলো সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ঢাকিয়া রাখে, তাহা হইতে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব নির্ণীত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নক্ষত্রদ্বয়ের আয়তন, মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব, ঘনত্ব, গুরুত্ব, ও আকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে পারি। এই জ্ঞান, অনুসন্ধানের এক প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে আল্‌গোল্‌ নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা, বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত জগত নহে, পরন্তু, নবজাত জগতের সন্দর্শন করিতেছি। যখন একটী আলগোল্‌ আমাদের নেত্রপথে পতিত হয়, তখনও সে দুগ্ধপুষ্য শিশু মাত্র; যেহেতু, জ্যোতিষের কথায় বলিতে গেলে, মাত্র গতকল্য একটী নক্ষত্র, বিদীর্ণ হইয়া, দুইটী যমজ নক্ষত্র উৎপন্ন করিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত, এতাদৃশ তিনটী নক্ষত্র কদাচিৎ বিভক্ত হইয়াছে। জরাসন্ধবৎ, নক্ষত্রদ্বয় যেন একটী সুবিশাল, যুগ্ম আতাফল।

পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের পঞ্চম শ্রেণী নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। যে সমুদয় পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীসমূহের বহির্ভূত, তাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সূক্ষ্ম-অনুসন্ধান-তৎপর পণ্ডিতগণের মতানুসারে, আকাশস্থ প্রত্যেক নক্ষত্রই ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তনশীল। পরন্তু, আমাদের সূর্য্যও যখন নক্ষত্র মাত্র, তখন ইহার আলোপরিবর্ত্তন হইতেছে কি? সূর্য্যের প্রতাপ সর্ব্বদাই কি একরূপ? যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, সূর্য্যেরও তেজ অপরিবর্ত্তনীয় নহে। সম্ভবতঃ, যখন আমরা সৌর-পরিবর্ত্তনের রহস্য ভেদ করিতে পারিব, তখন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, এবং চৌম্বকবিপর্য্যয়ের কারণও উদ্‌ঘাটিত হইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।
Ohio State University,
U. S. A.

...ীয় বর্ষ। পৌষ, ১৩১৫। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সুপ্রভাত

"নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা
আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে
প্রাচীন রজনী নাশো
নূতন উষালোকে।"

শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি,এ সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৵০ টাকা।

আজ

ধনীর সুপ্রভাত ! গৃহীর সুপ্রভাত !

সৌখীনের সুপ্রভাত ! মহিলার সুপ্রভাত !

কারণ,

বঙ্গ-দেশের কারখানাজাত সাবানের মধ্যে

ন্যাশন্যাল সোপ

অভিনব শিল্পজগতে অভাবনীয় যুগান্তর

ঘটাইয়াছে।

আকারে ও গন্ধের স্থায়িত্বে

ন্যাশন্যাল সোপ

বিলাতী সাবানকে পরাস্ত করিয়াছে !

মূল্যও যথাসম্ভব সস্তা করা হইয়াছে !!

তাই বলিতেছিলাম শিল্পজগতে আজ

সুপ্রভাত !

বাজারে সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য।

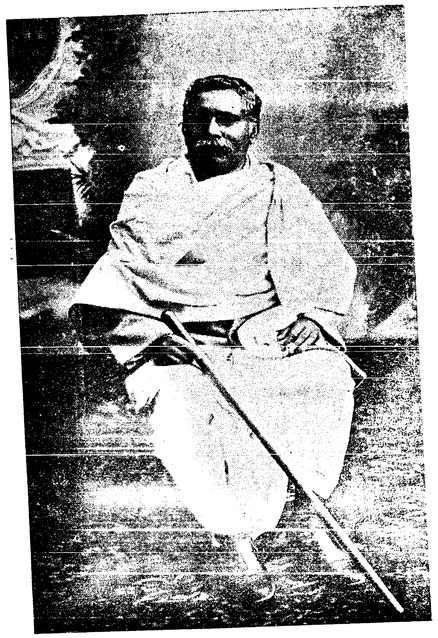

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত।

New Press, College Square.

সুপ্রভাত

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর ;
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

দ্বিতীয় বর্ষ। | পৌষ, ১৩১৫ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

হিন্দুশাস্ত্রে মিসর দেশ, নীলনদী ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য প্রদেশ।

আমাদিগের নিজের ঘরে অনেক মহামূল্য রত্ন ধূলায় ঢাকা পড়িয়া আছে। কিন্তু আমাদিগের এমনই দশা ঘটিয়াছে যে আমরা নিজেরা তাহার খোঁজ খবর রাখি না। অনেক সময় অনিসন্ধিৎসু বৈদেশিকগণ তাহার এক একটিকে ধূলি ঝাড়িয়া বাহির করেন। তখন তাঁহাদিগের হস্তে উহার উজ্জ্বল রশ্মি দেখিয়া আমরা বিমোহিত হই। কর্ণেল উইলফোর্ড (Colonel Wilford) এসিয়াটিক সোসাইটির একজন সুপণ্ডিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সভ্য ছিলেন। তিনি বহু যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাদিগের পুরাণ হইতে নীলনদী, মিসর দেশ ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য প্রদেশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। কাশীতে অবস্থান করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে তিনি বহু তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন। তিনি তৎসম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটিতে ইংরেজী ভাষায় লিখিত এক সারবান্, দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত সোসাইটি হইতে প্রকাশিত তৃতীয় সংখ্যক পুস্তকে ঐ প্রবন্ধ বাহির হয়। উক্ত প্রবন্ধে অনেক মূল্যবান্ ও মনোহর কথা আছে! প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা যে কেবল অধুনাতন ভারতবর্ষের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, পুরাজগতের সুসভ্য জাতিগণ যে খুব সম্ভবতঃ হিন্দুগণ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, হিন্দুগণের ধর্ম্মতত্ত্ব, ভাষা, পৌরাণিক কাহিনী ও উপকথাই যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে সমস্ত জগতে বিস্তৃত হইয়াছিল, এই প্রবন্ধ পাঠে তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। আমার শ্রদ্ধাস্পদ, সাহিত্যসেবী জনৈক বন্ধু আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ হইলে একটী সুখপাঠ্য বিষয় হইবে। তাঁহারই কথানুসারে আমি উক্ত প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অবশ্য এই প্রবন্ধটিতে উইলফোর্ড সাহেবের স্বকপোল কল্পিত ও অনুমানের দুর্ব্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অনেক কথা আছে;

তৎসম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ না করিয়া যথাশক্তি যথাযথ অনুবাদ করাই আমার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য।

হিন্দুগণ পৃথিবীকে উত্তর গোলকার্দ্ধ ও দক্ষিণ গোলকার্দ্ধ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই উভয়ের সাধারণ নাম মেরু। তাঁহারা এই দুই গোলকার্দ্ধের মধ্যে উত্তর গোলকার্দ্ধকেই শ্রেষ্ঠতর স্থান দিয়াছেন—কেবল মেরু বলিলে উত্তর গোলকার্দ্ধই বুঝায়। কবিকুল এই গোলকার্দ্ধকে বহু অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন, এই স্থান সর্ব্ববিধ আনন্দের নিকেতন। পক্ষান্তরে তাঁহাদিগের মতে কুমেরু অতি ভয়ানক স্থান, রাক্ষসগণের আবাস ভূমি, ইহার স্থলবিশেষে শীতের প্রবল প্রকোপ; আবার স্থলবিশেষে উত্তাপ এত অধিক যে সেখানকার জলাশয়ের জল অনবরত ফুটিতেছে। মেরু শব্দের প্রকৃত অর্থ মেরুদণ্ডের প্রান্ত ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ। কিন্তু হিন্দুগণের মতে দেবরাজ ইন্দ্রের পুরী ও উদ্যান পৃথিবীর মেরুদণ্ডের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী নহে উহা জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের (celestial sphere) মেরুদণ্ডের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী। উহারই দক্ষিণ প্রান্তে অসুরগণের রাজ্য, উহারাই উত্তরপ্রান্তবাসী দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ গোলকার্দ্ধবাসিগণ আবার তাহাদের বাসস্থান সম্বন্ধে অন্য ধারণা করেন; ইথিওনিয়ান ও মিশরদেশবাসীগণ উহাদের অন্যতম। তাঁহারা উত্তর মেরুকেই অতি ভয়ানক ও ক্লেশকর স্থান বলিয়া মনে করেন।

প্রাচীন গ্রীকগণ মিসরগণ হইতেই অনেক ধারণা গ্রহণ করিয়াছেন। তাই গ্রীকগণ তাহাদের নরক উত্তর মেরুতেই স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদের cronos তুষারাচ্ছন্ন উত্তর মেরুগুহাতেই আবদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণসমূহ পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে সমুদায় হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত স্বর্গ ভিন্ন হিন্দুগণ এই পৃথিবীস্থ একটী স্বর্গের কথা স্বীকার করিতেন। সে স্বর্গ আফ্রিকার দক্ষিণাংশে স্থিত। মিসরদেশবাসীগণের স্বর্গের ধারণার সঙ্গে বোধ হয় এই মতের সম্পর্ক আছে। উত্তর গোলকার্দ্ধবাসীগণের মধ্যে স্ব স্ব প্রাচীনত্ব লইয়া সর্ব্বদাই বিবাদ হইত। তাই মিসরদেশবাসীগণ সিদিয়ান (Scythian) গণের সহিত তর্কস্থলে দৃঢ়তার সহিত বলিতেন যে ইথিওনিয়ানগণই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জাতি।

বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ পৃথিবীকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ ঐ সমুদায় বিভাগ মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। বায়ু পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অনুমোদিত বিভাগই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উক্ত পুরাণ দ্বয়ের মতে পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত। যে ভূভাগের দুই দিকেই জল তাহার নাম দ্বীপ। আরবী ভাষায় জাজিরা, শব্দের অর্থও তাই। সুতরাং ইংরাজীতে Island এবং Peninsula বলিতে যাহা যাহা বুঝায় সংস্কৃত দ্বীপ শব্দে এবং আরবী জাজিরা শব্দে এতদুভয়ই বুঝায়। এই সপ্তদ্বীপ এক মহা সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ মহাসমুদ্রের পরপার অটল নামক দেশ ও পর্ব্বত শ্রেণী। খুব সম্ভবতঃ গ্রীকগণ এই অটল হইতেই তাহাদিগের সুপ্রসিদ্ধ এটলান্টিসের (Atlantis) ধারণা গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত এটলান্টিস দ্বীপ একবার আবিষ্কৃত হইবার পর আর দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল না। তাই গ্রীকগণ মনে করিয়াছেন সম্ভবতঃ কোনও ভীষণ নৈসর্গিক দুর্ব্বিপাকে উক্ত দ্বীপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। গ্রীকগণের এই সিদ্ধান্ত খাঁটি হিন্দু প্রকৃতির অনুরূপ। কারণ ব্রাহ্মণগণ সমস্ত জগতের একটা আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিতেও প্রস্তুত অথচ শাস্ত্রোক্ত একটী বাক্যেরও সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে প্রস্তুত নহেন। পূর্ব্বোক্ত সপ্তদ্বীপের নাম এই জম্বু, অঙ্গ, যম, যমল অথবা মলয়, শঙ্খ, কুশ ও বরাহ।

জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ এসিয়া মহাদেশান্তর্গত স্থলভাগ কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তাহার পূর্ব্বদিকে যথাক্রমে অঙ্গ, যম ও যমল; অঙ্গ সকলের উত্তরে ও যম সকলের দক্ষিণে। আর ঐ জম্বু দ্বীপের পশ্চিম পার্শ্বে শঙ্খ, কুশ ও বরাহ দ্বীপ অবস্থিত। সকলের দক্ষিণে শঙ্খ, তাহার উত্তরে কুশ এবং কুশের উত্তরে বরাহ। ভারতবর্ষের ঠিক পূর্ব্বে যম এবং ঠিক পশ্চিমে কুশদ্বীপ। বিবিধ প্রকারে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

শঙ্খদ্বীপ পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে। সর্ব্বসাধারণের অনুমান এই যে ইহা যমল দ্বীপের সহিত লগ্ন; আর এই উভয় দ্বীপই ভূভাগস্থ একটি বৃহৎ সাগরকে আলিঙ্গন করিতেছে। হিন্দুগণের মতে লঙ্কা উক্ত উভয় দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী এবং এই দ্বীপ বিষুব রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অতএব শঙ্খদ্বীপ অবশ্যই আফ্রিকার অংশবিশেষ হইবে আর যমল অথবা মলয় দ্বীপ আজিকালিকার মালয় উপদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত প্রদেশই হইবে। টলেমী আলেকজান্দ্রিয়াতে হিন্দুগণের সংসর্গে আসিয়াছিলেন। ভূভাগস্থ একটা বৃহৎ সাগরের ধারণা সম্ভবতঃ উক্ত হিন্দুগণের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন কারণ তাঁহার সময়ের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত গ্রীকগণের মধ্যে ঐ ধারণা ছিল না। তিনি উক্ত ভূভাগস্থ সাগরের নাম দিয়াছেন হিপ্পাডোস (Hippados)। ব্রাহ্মণগণের ভাষায় সাগরের সাধারণ নাম অব্ধি। এই অব্ধি হইতেই হিপ্পাডোস শব্দটির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার নানাবিধ কারণ বিদ্যমান আছে। যে ভূমধ্যসাগরের (Mediterranean) তট ও নীলনদীর মোহনা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত সিরিন্দ (Sirhind) পর্য্যন্ত কুশদ্বীপ বিস্তৃত ছিল।

কতকগুলি দূরবর্ত্তী স্থানের অবস্থিতি স্থল সবিশেষ ঠিক করিয়া নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পৃথিবীর আর একবার এক নূতন প্রণালীতে বিভক্ত হয়। ঐ বিভাগানুসারে পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্তদ্বীপ ব্যতীত আরও ছয়টি দ্বীপের সৃষ্টি হয়। উহাদের নাম এই; প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর এবং নূতন আর একটি কুশদ্বীপ। সপ্তদ্বীপের অন্যতম পুরাতন কুশদ্বীপ হইতে এই নূতন কুশদ্বীপের পার্থক্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, পুরাতন কুশদ্বীপকে অন্তঃকুশদ্বীপ আর নূতন কুশদ্বীপকে বহিষ্কুশদ্বীপ আখ্যা প্রদান করা হয়। পুরাণে এই কুশদ্বীপদ্বয়ের পার্থক্যের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলেও পুরাণকারগণ এই পার্থক্যবিধান সমর্থন করিয়াছেন। নূতন ছয়টি দ্বীপ যে যে স্থান বাচক, তৎসমুদয় স্থান পুরাতন সপ্তদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়াই অনুমান করা হইয়াছে। আর বিভিন্ন পুরাণে এই নূতন ছয়টি দ্বীপের বর্ণনায় অনেক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু পুরাতন সপ্তদ্বীপের বর্ণনা সকল পুরাণেই একরূপ।

পুরাতন বিভাগানুসারে সপ্তদ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; অবশিষ্ট ছয়টি দ্বীপ জম্বুদ্বীপের সহিত সংলগ্ন। সেই কারণে কেহ কেহ উক্ত ছয়টি দ্বীপকে দ্বীপ না বলিয়া উপদ্বীপ বলেন। আর নামের নূতন নির্ঘণ্টে উহাদের নামের উল্লেখ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা অন্তঃকুশদ্বীপ পরবর্ত্তী নাম—নির্ঘণ্টে উহা জম্বুদ্বীপেরই অন্তর্গত। ভারতবর্ষের সপ্তখণ্ডের মধ্যে তিন খণ্ড লইয়া উক্ত দ্বীপ গঠিত। কবিগুরু কালিদাসের লেখায় আবার আর একটা ভিন্ন রকমের ভৌগোলিক বিভাগের আভাস পাওয়া যায়। কালিদাস রঘুবংশে, রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণন প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে রঘু অষ্টাদশদ্বীপের প্রত্যেকটিতেই তাঁহার বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ বলেন এই অষ্টাদশ দ্বীপের মধ্যে সাতটি প্রধান আর এগারটি অপ্রধান। উপ হিপো (hypo) এবং সাব্ (sub) এই কয়টি মূলে একই শব্দ, ইহাদের প্রত্যেকেই অপকর্ষ বাচক যথা বেদ ও উপবেদ; ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম। কিন্তু দ্বীপ ও উপদ্বীপ, এই শব্দদ্বয়ের অযথা প্রয়োগের নিমিত্তই বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে।

আবিসিনিয়া ও ইথিওপিয়া লইয়াই বহিষ্কুশদ্বীপ গঠিত। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে কুশের বংশধরগণ অন্তঃকুশদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া শঙ্খদ্বীপে আসিয়া বসতি করিতে থাকেন এবং তাহাদের নূতন অবস্থিতিস্থলকে তাঁহারা পূর্ব্ব-

পুরুষের নামানুসারে বহিস্কুশ আখ্যা প্রদান করেন। যদিও সাধারণতঃ এই কথা প্রচলিত আছে বটে যে কুশতৃণ হইতে কুশ দ্বীপের নাম হইয়াছে কিন্তু তদনুসারেও বাস্তবিক কুশ হইতেই কুশদ্বীপের নাম আসিয়াছে। কারণ কুশতৃণের নাম ও মাহাত্ম্য কুশ হইতেই হইয়াছে। কেহ কেহ কেহ বলেন তপস্যা নিরত কুশের অথবা তাহার পুত্র কৌশিকের দেহের চতুর্দ্দিকে বল্মীকের স্তূপ জন্মিয়াছিল, ঐ স্তূপের এই তৃণ জন্মে। কিন্তু অন্যান্যের মতে বল্মীকের আখ্যানটি হিন্দুগণের মধ্যে আদি কবির সম্বন্ধেই প্রোক্ত আর এই ঘটনা হইতেই উক্ত কবির নাম বাল্মীকি হয়।

আমরা এক্ষণে যে সমুদয় দেশের বর্ণনা করিতে যাইতেছি তৎসমুদয় পুরাতন বিভাগানুসারে শঙ্খদ্বীপে অবস্থিত আর নূতন বিভাগানুসারে উহার কতকাংশ বহিস্কুশদ্বীপে আর অবশিষ্টাংশ নিজ শঙ্খদ্বীপে অবস্থিত। উক্ত দেশ সমূহ কখন কখন কালীতট নামে অভিহিত হয়। কারণ ঐসমুদায় দেশ কালীনদী অর্থাৎ ইথিওপিয়া দেশান্তর্গত নীলনদীর উভয়তীরে অবস্থিত। কালীতট, বলিতে আমাদিগের এই তিনটি দেশ বুঝিতে হইবে যথা ইথিওপিয়া, নিউবিয়া ও মিসরদেশ। আজ পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণগণ ইহাকে দেবতার দেশ বলিয়া বলেন এবং গ্রীক পুরাণলেখকগণও বলিয়া গিয়াছেন দেবগণ নীলনদীর তীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সুপ্রসিদ্ধ পুণ্যতোয়া নদী দেবগণের হ্রদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাই ঐ হ্রদের নাম দেব সরোবর বা অমর সরোবর। উক্ত হ্রদ শর্ম্মস্থানে, অর্থাৎ শর্ম্মাগণের দেশে, অজাগর, ও শীতান্ত, নামধেয় পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। ঐ পর্ব্বতদ্বয় সম্ভবতঃ সোমগিরি অর্থাৎ চন্দ্রপর্ব্বত শ্রেণীর অন্তর্গত, কারণ ঐ হ্রদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীস্থানের নাম চন্দ্রীস্থান অর্থাৎ চন্দ্রের স্থান। কালী নদী অমর সরোবর হইতে বহির্গত হইয়া পদ্মবনের জলাভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তথা হইতে নিষধ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া বর্ব্বর দেশে পৌছিয়াছে এবং তথা হইতে হেমকূট পর্ব্বত ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। এই হেমকূট পর্ব্বত নিজ শঙ্খদ্বীপে অবস্থিত। উক্ত পর্ব্বত অতিক্রম করার পর তপঃ নামক বনে অর্থাৎ থিবেস্ (Thebais) এবং তথা হইতে কণ্টক দেশে অথবা মিত্র স্থানে এবং তথা হইতে অরণ্য বা অটবী নামক এক বিশাল বন অতিক্রম করিয়া শঙ্খাব্ধি অর্থাৎ অধুনাতন ভূমধ্যসাগরে পতিত হইয়াছে। পুষ্পবর্ষ দেশে নিম্নলিখিত নদী সকল কালী নদীর সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে যথা আবিসিনিয়া দেশস্থিত নীলনদী অর্থাৎ নন্দা, অস্থিমতী বা ক্ষুদ্রতর কৃষ্ণা এই নদীই বর্ত্তমান টেয়াজে (Tacazze) অথবা ক্ষুদ্র এবে (Abay) এবং শঙ্খাঙ্গ অর্থাৎ মরেব (Mareb)। পুলিন্দ নামে এক অসভ্য জাতি এই নদীর তীরে বাস করিত। তদ্ব্যতীত যে যে প্রধান প্রধান জাতি এই নদীর তীরে বাস করিত তাহাদের নাম এই—(১) শার্শ্মিক অথবা শামিক, (২) পল্লী নামক গোচারক জাতিবিশেষ, (৩) শাঙ্খায়ন বা শাঙ্খায়নী উহাদেরই অধুনাতন নাম ট্রগ্লোডিট্স (Troglodytes) (৪) কুটীল কেশ বা কুটীলালক (৫) শ্যামমুখ (৬) দানব (৭) যবন। উক্ত প্রদেশে স্ত্রীরাজ্য নামে একটি স্থান ছিল, কেবল রাজ্ঞী দ্বারা শাসিত হইত বলিয়াই উহার নাম স্ত্রীরাজ্য।

এই নদীর তীরদেশে দেবী মহাকালী রাজরাজেশ্বরীরূপে সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূতা হন। দেবী সেখানে ঈশানী এবং ঈশী নামেও অভিহিতা হইতেন। পরে সতীরূপে নদীতে পরিণতা হন। দেবী মহাকালীর নাম হইতেই এই নদীর নাম কালী হইয়াছে। কাল শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। কল্ ধাতুর অর্থ বিনাশ করা। এই ধাত্বর্থ হইতেই সময়ের এক নাম কাল। সংহার-সাধিকা শক্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্তই স্ত্রীলিঙ্গে কালী শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। তাই কালী শব্দ কাল শব্দের পূর্ব্বোক্ত উভয় অর্থকেই লক্ষ্য করিতেছে। আমরা পরে দেখাইব পুরাণকারগণের মতেও কালী শব্দের ইহাই অর্থ। দেবী মহাকালীর আরও কতকগুলি আখ্যা আছে তাহাদের প্রত্যেকেরই অর্থ কৃষ্ণবর্ণে

প্রকার বিশেষ। কালিকাপুরাণে এই সমুদয় নামই নীলনদীর প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। সে নামগুলি এই—কালী, কালা, নীলা, অসিতা, শ্যামা, শ্যামলা, মেচকা, অঞ্জনাভা ও কৃষ্ণা। এই নদীরই আর এক নাম নহুষী। সুপ্রসিদ্ধ বিজয়ী বীর দেব নহুষের নাম হইতেই এই নামকরণ হইয়াছে। কথা বার্ত্তার ভাষায় উহাকে দেওনৌষ বলা হইত। সম্ভবতঃ ইনিই প্রাচীন ইয়ুরোপীয়গণের ডাইওনিসিয়াস (Dionysius)।

নাইল (Nile) অর্থাৎ নীল, এই নামটি যে সংস্কৃত মূলক তাহাতে আর তুল নাই। গ্রীক, রোমান ও হিব্রুগণ নীলনদীর নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন নাম জানিতেন যথা Melas, Melo, Argyptos, Sikhor অথবা Sihor, Nous, অথবা Nus, Aetos, Siris, Oceanus, Triton, Potamos। নাউস (Nous) শব্দ, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, নহুষ বা নৌম শব্দের অপভ্রংশ। এইটস্ (Aetos) শব্দ ঈত বা ঐত নামধেয় রাজার নামেরই অপভ্রংশ। উক্ত রাজা মহাদেবের অবাস্তর অর্থাৎ আংশিক অবতার বিশেষ। আরগিপটস (Argyptos) শব্দ আগুপ্ত, হইতে উদ্ভূত। আগুপ্ত, শব্দের অর্থ আ (সমন্তাৎ, চতুর্দ্দিক্ষু) গুপ্ত (রক্ষিত) অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে সুরক্ষিত। ট্রাইটন (Triton) শব্দ সম্ভবতঃ ট্রাইটুনি (Trituni) শব্দ হইতে আসিয়াছে। ইথিওপিয়ানগণের ভাষায় প, অক্ষর নাই। প, বা p এর স্থানে তাহারা ট, (t) উচ্চারণ করিয়া থাকে। তবেই তাহারা ট্রিপুনি (Tripuni) শব্দকেই ট্রিটুনি (Trituni) বলিয়া উচ্চারণ করে। এই ত্রিপুণী (Tripuni) শব্দ সংস্কৃত ত্রিবেণী শব্দেরই অপভ্রংশ। সংস্কৃত শব্দ ত্রিবেণীর, মূল অর্থ তিনটী বেণীতে বদ্ধ কেশ দাম। পুণ্যসলিলা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল এবং কোনও নদী তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া বাহির হইলে উক্ত বিভাগস্থল এই দুই অর্থেও ত্রিবেণী শব্দটি সর্ব্বদাই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আর্থিকাস্ (Arthicus) তাঁহার ভূবৃত্তান্তে হাইডাসপেস্ (Hydaspes) নদীর উৎপত্তি স্থানকে ত্রিবেণী নামক স্থান না বলিয়া ভুলক্রমে শব্দটীর অনুবাদ করিয়া তিনটি চুল, বা তিনগুচ্ছ চুল, এইরূপ লিখিয়াছেন। কালীনদী তিনটি পুণ্যতোয়া নদীর সম্মিলনে উৎপন্ন যথা নীলা অর্থাৎ ইথিওপিয়াদেশস্থা নীলনদী নন্দা অর্থাৎ আবিসিনিয়ার নীল নদী এবং ক্ষুদ্রকৃষ্ণা বা অস্থিমতী। বৃহত্তর কৃষ্ণা ও নন্দার সঙ্গমস্থল যে এক বিশেষ তীর্থস্থান ছিল তাহা অথর্ব্ববেদের নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক হইতে বেশ বুঝা যায়।

ভদ্রা ভগবতী কৃষ্ণা গ্রহ নক্ষত্র মালিনী
সংবেশনীসংযমনী বিশ্বস্য জগতো নিশা।
অগ্নি চৌর নিপাতেভ্যু সর্ব্ব গ্রহ নিবারণে
দক্ষা ভগবতী দেবী নন্দয়া যত্র সঙ্গতা।
সর্ব্বপাপ প্রশমনী ভদ্রে পারমসি মহী
সিতাসিতা যমা যোগাৎ পরং যা ন নিবর্ত্ততে।

অর্থাৎ কৃষ্ণা মঙ্গলময়ী, ঐশ্বর্য্যশালিনী আনন্দদায়িনী, বিপদনাশিনী এই বিশ্বজগতের নিশার ন্যায় এই নক্ষত্রাভরণভূষিতা। যেখানে এই নদী নন্দার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থলে এই নদী অগ্নিভয়, চোরের ভয় এবং গ্রহ বৈগুণ্য নিবারণ করিতে দক্ষা। ইনি সর্ব্বপাপ প্রশমনকারিণী। হে ভদ্রে তুমি ভবার্ণব পার করিতে ক্ষমা। শ্বেত ও কৃষ্ণ জলের সংযোগ হেতু তুমি অনবরতই জীবের প্রকৃষ্টতম মঙ্গলসাধন করিতেছ, কখনও তাহা হইতে নিবৃত্ত হওনা।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুঞ্জবিহারী হার।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমার স্বর্গস্থ পিতা এই সকল নৈতিক নিয়মানুসারে রাজসভায় অথবা গৃহের মধ্যে তাঁহার জীবন পরিচালিত করিতেন। আমিও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি যে মোহমদে উন্মত্ত হইয়া নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ ও পশু বলিদান দ্বারা ঈশ্বরের পূজা করা অপেক্ষা একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখাই প্রকৃত উপাসনা। পিতার ধর্ম্মভাব অতুলনীয় ছিল। তিনি প্রতি রাত্রির অধিকাংশ সময়ই ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন এবং মালাজপ করিতেন। তিনি সর্ব্বদা আমাকে এই শিক্ষা দিতেন যে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও নির্ভর ব্যতীত আমি কখন ও কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিব না। আমিও সেই শিক্ষানুসারে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি।*

১৩ই এপ্রিল তারিখে আমি আনন্দনগরে তাঁবু স্থাপন করিলাম। এই স্থানে আমি আলিবেগকে বাহাদুর খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া ৫৭ জন আমির এবং মুনসেব্‌দারের সহিত সেখ ফরিদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলাম। সেখ ফরিদ আমাদের অগ্রে গমন করিতেছিলেন। বাহাদুর খাঁ, জেমিলবেগ, সেরিফ আমোল প্রভৃতি আমীরদিগকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য আমি সেখ ফরিদকে দশলক্ষ টাকা প্রদান করিলাম। তাঁহারা যাহাতে বিদ্রোহদমনে তৎপর হন তজ্জন্য এই উপহার প্রদান করিলাম। ১৬ই এপ্রিল তারিখে আমি সংবাদ পাইলাম যে আমার সৈন্যদলকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া খসরু তাহার সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছে। সেখ ফরিদ রাজপতাকা উড্ডীন করিয়া সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বাহাদুর খাঁকে আমি বদক্‌সানের অধিপতি করিয়া দিয়াছিলাম। বাহাদুর খাঁ একজন বিচক্ষণ যোদ্ধা; তিনিও যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজাইতে প্রস্তুত হইলেন এবং তিন শ্রেণীতে সৈন্য সাজাইয়া এক দল লইয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎপরে ঘোর যুদ্ধ হইল এবং উভয় পক্ষে ভীষণ হতাহতের পর খসরুর চারিজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পলায়ন করিল এবং একহাজার সৈন্যের সহিত দুইজন সেনাপতি বন্দী অবস্থায় আমার নিকট আনীত হইল। তাহাদিগকে আমি গুরুতর শাস্তি প্রদান করিলাম। কতকগুলি বন্দীকে জীবদ্দশায় গাত্রের চর্ম্ম তুলিয়া হত্যা করিতে; কতকগুলির গলদেশে গরুর মোয়ালি বন্ধন করিয়া ঘুরাইতে, কাহাকেও নদীর ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে আদেশ দিলাম এবং কতকগুলি বন্দীকে হস্তীপদতলে মথিত করিতে বলিলাম। যাহারা রণক্ষেত্র হইতে আহতাবস্থায় পলায়ন করিয়াছিল তাহারা নিরাশহৃদয়ে খসরুর নিকট উপস্থিত হইল। এই দিন সংবাদ পাইলাম যে লাহোর নগর খসরুর সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে এবং নগরবাসীগণ ও নগরের মধ্যস্থ সৈন্যগণ একত্র হইয়া ঐ কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেছে। হোসেন বেগ বদক্‌সানি খসরুকে বলিলেন যে লাহোর নগরের অধিবাসীগণ রাজকীয় তোষাখানা লুট করিতেছে এবং যাহারা কামানে আগুন ধরায় তাহাদের নিয়মিত বেতন ব্যতীত তাহাদিগকে বহু মুদ্রা দান করিতেছে। খসরুকে এই লুণ্ঠন ব্যাপারে রত করিয়া তাহাকে আমার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে লইয়া যাইবার জন্য এই ব্যক্তি খসরুকে এই প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া ফেলিল। এই নগর লুণ্ঠন করিয়া অতুল ধনরাশি পাইবার লোভে খসরু নগরের ফটক বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিল। এই প্রকারে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত নগর সাতদিন ব্যাপিয়া নির্দ্দয় লুণ্ঠনকারীদিগের হস্তে রহিল। ধনীসন্তানগণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। রক্তপিপাসু দস্যুগণ তৎপরে প্রাসাদের একটি সিংহদ্বারে আগুণ লাগাইয়া দিল। নগরের দ্বাদশটি প্রধান সিংহদ্বার আছে। ইতিমধ্যে দিলওয়ার খাঁ, হোসেন বেগ এবং কোতোয়াল নুরুদ্দিন কুলি ভিতর হইতে সিংহদ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নগরবাসীগণ অগ্নির উপর অনবরত জল ঢালিতে লাগিল। এই প্রকারে সিংহদ্বারটি রক্ষা পাইল। শত্রুগণ ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। নুরুদ্দিন কুলি দুর্গ প্রাচীরে উঠিয়া শত্রুদিগের মধ্যে বন্দুক এবং গোলা গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে লুণ্ঠনকারীগণ সমূহ বিপদগ্রস্ত হইল। খসরুর সেনাপতিগণ এবং সৈন্যগণ নগর অধিকার করা সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িল, অধিকন্তু সম্রাটের সৈন্যের আগমন সংবাদে তাহারা নিতান্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। এই বিদ্রোহ ব্যাপারে যোগদান করিয়া তাহারা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে বলিয়া অনুতপ্ত হইল। সকলেই নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িল। তথাপি মরণ পণ করিয়া ১১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাত্রিযোগে আমার শিবির আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যাকালে তাহারা লাহোর নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ১৮ই এপ্রিল রাজুস্ আলীর পান্থশালায় অবস্থিতিকালে সংবাদ পাইলাম যে, লাহোর নগর পরিত্যাগ করিয়া খসরু ২০ হাজার সৈন্য লইয়া কোন্ দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহা কেহ জানে না। এই সংবাদ পাইয়া আমি নিতান্ত চিন্তিত হইলাম। খসরু পাছে আমাকে কৌশলপূর্ব্বক এড়াইয়া পলায়ন করে এই জন্য আমি তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে হুকুম দিলাম, যদিও তখন মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই দিনই আমি গণ্ডওয়াল নদী অতিক্রম করিয়া দোওয়াল নগরে শিবির স্থাপন করিলাম। সেই দিন দুপ্রহরে সেখ ফরীদ খসরুর যাত্রায় বাধা প্রদান করিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন। এই সময়ে আমি সুলতানপুর নগরে ছিলাম। আমি আহার করিতে বসিয়াছি এবং মোওজাল-উল-মুলক আমার খাদ্যের জন্য গম ভাজা আনিয়াছেন, এমন সময় সেখ ফরীদের এই কৃতকার্য্যতার বিবরণ জানিতে পারিলাম এবং আরও শুনিলাম যে তিনি খসরুর সৈন্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ একগ্রাস আহার করিয়া আমার অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ দিলাম এবং ঈশ্বরের সহায়তা ভিক্ষা করিয়া চিন্তাশূন্য হৃদয়ে কেবল আমার তরবারী ও বর্ষ লইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার নিকটে তখন কেবল দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। সেদিন যে তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইবে তাহা তাহারা জানিত না। সামরিক নীতি অনুসারে খসরুর বৃহৎ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে এই ক্ষুদ্র দলকে নিয়োজিত করা নিতান্ত অসঙ্গত বিবেচিত হইল; অধিকন্তু সৈন্যগণও ইহাতে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে সাহসী হইতে বলিয়া আমি সমগ্র সৈন্যদলকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে বলিলাম। গণ্ডোয়াল নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, আমার পক্ষে ২০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫০ হাজার উষ্ট্রবাহী বন্দুকধারী সৈন্য একত্রিত হইয়াছে। সেখ ফরীদের সাহায্যার্থ আমি এই বিশাল সৈন্য প্রেরণ করিলাম। এই সঙ্কটকালে আমি মির জমালুদ্দিনকে খসরুর নিকট এই সংবাদ দিয়া প্রেরণ করিলাম যে, এখনও শান্তি স্থাপনের সময় আছে, খসরু যেন যুদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র মানবের রক্তপাতের হেতু না হন। খসরু স্বয়ং যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইতে উদ্‌গ্রীব হইলেও তাহার দুর্দ্দান্ত অনুচরগণের পরামর্শে আমাকে বলিয়া পাঠাইল যে, "এতদূর অগ্রসর হইয়া এক্ষণে তরবারী ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই যুদ্ধে উপযুক্ত মস্তকেই রাজমুকুট প্রদান করি-

* যাঁহার হৃদয়ে এইরূপ উচ্চভাব বর্ত্তমান তিনিই যে খাঁটক কর্ত্তৃক দণ্ডিত আবুল ফজেলের এবং তাঁহার স্ত্রীর প্রথম স্বামী সের আফগানের হত্যা সাধন করিয়াছিলেন তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না।

বেন।" মির জমালুদ্দিনের নিকট হইতে খসরুর এই উদ্ধত উত্তর পাইয়া সেখ ফরীদকে বলিয়া পাঠাইলাম যে আর চিন্তার সময় নাই; বিদ্রোহীদলের প্রধান ভাগ আক্রমণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সেই মুহূর্ত্তে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদিকে বাহাদুর খাঁ ত্রিশ হাজার বর্ম্মধারী অশ্বারোহী সৈন্য এবং ২০ হাজার উষ্ট্রবাহী বন্দুকধারী সৈন্য লইয়া এবং অন্য দিকে সেখ ফরীদ একদল বিশিষ্ট যোদ্ধা লইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে খসরুর পক্ষে দুই লক্ষ অশ্বারোহী এবং উষ্ট্রবাহী সৈন্য ছিল। বাহাদুর খাঁর অশ্বারোহী সৈন্যগণ যে প্রকার বর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল, খসরুর অশ্বারোহী সৈন্যগণও সেই প্রকার বর্ম্ম পরিহিত ছিল। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই সাম্রাজ্য আমার অধীনে থাকিবে বলিয়াই আমি জয়লাভ করিলাম। খসরুর ত্রিশ হাজার সৈন্য হত হইল এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। এই গোলযোগের সময় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অজ্ঞানিত ভাবে পলায়ন করিবার জন্য খসরু একটী পাল্কীতে আরোহণ করিয়াছিল। বাহাদুর খাঁ দৈবক্রমে সেই স্থানে আসিয়া খসরুকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিবেষ্টন করিতে সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন। সেখ ফরীদও তখন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খসরু পলায়নের কোন উপায় না দেখিয়া পাল্কী পরিত্যাগ করিয়া সেখ ফরীদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল যে আর বল প্রকাশ করা বৃথা; এক্ষণে সে নিজেই তাহার পিতার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। আমি তখন গণ্ডোয়ালে ছিলাম। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, এই বিপদের সময় আমার মনে হইয়াছিল যে খসরু আমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু জমালুদ্দিন হোসেনি বলিলেন যে, সেখ ফরীদ সেই রাত্রে শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে কখনও সক্ষম হইবেন না, কারণ তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন যে খসরুর সৈন্য সংখ্যা তাঁহার অপেক্ষা অধিক। আমরা যখন এইরূপ আলোচনায় নিমগ্ন ছিলাম, তখন সংবাদ পাইলাম যে, সেখ ফরীদ জয়ী হইয়া খসরুকে বন্দী করিয়াছেন। জমালুদ্দিন তথাপি এই সংবাদে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া আমার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন যে, ইহা কখনও সত্য নহে। কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদের সকল সংশয় বিদূরিত হইল; খসরু এবং তাহার একজন সেনাপতি আমার সম্মুখে নীত হইল। এই দুঃসময়ে সেখ ফরীদ এবং বাহাদুর খাঁ সাতিশয় বিচক্ষণতা এবং বীরত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কারণে আমি বাহাদুর খাঁকে পাঁচ হাজারের পদে উন্নীত করিয়া, রাজপতাকা এবং বহুমূল্য সাজে সজ্জিত অশ্ব উপহার প্রদান করিলাম এবং তাঁহাকে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলাম। সেখ ফরীদ এতদিন দুই হাজার সৈন্যের অধিনায়ক আমীর ছিলেন; এক্ষণে আমি তাঁহাকে চারি হাজারের পদে উন্নীত করিলাম। সয়েদ মহম্মদের পুত্র সয়েফখাঁও এই যুদ্ধে সাতিশয় বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের নানা অংশে তিনি সতেরটি আঘাত প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধে সয়েদ জালাল হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগে এক দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন। কিয়দ্দিন পরে তিনি ইহাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি এক সম্ভ্রান্ত আফগান পরিবারের সন্তান ছিলেন। খসরুর দুইজন সেনাপতি সয়েদ হালাল এবং তাহার ভ্রাতা নিতান্ত ভীত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। উইমাক্ সম্প্রদায়ের চারিশত নেতা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে এবং সাতশত নেতা বন্দী অবস্থায় আমার সম্মুখে নীত হয়। খসরুর রত্নালঙ্কারের সিন্দুক কতকগুলি অজ্ঞানিত লোকের হস্তে পতিত হয়। তাহারা ইহা লইয়া পলায়ন করে। এই সিন্দুকে ১৮ কোটি টাকার রত্নালঙ্কার ছিল। সেই দিনই আমি লাহোর নগরে প্রবেশ করিলাম এবং তথাকার প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। হস্তীর লড়াই দেখিবার জন্য পিতা এই প্রাসাদের মধ্যে একটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমি রাভি নদীর তলদেশে বহু তীক্ষ্ণ শূল পুতিতে

আদেশ দিলাম এবং এই মণ্ডপে বসিয়া যে সাতশত বিদ্রোহী খসরুর সহিত যোগদান করিয়াছিল তাহাদিগকে আমি তাহার উপর ফেলিয়া মারিয়া ফেলিতে আদেশ দিলাম। এই শাস্তির ন্যায় কষ্টদায়ক শাস্তি আর নাই, কারণ ইহাতে শীঘ্র মৃত্যু হয় না। এই ভয়াবহ শাস্তির ভীষণ যন্ত্রনা দেখিয়া লোকে আর সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিবেনা বলিয়া এই শাস্তির ব্যবস্থা করিলাম। আমার রাজত্বের প্রথমেই লাহোর নগরের অসন্তুষ্ট ভণ্ডদিগের মধ্যে অধিককাল বাস করা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া এবং আগ্রা নগরীতে রাজকোষ থাকা হেতু আমি শীঘ্রই রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। হতভাগ্য, অনুতপ্ত খসরুকে দিলওয়ারখাঁর অধীনে বন্দী করিয়া রাখিয়া আসিলাম। পুত্রই সাম্রাজ্যের মঙ্গল চেষ্টার এবং রক্ষার প্রধান আশ্রয় ও অবলম্বন। তাহার সহিত সর্ব্বদা এই প্রকার বিরোধ থাকা সকল উন্নতির প্রতিবন্ধক। আমি কখনও বিজ্ঞতাশূন্য পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হই নাই। আমি চিরকালই আমার বিবেক বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা আমার সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। আমার গুরু ও পিতামহাশয়ের এই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকি। তিনি বলিতেন যে রাজপুত্রদের দুইটি গুণ থাকা আবশ্যক; উপযুক্ত সুযোগ সকল কার্য্যে লাগাইবার বুদ্ধি এবং বিশ্বস্ততা। সাম্রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধে একটির প্রয়োজন এবং নিজের সৌভাগ্য রক্ষা করিবার জন্য অন্য গুণটি আবশ্যক। কিন্তু প্রায়ই আমাদের অজ্ঞাতসারে উন্নতির সুযোগগুলি আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করে।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন আমি রাজধানী আগ্রা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। হতভাগ্য খসরু তাহার অন্যায় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তিন দিন এবং তিন রাত্রি খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করে নাই এবং কিছুই পান করে নাই। এই কয়দিন সে হাহাকার এবং ক্রন্দন করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। তপস্বী এবং যোগীগণই এতদিন অনাহারে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারাও জীবন রক্ষার জন্য দিনে একবার আহার করিয়া থাকে। খসরু তাহাও করে নাই।

কালু জেন, নিপুণতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং পরিশ্রমশীলতায় তাহার পিতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। দিবা রাত্রি অবিশ্রান্তরূপে সে আমার সেবা করিয়া থাকে এবং রৌদ্র, বৃষ্টি ও শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিয়া সে তাহার যষ্টির উপর ভর দিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করে। শিকারের সময়ও সে নিয়মিতরূপে পাঠ করিতে ত্রুটি করে না। এই সকল কার্য্যের জন্য আমার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই আমি তাহাকে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক পদ প্রদান করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাহাকে দুই হাজারের পদ প্রদান করিলাম। কিন্তু তাহার ধনবৃদ্ধি বশতঃ সে আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রমশীল নাই। লোকদিগের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদিগের কার্য্য প্রণালী দেখাই রাজাদিগের কর্ত্তব্য, এবং কার্য্যের গুণানুসারেই তাহাদিগকে ধনে এবং পদমর্য্যাদায় উন্নত করা কর্ত্তব্য। আমার পিতা এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রতি মাসের প্রথম দিবসে তিনি প্রথমে তাঁহার বন্দুক হইতে একটি গুলি নিক্ষেপ করিলে সমুদয় আমীর তাঁহাদের বন্দুক হইতেও ঐ প্রকারে গুলি নিক্ষেপ করিবেন এবং তৎপরে সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্ব নিম্ন পদস্থ সৈন্যগণও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। যুদ্ধ ব্যতীত এই দিন ছাড়া অন্য কোন দিন বন্দুক এবং কামান ছুঁড়িবার নিয়ম ছিল না। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে আমিও রাজ্যের মধ্যে এই নিয়ম স্থির রাখিতে আদেশ দিয়াছি। আমি আমার বন্দুক দ্রুস্তন্দাজ হইতে একটি গুলি নিক্ষেপ করিলে, সমুদয় কর্ম্মচারী তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। তেফাঙ্গ নামক বন্দুক লক্ষ্যভেদে এ প্রকার স্থির এবং ইহার নির্ম্মাণ কৌশল এতদূর সূক্ষ্ম এবং সুচিন্তিত, যে কোন সৈন্য শ্রেণীর পুরোভাগে যদি এই প্রকার ৫০ হাজার বন্দুকধারী উষ্ট্রারোহী সৈন্য থাকে তবে তাহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে। সমগ্র সাম্রাজ্যের দুর্গ সমূহ, প্রধান নগর সকল এবং

অন্যান্য স্থান রক্ষা করিবার জন্য ৩০ লক্ষ সৈন্য ব্যতীত কেবল আমার নিকটে এবং কিঞ্চিৎ দূর-স্থানে এক্ষণে ৫ লক্ষ উষ্ট্রারোহী এবং পদাতিক সৈন্য আছে। এতদ্ব্যতীত সাম্রাজ্যের অসংখ্য দুর্গ সমূহের মধ্যে অগণিত কামান, বন্দুক, গোলাগুলি আছে। এক একটি কামানে ৮ শত ৪০ সের বারুদ এবং গুলির প্রয়োজন হয়।

যখন আমি লাহোর পরিত্যাগ করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম তখন যে পথ দিয়া আমি আগ্রায় আসিলাম সেই পথের চতুপার্শ্বস্থ জমিদার-দিগকে ঐ রাস্তার দুইদিকে এবং প্রত্যেক নগর গ্রাম ও আমার বিশ্রামস্থলে তুঁতবৃক্ষ এবং অন্যান্য প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল রোপণ করিতে আদেশ দিলাম। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ হইতে পথশ্রান্ত পথিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই প্রকার ছায়াল বৃক্ষ রোপন করিতে বলিলাম। আগ্রা হইতে লাহোর পর্য্যন্ত প্রতি দুই ক্রোশ পরে ইষ্টক অথবা প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় পান্থশালা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলাম এবং প্রতি পান্থশালায় একটি স্নানা-গার এবং একটি পুষ্করিণীও রাখিতে বলিলাম। এই সকল পান্থশালার তত্ত্বাবধানের জন্য কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া দিলাম। কর্ম্মরত পথিকদিগের কার্য্যের কোন প্রকার ব্যাঘাত না হয় এই জন্য প্রতি নদীতে লোক যাতায়াতের পথে সেতু নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলাম। এই প্রকারে আগ্রা হইতে বঙ্গদেশ—এই ছয় মাসের রাস্তার সর্ব্বস্থানে বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে এবং পান্থশালা নির্ম্মিত হই-য়াছে। এই বৃক্ষ এক্ষণে বৃহৎ হইয়াছে সুতরাং শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকেরা তাহার ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে। এইদিকে আমার অনুরাগ দেখিয়া ধনীগণ, আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য এই পথের স্থানে স্থানে নানাপ্রকার ফলের বাগান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে যাঁহারা আমার এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিবেন তাঁহাদিগকে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। কিয়দ্দূর ব্যবধানেই তাঁহারা বাসের জন্য আরামপ্রদ গৃহ এবং আহার ও শ্রান্তিনাশের জন্য নানাপ্রকার তৃপ্তিদায়ক ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য পাইবেন ; তাঁহাদের ভ্রমণের কোন ক্লেশ পাইতে হইবে না। আমি দৃঢ়রূপে বলিতে পারি, ইহকাল এবং পরকালের সুগতির জন্য এইরূপ কার্য্য করাই বিধেয়। এই প্রকার পরোপকারের কার্য্যই আমাদের মৃত্যুকে পবিত্র করে। মানবের প্রতি উপকার সূচক কার্য্য সকলই পৃথিবীতে আমাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে। কিন্তু ইহার জন্য কখনই গর্ব্বিত হওয়া উচিত নহে। পুরস্কারের লোভে ঈশ্বরের কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। যে সকল নীতি দ্বারা রাজাদের পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে এই একটি উপ-দেশ আছে যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সম্মতি না লইয়া কোন কার্য্য করা অতিশয় বোকামি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে নিজের মনের স্থিরতা ব্যতীত অন্যের পরামর্শে কোন ফল হয় না এবং অন্যের পরামর্শে রাজ্যসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য পরিচালিত করিলে অন্তরের মধ্যে একজন মানবকে ঈশ্বরের সহযোগী করিয়া দেওয়া হয়। অন্যের পরামর্শ এবং উপদেশ দ্বারা যিনি সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেন এবং প্রজার সুখ দুঃখ নির্দ্ধারিত করেন, পরামর্শদাতার পরামর্শে তাঁহার রাজ্যে কোন অত্যাচার, অবিচার অনুষ্ঠিত হইলে পরকালে তাঁহাকেই তজ্জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য রাজাকেই কৈফিয়ৎ প্রদান করিতে হইবে, তাঁহার পরামর্শদাতাদিগকে নহে। যাঁহার হস্তে রাজদণ্ড এবং রাজমুকুট আছে, তিনি যদি প্রজার সকল দুঃখের বিষয় অবগত থাকেন তবে তাহা কি প্রকার শোভনীয় হয়! সাম্রাজ্যের মূলে এই প্রকার কর্ত্তব্য-শীল কর্ণধার থাকিলে প্রজাগণের সকল অভাব শীঘ্র বিদূরিত হয়।

মৌসাহেব খাঁ অতিশয় সাহসী এবং একজন প্রসিদ্ধ বীর। আমার পিতার সময় তিনি পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক আমীরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে পাঁচ হাজারের পদ উন্নীত করিলাম এবং গুজরাটের সমুদয় সৈন্যের

অধিনায়ক পদ প্রদান করিলাম। এই দুঃসাহসিক ব্যক্তির বীরত্বপূর্ণ কার্য্যসমূহ বীর স্তম্ভের কার্য্যের অনুরূপ। গুজরাট প্রদেশ পূর্ব্বে জঙ্গলপূর্ণ, পর্ব্বতময় অরণ্যভূমি ছিল এবং অকর্ষিত পতিত অবস্থায় পড়িয়া-ছিল। কিন্তু তাঁহার সুশাসনে এবং সুবন্দোবস্তে শীঘ্রই ইহা পরিষ্কৃত হইল এবং জনপদে পূর্ণ হইল ; পথিকগণ নির্ভয়ে সর্ব্বথা বিচরণ করিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে আমি তাঁহাকে খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিলাম। একদা পিতা, লাহোরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ৪ হাজার লোক লইয়া সিংহ শীকার করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে মৌসাহেব খাঁ অদ্ভুত বীরত্ব এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। পিতা একটি হস্তীতে আরোহণ করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেন। এই জঙ্গলে ২০টি সিংহ এবং সিংহী ছিল। পিতা জঙ্গলে প্রবেশ করিবামাত্রই তিনটি সিংহী তাঁহার হস্তীকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে এবং একটি সিংহী প্রকাণ্ড লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আমার পিতার উরুদেশ দংশন করে। সৌভাগ্য বশতঃ এই সময়ে মৌসাহেব খাঁ তাঁহার অশ্ব "কোপারা"র আরূঢ় হইয়া এই স্থানে আগমন করেন। তিনি এই ভীষণ অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুকে রক্ষা করিতে ছুটিলেন এবং এক হস্তে সিংহীর গলা ধরিয়া অন্য হস্ত দ্বারা একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা তাহার পেটে বিদ্ধ করিয়া দেন। সিংহী তৎক্ষণাৎ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে পতিত হয়। তৎপরে অপর দুইটি সিংহী মৌসাহেব খাঁকে আক্রমণ করে। তিনি তৎক্ষণাৎ দুই হস্তে তাহা-দের গলা ধরিয়া দুই সিংহীর মস্তক এত জোরে ঘর্ষণ করেন যে তাহাদের মুখ এবং নাক দিয়া মস্তিষ্ক নির্গত হইয়া পড়ে। এই সকল বীরত্বপূর্ণ এবং সাহসিক কার্য্যের জন্য তাঁহাকে যোগ্যরূপেই "সেরেফ্ফাজ খাঁ" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি যেপ্রকার বীর, সেইপ্রকার রণকুশল। মির্জা মহম্মদও বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। তিনি মুসেদের এক সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব। আমার পিতার রাজত্বের সময় তিনি পাঁচশতের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আমি তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বেই এক হাজার সৈন্যের অধি-নায়ক আমীরের পদ প্রদান করিয়াছিলাম। একদা একটি প্রকাণ্ড সিংহ আহতাবস্থায় আমার নিকট নীত হয়। আমার নিকট আসিবার কয়েকদিন পরে তাহার মৃত্যু হয়। তরবারীর এক আঘাতে তাহার দেহ হইতে মস্তকটি বিচ্যুত করা যায় কিনা তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হয়। অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে ইহার গলদেশের কেশর এত ঘন যে দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করা অসম্ভব। রাজা মানসিংহের এক আত্মীয় রাজপুত, শারীরিক বল এবং বীর্য্যের জন্য বিখ্যাত। তিনি বলিলেন যে আমার অনুমতি পাইলে তিনি এক আঘাতেই তাহার মস্তক ছেদন করিতে পারিবেন। আমি অনুমতি প্রদান করিলে তিনি সজোরে সিংহের গলদেশে তরবারীর দ্বারা আঘাত করেন। কিন্তু তাহাতে কয়েকটি কেশর কাটিয়া গেল, আর কোনই ফল হইল না। ইহা দেখিয়া মির্জা মহম্মদ অগ্রসর হইলেন এবং সিংহের মস্তক-ছেদন করিতে আমার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আমি বলিলাম, "ঈশ্বরের নামে আপনাকে এই অনুমতি দিতেছি, দেখি আপনি কি করিতে পারেন।" তদনুসারে তিনি তরবারী উত্তোলন করিয়া এত জোরে উহা সিংহের গলদেশে ফেলি-লেন যে তাহার মস্তক, দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে গিয়া পড়িল ; দর্শকগণ আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ত্রিশ হাজার টাকা উপহার প্রদান করিলাম এবং তাঁহাকে মির্জা মহম্মদ সের-বি-দাও নিম উপাধিতে ভূষিত করি-লাম। অপর এক সময়ে আমার পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা কোকার পুত্র মির্জা সাম্‌সি গুজরাট হইতে আমাকে একটী উৎকৃষ্ট ধনুক প্রেরণ করেন। অতি বলশালী ব্যক্তিও এই ধনুক বাঁকাইতে সক্ষম হইত না। দর্শকদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া মির্জা মহম্মদ এই ধনুক এত বাঁকাইয়া ফেলেন যে মধ্যস্থল ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহাতে আমি তাঁহাকে এক হাজারের পদ হইতে পনের

শতের পদে উন্নীত করিলাম এবং মির্জা মহম্মদকে শিচ্‌কে-মন (ধনুর্ভঙ্গকারী) উপাধি প্রদান করিলাম। আমি তাঁহাকে লাহোরের সীমান্ত দেশের ফৌজদার নিযুক্ত করিলে, তিনি সেই প্রদেশের কোন পরাক্রান্ত রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং তাহাকে পরাজিত করেন। এই সংবাদ পাইয়া আমি তাঁহাকে একটী উৎকৃষ্ট হস্তী উপহার দিলাম এবং তেওহার খাঁ উপাধি প্রদান করিলাম। তৎপরে আমার পরিবারস্থ কোন মহিলার সহিত তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। আমার আমীর দিগের মধ্যে বৌকার নুদ্‌জাম থাউনি শৌর্য্য, বীর্য্যের জন্য বিখ্যাত। ধনুর্ব্বাণ চালনা করিতে পৃথিবীতে ইঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই। তাঁহার এই বিদ্যা পরীক্ষার নিমিত্ত একদা এক সন্ধ্যাকালে আমার সম্মুখে একটী স্বচ্ছ কাচের বোতল রক্ষিত হয়। এই বোতলের কিঞ্চিৎ দূরে একটী আলো স্থাপিত করা হয় এবং একটী মোমের মক্ষিকা প্রস্তুত করিয়া বোতলের পার্শ্বে রক্ষিত হয়। তৎপরে এই মক্ষিকার উপরে একটী চাউল এবং একটী লঙ্কার বিচি রাখা হয়। নুদ্‌জাম্ থাউনি প্রথমে একটী তীর দ্বারা লঙ্কার বিচিটি বিদ্ধ করেন, তৎপরে আর একটী তীর দ্বারা চালটি দূরে নিক্ষেপ করেন এবং কাচের বোতলটিকে কিছু মাত্র স্পর্শ না করিয়া তৃতীয় তীর দ্বারা মোমের মক্ষিকাকে আঘাত করেন। ধনুর্ব্বিদ্যায় ইহা অপেক্ষা অধিক নিপুণতা আর কেহ দেখাইতে পারে না। * দর্শকগণ তাঁহার অদ্ভুত কৌশল দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমিও তাঁহার নিপুণতায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে এক হাজারের পদ হইতে দুই হাজারের পদে উন্নীত করিলাম এবং নুরজাহান বেগমের ভগিনী-কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় প্রদান করিলাম। এই পরিণয় হওয়াতে তিনি আমার পুত্রের তুল্য হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে কান্দাহারের পথসমূহে আফগানগণ পথিকদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বেই এই দস্যুদিগের দমনার্থ এক দল সৈন্য নিযুক্ত করিতে স্থির করিয়াছিলাম। এক্ষণে এ বিষয়ে কোন উপায় অবলম্বন করিব তাহা যখন চিন্তা করিতেছিলাম তখন আমার রাজ সভার এক জন প্রসিদ্ধ সদস্য আল্লাদাদ খাঁ দস্যুদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে এমন প্রমাণ উপস্থিত করিলেন যে আমি ঐ প্রদেশের জন্য এক জন ফৌজদার নিযুক্ত করাই উচিত বিবেচনা করিলাম এবং স্থির করিলাম যে দস্যুগণ ইহাকে ও অবহেলা করিলে তাহাদিগের বিনাশ সাধনের ব্যবস্থা করিব। আমি আল্লাদাদ খাঁকেই উক্ত প্রদেশের ফৌজদার নিযুক্ত করিলাম। কাবুলের রাস্তায় যে সকল দস্যু অত্যাচার করিয়া থাকে তাহাদিগকে দমনের জন্য লস্কর খাঁকে তথায় প্রেরণ করিলাম। লস্কর খাঁর পূর্ব্বনাম খাজা আবুল হোসেন ছিল। তিনি বহুদিন হইতে তৈমুর বংশের অধীনে কর্ম্ম করিতেছেন। লস্কর খাঁ গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে ৪০ সহস্র অশ্বারোহী এবং পদাতিক পার্ব্বতীয় সৈন্য কামান বন্দুক লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ চলিল। পরিশেষে শত্রুগণ পরাজিত হইল এবং তাহাদের ১৭ হাজার সৈন্য হত, বহু সংখ্যক বন্দী ও অবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিল। বন্দীগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আমার সম্মুখে আনীত হইল। সতের হাজার সৈন্যের মস্তক তাহাদের গলদেশে লম্বিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বহু চিন্তার পর স্থির করিলাম যে বন্দী দিগের প্রাণ বিনাশ করিব না। আমার হস্তী সমূহের খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলাম।

(ক্রমশঃ)

* সম্রাট জাহাঙ্গীরও ধনুর্ব্বিদ্যায় অতিশয় দক্ষ ছিলেন।

শৈলে
হেমন্ত-প্রকৃতির প্রতি।

কুয়াসা-আঁচলে আনন ঢাকিয়া
প্রকৃতি অয়ি,
কেন গো আজিকে রয়েছ সাজিয়া
বিষাদময়ী ?
নাহি ও অধরে হাসি সুকুমার,
না দোলে চিকুরে চারু ফুল-ভার
শূন্য সকল কুঞ্জ তোমার
বিহগ ধরে না তান !—
সিক্ত করিছে নয়ন-আসার
ধরণীর হিয়া খান !

না বুঝি তোমার কেনগো এমন
যোগিনী-বেশ,
জীবনের সব আবেশ-চেতন
হ'ল কি শেষ ?—
মরম-মর্ম্মে নীরবে পশিয়া
পুণ্য আসনে একেলা বসিয়া
পূজা উপচার যতনে লইয়া
ধেয়ান করিছ কার ?—
কোন্ সে দেবতা ধন্য মানিয়া
নিবে তব উপহার !

দেখেছিনু তোমা সেই সে কখন
নিদাঘ ভোরে
মধুর সুখের স্বপন যেমন
আলস-ঘোরে !
চারি ধারে হাসি চারি ধারে গান
চির-অফুরণ-উৎস সমান
উথলি উঠিতেছিল গো মহান্
বিশ্ব-মানস হরি'—
নীরব সকল ভাব-অভিধান
আকুল পুলকে মরি !

মেঘ-শিশুগুলি থরে থরে থরে
গিরির গায়
ঘুম পাড়াইয়া যতনে আদরে
রাখিলে হায়!
একটি একটি দেব-শিশু সম
ঘুমাইয়া তারা ছিল নিরুপম
না জানিত ধরা কত নিরমম
পাপ-কলুষ মাথা—
আশার মাঝারে লুকান কি ভ্রম
হরিষে বিষাদ ঢাকা!

আজি তাহাদেরে বিলাইয়ে দিয়ে
জগত-কাজে
আছ কি জননি, আপনি মরিয়ে
মরম মাঝে!
কল্যাণ বিনে তাহাদের আর
নাহি কিবা কিছু ভাবনা তোমার
শোভা-হাসি-গান লব আপনার
তাই কি তেয়াগি' আজ
করিতেছ পূজা নিজনে অপার
বিশ্ব ভুবন-রাজ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

অমর কবি শেলি।

বীণার তন্ত্রীগুলি যখন নীরব, উহাতে মোহিনী তান লয় সকল নিবদ্ধ থাকে; ঝঙ্কার দাও অমনি বাজিয়া উঠিবে—নীরব বীণায় রাগ রাগিণী উঠিয়া প্রাণ মন মুগ্ধ করিবে। কবির কাব্যের কথা ধরিতে গেলেও তাহাই। কাব্যের পশ্চাতে যে ভাব সকল নিবিষ্ট রহিয়াছে, নীরবে হৃদয় লইয়া প্রবেশ কর, আস্বাদন কর; গানে এবং বীণাতন্ত্রিতে মিলিয়া যেমন মানবের মনে এক অপূর্ব্ব ভাব-সমুদ্র উত্থিত হয়—কবির ভাষার পশ্চাতে যে সত্য, যে আনন্দ, যে ভাব সাগর নিহিত রহিয়াছে তাহার সহিত মানব মনের মিলন হইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ-রস-ধারা উত্থিত হইবে। প্রেমিক সেখানে কবিকে আপন পাইয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত, ভক্তজন কাব্য-রস পানে মুগ্ধ হইয়া ভগবানের অসীম করুণায় বিমুগ্ধ। তখন কবি ও যেমন ধন্য, কবিত্বেরও তেমন পূর্ণ সম্ভোগ।

জগতে যে সকল মহাপুরুষ মানবকে আনন্দ দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ইংরেজ কবি শেলি এক-জন। তিনি সমগ্র মানবজাতিকে আপন বুকে টানিয়া নিবার জন্য বাল্য হইতে জীবনের শেষ দিন

পর্য্যন্ত উন্মুখ ছিলেন। কবিতায় সেই ভাব ফুটিয়া রহিয়াছে। ইংরেজ কবিদের মধ্যে শেলির মত উচ্চ ভাবাপন্ন আর কেহ নয় ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শেলি ভাব-সাগরে ডুবিয়া কাব্যে যে সকল মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে জগত মুগ্ধ। উর্দ্ধগামী ব্যোমচরের ন্যায় অনন্ত নীলাকাশে উঠিতে উঠিতে অদৃশ্য পাখীর ন্যায় পাখা ঝাড়া দিয়া শেলি যেন সকল কাব্যে অনন্ত সৌন্দর্য্য সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় এক শতাব্দি অতীত হইতে চলিল-শেলির সঙ্গে যাঁহার পরিচয় হইয়াছে তিনিই মুগ্ধ হইয়া যান্। তিনি আত্মহারা প্রেমিক ছিলেন। নির্ম্মল জীবনের উচ্চভাব সকল তাঁহার সমস্ত কাব্যকে বিমল নির্ম্মল ভাব রাশিতে পুরিত রাখিয়াছে, কোন মলিনতা নাই।

আমি শেলির কবিতার কথা বলিতে অথবা সমালোচনা করিতে প্রয়াসী হইব না। তাঁহার কবিতার পরিচয় দিতে যে জ্ঞানের অধিকারী হও-য়ার প্রয়োজন তাহার কণা মাত্র আমার নাই। আমি সুধু এই মহৎ জীবনের দু'চারিটী কথা যাহা নানা গ্রন্থে এবং নানা জীবনচরিতে পাইয়াছি এবং যেখানে যাহা পাঠ করিয়া শেলিকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি, তাহারই কিছু পরিচয় সহজ ভাষায় বলিতে প্রয়াসী।

স্কুলে শেলি অত্যন্ত নীরব থাকিতেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীগণ শেলিকে অভিমানী মনে করিয়া অত্যন্ত গঞ্জনা দিতেন। পরে তাঁহারা বুঝিলেন শেলির নীর-বতা অহঙ্কারের পরিচায়ক নহে। তাঁহার মনের গতি এবং প্রতিমুহূর্ত্তের ভাব সকল তাহাদের চিন্তা-শক্তির অতীত। জীবনের প্রভাতে—তখনও শেলি স্কুলের বালক—যে দিন প্রথম তাঁহার প্রাণে জগ-তকে আলিঙ্গন করিবার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং কবিতারাণী আপনি আসিয়া তাঁহার হৃদয়পদ্মে আসন লইয়াছিলেন সে দিন তিনি হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া মনে করিলেন যেন মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—কি যেন অচিন্তনীয়, অভাবনীয় এক আনন্দ-প্রস্রবন অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার দুই চারিটী লাইন উদ্ধৃত করিলাম:—

"I do remember well the hour which burst
My spirit's Sleep: a fresh May dawn It was,
When I walked forth upon the glittering grass
And wept, I knew not why:
* * * *
And then I clasped my hands and looked around;
But none was near to mock my streaming eyes,
Which poured forth their warm drops on the sunny ground:
So without shame, I spake:—I will be wise,
And just, and free, and mild, if in me lies
Such power; for I grow weary to behold
The selfish and the strong still tyrannize
Without check or reproach:"

শেলির জীবন-চরিত প্রণেতা প্রসিদ্ধ বারনেট্ স্মিথ্ লিখিয়াছেন, ষোল বৎসর বয়স হইতে শেলি কখনও মদ্য মাংস স্পর্শ করেন নাই। মাংস খাই-তেন না জীব-হিংসায় কাতর হইয়া; মদ খাইতেন না উহা গরিবের রক্ত নিষ্পেষণকারী বহু পরিশ্রমে তৈয়ারী হয় বলিয়া। অনেকে হয়ত মনে করেন শেলি ইংরাজ হইয়া মদ খাইতেন না ইহা কিরূপ; কিন্তু তাঁহার জীবনী লেখক স্পষ্ট ভাষায় ইহা লিখিয়া গিয়াছেন।

ইটন হইতে স্কুল ছাড়িয়া অক্সফোর্ডে কলেজ

প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কিছুকাল তিনি গৃহে থাকিয়া নির্জ্জনে পাঠে নিমগ্ন ছিলেন। সমস্ত দিন পড়িতেন, অনেক সময় আহারাদি ভুলিয়া যাইতেন। এমন দিন গিয়াছে, ভৃত্য আসিয়া দেখিতে পাইত টেবিলে খাবার পড়িয়া রহিয়াছে, চেয়ারে বসিয়া শেলি কাঁদিতেছেন—কি লিখিতেছেন, কি পড়িতেছেন, কি ভাবিতেছেন, চক্ষু দুইটী জলে ভরা। রাত্রিতে বেড়াইতেন। কলেজে প্রবেশ করিলে কিছু কিছু লিখিতে লাগিলেন। ঐ সকল লেখা পাঠ করিয়া সকলে তাঁহাকে একজন নিরীশ্বর বাদী উদ্‌ভ্রান্ত যুবক মনে করিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিল। সমপাঠী, শিক্ষক, বন্ধুগণ এবং চতুর্দ্দিক হইতে আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহাকে তাঁহার ঐ প্রকার দুরন্ত ভাব সকল পরিত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরে তিনি কলেজ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

বাল্য-জীবনেই তাঁহার হৃদয় মন অসামান্য উদারতা এবং প্রশস্ততা লাভ করিয়াছিল। শীতকালের রাত্রিতে বেড়াইতে বেড়াইতে শেলি একদিন এক বৃদ্ধা রমণীকে রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কোলে করিয়া লইয়া আসিলেন, দুই তিন দরজায় ধাক্কা দিয়াও সাড়া না পাইয়া এক ডিউকের (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডিউক ও তাঁহার পত্নী গাড়ী হইতে তখনই অবতরণ করিতেছিলেন, শেলি কাতরকণ্ঠে ঐ বৃদ্ধা মৃতপ্রায় রমণীটিকে সেই রাত্রির জন্য গৃহে স্থান দিয়া বাঁচাইবার জন্য শত অনুরোধ করিলেও যখন উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শেলির প্রতি কটূক্তি করিয়া কর্কশ বচনে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন, তখন তিনি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন :—It is such men as you who madden the spirits and patience of the poor and the wretched; and if ever a convulsion comes in this country, (which is very probable) recollect what I tell you: you will have your house, that you refuse to put this miserable woman into, burnt over your head. শেলি তাঁহার আপন গাত্রাবরণ খুলিয়া রমণীকে পরাইয়া দিলেন এবং একখানা গাড়ী করিয়া বহুদূরে একটী বন্ধুর বাড়ীতে তাঁহাকে রাখিয়া দুরন্ত শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে হাঁটিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

দিন দিন তাঁহার হৃদয় মানবের দুঃখে এতই কাতর হইয়া উঠিল যে অবস্থা স্বচ্ছল হওয়ার পর তিনি দৈনিক প্রয়োজনীয় টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট মার্লোবাসী দরিদ্রদিগকে দান করিয়া আসিতেন।

শেলির নামে অনেক প্রকার দুর্নাম উঠিয়াছিল। শেলির বন্ধু, লেইহাণ্ট একদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি বাইরনকে লিখেন "শেলির নামে আমরা বাহিরে যত দুর্নাম শুনিতে পাই, তাহা সব্ মিথ্যা; শেলিকে দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়। দেখিলাম, শেলি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া কয়েক ঘণ্টা লেখা পড়ার পর সামান্য আহার করেন—পরে বাহিরে গিয়া আপন পল্লীর পিতৃমাতৃহীন শিশুদের শুশ্রূষা করেন, তৎপর দুই প্রহরে কোন গ্রীক্ গ্রন্থকারের পুস্তক অথবা বাইবেল লইয়া, হয় তাঁহার নৌকাখানি লইয়া বাহির হন, অথবা কোন নিভৃত বনে যাইয়া কিছুকাল পাঠে নিমগ্ন থাকেন। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সামান্য শাক্ সব্‌জি আহার করেন (কারণ তিনি মদ্যমাংস স্পর্শ করেন না)। তৎপর স্ত্রীকে ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পড়িয়া শুনান্, সন্ধ্যায় আপন মনে নির্জ্জনে বসিয়া কিছুকাল চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তৎপর রাত্রি অধিক না হইতে নিদ্রা যান্, ইহাই দেখিলাম শেলির বর্ত্তমান জীবন।"

হৃদয়গ্রাহী জীবনীলেখক বারনেট্ স্মিথ্, শেলির জীবন লিখিতে লিখিতে যে কয়টী কথা লিখিয়া তাঁহার পরদুঃখকাতরতা ও মানবপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, আমি তাহার কয়েকটী লাইন উদ্ধৃত করিলাম :—

"The record of his life is one of generous impulse and action from its

commencement to its close. A benignity and reverence, worthy of all praise, animated him in his relations to man and the humbler creation; to breathe, to him was to aspire to do good, irrespective of recognition or reward. His own appetites were conquered and held in subjection, so that he could be of service to humanity. The plainest food sufficed for his daily needs, and he would never use the produce of the cane so long as it was obtained by slave labour. Fragile in health and frame; of the purest habits in morals; but of devoted generosity and universel kindness; glowing with ardour to obtain wisdom; resolved, at every personal sacrifice to do right; burning with a desire for affection and sympathy, *he was treated as a reprobate, cast forth as a criminal.*"

আমি শেলির কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলি নাই—বলিতে সাহসী নহি। এই বিষয়ের সহিত জ্ঞানী ও বিদ্বজ্জন পরিচিত। তাঁহাকে লোকে নাস্তিক বলিয়া জানে, সে বিষম ভুল; তাঁহাকে যাহারা চিনিয়াছিল, তাহারা বুঝিত তিনি কি ভাবে জগৎপতিকে জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ জ্ঞানান্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ঈশ্বর বিশ্বাস সম্বন্ধে এবং ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহমূলক উদ্‌ভ্রান্ত কথাবার্ত্তা ছিল, বলিয়াই তাহার দেশবাসী তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া নানা তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে ফেলিয়াছিলেন। তিনি ঐ প্রকার উদ্‌ভ্রান্ত ভাব সকল কিছুকাল পোষণ করাতে পিতৃ সম্পত্তি ও আত্মীয়-জন-স্নেহ হইতেও বঞ্চিত হন। লোকে তাঁহাকে ঘৃণা করিত। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকল অবিশ্বাস দূরে ফেলিয়া দিলেন। তিনি যে ভাবে ভগবানকে ধারণা করিতেন, সকল মানুষ তাহা করিতে পারে না। তাঁহার চিন্তাস্রোত, মনের প্রসাদতা, ধর্ম্মবিশ্বাস অন্যান্য প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তাই সহজে মানুষ তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিত না। তিনি ঈশ্বরকে ভাল করিয়া ধরিতে পারিতেছেন না বলিয়া প্রাণের গভীর বেদনা লেখায় প্রকাশ করিতেন। প্রায়ই লিখিতেন,—"The great unknown" অর্থাৎ "সেই চির অপরিচিত পুরুষ।" কিন্তু তাঁহার চিত্ত ভগবানের জন্য অস্থির ছিল।

বাইরন Queen Mab পড়িয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে পরে তিনি বহু স্থানে, বহু সমাজে এবং অনেক লেখায় প্রকাশ করিয়াছেন "Shelleyism is never infidelity", "শেলি কখনই অবিশ্বাসী নয়—শেলির ধর্ম্মভাব কখনও ঈশ্বরে অবিশ্বাস নয়", শেলি জীবনের শেষ ভাগে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিতেন। "অন্ধকার হইতে আমাকে তোমার জগৎব্যাপী জ্যোতির মধ্যে লুকাইয়া রাখ, প্রভু"; ইহাই তাঁহার দৈনিক প্রার্থনা ছিল। যিশুর জীবনে, তাঁহার দেব ভাবে তিনি এত আত্মহারা হইয়াছিলেন যে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রেম বুঝা যাইবে। তিনি Divine Nazareneকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

"A Power from the unknown God
A Promethean conqueror came
Like a triumphant path he trod
The thorns of death and shame"

শেলির কথা বলিতে গেলে অফুরন্ত। আমি মাত্র দুই চারিটী কথা বলিব বলিয়াই প্রয়াসী হইয়াছি—তাহা তাঁহার জীবনের এক পাতাও নয়। শেলির জীবনকে অন্তহীন ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার কাব্য এবং নির্ম্মল জীবনের মধ্য দিয়া একটী অনিন্দ্য সুন্দর দেবদূতের ন্যায় স্বর্গের অমৃতধারা বহন করিয়া আনিয়া তপ্ত

ও প্রেমিককে অপার্থিব আনন্দামৃতে সিক্ত করিয়াছেন। যুগে যুগে মানব তাঁহাকে এই ভাবেই পাইয়া তাঁহার অমানুষিক প্রতিভা, অসামান্য আত্মোৎসর্গ, অকৃত্রিম মানব প্রেমে বিমুগ্ধ থাকিবেন।

শেলির মৃত্যু অতি দুঃখপূর্ণ। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুলাই ৩০ বৎসর বয়সে সমুদ্রে ডুবিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি তখন স্বদেশ হইতে বিদায় লইয়া ইটালির অন্তঃপাতি পিজিয়া উপসাগরের নিকট ভিলামেগনিতে বাস করিতেছিলেন। ইটালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তাহার মনপ্রাণ মোহিত ছিল এবং এই খানে থাকিয়াই তিনি তাঁহার উৎকৃষ্ট কয়েক খানা কাব্য লিখেন। ১লা জুলাই তিনি তাঁহার বন্ধু উইলিয়মস্‌কে সঙ্গে লইয়া বন্ধু লেইহাণ্ট এবং কবিবর বাইরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লেগহরণে গিয়াছিলেন। তরি খানা ক্ষুদ্র ছিল। ফিরিবার সময় সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠিয়া শেলি, বন্ধু উইলিয়মস্ এর সঙ্গে ডুবিয়া যান। আট দিন পরে উভয়ের মৃতদেহ সমুদ্র উপকূলে পাওয়া যায়। শেলির এই শোচনীয় মৃত্যুতে হাহাকার পড়িয়া গেল। মৃতদেহ রোম নগরে প্রেরিত হইবার আদেশ মঞ্জুর না হওয়াতে উহা ঐ সমুদ্র উপকূলে দাহ করিবার আয়োজন করা হইল, লেইহাণ্ট এবং বাইরণ আসিয়া উপনীত হইলেন। কোমল দেহ যখন চিতায় উঠাইয়া দেওয়া হইল, বাইরন দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন "আমার বেলায় অমন করিওনা, দেহ যেখানে পতিত হইবে সেখানেই যেন পচিয়া যায়।"

শেলির সমাধি স্থান কোথায় তাহা কাগজ পত্র হইতে ভালরূপ নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ইহা জানা যায় যে স্থানটী অতি নির্জ্জন, শান্তিময় এবং গাম্ভীর্য্য পূর্ণ; শেলির পক্ষে আদর্শ বিশ্রাম স্থান। সমস্ত দেহ ভস্ম হইয়া গেল কিন্তু প্রজ্জ্বলিত হুতাসন হৃদ্‌পিণ্ড ভস্মসাৎ করিতে পারিল না, ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। শেলির ভস্মাবশেষ তাঁহার পত্নীকে দেওয়া হইল। তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড—যাহা সমগ্র মানব জাতির দুঃখে স্পন্দিত হইয়াছিল, যাহা আগুন ভস্মীভূত করিতে পারে নাই—সেই হৃদ্‌পিণ্ড রোম নগরে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করা হইল। শেলি এবং কীটস্ জীবনে যেমন দুই অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, তেমনি মৃত্যুর পরে রোম নগরে দুই জন পাশাপাশি কবরে নিহিত রহিয়াছেন; দুইটী অমর কবির সমাধি সেখানে কত স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

ডাক্তার বয়জি ১৮৯০ সালে ভায়ারেগিও প্রদেশে কতিপয় নাবিক ও নাবিক রমণীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মনে ঐ শব দাহের স্মৃতি তখনও পরিস্ফুট ছিল। ইহাদিগের একজন শেলির সমাধির প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিয়া দিয়াছিল। "সমুদ্র বিধৌত দেবদারু বনের সন্নিহিত একটী নির্জ্জন বনভূমি সেই সমাধি স্থান।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত।

প্রেমে।

তুমি 'তুমি' বলে' আমি বাসিয়াছি ভালো—
হে মোর নয়ন-মণি, আঁধারের আলো!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

উৎকলকবি ৺ রাধানাথ।

উৎকল প্রদেশে যে সমুদয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাতৃভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছেন সম্প্রতি পরলোকগত রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। রাধানাথ বাবুর দ্বারা যে কেবল উৎকল ভাষাই পুষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, তাঁহার সেবায় বঙ্গভাষাও তুষ্টা হইয়াছেন এবং তাঁহার মস্তকে স্বীয় মঙ্গলাশীর্বচনসম্ভার বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আপন সন্তান বলিয়া নিজকোলে টানিয়া লইয়াছেন। রাধানাথ বাবুর পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গদেশ হইতে উৎকলে গিয়া বাস করেন। সুতরাং আসলে বাঙ্গালী হইলেও বহুকাল উড়িষ্যাবাসী হইয়া তিনি তদ্দেশীয়ই হইয়া গিয়াছিলেন এবং নিজেও সেই পরিচয়ই প্রদান করিতেন। কিন্তু উৎকলবাসী হইয়াও রাধানাথ পিতামহী বঙ্গভাষাকে বিস্মৃত হন নাই; প্রথম হইতেই তিনি পিতামহীর সেবাতে বিশেষরূপ আগ্রহই দেখাইয়াছেন। যখন তাঁহার কবিতাবলী সাহিত্যোৎসাহী রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে মহোদয় কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সাহিত্য সম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শণে উহার যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা হইতেও এই কবির স্বাভাবিকী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্গীয় পূজ্যপাদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাধানাথ বাবুর কবিত্বশক্তির বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার এডুকেশন গেজেটেও ইহার সম্বন্ধে তিনি প্রশংসাবাদ করিতে বিস্মৃত হন নাই। ক্রমে রাধানাথ স্বীয় কবিত্বে সাহিত্য সেবী মহাত্মাগণের নিকট সুপরিচিতই হইয়াছিলেন।

"সুপ্রভাতে" ইহাঁর কবিত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়া গিয়াছে; আমি অদ্য তাহার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই। আমার সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার সহিত কয়েকবৎসর ব্যাপী পরিচয় ঘটিয়াছিল তাহা হইতে আমি তাঁহার স্বভাব চরিত্রের মাধুর্য্য এবং কোন কোন বিষয়ে মতামত যাহা অবগত হইয়াছি তাহাই সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত করাই আমার উদ্দেশ্য।

সকলেই জানেন যে রাধানাথ বাবু বহুকাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যাবিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং ঐ কার্য্য ব্যপদেশে উড়িষ্যার আপামর সাধারণ সকলেরই পরিচয় এবং শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে যখন পুস্তকে রাজদ্রোহমূলক কথার অনুসন্ধানের পালা পড়ে তখন রাধানাথ বাবুর ন্যায় নিরীহ ভদ্রলোকও সেই সব অনুসন্ধানকারীর হস্ত হইতে মুক্তি পান নাই। তাঁহার পুস্তকাবলীর কোন কোন কোনেও নাকি রাজভক্তির অভাবসূচক ভাব উকি ঝুঁকি মারিতে ছিল এইরূপ আমরা সংবাদপত্রে জানিতে পারি। তারপরেই তিনি উড়িষ্যা বিভাগ হইতে বর্দ্ধমান বিভাগে ইনস্পেক্টররূপে বদলী হন। এতদুভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া তৎকালিন সংবাদপত্র সমূহ সন্দেহ করিয়াছিলেন মনে হয়। যাহাই হউক তাহাতে রাধানাথ বাবুর কোনই ক্ষতি হয় নাই। বর্দ্ধমান বিভাগের মত বর্দ্ধিষ্ণু ও উন্নত প্রদেশের ইনস্পেক্টর হওয়া তাঁহার মত ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছিল।

তাঁহার নাম এবং কোন কোন গ্রন্থের সহিত আমি পূর্ব্বেই পরিচিত ছিলাম। ময়ূরভঞ্জেও অবস্থানকালীন আমি তাঁহার মহাযাত্রা নামক উৎকলভাষায় লিখিত কাব্য গ্রন্থ খানি পাঠ করি এবং তাহা পাঠ করিয়া আমি বড়ই পুলকিত হইয়াছিলাম। আমি উড়িয়া ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে পারি নাই তথাপি বিশেষ যত্নের সহিত উক্ত কাব্য খানি পাঠ করি এবং তাহা হইতেই আমি উড়িয়া কবিতার পক্ষপাতী হইয়া পড়ি। কিন্তু যতদিন ময়ূরভঞ্জে ছিলাম ততদিন তাঁহার সহিত পরিচয় সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। তাহার দুই তিন বৎসর পরে আমি হুগলি জেলার অন্তঃপাতী সেহাখালার বিদ্যা-

লয়ে কিছু দিন শিক্ষকতা করিয়াছিলাম। তখন রাধানাথ বাবু বর্দ্ধমান বিভাগের ইনস্পেক্টর। তৎপূর্ব্ব হইতেই আমি মাসিক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিতাম। প্রদীপ, অনুসন্ধান, জন্মভূমি, সৎসঙ্গ উৎসাহ, বীরভূমি প্রভৃতিতে মধ্যে মধ্যে আমার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। মাতৃভাষার যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিবার প্রয়াসই আমার ন্যায় ক্ষুদ্র অজ্ঞ ব্যক্তিকেও ঐরূপ সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। রাধানাথ বাবু নিজে একজন সাহিত্যসেবী। মাসিক পত্রাদি পাঠ করা তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। আমার শুভাদৃষ্ট ক্রমে আমার কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক ঔদার্য্যগুণে তিনি আমার প্রতি স্নেহবান্ হন। তখনও তাঁহার সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ হয় নাই। সেহাথালা হইতে স্কুল সংক্রান্ত যে সব পত্রাদি ইনস্পেক্টর আফিসে লেখা হইত তাহাতে আমার নাম দেখিয়া আমি ও ঐসব প্রবন্ধ লেখক একই ব্যক্তি কিনা তাহা জানিবার জন্য তাঁর ঔৎসুক্য জন্মে। সেহাথালা বিদ্যালয়টির স্বত্বাধিকারী ছিলেন ৺ দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ। তিনি বহুকাল বর্দ্ধমান মিউনিসিপাল স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রাধানাথ বাবু বর্দ্ধমানে ঐ স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া দিবাকর বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনার স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু কি বাঙ্গলা কাগজে লেখেন?" দিবাকর বাবু বলেন "আজ্ঞা হাঁ।" তখন তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাহিত্য সম্বন্ধে আমার লিখিত কয়টি প্রবন্ধ, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ এবং কয়টি গল্পের কথা মুখে মুখেই তাঁহাকে বলিয়া সেগুলির সম্বন্ধে বড়ই অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং দিবাকর বাবুর নিকট আমি কিরূপ স্বভাবের লোক বলিয়া তিনি আমার লেখা হইতে বুঝিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করেন; তার পর দিবাকর বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার এ অনুমান ঠিক কি না। দিবাকর বাবু অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত তাঁহাকে বলেন "যদি আপনি না হইতেন তবে আমি বিশ্বাস করিতাম না যে তাঁর সঙ্গে আপনার বিশেষরূপ পরিচয় নাই; কারণ তাঁহার স্বভাবের বিষয় আপনি যেরূপ বলিলেন, তাহা এতই তাঁর সঙ্গে মিলে যে, শুধু পরিচয় নয়, ভালরূপ পরিচয় না থাকিলে এরূপ ভাবে জানা অসম্ভব।" রাধানাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "না, না, সে কিছু নয়, আমি তবে বুঝিলাম তিনি sincere; তাঁর মনে ও মুখে দুই ভাব নয়। দুঃখের বিষয়, অনেক লেখক আছেন তাঁরা লিখেন একরূপ, কাজ করেন অন্যরূপ। ইনি তেমন নন, ইঁহার লেখার মধ্যে নিজ মত ও বিশ্বাস ঠিক ঠিকই প্রকাশ করেন ও নিজেও তদনুসারে চলেন। আমি বড় সুখী হইলাম। শীঘ্র তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ করিয়া ধন্য হইব।" দিবাকর বাবু পরে এই সব কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। আমি শুনিয়া একদিকে যেমন লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলাম, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার জ্ঞান ও বিজ্ঞতার নিকট শ্রদ্ধায় অবনত মস্তক হইলাম।

এ স্থলে একটী কথা পাঠক পাঠিকাবর্গকে নিবেদন করিয়া রাখিতে চাই। রাধানাথ বাবুর চরিত্র মাধুর্য্য দেখাইতে গিয়া আমাকে বাধ্য হইয়া অনেক সময়ই নিজ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ করিতে হইবে, তাহাতে যেন তাঁহারা অন্যরূপ বিরুদ্ধ কোন ভাব না মনে করেন। আমি কতখানি ক্ষুদ্র তাহা আমি সকলের অপেক্ষাই বেশী জানি; তবে রাধানাথ বাবু স্নেহচক্ষে আমাকে বেশী দেখিতেন, সেটা তাঁরই মহত্ত্ব; আমি তাহাতে আমার ক্ষুদ্রত্ব কতখানি বেশী, তাহাই আরও বেশী পরিমাণে বুঝিয়া লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়ি। সকলে যেন এইটুকু দয়া করিয়া মনে করেন এই এ দীনের কাতর প্রার্থনা।

ঐ উপরি উক্ত কথোপকথনের মধ্য হইতে রাধানাথ বাবুর জ্ঞান গভীরতার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আজকাল মাসিকপত্রের অভাব নাই; সুলেখক, সুলেখিকাও বঙ্গের সাহিত্য মন্দিরে আজকাল যথেষ্ট। কিন্তু পাঠকবর্গের মধ্যে কয়জন দৃঢ়ভাবে বলিতে পারেন যে, প্রথিতনামা লেখক-

বর্গেরই কয়জনের লেখা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহারা এমন ভাবে পড়েন যে, তাঁহাদের লেখা হইতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে পর্য্যন্ত একটা ধারণা তাঁহারা করিয়া ফেলিয়া থাকেন? কিন্তু রাধানাথ বাবুর সম্বন্ধে দেখুন যে যখন ঐ সব কথা হয় তখন পর্য্যন্ত আমার অন্য পরিচয় দূরে থাকুক, আমি কোথায় কি কাজ করি তাহাও তিনি কিছুই জানেন না। সুতরাং পরিচয়জনিত পক্ষপাত হইতে যে তিনি আমার প্রবন্ধ পড়িতেন তাহা নহে। অথচ আমার ন্যায় একজন নগণ্য ক্ষুদ্র অজ্ঞাতনামা লেখকের লেখা পর্য্যন্ত তিনি এইরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পড়িতেন যে, আমার ব্যক্তিগত স্বভাব, চালচলন পর্য্যন্ত তিনি ধারণা করিতে কতক পরিমাণেও সক্ষম হইয়াছেন। ইহা হইতেই তাঁহার পাঠের প্রণালী কতদূর উচ্চ ছিল, তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত কার্লাইল, পাঠের প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছেন রাধানাথ বাবুর প্রণালী ও তদনুসারিণী ছিল বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি কথা ও কার্য্যে এক হওয়াটা বিশেষরূপ পছন্দ করিতেন সুতরাং নিজ জীবনেও যেতাহা পালন করিতেন তাহাও ঐ কথোপকথন হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

এইরূপ সব কথাবার্ত্তা যে হইয়াছে আমি তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত ছিলাম না। রাধানাথ বাবুর সহিত দেখা হওয়ার পর দিবাকর বাবু আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন।

একদিন আমি স্কুলে পড়াইতেছি এমন সময় বেলা ১টার সময়ে সেহাথালার একটী ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া বলিলেন "আপনাদের ইনস্পেক্টর আস্‌ছেন।" এই কথা বলিতে না বলিতে কোট-প্যাণ্টধারী পক্ক গুম্ফকেশধারী রাধানাথ বাবু সেখানে উপনীত হইলেন এবং প্রথমেই "আপনিই কি হেড-মাষ্টার যদু বাবু?" এই বলিয়া আমার দিকে তাকাইলেন। আমি সবিনয়ে বলিলাম "আজ্ঞা হাঁ!" তিনি অমনি স্বীয় স্নেহ-বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আমাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন "আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি আজ ধন্য হইলাম।" তাঁহার সে স্নেহমাখা বাণী এবং অমৃতবর্ষী আলিঙ্গন স্মৃতি এখনও এ হৃদয়ে সজীব ভাবেই রহিয়াছে। আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। তাঁহাকে বসিতে আমার চেয়ারখানি সরাইয়া দিলাম, তিনি কিছুতেই বসিলেন না,—"না, না, ও আপনার আসন, উহাতে আমি বসিব না" কিছুতেই তাঁহাকে সেখানে বসাইতে পারিলাম না।

স্কুল পরিদর্শন কার্য্য তিনি সামান্যই করিলেন! পরে আমাকে বলিলেন "আপনি বসুন, আপনার সঙ্গে দেখা করার সুখলাভ করিতেই এবার আমার আসা। দুঃখের বিষয় আজই আবার ফিরে যেতে হবে। দুটো কথা বলে যাই।" তার পর যে সামান্য সময় তিনি ছিলেন, আমার সঙ্গে সাহিত্য প্রসঙ্গেই আলোচনা হইল। তাহাতে তাঁহার জ্ঞান, গাম্ভীর্য্য, বিনয়, ঔদার্য্য, সহানুভূতি প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া আমি আনন্দিত, বিস্মিত এবং লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। যাইবার সময় নিকট হইয়া আসিল, তাঁহার সঙ্গে ষ্টেশনে গেলাম। অতীব বিনয় ও নম্রতার সহিত আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গীয় একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, অমনি তিনি শশব্যস্তে তাঁহাকে বাধা দিয়া নিজে নামিয়া আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিলেন, "আমি কায়স্থ, ব্রাহ্মণের দাস!" ইহার মধ্যেও তাঁহার বিনয় গুণের কত পরাকাষ্ঠা! বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, যিনি এসেছিলেন, তিনি কি সব-ইনস্পেক্টর?" আমি বলিলাম "না, ইনি ইনস্পেক্টর!" তাহারা বলিল "ইনস্পেক্টর! এমন ব্যবহারের ইনস্পেক্টর ত দেখিনি মহাশয়! এত উচ্চপদে থাকিয়াও লোকে এমন ধীর, শান্ত প্রকৃতি আর এত বিনয়ী হয়!" বালকগণের নিকট তাঁহার ব্যবহার এতই মধুর হইয়াছিল।

রাধানাথ বাবু কিছুদিন পর তাঁহার 'লেখাবলী' নামক কবিতা পুস্তক অনুগ্রহ করিয়া আমাকে

উপহার প্রেরণ করেন, তাহার সঙ্গে যে পত্র দেন তাহাতেই বা কত দৈন্য! পুস্তক খানি যেন আমি পড়িয়া আমার মতামত তাঁহাকে জানাই এই জন্য কতই বিনয় করিয়া লেখেন। আমি উহা পাঠ করিয়া উহার একটী নাতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা লিখিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করি। তাহার মধ্যে আমার নিকট স্থানে স্থানে যে একটু আধটু দোষ ত্রুটী বোধ হইয়াছিল তাহাও সবিনয়ে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি তাহা পাঠ করিয়া আমাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া একখানি পত্র লিখেন, তাহা উল্লেখ করিতেও আমি কুণ্ঠিত হইয়া পড়ি। আমি এরূপ প্রশংসার উপযুক্ত নহি এই কথা তাঁহাকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করাতে তিনি আমাকে যাহা লিখিয়া ছিলেন তাহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"* * কাব্যেও আপনার এরূপ দক্ষতা আছে আমি জানিতাম না। আমি অনুচিত কিছু বলি নাই। আপনার সমালোচনা পড়িয়া আমি প্রকৃতই অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছি। সাধারণতঃ সমালোচনা যে শ্রেণীর হয় ইহা সে শ্রেণীর নহে। * * সমালোচনা এইরূপই হওয়া উচিত। সমালোচনা প্রসঙ্গে আপনি স্বদেশীয় বিদেশীয় অনেক গ্রন্থোক্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া যাহা বলিয়াছেন সে গুলি বেশ মূল্যবান। সমালোচ্য গ্রন্থের দোষ গুণ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়া দেওয়াই সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। আপনি আমার দোষ যাহা দেখাইয়াছেন সেজন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। * * আমি আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি সাহিত্যের পথে ক্রমেই অগ্রসর হইয়া মাতৃভাষার আশীর্ব্বাদ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করুন। * * * সমালোচনাটি ফেরৎ পাঠাই, কোন মাসিকপত্রে উহা প্রকাশিত করিয়া দিলে সাধারণেই বিচার করিবেন, আমার কথা যথার্থ কি না। * *।" তাঁহার অনুরোধে সমালোচনাটি কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের সম্পাদক মহাশয়কে দেখাই। তিনিও তাহা সাগ্রহেই লন বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা প্রকাশিত করেন না; দেখা হইলে ফেরৎ চাহিলেও জোড় হাত করেন, সম্পাদকীয় উচ্চ পদের নিকট আমাদের কাঁদাকাটি অরণ্যে রোদন মাত্র।

রাধানাথ বাবুকে আমি প্রথম যে পত্র লিখি তাহা বাঙ্গলায় লিখি এবং তাঁহাকে জানাই যে আমার নিজ বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন এবং স্বদেশীয় সাহিত্য সেবী মহোদয়গণকে আমি বাঙ্গলাতেই পত্রাদি লিখি এবং সেইটাই ভাল মনে করি; এ বিষয়ে তাঁর মত কি তাও জানিতে চাই। তদুত্তরে তিনি লিখেন—"আপনার পত্র পাইলাম। আপনার পত্রের মধ্যে শিক্ষনীয় বিষয় যথেষ্ট। স্বদেশীয় গণকে মাতৃ ভাষায় পত্র লেখার বিষয় আপনি যাহা লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ এক মত। আমিও সাধারণতঃ নিজ পরিজন ও বান্ধবগণকে উড়িয়া অথবা বাঙ্গলা ভাষাতেই পত্র লিখি। সকলেরই এইরূপ করা উচিত বই কি? মাতৃ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে জাতীয় উন্নতির আশা নাই। * * তবে যে সমুদয় বন্ধু নিতান্তই বাঙ্গলাতে পত্রাদি লেখা ভাল বাসেন না তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ইংরাজিতে লিখিতে হয়। * *"।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর নিকট তিনি আমার কথা বলেন এবং আমার "কয়েক খানি" পত্র নামক স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক পাঠাইতে লিখিয়া পাঠান। তদনুসারে আমি তাঁহাকে পুস্তক পাঠাই এবং এক খানি পত্র ও লিখি। তদুত্তরে উক্ত মহিলা রাধানাথ বাবুকে ঋষি তুল্য ব্যক্তি বলিয়া আমার নিকট লিখেন এবং তাঁহার অনেক গুণের কথা আমাকে জানান। তাহার পরে যখন নগেন্দ্র বালার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ কাহিনী জানিতে পারি সেই সময় রাধানাথ বাবুর সঙ্গে যে পত্র লেখালেখি হইয়াছিল তাহাতে ঐ প্রসঙ্গে রাধানাথ বাবু অনেক দুঃখ প্রকাশ করেন এবং অন্যান্য কথার মধ্যে লিখেন "নগেন্দ্রবালা এরূপ শিক্ষিতা, এরূপ ধর্ম্ম নিষ্ঠা হইয়া যে সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তিনী হইয়া

এইরূপ মহাপাতকের (আত্ম হত্যা) অনুষ্ঠান করিবেন তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। দেশের শিক্ষিত শিক্ষিতাগণ যদি দুঃখ, কি সন্তাপ, কি অভিমানের চাপ সহ্য করিতে না পারেন তবে আর ভরসা কি? আমি বড়ই ব্যথিত হইয়াছি * *" এই ভাবের কথাই তিনি লিখিয়াছিলেন।

রাধানাথ বাবুর অধীনে ৺ শ্যামাপ্রসন্ন রায় মহাশয় কিছু দিন ডেপুটী ইনস্পেক্টারের কাজ করিয়াছিলেন; তিনি গিরিধিতে আমার নিকট রাধানাথ বাবুর প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার বিনয় সৌজন্যের অনেক কথাই পরমানন্দের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "গাড়ীতে উভয় একত্র যাইতে পশ্চাতের আসনে আমাকে উপবেশন করাইয়া নিজে সম্মুখের আসনে বসিতেন; আমি কোন মতেই তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইতে পারি নাই। বাসায় গেলে আমাকে তিনি এরূপ ভাবে অভ্যর্থনা করিতেন যে আমি তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ইহা বোঝা দূরে থাকুক, বরং আমিই যেন তাঁহাপেক্ষা অতি বিশিষ্ট পদস্থ এই রূপ বোধ হইত। যখনই আমি গিয়াছি তখনই তাঁহাকে কোন না কোন গ্রন্থ পাঠ কি লেখা পড়ার কার্য্য করিতে দেখিয়াছি। জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহায় তিনি বৃদ্ধ হইলেও অনেক যুবকের আদর্শ স্থানীয় * *"।

সাহিত্য চর্চ্চা সম্বন্ধে আমাকে তিনি এক খানি পত্রে লিখিয়াছিলেন "সহানুভূতি সাহিত্য চর্চ্চার প্রাণ, সহানুভূতি গুণেই সাহিত্য লোক শিক্ষক ও আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে। সহানুভূতির মধ্য দিয়া সাহিত্য সমাজের অনেক দোষ সহজে নিরাকরণ করিতে পারে। * * * দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আজ কাল কিছু কিছু মাতৃ ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন ইহা শুভ লক্ষণ বটে কিন্তু ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে; ইহাতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া কয়জন চর্চ্চা করেন; যাঁহারা তাহা করেন তাঁহারা পূজ্যপাদ। যাঁহারা শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মাতৃ ভাষার অঙ্গ পুষ্টির জন্য চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যে শিক্ষা তাঁহারা স্কুল কলেজে লাভ করিয়াছেন, তাহা পথ প্রদর্শিকা মাত্র তাহা শিক্ষার পরিণতি নহে, সোপান মাত্র। তদবলম্বনে অগ্রসর হইয়া মাতৃ ভাষায় ও স্বদেশের উন্নতি চেষ্টা করা আমাদের দেশের যুবকগণের কর্ত্তব্য। * * * দুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষক গণের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন। তাঁহারা অন্যান্য নানা রূপে সময় ক্ষেপণ করেন কিন্তু সাহিত্য চর্চ্চায় একটুও সময় দিতে চান না। এত দিন পরিদর্শক কর্ম্মচারী রূপে কার্য্য করিয়া অনেকানেক শিক্ষকের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি কিন্তু সাহিত্য চর্চ্চায় বিশেষতঃ মাতৃ ভাষার সেবায় দীক্ষিত শিক্ষক অতি অল্পই পাইয়াছি। অথচ তাঁহাদের অবসরও যথেষ্ট। আপনার সাহিত্যানুরাগে আমি বড়ই সন্তুষ্ট। * * আমি অতি ক্ষুদ্রব্যক্তি; সাহিত্যের তরণীর সামান্য ক্ষেপণী বাহকের কাজও করিতে সক্ষম নহি—নাবিকের কথা দূরে যাউক। আমি আপনাকে উপদেশ দিবার যোগ্য নহি। বয়োবৃদ্ধ হইলেও আমি জ্ঞানে বালক মাত্র। যাহা হউক আপনার কোন বিষয় ইচ্ছা হইলে আমাকে জানাইবেন, আমি সানন্দে তৎবিষয়ে আপনার সাহায্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিব।" রাধানাথ বাবুর কথাবার্ত্তা, বিনীত ব্যবহার, স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা, প্রভৃতি প্রকৃতই আদর্শস্থানীয় ছিল। তাঁহার কার্য্যে সুপ্রসিদ্ধ

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।

এই শ্লোক স্মরণ করাইয়া দিত। এই বাক্য যেন নিজ জীবনে তিনি সর্ব্বদা পালন করিতেন।

স্বদেশের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও তৎপ্রতি আমাদের কর্ত্তব্য বিষয়েও তাঁহার মনের ভাব অতি উচ্চ ছিল। রাধানাথ বাবু স্বর্গে গিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সৌজন্য, বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, সহানুভূতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি উৎকলে ও বঙ্গে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি বহুকাল জাগাইয়া রাখিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

"পরপারে"—

ঐ দূরে ঐ পরপারে—
বিক্ষোভিতা ক্ষিপ্তা-তটিনীর
সুন্দর শ্যামল-তীরে
দেখিছ কি সুবর্ণ মন্দির ?

শাসন বিনত দৃষ্টি
উঠাইয়া বারেকের তরে,
ত্যজি বৃথা অশ্রুবৃষ্টি,
চেয়ে দেখ কি রাজে ও পারে।

ওই স্বর্ণ সিংহাসনে
দেবী মূর্ত্তি বিদ্যুৎ বরণী
বিরাজিছে—চক্ষু কোণে
স্নেহ দৃষ্টি মর্ম্ম পরশিনী !

ভারতী কমলা করে
দুলিতেছে সুবর্ণ চামর,
গৌরব সৌরভ ঝরে
পরিপ্লাবি দিব্য-কলেবর !

সম্মান-সাহস শক্তি
পদযুগ চুমিছে আদরে,
মুক্তকণ্ঠে দেশ ভক্তি
গাইতেছে রাগিণী মল্লারে !

দীপ্ত বিস্ফারিত স্থির-
নয়নের স্নেহ দৃষ্টি দু'টী,
বহি আশ্বাস গভীর
এ পারেতে আসিয়াছে ছুটি।

সুতীব্র আহ্বান-বাণী
অতিক্রমি ঝটিকা গর্জ্জন,
মুক্তির বারতা আনি
করিতেছে সরোষে তর্জ্জন !—

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক।

New Press, College Square.

ত্যাগের কঠোর স্পর্শে
　　ভেঙ্গে ঘোর-স্বার্থ-বধিরতা,
—জীবনের নব-বর্ষে
　　শুন হর্ষে মুক্তির বারতা!

অন্যায়-পশুর মুখে,
　　রোগ-শোক দুর্ভিক্ষ-অনলে
বিসর্জ্জিয়া শান্তি-সুখে
　　কিবা ফল ভাসি অশ্রু-জলে!

তটে বসি অনাহারে
　　উদ্বন্ধনে কত দিন আর,
একে একে মৃত্যু-করে
　　প্রিয়-প্রাণ দিবি উপহার!

শোকে দুঃখে অত্যাচারে
　　হয়ে ক্ষিপ্ত পাগলের প্রায়,
আঁধার বিপথ ধরে'—
　　কেন ধ্বংস লভিবি বৃথায়!

*　　　*　　　*

খর বেগে সম্মুখেতে
　　তর তর ছুটিছে তটিনী—!
তরঙ্গেতে তরঙ্গেতে
　　আহ্বানের তীব্র-প্রতিধ্বনি—!

এইবার! এইবার!
　　ত্রিশ-কোটী দাও সন্তরণ,
হেরি ঝড় খর-ধার
　　ফিরিওনা ভীরুর মতন!

প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে,
　　সুগভীর আবর্ত্ত-মাঝারে,
কতজন অর্দ্ধ পথে—
　　দিবে প্রাণ কুম্ভীরের করে!

সে ভীষণ দৃশ্য হেরি
　　ফিরিওনা পশ্চাতে কখন!

মরণে-নির্ভয় করি
    মাতৃ-নাম করিও স্মরণ!

যে মুহূর্ত্তে পরশিবে
    ওই দূরে সফলতা-তীর,
—উঠিবে বিজয়-রবে
    মুকতির সঙ্গীত গভীর।

দেবী-মূর্ত্তি পূতকরে
    পুষ্পসহ আশীষ চন্দন,
আদরে ঢালিয়া শিরে
    মুক্ত-স্নেহে করিবে চুম্বন!

শ্রীমোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য।

গুর্জ্জর ভূমি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বর্ত্তমান নগরীর বিবরণ।

আমেদাবাদের পশ্চিমদিকের প্রাচীর, উত্তর দক্ষিণে সাবরমতী বা প্রাচীন সময়ের স্বর্ণমতী নদীর তীর দিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই দিকে ত্রিপক ও কানপুর দরজা, এবং উত্তর দিকে শাপুর দরজা হইতে দিল্লী দরজা হইয়া দরিয়াপুর দরজা পর্য্যন্ত প্রাচীরের বেষ্টন বিস্তৃত রহিয়াছে। তথা হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রেমাবাদ্ধ দরজা; আরো একটু দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কালুপুর দরজা, তথা হইতে একটু ভিতরের দিকে অগ্রসর হইয়া পাঁচকুয়া দরজা এবং তথা হইতে রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে সারনপুর দরজা। তথা হইতে পশ্চিম দিকে অষ্ট্রতিয়া দরজা এবং নগরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে জামালপুর দরজা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীর দ্বারা নগরী বেষ্টিত রহিয়াছে। এই নগরের পরিধি প্রায় ৬ মাইল; প্রতি ৫০ গজ অন্তর করিয়া একটী যুদ্ধ বুরুজ আছে। নগরীর সর্ব্বশুদ্ধ ১৬টী দরজা।

গোলাগুলি নিক্ষেপের জন্য এই প্রাচীরে ছিদ্রাদি রহিয়াছে, তিন চারিটি লোক অনায়াসে প্রাচীরের উপর দিয়া পাশাপাশি হাটিয়া যাইতে পারে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ রাজ ২॥ লক্ষ টাকা টেক্স তুলিয়া প্রাচীরের ভগ্ন স্থান সমূহ সংস্কার করেন। প্রাচীর ৫ ফিট চওড়া ও ১৫ ফিট উচ্চ।

মুসলমান ধ্বংশাবশেষ।

রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট নগরীর প্রাচীরের বাহিরে দুইটী সমুচ্চ মিনারেট আছে, আমেদাবাদের সমুদয় স্তম্ভের মধ্যে এই দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; ইহার উপরে উঠিবার ধাপগুলি প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার কিছু দক্ষিণে সিদিবিসির মসজিদ ও সমাধি মন্দির রহিয়াছে। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে মইদখান বিবির নিকট হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন এই নগরী অধিকার করেন তখন ইহা নষ্ট হইয়া যায় এখন মাত্র দুইটি মিনারেট ও দরজার ধ্বংশাবশেষ বর্ত্তমান আছে। সিদিবিসি, সুলতান আমেদ সার এক জন প্রিয় ক্রীতদাস ছিল। সারন পুর দরজা দিয়া

প্রবেশ করিলে—রাণী কি মসজিদ দেখা যায়, ইহার কিছু বামদিকে সেখ মহম্মদ খস গোয়ালিয়ারীর একটী মসজিদ আছে; ইহা ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রায়পুর দরজা হইতে অষ্ট্রতিয়া দরজায় যাইতে ডানদিকে রাণীসিপ্রিকা মসজিদ দেখা যায়। এক জন দক্ষ শিল্প সমালোচক ইহার কারু কার্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—ইহা আমেদাবাদের রত্ন স্বরূপ এবং পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট অট্টালিকা গুলির মধ্যে অন্যতম। মিনারেট দুটীর কারুকার্য্য অত্যুৎকৃষ্ট কিন্তু ইহা অন্য মিনারেট গুলির অনুরূপ নয়; ইহার ভিতরের দিকে উঠিবার কোন সিঁড়ি নাই এবং উচ্চে দাঁড়াইবার জন্য কোন স্থান নাই। ইহা একটী মনোমুগ্ধকর অলঙ্কার স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। দুইটি জিনিষ অট্টালিকার সৌন্দর্য্য সম্পাদান করিতেছে;—প্রথমটী সর্ব্বপ্রকার কারুকার্য্যের বিচিত্রতা এবং দ্বিতীয়টী সর্ব্বপ্রকার বিভিন্নতা; এই দুটি জিনিষ একটী পূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে। রাণী সিপ্রি, আমেদ শার কোন পুত্রবধু ছিলেন। ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদটী অনেকটা 'হলের' আকারের—পূর্ব্বদিক উন্মুক্ত; ইহা দৈর্ঘ্যে ৫০ ফিট এবং ইহার ছাদ দুই সারি ২৪টী স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত। কবরটী মন্দিরের সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। ইহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান আশাবাড়া নামে সুপ্রসিদ্ধ। আমেদ শাহ যখন এই নগরী নির্ম্মাণ করেন তখন এই স্থানটী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এখান হইতে ৫০ গজ দূরে মহম্মদ বেগেড়ার উজির দস্তুরখাঁর মসজিদ রহিয়াছে। রন্ধ্রময়ী প্রস্তর জালের জন্য ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার প্রাঙ্গণে ২৫ গজ সমচতুষ্কোণ একটী জলাশয় রহিয়াছে। ইহার কিছু দক্ষিণে জামালপুর দরজার নিকট হাবিত খানের মসজিদ রহিয়াছে; হাবিতখান আমেদসার একজন সভাসদ ছিলেন। মানিকচকের নিকট যে, জুম্মা মসজিদ আছে তাহার দৈর্ঘ্য ৩৮২ ফিট ও প্রস্থ ২৩৮ ফিট। কেবল মসজিদটী দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২১০ ফিট ও ৯৫ ফিট। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটী জলাশয় আছে, ইহাতে লাল নীল বিবিধ মৎস্য বিচরণ করিতেছে। মসজিদে ২৬০টী স্তম্ভোপরি ১৫টী গুম্বজ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় মসজিদ, ইহার দুইটি সমুচ্চ মিনার ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভূপতিত হইয়া যায়। মসজিদের মধ্যে একখণ্ড মার্ব্বেল প্রস্তরে এই লিখিত আছে যে, এই জুম্মা মসজিদ সুলতান নাসিরুদ্দিন আবুল ফটা মহম্মদ বিন সুলতান আমেদ কর্ত্তৃক ৮২৭ হিজরিতে (ডিসেম্বর ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হয়।

মসজিদে প্রবেশ করিবার উত্তর এবং দক্ষিণদিকে দুটী রাস্তা আছে; দক্ষিণদিকের কারুকার্য্য সমন্বিত বারান্দাটী সম্পূর্ণরূপে হিন্দুধরণের বলিয়া বোধহয়। মসজিদ প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকের একটী রাস্তা দিয়া গমন করিলে অত্যুৎকৃষ্ট রোজা মসজিদে উপনীত হওয়া যায়; তথায় প্রথম, আমেদশা, তাঁহার পৌত্র জালালখান কুতুবদ্দিন এবং দ্বিতীয় আমেদশা প্রভৃতির কবর রহিয়াছে। রোজা মসজিদের ভিত্তিগাত্র এবং কবরগুলি মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত। রোজার পশ্চিমদিকের প্রাচীরের নিকটে প্রার্থনা পীটস্থানটী নানাপ্রকার শ্বেত, কৃষ্ণ ও হরিৎ প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহার কিছু পূর্ব্বদিকে আমেদশার স্ত্রীর ধ্বংশ প্রায় মগবারা রহিয়াছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে আমেদশার স্ত্রী মোগলানী বিবির কবরটী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত এবং তাঁহার প্রিয় মন্ত্রীর স্ত্রী মারাকীবিবির কবরটী কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত, তদুপরি শুক্তির কাজ রহিয়াছে। এই 'মগবারার' কিঞ্চিৎ পশ্চিমে তিন দরজা; ইহা দ্বারা রাজপ্রাসাদের বহির্ব্বাটীস্থ প্রাঙ্গণে যাওয়া যায়। সম্মুখে অগ্রসর হইলেই প্রাচীন প্রাসাদ নয়নগোচর হয়, বর্ত্তমান সময়ে এখানে পোষ্ট অফিস রহিয়াছে। প্রবেশদ্বারের খোদিত পারশী অক্ষর পাঠে জানা যায়; সাজাহানের সময়কার শাসনকর্ত্তা আলমখান গাজী এই রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন।

"প্রতিধ্বনিকে নির্ম্মাণ দিনের কথা বলিতে

বলা হইল, উত্তর হইল, গৃহখানি সৎকর্ম্মানুলেপী ও কৃপাবর্ষী"।

উদ্ধৃত কথাগুলি পারশী শ্লোকের অনুবাদ; বিচিত্র অর্থ পূর্ণ ঐ শব্দগুলির সংখ্যা নির্দ্দেশে জানা যায়,—১০৪৬ হিজরীতে (১৬৩৬—১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে) এই রাজ প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়।

পরবর্ত্তী সময়ে ইহা মুসলমান কলেজরূপে ব্যবহৃত হয়, তৎপর "সৎকর্ম্মানুলেপিত কৃপাবর্ষী" রাজপ্রাসাদ জেলখানায় পরিণত হয়; কালের কি বিচিত্র গতি!

বর্ত্তমান সময়ে ইহাতে পোষ্ট অফিস এবং গবর্ণমেণ্ট অফিসাদি আছে।

এই সমুদয় অট্টালিকার পশ্চাদ্‌ভাগে ভদ্রক অবস্থিত। ইহার দক্ষিণভাগে আমেদশার মসজিদ; ইহা খুব সম্ভবতঃ কোন জৈন বা হিন্দু মন্দিরের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পশ্চিম দিকে মেনিই বুরুজ বা লাল প্রস্তরের একটী স্তম্ভ। আমেদাবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা প্রস্তর এইখানে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। এই মস্‌জিদের উত্তর পূর্ব্ব কোনে সিদি সৈয়দ নামে আমেদশার একজন কৃতদাসের কবর রহিয়াছে। ইহা মহারাষ্ট্রীয়দিগের দ্বারা অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হয়। ইহাতে মর্ম্মর প্রস্তর জালের তিনটী বাতায়ন রহিয়াছে। ইহার ভিতরের বৃক্ষাবলী এমন সুন্দর, সুনিপুণ ও সুক্ষ্মভাবে খোদিত রহিয়াছে যে, ইহা মানবের কল কৌশল অপেক্ষা প্রকৃতির সিদ্ধহস্ত নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। বৈকালিক রৌদ্ররশ্মি যখন ইহার উপর নিপতিত হয় তখন ইহা একখানি সুবর্ণখচিত উজ্জ্বল দর্পণ বলিয়া বোধ হয়। কখনও বা ইহা দেখিয়া শ্বেতোজ্জ্বল দর্পণে বিম্বিত চারুচিত্রের কথা মনে পড়ে। ইহার তাক্ষর্য্য শিল্পের নিকট তাজমহলের কারুকার্য্য ও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব লাট কর্জ্জন সাহেব মধ্যস্থলের বড় বাতায়নটী বৃটিশ মিউজিয়মে লইয়া গিয়াছেন। মহামতি ফার্গুসন সাহেব এই বাতায়ন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"It is probably more like a work of nature than any other architectural detail that has yet been designed by the best architects of Greece."

ইহার সন্নিকটেই সা বিজিউদ্দিনএর সমাধিমন্দির রহিয়াছে, প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে একটী অতি সুচারু কারুকার্য্য সংযুক্ত প্রস্তর বাতায়ন রহিয়াছে। ইহার কিছু উত্তরে সৈয়দ আলমের মসজিদ, ইহা আবু বক্কর কর্ত্তৃক ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

মির্জাপুরে রাণীকা মসজিদ একটী উচ্চভূমির উপর সংস্থাপিত, ইহাতে দুটী রাজপুত রমণীর কবর রহিয়াছে; ইহাদের মধ্যে একটীর নাম রূপ বাঈ।

দিল্লির দরজার নিকট কুতুবদ্দিনের মস্‌জিদ্ রহিয়াছে, সম্ভবতঃ ইহা ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার নিকটই ইদর কা চাকলার মহাবৎ খানের মস্‌জিদ রহিয়াছে; মহম্মদ বেগেড়ার সময় উজির জালালুদ্দিন কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়।

শাপুর দরজার নিকট সেখ হোসেন মহম্মদ চিৎসীর মস্‌জিদ রহিয়াছে—হিজরি ৯৭৩ দ্বিতীয় মুজাফ্ফর শা (র) সময় নির্ম্মিত হয়।

রায়পুর দরজা হইতে নির্গত হইয়া অল্প দূরে কেঙ্কেরিয়া নামক একটী সরোবর আছে; ইহা ৭২ একর জমি ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং ৩৪টী সমভূজ সমন্বিত আকৃতি-বিশিষ্ট—প্রতি বাহু ১৯০ ফিট দীর্ঘ। সরোবরের চতুর্দ্দিক প্রস্তর সোপানাবলী দ্বারা পরিবেষ্টিত, সরোবরের মধ্যস্থলে একটী সুন্দর উদ্যান আছে, তাহার নাম, নগিনাবাগ, উদ্যানে একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকা আছে। পূর্ব্বের রাজপ্রাসাদ ঘাট মণ্ডল এখন আর নাই। পূর্ব্বে এই উদ্যানের সহিত তীর ভূমি সেতু দ্বারা সংযুক্ত ছিল, এখন একটী পথ মাটি দ্বারা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুতুবউদ্দিন শা মালব যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করেন।

কোঙ্কেরিয়া হইতে দুই মাইল দক্ষিণ দিকে সাহ আলমের অট্টালিকা শ্রেণী বিদ্যমান; ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ বেগেড়া কর্ত্তৃক সাহ আলমের মৃত্যুর পর এই সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমাধি মন্দি-

রের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত; দুইটী দরজা পার হইলে প্রাঙ্গন দৃষ্ট হয়। প্রাঙ্গনের বাম পার্শ্বে বিমল শুভ্র মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত সাহ আলমের সমাধি মন্দির, মন্দিরের গুম্বজটী বহুমূল্য প্রস্তর বিনির্ম্মিত, তদুপরি সুবর্ণ নির্ম্মিত চূড়া রহিয়াছে। সমাধির ভিত্তিতল শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তর মণ্ডিত। সমাধির চতুর্দ্দিকে বিবিধ কারুকার্য্য পূর্ণ মর্ম্মর প্রস্তর জালের বেষ্টন রহিয়াছে। প্রাঙ্গনের পশ্চিম দিকে একটী মস্‌জিদ, তৎসন্নিকটেই একটী সভাগৃহ আছে। ইহার পার্শ্বেই জল রক্ষণের একটী স্থান, তৎপর সেওোলা নামে একটী সুবৃহৎ সরোবর আছে, এমন সুবৃহৎ সরোবর ভারতে কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ, ইহার পরিধি প্রায় ৪ মাইল; সরোবরের মধ্যস্থলে একটী নয়নরঞ্জন দ্বীপ আছে।

সারনপুর দরজা হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে এক মাইল দূরে গমতিপুর নামক একটী পল্লির নিকটবর্ত্তী স্থানে কম্পবান চূড়াময়ী (Shaking Tower) একটী মস্‌জিদ্ আছে। মস্‌জিদের সম্মুখস্থ দরজার দ্বয় কারুকার্য্য এবং পার্সী শ্লোকাবলী খোদিত রহিয়াছে। ইহার একটী চূড়া ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে অকস্মাৎ ভূপতিত হইয়া গিয়াছিল। ভিতরের সিড়ি বাহিয়া মিনারেটের উর্দ্ধে উঠিয়া নাড়িয়া দিলেই দুটী মিনারেট বাতাহত বৃক্ষের মত কিছুক্ষণ ধরিয়া কাঁপিতে থাকে। একটী মিনারেট অপরটী অপেক্ষা কয়েক গজ দূরে অবস্থিত। এই প্রস্তর বিনির্ম্মিত সমুচ্চ মিনারেট এত অল্প আয়াসে এরূপ ভাবে নড়িতে পারে, ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত আশ্চর্য্য। অনেক দিন চেষ্টা করিয়াও ইয়ুরোপীয় পরিব্রাজক এবং ইঞ্জিনিয়ারগণ ইহার নির্ম্মাণ কৌশল অবগত হইতে পারেন নাই।

আমেদাবাদের চতুর্দ্দিকস্থ স্থান ব্যাপিয়াই মুসলমানদের সময়কার নির্ম্মিত কত অট্টালিকা, কত রোজা মস্‌জিদ পরিদৃষ্ট হয়, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ।

সহর হইতে পশ্চিম দিকে ৬ মাইল দূরে সারখেজ নামক একটী স্থান আছে; দূর হইতেই সমতল প্রান্তরের একপার্শ্বে বনভূমের মধ্যদিয়া সারখেজের উন্নত অট্টালিকা শ্রেণী নয়নগোচর হয়। পূর্ব্ব সময়ের তগ্নদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া অল্পদূর অগ্রসর হইলেই ভিতরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিবার দ্বারদেশে উপনীত হওয়া যায়। প্রাঙ্গনের বামদিকের একটী অট্টালিকায় সুলতান মহম্মদ বেগেড়া, তদীয় পত্নী ও পুত্রের তিনটী কবর আছে। ভিতরে স্থানে স্থানে শ্বেত প্রস্তরের সুন্দর কারুকার্য্য আছে। প্রাঙ্গনের ডান দিকে মহম্মদ বেগেড়ার গুরুর কবর আছে। মন্দিরে শ্বেত প্রস্তরের বিচিত্র কারুকার্য্য আছে, উহার ভিত্তিতল শ্বেত মর্ম্মর মণ্ডিত।

এই প্রাঙ্গনের পশ্চিমদিকের একটী দরজা পার হইলে অন্য একটী প্রাঙ্গনে উপনীত হওয়া যায়, তথায় মুসলমানদিগের নমাজ করিবার স্থান আছে। নমাজস্থান প্রাঙ্গনের পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ব্যাপিয়া ৭২টী গুম্বজ শোভিত হইয়া বিদ্যমান।

এই সমুদয় স্থানের নিকটে দক্ষিণদিকের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর সোপানাবলী পরিবেষ্টিত একটী সুন্দর সরোবর আছে।

মস্‌জিদের পশ্চিম পার্শ্বে সরোবরের জল সঞ্চরণ প্রণালী আছে; ইহার উত্তর পার্শ্বেই আরো দুটী ক্ষুদ্র সরোবর বিদ্যমান। জল ক্রমান্বয়ে এই দুইটী সরোবরে পরিষ্কৃত হইয়া জল সঞ্চরণ প্রণালী দ্বারা বৃহৎ সরোবরে আসিয়া জমা হয়। সরোবরের দক্ষিণ ও পশ্চিম তীরে অট্টালিকা শ্রেণী রহিয়াছে, সম্ভবতঃ মহম্মদ বেগেড়া পরিজনবর্গ সহিত মাঝে মাঝে এখানে বাস করিতেন।

আমেদাবাদের উত্তর দিকে সাবরমতী নদী তীরে সাহীবাগ রাজপ্রাসাদ।

হিন্দু ও জৈন মান্দির।

বর্ত্তমান সময়ে আমেদাবাদ সহরে হিন্দুদিগের রনছোরজী, হনুমানজী ও স্বামীনারায়ণের অনেক মন্দির আছে।

ভদ্রকের রাজপ্রাসাদে পোষ্ট অফিসের নিকটবর্ত্তী স্থানে মহারাষ্ট্রীয়গণ ভদ্রকালী নামে এক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে।

দিল্লী দরজা হইতে অল্প একটু দূরে—হাতীসিং উপাধিধারী এক ধনী ব্যক্তি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া হাতীসিংহ জৈনমন্দির ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করেন। ইহার কারুকার্য্য অতি চমৎকার;—প্রবেশ দ্বারের সুনিপুণ কারুকার্য্য আদর্শ ভাস্কর শিল্পের পরিচয় দিতেছে। সুপরিষ্কৃত ও সুনির্ম্মল গাবাণ গটে বিবিধ চারু চিত্র খোদিত রহিয়াছে। শত্রুঞ্জয় ও গিরনর প্রভৃতি স্থানের জৈন মন্দির অপেক্ষা ইহা আকারে বৃহৎ না হইলেও কারুশিল্পে ইহা অনেক উন্নত।

মন্দিরের ভিতরস্থ প্রাঙ্গনের চতুষ্পার্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠুরীতে ৫২টী তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সহরের মধ্যে অনেকগুলি জৈন মন্দির আছে।

আশাবাড়ার নিকটবর্ত্তী স্থলে "দাদা হরির বাদাই হরির বাউ" নামে একটী কূপ আছে; ইহা দৈর্ঘ্যে ১৯৬ ফিট; ইহার পূর্ব্বভাগে ওষজ দ্বারা একটী চন্দ্রাতপ বিনির্ম্মিত হইয়াছে। সেই স্থান দিয়া নয়টি সিঁড়ি অবতরণ করিলে উর্দ্ধ সমাচ্ছাদিত একটী মুক্ত প্রকোষ্ঠাগারের মত স্থানে উপনীত হওয়া যায়, তথা হইতে আরো আট সিঁড়ি অবতরণ করিলে সেই প্রকার আর একটি প্রকোষ্ঠে পৌছিয়া আরো আট সিঁড়ি নিম্নে অবতরণ করিলে কূপের জল সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে উপনীত হওয়া যায়। সেখান হইতে পরিধি প্রাচীর সংলগ্ন স্থান দিয়া—অপর পার্শ্বে উপনীত হইলে অষ্টভুজ বেষ্টনাকৃতি প্রকৃত কূপ দেখা যায়, ইহা হইতে নিম্নস্থ জলসঞ্চরণের রাস্তা দিয়া পূর্ব্বোক্ত কূপটি জলে পূর্ণ হয়।

ইহার সমুদয় নির্ম্মাণ কৌশল, সেখান হইতে ৯ মাইল উত্তরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ আটনোজ কূপের নির্ম্মাণ কৌশলের অনুরূপ। ইহা সেই সময়ের কিছু পূর্ব্বে রাজা বীরসানির স্ত্রী রাধাবাঈ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। আর একটি প্রবাদ এই যে বাঈ হরির ভগ্নি কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খাসিয়া জাতীয় এক ব্যক্তির কন্যা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বার্দ্ধ হরির নামে পরিচিত হয়। বার্দ্ধ হরির সুলতান মহম্মদ বেগেড়ার এক শিশু সন্তানের ধাত্রী নিযুক্ত হয়। সুলতান বেগেড়ার দৃষ্টি আকর্ষণ মানসে সে এই কূপ নির্ম্মান করিয়াছিল। ইহার নিকটেই তাহার সমাধি ও মসজিদ রহিয়াছে। কূপের প্রথম স্তর চন্দ্রাতপের প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে সংস্কৃতে একটী লিপি আছে, নিম্নে তাহার মর্ম্মার্থ উদ্ধৃত করিলাম :—"বিশ্ব বিধাতাকে প্রণিপাত করি; কমলাপতি বিষ্ণু, জলাধিপতি বরুণ জীবের আশ্রয় ও পুণ্য কর্ম্মের দ্রষ্টাকে প্রণিপাত করি। যাঁহার চরণ দেব মানব সকলে বন্দনা করিতেছে সেই ত্রিভুবন জননী পরাশক্তির ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যাঁহার অনুগ্রহে সকলে স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে সক্ষম, সেই কর্ম্ম ইচ্ছার অভিষ্টদাতা বিশ্বকর্ম্মাকে প্রণিপাত করি।"

গুর্জ্জরের ধন সম্পদপূর্ণ, সুন্দর আমেদাবাদের রিজয়ী সুলতান মহম্মদ বেগেড়ার রাজত্ব কালে শ্রীহরির, রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে অবস্থান করিয়া হস্তিপুরার উত্তর পূর্ব্বদিকে—৮৪ লক্ষ তৃষিত জীব মনুষ্য, পশু, পক্ষী বৃক্ষ প্রভৃতির জন্য পরমেশ্বরে ভক্তি সহকারে ১৫১৬ সংবতে বা ১৪২১ শকে (১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ) শুক্ল পৌষ মাসের ১৩ই তারিখ সোমবার এই "বার্ড" বা বাপি নির্ম্মান করেন। এই "বার্ড" নির্ম্মাণে ২৯০০০ টাকা ব্যয় হয়। শ্রীহরির বিশ্ব হিতের জন্য এই অর্থ ব্যয় করেন। ঈশ্বর আজ্ঞানুবর্ত্তী মালিক শ্রীবিহমদ এই কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

'গেলারীর' উত্তর দিকে আরবিক অক্ষরের একটী লিপি আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এই,"এই স্থানের পবিত্র ও হিতকারী সলিল এবং চতুর্দ্দিকস্থ সুন্দর ধর্ম্মশালা ও ফল পুরিত বৃক্ষাবলী সহিত এই 'বার্ড' কূপ মনুষ্য ও পক্ষীর উপকারের জন্য প্রতাপান্বিত সুলতানের রাজত্ব কালে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও ইসলাম ধর্ম্ম বিশ্বাসে নির্ম্মিত হইল।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

(সমাপ্ত)

নারীশক্তি।

ভারতবর্ষে নারী নিজের এবং সমাজের অশেষ উন্নতি ও উপকার সাধন করিতে পারেন। এই উন্নতি ও উপকার সাধনের অধিকার হইতে তাঁহাকে বহু পরিমাণে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। তজ্জন্য নারীশক্তি সম্যক্ বিকশিত হইতে পারিতেছে না; নারীর শক্তির সম্যক্ পরিচয়ও আমরা পাইতেছি না। তথাপি, হিন্দুর দেশে ও হিন্দুর নানা ভাষায় নারীর নাম কেন যে অবলা হইল, তাহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে।

হিন্দুর আদ্যাশক্তির নাম স্ত্রীলিঙ্গবাচক, তাঁহার রূপ কল্পনাও নারীর মতই করা হইয়াছে। হিন্দুর জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নারী, হিন্দুর ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নারী। তাঁহার পুরাণে পাপপুরি অসুরকুলের বিনাশকারিণী যিনি, তিনিও নারী। সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য হিন্দু যাঁহার পূজা করেন, তিনি দেবী, তিনি নারী। মানুষ প্রেয় ও শ্রেয় বলিয়া যাহা কিছু প্রার্থনীয় মনে করে, সকলেরই প্রদাত্রী হইবেন, কোন না কোন দেবী, সুতরাং নারী। অথচ নারীর হিন্দু নাম—অবলা। এমন কেন হইল? নারীর স্বভাবগত কোন কারণে কি এরূপ নামকরণ হইয়াছে, না আমাদের ভ্রমে বা দোষে এরূপ হইয়াছে?

অবলা কথাটার উল্লেখ দেখিয়াই হয় ত অনেকে ভাবিবেন যে আমি বুঝি, নারী বড় কি পুরুষ বড়, বা উভয়েই সমান, কিম্বা উভয়ের প্রকৃতি ভিন্ন হওয়ায় কোন তুলনা চলে না, এইরূপ কিছু একটা প্রশ্নের মীমাংসা বা তদ্রূপ একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছি। বাস্তবিক আমার উদ্দেশ্য তাহা নয়।

নারীকে অবলা বলিবার প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, তাহার একটা কারণ নিশ্চয়ই বল সম্বন্ধে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা। কথায় যে বলে, "বলং বলং বাহুবলং" সেটা ভুল। আমরা পঞ্চতন্ত্রে ছেলেবেলায় যে পড়িয়াছিলাম,

"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতো বলম্।
পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ॥"

তাহাতেও প্রকৃত সত্য প্রকটিত হয় নাই। কেন না সিংহ ও শশকের গল্পে চাতুরীরই জয় ঘোষিত হইয়াছে।

শারীরিক বল যে শ্রেষ্ঠ বল নয়, তাহার প্রমাণের জন্য বেশী দূর যাইতে হইবে না। হাতীর চেয়ে ত মানুষের শারীরিক বল বেশী নয়, অথচ হাতী মানুষের দাসত্ব করে। ঘোড়া গরু প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। নানা মনুষ্য জাতির মধ্যে আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য জাতিদের যে প্রাধান্য সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহাও শারীরিক বলের জন্য নহে। জাপানীরা রুশীয়দিগকে যে হারাইয়াছিল, তাহাতে ইহা প্রমাণ হয় না যে জাপানীরা দৈহিক শক্তিতে রুশীয়দিগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেক জাতির জীবনের এবং দেশ রক্ষা ও শাসনের নানা কার্য্যের মধ্যে শক্তির কথা বলিতে গেলে যে বিভাগের কথা আগে মনে হয়, তাহা সৈনিক বিভাগ। অথচ এই সৈনিক বিভাগের সেনাপতি করা হয় কাহাকে? বাছিয়া বাছিয়া ভাল পলোয়ান ধরিয়া ত সেনাপতি করা হয় না। যিনি বুদ্ধি, যুদ্ধবিদ্যা ও সাহসে শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকেই করা হয়; অন্ততঃ এইরূপ লোককেই করা উচিত, ইহা বুদ্ধিমান্ লোক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। অনেক বিখ্যাত সেনাপতি ৬০।৭০ বা ততোধিক বয়সে অনেক অভিযানের নেতৃত্ব করিয়াছেন। আধুনিক সমুদয় যুদ্ধাস্ত্র বুদ্ধিবলের শ্রেষ্ঠতারই পরিচায়ক।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দৈহিক বল দ্বিতীয় স্থানীয়; মানসিক বা আত্মিক বলই শ্রেষ্ঠ বল। অবশ্য মানসিক শক্তির ভৃত্যস্বরূপে কার্য্য করিবার

সামর্থ্যটুকু অন্ততঃ দেহের থাকা চাই। সেনাপতি যতই বুদ্ধিমান, সাহসী ও রণদক্ষ হউন না,—তাঁহার দেহটা পলোয়ানের মত না হউক, কিন্তু একেবারে অপটু হইলে চলিবে না। বক্তা, উপদেষ্টা, কবি বা অন্যবিধ লেখক, চিত্রকর বা গায়ক, যিনি যে ভাবেই আপনার আত্মার শক্তির প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করুন না, তাঁহার শরীরটা কতকটা সুস্থ ও সবল হওয়া চাই। একথা আমরা অস্বীকার করিব কেন? কিন্তু আত্মিক বল যে শীর্ষস্থানীয়, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। দৈহিক শক্তি একান্ত প্রয়োজনীয়, উহা তুচ্ছ নয়। উহার প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আত্মিক শক্তির মধ্যে আবার যে শক্তি মানুষের আধ্যাত্মিকতার অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তা, সাধনা ও আচরণে প্রকাশ পায়, তাহাই শ্রেষ্ঠস্থানীয়।

যুদ্ধকে লোকে সচরাচর কেবলমাত্র পাশব শক্তির কার্য্যক্ষেত্র ও পরিচয়স্থল বলিয়া মনে করে; কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে যুদ্ধেও শুধু পাশববলের স্থান কত নীচে।

লোকে বীর বলিলেই রণবীর বুঝে। রণবীরের সম্মান হানি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আর আমার মত লোকে তাহা করিতে চাহিলেই বা সে হাস্যকর প্রয়াস সফল হইবে কেমন করিয়া? আমি বলিতে যাইতেছিলাম যে ফলের বিচার করিয়া দেখিলে ধর্ম্মবীর, দিগ্‌বিজয়ী বীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এমন কোন দিগ্‌বিজয়ী বীরের নাম কেহ করিতে পারেন কি, যাঁহার কথা নানা যুগের নানা দেশের নানা ভাষাভাষী মানুষ বুদ্ধ কিম্বা খৃষ্টের কথার মত মানিয়া আসিতেছে? কোটি কোটি রাজা ও প্রজার মস্তক কত কাল ধরিয়া ভক্তিভরে তাঁহাদের নিকট অবনত হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। রাজকুমার শাক্যসিংহ রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিলেন, কিন্তু কালক্রমে সেই আত্মজয়ী পুরুষসিংহের সিংহাসন সমগ্র এসিয়া মহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মের উপদেষ্টাগণ ইউরোপে, এবং, কলম্বসের বহু পূর্ব্বে, আমেরিকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই মহাপুরুষের সাহস এবং আত্মনির্ভরই বা কিরূপ অসামান্য!

খুব বড় বীর যিনি, তিনি কতকগুলি সৈন্যের সাহায্যে পরদেশ জয় করেন, ধনরত্ন সংগ্রহ করেন, বা স্বদেশ রক্ষা করেন এবং তাহার ধন লুণ্ঠনকারীর গ্রাস হইতে তাহাকে রক্ষা করেন। কিন্তু শাক্যসিংহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি একা শুধু মানুষের নয়, সর্ব্বজীবের মুক্তির পথ আবিষ্কার করিবেন। সকল জীবকে প্রকৃত স্বাধীনতা, সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার বীজ যে আত্মিক স্বাধীনতা তাহা দিবেন, ও শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী করিবেন। তাঁহার আত্মনির্ভরের কথা, তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে তিনি শেষ যে উপদেশ দিয়া যান, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে:—

"হে আনন্দ, তোমরা নিজেই নিজেদের প্রদীপ হও, নিজেই নিজেদের শরণ হও। ধর্ম্মকে দৃঢ়রূপে প্রদীপের মত ধরিয়া থাক; ধর্ম্মকে শরণ রূপে দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া থাক। আপনাদিগকে ছাড়িয়া শরণের জন্য আর কাহারও প্রতি তাকাইয়ো না।"

এই মহাত্মার স্বাবলম্বন এত বেশী যে তিনি শিষ্যগণকে স্বাবলম্বনই শিখাইয়া গেলেন, বলিলেন না যে "আমার পূজা কর" বা "আমার অনুসরণ কর।" জগতের ইতিহাসে স্বাবলম্বন বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়।

যোদ্ধার জয় এবং ধর্ম্মবীরের জয়ের আর একটি মহৎ প্রভেদ এই যে, যোদ্ধা সদাশয় ও মহানুভব হইলেও, বিজিতের মনুষ্যত্বের অবমাননা ও হ্রাস হইবেই হইবে; কিন্তু ধর্ম্মবীর যাঁহাকে জয় করেন, তাঁহার মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া বাড়াইয়া দেন ও তাঁহাকে প্রকৃত সম্পদ ও আনন্দের অধিকারী করেন।

যাহা হউক, কোন প্রকার জয়ের কথা বলা আমার মূল উদ্দেশ্য নয়। আমি শ্রেষ্ঠ শক্তি কি তাহাই বলিতেছিলাম। আধ্যাত্মিক শক্তিই প্রকৃত শক্তি।

অনেকে বলিবেন, তাহা না হয় মানিলাম, কিন্তু এই শক্তির প্রকাশে, বীরের যে একটা লক্ষণ নির্ভীকতা, তাহা কোথায়? ইহার উত্তর ত পড়িয়া

রহিয়াছে। সকল দেশের ধর্ম্মোপদেষ্টাদের শিরোমণি যাঁহারা, তাঁহারা কোন্ পার্থিব শক্তিকে ভয় করিয়াছেন? তাঁহাদিগকে পুড়াইয়া মারিয়াছে, তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা ভয় পান নাই। পরের উপর অত্যাচার করিতে যে নিষ্ঠুর নির্ভীকতার প্রয়োজন, স্থূলদর্শী লোকেরা তাহাকেই বীরত্ব মনে করিতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা সেরূপ মনে করেন না। দীনতার, বিনয়ের, শান্ততার, করুণার মধ্যে অসামান্য নির্ভীকতা থাকে এবং থাকিতে পারে। রাজগৃহের পথে যজ্ঞে বলি দিবার জন্য যে এক পাল ছাগল লইয়া যাইতেছিল, তাহাদের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া বুদ্ধদেব যে তাহাদের রক্ষার জন্য যূপ কাষ্ঠে নিজের প্রাণ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে কি তাঁহার ভয়-বিহীনতা প্রমাণিত হয় নাই?

যদি আধ্যাত্মিক শক্তিই শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে, নারীর দৈহিক বল পুরুষের দৈহিক বল অপেক্ষা কম বলিয়া ধরিয়া লইলেও, নারীকে অবলা বলা ঠিক নয়। নারী যে যুদ্ধ করেন নাই, যুদ্ধে ও রাজনীতিজ্ঞতায় অনেক সময়ে পুরুষকেও পরাস্ত করেন নাই, তাহাও ত সত্য নহে। এই ভারতেই ত অনেক রণরঙ্গিণীর নাম সর্ব্বজনবিদিত। ভারতের নরপতিগণের মধ্যে রাণী অহল্যাবাঈ অপেক্ষা কে অধিক পূজনীয় হইয়া আছেন?

নিউজীলণ্ডে, এবং মার্কিন যুক্তপ্রদেশসমূহের কোন কোন প্রদেশে নারীর রাজনৈতিক অধিকার পুরুষের অধিকারের সমান। এরূপ হওয়ায় ঐ সকল দেশে সামাজিক পবিত্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, পানদোষ নিবারিত হইয়াছে, এবং আরও অনেক কল্যাণ হইয়াছে। ইংলণ্ডের নারীগণও পুরুষের সমান রাজনৈতিক শক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা এ প্রবন্ধের বিচার্য্য নহে। ভারতবর্ষের পুরুষদেরই রাজনৈতিক শক্তি নাই, সুতরাং ভারতবর্ষে এখন ইহার আলোচনার সময়ও আসে নাই। এখানে এ বিষয়ের উল্লেখ করিলাম এই জন্য, যে, নানা দেশে রাজ্ঞী রূপে অনেক নারী ত রাজশক্তির পরিচালন করিয়াছেন, অধিকন্তু অনেক নারী প্রজাশক্তিরও পরিচালন করিতেছেন, এবং সুন্দর রূপেই করিতেছেন।

নারী গ্রন্থ লিখিয়া, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া, এবং আরও নানা প্রকারে নিজের মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু আমি নারীচরিত্রের আধ্যাত্মিক দিগ্বিজয়ের উল্লেখই ভাল করিয়া করিতে চাই। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য আমি বিদেশে যাইব না। সতী, সাবিত্রী, সীতা, ভারতীয় নরনারীর আত্মার উপর আরও কত যুগ ধরিয়া রাজত্ব করিবেন, কেহ তাহার ইয়ত্তা করিতে পারেন কি? ভারতীয় নরনারীর কথাই বা বলি কেন? ভিন্ন দেশীয় যে কোন পুরুষ বা নারী ইহাঁদের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহাদেরই মস্তক ইহাঁদের মানসী মূর্ত্তির নিকট ভক্তিভরে অবনত হইয়াছে। ইহা কি শক্তি নয়? এই বিশ্বজনবন্দনীয়া শক্তিশালিনী নারীগণকে অবলা নামে অভিহিত করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা নহে কি?

ভিন্ন দেশে, এবং ভারতবর্ষেও, অনেক নারী স্বধর্ম্মের জন্য, স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়াছেন,—আগুনে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন। ইহাঁদের পূজার ফুল একটীও কমাইতে আমি চাহি না, আমার কাপুরুষতা এখনও সে মাত্রায় পৌঁছে নাই। আমি এবম্বিধ সাহস ও আত্মোৎসর্গের সমালোচনা করিতে যাইতেছি, কেবল ভারতনারীর অন্যবিধ সাহস ও আত্মোৎসর্গের বিশিষ্টতা দেখাইবার জন্য।

যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি? তাহা হইলে আমি বলি, প্রেম এবং প্রেমের জন্য আত্মোৎসর্গের শক্তি ও সাহস। নারী যে স্বজাতি, স্বদেশ বা স্বধর্ম্মের প্রেমের প্রেরণায় আত্মোৎসর্গের শক্তি ও সাহস দেখাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনপূজ্য। কিন্তু ইহাতে চর্ম্মচক্ষে বা কল্পনানেত্রে দৃষ্ট সমসাময়িক বা ভবিষ্য যুগের সহানুভূতিকারী, অনুরাগী বা উৎসাহদাতা জনসঙ্ঘের উন্মাদক, উত্তেজক, বা উদ্দীপক প্রভাব বিদ্যমান থাকিতে পারে। কিন্তু যে নারী ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে ক্ষুদ্র অন্তঃপুরে জীবন যাপন করিয়াছেন, ইতিহাসের

নাম যিনি শুনেন নাই, লোকের প্রশংসার কথা যিনি মনে আনেন নাই, তিনি যখন পবিত্র দাম্পত্য প্রীতির বশে স্ব-ইচ্ছায় পতির সহিত চিতায় সহমৃতা হইতেন, তখন তাঁহার প্রেম, আত্মোৎসর্গ ও সাহস নিশ্চয়ই তুলনা রহিত। দাম্পত্য প্রীতির এরূপ নিষ্ঠুর পরিচয় লইতে ইচ্ছা করাও মানুষের কাজ নয়। যে প্রাণ বিধাতার দত্ত তাহা লইবার অধিকার তাঁহারই আছে। কিন্তু সহমরণের সে দিকটার আলোচনা এখন করিতেছি না। অনেক নারীকে যে জোর করিয়া সহমৃতা করা হইত, তাহাও এখানে উল্লেখ না করিলে চলে। আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, স্ব-ইচ্ছায় সহমৃতা সতী নারীর প্রেম, আত্মোৎসর্গ, আধ্যাত্মিক শক্তি, ও সাহসের তুলনায় আমরা ভারতের সাধারণ পুরুষগণ প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত কি অধিক প্রেম, আত্মোৎসর্গ, আধ্যাত্মিক শক্তি, ও সাহস দেখাইয়াছি, যে তাঁহাদিগকে অবলা বলিবার আমাদের অধিকার জন্মিয়াছে?

আমি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিতেছি না। দাম্পত্য প্রেমের পবিত্র ও সংযত আনন্দময় আহুতিতে যে আত্মোৎসর্গ, আধ্যাত্মিক শক্তি ও সাহস আত্মপরিচয় দিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবার সুযোগ পাইলে ভারতের আত্মশক্তি উদ্দীপনে সম্পূর্ণরূপেই সমর্থ হইবে। বিধাতার নিকট করযোড়ে সেই সুযোগের প্রার্থনা করি। এক বিষয়ে নারী শক্তির প্রাধান্য অস্বীকার করিবার যো নাই;—তাহা রক্ষণে। উপার্জ্জন তুমি করিতে পার, রক্ষার ভার নারীর উপর। বাহির হইতে তুমি আগুন সংগ্রহ করিয়া আনিতে পার, কিন্তু তাহা জ্বলন্ত রাখেন নারী। স্বদেশপ্রেম বল, আর ধর্ম্মই বল, নারীকে যাহা তুমি দিতে পার নাই, নারী যাহাকে হৃদয়ে স্থান দেন নাই, তাহা অচিরে লোপ পাইয়াছে। বারোয়ারির পাকশালার ধূম অধিক, কিন্তু তাহার আগুন জ্বলে কয় দিন? গৃহস্থের রন্ধন শালার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিলেও নিত্যই জ্বলে। নারী হৃদয়ের আগুন এই জাতীয়। ভারতবর্ষে তাহা জ্বলিয়াছে কি?

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ববরা।

(ঋগ্‌বেদের স্তোত্ররচয়িত্রী)

শান্তোজ্জ্বল অতীতের প্রথম উষায়,
বেদপূত পঞ্চনদে, বিপাশার তীরে,
স্তব্ধ মৌন বনভূমে তপোবন মাঝে
তুলেছিলে সুগম্ভীর কি সঙ্গীত তান
আর্য্যকুললক্ষ্মী তুমি। তোমার আহ্বানে,
সনাতন ভারতের জনক জননী,
আর্য্য নরনারী সবে মিলিলা হরষে,
এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম আরাধনে!
সৃষ্টির শৈশবে, দেবি! ভারত গগনে,
যে মহাসত্যের জ্যোতিঃ তুলিলে ফুটায়ে,
যুগ যুগান্তের পরে লক্ষ্য ধরি তা'রে,
জাগিয়া উঠিছে সুপ্ত মানব-সমাজ!
যে সঙ্গীতে মুগ্ধ ছিল ভারতের প্রাণ,
বিশ্ববাসী গাহে আজি সেই সামগান!

শ্রীসন্তোষকুমার বসু

ফরাসী বিপ্লবের একটি আলেখ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তাহাদের সুতীক্ষ্ণ সঙ্গীন ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্য হইতে দলপতি আসিয়া মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইলেন। তিনি ফরাসী ভাষায় কি বলিতেছিলেন। পরে বেলজিয়ান্ ভাষায় কহিলেন "আপনারা এখন মন্দির ত্যাগ করিতে পারিবেন না। আমি ফরাসী রিপাব্‌লিকের আদেশ অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিলাম," এই বলিয়া তিনি একখানি তালিকা হইতে আসামীগণের নাম পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ করিয়া তিনি বলিলেন "যাঁহারা রিপাবলিকের আনুগত্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইবেন, আইন অনুসারে আমি তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইব। আপনারা যদি আমার কার্য্যে বাধা প্রদান করেন, তবে আমাকে সৈন্যগণের সাহায্য লইতে হইবে।" এতক্ষণ পরে সকলে বুঝিল যে এই ব্যক্তি সাইমন। বিকৃত কণ্ঠস্বরে বিদেশীয় ভাষা,বিধর্ম্মীর ভোজ্য দ্রব্যে পরিপুষ্ট দেহে বিজাতীয় পরিচ্ছদ দেখিলে তাহাকে আপনার স্বদেশী ভাই বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন। সকলে ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে বেদীর পশ্চাতের দরজা উন্মুক্ত হইল। সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া বেগে সেই দিকে ছুটীয়া চলিল। সকলে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সাইমন জনতার গতি রোধ করিতে সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন। কিন্তু সেই ভিড়ের মধ্যে তাহারা অস্ত্র সঞ্চালনের অবসর পাইল না। সন্ত্রস্ত জনস্রোতের ধাক্কায় সাইমন নিজেই মাটীতে পড়িয়া লুটোপুটী খাইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মন্দির শূন্য হইয়া গেল। মাতা ক্লান্তপদে অবসন্নদেহে আকুল প্রাণে শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া দৌড়াইতে লাগিল। রিপাব্‌লিক সৈন্যগণ পলায়মান নিরস্ত্রের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া অবিরাম গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। এমন সময়ে ক্রণো ও তাহার সঙ্গীগণ বনান্তরাল হইতে বাহির হইয়া ফরাসী সৈন্যগণকে পশ্চাৎ দিক্ হইতে আক্রমণ করিল। সাইমন হঠাৎ এরূপ ভাবে আক্রান্ত হইয়া অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত হইল; তখন দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রণোর সঙ্গীগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও প্রাণপণে শত্রুর গতি প্রতিরোধ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ক্রণোর অনেক লোক নিহত হইল। অকস্মাৎ ক্রণোর স্কন্ধে একগুলি প্রবিষ্ট হইল, তাহার সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে পায়ে আর একগুলি বিদ্ধ হইল। ক্রণো ভূমিতে পড়িয়া গেল। একজন রিপাবলিক্ সৈন্য ক্রণোর মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারী উঠাইল, এমন সময় সাইমন তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। সাইমন গম্ভীর স্বরে আদেশ করিল "সাবধান, আঘাত করিও না, বন্দী কর।" ক্রণো কহিল "সাইমন, আমার জীবন রক্ষা করিও না। আমাকে বিনাশ কর, তোমার প্রতিহিংসা পূর্ণ হউক। আর ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য মাতৃভূমির সর্ব্বনাশ করিও না।" সাইমন বিদ্রূপ করিয়া কহিল "আজ মরিতে চাহিতেছ কিন্তু পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তুমি একটু স্বার্থ ত্যাগ করিলে বোধ হয় আমাকে স্বদেশদ্রোহী হইতে হইত না; আর তোমারও মরিবার প্রয়োজন হইত না। মনে করিও না মৃত্যুতে তোমার বীরত্ব গৌরব ফুটিয়া উঠিবে।" ক্রণো অস্ফুট স্বরে কহিল "সাইমন, শিশুকাল হইতে যাঁর অন্নজলে শরীর পুষ্ট করিয়াছ, সেই জন্মভূমির আজ কি দুর্ভাগ্যের সূচনা করিলে তাহা এখন বুঝিতে পারিবে না। তুমি জয়োল্লাসে উন্মত্ত! কিন্তু এমন একদিন আসিবে যেদিন অনুতাপের বৃশ্চিক দংশনে জর্জ্জরীভূত হইবে, সে দিন আমায় স্মরণ করিও।" ক্রণো চৈতন্য শূন্য

হইয়া পড়িল। সাইমন তাহাকে সযত্নে লইয়া চিকিৎসালয়ে রাখিল এবং সেবা-শুশ্রূষার সুবন্দোবস্তের আদেশ করিল।

সাইমন উপাসনা মন্দির লুণ্ঠন করিয়া যে সমস্ত মূল্যবান্ জিনিষ পাওয়া গিয়াছিল সে সমস্ত আস্তোয়ার্পে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল, এবং বাহিরে এক সিলমোহরের ছাপ দিয়া লিখিয়া দিল :—

Long live the French Republic
Forbidden to be opened under
penalty of death"

(৩)

একটী সুসজ্জিত কক্ষে সাইমন বসিয়া আছে। আজ তাহার মন প্রফুল্ল। এতদিনে তাহার আশৈশবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। সে তাহার পাপ-পঙ্ক-মলিন হৃদয়ে কোন্ এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সুখময়ী কল্পনায় তন্ময় হইয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে সাইমন লিখিবার টেবিলের সম্মুখে যাইয়া বসিল। তাড়াতাড়ি করিয়া একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট লিখিল—"ভীষণ যুদ্ধের পর নগর অধিকৃত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা বিপুল আয়োজন করিয়াছিল। অনেক গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছি। আমাদের বন্দীর সংখ্যা প্রায় ৫০ জন। পলায়িত আসামীগণ শীঘ্রই ধৃত হইবে। এখানকার বিদ্রোহীরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত, তাহারা পুনর্ব্বার আক্রমণের চেষ্টা করিতে পারে। আমার সাহায্যার্থ আরও একশত সৈন্য পাঠাইবেন। আমি এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রদেশে রিপাব্লিকের জয়পতাকা উড্ডীন করিব।" সাইমন নাম স্বাক্ষর করিয়া চিঠির উপরে শিরোনামা লিখিল। এমন সময়ে একজন গার্ড আসিয়া সংবাদ জানাইল "একজন রমণী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছে।" সাইমন বলিল "অস্তোয়ার্পে সার্জ্জেণ্ট মেজরের নিকট এই চিঠিখানি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া রমণীকে আমার নিকটে পাঠাইয়া দাও।" গার্ড অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সম্মুখের দ্বার আস্তে আস্তে উন্মুক্ত করিয়া এক জন রূপলাবণ্যবতী মহিলা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিষাদের ঘনান্ধকারে তাঁহার বদনকান্তি বিমলিন হইয়া গিয়াছে। অবিরাম অশ্রুবর্ষণে তাঁহার সুনীল নয়নদ্বয় অবসন্ন ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে। সুবঙ্কিম ভ্রূযুগলের অন্তরে উদার আকাশের মত শুভ্র ললাট দেশ চিন্তার কালমেঘে আবরিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি সেই সৌন্দর্য্য কি নয়নাভিরাম! সাইমন আত্মহারা হইয়া অপলক নেত্রে সেই স্নিগ্ধ মধুরিমা নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার বোধ হইল যেন গোধূলি মলিন নীরব সন্ধ্যায় শরতের প্রথম জোৎস্না মেঘের অন্তরাল হইতে সসঙ্কোচে ধরাতলে নামিয়া আসিল। মহিলাটি ধীরে ধীরে সাইমনের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া জানু পাতিয়া অবনতমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সাইমন আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। সে আসন হইতে উঠিয়া শশব্যস্তে মহিলার হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিল "ভেবা, ভেবা কেন কাতর হইতেছ? তুমি স্বর্গের দেবী আজ অমৃতের ভাণ্ড লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ, তোমার কোন্ ভিক্ষা আমি অপূর্ণ রাখিতে পারি?" সাইমনের আকস্মিক স্পর্শে ভেবার বুক কাঁপিয়া উঠিল; সে আপনার হাত টানিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল "ক্রণোর জীবন।" ভেবার এই রূপ ব্যবহারে সাইমন একটু আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া কহিল "ভেবা, অনুগ্রহ-প্রার্থিনীর এত আত্মগৌরব যে আমি তাহার কর-স্পর্শেরও অধিকারী নই, তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক ক্রণোর অনেক অপরাধ, সে বিদ্রোহীগণের নেতা। আমার কর্ত্তব্য কাজে সে বাধা প্রদান করিয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে আমরা তাহাকে বন্দী করিয়াছি। সামরিক বিভাগের বিচার সভা তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তাহাকে মুক্তিদান করিবার আমার কোন অধিকার নাই।" ভেবা কহিল, "মহাশয়, আমি আইন জানি না; অপরাধও বুঝি না। একবার অসহায়ের প্রতি দয়া করুন। মনে করিয়া দেখুন, শৈশবে আপনার মাতৃবিয়োগ

হইলে ক্রণোর মাতাই কোলে করিয়া আপনাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ক্রণোকে উপবাসী রাখিয়াও তিনি আপনাকে স্তন্যদুগ্ধ দানে পরিপুষ্ট করিয়া অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এমনি করিয়া ভাইয়ের রক্তপাত করিয়া কি মাতৃ-ঋণ পরিশোধ করিবেন? অভাগিনীকে পুত্রহারা করিবেন না।" সাইমন কহিল, "ভেবা, আমাকে অন্যায় অনুরোধ করিও না। তুমি কি জান না যে শিশুকাল হইতে ক্রণো আমার শত্রু? সে আমার প্রাণে যে নিদারুণ আঘাত দিয়াছে, তাহা কি মুহূর্ত্তের কাতরতায় বিস্মৃত হইয়া যাইব? সে যে চিরদিনের জন্য আমার জীবন বিষময় করিয়া দিয়াছে, তাহা কিরূপে ভুলিব? প্রণয়ের প্রথম ব্যর্থতায় উত্তেজিত হইয়া আমি পুণ্যকে পদদলিত করিয়াছি—পাপকে বরণ করিয়া লইয়াছি। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! যে আজ অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে, সে আজন্ম ভালবাসার পরিবর্ত্তে কেবল অবজ্ঞা লইয়া আসিয়াছে। ভেবা, আমার চরিত্রের সেই একমাত্র দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করিলে, পাষাণ হৃদয়েও প্রীতি-নির্ঝর প্রবাহিত হইত। তাহা হইলে আমি চিরশত্রুকেও আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইতাম। তবে আর দেশদ্রোহীর অপরাধ মাথায় লইয়া স্বদেশীয় রক্তপাত করিতে হইত না। যেদিন দেখিলাম, তৃষিতের জীবনতোষিনী সুধার ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল, যে মন্দিরে আমি প্রণয় পুষ্পোহারে পূজার আয়োজন করিয়াছিলাম সে পুণ্যভূমিতে সকলেই উপেক্ষার সহিত পদাঘাত করিয়া গেল, সেই দিন হইতে প্রতিহিংসা আমার ব্রত হইয়াছে। ভেবা, জানিও ক্রণোর জীবন তোমারি হস্তে।" ভেবা বলিল, "মহাশয়, যদি আমার প্রতি আপনার কিছুমাত্র অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার অভিলাষ হয়, তবে ক্রণোর মুক্তি প্রদান করুন। শোকাতুরা জননীর অশ্রুমোচন করুন। আমরা চিরদিন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিব।" সাইমন বলিল, "ভেবা, আমি আমার চিরশত্রুকে ক্ষমা করিব, আর তার পরিবর্ত্তে তোমার তুচ্ছ কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করি না। ক্রণোর জীবনের মূল্য তোমার প্রণয়। ভেবা, আজ তুমি আশার আলোক লইয়া আমার বাল্যস্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছ; আমায় আর নিরাশ করিও না। কেবল মাত্র বল, তুমি আমায় ভালবাসিবে।" এবার অবনতমুখী ভেবা মুখ তুলিয়া চাহিল; তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে; স্নিগ্ধ চাহনিতে বিদ্যুৎদীপ্তি বিকশিত হইয়া উঠিল। সে নির্ভয়ে বলিল, "তবে শত্রুর তরবারিতেই দেশভক্ত বীরের পুণ্যজীবনের অবসান হউক। পরলোকে অনন্ত স্বর্গসুখ, মুহূর্ত্তব্যাপী মরণ যন্ত্রণায় অমৃত বর্ষণ করিয়া দিবে।" এই বলিয়া ভেবা দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সাইমন হতবুদ্ধি হইয়া ভেবার দিকে চাহিয়া রহিল।

(৪)

চিকিৎসালয়ে আহত বন্দিগণের সেবা-শুশ্রূষার ভার ভগিনী-সম্প্রদায়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় একজন শুশ্রূষাকারিণী আবশ্যকীয় ঔষধ, পথ্যাদি সঙ্গে লইয়া আহত সৈন্যগণের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করিতেছেন। অবশেষে তিনি একজন বন্দী বেল্‌জিয়ান্ যুবকের নিকটে আসিলেন। তাহার স্কন্ধে ও পায়ে গুরুতর আঘাত। সেবিকা ভগিনী তাহার আহত স্থান ধুইয়া ভালরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে লাগিলেন ও বিশেষ যত্নের সহিত তাহাকে বলকারক পথ্য সেবন করাইলেন। যুবক চক্ষু মেলিয়া ভগিনীর দিকে চাহিল। সে হঠাৎ চমকিত হইয়া আবেগের সহিত কি যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ভগিনী তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন; যুবক নীরব হইল। শুশ্রূষাকারিণী বেল্‌জিয়ান্ ভাষায় অস্ফুটস্বরে যুবকের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। অদূরে একজন ফরাসী প্রহরী দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। ভগিনী মাঝে মাঝে ফরাসী ভাষায় কথা কহিতেছিলেন। যুবকের মুখ আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই রোগীর সেবা করিতে তাঁহার একটু অধিক সময়ের প্রয়োজন হইল। প্রহরী বলিল—"হতভাগ্যের জন্য আর কেন

হইয়া পড়িল। সাইমন তাহাকে সযত্নে লইয়া চিকিৎসালয়ে রাখিল এবং সেবা-শুশ্রূষার সুবন্দোবস্তের আদেশ করিল।

সাইমন উপাসনা মন্দির লুণ্ঠন করিয়া যে সমস্ত মূল্যবান্ জিনিষ পাওয়া গিয়াছিল সে সমস্ত আন্তোয়ার্পে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল, এবং বাহিরে এক সিলমোহরের ছাপ দিয়া লিখিয়া দিল :—

Long live the French Republic
Forbidden to be opened under
penalty of death"

(৩)

একটী সুসজ্জিত কক্ষে সাইমন বসিয়া আছে। আজ তাহার মন প্রফুল্ল। এতদিনে তাহার আশৈশবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। সে তাহার পাপ-পঙ্ক-মলিন হৃদয়ে কোন্ এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সুখময়ী কল্পনায় তন্ময় হইয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে সাইমন লিখিবার টেবিলের সম্মুখে যাইয়া বসিল। তাড়াতাড়ি করিয়া একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট লিখিল—"ভীষণ যুদ্ধের পর নগর অধিকৃত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা বিপুল আয়োজন করিয়াছিল। অনেক গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছি। আমাদের বন্দীর সংখ্যা প্রায় ৫০ জন। পলায়িত আসামীগণ শীঘ্রই ধৃত হইবে। এখানকার বিদ্রোহীরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত, তাহারা পুনর্ব্বার আক্রমণের চেষ্টা করিতে পারে। আমার সাহায্যার্থ আরও একশত সৈন্য পাঠাইবেন। আমি এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রদেশে রিপাব্লিকের জয়পতাকা উড্ডীন করিব।" সাইমন নাম স্বাক্ষর করিয়া চিঠির উপরে শিরোনামা লিখিল। এমন সময়ে একজন গার্ড আসিয়া সংবাদ জানাইল "একজন রমণী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছে।" সাইমন বলিল "অন্তোয়ার্পে সার্জ্জেণ্ট মেজরের নিকট এই চিঠিখানি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া রমণীকে আমার নিকটে পাঠাইয়া দাও।" গার্ড অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সম্মুখের দ্বার আস্তে আস্তে উন্মুক্ত করিয়া এক জন রূপলাবণ্যবতী মহিলা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিষাদের ঘনান্ধকারে তাঁহার বদনকান্তি বিমলিন হইয়া গিয়াছে। অবিরাম অশ্রুবর্ষণে তাঁহার সুনীল নয়নদ্বয় অবসন্ন ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে। সুবঙ্কিম ভ্রূযুগলের অন্তরে উদার আকাশের মত শুভ্র ললাট দেশ চিন্তার কালমেঘে আবরিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি সেই সৌন্দর্য্য কি নয়নাভিরাম! সাইমন আত্মহারা হইয়া অপলক নেত্রে সেই স্নিগ্ধ মধুরিমা নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার বোধ হইল যেন গোধূলি মলিন নীরব সন্ধ্যায় শরতের প্রথম জোৎস্না মেঘের অন্তরাল হইতে সসঙ্কোচে ধরাতলে নামিয়া আসিল। মহিলাটি ধীরে ধীরে সাইমনের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া জানু পাতিয়া অবনতমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সাইমন আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। সে আসন হইতে উঠিয়া শশব্যস্তে মহিলার হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিল "ভেবা,ভেবা কেন কাতর হইতেছ? তুমি স্বর্গের দেবী আজ অমৃতের ভাণ্ড লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ, তোমার কোন্ ভিক্ষা আমি অপূর্ণ রাখিতে পারি?" সাইমনের আকস্মিক স্পর্শে ভেবার বুক কাঁপিয়া উঠিল; সে আপনার হাত টানিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল "ক্রণোর জীবন।" ভেবার এই রূপ ব্যবহারে সাইমন একটু আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া কহিল "ভেবা, অনুগ্রহ-প্রার্থিনীর এত আত্মগৌরব যে আমি তাহার কর-স্পর্শেরও অধিকারী নই, তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক ক্রণোর অনেক অপরাধ, সে বিদ্রোহীগণের নেতা। আমার কর্ত্তব্য কাজে সে বাধা প্রদান করিয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে আমরা তাহাকে বন্দী করিয়াছি। সামরিক বিভাগের বিচার সভা তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তাহাকে মুক্তিদান করিবার আমার কোন অধিকার নাই।" ভেবা কহিল, "মহাশয়, আমি আইন জানি না; অপরাধও বুঝি না। একবার অসহায়ের প্রতি দয়া করুন। মনে করিয়া দেখুন, শৈশবে আপনার মাতৃবিয়োগ

হইলে ক্রণোর মাতাই কোলে করিয়া আপনাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ক্রণোকে উপবাসী রাখিয়াও তিনি আপনাকে স্তন্যদুগ্ধ দানে পরিপুষ্ট করিয়া অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এমনি করিয়া ভাইয়ের রক্তপাত করিয়া কি মাতৃ-ঋণ পরিশোধ করিবেন? অভাগিনীকে পুত্রহারা করিবেন না।" সাইমন কহিল, "ভেবা, আমাকে অন্যায় অনুরোধ করিও না। তুমি কি জান না যে শিশুকাল হইতে ক্রণো আমার শত্রু? সে আমার প্রাণে যে নিদারুণ আঘাত দিয়াছে, তাহা কি মুহূর্ত্তের কাতরতায় বিস্মৃত হইয়া যাইব? সে যে চিরদিনের জন্য আমার জীবন বিষময় করিয়া দিয়াছে, তাহা কিরূপে ভুলিব? প্রণয়ের প্রথম ব্যর্থতায় উত্তেজিত হইয়া আমি পুণ্যকে পদদলিত করিয়াছি—পাপকে বরণ করিয়া লইয়াছি। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! যে আজ অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে, সে আজন্ম ভালবাসার পরিবর্ত্তে কেবল অবজ্ঞা লইয়া আসিয়াছে। ভেবা, আমার চরিত্রের সেই একমাত্র দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করিলে, পাষাণ হৃদয়েও প্রীতি-নির্ঝর প্রবাহিত হইত। তাহা হইলে আমি চিরশত্রুকেও আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইতাম। তবে আর দেশদ্রোহীর অপরাধ মাথায় লইয়া স্বদেশীর রক্তপাত করিতে হইত না। যেদিন দেখিলাম, তৃষিতের জীবন-তোষিনী সুধার ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল, যে মন্দিরে আমি প্রণয় পুষ্পোহারে পূজার আয়োজন করিয়াছিলাম সে পুণ্যভূমিতে সকলেই উপেক্ষার সহিত পদাঘাত করিয়া গেল, সেই দিন হইতে প্রতিহিংসা আমার ব্রত হইয়াছে। ভেবা, জানিও ক্রণোর জীবন তোমারি হস্তে।" ভেবা বলিল, "মহাশয়, যদি আমার প্রতি আপনার কিছুমাত্র অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার অভিলাষ হয়, তবে ক্রণোর মুক্তি প্রদান করুন। শোকাতুরা জননীর অশ্রুমোচন করুন। আমরা চিরদিন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিব।" সাইমন বলিল, "ভেবা, আমি আমার চিরশত্রুকে ক্ষমা করিব, আর তার পরিবর্ত্তে তোমার তুচ্ছ কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করি না। ক্রণোর জীবনের মূল্য তোমার প্রণয়। ভেবা, আজ তুমি আশার আলোক লইয়া আমার বাল্য-স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছ; আমায় আর নিরাশ করিও না। কেবল মাত্র বল, তুমি আমায় ভালবাসিবে।" এবার অবনতমুখী ভেবা মুখ তুলিয়া চাহিল; তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে; স্নিগ্ধ চাহনিতে বিদ্যুৎদীপ্তি বিকশিত হইয়া উঠিল। সে নির্ভয়ে বলিল, "তবে শত্রুর তরবারিতেই দেশভক্ত বীরের পুণ্যজীবনের অবসান হউক। পরলোকে অনন্ত স্বর্গসুখ, মুহূর্ত্তব্যাপী মরণ যন্ত্রণায় অমৃত বর্ষণ করিয়া দিবে।" এই বলিয়া ভেবা দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সাইমন হতবুদ্ধি হইয়া ভেবার দিকে চাহিয়া রহিল।

(৪)

চিকিৎসালয়ে আহত বন্দিগণের সেবা-শুশ্রূষার ভার ভগিনী-সম্প্রদায়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় একজন শুশ্রূষাকারিণী আবশ্যকীয় ঔষধ, পথ্যাদি সঙ্গে লইয়া আহত সৈন্যগণের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করিতেছেন। অবশেষে তিনি একজন বন্দী বেল্জিয়ান্ যুবকের নিকটে আসিলেন। তাহার স্কন্ধে ও পায়ে গুরুতর আঘাত। সেবিকা ভগিনী তাহার আহত স্থান দুইয়া ভালরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে লাগিলেন ও বিশেষ যত্নের সহিত তাহাকে বলকারক পথ্য সেবন করাইলেন। যুবক চক্ষু মেলিয়া ভগিনীর দিকে চাহিল। সে হঠাৎ চমকিত হইয়া আবেগের সহিত কি যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ভগিনী তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন; যুবক নীরব হইল। শুশ্রূষাকারিণী বেল্জিয়ান্ ভাষায় অস্ফুটস্বরে যুবকের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। অদূরে একজন ফরাসী প্রহরী দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। ভগিনী মাঝে মাঝে ফরাসী ভাষায় কথা কহিতেছিলেন। যুবকের মুখ আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই রোগীর সেবা করিতে তাঁহার একটু অধিক সময়ের প্রয়োজন হইল। প্রহরী বলিল—"হতভাগ্যের জন্য আর কেন

কষ্ট করিতেছেন? সিটিজেন্ কমিশনার সাইমনের অনুগ্রহে কল্য প্রভাতেই ইহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।" ভগিনী কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার যাইয়া প্রহরীকে বলিলেন, "দরজা একবার খুলিয়া দাও; আমাকে নগরের বাহিরে ডাক্তার ডাকিতে যাইতে হইবে।" প্রহরী বলিল, "হুকুম নাই; আজ বিশেষ কড়াকড়ি বন্দোবস্ত।" ভগিনী কহিলেন, "আমার নিকট Citizen Commissionerএর পাশ আছে। এই দেখ।" প্রহরী দেখিল, সাইমনের স্বাক্ষরিত অনুমতি পত্র। দরজা খুলিয়া দিল। ভগিনী বাহিরে আসিয়া প্রহরীকে বলিলেন, "আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিব। দরজায় আসিয়া 'Sisters of Charity' বলিয়া ডাকিলে দ্বার খুলিয়া দিও। প্রহরী 'আচ্ছা' বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া একটু শুইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ভগিনী উন্মুক্ত প্রান্তরে নামিয়া একবার দাঁড়াইলেন। আকাশের পানে চাহিয়া যুক্তকরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন, "হে জগতের প্রভু, শঙ্কটতারণ, আজ রমণী হইয়া অসাধ্য সাধন করিতে বসিয়াছি। ভগবান সহায় হও, দুর্ব্বল চিত্তে শক্তি দাও; তোমার পুণ্যনাম জয়যুক্ত হউক।" ভগিনী আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রান্তরের শেষ সীমায় এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কুটীরের ভিতরে অন্ধকার। ভগিনী একটা সাঙ্কেতিক শব্দ করিবামাত্র ভিতর হইতে একজন সশস্ত্র, দীর্ঘকায় পুরুষ দরজা খুলিয়া বাহির হইল। অস্ত্রধারী পুরুষ রমণীকে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া বলিল, "কে, ভেবা আসিয়াছ? তোমার জন্য আমি বড়ই চিন্তিত ছিলাম। কি সংবাদ?" ভেবা বলিল, "জেন্, সমস্তই ঠিক্। তোমার নিকট কত লোক আছে?" জেন বলিল, "এখানে ত্রিশজন আছে। সম্মুখে এক খাদে আরও দশজনকে লুকাইয়া রাখিয়াছি।" ভেবা বলিল, "যথেষ্ট; দরজার নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ পার্শ্বের ঘরেই ক্রণো আছে। আমার অনুসরণ করিয়া চল। আমি যাইয়া প্রথমে দরজা খুলিব। তার পর যখন আমি 'Sister Jane,' 'Sister Jane' বলিয়া চীৎকার করিব, তখন তোমরা বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিও। আমার কার্য্য এই খানেই শেষ; অবশিষ্ট তোমাদের দক্ষতা ও বীরত্বের উপর নির্ভর করিবে। চল, আর বিলম্ব করিও না। এই উপযুক্ত সময়; রাত্রি অধিক হইয়াছে, সকলে নিদ্রিত।" সকলে অন্ধকারে সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিয়া চলিল। পথে আরও দশজন আসিয়া মিলিত হইল। ভেবা দরজায় আসিয়া ডাকিল, "Sisters of Charity." প্রহরী ঘুমাইয়াছিল; তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভেবা বলিল, "একটু অপেক্ষা কর; আমার সঙ্গে আর একজন ভগিনী আসিয়াছেন। তিনি একটু ক্লান্ত হইয়া পশ্চাতে পড়িয়াছেন; এখনি আসিবেন।" প্রহরী ঘুমের ঘোরে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। সে বলিল, "আমি আর দাঁড়াইতে পারি না, বড় ঘুম পাইতেছে। তোমার সঙ্গিনীকে একবার ডাক না।" ভেবা চীৎকার করিয়া বলিল, 'Sister Jane,' 'Sister Jane.' এমন সময় কয়েক জন অস্ত্রধারী পুরুষ বাঘের মত আসিয়া প্রহরীর ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। প্রহরী আর চীৎকার করিবার অবসর পাইল না। তখন ৪০ জন যোদ্ধা নির্ব্বিঘ্নে ভিতরে প্রবেশ করিল। কারাগারের প্রহরীগণ সকলেই যুদ্ধে অনভ্যস্ত। তাহারা হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় সন্ত্রস্ত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ফরাসিগণের সৈন্যাবাস একটু দূরে ছিল। সাইমন্ সৈন্য কলরবে জাগরিত হইয়া আসিয়া দেখিল, ক্রণোর গৃহ শূন্য। ফরাসী সৈন্যগণ পলায়িত শত্রুগণকে অন্ধকারে লক্ষ্য করিতে পারিল না। তথাপি সাইমনের আদেশে অদূরবর্ত্তী বনভূমি লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।

(মিঃ ডি, ই, ওয়াচার দিকে
হেলিয়া রহিয়াছেন)।

New Press, College Square.

সন্তপ্ত মূক। *

১

বিধাতঃ!—করিলে একি ?
দিলে যদি বরণীয় মানব জীবন
দিলে যদি ভালবাসা,
উদ্যম, আনন্দ, আশা ;
ক্ষোভ, রোষ অভিমানে ভরি দিলে মন
এত দিয়া তবে কেন,
প্রমাদ পাড়িলে হেন,
প্রকাশিতে নাহি পারি ভাবি যা যখন,
মর্ম্মে দিলে ভাষা, মুখে দিলে না বচন ?

২

তোমার রহস্য নাথ,
অধম অবোধ নর বুঝিব কেমনে ?—
তুমিতো মঙ্গলময়,
এ বিশ্ব মঙ্গলালয়,
তবে কেন এত ব্যথা অভাগার মনে ?
তুমি কি বোঝ না হরি,
রয়েছি জীবনে মরি,
কত কি তরঙ্গ উঠে আকুল পরাণে,
সসীম মানব আমি নিবারি কেমনে ?

৩

সুখের স্বপন যবে—
দেখায় মোহিনী আশা মধুর হাসিয়া
কহিতে তা' সখা সনে,
কত সাধ হয় মনে,
হায়, পোড়া কণ্ঠরোধ কহিব কি দিয়া
কত ক্ষোভ কত রোষ,
কতই বা বক্ষ শোষ,
মৌন হিয়ার মাঝে যায় মিলাইয়া
এ মূক জীবন নাথ! দিলে কি লাগিয়া ?

৪

এত শব্দময়ী ধরা—
অভাগা নীরবে রহে চাহি শূন্য পানে,
বজ্র যদি গর্জ্জে শিরে,
ফণী যদি বক্ষ চিরে,

* মূকের হৃদয়োচ্ছ্বাস।

ডোবে যদি তরী মম প্রবল তুফানে,
পারি না ডাকিতে হায়,
"আয় কেহ কাছে আয়
আমার ব্যথার ব্যথী আছিস্ যেখানে"
নীরবে সকলি সহি বিধির বিধানে!

৫

কত কে তামাসা করে—
কাড়িয়া মুখের গ্রাস লয় কোন জন,
কেহ ধূলি ভস্ম দিয়া
যায় দেহে আঘাতিয়া,
অকারণে কহে কেহ কত কুবচন,
সেই উপহাস যত,
জীবন্তে মৃতের মত,
থাকি স'য়ে—উরুভম যথা দুর্য্যোধন,
বুঝিছ কি এ বেদনা তুমি নারায়ণ?

৬

সিংহে ছিন্ন জিহ্ব করি,
নিষ্ঠুর নিষাদ হায় খেলে অনায়াসে,
কি দারুণ ক্ষোভে হায়,
হরি হিয়া ফেটে যায়,
কি যে মনস্তাপে তায় নেত্রে অশ্রু আসে,
বোঝে কি ব্যাধের মন,
বোঝে কি দর্শকগণ,
করতালি দিয়া তা'রা উচ্চরবে হাসে,
বাখানে সে "সহিষ্ণুতা" করুণা আখাসে।

৭

বুঝি কোন জন্মে নাথ!—
আমিই কিরাত রূপে করেছি পীড়ন,
পারীন্দ্র-রসনা চিরি,
শার্দ্দূল নখর ছিঁড়ি,
কাড়ি নিয়া করীন্দ্রের বিশাল দশন,
প্রভাত সায়াহ্ন বেলা,
করেছি কৌতুক খেলা,
এজনমে নহি তাই এত নির্য্যাতন,
তুমি সেই কর্ম্মফল অদৃষ্ট লিখন!

শ্রীমানকুমারী বসু।

২য় বর্ষ। মাঘ, ১৩১৫। ৭ম সংখ্যা।

সুপ্রভাত

"নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা
আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে
প্রাচীন রজনী নাশো
নূতন উষালোকে।"

শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি,এ সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৵০ টাকা।

আজ

ধনীর সুপ্রভাত ! গৃহীর সুপ্রভাত !

সৌখীনের সুপ্রভাত ! মহিলার সুপ্রভাত !

কারণ,

বঙ্গ-দেশের কারখানাজাত সাবানের মধ্যে

ন্যাশন্যাল সোপ

অভিনব শিল্পজগতে অভাবনীয় যুগান্তর

ঘটাইয়াছে।

আকারে ও গন্ধের স্থায়িত্বে

ন্যাশন্যাল সোপ

বিলাতী সাবানকে পরাস্ত করিয়াছে !

মূল্য ও যথাসম্ভব সস্তা করা হইয়াছে !!

তাই বলিতেছিলাম শিল্পজগতে আজ

সুপ্রভাত !

বাজারে সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য।

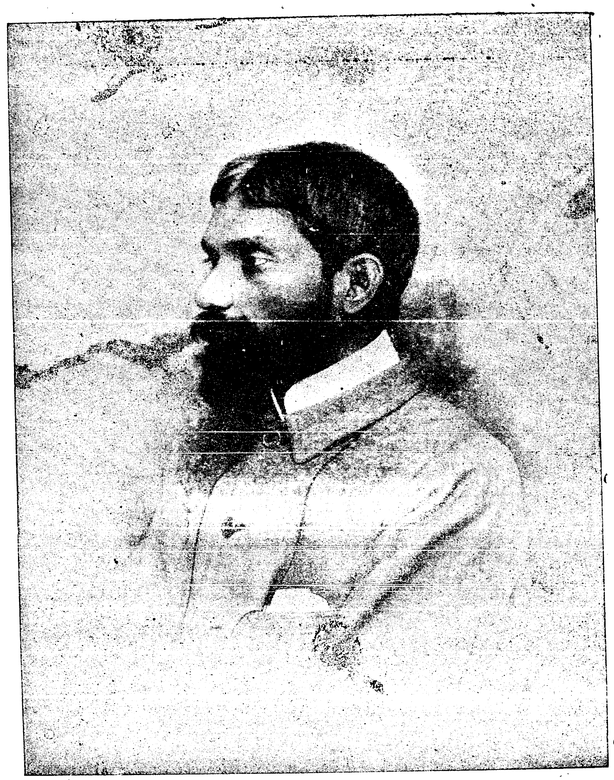

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

সুপ্রভাত

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর ;
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

দ্বিতীয় বর্ষ। | মাঘ, ১৩১৫ সাল। | ৭ম সংখ্যা।

প্রাচীন আর্য্য উপনিবেশ।

এখন ভারতে কলিযুগ উপস্থিত, ভারতের লোকসমূহ এখন কলহীন, মানহীন, ধনহীন ও ধর্ম্মহীন। এখন ব্রাহ্মণের সে বিদ্যা নাই, ক্ষত্রিয়ের সেই শক্তি সম্ভ্রম নাই, বৈশ্যের সেই বিশাল বাণিজ্য নাই,—এখন ভারতবাসী আর্য্যগণ সকলেই, ব্রাহ্মণাদি সকলবর্ণই শূদ্রবৎ, সকলেই শূদ্র। হায়! যে ব্রাহ্মণ নিজ বিদ্যা গৌরবে শূদ্রকে গুরুর মত ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, অম্লানবদনে আইন করিয়াছিলেন যে "বিড়াল নকুলাদি ক্ষুদ্র পশু এবং কাক পেচক প্রভৃতি পক্ষী হত্যায় যে পাপ হয়, শূদ্র হত্যার পাপও সেই প্রকার" (১),—"শূদ্রকে কদাপি ধনসঞ্চয় করিতে দিবে না, কারণ ধনী হইলে শূদ্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে সেরূপ সম্মান করিবে না," (২) সেই ব্রাহ্মণের অবস্থা অধুনা শূদ্রের অবস্থা অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্রও উন্নত নহে। এখন ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান হইয়া গিয়াছে। কেন এরূপ অধঃপতন হইল তাহার আংশিক আভাস আমরা গত অগ্রহায়ণ মাসের "সুপ্রভাতে" দিয়াছি এবং সময়ান্তরে তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। আজ আমরা পূর্ব্ব গৌরবের,—সেই শুভ সত্য ত্রেতাদি-যুগের মহিমা লইয়া দুই চারি কথা বলিতে বসিয়াছি। আজ যেমন য়ুরোপীয়দিগের শুভ সময় পড়িয়াছে,—এক দিন আমাদেরও ঠিক এইরূপ, অথবা এতদপেক্ষাও শতগুণে অধিক সুসময় ছিল। আজ যেমন ইংরাজ কবি স্বজাতির শক্তিসম্পদ ও জ্ঞান গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া জগতের সম্মুখে শ্বেতাঙ্গ মনুষ্যের দায়িত্ব বা White man's burdenএর বড়াই করিতেছেন, ভারতের সুসময়েও তদ্রূপ ভারতের ঋষি নিজ দেশ

(১) "মার্জ্জার নকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডুক মেবচ।
শ্বগোধোলূককাকাংশ্চ শূদ্র হত্যা ব্রতং চরেৎ॥" মনুসংহিতা ॥১১॥১৩২॥

(২) "শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধন সঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥" মনু ॥১০॥১২৯॥

ও নিজ জাতির জ্ঞান বিজ্ঞান ও শক্তি সদাচার প্রভৃতি গুণগরিমা অবলোকনে উচ্চকণ্ঠে স্ফীত বক্ষে বলিয়াছিলেন, যে "আমার এই যে দেশ,—আমার এই আর্য্যাবর্ত্ত,—ইহাতে মনুষ্যের যে আচার, তাহাই সদাচার এবং এই দেশের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের নিকট হইতে পৃথিবীর সমগ্র জাতি নিজ নিজ আচার ব্যবহার শিক্ষা করুক।" (১)

যাহা হউক, মনু মহারাজের এই উক্তি সত্য কি না, তাহা কেমন করিয়া জানিব? সত্যই কি এই সহস্রাধিক বৎসরের পদদলিত জাতি একদিন সমস্ত জগৎকে সভ্যতা ও শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল? এখন আর "মনু বলিয়াছেন, সুতরাং সত্য" বলিয়া বড়াই করিবার সময় নাই, এখন কোনও কথা বলিলে, তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন, কেবল মুখের কথায়,—এখন কোন কাজ হয় না। আমরা তাই মনু মহারাজের গৌরবময়ী বাণীর অনুকূলে কতকগুলি প্রমাণ পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত করিতেছি। প্রমাণ প্রচুর ও বিশ্বাসযোগ্য কি না, তাহার বিচার তাঁহারা করিবেন। এস্থলে আরও একটী কথা আমরা নিবেদন করিয়া রাখি,—আমাদের প্রমাণগুলির অধিকাংশই আমাদের গুরুস্থানীয় য়ুরোপীয় পণ্ডিত মহাশয়দিগের শ্রীলেখনী বিনির্গত, সুতরাং পাঠকগণ প্রমাণ গুলি অবিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিচার পূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন,—নচেৎ তাঁহাদিগের "গুরুদ্রোহ" রূপ মহাপাতকের সম্ভাবনা।

কথায় কথা আসিয়া পড়ে। আমি ভাবিতেছি,—পাঠকগণ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবেন, আর্য্যগণ যে সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষক হইয়াছিলেন, কি উপায়ে তাহা সম্ভব হইয়াছিল? আর্য্যগণ কি দেশে দেশে গিয়া বিদ্যা ও সভ্যতার প্রচার করিয়াছিলেন, না অন্য দেশবাসিগণ নিজ নিজ দেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতের চতুষ্পাঠীসমূহে আসিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? আমরা তাঁহাদিগকে প্রথমেই বলিতে চাই, যে আর্য্যগণই পৃথিবীর সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়া শিক্ষা ও সদাচার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেকালে "কালাপাণি" পার হইলেই আর্য্যত্ব নষ্ট হইত না,—অথবা হইলেও সেজন্য বড় একটা ভাবনা তাঁহাদের ছিল না; দ্বিতীয়তঃ "কালাপাণি" পার না হইয়াও সেকালে আফ্রিকা ও আমেরিকা যাওয়া যাইত। সুয়েজখাল ত সেদিনকার কাটা,—প্রাচীনকালে "বেয়ারিং" প্রণালী ছিল না, উহাও যোজকরূপে এসিয়াকে আমেরিকার সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিত। অধুনা যেমন য়ুরোপের ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নিজ নিজ সভ্যতালোক বিকীর্ণ করিতেছেন, পূর্ব্বকালে ভারতীয় আর্য্যগণও ঠিক সেইরূপ করিয়াছিলেন। উপনিবেশ স্থাপন উচ্চ সভ্যতার একটী বিশেষ লক্ষণ।

মহাভারতের বিখ্যাত যুদ্ধের সময় হইতে অথবা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষ হইতে দলে দলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আর্য্যগণ নানাদিকে গমন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রাচীন মিশরীয়, আসিরীয়, গ্রীসীয় প্রভৃতি বিখ্যাত সভ্যজাতির উৎপত্তি স্থান ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় আর্য্যসভ্যতা যাবতীয় সভ্যতার প্রসূতি। India in Greece নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক পণ্ডিতবর মিঃ পোকোক, Historical Researches পুস্তকের রচয়িতা অধ্যাপক হীরেন, রাজপুত ইতিহাস লেখক মহামনস্বী কর্ণেল টড্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এই উপনিবেশ স্থাপনের কথা বলিয়া গিয়াছেন। মিঃ পোকোক বলিয়াছেন "মহাভারতের ভয়ানক যুদ্ধের পর আর্য্যগণ দলে দলে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কতিপয় দল পশ্চিমে সিন্ধুনদ পার হইয়া এসিয়া ও য়ুরোপের নানাস্থানে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারাই অন্ধকারময় প্রদেশ সমূহে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা

(১) "এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥" মনু ॥২॥২০॥

য়ুরোপীয় শিল্প বিজ্ঞানাদির বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই জগতে সভ্যতা বিস্তার হইয়াছিল।" (১) অধ্যাপক হীরেন বলিয়াছেন, "ভারতের লোকসংখ্যা যেরূপ অসম্ভবরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল,—তাহাতে আর্য্যগণের পক্ষে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক বসবাস করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।" (২) সার ওয়ালটার র‍্যালে তাঁহার "জগতের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই সভ্যতার প্রাচীন খনি এবং ভারতবর্ষ হইতেই সভ্য মানবজাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে।" (৩) Count Bjorustjerna তাঁহার Theogony of the Hindus গ্রন্থের ১৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশে যে কেবল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহা নহে, আর্য্যাবর্ত্তেই প্রাচীন অত্যুচ্চ আর্য্যসভ্যতার উৎপত্তি এবং সেই আর্য্যসভ্যতাই ক্রমশঃ পশ্চিমে ইথিওপিয়া, ইজিপ্ট, ফিনিশীয়ায়; পূর্ব্বে শ্যাম, চীন ও জাপানে; দক্ষিণে সিলোন জাভা ও সুমাত্রা প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং উত্তরে তাতার, মাঙ্গডিয়া, কন্দ্যিশ প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়া গ্রীশ রোম জর্ম্মাণি ও স্কাণ্ডিনেভিয়া পর্য্যন্ত সভ্য করিয়া তুলিয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত কর্ণেল অলকট ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের The Theosophist পত্রে লিখিয়াছেন "আধুনিক শব্দশাস্ত্রাদির বিচার দ্বারা এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত আধুনিক ভাষাসমূহের তুলনা দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে আর্য্য সভ্যতাই য়ুরোপে বিস্তৃত হইয়াছিল। মিসর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম এবং উত্তর য়ুরোপের ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রালোচনা দ্বারা আমাদের এই ধারণা অধিকতর দৃঢ় হয়; কারণ পাইথাগোরাস, সক্রেটীশ, প্লেটো, আরিষ্টটল, জেনো, হিমইড্, সিসিরো, সিভোলা, বারো ও ভারজিল প্রভৃতির উপদেশ সমূহের সহিত বেদব্যাস, কপিল, গৌতম, পতঞ্জলি, কণাদ, জৈমিনি নারদ, পানিণি প্রভৃতির উপদেশ সমূহ মিলাইয়া পাঠ করিলে অতি আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য দেখা যায়। আমরা দর্পণে মুখ দেখিবার সময় আমাদের মুখের সহিত দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের যেরূপ চমৎকার সাদৃশ্য দেখিতে পাই, ভারতের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের সহিত গ্রীক ও রোমান দর্শনের সাদৃশ্যও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ সাদৃশ্য হঠাৎ জন্মিতে পারে এরূপ বিবেচনা করা সাধারণ বুদ্ধির অতীত।" সার উইলিয়াম জোন্স মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে আর্য্যদিগের সম্বন্ধে সামান্যরূপ আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে প্রাচীন পারসিক, মিসরীয়, ইথিওপীয়, ফিনীশীয়, গ্রীক, শিথীয়, জর্ম্মাণ, চৈনিক, জাপানী ও আমেরিকদিগের সহিত আর্য্যদিগের সভ্যতা ও আচার ব্যবহার প্রভৃতির আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য আছে।" (৪) আমরা সংক্ষেপে ধারাবাহিকরূপে পৃথিবীর আর্য্য উপনিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

১। প্রাচীন মিশর এবং ইথিওপীয়া।

"প্রায় আট হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে একদল আর্য্য মিসরদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথায় আর্য্য শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, একথা একপ্রকার নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। মিসরদেশ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ বিদ্বান Brugsch Bey নানারূপ অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা (মিসরীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষগণ) সুয়েজ যোজক দিয়া নীল নদ-সনাথ মিসরে আগমন করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। মিশরীয়দিগের নিজের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও প্রতীত হয় যে তাঁহারা ভারতীয় আর্য্যদিগেরই বংশধর। (৪) সিন্ধুনদের সঙ্গমস্থলে বলিষ্ঠ, সাহসী, সমুদ্র-যাত্রা-নিপুণ একজাতি বাস করিত। সময়ের পরিবর্ত্তনে তাহারাই পরবর্ত্তীকালে স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া সুদূর গ্রীসে বাস করিয়াছিল। এই জাতিই পারস্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহে, আরব উপদ্বীপে লোহিত সাগরতীরস্থ দেশসমূহে এবং মিশর, নুবিয়া এবং

(১) India in Greece ২৬পৃ। (২) Historical Researches, Vol II ৩১০ পৃ। (৩) History of the world ‡ ২২পৃ।
(৪) The Theosophist, March 1881 (Col. Olcott.)

আবিসিনীয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। গ্রীস দেশে উপনিবেশ স্থাপনের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই মিসরীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, (৫) ভারতের প্রসিদ্ধ নদীসমূহের নাম হইতে মিসরের নদী ও নগর সমূহের নামকরণ, পশ্চিম ভারতের প্রদেশ বা নগর সমূহের নামে মিসরীয় নগর সমূহের নামকরণ, "রাম" প্রভৃতি হিন্দু রাজগণের নামে মিশরীয় রাজাদিগের নামকরণ, প্রাসাদ, মন্দির, সমাধিস্থান সমূহের গঠনের ঐক্য ও তৎসমুদায়ের বিশালতা এবং মিশরীয় ভাষা ও শব্দকে সংস্কৃত ভাষার সহায়তায় অনুবাদ করিবার সুগমতা প্রভৃতি কারণে মিশরে আর্য্য উপনিবেশ সম্বন্ধে স্থির ধারণা জন্মে। (৫) "মিশরীয় মনুষ্যের শারীরীক গঠনের সহিত আর্য্যদিগের শারীরীক গঠনের নিতান্ত সাম্য, উভয় জাতির ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম সমূহের ঐক্য, উহাদের শিল্প বাণিজ্যাদির বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণই মিশরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথায় সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন।" (৬) "ইথিওপীয়া এবং হিন্দুস্থান যাঁহাদিগের সভ্যতা, শিক্ষা ও সদাচার সম্বন্ধে অভ্রান্তরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাঁহারা যে এক মহান জাতির বিভিন্ন শাখা, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (৭)"ভারতের হিন্দুদিগের একদল রাজহত্যা করার অপরাধে জাতিচ্যুত হইয়া ইথিওপীয়া প্রদেশে আসিয়া বসতি করিয়াছিল।" (৮) "ইস্থবিয়াস বলিয়াছেন যে ইথিওপীয়গণ সিন্ধুপ্রদেশ হইতে আগমন করিয়া মিসরের নিকটস্থ প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন।" (৯)"প্রাচীন সময়ে ভারতের অধিবাসীগণ বহির্বাণিজ্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বাণিজ্য ব্যপদেশে আফ্রিকার নানা স্থানে বসতি করিয়াছিলেন। আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগের নানাস্থানের পল্লী ও নগরাদির নামের সহিত ভারতের দেশ নগরাদির আশ্চর্য্য ঐক্য এবং আফ্রিকায় প্রচলিত বহুশব্দ ভগ্ন সংস্কৃত মূলক দেখা গিয়াছে।" (১০)

২। পারস্য।

"পরশুরামের বংশজ অথবা সম্প্রদায় হইতে পারস্য দেশের নামকরণ হইয়াছে। "ভারত" (Eu-Bharat-es) হইতেই পারস্যোপসাগরের (Euphrates) নামের সৃষ্টি হইয়াছে।" (১১) "আর্য্য" এই শব্দের অর্থ জিন্দ্-অবেস্থা ধর্ম্ম গ্রন্থে স্পষ্টরূপেই লিখিত আছে এবং প্রাচীন পারসিকগণ উত্তর ভারত হইতেই পারস্যে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। (১২) অধ্যাপক হীরেন বলিতেছেন "প্রাচীন জিন্দ্ ভাষা সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং পারসিকগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন।" "Du Perron's Zind অভিধান পাঠ করিলে পাঠক দেখিবেন যে প্রত্যেক দশটী শব্দের মধ্যে ছয় সাতটী বিশুদ্ধ সংস্কৃত।" (Sir W. Jones' works Vol I) "বেদ এবং জিন্দ-অবেস্থা তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা হইবে বৈদিক ধর্ম্মের সম্প্রদায় বিশেষের সহিত বিরোধ হইতেই পারসীক ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছিল।" এই ধর্ম্মবিরোধ হইতেই প্রাচীন পারসিক জাতি ব্রাহ্মণদিগের সহিত চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন ধর্ম্ম লইয়া নূতন দেশে বাস করিতে লাগিলেন।" (Prof. Hang's Essays on the Parsees) "পারসীকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ, প্রাচীন পারসীকদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার এবং প্রাচীন পারস্য, কলচিস ও আরমেনিয়া দেশের মানচিত্রাদি আলোচনা করিলে, ভারতবর্ষ হইতে প্রাচীন আর্য্যদিগের দ্বারাই যে পারস্য প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কোন সন্দেহই থাকে না।" (১১)

(৫) India in Greece. (Mr. Pococke.)
(৬) Prof. Heeren's Asiatic Nations Vol II and Historical Researches Vol II.
(৭) Asiatic Researches Vol I. (Sir W. Jones) (৮) India in Greece P. 200.
(৯) Lemp, Barkers' Ed. (১০) Tod's Rajasthan Vol I and Asiatic Journal Vol IV.
(১১) India in Greece. (১২) Max Muler's Science of Language.

৩। এসিয়া মাইনর।

"কালডিয়া, বাবিলন ও কলচিশ প্রদেশের অধিবাসিগণ প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিল এবং এই সকল দেশের সভ্যতা আর্য্য সভ্যতা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল।" (১) "প্রসিদ্ধ ট্রোজান যুদ্ধে যে "অবন্তী" জাতির উল্লেখ আছে, এবং যাহারা ঐ যুদ্ধে অতিশয় সাহস ও শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহারা মালব দেশস্থ অবন্তী নগরের ক্ষত্রিয় বীরগণ, সন্দেহ নাই।" (২) "আসিরীয়দিগের রাজা 'বেল' বা বলী ভারতীয় হিন্দু সম্রাট; তাঁহার রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল, জানিতে পারা গিয়াছে।" (৩) "ভারতের যে প্রদেশ হইতে যে জাতি কর্ত্তৃক এই প্যালেষ্টাইন দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের আচার, ধর্ম্ম, উপাসনা পদ্ধতি হইতে জানা গিয়াছে যে উহারা ভারতীয় "রাজপুত" বংশসম্ভূতা ছিলেন। (২)

৪। গ্রীস।

"গ্রীসের সামাজিক অবস্থা, রাজ্যশাসন প্রণালী, ও ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে ঐ সকল প্রণালী, নিয়ম ও বিশ্বাসের মূল ভারতীয় সভ্যতা হইতে পাওয়া গিয়াছে। আমি প্রমাণ করিব, ভারতীয় উপনিবেশ ও তৎসম্ভূত ধর্ম্ম এবং ভাষা, গ্রীক্ ভূমিতে স্থাপিত ও বদ্ধমূল হইয়াছিল। আমি দেখাইতে পারিব যে কতকগুলি রাজবংশ পশ্চিমভারত হইতে লুপ্ত হইয়া গ্রীসে উদিত হইয়াছে, এবং ভারতের ইতিহাস সমূহে যে সকল ক্ষত্রিয় জাতির রণপাণ্ডিত্যের গাথা গীত হইতেছে, তাহাদেরই বীরত্বের প্রভায় ট্রয় প্রান্তর আলোকিত হইয়াছিল।" গ্রীসের ভাষা, দর্শন, ধর্ম্ম, তাহার নদ নদী, পর্ব্বত জনপদ, তাহার জাতিসমূহ, গ্রীকদিগের চতুরতা, বুদ্ধবৃত্তি, তাহাদিগের রাজনৈতিক অধিকার,—সমস্ত বিষয়ই অভ্রান্তরূপে তাহাদিগের ভারতীয় উৎপত্তি খ্যাপন করিতেছে। গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাস একই কথা। সংস্কৃত ভাষা হইতে গ্রীক ভাষার উৎপত্তি অনেক পণ্ডিত স্বীকার করেন, অথচ যাহারা সেই সংস্কৃত ভাষা হইতে গ্রীক ভাষা উৎপন্ন করিল, তাহাদিগের সম্বন্ধে নীরব থাকেন, আমার মতে ইহা সঙ্গত নহে। "গ্রীক" এই নাম হইতেই উহার "ভারতীয়" মূল আমরা বুঝিতে পারি। প্রাচীন মগধের রাজধানী "রাজগৃহ" নামে বিখ্যাত ছিল। সংস্কৃত ভাষার নিয়মানুসারে "গৃহ" কুলসম্ভূত মানবদিগের উপাধি "গ্রৈহিক" হইয়া থাকে। "Graihika" হইতে "Graihakoi", Graikos, Græcus, Greek হইয়াছে,—ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। মগধ হইতে আর্য্যগণ গ্রীসে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক কবি আসিয়াস লিখিয়াছেন যে পীলাসগাস নামক ভূপতি 'গয়া' হইতে আসিয়াছিলেন।" (২)

৫। রোম।

"ভারতের বিখ্যাত বীরপুরুষগণ যেমন দেবরূপে গ্রীসে পূজিত হইতেছিলেন, রোমেও ঠিক তাহাই হইতেছিল। রোমানগণ ভারতীয় আর্য্যদিগেরই বংশধর। 'রোম' এই নাম 'রাম' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'Rama' শব্দের a অক্ষরের পরিবর্ত্তে o অক্ষর বসিয়াছে এবং এরূপ পরিবর্ত্তন অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।" (৩) "রোমের দেবদেবীর উপাসনা, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাবতীয় ক্রিয়ার সহিত আর্য্যদিগের ও প্রাচীন মিশরীয়দিগের উপাসনা পদ্ধতি ও কর্ম্মকাণ্ডের অতি সুন্দর মিল আছে।" (৪)

(১) Theogony of the Hindus. (২) India in Greece. * (৩) Prof. Maurice.
* Mr. Pococke জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়া India in Greece নামক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠ করিলে পাঠক দেখিবেন যে প্রাচীন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন নিমিত্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ কিরূপ অসাধারণ শ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ দ্বারা য়ুরোপখণ্ডে সভ্যতা নীত হইয়াছে, মিঃ পোকোক ইহা অতি উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছেন।
(৩) Mr. Pococke's "India in Greece."
(৪) Count Bjornstjerna's "Theogony of the Hindus."

৬। তুর্কিস্থান ও উত্তর এসিয়া।

"আবদুল গাজি বলিয়াছেন যে হিন্দু পুরাণ কথিত তুরিষ্ক বা তুর্ক পুত্র তমকের নাম হইতে "তুর্কিস্থান" নাম হইয়াছে।" (১) "যযাতি পুত্র তুর্বসু হইতে তুরান বা তুর্কজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তুর্বসু পিতৃশাপে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু মহাকাব্যাদিতে কথিত হইয়াছে।" (২) "যশলমীর রাজ্যের রাজপুত ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে চন্দ্রবংশের যদু ও বালীক শাখা দ্বয়, মহাভারতের যুদ্ধের পরে খোরাসান প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। কুরুবংশের বহু শাখা উত্তর এসিয়ার নানাস্থানে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল প্রদেশ হিন্দু পুরাণে 'উত্তর-কুরু' নামে পরিচিত। গ্রীক গ্রন্থকারগণ ঐ প্রদেশকে Ottorocurae বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সূর্য্য এবং চন্দ্র উভয়বংশের বহুতর শাখা ভারত হইতে বহু যুগে নানা দিকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।" (১) "যশলমীরের উক্ত ইতিহাসে আরও কথিত আছে যে বিক্রমাদিত্যের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে যদুবংশের কতিপয় শাখা গজনী হইতে সমরকন্দ পর্য্যন্ত ভূভাগ শাসন করিতেন এবং মুসলমান অভ্যুদয়ের পরেই তাঁহারা ভারতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন! যদুবংশই জাবুলীস্থান প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গজনী নগর স্থাপন করেন। আবু হৌকল নামক ঐতিহাসিকের মতে হিরাট নগরের নাম 'হরি' ছিল। অধিক কি চন্দ্রবংশের "অশ্ব" শাখা বহু বিস্তৃত হইয়া সিন্ধুনদের উভয় প্রান্তেই ছড়াইয়া পড়ে এবং এই প্রবল প্রতাপ রাজবংশের নাম হইতেই 'এসিয়া" মহাদেশের নাম-করণ হইয়াছে। সাইবিরিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডে এখন ও Samoyedes নামে যে জাতি বাস করে, উহারা যদুবংশ বা শ্যাম যদুবংশের বংশধর। উহাদের ভাষাকে পণ্ডিতবর Klaproth সংস্কৃত ভাষার সহিত অতি নৈকট্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।" (১)

৭। জার্ম্মাণ দেশ।

"হিন্দুদিগের মতে 'মনু' হইতে মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, জার্ম্মাণ পুরাণ বলেন টিউটন বা জার্ম্মাণ জাতির আদি পুরুষের নাম "Manus" (মনুঃ)। জার্ম্মাণ ভাষায় Manu ও ইংরাজির man সংস্কৃত 'মনু' শব্দের এবং জার্ম্মাণ Mensch সংস্কৃত 'মানুষ' শব্দের অতি নিকট অনুকরণ বোধ হয়।" (৩) জর্ম্মাণ দেশের লোকে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে স্নান করেন, তাঁহাদিগের এই আচার জার্ম্মানীর ন্যায় শীতপ্রধান দেশের পক্ষে স্বাভাবিক নহে; বরঞ্চ উহা তাঁহাদিগের পূর্ব্বজগণের অতীতকালে উষ্ণদেশবাসেরই অবিনিষ্ট নিদর্শন। জর্ম্মানদিগের ঢিলে ঢালা লম্বা পোষাক এবং মাথার মধ্যভাগে লম্বা চুল গ্রন্থি বাঁধিয়া রাখার পদ্ধতি ও হিন্দু আচারের অনুরূপ। Saxon শব্দ শকসানু বা Saca-son, শকপুত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইংলণ্ডের সাক্সন (saxon) ধর্ম্মগৃহের চিত্র সমূহ দেখিয়া আমার মনে ভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপীদিগের চিত্রের কথা মনে পড়ে, উভয় চিত্রের মূল কোথায়? আমার বিশ্বাস যে সাক্সণদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতবর্ষ হইতেই ঐ সকল চিত্রের ভাব আনয়ন করিয়াছিলেন।" (৪)

৮। স্কাণ্ডিনেভিয়া (নরওয়ে ও সুইডেন)

"চন্দ্রবংশের একশাখা "অশ্ব" এই উপনামে বিখ্যাত ছিল। স্কাণ্ডিনেভিয়া দেশের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র Edda (এড্ডা) গ্রন্থে লিখিত আছে যে 'অশি' বা অশ্ববংশীয় জিৎ বা জিতেশ (Getes or jits) স্কাণ্ডিনেভিয়ায় আগমন করেন এবং প্রথমে যে স্থানে বাস করিয়াছেন, তাহার নাম অশ্বগড় (Asigard) বা 'অশ্বদুর্গ' রাখিয়াছিলেন। এই দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম ও কাব্যগ্রন্থে ভারতীয় মূলের পরিচয় পাওয়া যায়। Pinkerton বলেন ওডিনদেব খ্রী পূঃ ৫০০ অব্দে স্কাণ্ডিনেভিয়ায় আগমন করিয়াছিলেন এবং গোতম তাঁহার বংশধর। এই গোতম সম্ভবতঃ গোতম-বুদ্ধদেব, তাঁহার আবির্ভাবকাল ও খ্রীঃ ৫৩৩ অব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।" (১) "বেদ" শব্দ হইতে Edda উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। যে নিয়ম অনুসারে ভারতে সপ্তাহের সাতটী বারের নামকরণ হইয়াছে, স্কাণ্ডিনেভিয়াও ঠিক ঐ বিধি অনুসৃত হইয়াছে। যথা :—

	ইংরাজি নাম।	সংস্কৃত নাম।
১।	Sunday	রবিবার।
২।	Monday	সোমবার।
৩।	Tuesday	মঙ্গলবার।
৪।	Wednesday	বুধবার।
৫।	Thursday	বৃহস্পতিবার।
৬।	Friday	শুক্রবার।
৭।	Saturday	শনিবার।

স্কাণ্ডিনেভিয়ার নাম।

Sondag	সূর্য্য হইতে নাম করণ।
Mondag	চন্দ্র হইতে ,,
Tisdag	হিন্দুমতে মঙ্গলগ্রহ হইতে; স্কাণ্ডিনেভিয়ায় This নামক দেবতা হইতে।
Onsdag	হিন্দুমতে বুধ হইতে স্কাণ্ডিনেভিয়ায় Oden (Oden = বোধ বা বুধ, অত্যন্ত 'ব' কার Oর ন্যায় উচ্চারিত হয়।) হইতে।
Thorsdag	হিন্দুমতে 'বৃহস্পতি' হইতে স্কাণ্ডিনেভিয়ার প্রধান দেব Thor হইতে।
Freidag	হিন্দুমতে শুক্র হইতে, স্কাণ্ডিনেভিয়ায় Freja দেবী (সৌন্দর্য্যের দেবতা) হইতে।
Lordag	হিন্দুমতে শনৈশ্চর হইতে, স্কাণ্ডিনেভিয়ায় Loger বা স্নান হইতে।

এই বারের নামকরণ হইতে আমরা আরও প্রমাণ পাইতেছি যে স্কাণ্ডিনেভিয়ার পৌরাণিক আখ্যানাবলী ভারতীয় পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। (২)

৯। শ্বেতদ্বীপ (গ্রেটবিটেন।)

"গ্রেট ব্রিটনের ড্রুইড্‌গণ বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুনর্জ্জন্মবাদ, স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা এই ত্রিদেবের অস্তিত্ব ও ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় 'শাপ' দেওয়ার প্রথা ড্রুইড্‌গণ স্বীকার করিতেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের মত ড্রুইড্‌দিগের শ্রেণী বিভাগ ছিল।" (৩) "ইংলণ্ডের হর্ষসূচক "Hurrah" কোথা হইতে আসিল? কোন ইংরাজ কি ভাবিয়াছেন যে তাঁহার রাজপুত পূর্ব্বজগণ আনন্দফুল্ল-চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে যে "হর হর" বলিয়া সিংহনাদ করিতেন, এই 'Hurrah' তাহারই বিকৃতি মাত্র? মহাকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ড্রুইড্‌দিগের যে যুদ্ধ বিবরিণী হৃচ্ছাস কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে সেই রাজপুত জাতির কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়; কবি বলিয়াছেন :—

"Then seize the spear, and mount the *Scythed wheel*,
Lash the proud steed, and whirl the flaming steel,
Sweep through the thickest host and scorn to fly,
Arise! arise! for this it is to die.
Thus, 'neath his *vaulted lane* the Druid Sire
Lit the rapt soul, and fed the martial fire." (৪)

(১) Tod's Rajasthan. (২) Max Muller's 'Sicence of Language."
(৩) Manning's "Ancient and Mediæval India Vol I. (৪) Tods' Rajasthan.

(১) Tod's Rajasthan.
(২) Count Bjornstjerna's "Theogony of the Hindus". এই কাউণ্ট সাহেবের নিবাস স্কাণ্ডিনেভিয়ায়। অতি দৃঢ় প্রমাণ না পাইলে তিনি পরাধীন ভারতীয় আর্য্যদিগকে স্বজাতির পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কখনই স্বীকার করিতেন না।
(৩) "India in Greece."
(৪) History in Greece

"প্রাচীন ইংলণ্ডের ড্রুইডগণ প্রাচীন রাজপুত জাতির ভাট বা কবিবংশ সম্ভূত এবং তাঁহাদের সহিত চন্দ্রবংশের রাজপুতদিগের বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় তাঁহারা অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। প্রাচীন কালে হিন্দুগণ যে ব্রিটন দেশে বাস করিতেন, তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে।" (১)

১০। পূর্ব্ব এসিয়া।

"ব্রহ্মদেশবাসিদিগের আইন সমূহের সাধারণ নাম "ধর্ম্মসাথ" বা ধর্ম্মশাস্ত্র; উহা বিখ্যাত মনু সংহিতার এক বিশেষ সংস্করণ মাত্র। এই শাস্ত্র নিবদ্ধ বিধি ব্যবস্থা অতি উৎকৃষ্ট সভ্যতার পরিচায়ক (২) "ব্রহ্মদেশ ও তিব্বতদেশ সভ্যতা ও শিক্ষা সমূহে ভারতবর্ষের নিকট বিশেষ রূপে ঋণী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'ব্রহ্ম' নাম শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ। নানা শাস্ত্রে নানা স্থানে 'কাম্বোজ' দেশের উল্লেখ আছে, কাম্বোডিয়া এবং কাম্বোজ যে এক প্রদেশেরই নাম তাহা কে অস্বীকার করিবেন? (৩) ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রে (১৮৮২ খৃঃ ২ রা সেপ্টেম্বর) কাম্বোডিয়া দেশে এক হিন্দু দেবালয় আবিষ্কারের কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ দেবালয়ের লিপি হইতে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে হয় ঐ দেশ ভারতের কোন রাজার অধীনে ছিল, নতুবা ঐ রাজ্যের সহিত কাম্বোডিয়ার নিকট সম্বন্ধ ছিল।

"চীনদেশ ও ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়দিগের উপনিবেশ স্থান। চীন ও তাতার প্রদেশের ঐতিহাসিক গণ স্বীকার করিয়াছেন যে আর্য্য সম্রাট পুরুরবা তাঁহাদিগের আদি পুরুষ।' (৪) "চীনদিগের ধর্ম্ম যে ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।" (৫) "জাভা দ্বীপের ইতিহাসে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে কলিঙ্গ দেশ হইতে খৃঃ পূঃ ৭৫ অব্দে এক দল হিন্দু তথায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক সভ্যতা বিস্তার করেন ও একটি অব্দ স্থাপিত করেন ঐ অব্দ এখন ও তথায় প্রচলিত রহিয়াছে।" (৬) "আর্য্যদিগের দ্বারা যে জাভা দ্বীপ অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" (৭) "পরে বৌদ্ধগণ ৬০৩ খৃঃ অব্দে গুজরাট প্রদেশের এক রাজপুত্রের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় দশ সহস্র ছিল এবং সেই সময় হইতে তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে।" (৮) খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে চৈনিক ভ্রমণকারীগণ জাভাদ্বীপে বহুতর হিন্দুর বসতি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুগণ তথায় যাইয়া নিজ সভ্যতা ধর্ম্ম ও শিক্ষার বিস্তার করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।" (৯)

"বোর্ণিও দ্বীপের নানা স্থানে, সমুদ্র হইতে ৪০০ মাইল দূর পর্য্যন্ত ভূভাগে, বিবিধ আকারের দেব মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ সমূহ বর্ত্তমান আছে; সে গুলি দেখিলে হিন্দু দেব দেবীর মন্দির বলিয়া বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।" (১০) "জাভা দ্বীপের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র বলী দ্বীপে এখন ও হিন্দু ধর্ম্ম এবং প্রাচীন পঞ্চায়েতী শাসন প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে।" (১১)

"সুমাত্রা দ্বীপে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক মিঃ অণ্ডারসন বলিয়াছেন যে এই দ্বীপে আদি নামক স্থানে এক বিশাল হিন্দু দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ এবং বহু ভগ্ন দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মূর্ত্তি ও মন্দির দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হয় যে হিন্দুগণ এই দ্বীপে আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও বিদ্যার প্রচার করিয়াছিলেন।" (১২)

(১) Colebrooke's Miscellaneous Essays Vol II. যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Mr. Godfrey Higgins প্রণীত "Celtic Druids" নামক পুস্তক পাঠ করুন। এই পুস্তকে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইংলণ্ডে হিন্দুগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং ড্রুইডগণ তাঁহাদের পৌরোহিত্য করিতেন।

(২) Symes' Embassy to Ava. (৩) Prof H. Wilson.

(৪) Tod's Rajasthan. (৫) Theogony of the Hindus. (৬) Elphinstones' History of India. (৭) Prof Heeren's "Historical Researches Vol II. (৮) Journal R. A. S. (1906) (৯) Journal R. A. S. Vol IX. Dr. Cust's "Linguistic and Oriental Essays. (১০) Journal R. A. S. Vol VII. (১১) Sir S. Raffles' "Description of Java." (১২) Coleman's "Hindu Mythology."

১১। আমেরিকা।

"সুবিখ্যাত জর্ম্মাণ পরিব্রাজক ব্যারণ হমবোল্ট আমেরিকা দেশে এখনও যে সকল হিন্দুকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।" (১) "পেরু দেশের অধিবাসী ও ভারতের আর্য্যগণ একই জাতি সন্দেহ নাই।" (২) "মধ্য আমেরিকার 'চিচেন' নামক স্থানের প্রাচীন গৃহাদি ভারতের মন্দিরের অবিকল অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়।" (৩) "দক্ষিণ ভারতের ও পূর্ব্ব উপদ্বীপের বৌদ্ধ মন্দির সমূহের সহিত মধ্য আমেরিকার প্রাচীন মন্দিরাদির বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।" (৪) "আমেরিকা দেশে যে সকল প্রাচীন মন্দির, দুর্গ, জলপ্রণালী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় সে সমুদায় 'ভারতীয় শ্রেণীর' অন্তর্গত।" (৫) ভারতের পৌরাণিক পূজা ও উপাসনা পদ্ধতির সহিত আমেরিকাবাসিগণের পূজা ও উপাসনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে যথা—

(১) আমেরিকা দেশে পৃথ্বীমাতার পূজা হয়; ভারতেও ধরিত্রীমাতা বা পৃথ্বীমাতার পূজা হয়।

(২) পর্ব্বত প্রস্তরাদিতে অঙ্কিত দেবদেবীর পূজা আমেরিকা ও ভারত উভয় দেশেই ভক্তির সহিত পূজিত হয়।

(৩) চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে হিন্দুপুরাণের মত ও আমেরিকদিগের মালেইও (Maleoyo) নামক দৈত্য চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করে বলিয়া গ্রহণ হয়, হিন্দুমতে রাহু দৈত্য গ্রহণের কারণ। গ্রহণের সময় ঢাক ঢোল বাজাইবার প্রথা উভয় দেশেই দৃষ্ট হয়।

(৪) ভারতের শিব তারা প্রভৃতি দেবদেবীর ন্যায় আমেরিকার অনেক দেবদেবীর সর্পভূষণ লক্ষিত হয়।

(৫) হিন্দুদিগের গণেশের ন্যায় গজমুণ্ড নরাকার দেবতা এখনও মেক্সিকো দেশে পূজিত হইতেছেন। পুরাণের জলপ্লাবনের গল্প আমেরিকায়ও প্রচলিত আছে। কচ্ছপের পৃষ্ঠে পৃথিবীর অবস্থান উভয় দেশের গল্পেই বিদ্যমান। সর্পের পূজা ভারতের ন্যায় এখনও আমেরিকায় বর্ত্তমান আছে।

(৬) হিন্দুস্থানের "রামলীলার" ন্যায় পেরুদেশে "রামলীলার" মেলা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আমেরিকগণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে। পৌরাণিক গল্প ভিন্ন সামাজিক আচার পদ্ধতি, বেশভূষা, সভ্যতার নানাবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেদিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক, আমেরিকা দেশে যে প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দুগণ যাতায়াত করিতেন এবং তথায় বাস করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই।" (১)

এই উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আমরা আমাদের পাশ্চাত্য গুরুদিগের মহামহিমময়ী বাণী উদ্ধৃত করিয়াছি; যদি পাঠকদিগের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা মূল পুস্তকগুলি দেখিতে পারিবেন, এই আশায় ইংরেজী গ্রন্থগুলিরও পরিচয় দিয়াছি। আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অতি অল্পাংশমাত্রই আমরা দেখিতে পাই, ঐ বিশাল সাহিত্যের ভূরিভাগই ধর্ম্মোন্মত্ত বা অর্থলোলুপ বিজয়ীদিগের দ্বারা নষ্ট হইয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। আলেক্‌জান্ড্রিয়া নগরের বিখ্যাত পুস্তকালয় দাহের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন, কিন্তু ভারতের বিনষ্ট পুস্তকের সংখ্যা তদপেক্ষা ও অধিক। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ রায় শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর লিখিয়াছেন যে নালন্দ, বুদ্ধগয়া ও উদণ্ডপুরী নামক স্থানে নয় দশ তলা বৃহৎ প্রাসাদ সমূহ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল, ১২১২ খৃঃ অব্দে বখ্‌তিয়ার খিলিজী মহাশয়ের সেনাপতি ভক্তবর মহম্মদ বেন সাম মহোদয় অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক ঐ লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ বিনাশ করিয়া

(১) Coleman's "Hindu Mythology." (২) India in Greece. (৩) Mr. Hardy on Eastern Monachism. (৪) Mr. Squire on Serpent Symbol. (৫) Dr. Zerfu's Manual of Historical Development of Art.

Tayor's Early History of Mankind etc.

অপরিসীম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। মহা প্রতাপশালী সুলতান্ আলাউদ্দীন খিলিজী অনহলবারা পাটনের বিখ্যাত পুস্তকালয় দগ্ধ করিয়াছিলেন। সম্রাট ফিরোজসাহ তোগলক বাহাদুর কোহানস্থ বিশাল সংস্কৃত পাঠাগার ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। আর মোগলকুলভূষণ সম্রাট সুলতান সেকন্দর সানি (আলমগীর বাদশাহ) তাঁহার রাজ্যের যেথানে হিন্দুদিগের কেতাব পাইতেন, সেইখানেই তাহা অগ্নিসাৎ করিতেন। এই শেষোক্ত বিষয়টী তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হুসেন স্বপ্রণীত "সৈর মুতাক্ষ্রীন" নামক ইতিহাসে বেশ একটু গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু দুঃখ করিয়া লাভ কি? যাহা গিয়াছে, তাহা গিয়াছে,—আর তাহা পাইবার আশা নাই। হিন্দুশাস্ত্রের যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে হিন্দুগণের দ্বারা পৃথিবীর অনেকাংশে উপনিবেশ স্থাপনের কোন প্রমাণ আছে কি না? আমরা হিন্দুশাস্ত্রানুসন্ধানে যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাও পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। যদি 'স্বদেশী' প্রমাণে তাঁহাদের আস্থা হয়, গ্রহণ করিবেন।

মনু মহারাজ বলিতেছেন:—

"শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ॥"

মনু ॥১০॥

নিম্নলিখিত ক্ষত্রিয় জাতিগণ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ বশতঃ এবং ব্রাহ্মণদিগের অদর্শন হেতু ক্রমশঃ পতিত হইয়াছেন, যথা ১। পৌণ্ড্রক ২। ওড্র ৩। দ্রবিড় ৪। কাম্বোজ ৫। যবন ৬। শক ৭। পারদ ৮। পহ্লব ৯। চীন ১০। কিরাত ১১। দরদ ১২। খশ।

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে

"শকা যবন কাম্বোজাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥
দ্রাবিড়াশ্চ কলিন্দাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যুশীনরাঃ।
কোলিসর্পা মাহিষকাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ॥
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥"

পুনশ্চ

"মেকলা দ্রবিড়া লাটা পৌণ্ড্রাঃ কোম্বশিরাস্তথা।
শৌণ্ডিকা দরদা দর্ব্বা শ্চৌরা শবরবর্ব্বরা॥
কিরাতা যবনাশ্চৈব তাস্তাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বমনুপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥

এই বচনে মনু বচনের অতিরিক্ত ১৩। কলিন্দ, ১৪। পুলিন্দ, ১৫। উশীনর, ১৬। কোলিসর্প ১৭। মাহিষক, ১৮। মেকল, ১৯। লাট, ২০। কণ্ঠাসির, ২১। শৌণ্ডিক, ২২। দর্ব্ব ২৩। চৌর ২৪। শবর, ২৫। বর্ব্বর জাতির উল্লেখ আছে।—পাতিত্যের কারণ পূর্ব্বরূপ। এতদ্ভিন্ন হরিবংশ পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থে এই সকল জাতির এই প্রকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সকল জাতির কতকগুলির পরিচয় (ওড্র, পৌণ্ড্র ইত্যাদি) ভারতে পাওয়া যায়,—অনেকগুলি এসিয়া, আফ্রিকা, য়ুরোপ ও আমেরিকাবাসী বলিয়া বোধ হয়। যবন = গ্রীক, শক = শিথীয়, পহ্লব = প্রাচীন পারসীক, কাম্বোজ = কাম্বোডিয়াবাসী, দ্রবিড় = ড্রুইড্, দরদ = দর্দ্দিস্থানের অধিবাসী ইত্যাদি। এতদতিরিক্ত হূন, তুষার, কঙ্ক, অন্ধ্র, উড্র, রমঠ, প্রভৃতি জাতির উল্লেখ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিব জাতির নাম লিখিত আছে। এই জাতিদিগের বাসস্থান, আচার ব্যবহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে বিষ্ণুপুরাণে এবং হরিবংশে দেখিতে পাওয়া যায় যে সূর্য্যবংশীয় সম্রাট সগর শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, ও পহ্লব জাতি সমূহকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত করেন এবং যবনদিগকে মাথা সম্পূর্ণ কামাইতে, শকদিগকে মাথার অর্দ্ধেক কেশশূন্য করিতে, পারদদিগকে দীর্ঘ কেশ রাখিতে ও পহ্লবদিগকে দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতে বাধ্য করেন। ঐ সকল জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি যে মাথা

কামাইয়া দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতেন, তাহা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বে ১১৯ অধ্যায়ে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীর সাত্যকির সহিত কুরুপক্ষীয় শক শবরাদির যুদ্ধ বর্ণনা উপলক্ষে মহর্ষি লিখিতেছেন:—

"কাম্বোজানাং সহস্রৈশ্চ শকানাং চ বিশাংপতে॥
শবরাণাং কিরাতানাং বর্ব্বরাণাং তথৈবচ॥
অগম্যরূপাং পৃথিবীং মাংস শোণিত কর্দ্দমাম্।
কৃতবাংস্তত্র শৈনেয়ঃ ক্ষপয়ংস্তাবকং বলম্॥
দস্যূনাং সশিরস্ত্রাণৈঃ শিরোভির্লূন মূর্দ্ধজৈঃ।
দীর্ঘ কূর্চৈর্মহী কীর্ণা বিবর্হৈরণ্ডজৈরিব॥"

"সাত্যকির শরজালে সহস্র সহস্র কাম্বোজ, শক শবর, কিরাত ও বর্ব্বর জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে রণক্ষেত্র তাহাদের মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমময় হইয়া গেল। সেই দস্যুদিগের কেশহীন কিন্তু দীর্ঘশ্মশ্রু সম্পন্ন মস্তক সমুহ ছিন্ন পক্ষ পক্ষীদিগের ন্যায় পৃথিবী আচ্ছন্ন করিল।"

কালিদাস রঘু রাজার দিগ্বিজয় উপলক্ষে পারস্ত দেশ বিজয় ও যবন জাতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ বর্ণনায় লিথিয়াছেন:—

"পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী॥
যবনী মুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাব্জানা মকাল জলদোদয়ঃ॥
সংগ্রামস্তুমুলস্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্বসাধনৈঃ।
শার্ঙ্গকূজিত বিজ্ঞেয় প্রতি যোধরজস্যভূৎ॥
ভল্লাপবর্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্।
তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ সক্ষৌদ্র পটলৈরিব॥"

রঘুবংশ ॥৪॥৬০—৬৩।

সুকবি নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ—

"পারস্যের রাজকুলে করিবারে জয়
স্থলপথে তথা রঘু করিলা গমন।
তত্ত্বজ্ঞান পথে যথা চলে যোগিজন
করিতে ইন্দ্রিয়রূপ রিপুর বিজয়॥
যবনীর মুখপদ্মে মদ-রাগ ছটা
ঘুচাইল রঘুরাজ, (যবনে বিনাশি)
অকালে ঢাকিলে সূর্য্যে জলদের ঘটা
ফোটে কি বালার্ক রাগে কমলের হাসি?
অশ্বপৃষ্ঠে মহাবল যবননিকর
যুঝিল রঘুর সহ, আঁধারি অম্বর
উঠিল ধূলার রাশি, না চলে নয়ন,
শিঙ্গারবে শত্রুপক্ষে চিনে সেনাগণ।
শত শত শ্মশ্রুযুক্ত যবনের শির
ভল্লেতে কাটিয়া রঘু পাড়িলা ধরায়,
নীল অলি পরিবৃত মধুচক্র প্রায়
শোভে তাহা রণস্থলে দেখিতে রুচির॥"

পুনশ্চ ভারতের উত্তরদিকস্থ হূণদিগের বিজয় উপলক্ষে কবি বলিতেছেন,—

"তত্র হূণাবরোধানাং ভর্ত্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্।
কপোল পাটলা দেশি বভূব রঘুচেষ্টিতম্ ৬৮॥"

মল্লিনাথ হূণদিগকে ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়াছেন। কবি নবীনচন্দ্র অনুবাদ করিয়াছেন:—

"হূণদেশ বীরগণে বধি রণস্থলে
লভিলা অতুল যশ কোশল-রাজন,
পতিহীনা হূণাঙ্গনা বদনমণ্ডলে
শোকজাত রক্ত আভা করি আরোপণ॥"

পাঠক দেখিতেছেন পূর্ব্বকালে ভারতের সহিত এসিয়া য়ুরোপ প্রভৃতি দেশের অধিবাসীর যাতায়াত ছিল। রামায়ণ উত্তরকাণ্ডের ৪৬সর্গে রাবণের শ্বেতদ্বীপে গমনের উপাখ্যান আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে ঐ দ্বীপবাসী মানবদিগের বিশাল দেহ, স্বর মেঘগর্জ্জনবৎ, বর্ণ সুধাংশু তুল্য, বাহু সুবৃহৎ অর্গলের ন্যায়, এবং রমনীকুল পর্য্যন্ত এরূপ বীর্য্যবতী যে যুদ্ধদুর্ম্মদ রাবণ তথায় গেলে এক যুবতী সহাস্য-মুখে রাবণকে বালকের ন্যায় ধরিয়া ঘুরপাক খাওয়াইয়া উপহাস করিয়া বলিলেন—

"সখি! পশ্য ত্বং কীটকং ধৃতম্।
দশাস্যং বিংশভিভুজ; কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভমং॥"

"সখি দেখ্ দেখ্ কেমন এক মজার কৃষ্ণবর্ণ দশমুখ কুড়িহস্তযুক্ত একটা পোকা ধরিয়াছি!" পণ্ডিতগণ বলেন এই শ্বেতদ্বীপ গ্রেট ব্রিটেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে দেখা যায় বেদব্যাসতনয় শুকদেব ইলাবৃতবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ অতিক্রম

করিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের ভিতর চীনদেশ ও হূণদেশ ছিল। ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ যথাক্রমে আমেরিকা ও য়ুরোপ বলিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। হরিবংশে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদ্বয় গদ শাম্ব প্রদ্যুম্ন উত্তরসাগরতীরস্থ বজ্রপুর নগরে (সাইবিরিয়ায়) নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন আমেরিকার অন্তর্গত কুরুরাজ কন্যা উলুপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব ৯১ অধ্যায়।)

সেকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঠিক আধুনিক য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় উদ্যোগী, কর্ম্মঠ, বিদ্বান, বাণিজ্যকুশল জীবিত জাতি ছিলেন। সত্য সত্যই এখন ভারতে কলিযুগ উপস্থিত। আর কি আমরা আমাদিগের পূর্ব্বগৌরব লাভ করিতে পারিব না? যাহাদের অতীত এরূপ উজ্জ্বল, তাহাদের ভবিষ্যৎ কি চিরান্ধকময় থাকিবে? ভগবন্, তুমিই জান, ভবিষ্যতের ভিতর আমাদের কি নিয়তি নিহিত রহিয়াছে।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।

সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের বক্তৃতা।

গত ৩১এ জানুয়ারী মহাসমারোহে রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নিম্নে সভাপতির বক্তৃতা প্রকাশিত হইল।

শ্রদ্ধেয় শশধর রায় মহাশয় যখন আপনাদের প্রতিনিধি স্বরূপ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহিত্য সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন তখন আমি যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কে অভিভূত হইলাম। প্রথমতঃ মনে হইল নাম বা ঠিকানা ভুলিয়া হয়ত তাঁহারা আমার নিকট আসিয়াছেন। আমি সাহিত্যসেবা করি নাই। বলিতে লজ্জা হয়, মাতৃভাষায় দুইটি কথা সংযোগ করিতে হইলে আমার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ যে আসনে সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথকে আপনারা একবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে আসন গ্রহণ করা আমার ধৃষ্টতা ও বাতুলতা মাত্র। তারপর আমি এক প্রকার চিররুগ্ন। দূর প্রদেশে আসিয়া কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কাজ করা আমার শক্তি ও সামর্থ্যের অতীত। এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া আমি এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু শশধর বাবু যখন পরদিন সাহিত্য-পরিষদের দুই প্রধান স্তম্ভস্বরূপ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে করিয়া পুনরায় এই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণদেহ মশককে ধৃত করিবার জন্য জাল বিস্তার করিলেন, তখন পরাভূত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলাম। আমি এক প্রকার বন্দীভাবে আপনাদের সমক্ষে আনীত, এই গুরুভার আমার স্কন্ধে চাপাইয়া আপনারা কতদূর সফলতা লাভ করিবেন জানি না, তবে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই শাস্ত্রোক্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়া আজ সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ করিতেছি।

স্থানীয় কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে বঙ্গসাহিত্যে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রসার হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

জাতীয় সাহিত্য জাতির মানসিক অবস্থা পরিচায়ক ও পরিমাপক। যে কোন দেশের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের সাহিত্য নিবিষ্টভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সে দেশের তৎকালীন লৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। কারণ, সাহিত্য জাতীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির শাশ্বিক বিকাশ মাত্র। যেমন চিত্রকর নীরব ভাষাতে চিত্রিত বিষয়ে কেমন এক প্রকার সজীবতা প্রদান করেন যদ্দ্বারা আলেখ্য বিশেষের মনোগত ভাব অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায় তেমনি সাহিত্য-চিত্রে জাতীয় চরিত্র মুখরিত হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের সূচনা হইতেই তাহাতে ধর্ম্ম প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মানিকচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্রের গীতাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত কেবল এই একই সুর। এই ভাবের চরম বিকাশ হইয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। প্রেমের জয়, নামে রুচি, যে সাহিত্যের মূলমন্ত্র, সেই বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদন স্রোতে দেখিতে পাই সেই একভাব—ধর্ম্ম প্রবণতা। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসাদেই আমরা আজ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বীণা-নিক্কণ শুনিয়া মাতৃভাষাকে ও স্বদেশকে গৌরবান্বিত মনে করি। চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমরা তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধেও সেই উক্তি প্রয়োগ করিব। ইহার আদ্যোপান্ত "নিকষিত হেম।"

এই ধর্ম্ম সাহিত্যের স্রোত মানিকচাঁদের সময় অর্থাৎ খৃঃ একাদশ শতাব্দী হইতে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি সাধন ও কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। সেই স্রোত আজও প্রবাহিত। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গুরুস্থানীয় জয়দেবের সময় হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী—এই ৭।৮ শত বৎসর—একই স্রোত চলিতেছে। গীতগোবিন্দে যে তরঙ্গ আলোড়িত, হইয়াছিল, রাই উন্মাদিনীতে তাহারি আঘাত ও প্রতিঘাত দেখিতে পাই। এই সংক্রামকতা ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী কবিগণও এড়াইতে পারেন নাই। বৈষ্ণব পদাবলীতে ৭০।৭৫ জন মুসলমান কবির পদাবলী পাওয়া যায়। গত কয় বৎসর বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্ম-বিষয়ক।

বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন্ সময়ে গদ্যের প্রথম আবির্ভাব হয় তাহার আলোচনা করিবার আমাদের সময় নাই। তবে মোটামুটি ইহা ধরা যাইতে পারে যে গদ্য সাহিত্যের বয়স শতবর্ষ মাত্র। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ স্থাপন সময় হইতে বঙ্গ সাহিত্য নবযুগে পদার্পণ করিয়াছে। কেরী, মার্সম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ, রাজীবলোচন এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রাম রাম বসু, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই যুগের প্রবর্ত্তক। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস সবিস্তার বিবৃত করিয়া, নিম্নলিখিত কথা কয়টী বলিয়া তাঁহার সারবান গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন :—

"ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি, নূতন আকাঙ্খার সঙ্গে সমস্ত জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে। সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্য সাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে, এ বড় শুভ লক্ষণ। ক্রীড়াশীল শিশু যেমন সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর ঊর্ম্মরাশির অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যপৃত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের অদূরবর্ত্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কুরিত না হয়!"

আজ আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধশালী। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা প্রভাবে তাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যকে অনেকে বিদ্যাসাগরীয় যুগের সাহিত্য এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা সাহিত্যের শব্দবিন্যাস বর্ত্তমান হইতে অনেকটা বিভিন্ন। তাঁহার বেতাল পঞ্চবিংশতি সংস্কৃত সমাসবদ্ধপদে পরিপূর্ণ। এক পংক্তি রচনার মধ্যে ৩। ৪ টি হ্রস্বহ সমাসবদ্ধপদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান পাঠকদিগের নিকট কিরূপ সুখপাঠ্য হইবে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের শৈশবে ইহাই রীতি ছিল। Fort William College-এর পাঠ্য-পুস্তক "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" তাহা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। "কোকিলকালালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরান্তঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া

* এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত আমরা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দা মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

আসিতেছে" ইহাই তখনকার আদর্শ ভাষা ছিল। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র "আলালের ঘরের দুলালে"র মুখবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপকেরা যিকে "আজ্য" বলিতেন কদাচ 'ঘৃতে' নামিতেন। খইকে "লাজ" চিনিকে "শর্করা" ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া ভাষার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিতেছিলেন। যাহা হউক নূতন বন্যায় সে ঢেউ চলিয়া গেল। বসন্তের অতৃপ্ত কোকিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে যেমন একদিকে বিরহের উচ্ছ্বাস গীতিকা গাহিতে লাগিল, আবার 'আনন্দমঠে' স্বদেশপ্রেমিকতার ভৈরবনিনাদ, অপরদিকে সংযম, আত্মনিবৃত্তি, যোগ, অনুশীলন, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির উচ্ছ্বাসে 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গদেশে নূতন যুগ আনয়ন করিল। সেই অলোকসামান্য প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়া আজ বাঙ্গলা সাহিত্য সমগ্র ভারত-সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভাবারি সিঞ্চন করিয়া উর্ব্বরতা সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত, শ্রীমধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যের কাব্যাংশ কনকাভরণে সাজাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত সত্বেও আজ আমাদের সম্মুখে একটী ভীষণ বিপদ উপস্থিত। আমাদের সাহিত্যের আংশিক উন্নতি হইয়াছে মাত্র, সাহিত্যের উপন্যাস ও কাব্যাংশের পূর্ণ বিকাশ হইতেছে ইহাও সত্য বটে, কিন্তু একটী মাত্র কারণে ভাষার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতে পারিতেছে না। শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, যে অঙ্গের চালনা হয় সেই অঙ্গ দৃঢ় ও সবল হইতে থাকে আবার যে অঙ্গের চালনা হয় না তাহা ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইয়া পরে একবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

প্রাচীন ভারতে সত্যের ও নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য ঋষিরা ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু মধ্যযুগে এ সমস্ত লুপ্ত হইল। চৌষট্টি কলার অন্তর্ভুক্ত যিনি যত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেন, তিনি শিক্ষিত সমাজে তত জ্ঞানবান বলিয়া আদৃত হইতেন। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায় ধাতুবাদ (Chemistry and Metallurgy) ঐ সকল কলার মধ্যে পরিগণিত হইত। চরকে বনৌষধি চিনিয়া ও বাছিয়া লইবার জন্য উদ্ভিদ্ বিদ্যালাভের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সুশ্রুতে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্থিবিদ্যা শিখিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে শল্যতন্ত্র (Surgery) একটী প্রধান অঙ্গ। সুশ্রুতে যে ক্ষারপাকবিধি বর্ণিত আছে, তাহা নব্য রসায়ন শাস্ত্রের এক অধ্যায় বলিয়া অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু হায়, যে ভারতের পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বর্ত্তমান জগতেরও আদর্শ, যাঁহাদের কাব্য ও দর্শন আজও সভ্য জগতের সাহিত্য মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, যে সাম গান একদিন ভারতের বন-ভবনে উচ্চারিত ও গীত হইয়া ভারতে ধর্ম্মের যুগ আনয়ন করিয়াছিল, যে তটশালিনী গঙ্গা যমুনা আবহমানকাল হইতে কুলুকুলু নিনাদে বহিয়া, বক্ষে প্রাচীন ইতিহাস ধারণ করিয়া আজও হিন্দুস্থান পবিত্র করিয়া সাগর সঙ্গমে ধাইতেছে, সেই ভারতের, সেই পুণ্যদেশ আর্য্যাবর্ত্তের জ্ঞানরবি, দুর্ভাগ্য বংশধর, আমাদিগের দোষে অস্তমিত হইল! সত্যই কবি গাহিয়াছেনঃ—

"অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে"
"তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইল, ঔষধ সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদ পরিচয়ের ভার বেদিয়া জাতির উপর সমর্পিত হইল। অস্ত্র চালনার দুঃসাধ্য ভার নরসুন্দরের উপর ন্যস্ত হইল। যাহা হউক অতীতের আলোচনা ও অনুশোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আর প্রয়োজন নাই, এখন সময় আসিয়াছে।

গত কয় বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্ত গুলিই পাঠ্যপুস্তকশ্রেণীভুক্ত। দুই একখানি মাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইউরোপখণ্ডে ও আসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের এ প্রকার দুর্গতি হয় নাই। বাঙ্গালা সাময়িক

পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় পদার্থবিদ্যা বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল "বিবিধার্থ সংগ্রহে" ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে তজ্জন্য এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব। ইহাঁদের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "Lord Hardinge"এর আনুকূল্যে Encyclopœdia Bengalensis অথবা "বিদ্যাকল্পদ্রুম" আখ্যা দিয়া কয়েক খণ্ড গ্রন্থক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষ শাস্ত্রবিৎ ও নানা ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের রচনার ন্যায় স্থায়ী প্রচলিত সাহিত্যের (classics) মধ্যে গণ্য হইবে না তথাপি তাঁহারা বঙ্গ সাহিত্যের অভিনব পথপ্রদর্শক বলিয়া চিরকাল মান্য হইবেন। কিন্তু ইহাঁদের পূর্ব্বেও বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারাই আবার বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্ত্তক! আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, 'খৃষ্টানী বাঙ্গলা' বলিয়া তাঁহাদের কৃতকার্য্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার যে সম্মান প্রাপ্য তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ইয়েটস্ প্রথমে 'সার পদার্থ-বিদ্যা' বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পদার্থ বিদ্যা ভিন্ন মৎস্য, পতঙ্গ, পক্ষী ও অন্যান্য জীবের বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন "কিমিয়া বিদ্যাসার" নামক রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ 'সমাচার দর্পণ' নামে সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহারাই আবার 'দিগ্‌দর্শন' নামক নানা তত্ত্ববিষয়িনী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতেই বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়।

ইহার পর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে "বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি"(Society for translating European Sciences) নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। প্রফেসর উইলসন এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন ও উক্ত সমিতির চেষ্টায় 'বিজ্ঞান সেবধি' নামক গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Vernacular Literary Society নামে আর এক সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও যাহাতে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে তদ্বিষয়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা বেথুন ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১৫০৲ শত টাকা চাঁদা দিয়া ইহার আনুকূল্য করিতেন। এই সভার উদ্যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রকাশ করেন। মহামতি হড্‌সন প্র্যাট এই সমিতির স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই:—

"বাঙ্গলার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। * * ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠ লিপ্সার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে অল্পমূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানবশরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে।

নীতি প্রভৃতি উপদেশসূচক গ্রন্থ প্রচারও অতি প্রয়োজনীয়, ইহাতে সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এই সকল প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্য প্রচার অতি আবশ্যক। এই সমিতিকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।"

বিজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী ফলবতী হয় নাই। ১৭ খানি পুস্তক প্রকাশের পর সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে গল্প ও আমোদজনক পুস্তকই এদেশের পাঠকসাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা এই তিন স্থানে ৩টি নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা জ্যামিতি, ভুগোল, প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুল সমূহের পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যাঘটিত অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচারেও যে বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন আলোচনার বিষয় এই যে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে কি না। বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল পুস্তকের কিছু কাট্‌তি আছে তাহা Text Book Committeeর নির্ব্বাচিত তালিকাভুক্ত, সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সোপানস্বরূপ একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষীয় বালকদিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে তদ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৩টী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। এই জ্ঞান-স্পৃহার অভাবেই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয় সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-অধ্যাপন ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেননা ঘোঁড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। একজামিন পাশই যেখানকার ছাত্র জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্য-বিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান কিম্বা যে কোনও প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়মূলক কার্য্যের সাফল্য সম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত। বস্তুতঃ একজামিন্ পাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া স্বরস্বতীর নিকট চির-বিদায়গ্রহণ,—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ হয়, কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে, তাঁহারা একথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র-মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞানমন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পঞ্জিকা পরীক্ষোত্তীর্ণগণের নামে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এক বৎসর হয়ত উদ্ভিদ বিদ্যায় ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে এম, এ পাশ হইলেন। কিন্তু অগ্নিস্ফ লিঙ্গ এখানেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল; সে সমুদয় যুবকগণকে ২।১ বৎসর পর বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পিপাসাশূন্য জ্ঞানালোচনার এইত পরিণাম! জাপানের জ্ঞানতৃষ্ণা আর আমাদের যুবকগণের তৃষ্ণা দুই তুলনা করিলে

অবাক্ হইতে হয়। সম্প্রতি সঞ্জীবনীতে কোন বাঙ্গালী যুবক জাপানে পদার্পণ করিয়াই যাহা লিখিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল:—

"জাপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণা যেরূপ, অন্য কোন জাতির সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। কি ছোট কি বড়, কি ধনী, নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকলেই নূতন বিষয় জানিতে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে যে আভাস পাইয়াছিলাম তাহাতেই মনে করিয়াছিলাম এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

* * * *
* * * *

চাকরাণীগুলি পর্য্যন্ত বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে যতটা খোঁজ রাখে আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্র মহিলাই তাহা জানেন না।"

এখন একবার ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়া দেখা যাউক। ফরাসী বিপ্লবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই জ্ঞানপিপাসা কি প্রকার বলবতী হইয়াছিল তাহা বাক্‌ল্ (Buckle) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াসিয়ে, লালাণ্ড, বাঁফো প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া সরল ও সরস ভাষায় জন সাধারণের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন তখন ফরাসী সমাজে ধনীর রম্য হর্ম্ম্যে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে বিজ্ঞান সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইত তাহা শুনিবার জন্য দুই চারিজন বিশেষজ্ঞ মাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নূতন বারতা শুনিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ ইতর লোকের সংস্পর্শে আসিলে নিজকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন তাঁহারাই পদমর্য্যাদা ভুলিয়া লেকচার শুনিবার জন্য নগণ্য লোকের সহিত ঘেসাঘেসি করিয়া বসিবার একটু স্থান পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।

সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াছে যে বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিখা হয় না। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদী ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞান-পিপাসার যে কত প্রকার অনুসন্ধের বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাংলার দয়েল, বাংলার পাপিয়া, বাংলার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাংলার মশা, বাংলার সাপ, বাংলার মাছ, বাংলার কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? এদেশের সোদাল, বেল, বাবলা ও শ্যাওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে? বনে, জঙ্গলে ও উপবনে যে সকল তরু লতা ও গুল্ম জন্মে তাহার গ্রাম্য নাম ও পরিচয় পাইতে হইলে শতাধিক বর্ষের অধিক লিখিত Roxburgh এর Flora Indica এখন ও আমাদের উদ্ঘাটন করিতে হয়। ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে? এদেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি এ সবের ভিতরে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না?

রসায়ন পদার্থবিদ্যাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ বিদ্যা এবং ভূতত্ত্ববিদ্যার মৌলিক গবেষণা—যে বিরাট যন্ত্রাগারের অভাবে কতক দূর চলিতে পারে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ছুরি, কাঁচি, অনুবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০৲ টাকার অধিক মূল্য লাগে না? কিন্তু গোড়াতেই গলদ, জ্ঞানের পুণ্য পিপাসা কোথায়? এদেশের প্রকৃতি বিদ্যার্থী যুবক দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্রকৃতি বিদ্যার্থী যুবকের কথা শুনুন। বিদ্যাবিষয়ক উপকরণ আহরণের জন্য জ্ঞানপিপাসু ইউরোপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আহার নিদ্রা ভুলিয়া কার্য্য করিতে থাকেন, ভোগলালসা তখন তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র আসক্তি। আপনারা অনেকেই জানেন, উদ্ভিদ্-নিচয় আহরণের জন্য Sir Joseph Hooker ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কত বিপদ আলিঙ্গন করিয়া হিমা-

লয় পর্ব্বতের বহু উচ্চদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে Darjeeling Himalayan Railway হয় নাই। কাজেই তখন হিমাচলারোহণ এখনকার মত সুগম ছিল না। তুষারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার জন্য কত অর্থব্যয়ে কতবার অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশের কি অদম্য উৎসাহ! কি অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা! যখন ন্যানসেন (Nansen) ফিরিয়া আসিলেন সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল।

আমাদের পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয় বাঙ্গলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য,—ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ও ইহার ভাবি উন্নতি বিধানের উপায়নির্দ্দেশ। তিনটি দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিবে। কারণ ইতিহাসে সদৃশ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। যাহা জর্ম্মানীতে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা রুসিয়াদেশে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা জাপানেও সম্প্রতি সম্ভবপর হইয়াছে তাহা বাংলাদেশেও সম্ভবপর হইবে। এই তিন দেশই অল্প সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মণ সাহিত্যের কি দুর্গতি ছিল। সত্য বটে, মার্টিন লুথার মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহার আদর ও চর্চ্চা বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়ে লাটীন ও গ্রীকই অধীত হইত এবং রাজসভায় ফরাসী ভাষা চলিত ছিল। এমন কি Frederic The Great মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জাবোধ করিতেন। তিনি ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া বলটেয়ারের সমক্ষে আবৃত্তি করিতেন এবং তাঁহার নিকট একটু বাহবা পাইলে নিজকে ধন্য মনে করিতেন।

কিন্তু Frederic এর মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই Schiller, Goethe, Kant প্রভৃতি একদিকে, আবার উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Liebig, Wohler, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অপর দিকে জর্ম্মণ ভাষাকে মহাশক্তিশালিনী করিয়া তুলিলেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রুষিয়ার যে কি দুরবস্থা ছিল তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মহামতি Buckle ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় এই দেশকে সুসভ্য আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনার্য্য জাতির ভাষা আজ আদর্শ স্থানীয়। যে ভাষা রূযভল্লুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহসিত হইত, টলষ্টয়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে সাজাইয়া জগতের সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন। সেই ভাষাতেই রুষ রসায়নশাস্ত্রবিৎ Mendeleef স্বীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া ইউরোপীয় অপরাপর পণ্ডিতদিগকে রুষ ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

অধিক কি, এসিয়া খণ্ডেই ইহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান কি ছিল আর আজ কি হইয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যে সমুদয় স্বদেশ প্রেমিক বর্ত্তমান জাপান গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা উৎসাহী আশাপ্রদ যুবকবৃন্দকে প্রতীচ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত ইউরোপে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই. তৎতৎ দেশীয় পণ্ডিতদিগকে জাপানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আনয়ন করেন। বলা বাহুল্য, যদিও উক্ত পণ্ডিতগণ স্বীয় ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা প্রদান করিতেন, তথাপি শীঘ্রই সে সমুদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জাপান নিজের ভাষার আদর বুঝিল; বুঝিল বৈদেশিক ভাষাতে শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না, বুঝিল মাতৃভাষার সৌষ্ঠবসাধন অবশ্য কর্ত্তব্য।

ফল কথা এই যে আমরা যতদিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি এক প্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয় বিভব হারাইয়া নিঃস্ব ভাবে কালাতিপাত করেন অথচ পূর্ব্ব-পুরুষগণের ঐশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ। লেকি বলেন যে খৃষ্টাব্দ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপ খণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়; প্রায় সেই সময় হইতেই ভারতগগণ তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অধ্যাপক বেবর (Weber) যথার্থই বলিয়াছেন ভাস্করাচার্য্য ভারত গগণের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে আমরা নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায়ের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী মস্তিষ্কের প্রখরতার শ্লাঘা করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে যে সময়ে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি মন্থন ও আলোড়ন করিয়া নবম বর্ষীয়া বিধবা নির্জ্জলা উপবাস না করিলে তাহার পিতৃ ও মাতৃ কুলের উর্দ্ধতন ও অধস্তন কয় পুরুষ নিরয়গামী হইবেন ইত্যাকার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা টিপ্পনি রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্ব্বিদবৃন্দ প্রাতে দুই দণ্ড দশ পল গতে নৈঋত কোণে বায়স কা কা রব করিলে সেদিন কি প্রকার যাইবে ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় পূর্ব্বক কাকচরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে সময়ে এদেশের অধ্যাপকবৃন্দ "তাল পড়িয়া ঢিপ করে কি ঢিপ করিয়া পড়ে" ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শান্তিভঙ্গের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইউরোপখণ্ডে গ্যালিলিও, কেপ্লার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বীগণ উদীয়মান হইয়া প্রকৃতির নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক জ্ঞানজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন। তাই বলি, আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, বিধাতার কৃপায় হাওয়া ফিরিয়াছে; মরা গাঙে সত্য সত্যই বাণ ডাকিয়াছে; আজ বাঙ্গালি জাতি ও সমগ্র ভারত নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত। যে দিন রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্মিলনই ভবিষ্য ভারতের সমৃদ্ধিসোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন সেই দিনই বুঝি বিধাতা ভারতের প্রতি পুনরায় শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল জাতি পুরাতন আচার, ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই গোঁড়া, যাঁহারা প্রাচীন শিক্ষার ও প্রাচীন প্রথার নামে আত্মহারা হন, যাঁহারা বর্ত্তমান জগতের জীবন্তভাব জাতীয় জীবনে সংবেশিত করা হঠকারিতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান কালের ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায়; এমন কি এই সমস্ত জাতি নূতনের প্রবল সংঘর্ষণে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই যে বর্ত্তমান ইয়োরোপের শিক্ষা অত্যল্পকাল হইল আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু আমরা ইহা যেন না ভুলি যে বর্ত্তমান অবস্থার ইয়োরোপ আমাদিগকে যোজনাধিক পশ্চাতে ফেলিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পূর্ণোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আমার স্বতঃই মনে হয় আমাদের এই অধোগতির কারণ পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও অনেক সময়ে অহেতুক আসক্তি ও অপরাপর জাতির গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও অগ্রাহ্যের ভাব। এস্থানে অবশ্য স্বীকার্য্য যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার পদ্ধতি ও শিক্ষা অনেক সময়ে বর্ত্তমান সভ্যজাতি গণের আচার পদ্ধতি হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল এবং সে সমুদয়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া মূঢ়তার লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে অনেক বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে—যেমন বাহ্যিক জগতে তেমনই মানসিক রাজ্যে। এ স্থানে প্রশ্নটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমি আশঙ্কিত হইতেছি পাছে কাহারও মনে অপ্রীতি সঞ্চার করিয়া ফেলি, কিন্তু যদি স্বাধীন চিন্তা মানব মাত্রেরই পৈত্রিক সম্পত্তি হয় তাহা হইলে আমাকে বলিতেই হইবে যে পরকীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞান বিষয়ে বর্ত্তমান ইয়োরোপ ও আমেরিকা আমাদের অনুকরণীয় হইত। এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণের উপরেই আমার মতে ভাবী ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যে জাপান ত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল, জগতে যাহার অস্তিত্ব (ঐতিহাসিক হিসাবে) সন্দেহের বিষয় ছিল সেই জাপান পাশ্চত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজন করিয়া আজ কি এক অভিনব ক্ষমতশালী জাতি হইয়া আসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে বিরাজ করিতেছে।

এখন জ্ঞানজগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম পার্থিব জগতেও ততোধিক। নূতনের দ্বারা

পুরাতনের সংস্কার করিতেই হইবে,নচেৎ ভয় হয় ভারতভাগ্যরবি প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অস্তমিত হইবে।

এখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব। জাপানিরা জর্ম্মনি ও ও রুষিয়ার ন্যায় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাতৃ ভাষায় প্রচার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ মৌলিক গবেষণা সমূহ ইংরাজি ও জর্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত করেন, কিন্তু জন সাধারণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানের নানাবিধ মূলতত্ত্ব প্রচার হইতে পারে তজ্জন্য মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রায় একই; সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে একই পরিভাষা হইলে যে কতদূর সুবিধা হয় তাহা নির্ণয় করা যায় না। জাপানিরা এই সুবিধা টুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন; আমাদেরও তাহাই অবলম্বনীয়, কেননা, উক্ত জাতির অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান।

ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃজন করা সাহিত্য সম্মিলনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য পরিষৎ এ বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ তজ্জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় সাময়িক পত্রিকায় যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন তাহাতেও এ বিষয়ে সহায়তা হইতেছে। নাগরীপ্রচারিণী সভা ভূগোল, খগোল, অর্থনীতি, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতি ঘটিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন করিয়াছেন। পরলোকগত জগন্নাথস্বামী তেলেগু ভাষায় রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন ও তাহাতে সংস্কৃত মূলক অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি Vernacular Text Book Committee বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংকলন করিয়াছেন এবং আশা করা যায় সাহিত্য সম্মিলনও এই অধিবেশনে একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি (committee of experts) নিয়োজিত করিয়া কি ভাবে পরিভাষা গৃহীত হইবে তাহার নিষ্পত্তির উপায় বিধান করিবেন।

বর্ত্তমান সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠাতাগণ বাংলা সাহিত্যকে সাধারণ সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়া শেষোক্ত বিভাগের কার্য্যক্ষেত্র British Association for the Advancement of Learning and Scienceএর আদর্শে যে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তাহা সদ্যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। মানবতত্ত্ব (Anthropology), পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, লোকতত্ত্ব (Ethnology), ভূগোল,পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা হইয়া যাহাতে তৎ তৎ বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আশা করি এই অধিবেশনে রাজসাহী বিভাগের লোকতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটি সারবান প্রবন্ধ পঠিত হইয়া ইহার সূচনা হইবে। অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে রাজসাহীর দুইজন কৃতবিদ্য সন্তান পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে নূতন পথ দেখাইয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। বাঙ্গালী যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে সক্ষম, সিরাজদ্দৌলা প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। আমার বন্ধু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু দুর্লভ পারসী পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই সকল মন্থন করিয়া রত্নাবলী আহরণ করিতেছেন। তিনি যে সমুদয় বিবরণ লিখিতেছেন তাহা পাঠ করিতে করিতে আমি অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃতি লাভ করিয়াছি এবং নিজকে কল্পনায় অনেক সময়ে ঔরঙ্গজেব বাদসাহের সমকালীন বলিয়া মনে করিয়াছি। তিনি দীর্ঘজীবি হইয়া এইরূপ মহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন এবং মোগলরাজ্যের বিশাল ইতিহাস লিখিয়া মাতৃভাষার সৌষ্ঠব সাধন করেন ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। আমাদিগের সম্মিলনের একজন উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় "মানব সমাজের ক্রমবিকাশ" প্রভৃতি শীর্ষক যে সকল প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন

তদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী অভাব মোচন হইবার সূচনা হইয়াছে। আজ আমরা নূতন জাতীয় জীবনের প্রাসাদের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে দেশে 'জাতীয় জীবন' ইত্যাদি আশা ও উৎসাহের কথা অলীক ও কবিকল্পনা-প্রসূত উন্মাদোক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত, যে দেশ স্বদেশপ্রেম বলিয়া কথা যহ শতাব্দী যাবত বিস্মৃত ছিল, যে দেশ মাতৃভাষা ভুলিয়া এতদিন বৈদেশিক ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বার বিবেচনা করিত, সেই দেশে আজ কি এক অপূর্ব্ব ভাব আসিয়া মৃত প্রাণকে কি এক অমৃত বারি সিঞ্চন করিয়া সঞ্জীবিত করিল! যে যুবকগণের কাঠহাসি দর্শনে পূর্ব্বে আশঙ্কার উদ্রেক হইত, যে দেশের প্রৌঢ়গণের মিতব্যয়িতা আত্মপ্রবঞ্চনা-মূলক বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, আজ কি এক অপূর্ব্ব ঈশ্বরপ্রেরিতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই যুবক সরসবদনে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি লোকসেবায়, জাতীয় শিক্ষায় অকাতরে বহু কষ্ট সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিল। ইহা কি আশার কথা নহে—ইহা ভাবিলেও কি প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয় না? দুই বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী যুবক পিতামাতার স্নেহক্রোড় ত্যাগ করিয়া অথবা নবপরিণীতা ভার্য্যাকে ছাড়িয়া বৈদেশিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য দূরদেশে যাইতে কুণ্ঠিত হইত, আজ জানি না কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, ভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে সেই যুবক বিদেশযাত্রা করিল। তাই বলিতেছিলাম আমরা জাতীয় জীবনের সোপানে আজ দণ্ডায়মান—আজ নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনার দিন।

বাঙ্গলার এমন দীনহীন কাঙ্গাল, হতভাগ্য যে আছ ভাই যে আজ বিধাতার মঙ্গলময় আহ্বানে আহূত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার ভারতির জন্য নৈবেদ্যোপচার লইয়া সমুপস্থিত না হইবে? ধনি! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বলি! তুমি তোমার বল লইয়া, বিদ্বান্! তুমি তোমার অর্জ্জিত বিদ্যা লইয়া, সকলে—সমবেত হও।

আজ আমরা যুগসন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারত আজ আমাদিগের দিকে সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন। স্বর্গ হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছেন। আজ আমরা জাতীয় জীবনের এমন একস্তরে দণ্ডায়মান যেখানে আমাদের সম্মুখে দুইটী মাত্র পথ, একটী অনন্ত অমরত্বের, অপরটী অনন্ত অকীর্ত্তির, মধ্যপথে আর কিছু নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আয়াসে মজিয়া ভবিষ্যৎ প্রেরিত এই মহাভাব উপেক্ষা করি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক উপাধিতে কলঙ্কিত করিবে, ভারতাকাশের উদীয়মান রবি উষার উন্মেষেই হায়, আবার অস্তমিত হইবে।

কিন্তু আজ আশার দিন, আজ উদ্দীপনার যুগ। বাঙ্গালা এ আহ্বান উপেক্ষা করে নাই—সতীশচন্দ্র ও রাধাকুমুদের ন্যায় বিদ্বান ও বিভোৎসাহী যুবক, সুবোধচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রকিশোর, সূর্য্যকান্ত, মনীন্দ্রচন্দ্র, তারকনাথ, যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি ধনাঢ্যগণ যে দেশের জাতীয় শিক্ষায় জন্য বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত, সে দেশ নিশ্চয়ই উঠিবে—সে দেশের ভাষা ও বিজ্ঞান কখনই উপেক্ষিত থাকিবে না। যাহাতে অধীতবিদ্য বিজ্ঞানবিদ্ ছাত্রগণ বৃত্তি লাভ করিয়া অন্নচিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ও অনন্যমনে বিজ্ঞান চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গলা দেশের সেবায় মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে এমন উপায় নির্দ্ধারণ করুন। সৌভাগ্যক্রমে এখন কৃতবিদ্য ও নিষ্ঠাবান ছাত্রের অভাব নাই। তাহারা বিলাসবিভ্রমের প্রত্যাশী নহে,যাহাতে তাহাদের সাংসারিক অভাব মোচন হয় ও তাঁহারা একান্ত মনে বিজ্ঞান সেবায় ব্রতী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন জ্ঞান জাতীয় জীবনের উৎস। এই উৎসের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য আবার ভারতে নিষ্কাম জ্ঞানচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হউক।

সেবক।

এসগো আজ, হে হৃদি রাজ,
দেশের প্রাণ-মন্দিরে,
সিংহাসন র'য়েছে শুধু
পড়িয়া,
হৃদয় রক্তে শতেক ভক্তে
তোমারে সবে বন্দিরে,
নীরব ভাষে, মানস মূর্ত্তি,
গড়িয়া!

বিশাল দেশে, দীনের বেশে,
যে শঙ্খ গেলে বাজায়ে,
ধ্বনিছে সদা, ধ্বনিবে সদা
শ্রবণে;
মুক্তি-আশী স্বদেশবাসী
রাজার বেশে সাজায়ে,
পুজিছে তোমা বঙ্গ-ভবনে
ভবনে।

সত্য যবে, সরল হবে,
জগৎ লবে বরিয়া,
বিজয় রবে, আসিবে সবে
ছুটিয়া;—
কাঁটার পথে যে পারে যেতে
সত্য জ্যোতি ধরিয়া,
গরিমা তা'র কত না উঠে
ফুটিয়া!

খৃষ্ট ধীর, আরব বীর,
নিমাই বঙ্গ গগনে,
পীড়ন শত পাষাণ মত
সহিয়া,
বিভুর গানে, পুণ্য তানে,
জাগাল সুপ্তি মগনে,
ভুবনে গেল অমৃত ধারা
বহিয়া।

তাইত মোরে, নিরাশা ডোরে
বাঁধিতে কভু চাহিনা,
পীড়নে তব মঙ্গল নব
হেরিয়া,
শিশির সাঁঝে, আঁধার মাঝে
উদাস গান গাহি না,—
আলোক চির সত্যে র'য়েছে
ঘেরিয়া!

(তাই) সকলে আজ, হে হৃদি রাজ,
চরণে তব দাঁড়ায়ে,
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা ল'য়েছে
হাসিয়া;
স্বার্থ বিবাদ, ভেদ বিসম্বাদ
গৃহকোণ হ'তে তাড়ায়ে,
নেমেছে কর্ম্মে, জড়তা গিয়াছে
ভাসিয়া!

যে ছিল ভুলে, নয়ন তুলে
মায়ের পানে চাহিছে,
পরাণে তা'র বেদনা আর
ধরে না!
নূতন প্রাণে, নূতন তানে
মায়ের গান গাহিছে,
কহিছে তেজে, সত্য কভু
মরে না।

জননী আজ বীরের সাজ
অঙ্গে তব পরায়ে,
আশীষ নব শিরেতে তব
রাখিয়া,
নিন্দা বাণী, বিষাদ গ্লানি
আপন হাতে সরায়ে,
বিজয় টীকা ললাটে দিলা
আঁকিয়া!

শ্রীসন্তোষকুমার বসু।

হিন্দুশাস্ত্রে মিসর দেশ, নীলনদী ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য প্রদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

থিওফ্রেষ্টাস (Theophrastus) এর লেখায় পটামস্ (Potamos) শব্দ নদী বাচক নহে উহা কেবল নদী বিশেষের প্রাধান্য দ্যোতক। যাহা হউক মর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, সংস্কৃত পদ্ম শব্দ হইতেই যে Potamos শব্দ আসিয়াছে তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পদ্ম শব্দ কোথাও পদ্‌ম্ কোথাও বা পতম্ রূপে উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। বিখ্যাত উদ্ভিদ্ শাস্ত্রবিৎ লিনিয়াস্ (Linnoeus) পদ্ম পুষ্পকে নিম্ফিয়া (Nymphoea) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। নীল নদীতে যে লোটস্ (Lotos) পুষ্প জন্মে তাহাও এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। ফরাসি দেশবাসী সুবিজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মণ্টফকন্ (Montfaucon) মিসর দেশীয় একটি সমারক-চিত্র (emblem) অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা হইতে পদ্মপুষ্পের সহিত মিসর দেশের বিশেষ সম্পর্ক প্রমাণিত হইতেছে। সে চিত্র এই—একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের বীজকোষের উপর একটি ভেক উপবিষ্ট। কালী নদীতে এবং তাহ'র চতুষ্পার্শ্বস্থ জলাভূমিতে এই পুষ্প প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা পরে দেখাইব যে এই পুষ্প দেবী কালীরও বড়ই প্রিয় এবং পদ্মাবতীরূপে এই পুষ্পই তাঁহার প্রিয় আবাসস্থল। যে সমুদয় নদীতে প্রচুর পরিমাণে নিম্ফিয়া পুষ্প আছে তাহাদিগের অধিকাংশের নামই পদ্মবতী বা পদ্মমতী। এই সমুদয় কারণে মনে হয় নীলনদীর Potamos নামটি পদ্ম শব্দ হইতেই গৃহীত হইয়া থাকিবে। আর Potamos শব্দটি যে বড় বড় নদীর আখ্যারূপে ব্যবহৃত হয়, তাহারও মূলে বোধ হয় এই পদ্ম শব্দটীই বর্ত্তমান। মোটের উপর Potamos শব্দের যে সমুদয় ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে সুবিস্তীর্ণ শর্ম্ম দেশে পুংবাচক সোম নামক পর্ব্বতের নিকটে নীলা নদীর উৎপত্তি স্থান আর এই নদী দেবসরোবর হইতে বহির্গত হইয়াছে। এই দেব সরোবর চন্দ্রী নামক দেশে অবস্থিত। চন্দ্রী শব্দ এই স্থলে স্ত্রীবোধক। সরোবর শব্দের অর্থ বৃহৎ জলাশয়। দেব, অমর বা সুর শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ হইয়াই দেব সরোবর, অমর সরোবর এবং সুর সরোবর শব্দ গঠিত হইয়াছে। দেব সরোবর শব্দ চলিত ভাষায় দেও সরোয়াররূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। দেব সরোবর দুইটি পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বদিগস্থ পর্ব্বতেরনাম অজাগর আর পশ্চিমদিগস্থ পর্ব্বতের নাম শীতান্ত। অজাগর শব্দের অর্থ অজাগরণ-শীল আর শীতান্ত শব্দের অর্থ শীতের অবসান। শীতান্ত নাম হইতে উক্ত নামধেয় পর্ব্বত সম্বন্ধে বুঝা যায় যে উক্ত পর্ব্বতের শিখরদেশে বরফ থাকিতে পারে কিন্তু তাহার পরিমাণ অতি অল্প।

শর্ম্ম স্থান, পর্ব্বতময় অজাগর স্থান নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে ইহার দৈর্ঘ্য ৩০০ শত যোজন এবং প্রস্থ ১০০ শত যোজন। তাই মাইল হিসাবে উক্ত দেশ ১৪৭৬৩ মাইল দীর্ঘ এবং ৪৯২১ মাইল প্রশস্ত। আবিসিনিয়া দেশে যে সমুদয় পর্ব্বত আছে তৎসমুদায় কোনও কালে নিশাচরগণের বাসস্থান ছিল। উহারা একদল নিকৃষ্ট শ্রেণীর যক্ষ ছিল। তাহারা সারাদিন ঘুমাইত আর সারা রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া আমোদ প্রমোদে কাটাইত। ব্রুস্ (Bruce) সাহেব বলেন যে কোয়াজ (Kowas) নামক এক জাতীয় জাগরণশীল কুকুর আবিসিনিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে দেবতাজ্ঞানে উপাসিত হইত। এই জাগরণ শীল জাতির অধ্যুষিত পর্ব্বত সমূহ হইতে স্পষ্টভাবে পার্থক্য

নির্দ্দেশ করিবার জন্যই অজাগর পর্ব্বত উক্ত আখ্যা পাইয়াছিল।

সোম পর্ব্বত ভৌগোলিকগণের নিকট অপরিচিত নহে। তবে এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে মিসর দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ গণিত শাস্ত্রবিৎ ও ভৌগোলিক টলেমী (Ptolemy) এই স্থানকে যতদূর দক্ষিণদিকে অবহিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে, আবার পক্ষান্তরে ফরাসি দেশীয় ভৌগোলিক আন্‌ভাইল (Anville) যতটা উত্তরে অবস্থিত বলিয়া বলিয়াছেন তাহাও ঠিক নহে। আমরা পরে একথা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব। পর্টুগাল দেশীয় ধর্ম্মযাজক ফাদার লবো (Father Lobo) বলেন তথাকার স্থানীয় অধিবাসিগণ এই পর্ব্বতকে টরোয়া (Toroa) বলে। অজাগর পর্ব্বত আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলের সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত এবং ইহার বর্ত্তমান নাম লুপাতা (Lupata) অর্থাৎ পৃথিবীর মেরুদণ্ড। শীতান্ত পর্ব্বত জ্যাম্বার (Zamber) অথবা জেয়ার (Zaire) হ্রদের পশ্চিমে অবস্থিত। খুব সম্ভবতঃ জ্যাম্বার শব্দ অমর, শব্দের এবং জেয়ার শব্দ সুর শব্দের অপভ্রংশ। দেব সরোবর সম্বন্ধে একটি ধারণা এই যে উহা একটি প্রকাণ্ড জলাশয় আর এই সরোবরই কোথাও ভূপৃষ্ঠস্থ আর কোথাও ভূগর্ব্ভস্থ ধারায় এই দেশের সমুদয় নদীর জল যোগাইতেছে। প্রাচীন হিন্দুগণ পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলীর (Mythology) অববোধ বা গঠনাদির সুবিধার নিমিত্ত ভূগর্ব্ভের মধ্য দিয়া হ্রদের সহিত নদীর সংযোগ আছে এইরূপ বিশ্বাস করিতে ভাল বাসিতেন। গ্রীকগণেরও তদনুরূপ ধারণা ছিল। ক্রুস সাহেব স্থানীয় অধিবাসিগণের প্রমুখাৎ শুনিয়া লিখিয়াছেন শ্বেত নদীর উদ্ভবস্থলে একটী অন্তঃসলিল জলাশয় আছে। শ্বেত ও কাল শব্দ বিপরীত অর্থবোধক বটে। তথাপি সম্ভবতঃ ক্রুস্ সাহেব যে শ্বেতনদীর কথা বলেন উহাই পুরাণোক্ত কালী নদী: নিম্নলিখিত কারণে এইরূপ অনুমাণ করা যাইতে পারে। উক্ত নদীর জলে বহু কুমুদ আছে। কুমুদ হইতে উক্ত নদীর নাম শ্বেত হইয়া থাকিবে। তন্নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত সমূহের নাম কুমুদাদ্রি। উক্ত নাম যে কুমুদ শব্দ হইতে উদ্ধৃত তাহাতে আর সন্দেহের কারণ নাই। আবার কুমুদ এক প্রকার জলজপুষ্প, উহা চন্দ্রের অতি প্রিয়। আবার এই পুষ্প দৃষ্টে অনুমান হয় ইহা মেনিয়ান্থিস্ (Menianthis) হাইড্রোফিলাম্ (Hydrophyllum) অথবা নিম্ফিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একপ্রকার শ্বেতপুষ্প। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি পদ্মও নিম্ফিয়া শ্রেণীর অন্তর্গত এবং নীলনদীতে উহা প্রচুর পরিমাণে আছে। সুতরাং এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নয়। পূর্ব্বকথিত শ্বেত ও কালী বা নীল নদী এই উভয়ই এক। অমর সরোবর গ্রীক ও রোমানগণের অপরিজ্ঞাত ছিল তাহা নহে। তবে ইহাঁরা ইহার অবস্থিতি স্থল ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই। আর আমরাও উক্ত হ্রদের ঠিক অবস্থিতিস্থল তাঁহাদিগের হইতে বড় ভাল করিয়া জানিতে পারিযাছি তাহা নহে। জুবা (Juba) রোমক সম্রাট অগাষ্টাসের (Augustns) সমসাময়িক। তিনি মরিটানিয়া (Maritania এবং নিউমিডিয়া (Nuimidia) দেশের রাজা ছিলেন এবং গ্রীক ভাষায় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতগুলি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখায় অমর সরোবর, নিলাইডিস্ (Nilides) নামে অভিহত হইয়াছে। Peutingerian টেবলে ইহার নাম নিলিডাকাস (Niliducus) এবং নাসাপ্টিস (Nusuptis) টলেমি ইহাকে Oriental marshes অর্থাৎ প্রাচ্য জলাভূমি আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে এই হ্রদ রাপ্টা (Rapta) অর্থাৎ বর্ত্তমান কুইলোয়া (quiloa) হইতে বড় বেশী দূরে নয়। উক্ত বিখ্যাত ভৌগোলিক উল্লেখ করিয়াছেন, ডাইয়োজিনিস (Diogenes) নামক এক ব্যক্তি বাণিজ্যের জন্য নৌপথে ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় আজ কাল যাহার নাম গার্ডাফান (Guardafan) অন্তরীপ তাহার নিকটে আসিলে উত্তর সন্নিহিত উত্তর পূর্ব্বদিক (N. N, E.) হইতে এক প্রবল ঝড় আসিয়া তাহাকে রাপ্টার নিকটে লইয়া গিয়াছিল। তথাকার অধিবাসীগণের নিকটে ডাইয়োজিনিস শুনিতে পাইয়াছিলেন যে নীল নদী যে সমুদয় হ্রদ বা জলাভূমি হইতে বাহির হইয়াছে তৎসমুদয় রাপ্টা হইতে বেশী দূরে নয়।

হিন্দুগণের ন্যায় মিসরদেশবাসিগণও মনে করিতেন যে ভূগর্ভস্থ কোনও জলাশয় নীলনদী এবং আফ্রিকার অন্যান্য নদীর জল যোগাইতেছে। কারণ মিনার্ভা মন্দিরের অধ্যক্ষ হিরোডোটাস্‌কে বলিয়াছিলেন যে এই পুণ্যতোয়া নদী ক্রফি (Crophi) ও মফি (Mophi) পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী গভীর হ্রদ সমূহ হইতে বহির্গত হইয়াছে; নদীর এক অংশ উত্তর দিকে এবং অপরাংশ ইথিওপিয়ার মধ্য দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। তবে কথা এই হিরোডোটাস্ মন্দিরাধ্যক্ষের কথা অনুসারে উক্ত হ্রদ সমুদয় দেখিবার উদ্দেশ্যে সাইয়েন্ (Syene) প্রদেশের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হন এবং তথায় কোনও হ্রদের চিহ্ন না পাইয়া মন্দিরাধ্যক্ষের কথা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহাতেই কথাটী সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে না। উক্ত হ্রদবলী আজানিয়া (Azania) বা আজান্ (Azan) প্রদেশের নিকটবর্ত্তী। হয়তো মন্দিরাধ্যক্ষ ভুলক্রমে আজান্ বা আজানিয়া স্থলে সাইয়েন্ বলিয়াছিলেন। অথবা হয়তো মন্দিরাধ্যক্ষ ঠিকই বলিয়া থাকিবেন, হিরোডোটাস্ই ভুলক্রমে সাইয়েন্ বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন—এই শেষোক্ত অনুমানের কারণ এই যে মিসরদেশে সাইয়েন্ শব্দ আজোয়ান (Uswan) অথবা য়্যাজোয়ান (Aswan) বলিয়া উচ্চারিত হইত।

ভূ-গর্ভস্থ একটা সাধারণ জলাশয়ের ধারণা হইতেই পুরাকালের লোকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন নীলনদী যে সমুদয় হ্রদ হইতে নির্গত হইয়াছে নাইগার (Niger) নদী ও সেই সমুদয় হ্রদ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এইরূপ অনুমানের কোনও দৃঢ়ভিত্তি নাই। জুবা বলিয়াছেন ঐ জলাশয় ২০ দিনের পথ অর্থাৎ ৩০০ মাইল পর্য্যন্ত ভূগর্ভের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। ডাইয়োজিনিসের মত তিনিও বলেন ঐ হ্রদ সমুদ্র হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নয়। তিনি আবার দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে নীলনদী উক্ত অন্তঃসলিল জলাশয় হইতে বহির্গত হইয়াই অমনি লোকচক্ষুর গোচরীভূতা হইয়া ভূপৃষ্ঠ দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায় নাই, আরও বহুদিনের পথ পর্য্যন্ত অন্তঃসলিলা ভাবেই প্রবাহিতা হইয়াছে পরে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিতা হইয়া একটী হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। এই হ্রদ পূর্ব্ব কথিত হ্রদ হইতেও বড় এবং ইহা ম্যাসেনসিলি (Massensyli) গণের দেশে অবস্থিত। এই ম্যাসেনসিলিগণই সম্ভবতঃ পুরাণোক্ত মহাহাস্যশীল জাতি। ক্রুস্ সাহেবের মতে আরবগণের কথিত নারুলাবাদ (Nahrulabad) অথবা শ্বেতনদী যে জলাভূমি হইতে বহির্গত হইয়াছে, এই হ্রদ তাহাই বটে। ইহা ৩ কি ৪ উত্তর অক্ষ রেখায় (N. Latitude) অবস্থিত। মানচিত্রে ইহার নাম (Cowir) এবং নিউবিয়া দেশের ভৌগোলিকগণও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথমোক্ত হ্রদের নুসাপ্টিস্ (Nusaptis) নামের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সম্ভবতঃ উক্ত নাম নিশাপতি- শব্দ হইতে আসিয়াছে। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ দেশটির নাম, তৎপ্রদেশস্থ পর্ব্বত সমূহের নাম এবং অধিকাংশ নদীগণের নাম ইহাদের প্রত্যেকের সহিত চন্দ্রের সম্পর্ক আছে। ঐ স্থানের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহারা নিম্নলিখিত নামে পরিচিত—যথা রজনী, কুহূ, সিনিবালী, অনুমতি, ও রাকা। কুহূ শব্দের অর্থ নষ্টচন্দ্রা অমাবস্যা। সিনিবালী অর্থ দৃষ্টচন্দ্রা অমাবস্যা, অনুমতি শব্দের অর্থ চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা আর রাকা শব্দের অর্থ পূর্ণচন্দ্র। টলেমী ঐ দেশের অধিবাসিগণকে মাষ্টিটি (Mastitae) বলেন, আর পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে জুবা উহাদিগকে ম্যাসে-সিলি (Massaesyli) নাম দিয়াছেন এবং মানচিত্রে উক্ত দেশের নাম মাসি (Massi) অথবা মাসাগুইয়স্ (Massagucles)। এই কয়েকটী নামের প্রত্যেকটির

প্রধান অংশ মাসা (Massa)। মরিটানিয়া দেশেও উক্ত নামধেয় একটী জাতি ছিল। এতদৃষ্টে প্লিনি বলেন যে জুবার মতে উহা মরিটানিয়া দেশেই অবস্থিত। মরিটানিয়া জুবার স্বদেশ। আপনার দেশের এক নিকটবর্ত্তী স্থান সম্বন্ধে তিনি একটা গুরুতর ভুল করিবেন, ইহা সম্ভব হয় না। কাজেই প্লিনির এই অনুমান আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

শেষোক্ত হ্রদ সম্ভবতঃ সংস্কৃত উপকথার বর্ণিত পদ্মবন। এই নাম হইতেই বোঝা যায় এই হ্রদে প্রচুর পরিমাণে পদ্ম জন্মিত। এই পদ্ম সম্ভবতঃ সাধারণ পদ্ম নহে উহা কোটি পত্র পদ্ম অর্থাৎ এক কোটি দল বিশিষ্ট পদ্ম। ক্রস সাহেব বলেন—এই হ্রদে এন্‌ফিট (Enfete) নামক পুষ্প প্রচুর পরিমাণে আছে। সম্ভবতঃ ক্রস সাহেবের কথিত Enfete কোটি পত্র পদ্ম। তবে কথা এই যে নিম্ফিয়া ও এন্‌ফিট উদ্ভিদ শাস্ত্রানুসারে এক শ্রেণীর পুষ্প নহে। সম্ভবতঃ উহার কারণ এই যে হিন্দুগণের উদ্ভিদ শাস্ত্রে তেমন দক্ষতা ছিল না তাই তাঁহারা কতকটা বাহিক সাদৃশ্য দেখিয়াই নিম্ফিয়া ও এন্‌ফিট এই বিভিন্ন শ্রেণীর পুষ্পগণকে এক পদ্ম নামেই অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতন গ্রীকগণ সাধারণ জলজ পদ্মকে লোটস্ বলেন আবার লোটো ফাগির (Lotophagi) ফলকেও লোটস্‌ই বলেন অথচ এই উভয়ের মধ্যে বিজ্ঞানানুমোদিত তেমন কোনও সাদৃশ্য বিদ্যমান নাই। নিম্ফিয়া জাতীয় লোটসে (Nymphaea Lotos) সাধারণতঃ ১৫টি দল থাকে তন্মধ্যে কোনও কোনও প্রকারের পুষ্পে মাত্র ৮টি দল থাকে। নিম্ফিয়া নামধেয় জাতীয় পুষ্পের বহু দল থাকাই একটা বিশেষত্ব বটে এবং অভিধানে সহস্র পত্র এই সংস্কৃত বিশেষণটি সাধারণ পদ্মের প্রতি প্রযুক্ত হয় বটে কিন্তু কোটি পত্র এই বিশেষণটি সাধারণ পদ্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। মিসর দেশীয় কোন কোনও স্মৃতিস্তম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় দেবী ঈশিস Isis এক প্রকার পত্রাবলীর মধ্যে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। উহাদিগের আকৃতি দেখিয়া অনুমান হয় উহারা কদলী বা মজা (Mauza) পত্র। লিনিয়াস এই পত্রকেই মাসা (Musa) বলিয়াছেন। কিন্তু ক্রস্ সাহেব উহার ভুল ধরিয়া দিয়া দেখাইয়াছেন যে উক্ত পত্র কদলী বা মজা নহে উহা এন্‌ফিট (Enfete)। তবেই দেখা যায় যে মিসর দেশীয় দেবী ঈশিসের এন্‌ফিট বা কোটি পত্র পদ্মের সহিত একটা সম্পর্ক থাকিতে পারে। ভারতবর্ষীয়া যক্ষিণী নামিকা এক দেবী ও মজা (Mauza) পত্রে অবস্থিতা দেখা যায় বটে। কিন্তু ইনি অবান্তর অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীর অবতার সম্ভূতা কাজেই মহিমা বা পদ গৌরবে পদ্মা দেবীর সমকক্ষা নহেন। পুরাণে স্পষ্টই উল্লেখ আছে কালী নদীর তীরে কোটি পত্র পদ্মে পদ্মাদেবী বাস করেন। এই কোটি পত্র পদ্ম ভারতবর্ষে ছিল না। তাই সংস্কৃত গ্রন্থে উহার বর্ণনা ভাল নাই। প্লিনি নীল নদীয় বর্ণনা প্রসঙ্গে এক বাক্যাংশ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা এন্‌ফিট্ (Enfete) পুষ্পের বেলা বেশ খাটে। সে বাক্যাংশ এই folii densa congerie stipatis (ঘন সন্নিবিষ্ট বহু দল বিশিষ্ট পত্র) ক্রস্ সাহেব এই পুষ্পের যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন উক্ত বর্ণনার সঙ্গে প্লিনির লিখিত বর্ণনার কতকটা অসামঞ্জস্য আছে বটে। তবে প্লিনির উদ্ভিদ শাস্ত্রে তেমন পাণ্ডিত্য ছিল না কাজেই তিনিই ভুল করিয়া উভয়বিধ পদ্মের বর্ণনা মিশাইয়া ফেলিয়াছেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। ক্রমশঃ

শ্রীকুঞ্জবিহারী হার।

"নারীশক্তি" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য ও উত্তর।

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

সম্প্রতি সুপ্রভাত পত্রিকায় আপনি যে প্রবন্ধটি লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। কেবল একটি বিষয়ে আমার মন সায় দিতে পারিতেছে না—সতীদাহ বিষয়ে। সতীদাহ আমাদের দেশের মৌলিক দয়ার্দ্র প্রকৃতির সঙ্গে কিছুতেই মিল খায় না। আমাদের দেশের মূল প্রকৃতির উপরে অনেকগুলা সাময়িক আবর্জ্জনা জড়ো হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; সতীদাহ তাহারই মধ্যেকার একটা বীভৎস শ্রেণীর প্রথা এইরূপ আমার ধারণা। বিধবা স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া লোকহিতে রতা হইলে সকল পক্ষেই কেমন ভাল হয়—তাহা না করিয়া সহমরণে প্রবৃত্ত হওয়া আমার মতে কোনো প্রকারেই—কোনো হিসাবেই—ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। আফ্রিকার অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে সহমরণের প্রথা এখনো পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। রাজার মৃত্যু হইলে জ্যান্ত রাণীদিগকে রাজার সঙ্গে একত্রে গোর দেওয়া হয়। আমাদের দেশে বহু পূর্ব্বে—আদিম বৈদিক যুগে ঐরূপ অসভ্য প্রথার স্বল্পাবশিষ্ট গুঁড়া একটু আধটু, যাহা ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সতীদাহ আমাদের দেশের নিতান্তই একটা আধুনিক শাস্ত্র—তাহা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননদিগের হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কের বিধানব্যবস্থা। আমাদের দেশে ভাল জিনিষের বিকৃতি যেমন মাত্রাতীত পরিমাণে ঘটিয়াছে এমন আর কোনো দেশেই নহে। সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং—Too much of a good thing is bad এ কথাটা আমাদের দেশের আধুনিক শাস্ত্রে আমল পায় না। তার সাক্ষী—কোথায় চৈতন্য মহাপ্রভুর নিষ্কাম প্রেমচর্চ্চা—কোথায় ন্যাড়া নেড়ীর কাণ্ড; কোথায় আদ্যাশক্তি এবং মূলা প্রকৃতির ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা—কোথায় ভৈরবীচক্রের বীভৎস কাণ্ড। আমাদের দেশের গোড়ার মহাজ্ঞানীদিগের শাস্ত্রের সঙ্গে পরপরবর্ত্তী সাময়িক ব্যতিক্রমের ভার চাপাইলে তাহাকে একপ্রকার বদ্ধ করা হয়। আপাততঃ যাহা আমার মনে হইল লিখিলাম—যদি বিনয়ের ত্রুটি হইয়া থাকে সত্যের অনুরোধে মার্জ্জনা করিবেন।

আপনার অনুরক্ত
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম।

সতীদাহ প্রথার কোন প্রকার প্রশংসা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। যদি আমার প্রবন্ধে ওরূপ বুঝিবার কোন কারণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তাহা আমার পক্ষে লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়। সতীদাহ প্রথাকে আমি বর্ব্বর ও নৃশংস প্রথা মনে করি। যিনি পতিগতপ্রাণা, তাঁহার পক্ষেও আমি স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাঁচিয়া থাকিয়া ভগবৎসেবা ও স্বামীর জীবনব্রত পালন শ্রেষ্ঠ পন্থা মনে করি। সহমরণ স্বেচ্ছাকৃত হইলেও আত্মহত্যাপাপদুষ্ট। সহমরণরূপ কুপ্রথার মধ্যদিয়াও হিন্দুনারীর যে একনিষ্ঠ প্রেম, আত্মোৎসর্গ ও বীরত্ব প্রকাশ পাইত, তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার অভিপ্রায় ছিল। বশম্বদ

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

মাঘোৎসবের উপদেশ।

পবিত্র মাঘোৎসব, ১১ই মাঘ দিবসের প্রভাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিতল গৃহে, সুসম্পন্ন হইয়াছে। গৃহটি শ্রদ্ধাবান উপাসকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনেকেই স্থানাভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। এ বৎসর প্রবীণ ও বর্ষীয়ান লোকের যেরূপ সমাগম হইয়াছিল, অনেক দিন সে দৃশ্য আমরা দেখি নাই। ধূপ ধুনার গন্ধে সমাজমন্দির আমোদিত হইলে ঠিক আটটার সময় শঙ্খ ধ্বনির পর অর্চ্চনা হইয়া উপাসনা ও সঙ্গীত আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বাবু উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন। পরে রবীন্দ্র বাবু তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় যে সারগর্ভ উপদেশ দেন, তাহাতে সকলে মোহিত ও স্তব্ধ হইয়া অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"আমাদের এই উৎসব মিলনের উৎসব।

এর মধ্যে দুটি মিলন আছে। যেমন বিবাহ উৎসবের কেন্দ্রস্থলে আছে বর কন্যার মিলন এবং তাকে বেষ্টন করে আছে আহূত অনাহূত বরাহূতের মিলন—পরিচিত অপরিচিত আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মিলন—তেমনি আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এই উৎসবের কেন্দ্র স্থলে আছে আমার সঙ্গে আমার অধীশ্বরের মিলন এবং সেই মূল মিলনটিকে অবলম্বন করে বিশ্বসাধারণের সঙ্গে আনন্দ মিলন।

আজ প্রভাতে সর্ব্বপ্রথমে সেই মূল কথাটিকে নিয়ে এই উৎসবের রাজ্যে প্রবেশ করতে চাই—সব মিলনের মূলেযে মিলন, যেখানে কেউ কোথাও নেই, জগৎ সংসার নেই, কেবল আমি আছি আর তিনি আছেন, সেই খান দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করব—তার পরে সেই একটি মাত্র বৃন্তের উপরে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে হৃদয় পদ্মের একশো দলকে একেবারে বিশ্বভুবনের একশো দিকে ফুটিয়ে তোলা যাবে—তখন একের থেকে অনেকের দিকে প্রসারিত হয়ে উৎসব সম্পূর্ণ হবে।

অতএব এই পবিত্র শান্ত সময়ে গভীরতম নিভৃততম একলার কথা দিয়ে প্রভাত আরম্ভ করা যাক্! কোন্‌খানে আমি আর তিনি মিল্‌চেন, সেইটে একবার চেয়ে দেখি।

রোজই ত দেখা যায়, সকাল থেকেই সংসারের কথা ভাব্‌তে সুরু করি। কেমনা, সে যে আমার সংসার। আমার ইচ্ছাটুকুই এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কি চাই কি না চাই, কি রাখব কি ছাড়ব, এই কথাটাকেই মাঝখানে নিয়ে আমার সংসার।

যে বিশ্বভুবনে বাস করি, তার ভাবনা আমাকে ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দ্বারা সূর্য্য উঠ্‌চে না, বায়ু বইচে না, অণু পরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে সৃষ্টি রক্ষা হচ্ছে না। কিন্তু আমি আমার নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি, তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে 'বড়' ভাবনা করেই ভাব্‌তে হয়; কেননা সেটা যে আমারি ভাবনা।

তাই এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোট কথা আমার কাছে ছোট বলে মনে হয় না। আমার প্রভাত কালের সামান্য আয়োজন চেষ্টা প্রভাতের সুমহৎ সূর্য্যোদয়ের কাছে লেশ মাত্র লজ্জিত হয় না, এমন কি তাকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে চল্‌তে পারে।

তবেইত দেখছি, দুইটি ইচ্ছা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে কাজ করচে। একটি হচ্চে বিশ্বজগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর একটি আমার এই অতি ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা ত রাজত্ব করচেন, আবার তাঁর অধীনের তালুকদার সেই মহারাজ্যের মাঝখানেই নিজের রাজত্বটুকু জমিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্য্যের সমস্ত লক্ষণ আছে—কেননা ঐ ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা, তার কর্ত্তৃত্ব আছে।

এই আমাদের আমি-জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন। যে লোক রাস্তার ধুলো ঝাঁট দিচ্চে, সেও তার আমি অধিকারের মধ্যে স্বয়ং সকলের শ্রেষ্ঠ। যিনি ইচ্ছাময় তিনি "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন।

আমাদের এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক একবার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠি। বলি যে, আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া কাউকেই মানিনে। এই বলে, সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই, আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন, এইটে স্পর্দ্ধার সঙ্গে অনুভব করিতে চাই।

কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ত্ব আছে। স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নয়। শরীর যেমন শরীরকে চায়, মন যেমন মনকে চায়, বস্তু যেমন বস্তুকে আকর্ষণ করে—ইচ্ছা তেমনি ইচ্ছাকে না চেয়ে থাক্‌তে পারে না। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হতে না পরিলে এই একলা ইচ্ছা আপনার সার্থকতা অনুভব করে না। সে মায়ের কাছ থেকে কেবল সেবা চায় না, সেবার সঙ্গে মায়ের ইচ্ছাকেও চায়—বন্ধুর কাছ থেকে কেবল উপকার চায়না, বলে যে বন্ধু ইচ্ছা করেই প্রেমের সঙ্গে আমার উপকার করুক্—এমন কি, উপকার নাও করুক, কিন্তু তার ইচ্ছা যেন আমার দিকেই আসে, আমি যেন তার অনিচ্ছার সামগ্রী না হই।

এমনি করে, ইচ্ছা যেখানে অন্য ইচ্ছাকে চায়, সেখানে সে আর স্বাধীন থাকে না, সেখানে নিজেকে তার খর্ব্ব করতেই হয়। আমি যেমনি ইচ্ছা তেমনি চল্‌ব, অথচ অন্যের ইচ্ছাকে বশ করে আনব, এ ত হয় না। গৃহিণীকে বাড়ির সকলেরই সেবিকা হতে হয়, তবেই তিনি বাড়ির সকলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করে গৃহকে মধুর করে তুল্‌তে পারেন।

এই যে ইচ্ছার অধীনতা, এতবড় অধীনতা ত আর নেই। আমরা দাসতম দাসের কাছ থেকেও জোর করে ইচ্ছা আদায় করিতে পারিনা—অতএব সেই ইচ্ছা যখন আত্মসমর্পণ করে, তখন আর কিছুই বাকি থাকেনা।

তাই বলছিলুম—ইচ্ছাতেই আমাদের স্বাধীনতার সব চেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, তেমনি এই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্ত্তি। ইচ্ছা, অহঙ্কারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করে সুখ পায় বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় সুখ পায় প্রেমে আপনাকে অধীন বলে স্বীকার করে'।

ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও এই ধর্ম্মটি দেখ্‌তে পাচ্চি—তিনিও ইচ্ছাকে চান। এই জন্যেই—চাইতে পারিবেন বলেই—আমার ইচ্ছাকে তিনি আমার করে দিয়েছেন। বিশ্বনিয়মের জালে তাকে একেবারে নিঃশেষে বেঁধে ফেলেননি। বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য্য, কেবল ঐ একটি জিনিষ তিনি নিজে রাখেননি—সেটি আমার ইচ্ছা—ঐটে তিনি কেড়ে নেননা, চেয়ে নেন—মন ভুলিয়ে নেন। ঐ একটি জিনিষ আছে যেটি আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি, সে আমারি ইচ্ছা বটে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এইখানে তাঁর ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব করেছেন। আমার কাছে এসে বল্‌চেন, আমি রাজখাজনা চাইনে, আমাকে প্রেম দাও। হে প্রেমস্বরূপ! তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তুমি এত কাণ্ড করেছ। আমার মধ্যে এই এক সৃষ্টিছাড়া "আমি"র লীলা ফেঁদে বসেছ, এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার জন্যে আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ।

তাই যদি না হ'ত, তবে এ গানটি গাইতে কি আমার সাহস হ'ত?

"নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও—
মাঝে কিছুই রেখোনা রেখোনা—
থেকোনা থেকোনা দূরে!"

এ কেমন প্রার্থনা? এ প্রেম কার সঙ্গে? মানুষ কেমন করে এ কথা কল্পনাতেও এনেছে এবং মুখেও উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে? বিশ্বভুবন বল্‌তে কতখানি বোঝায় এবং তার তুলনায় মানুষ যে এত ছোট যে কোনো অঙ্কের দ্বারা তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য।

এমন যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর—তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু, বলে কি না প্রেম করবে! অর্থাৎ, তাঁর রাজ-সিংহাসনে একেবারে তাঁর পাশে এসে বস্‌বে? অনন্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎ-যজ্ঞের হোম-হুতাশন যুগযুগান্তর জ্বল্‌চে, আমি সেই যজ্ঞ-নক্ষত্রের অসীম জনতার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্ দাবীর জোরে দ্বারীকে বল্‌চি, এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে আসন দিতে হবে?

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায়, এ কি তার অত্যাকাঙ্ক্ষার অশান্ত উন্মত্ততা, অহঙ্কারের চরম পরিচয়?

কিন্তু অহঙ্কারের একটা যে লক্ষণ নিজেকেই ঘোষণা করা, সেটা ত এর মধ্যে দেখ্‌চিনে—এ যে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করা। তাঁর প্রেমের জন্যে যে লোক ক্ষেপেছে, সে যে নিজেকে দীন করে' সকলের পিছনে সে দাঁড়ায়, যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারী তাঁদের পায়ের ধুলা পেলেও সে যে বাঁচে!

সেই জন্যে, জগৎ সৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য বলে বোধ হয় যে, মানুষ তাঁর প্রেম চায়—এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড় সত্য—বড় লাভ—বলে চায়।

কেন চায়? কেন না, সে যে অধিকার পেয়েছে। হোন না তিনি বিশ্বজগতের রাজাধিরাজ, এই প্রেমের দাবী তিনিই জন্মিয়ে দিয়েছেন, আবার প্রেমও তাঁরই সঙ্গে। এতে আর ভয় লজ্জা কিসের!

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ "আমি" করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন! এক দিকে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড, আর এক দিকে আমার এই আমি! এ রহস্য কেন? এই ছোট আমিটির সঙ্গে সেই পরম আমি যে মিল্‌বেন!

এমন যদি না হ'ত তবে তাঁর জগৎ-রাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর কিসের আনন্দ? কোথাও যাঁর কোনো সমাজ নেই তিনি কি ভয়ঙ্কর একলা, কি অনন্ত একলা! তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই তাঁর একাধিপত্য এক জায়গায় বিসর্জ্জন করেছেন! তিনি আমার এই "আমি" টুকুর আনন্দ-নিকেতনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন। বলে দিয়েছেন "আমার চন্দ্র-সূর্য্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেন না ওজনদরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে—তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলে'ই তুমি হয়েছ, তুমি আছ!"

এই খানেই আমার এত গৌরব যে, তাঁকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি! বল্‌তে পারি—"আমি তোমাকে চাই নে! সে কথা তাঁর ধুলো-জলকে বল্‌তে গেলেও তারা সহ্য করে না—তারা তখনি নাবতে আসে! কিন্তু তাঁকে যখনি বলি "তোমাকে আমি চাইনে, আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই" তিনি বলেন আচ্ছা বেশ! বলে চুপ করে বসে থাকেন!

এদিকে কখন এক সময় হুঁস্ হয় যে, আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন, সেখানকার চাবি ত আমার খাতাঞ্চির হাতে নেই—টাকাকড়ি ধনদৌলত কোনোমতেই সেখানে গিয়ে পৌছায় না—বাইরে আবর্জ্জনার মত পড়ে থাকে। সেখানে ফাঁক থেকেই যায়! সেখানকার সেই একলা ঘরটিকে জগতের আর একটি মহান্ একলা ছাড়া কেউ কোনোমতেই ভরাতে পারে না। যে দিন বল্‌তে পারব, আমার টাকার কাজ নেই, খ্যাতিতে কাজ নেই, কিছুতে কাজ নেই, তুমি এস; যে দিন বল্‌তে পারব, চন্দ্রসূর্য্যহীন এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার, সেই দিন আমার "আমি" জন্মের মত সার্থক হবে!

আমাদের অন্তরাত্মার "আমি" ক্ষেত্রের একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে, জগৎজুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে! আকাশের নীলিমায়, বনের শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে, সর্ব্বত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে! সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আস্‌তেন, তা'হলে জোড়হাত করে মাথা ধুলোয় লুটিয়ে তাঁকে মান্‌তুম—কিন্তু ঐ জায়গায় তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন, সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে আসে না, সেইজন্যে পাপ ঘুম ভাঙ্‌তেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে!

কিন্তু এমন করলে ত চল্‌বে না! শাসনের দায় নেই বলেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বীকার না করে তবে জন্মজন্ম সে কেবল দাস দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে! মানবজন্ম যে আনন্দের জন্ম সে খবরটা সে একেবারেই পাবে না! ওরে, অন্তরের যে নিভৃততম আবাসে চন্দ্রসূর্য্যের দৃষ্টি পৌঁছায় না, সেখানে কোনো অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশ পথ নেই, যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসন পাতা, সেইখানকার দরজাটা খুলে দে' আলো জেলে তোল্! যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি, তাঁর আলোক আমাকে সর্ব্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে, যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝ্‌তে পারি, তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রেম, আমার জীবনকে সর্ব্বত্র নীরন্ধ্র নিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে! তিনিও পণ করে বসে আছেন, তাঁর এই আনন্দমূর্ত্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না—বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্য্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে, তবু তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যে দিন আমার প্রেম জাগবে, সে দিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাকবে না। কেন যে "আমি" হয়ে এত দিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরচি, সেদিন সেই বিরহ-দুঃখের রহস্য এক মুহূর্ত্তে ফাঁস হয়ে যাবে।

হে আমার প্রাণের প্রাণ, জগতের সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে। ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে; পশু পক্ষীর সঙ্গে আমার মিল আছে, সাধারণ মনুষ্যের সঙ্গে আমার মিল আছে। কিন্তু এক জায়গায় একেবারে মিল নেই—যেখানে আমি হচ্চি বিশেষ। আমি যাকে "আমি" বল্‌চি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এ সৃষ্টি অপূর্ব্ব—এ কেবলমাত্র "আমি," একলা "আমি" অনুপম অতুলনীয় "আমি"। এই "আমি"র যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সেই মহাবিজন লোকে, হে আমার অন্তর্যামী, তুমি ছাড়া কারো প্রবেশ করবার কোনো জো নেই।

প্রভু, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব। সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালেই নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু! এই আমি নামক তোমার সকল হতে স্বতন্ত্র এই যে একটী বিশেষ লীলা আছে, এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব—একের সঙ্গে এক হয়ে মিলব!

এই আমিটিকে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে আন্‌চ। কত সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারার মধ্যে দিয়ে এ'কে তোমার পাশে করে হাতে ধরে নিয়ে এসেচ কিন্তু কারো সঙ্গে এ'কে জড়িয়ে ফেলনি! কোন্ নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পনির্ঝর থেকে এর অণু পরমাণুকে চালনা করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্ত্তন, কত পরিণতির ভিতর দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ! তোমার সেই অনাদিকালের সঙ্গে যে আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখানে দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে, সেটি হচ্চে এই "আমি"র রেখা। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু। তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধুরূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর

কোনো কিছুই তোমার সমান না হক. তোমার চেয়ে বড় না হক্! আর আমার এই যে একটা সাধারণ জীবন, যা নানা ক্ষুধা তৃষ্ণা চিন্তা চেষ্টা দ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করচি, সেইটেই নানাদিক দিয়ে প্রবল হয়ে না উঠে। আমি যেখানে জগতের সামিল, সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি —কিন্তু 'আমি' রূপে তোমাকে আমার একমাত্র বলে জানতে চাই। এই আমিক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহঙ্কারের দুঃখ—আমার সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন অর্থাৎ প্রেমের সুখ। এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘুচ্‌বে, সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে, সেই জানিয়েই খ্রীষ্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম প্রিয়তম, এই "আমি"—নিকেতনেই যে তোমার চরম লীলা, এই জন্যেইত এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ, এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান! সেই জন্যেইত এই খানেই মৃত্যু এবং অমৃত, সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্চে। এই দুঃখ এবং সুখ, মিলন এবং বিচ্ছেদ, মৃত্যু এবং অমৃত, তোমার দক্ষিণ ও বাম দুই বাহু, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বল্‌তে পারি—আমার সব মিটেছে, আমি আর কিছু চাইনে।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

দীনের প্রণাম।

(১)

জাগ গো জননী শক্তিরূপা বঙ্গবালা;
হের নেত্রে পূর্ব্বাকাশে নবালোক ঢালা।
অন্ধকার যায় দূরে,
যেন কোন সুরপুরে,
মঙ্গল আরতি-বাদ্য উঠিয়াছে বাজি'
দাঁড়াও মা, এ সময়ে মাতৃরূপে সাজি'।

(২)

দাঁড়াও মার্জ্জিত করি' নিদ্রাতুর আঁখি,
দাঁড়াও সন্তান-হিতে স্থির লক্ষ্য রাখি।
শুনাও মা উচ্চরবে,
পতিত সন্তান সবে,
পুত্রের মঙ্গলে মাতা পারে প্রাণ দিতে;
কি ছার বিলাস-আশা মুহূর্ত্তে বর্জ্জিতে!

(৩)

দাঁড়াও মহিমাময়ী মাতৃমূর্ত্তি ধরি;
দুর্নীতি দলনীরূপে, মোহত্যাগ করি।
আশীর্ব্বাদ ল'য়ে করে,
কাতর সন্তান-তরে,
কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও ধীরপদে;
সম্মুখে দাঁড়াও দেবী—কি ভয় বিপদে!

(৪)

হিংসা, দ্বেষ, পরচর্চ্চা করিয়া বর্জ্জন,
চালাও নূতন পথে সংযত জীবন।
মুক্ত কর রুদ্ধ মন,
আসিয়াছে শুভক্ষণ,
আপন শক্তিতে মাতা করিয়া নির্ভর;
উঠাও পতিত পুত্রে ধরি দু'টি কর।

(৫)

মাতৃভক্তি মহামন্ত্রে কর মা দীক্ষিত,
মাতৃসেবা মহাকার্য্যে কর মা শিক্ষিত।
তোমাদের পুত্র যত,
সাধনায় হ'ক রত,
মাতৃপদধুলি লয়ে লভুক চেতন;
চলুক উড়ায়ে বিশ্বে জাতীয় কেতন!

(৬)

নিদ্রামগ্ন পুত্র তব হ'য়ে লক্ষ্য হারা;
তোমরা মা না জাগিলে জাগিবে না তা'রা।
নিশার আঁধার ঘোর,
চ'লে যায়, হ'ল ভোর,
জাগিয়া জাগাও মাগো তব পুত্র গণে;
শক্তি হীনে শক্তিদাও স্নেহ পরশনে।

(৭)

জেগেছে জগতবাসী উন্মিলি' নয়ন;
অবোধ আমরা ঘুমে আছি অচেতন।
জননী স্নেহের স্বরে,
যদি না আহ্বান করে,
আমাদের জাগরণ আসিবে কি ফিরে?
জাগাও মা—রক্ষামন্ত্র বেঁধে দাও শিরে।

(৮)

জননীর আশীর্ব্বাদ ল'য়ে শির পাতি'
দাঁড়া'ক বিশ্বের মাঝে এ বাঙ্গালী জাতি।
তোমরাও থাকি' কাছে,
লক্ষ্য রেখো যা'তে বাঁচে,
বাঙ্গালীর ক্ষীণপ্রাণ—ক্ষুদ্রতম নাম;
জাগ মা, গ্রহণ কর দীনের প্রণাম!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লস্কর খাঁর অপরিসীম চেষ্টায় কাবুলের রাস্তা দস্যুশূন্য হইল এবং এত নিরাপদ হইল যে, কাবুলের উৎপন্ন দ্রব্য সমূহ নির্ব্বিঘ্নে লাহোর নগরে আসিতে লাগিল। মনুষ্যের রক্তপাত করা নিতান্তই দুঃখজনক। দুর্ভাগ্যবশতঃ শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে অনেক সময় কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়। কেন না সময় সময় কোন প্রকার কঠোর পন্থা অবলম্বন না করিলে সমগ্র মানব সমাজ বন্য পশুর ন্যায় নিজের নিজের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থের নিমিত্ত এবং অপরের অনিষ্ট সাধনার্থ উন্মুখ হইয়া উঠিয়া থাকে। রাজার পক্ষে যে শান্তি নাই তাহা ঈশ্বর জানিতেছেন। তাঁহাকে সর্ব্বদা যে কি প্রকার মনোকষ্ট ভোগ করিতে হয় এবং চিন্তা-বিষে জর্জ্জরিত হইতে হয় তাহা অপরে জ্ঞাত নহে। রাজাদিগের অদৃষ্টে চিন্তা এবং মনোকষ্ট ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি এক মুহূর্ত্তের অমনোযোগিতায় কত অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়া যাইতে পারে। নিদ্রাতেও তাঁহাদের শান্তি নাই। এইরূপ কথিত আছে যে, আপনার দেহের চুলের মধ্যে রাজাদিগের শত্রু আছে; এ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য। "মহামূল্য রত্নের ন্যায় আমার এই উপদেশটী স্মরণ রাখিও। ঈশ্বরের কৃপায় যদি তুমি সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা পাইয়া থাক তবে তোমার অধীন প্রজাবর্গের সহিত সদ্ভাব রাখিও। উজ্জ্বল স্বর্ণ-নির্ম্মিত প্রাসাদ রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা এই পৃথিবীতে সুনাম এবং সুযশ রাখিয়া পরলোকে গমন করাই শ্রেয়ঃ।" ঈশ্বর যাঁহাকে মহিমান্বিত রাজশক্তি অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য প্রজাবর্গকে অত্যাচার, অবিচার এবং উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করা। আমি সত্যই বলিতেছি যে, আমি কখনও বিলাসে এবং পার্থিব সুখে মত্ত হইয়া এই কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই নাই। ঈশ্বর এই পৃথিবীর রত্ন সমূহ অযাচিতভাবে, অপর্য্যাপ্তরূপে আমার মস্তকে বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহাদিগকে কিছুমাত্র মূল্যবান জ্ঞান করি না এবং তাহা রক্ষা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার পার্থিব সুখ-স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। শিকারের আমোদ এবং অন্যান্য আমোদ সর্ব্বদাই দুঃখ কষ্টের হেতু হইয়াছে। বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইবার প্রাক্কালে বুঝিতে পারিতেছি যে, নির্জ্জন বাসেই আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ এবং শান্তি পাইব। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই পৃথিবীতে কোন সুখ এবং আনন্দই চিরস্থায়ী নহে; সকলই ক্ষণভঙ্গুর, চঞ্চল এবং মরণশীল। আমরা দেখিতেছি যে, যে মানব পার্থিব সুখ এবং আমোদে মত্ত এবং তাহাকেই সার জ্ঞান করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম বিস্মৃত হইতেছে, পরক্ষণেই

দেখিতেছি সে অসীম দুঃখপারাবারে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিষ্পেষিত হইতেছে। যে পৃথিবী এই প্রকার দুঃখপূর্ণ, তাহা অধিকারের নিমিত্ত অধর্ম্মাচরণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।" ভবিষ্যৎ বিপদ দূরীকরণার্থ আমি দস্যুদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু আমি এ কথা নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, নিজের স্বার্থ সাধন অথবা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য আমি কখনও এরূপ করি নাই। পৃথিবীর বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যাচরণ আমার নিকট দিনের আলোর ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত। মানব জীবনের সুখের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা সকলই আমার আছে, আমি ইহাতে বিশেষ সৌভাগ্যবান। স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কারে, জাঁকজমকশালী বহুমূল্য সাজসজ্জা ও পরিচ্ছদে কোন্ ব্যক্তি আমাকে কবে অতিক্রম করিয়াছে? আমি যদি ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণী সমূহের সুখ এবং সম্মানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কার্য্য করিতাম, তাহা হইলে আমি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অত্যাচারী রাজা হইতাম।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কয়েকজন অদ্ভুতকর্ম্মা ঐন্দ্রজালিক আছে। তাহাদের অভূতপূর্ব্ব কৌশল আমাকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে এতদ্ সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। একদা এই প্রকার সাত জন বাজিকর আমার সভায় আগমন করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল যে তাহারা মানবের বুদ্ধির অগম্য কার্য্য সমূহ সম্পন্ন করিতে সক্ষম। বস্তুতঃ তাহারা এমন সকল আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করিয়াছিল যে তাহা দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

প্রথম। তাহারা বলিল যে কেহ কোন বৃক্ষের নাম করিলে তাহারা সেই বৃক্ষের বীজ মৃত্তিকাতে রোপণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষ উৎপন্ন করিবে। আমার সভার একজন সভাসদ্ খান-ই-জাহান তাহাদিগকে তুঁত বৃক্ষ উৎপাদন করিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ বাজিকরগণ দশটি বিভিন্ন স্থানে বীজ রোপন করিয়া আমাদিগের অবোধ্য ভাষায় মন্ত্র পড়িতে লাগিল। নিমেষের মধ্যেই দশটি স্থানে দশটি তুঁত বৃক্ষ দেখা দিল। এই প্রকারে তাহারা আম্র, আপেল, সাইপ্রেস, আনারস, ডুমুর, বাদাম, আখরোট এবং অন্যান্য বহু বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছিল। তাহারা এই সকল কার্য্য আমাদের সম্মুখে প্রকাশ্যরূপেই করিয়াছিল। বৃক্ষগুলি প্রথমতঃ ধীরে ধীরে মৃত্তিকা হইতে উত্থিত হইল এবং দুই, একহাত দীর্ঘ হইবার পর বহু শাখা, প্রশাখা ও পত্র দ্বারা শোভিত হইল। আপেল বৃক্ষ হইতে যে আপেলটি উৎপন্ন হইল তাহা আমার নিকট আনাইয়া দেখিলাম যে ইহা সৌগন্ধে এবং আকারে স্বাভাবিক আপেলের ন্যায়। অন্যান্য বৃক্ষ হইতে ও ফল সকল উৎপাদিত হইল। বাজিকরগণ ঐ সকল ফল আমাকে আস্বাদন করিয়া দেখিতে বলিল। আমার সম্মুখেই বৃক্ষ হইতে ফলগুলি পাড়িয়া আনা হইল এবং সভাষদ্গণ তাহা আস্বাদন করিলেন। ফল উৎপাদিত হইবার পর শাখার উপর নানা বর্ণের মনোহর পক্ষী সকল আবির্ভূত হইল। তাহাদের সৌন্দর্য্য এবং সুস্বর অতুলনীয়। পক্ষী সকল আনন্দে শাখার উপর নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃক্ষের পত্রসমূহ শরৎকালীন বৃক্ষের রং ধারণ করিল এবং বৃক্ষগুলি ধীরে ধীরে মৃত্তিকার মধ্যে মিলাইয়া গেল। এই সকল ঘটনা যদি আমার চক্ষুর সম্মুখে না ঘটিত তবে আমি কখনও বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে কোন মানব এমন অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে।

দ্বিতীয়। এক দিবস রাত্রি দুপ্রহরের সময়—সমুদয় জগৎ যখন গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত—এই সাত জনের মধ্যে একজন বাজিকর আপনার পরিধেয় বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া একটি চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিল। তৎপরে সে এই চাদরের তলদেশ হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল আয়না বাহির করিল। এই আয়না হইতে এ প্রকার তীব্র রশ্মি নির্গত হইল যে

তদ্দ্বারা সমুদয় আকাশ অসম্ভবরূপে আলোকিত হইয়া উঠিল। পথিকগণ বলিয়াছিল যে এই রাত্রিতে তাহারা নভোমণ্ডল এক অভূতপূর্ব্ব আলোকে পরিপ্লাবিত হইতে দেখিয়াছিল এবং আগ্রা হইতে যে সকল স্থানে গমন করিতে দশদিন লাগে সেই সকল স্থানের লোকেরাও এই আলো দেখিতে পাইয়াছিল। এই আলোক, অত্যুজ্জ্বল দিবসের আলোক অপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল।

তৃতীয়। সাতজন ঐন্দ্রজালিক একত্র দণ্ডায়মান হইয়া জিহ্বা কিংবা ওষ্ঠ না নাড়িয়া এমন সমতান লয়বিশিষ্ট সুস্বর লহরী উত্থিত করিল যে মনে হইল যেন তাহাদের সাতটি গলা হইতে একটী স্বর নির্গত হইতেছে। এই প্রকার স্বর বাহির করিবার সময় দেখিলাম যে, তাহারা জিহ্বা এবং মুখের সাহায্য লইতেছে না। অথচ একটি সুস্বর বাহির করিতেছে।* ইহাতে আমি বিস্ময়াভিভূত হইলাম।

চতুর্থ। তাহারা এক শত হাওয়াইবাজি প্রস্তুত করিয়া তাহা কিয়দ্দূরে একটি উচ্চ স্থানে রাখিয়া আমাকে বলিল যে, তাহারা এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে, অথচ বাজিগুলি আপনাপনি জ্বলিয়া উঠিবে। আমার আজ্ঞা পাইয়া তাহারা ঐরূপই করিল।

পঞ্চম। বাজিকরগণ আমার সম্মুখে একটি গরম জলপূর্ণ বৃহৎ কটাহ স্থাপন করিয়া তাহাতে প্রায় ৩ মণ চাউল ফেলিয়া দিল। তৎপরে বিনা অগ্নিতে কটাহের জল ফুটিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহারা কটাহের ঢাকনি তুলিয়া তাহা হইতে ভাত বাহির করিয়া একশতটি থালা পূর্ণ করিল, অধিকন্তু কটাহ হইতে প্রত্যেক থালায় একটি সিদ্ধ মুরগি রাখিল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম।

ষষ্ঠ। একটি শুষ্ক ভূমিখণ্ডের উপর বাজিকরগণ একটি পুষ্প স্থাপন করিল। তাহারা ইহার চতুর্দ্দিকে তিনবার নৃত্য করিবার পর পুষ্পের মধ্যদেশ হইতে একটি ফোয়ারা নির্গত হইল এবং তৎক্ষণাৎ অজস্রধারে গোলাপ পুষ্প ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু ফোয়ারার এক বিন্দু জলও ভূমি স্পর্শ করিল না। এক ঘণ্টা ফোয়ারা হইতে জল নির্গত হইবার পর তাহারা পুষ্পটি সরাইয়া ফেলিল এবং ফোয়ারাটিও বন্ধ হইয়া গেল। তৎপরে আশ্চর্য্যের সহিত দেখিলাম যে, সেই স্থান যেমন পূর্ব্বে শুষ্ক ছিল, উহা তেমনি রহিয়াছে, জলের চিহ্নমাত্রও নাই। পুনরায়, তাহারা উপরোক্ত পুষ্পটি ভূমিতে স্থাপন করিল। স্থাপন করিবামাত্র উহা হইতে জল এবং অনলবর্ষী পুষ্প সকল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

সপ্তম। একজন বাজিকর নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইল। আর একব্যক্তি তাহার মস্তকের উপর আপনার মস্তক রাখিয়া শূন্যে পদদ্বয় স্থাপন করিল। তৃতীয় বাজিকর তাহার পদদ্বয় দ্বিতীয় বাজিকরের পদদ্বয়ের উপর স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। এই প্রকারে সাতজন বাজিকর দণ্ডায়মান হইলে, প্রথম বাজিকর,—যাহার মস্তকের উপর ছয়জন বাজিকর অবস্থিতি করিতেছিল—একটি পদ স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উত্থিত করিল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক পদের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। আমি তাহাদের বল এবং স্থিরতা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইলাম।

অষ্টম। একটি বাজিকর পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল। আর একটি বাজিকর তাহার পশ্চাদ্দেশ হইতে তাহার কটিদেশ ধারণ করিল। এইরূপে ৪০ জন লোক পরস্পরের কটিদেশ ধারণ করিলে পর, প্রথম ব্যক্তি বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিল। এই অদ্ভুত বল দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম।

নবম। ঐন্দ্রজালিকগণ একটি মনুষ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া তাহার দেহের অংশগুলি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা ঐ স্থানের উপর একটি চাদর বিছা-

* Ventriloquism, সন্দেহ নাই।

ইয়া দিল। তৎপরে একটি বাজিকর ঐ চাদরের তলদেশে গমন করিবামাত্র সে এবং নিহত ব্যক্তি সুস্থদেহে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার দেহে কোন প্রকার আঘাতের চিহ্ন দেখিলাম না।

দশম। বাজিকরগণ একটি ব্যাগ হস্তে লইয়া দর্শকদিগকে দেখিতে দিল। দর্শকগণ দেখিয়া বলিল যে, ইহা সম্পূর্ণরূপে খালি, ইহার ভিতরে কিছুই নাই। তৎপরে একজন বাজিকর ব্যাগের মধ্যে হস্ত প্রদান করিয়া বাহির করিবামাত্র দুইটি বৃহৎ এবং অতি সুন্দর লড়াইয়ের মোরগ নির্গত হইল। ব্যাগ হইতে নির্গত হইয়াই তাহারা প্রবল তেজের সহিত লড়াই করিতে আরম্ভ করিল। এক ঘণ্টা লড়াইর পর বাজিকরগণ তাহাদের উপর একটি চাদর ফেলিয়া দিবামাত্র তাহারা অদৃশ্য হইল। বাজিকরগণ পুনরায় চাদরটী তুলিবামাত্র সুদৃশ্য পালক সমন্বিত দুইটী তিতির পক্ষী আবির্ভূত হইল এবং সুস্বর লহরী উত্থিত করিতে লাগিল। পর্ব্বতের গাত্রে তাহারা যে প্রকারে কীট, পতঙ্গ খুঁটিয়া আহার অন্বেষণ করে, সেই প্রকার শব্দ করিয়া কীট, পতঙ্গ আহার করিতে লাগিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে তাহাদের উপর চাদর নিক্ষিপ্ত করিলে পর তাহারা অদৃশ্য হইল এবং উহা তুলিবামাত্র সেই স্থানে দুইটি ভীষণ কৃষ্ণবর্ণের সর্প দেখা দিল। এই দুইটি সর্প ভীষণ তেজের সহিত পরস্পরকে আক্রমণ করিল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর তাহারা শ্রান্ত হইয়া পড়িল। বাজিকরগণ পুনরায় তাহাদিগকে চাদর দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল এবং উহা উঠাইলে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমূহের কোন চিহ্নই ঐ স্থানে রহিল না।

একাদশ। বাজিকরগণ মৃত্তিকাতে একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা জল দ্বারা পূর্ণ করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিল। কর্ম্মচারিগণ উহা জলে পূর্ণ করিলে পর তাহারা পুষ্করিণীর উপ-রিভাগ আবৃত করিল। অল্পক্ষণ পরে আচ্ছাদনটি সরাইলে দেখা গেল সমুদয় জল এক বৃহৎ বরফ-খণ্ডে পরিণত হইয়াছে। বাজিকরগণ মাহুতদিগকে এই বরফের উপর দিয়া হস্তী চালাইয়া লইতে বলিল। তদনুসারে একটি মাহুত একটি হস্তী লইয়া এই বরফ খণ্ডের উপর দিয়া অনায়াসে চলিয়া গেল, কোনও স্থান একটুও ভাঙ্গিল না। তৎপরে একটি চাদর দ্বারা পুষ্করিণীর উপরিভাগ আবৃত করা হইল। চাদরটি অপসারিত করিলে দেখা গেল যে বরফখণ্ড অদৃশ্য হইয়াছে এবং জলের চিহ্নমাত্রও নাই।

দ্বাদশ। বাজিকরগণ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে দুইটি তাঁবু স্থাপন করিল। দুইটি তাঁবুর দ্বার পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া রাখা হইল। আমরা সকলে এই তাঁবুর ভিতর গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে দুইটি তাঁবুই শূন্য। দুইটি বাজিকর দুইটি তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে বলিল যে আমরা যে জন্তু উপস্থিত করিতে বলিব তাহারা তাঁবু হইতে সেই জন্তুই বাহির করিয়া দিবে। খান-ই-জাহান তাহাদিগকে অষ্ট্রীচ্ পক্ষী বাহির করিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ দুইটি তাঁবু হইতে দুইটি বৃহত্তম অষ্ট্রিচ নির্গত হইয়া পরস্পরকে এ প্রকার ভীষণরূপে আক্রমণ করিল যে তাহাদের মস্তক বাহিয়া শোণিত পড়িতে লাগিল। পরিশেষে বাজিকরগণ তাহা-দিগকে পৃথক করিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। তৎপরে আমার পুত্র খরম্ বাজিকরদিগকে নীল-গাই উপস্থিত করিতে বলিল। তৎক্ষণাৎ দুইটি তাঁবু হইতে দুইটি ভীমদর্শন নীল গাই বাহির হইয়া লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইল। এই প্রকারে দুই ঘণ্টা লড়াইর পর তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়া তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। সংক্ষেপতঃ যে ব্যক্তি যে জন্তু দেখিতে চাহিল, বাজিকরগণ তাহাই উপস্থিত করিল। আমি এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার কারণ উদ্ভাবন করিতে বহু চেষ্টা করিয়া ছিলাম, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হই নাই।

ত্রয়োদশ। বাজিকরগণ একটি ধনুক ও পঞ্চা-শটি তীর হস্তে লইল। একটি বাজিকর ধনুক ও তীরগুলি লইয়া একটি তীর শূন্যে নিক্ষেপ করিল। উহা শূন্যেই ঝুলিয়া রহিল। তৎপরে সে আর একটি তীর নিক্ষেপ করিল, উহা প্রথমটির নিম্নদেশে

বিদ্ধ হইয়া ঝুলিয়া রহিল। এই প্রকারে পঞ্চাশটি তীর একটির সহিত আর একটি সংযুক্ত হইয়া ধান্যের শিষের ন্যায় শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত বাজিকর আর একটি তীর সর্ব্ব-নিম্ন তীরের উপর নিক্ষেপ করিবামাত্র সমুদয় তীর ঝন্ ঝন্ শব্দে ভূমিতে পড়িয়া গেল। ইহার অর্থ-ভেদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইল।

চতুর্দ্দশ। তাহারা একটি বৃহৎ পাত্র, পরিষ্কার জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া আমার সম্মুখে ভূমিতে স্থাপন করিল। একটি বাজিকর একটি রক্তবর্ণের গোলাপ পুষ্প হস্তে লইয়া আমাকে বলিল যে এই জলের মধ্যে পুষ্পটি নিমজ্জিত করিয়া আমি যে রঙ ইচ্ছা করি সে সেই রঙ উৎপন্ন করিতে পারিবে। তদনু-সারে সে পুষ্পটী জলে দিবামাত্র উহা উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করিল এবং প্রত্যেক বার ডুবাইবার পর ইহা হইতে বিভিন্ন প্রকার রঙের বিভিন্ন প্রকৃতির পুষ্প উৎপন্ন হইতে লাগিল। আমি আদেশ করিলে সে একশত প্রকার রঙের বিভিন্ন পুষ্প উৎপন্ন করিতে পারিত। তৎপরে তাহারা একটি শ্বেত বর্ণের সূত্র এই জলের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রথমতঃ ইহা রক্তবর্ণ ধারণ করিল, পরে হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিল। আমি আদেশ করিলে তাহারা এক শত প্রকারের বিভিন্ন রঙের সূত্র উৎপাদন করিতে পারিত।

পঞ্চদশ। বাজিকরগণ একটি পক্ষীর পিঞ্জর উপস্থিত করিল। যে পার্শ্ব আমার দিকে রহিল, সেই দিকে দুইটি সুদৃশ্য নাইটিঙ্গেল পক্ষী দেখিলাম। তাহারা পিঞ্জরটী ঘুরাইবামাত্র নাইটিঙ্গেলদ্বয় অদৃশ্য হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে সবুজবর্ণের দুইটি শুক পক্ষী ঐ স্থলে আবির্ভূত হইল। তৎপরে আর একবার ঘুরাইলে পর রক্তবর্ণের দুইটি সুগায়ক পক্ষী আবি-র্ভূত হইল এবং পুনরায় ঘুরাইয়া দিলে দুইটি বিচিত্র বর্ণের তিতির দেখা দিল। এই প্রকারে পিঞ্জরের চারি কোণ যতবার তাহারা ঘুরাইতে লাগিল ততবার বিভিন্ন প্রকারের ও বিচিত্র বর্ণের পক্ষী সকল দেখা দিতে লাগিল।

ষোড়শ। বাজিকরগণ কুড়ি হস্ত দীর্ঘ পরিমাণ একটি বিচিত্র বর্ণের সুদৃশ্য কার্পেট বিস্তৃত করিল। তাহারা এই কার্পেট উল্টাইয়া দিবামাত্র ইহা বিভিন্ন বর্ণে এবং বিভিন্ন নমুনায় পরিবর্ত্তিত হইল। এই প্রকারে যতবার তাহারা ইহা উল্টাইয়া দিতে লাগিল ততবারই ইহা ভিন্ন ভিন্ন নমুনা এবং বর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। আমি একশতবার উল্টা-ইতে অনুরোধ করিলে ইহা একশত প্রকার ভিন্ন নমুনা এবং বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত।

সপ্তদশ। বাজিকরগণ একটি বৃহৎ পাত্র আমার সম্মুখে আনিয়া জল দ্বারা পূর্ণ করিল। তাহারা তৎপরে ইহা উল্টাইয়া সমুদয় জল ফেলিয়া দিল। পরে পাত্রটি সোজা করাতে দেখা গেল যে ইহা পূর্ব্বের ন্যায়ই জলপূর্ণ রহিয়াছে। এই প্রকারে তাহারা একশতবার পাত্রটি উল্টাইয়া জল ফেলিয়া দিয়া পরক্ষণেই তাহা জলপূর্ণ অবস্থায় দেখাইতে পারিত।

অষ্টাদশ। বাজিকরগণ একটি বৃহৎ থলে আনিল। ইহার দুই পার্শ্ব উন্মুক্ত ছিল। তাহারা এক পার্শ্ব দিয়া একটি তরমুজ থলের মধ্যে প্রবেশ করা-ইয়া দিল কিন্তু উহা অন্য পার্শ্ব দিয়া শষায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থলের ভিতর হইতে নির্গত হইল। তৎপরে শষাটি প্রবেশ করাইয়া দেওয়ায় অন্য মুখ দিয়া এক-রাশি আঙ্গুর নির্গত হইল। পুনরায় আঙ্গুরগুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিবার পর থলের অন্য মুখ হইতে আপেল ফল বাহির হইল। এই প্রকারে এক শত বার আদেশ করিলে তাহারা একশত প্রকারের ফল দেখাইতে পারিত।

উনবিংশতি। একটি বাজিকর আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মুখব্যাদান করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মুখের মধ্যে একটি সর্পের মস্তক দেখা গেল। তাহার সঙ্গী আসিয়া সর্পের গলদেশ দৃঢ়-রূপে ধরিয়া টানিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই চারি হস্ত দীর্ঘ একটি সর্প নির্গত হইল। তৎপরে ইহা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর আর একটি ঐ প্রকার দীর্ঘ সর্প নির্গত হইল। এই প্রকারে

তাহার মুখ হইতে আটটী সর্প নির্গত হইয়া পরস্পরের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

বিংশতি। বাজিকরগণ এক হস্তে একটি আয়না ধরিল এবং অপর হস্তে একটি গোলাপ পুষ্প লইল। তাহারা এই পুষ্পটি আয়নার পশ্চাতে মুহূর্ত্তের জন্য ধরিয়া আমার সম্মুখে আনিল। দেখিলাম যে গোলাপ পুষ্পটি অন্য বর্ণ ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারে ঐ পুষ্পটি সবুজ, লাল, হরিদ্রা, বেগুণী, কাল এবং সাদা বর্ণ ধারণ করিল।

একবিংশতি। তাহারা আমার সম্মুখে দশটি পোর্সেলিনের পাত্র সাজাইয়া রাখিল। দর্শকগণ সকলেই দেখিল যে এই পাত্রগুলি শূন্য। অর্দ্ধঘণ্টা পর তাহারা ইহাদের মুখাবরণ খুলিলে দেখা গেল যে, একটি গম দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, অন্যটিতে মোরব্বা রহিয়াছে। আর কয়েকটি পাত্রে আচার, তেঁতুল, মিছরি প্রভৃতি রহিয়াছে। বলিতে কি, প্রত্যেক পাত্রেই কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য রহিয়াছে দেখা গেল। আমার অনুচরগণ এই সকল দ্রব্য আস্বাদনও করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা পুনরায় এই পাত্রগুলির ঢাক্‌নী খুলিলে দেখিলাম যে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় শূন্য হইয়াছে। আমি এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

দ্বাবিংশতি। বাজিকরগণ কবি সাদির গ্রন্থাবলী আমার সম্মুখে আনিয়া পূর্ব্বে পরীক্ষিত একটি থলের মধ্যে রাখিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন উহা থলের ভিতর হইতে তাহারা বাহির করিল, দেখিলাম যে সাদির গ্রন্থাবলী হাফেজের দেওয়ানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পুস্তকটি থলের মধ্যে রাখিয়া বাহির করিবার পর দেখা গেল যে ইহা সলোমনের গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। ইহা বহুবার পুনরুক্তি করা হইল এবং প্রত্যেকবারই বিভিন্ন গ্রন্থকারের গ্রন্থসমূহ নির্গত হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশতি। তাহারা পঞ্চাশহস্ত পরিমিত দীর্ঘ একটি শৃঙ্খল লইয়া আনিয়া এক দিক আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। এই দিক যেন শূন্যেই, কোন অদৃশ্য বস্তুতে আটকাইয়া রহিল। শৃঙ্খলের অপর দিক ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। তৎপরে তাহারা একটি কুকুর আনিয়া শৃঙ্খলের নিম্নদিকে দণ্ডায়মান করাইয়া দিল। কুকুরটি তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খল বাহিয়া শেষ সীমায় গিয়া উপস্থিত হইল এবং সেস্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। এই প্রকারে এক একটি শূকর, প্যান্থার, সিংহ, ব্যাঘ্র শৃঙ্খল বাহিয়া উঠিয়া উপরিভাগে গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তৎপরে তাহারা শৃঙ্খল নামাইয়া লইয়া একটি থলের মধ্যে রাখিল। জন্তুগুলি আকাশের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সবিশেষ আশ্চর্য্যজনক।

চতুর্বিংশতি। তাহারা আমার সম্মুখে একটি আবৃত ঝুড়ি রাখিল। আমি পূর্ব্বেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম যে ইহা সম্পূর্ণরূপে রিক্ত। তৎপরে তাহারা আচ্ছাদনটি উন্মুক্ত করিবামাত্র দেখিলাম যে ইহা নানাপ্রকার সুস্বাদু ব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহারা পুনরায় ইহা আচ্ছাদিত করিল, কয়েকমুহূর্ত্ত পরে আবরণ উন্মোচন করিলে দেখিলাম যে ঝুড়িটি বাদাম, কিস্‌মিস প্রভৃতি শুষ্ক ফলের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। এই প্রকারে প্রত্যেকবার আবরণ উন্মোচিত হইবার পরই ঝুড়িটি নানাপ্রকার বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ হইতে দেখিলাম।

পঞ্চবিংশতি। বাজিকরগণ আমার সম্মুখে একটি আবরণযুক্ত পাত্র স্থাপন করিয়া তাহা জলপূর্ণ করিল। তাহারা আবরণ খুলিয়া আমাকে দেখাইল যে ইহাতে কেবল জল-রহিয়াছে। তৎপরে পাত্রটি আবৃত করিয়া কিছুক্ষণ রাখিবার পর যখন ইহা খোলা হইল তখন দেখা গেল যে এই জলে দ্বাদশটি সবুজবর্ণের বৃক্ষপত্র ভাসিতেছে। পুনরায় ইহা ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা খুলিবার পর চারিটি সর্প জলে বেড়াইতেছে দেখা গেল। তৎপরে ইহা অদৃশ্য হইল এবং উহাদের স্থলে চারিটি বৃহৎ পক্ষী দেখা দিল। পরিশেষে যখন পাত্রটি অনাবৃত করা হইল তখন দেখিলাম যে ইহা শূন্য, জলের চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই।

ষড়বিংশতি। একটি বাজিকর তাহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে শোভিত একটি চুণীর অঙ্গুরীয় আমাকে দেখাইল। সে এই অঙ্গুরীয় আর একটি অঙ্গুলীতে পরিবামাত্র চুণীটি মরকতে পরিণত হইল, আর একটি অঙ্গুলীতে দিবা মাত্র মরকতটি হীরকে পরিণত হইল। পুনরায় অন্য অঙ্গুলীতে ধারণ করিবামাত্র হীরক পান্নাতে পরিণত হইল। এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গুলীতে ধারণ করিবামাত্র ইহা বিভিন্ন বর্ণ এবং প্রকৃতির রত্নে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

সপ্তবিংশতি। একটি ধারাল তরবারী ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিয়া একজন বাজিকর তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু ইহাতে সে সম্পূর্ণ অক্ষতাবস্থাতেই রহিল। এ প্রকার তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাতে সে যে কোন প্রকারে আহত হয় নাই, ইহাতে আমি বিস্মিত হইলাম।

অষ্টবিংশতি। বাজিকরগণ সাদা কাগজের একটী বাঁধান খাতা আমার হস্তে প্রদান করিল। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে প্রত্যেক পাতাই সাদা, তাহাতে কিছুই মুদ্রিত, লিখিত অথবা অঙ্কিত নাই। একজন বাজিকর খাতাখানি আমার হস্ত হইতে লইয়া প্রথম পাতা খুলিলেই দেখিলাম যে ইহা সোণালি রং মিশ্রিত উজ্জ্বল লালবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং এই পাতাতে সুচারু কারুকার্য্য খচিত রহিয়াছে। পর পৃষ্ঠা খুলিলে দেখিলাম যে তাহা নীলবর্ণে রঞ্জিত এবং পাতার পার্শ্বে বিভিন্ন প্রকার নরনারীর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। আর একটী পাতায় সিংহ ও গরু, ভেড়া প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে এবং একটী সিংহ একটী গাভীকে আক্রমণ করিয়াছে। এই পাতাটী চীন দেশীয় রঙে চিত্রিত এবং স্বর্ণখচিত। পরের পৃষ্ঠা সুন্দর সবুজ বর্ণে রঞ্জিত এবং স্বর্ণ খচিত। এই পাতাতে নানাবর্ণে চিত্রিত একটী বাগান অঙ্কিত রহিয়াছে। বাগানের মধ্যে একটী সুদৃশ্য মণ্ডপ এবং চতুষ্পার্শ্বে সাইপ্রেস বৃক্ষ, গোলাপ গুল্ম ও অন্যান্য বৃক্ষ রহিয়াছে। পর পৃষ্ঠা কমলালেবু রঙে রঞ্জিত। এই পাতায় দুইটি বিপক্ষ রাজা ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই প্রকার চিত্র অঙ্কিত আছে। এই প্রকারে প্রতি পৃষ্ঠা খুলিলেই বিভিন্ন প্রকার বর্ণে রঞ্জিত বিভিন্ন দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাইলাম। সমুদয় ভোজবাজির মধ্যে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আমি সাতিশয় পুলকিত হইলাম।

ক্রমশঃ।

জাপানের ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যতে জাপান সভ্য জগতের কোন্ স্থানাধিকার করিবে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এই সম্বন্ধে মারকুইস * ইতো (সম্প্রতি ইনি প্রিন্স হইয়াছেন) যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ যোগ্য। এই মহাত্মাই জাপানের প্রকৃত নির্ম্মাতা। সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ ইনি যেরূপ আশা করেন অনেকাংশে তাহা পূর্ণ হইবে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইনি ইউরোপ এবং আমেরিকা হইতে Financial system পাঠ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে আমেরিকায় যে বক্তৃতা করেন নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত হইল।

"পাশ্চাত্য জাতিগণের ন্যায় প্রাচ্য জাতি সমূহ সভ্যতার চরম সীমায় পঁহুছিতে পারে নাই কেন? এই প্রশ্নটী স্বভাবতঃ আমাদের মনে উদয় হইয়া থাকে। ধন কিংবা লোক বলের অভাব ইহার কারণ নহে। প্রাচ্য দেশ সমূহের শাসন পদ্ধতির দোষেই আমরা এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া রহিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমরা সেই সমস্ত দোষ বুঝিতে পারিয়াছি এবং সেই কারণেই আমরা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষা (General Education) দিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই নাই। রাজনৈতিক শিক্ষার

* নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ প্রিন্স "ইতো"কে জাপান নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। 'ইনে উয়ে', 'ইয়ামাগাতা', 'মাৎসুকাবু', 'ওকুমা', 'কাৎসুরা' প্রভৃতি ব্যক্তিগণও জাপানের নির্ম্মাতা বলিয়া ইহার ইতিহাসে স্থান পাইবেন।

সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ও ব্যবস্থা করিয়াছি। কারণ বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই প্রকৃত পক্ষে সভ্যতার মাত্রা নির্দ্দেশ করে। যে জাতি যত বেশী বৈজ্ঞানিক চর্চ্চায় সফলতা লাভ করিয়াছে, সে সেই পরিমাণে সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে।

"জাতীয় বল কিংবা ব্যক্তিগত দৈহিক শক্তির সহিত সাম্রাজ্যের উত্থান এবং পতনের কোনও সম্বন্ধ নাই। ইজিপ্ট, ভারতবর্ষ, গ্রীস এবং রোম প্রভৃতি প্রদেশের পতন দৈহিক শক্তির অভাবে হয় নাই, মানসিক শক্তি হ্রাস পাওয়ায় ঐ সমস্ত দেশ এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। জাপান এতদিন পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের অভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। এক্ষণে আবার পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গে আসিয়া বুঝিতেছি যে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি না। এবং এই কারণেই আমরা ইউরোপ এবং আমেরিকার সভ্যতা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে আমরাও জাপানে বৈদেশিক শিল্প এবং বিজ্ঞান বিস্তার করিতেছি এবং ইহার সুফলও আমরা ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে।

"শিল্প এবং বিজ্ঞানক্ষেত্রে জাপান আশাতীত উন্নতি করিয়াছে। এবং এই জন্যই এক্ষণে আমরা বৈদেশিক Financial systemএর তত্ত্বানুসন্ধানে আসিয়াছি। কতিপয় বৎসরের মধ্যে আমরা সর্ব্ব-বিষয়ে যেরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছি এবং আমাদের জনসাধারণের যেরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে আমার খুবই ভরসা হয় যে অতি সত্বরই জাপান সভ্যজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

"এক্ষণে আমাদের মধ্যে বিবিধ মতাবলম্বী লোক বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ Radicals, কেহ Rapid Progessists, কেহ বা Conservatives। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা সভয়ে এবং অতি ধীরে ধীরে উন্নতির মার্গে অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই আকাঙ্ক্ষা এই যে সমাজের ও গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন ঘটিলে ইহাদিগকে অনেক পূর্ব্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। ইহাঁরা অনেক সময়ে অলীক অশুভ কল্পনা করিয়া অমূল্য সময় বৃথা কাটাইতেছেন।

"আমাদের মধ্যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোক থাকায় অনেকে ভাবিতে পারেন উহা আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমার মনে হয় যে উহাই আমাদের জাতীয় শক্তির উপাদান elements of strength) স্বরূপ; কারণ আমেরিকার শাসন প্রণালীর প্রতি দৃক্‌পাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে জনসাধারণের আন্দোলনের উপরই উহার শক্তি নির্ভর করিতেছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে যত বেশী বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক থাকে গবর্ণমেণ্টের শক্তি এবং সফলতা তৎপরিমাণে উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেরূপ বুঝিতেছি তাহাতে বোধ হয় সভ্যতা এবং উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিতে জাপানের আর বেশী দিন লাগিবে না। কারণ আমরা লোক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ধনাগমনের পথও প্রশস্ত করিয়া দিতেছি।

"আমার আশা হয় যে ভবিষ্যতে জাপান এবং আমেরিকার সম্বন্ধ এরূপ ঘনীভূত হইবে যে তাহারা একত্রে মিলিত হইয়া জগতের অন্যান্য জাতির মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য সমুদয় জাতিকে নৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ সমাজে পরিণত করিবে।"

উপরে প্রিন্স ইতো'র যে মন্তব্য লিখিত হইল তাহা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ দেখুন যে জাপানের উদ্দেশ্য কত সাধু! মহাত্মা ইতোর আশা ও ভরসা যে প্রতিপদে পূর্ণ হইবে বর্ত্তমান জাপানী জীবনে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। পৃথিবীর সমগ্র জাতি নিচয়কে একত্রীভূত করিতে হইলে এইরূপ একটী বিনয়ী জাতির যত্ন এবং চেষ্টা ফলবতী হইবার খুবই সম্ভব। অহঙ্কারী এবং উদ্ধত জাতির পক্ষে এরূপ সদনুষ্ঠান কখনই সম্ভবপর নহে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

স্বদেশজাত দ্রব্যে অনুরাগ নাই কাহার?

সর্দ্দি কাশী হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সিরাপ্ হাইপোফস্ফাইটস্ অফ্ লাইম বি, সি, পি, ডব্লিউ ব্যবহার করিবেন।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র।

আমাদের ঔষধ ব্যবহার করিবেন কেন?

কারণ, ১। ইহাই কেবল বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সুযোগ্য রাসায়নিক পরীক্ষক রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া ১৯০৭ সালের কলিকাতা শিল্প প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা-পত্র ও সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত। সুতরাং ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

২। ইহা দেশীয় উপাদানে স্বদেশী অর্থে ও স্বদেশী পরিশ্রমে আপনাদের হিতার্থ প্রস্তুত।

স্মরণ রাখিবেন—যখন আপনি বিলাতী বা বিদেশী ঔষধ ক্রয় করেন, তখন উহা অন্ততঃ ৩।৪ মাসের—সম্ভবতঃ আরও অধিক দিনের—পুরাতন প্রাপ্ত হয়েন—সুতরাং উহা আমাদের টাট্‌কা ঔষধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও হীনবীর্য্য।

৩। ইহা বিদেশী ঔষধ অপেক্ষা সুলভ অথচ উপকারিতায় শ্রেষ্ঠ। সর্দ্দি, কাশী, ব্রন্‌কাইটস্, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি যাবতীয় নূতন ও পুরাতন ফুস্‌ফুস্ রোগের একমাত্র অকৃত্রিম ও অব্যর্থ

মহৌষধ।

ব্যবহারে ফলের পরিচয় পাইবেন।

প্রস্তুতকারক—ভারতের একমাত্র স্বদেশী ঔষধের বৃহৎ কারখানা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড্।

৯১নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শীতের দিনে **কুন্তলীন** ব্যবহার করা
ত্বক ও কেশের জন্য একান্ত আবশ্যক।

শীতের শুষ্ক বায়ুতে শরীরের রস শোষণ করে তজ্জন্য ত্বক ও কেশ রুক্ষ হইয়া উঠে। বায়ুর এই শোষণ কার্য্য হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইলে আপনার কুন্তলীন ব্যবহার করা আবশ্যক। কারণ কুন্তলীনে বায়ুর এরূপ শোষণ কার্য্যের প্রতিষেধক পদার্থ বর্ত্তমান আছে। ইহা ব্যতীত শীতকালে বেশী তৈল ব্যবহার করিলে চুল বলিয়া সুগন্ধি তৈল ব্যবহার সকলের পক্ষে সুবিধা জনক হয় না। কিন্তু সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য কুন্তলীন সকলের সুবিধাজনক। কারণ

কি গুণে, কি পরিমাণে, কুন্তলীন সম মূল্যের অন্য তৈলের তিন শিশি তৈলের সমান।

আবার, অধিক তৈল ব্যবহারে শরীর, কেশ ও মুখশ্রী যেরূপ তৈলাক্ত মনে হওয়া সম্ভব, কুন্তলীনে সেরূপ হয় না এবং বস্ত্রাদি তৈলাক্ত হইয়া নষ্ট হয় না।

কুন্তলীনের মূল্য—প্রতি বোতল—১৲ টাকা।
তিন বোতল—২৷৵০। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

এইচ বসু, ম্যানুফ্যাক্‌চারিং পারফিউমার,
দেলখোস হাউস, ৬১।১ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬নং কলেজ-স্কোয়ার, সামা-যন্ত্রে, সেখ আবদুল লতিফ দ্বারা মুদিত ও প্রকাশিত।

বর্ষ। ফাল্গুন, ১৩১৫। ৮ম সংখ্যা।

সুপ্রভাত

"নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা
আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে
প্রাচীন রজনী নাশো
নূতন ঊষালোকে।"

শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি,এ সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৵০ টাকা।

আজ

ধনীর সুপ্রভাত ! গৃহীর সুপ্রভাত !

সৌখীনের সুপ্রভাত ! মহিলার সুপ্রভাত !

কারণ,

বঙ্গ-দেশের কারখানাজাত সাবানের মধ্যে

ন্যাশন্যাল সোপ

অভিনব শিল্পজগতে অভাবনীয় যুগান্তর ঘটাইয়াছে।

আকারে ও গন্ধের স্থায়িত্বে

ন্যাশন্যাল সোপ

বিলাতী সাবানকে পরাস্ত করিয়াছে !

মূল্যও যথাসম্ভব সস্তা করা হইয়াছে !!

তাই বলিতেছিলাম শিল্পজগতে আজ

সুপ্রভাত !

বাজারে সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য।

এ, বর্ম্মণ এণ্ড কোং।

পাইকারী বিক্রির বিপুল আয়োজন করিতেছেন, এই আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী জামার মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়াছেন।

টুইল সার্ট ৪ পকেট যুক্ত ডজন ৯৸০।

মাটিং সার্ট „ „ „ ১৩৵০।

সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশ-সেবক স্বর্গীয় রমাকান্ত রায় লিখিয়া গিয়াছেন।—

"এ, বর্ম্মণ কোম্পানী আমার সবিশেষ পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী উচ্চ শিক্ষিত কতিপয় ভদ্রলোক এই কোম্পানী স্থাপন করিয়াছেন। ইহাঁরা সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য এবং ভদ্রলোক ও ছাত্রমণ্ডলীর বিশেষ উৎসাহ পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।"

রমাকান্ত রায়।

সম্রান্ত পাইকারগণের উক্তি—

১। "আমি কোট, সার্ট, ট্রাউজার বউবাজারস্থ মেসার্স এ, বর্ম্মণ কোং হইতে ক্রয় করিতেছি। বাজারের দর হইতে ইহাঁদের দর সুলভ ; ইহাঁদের বস্ত্রাদি খাঁটি স্বদেশী বস্ত্রে প্রস্তুত ; আমি বলিতে পারি এই কোম্পানী TRUE PIONEER SWADESHI FIRM." কারবারে সাধুতা, সরলতা ও বিশ্বস্ততাই ইহাঁদের উন্নতির হেতু।

সেক্রেটারী, মেমীও কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স, ব্রহ্মদেশ।

"Itis the only reliable firm dealing in genuine swadeshi goods" "এ, বর্ম্মণ কোং একমাত্র বিশ্বস্ত খাঁটি স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবসায়ী। এই কেম্পানী বিলাতী মাল বর্জ্জন করিতে আমাদিগকে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।"

শ্রীবিপিনচন্দ্র বসু, বি, এ।
চাঁদপুর ট্রেডিং কোম্পানী।

রাণী।

বর্ত্তমান সম্রাজ্ঞী ও তাঁহার পুত্রের সচিত্র জীবন-চরিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ, প্রণীত।

অতি সুন্দর কাগজে এই পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি হাফটোন ছবি আছে। দ্বিতীয় সংস্করণে আরও নূতন ছবি দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকের সহিত বাঁধাইয়া রাখিবার উপযোগী অভিষেক পরিচ্ছদ সহ রাণীর সুন্দর প্রতিকৃতি একখানি দেওয়া যাইতেছে। এত পরিবর্দ্ধিত হইয়াও মূল্য পূর্ব্ববৎ ৵০ আনা রহিয়াছে। ভিঃ পিতে প্রত্যেক কাপি চারি আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী,
২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

(প্রথম ভাগ)

মূল্য এক টাকা মাত্র।

স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের গ্রন্থাবলী প্রথমভাগ সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত কেবলমাত্র এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে। ইহাতে অবকাশ রঞ্জিনী, পলাশির যুদ্ধ, রঙ্গমতী রৈবতক কাব্য এই কয়খানি পুস্তক আছে। পুস্তক গুলির মূল্য সাড়ে ছয় টাকার স্থলে কেবল মাত্র এক টাকা। সুন্দররূপে বাঁধান। অতি অল্প সংখ্যকই বিক্রয়ার্থ আছে।

ইউনাইটেড্ বেঙ্গল লাইব্রেরী
৪নং কলেজ স্কোয়ার।

মুখার্জ্জি ট্রেডিং কোম্পানী।

৩৭।২ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

আমরা সকল প্রকার স্বদেশী দ্রব্য, বস্ত্র, ষ্টেশনারী ইত্যাদি আমদানী করিয়া থাকি ও সুলভ মূল্যে সহরে ও মফঃস্বলে পাইকারী ও খুচরা সরবরাহ করিয়া থাকি। সর্ব্বপ্রকার স্বদেশী দ্রব্য অর্ডার মত অল্প সময়ের মধ্যে পাঠাইতে পারি।

ভদ্র মহোদয়গণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি ব্রিপণ ট্রেডিং কোং।

ষ্টেসনার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

৩৯নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বদেশী দ্রব্যের তালিকা।

মোজা, গেঞ্জি, তোয়ালে, ঝাড়ন, চিরুণি, ছুরি, কাঁচী, হোলডার, নিব, দোয়াত, কালী, পেন্সিল, কাগজ, টুথ পাউডার, টুথ ব্রাস, চিঠির কাগজ, খাম, হেয়ার ব্রাস, জুতার কালী, ক্রিম, ব্র্যাকো, এলুমিনিয়াম গেলাস, বাটী ইত্যাদি।

জবাকুসুম, কেশরঞ্জন প্রভৃতি সকল প্রকার কেশ তৈল।

পাউডার, পাফ্, ফিতে, সাবান, সেণ্ট, তাস, বাতি, চায়ের বাটী, চামচ, শাঁখা, আলুর চুড়ি, মহিষের সিঙ্গের চুড়ি, আয়ভরি বোতাম, তালা, আয়না, আল্‌তা, গোলাপ জল, কেওড়া, আতর প্রভৃতি আর আর সকল প্রকার স্বদেশী জিনিস সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। মফঃস্বলের ক্রেতাগণের নিকট অন্ততঃ সিকি মূল্য অগ্রিম লইয়া ভিঃ পিতে মাল পাঠান হইয়া থাকে।

স্বদেশ-সেবকগণের একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ক্রেতার নূতন লাভ।

হোপ এণ্ড কোং।

স্বদেশী ডিলার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

বিবরণ জ্ঞাত হইবার জন্য কার্ড লিখুন।

৮৮।৫।৬ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সাবধান—বড়ই অনুকরণ চলিতেছে।

যৌবনের অত্যাচার বশতঃ অকাল-বার্দ্ধক্য ধারণাশক্তির অভাব ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে

অশ্বগন্ধা ওয়াইন

নাম করিয়া চাহিবেন এবং "রেজিষ্টার্ড শৃগাল মার্কা" লেবেলযুক্ত বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইবেন নতুবা সম্পূর্ণ প্রতারিত হইবেন।

শরীরে নব বল ও স্বাস্থ্য পুনরানয়নে এবং নিস্তেজ পেশী স্নায়ুমণ্ডল সবল করিতে আমাদের শৃগাল মার্কা অশ্বগন্ধা ওয়াইন অমোঘ শক্তিশালী মহৌষধ। ৪ আউন্স শিশি ১৲ টাকা। ডজন ১১৲ টাকা, পাউণ্ড ৩॥০ টাকা।

জারজিনা

বা

কম্পাউণ্ড আইওডাইড সালসাপ্যারিলা এণ্ড গোল্ড।

রক্তদুষ্টি, বাতরক্ত তজ্জনিত নানাবিধ উপসর্গ, ক্ষত, হস্ত পদাদিতে কাল কাল দাগ অথবা চর্ম্ম উঠা, প্রভৃতি আমাদের এই জারজিনা বা স্বর্ণাদি ঘটিত সালসা সেবনে অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। ৪ আউন্স শিশি ১৸০ আনা ডজন ২০৲ টাকা, পাউণ্ড ৬॥০ টাকা। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

শিরঃপীড়া ও যাঁহারা মাথাধরা ও অতিরিক্ত শ্রমের জন্য সর্ব্বদা অনিদ্রা রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের মস্তিষ্ক শীতল রাখিবার ও সুনিদ্রা হইবার একমাত্র উপকরণ। ইহা ব্যবহারে কেশগুচ্ছ কোমল, মসৃণ এবং ঘন ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং মাথার খুস্কি, মরা মাস কেশদাদ প্রভৃতি দূর হইয়া কেশের মূল দৃঢ় হয় ও রীতিমত ব্যবহারে কেশের অকাল পক্বতা ও অকাল পতন নিবারিত হয়। অধিকন্তু ইহার গন্ধ স্নানের পর পর্য্যন্ত থাকে। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা, ডজন দশ টাকা। সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

ম্যানেজার—এস, এন, বসু।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস

১নং হোগলকুড়িয়া, সিমলা পোষ্ট আফিস, কলিকাতা।

কমলালয়।

দেশী জামা।

অল্প লাভে উৎকৃষ্ট ছাঁট কাট যুক্ত খাঁটী দেশী জামা ও গেঞ্জী মোজা প্রভৃতি বিক্রয় হয়। অর্ডার সত্বর সরবরাহ হয়।

৫নং কলেজ-স্কোয়ার,
ব্রাঞ্চ—৭৯।২নং হ্যারিসন রোড,
(ঠনঠনিয়ার মোড়),
কলিকাতা।

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
১। নবাবী আমলের হিসাবনিকাশ—	শ্রীহুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী	২৮৩
২। হিন্দুশাস্ত্রে মিসর দেশ—	শ্রীকুঞ্জবিহারী হার ...	২৯০
৩। বোপদেব-প্রসঙ্গ—	শ্রীসীতারাম গণেশ দেউস্কর	২৯১
৪। মহাপ্রয়াণ (কবিতা)—	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩০৪
৫। জাপানের কথা—	শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত ...	৩০৬
৬। সেখ সাদি—	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ...	৩১১
৭। মহতের স্মৃতি (কবিতা)—	শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	৩১২
৮। রাণীক দেবী—	শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন	৩১৩
৯। মালদহের শিল্প ইতিহাসের উপাদান—	শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ ...	৩১৮

ছবির সূচী।

১। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস।
২। রাণী সিপ্রিকা মস্‌জিদ [আহাম্মেদাবাদ]

নূতন পুস্তক

মেরী কার্পেণ্টার।

শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র বি,এ, প্রণীত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ মেরী কার্পেণ্টারের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। ইহাতে মেরী কার্পেণ্টারের একখানি প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। মূল্য চারি আনা মাত্র। শিক্ষিতা বঙ্গ রমণিগণের নিকট মেরী কার্পেণ্টারের নাম সুপরিচিত, প্রত্যেক বঙ্গমহিলার এই পরোপকারিণী ভারতবন্ধু মেরী কার্পেণ্টারের জীবনী পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উপহার দিবার উপযুক্ত পুস্তক।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শিখের বলিদান ও মেরী কার্পেণ্টার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ। তাহাদের বিষয় যদিও বিভিন্ন, কিন্তু উভয়েই উন্নত ও পবিত্র ভাব উদ্বোধক।

মজুমদার লাইব্রেরী,
২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স

দন্ত চিকিৎসক, দন্ত নির্ম্মাতা ও চসমা নির্ম্মাতা।
২৭নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এখানে দন্ত রোগের চিকিৎসা হয় ও নানাবিধ দন্ত রোগের ঔষধ পাওয়া যায়।

আমাদের পাথরের দন্ত ও চসমা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুলভ ইহা আমাদের কথা নয়; সাধারণের। পাথরের দন্ত দ্বারা উত্তমরূপে চিবাইয়া আহার করা যায় ও বিশুদ্ধভাবে কথা কহা যায়, আমরা সে জন্য দায়ী।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চসমা দেওয়া হয়; সর্ব্ব প্রকার চসমা ও ফ্রেম পাওয়া যায়।

সোণার ফ্রেম বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।
ব্রাঞ্চ—২৪নং রসারোড নর্থ ভবানীপুর।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস।

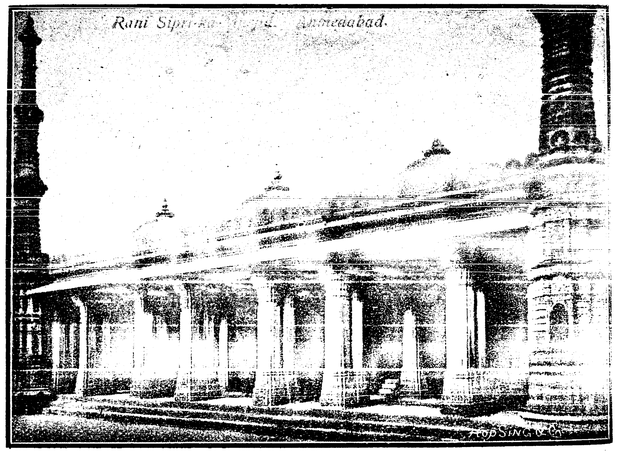

রাণী সিপ্রিকা মস্‌জিদ [আহাম্মেদাবাদ]

সুপ্রভাত

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

দ্বিতীয় বর্ষ। | ফাল্গুন, ১৩১৫ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

নবাবী আমলের হিসাবনিকাশ।*

নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে টাকায় আট-মণ চাউল বিক্রয় হইত। ডাক্তার বাউটন্ নবাব কন্যাকে আরোগ্য করিয়া পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজ বণিকের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রার্থনা করেন। কৃতজ্ঞ নবাব যখন সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তখন বোধ হয় তিনি সুদূর ভবিষ্যৎ ভাবিতে পারেন নাই। তার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন মুরশিদ্ কুলি খাঁ বাংলার নবাব ছিলেন, তখনও টাকায় পাঁচ মণ চাউল বিক্রয় হইত; যাহার মাসিক আয় এক টাকা মাত্র ছিল, সেও তখন দুই বেলা পোলাও কালিয়া খাইয়া নিশ্চিন্তমনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত।

মুরশিদ কুলী খাঁ দেশরক্ষী সৈন্যদলের ব্যয় কমাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে বিদেশে শস্য রপ্তানী হইত না। যে সকল কর অথবা শুল্ক প্রদান করিতে প্রজার কষ্ট হইত তিনি সে গুলি উঠাইয়া দিতেন। তিনি জায়গীর ভূমির উপর 'ওয়াজেসাৎ খাসনবিশী' নামক এক প্রকার আব্‌ওয়াব্ ধার্য্য করেন। তাহার আয় বার্ষিক ২, ৫৮,৮৫৭ টাকা ছিল। নবাব সুজাখাঁ চারি প্রকার আব্‌ওয়াব্ নির্দ্ধারিত করেন; যথা,—

আব্‌ওয়াবের নাম.	বার্ষিক আয়
নজর্ আনা মোকারেরি	৬,৪৮,০৪০ টাকা
সারেফ্ মাথট্	১,৫২,৭৮৬ "
মাথট্ পীলখানা	৩,২২,৬৩১ "
ফৌজদারী	৭,৯০,৬৪৮ "

আলীবর্দ্দী খাঁ যখন সরফরাজ্ খাঁকে পরাস্ত করিয়া মুরশিদাবাদে প্রবেশ করেন, তখন তিনি রাজকোষে নগদ ৭০ লক্ষ টাকা ও মণিমুক্তা প্রভৃতিতে পঞ্চাশ ক্রোর টাকা মজুত পাইয়াছিলেন।

* (শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'মস্‌নদ অব্ মুরশিদাবাদ' নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

তাঁহার আদরের দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলার বাজে খরচের জন্য তিনি ২২,২৫,৫৫৪ টাকা আব্‌ওয়াব্ ধার্য্য করেন।

আব্‌ওয়াবের নাম	বার্ষিক আয়
চৌথমারহাট্টা	১৫,৩১৮১৭ টাকা
অহক এবং কিস্ত্‌গেড়,	১,৯২-১৪০ „
নজরানা মনসুরগঞ্জ *	৫,০১,৫৯৭ „

আলীবর্দ্দী মহারাট্টাগণকে বার লক্ষ টাকা 'বৌখ' স্বরূপ প্রদান করিতেন।

হীরাঝিলের অন্তর্গত যে 'এমতাজমহল' সিরাজদ্দৌলার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তাহাতে আজকালকার ইউরোপীয় তিনজন সম্রাট স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন।

পলাশী যুদ্ধের পরে ক্লাইভের প্রাইভেট্ সেক্রেটরী ওয়াল্‌স্, কাসিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ লুসিংটন, কেরাণী রামচাঁদ, মুন্সী নবকৃষ্ণ প্রভৃতি রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন ১৭৬০০০০ রৌপ্য মুদ্রা, ২৩০০০০০ স্বর্ণমুদ্রা ও আট সিন্দুক স্বর্ণ এবং বহুমূল্য প্রস্তর ও মণিময় অলঙ্কারাদি সঞ্চিত আছে। অন্তঃপুরের রত্নভাণ্ডারে ৮০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ছিল। এতদ্ব্যতীত সিরাজ ও তাঁহার পত্নী লুৎফউন্নিসা পলায়ন করিবার সময় দুই তিন ক্রোর টাকার ধনরত্ন সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই বিপুল ধন-ভাণ্ডারের তখন কেহ মালিক ছিল না সুতরাং অবাধে লুণ্ঠন আরম্ভ হইল। নবাবের নেওয়ারা বিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী নৌকা বোঝাই করিয়া তখনই কলিকাতায় ১ কোটি,২০ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে মীরজাফরের নিকট ইংরাজের যাহা পাওনা ছিল, তাহা ক্লাইভ যখন কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া দাবী করিয়া বসিলেন, তখন হতভাগ্য মীরজাফরের দুরদৃষ্টবশতঃ সমস্ত অর্থের সংকুলান হইল না। এইখানেই বাংলার গদি লইয়া ইংরাজের নূতন ব্যবসা করিবার সুযোগ হইয়া গেল। এতদিন ইংরাজ বণিক অবাধ বাণিজ্যের দ্বারা দেশবাসীর অর্থ লইতেছিলেন; এখন হইতে নবাব ভাণ্ডারের ধনরত্ন তাঁহাদের জন্য ব্যয়িত হইতে লাগিল। মীরজাফরের প্রথম নবাবী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যয়ের আরম্ভ হয়। ইংরাজেরা ৩৩,৮৮,৫৭৫ পাউণ্ড পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ্যে স্বীকার করেন। আমরা নিম্নে একটী হিসাবের তালিকা উদ্ধৃত করিলাম;—

	পাউণ্ড
গবর্ণর ড্রেক্ সাহেব	৩১,৫০০
কর্ণেল ক্লাইভ	২,৩৪,০০০
ওয়াট্‌স্	১১৭০০০
মেজর কিল পেট্রিক	২৭০০০
ঐ (প্রাইভেট্ দান)	৩৩৭৫০
ম্যানিংহাম্ সাহেব	২৭০০০
বিচার সাহেব	২৭০০০
কাউন্সিলের ছয় জন সভ্য	৬৮১০০
ওয়াল্‌স্	৫৬২৫০
স্ক্রাফ্‌টন্	২২৫০০
লুসিংটন	৫৬২৫
কাপ্তান গ্রাণ্ট	১১২৫০
আর্মি ও নেভির অঙ্গীকৃত	৬০০০০০
	১২৬১০৭৫ পাঃ
কোম্পানীর অপরাপর ব্যয়, কর্ম্মচারিগণের ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ	১৮০০০০০ পাঃ
মোট	৩০৬১০৭৫ পাঃ

* এই সম্বন্ধে একটী কৌতূহলপ্রদ ঘটনা আছে। সিরাজদ্দৌলা হিরাঝিলের প্রাসাদে মাতামহকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। আলীবর্দ্দী অমাত্য ও অনুচরবর্গ সহিত দৌহিত্রের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া যখন প্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষগুলি দেখিতেছিলেন তখন সিরাজদ্দৌলা কৌশলপূর্ব্বক বৃদ্ধকে এক কুঠরীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলেন। সিরাজ বলিলেন "আমার হীরাঝিল রক্ষণের জন্য একটা করস্থাপনের অঙ্গীকার করিলে আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।" বৃদ্ধ আলীবর্দ্দী সিরাজের কোন আব্দার সম্পূর্ণ রাখিতেন না। তিনি মনসুরগঞ্জ নামক এক বাজার স্থাপনের অঙ্গীকার করিলেন এবং তাহার খাজানা হইতে হিরাঝিল রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করিবেন এই অঙ্গীকার করিয়া মুক্ত হইলেন, এই নূতন করের নাম নজরানা মনসুরগঞ্জ।

মীরণের জন্য ক্লাইব মাসিক ৬০০০ টাকার একটী বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

ইংরাজের দেনা পরিশোধ করিতে অক্ষম হওয়ায় মীর জাফর রাজ্যচ্যুত হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে আরও কতকগুলি অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল। এই সুযোগে ইংরাজগণ মীর কাসিমের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইলেন। নবাবী গ্রহণ করিতে মীর কাসিমের কত ব্যয় হইয়াছিল, নিম্ন লিখিত হিসাব দৃষ্টে তাহা জানিতে পারা যাইবে।

	পাউণ্ড
মিঃ সাম্‌নার	২৮০০০
হল্ ওয়েল্	৩০৯৩৭
ম্যাক গুয়ার	২০৬২৫
স্মিথ	১৫৩৫৪
মেজর ইয়র্ক	১৫৩৫৪
জেনারেল কালিয়ড	২২৯১৬
ভান্‌সিটার্ট	৫৮৩৩৩
ম্যাক্ গুয়ার পাঁচ হাজার সোণার মোহর	৮৭৫০
	২০০২৬৯ পাঃ
ক্ষতিপূরণ	৬২৫০০ „
মোট	২৬২৭৬৯ পাঃ

মীর কাসিম নবাব হইয়া নানা উপায়ে ব্যয় হ্রাস ও আয় বৃদ্ধি করিয়া ইংরাজের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করেন। তিনি চারি প্রকার আব্‌ওয়াব্ ধার্য্য করেন:—

আব্‌ওয়াবের নাম।	বার্ষিক আয়।
কিফাইৎ হাস্তাবুধ	১৪৭২৫৯৯ টাকা
সারেফ্ সিক্কা দেড় আনা।	৪৫৩৪৮৮ „
কিফাইৎ ফৌজদারান	৩৮৭৪২৩৯ „
তৌফির জায়গীর দারাণ	১৮৮১০১৪ „

মীর কাসিমের সময়ে সর্ব্ব প্রকার খরচ মাত্র চারি লক্ষ টাকা বাদে প্রায় আড়াই কোটী টাকা রাজস্ব স্থিত থাকে।

এই সময়ে ইংরাজের মধ্যে দুই দল হয়। মীর জাফরের পক্ষে আয়ারকুট্, আমিয়ট্, কার্ণারড, এলিস, ব্যাট্‌সন ও ভেরেলষ্ট্; আর মীর কাসিমের পক্ষে হলওয়েল, ভ্যান্সিটার্ট, হেষ্টিংস প্রভৃতি ছিলেন। বাণিজ্যের শুল্ক লইয়া যখন মীর কাসিমের সঙ্গে ইংরাজের বিবাদ হয় এবং নবাব যখন বাধ্য হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তখন দুই দল এক হইয়া মীর জাফরকে নবাবী পদে পুনঃ স্থাপিত করিতে চেষ্টা করে।

আমিয়ট্ প্রস্তাব করিলেন যে, মীর কাসিম নবাবী গ্রহণ করিবার সময় কলিকাতার গবর্ণর ও কৌন্সিলের মেম্বরগণকে যে বিশ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই টাকা দাবী করা হউক। মীর কাসিম প্রত্যুত্তর করিলেন, "কাহারও নিকট আমার একটি মুদ্রাও ঋণ নাই, এবং আমি আপনাদের দাবী পরিশোধ করিব না।"

মীর কাসিমের শোচনীয় পরিণাম সকলেই অবগত আছেন। রামচাঁদ মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনের কেরাণী ছিলেন; তিনি মৃত্যুকালে ৭২০০০০ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। নবকৃষ্ণ মাসিক দুই শত টাকা বেতনে মুন্সী ছিলেন। তিনি আপনার মাতৃ শ্রাদ্ধে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। আর বাংলার নবাব মীর কাসিম নির্জ্জন পর্ণকুটীরের ভূমিশয্যায় অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত একমাত্র সম্পত্তি এক জোড়া শাল বিক্রয় করিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কোনরূপে সমাধা হয়!

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মীর জাফর আবার নবাব হইলেন। ঐ বৎসর ১০ই জুলাই যে সন্ধি হয়, তদনুসারে ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন চাকলা প্রদান করা হইল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন কেবল লবণের উপর শতকরা ২৷৷০ টাকা শুল্ক নিরূপিত হইল। তৎপরিবর্ত্তে কোম্পানী পূর্ণিয়ার উৎপন্ন সোরার অর্দ্ধেক ও সিলেটে উৎপন্ন চুণের অর্দ্ধেক

অংশ পাইলেন। কলিকাতায় ইংরাজের টাকশালে প্রস্তুত মুদ্রা মুরশিদাবাদের সিক্কার মত বাট্টা ব্যতীত প্রচলিত হইল। এবারেও ইংরাজ নিম্নলিখিত হিসাবমত আপনাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া লইলেন;—

	পাউণ্ড
আর্মি ও নেভীর অঙ্গীকৃত	২৯১৬৬৬ ১৪৫৮৩
	৪৩৭৪৯৯
ক্ষতিপূরণ	৯৭৫০০০
মেজর মনরো ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ	৩০০০ পাউণ্ড ৩০০০ পাউণ্ড
সর্ব্বশুদ্ধ	১৪১৮৪৯০

ঐতিহাসিকগণ মীর জাফরকে 'ক্লাইভের গর্দ্দভ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ক্লাইভ মীর জাফরের 'নয়নের আলো' (নুর চশম) ছিলেন।*

মীর জাফর মৃত্যু সময় ক্লাইবের নামে পাঁচ লক্ষ টাকা ও অনেক মোহর এবং মনিময় অলঙ্কারাদি উইল করিয়া পত্নী মনিবেগমের হস্তে অর্পণ করেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল ক্লাইব এই অর্থদ্বারা ইউরোপীয় কর্ম্মচারী বৃদ্ধ ও রুগ্ন সৈনিক পুরুষ এবং তাহাদের দরিদ্র বিধবা পত্নীগণের সাহায্যের জন্য এক তহবিল স্থাপন করেন। বাংলাদেশে ক্লাইব যে অর্থ ও সম্পত্তি করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার বার্ষিক চল্লিশ হাজার পাউণ্ড আয় হইত।

মীর জাফরের পুত্র নজামুদ্দৌলা পিতার সন্ধি বহাল রাখিতে স্বীকৃত হইয়া নবাবী গ্রহণ করেন। তাঁহাকে কলিকাতা কাউন্সিলের মেম্বারগণকে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড প্রদান করিতে হইয়াছিল। তাহার এইরূপ একটা হিসাব পাওয়া যায়,—

	পাউণ্ড—
মিঃ স্পেন্সার	২৩৩৩৩
প্লেডেল, বার্ডেট, গ্রে	৩৫০০০
মিঃ জনষ্টোন্	২৭৬৫০
„ লিসেষ্টার	১৩১২৫
„ সিনিয়ার	২০১২৫
মিঃ মিডল্টন্	১৪২৯১
„ জি, জনষ্টোন্	৫৮৩৩
মোট	১৩৯৩৫৭

ফ্রান্সিস্ সাইক্স নবাব দরবারের রেসিডেণ্ট স্বরূপ মুরাদবাগে উপস্থিত হইয়া নজামুদ্দৌলাকে কহিলেন "আপনি বার্ষিক আঠার লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কেন একদল সৈন্য পোষণ করিতেছেন? আমরা আমাদের সৈন্য দিয়া আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। আপনার এই সকল সিপাহী বরখাস্ত করিয়া দিন। যুদ্ধ বিগ্রহের হাঙ্গামা কি আপনার পোষায়? আপনি আমাদের নিকট হইতে একটা বৃত্তি গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নবাবী করুন।"

সাহেবের কথায় বালক নজামুদ্দৌলা সম্মত হইলেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের সন্ধি অনুসারে নবাব বার্ষিক ৫৩৮৬১৩১ টাকা ৯ আনা বৃত্তি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তন্মধ্যে ১১৭৮৫৪ টাকা এক আনা সাংসারিক খরচের জন্য এবং ৩৬০৭২৭৭ টাকা আট আনা নবাবের পদমর্য্যাদা রক্ষার ব্যয় স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইল। মহম্মদ রেজা খাঁ দেওয়ান সুবা নিযুক্ত হইলেন। নিম্নলিখিত কয়েকটী বৃত্তি বিতরণের ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হইল।

নবাবের ভ্রাতা সারেফ্উদ্দৌলা	মাসিক	৭০০০ টাকা
ঐ মোবারকউদ্দৌলা	„	৫০০০ „
মীরণের পুত্র	„	৫০০০ „
বেগম এবং তাঁহার পরিবার বর্গ	„	৬০০০ „

যতদিন পর্য্যন্ত বৃহৎ সৈন্যদল রাখা প্রয়োজন

* ছয় বৎসর পূর্ব্বে ক্লাইবের পঞ্চম পুরুষ লর্ড পাউইস্ (Powis) মুরশিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব আলীকাদের বাহাদুর মীরজাফরের সপ্তম পুরুষ। লর্ড পাউইস্ মীরজাফরের চিত্র দেখিয়া সহজ জ্ঞানেই বলিয়া উঠিলেন "That I think is Meerjaffer." বলা বাহুল্য তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও মীরজাফরের চিত্র দেখেন নাই।

বিবেচিত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কোম্পানীকে বার্ষিক আরও পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে নজামুদ্দৌলা স্বীকৃত হন। বলা বাহুল্য পূর্ব্ব সন্ধি অনুসারে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন প্রদেশও কোম্পানীর অধিকারে রহিল।

সাইক্স্ নবাবের নিকট হইতে ১০৬ খানি সুবিধাজনক পরওয়ানা স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন, তাহাতে জমিদারেরা সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর অধীন হইয়া পড়িলেন।

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ পুনরায় আসিয়া দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বাংলার রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া সৈন্যের ব্যয় ও নিজামতের খরচবাদে যাহা থাকে তাহা দিল্লীর সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ—ইহাতে আপত্তি করেন। এই সম্বন্ধে তাঁহারা ১৭৬৬ অব্দের ৭ই মে তারিখে কলিকাতা কাউন্সিলে যে পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম এইঃ—"বাঙ্গালীর সহিত চতুরতায় ইংরেজ আটিয়া উঠিতে পারিবে না। বর্দ্ধমানের খাজানা আদায় করিতে যাইয়া আমাদিগকে যেরূপ গোলমালে পড়িতে হইয়াছে, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গালীর নিকট হইতে খাজানা আদায় করা ইংরাজের কর্ম্ম নহে। নবাবের কর্ম্মচারিগণই পূর্ব্বের মত খাজানা আদায় করুক। দেওয়ানী সনন্দ অনুসারে আমাদের কলিকাতা কাউন্সিলের গবর্ণর ও মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন; এবং সংগৃহীত রাজস্ব কি ভাবে ব্যয়িত হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিবেন। মোটামুটিরূপে বলিতে গেলে নবাবের রাজকোষ হইতে কোম্পানীর ধনভাণ্ডারে খাজানা লইয়া আসা আমাদের দেওয়ানীর প্রধান কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করি।" যাহা হউক সম্রাট সাহ আলম্ এলাহাবাদে আসিলেন। নজামুদ্দৌলার প্রতিনিধি স্বরূপ ক্লাইভ ও কার্ণাক মুর্শিদাবাদ হইতে এলাহাবাদে গেলেন। সম্রাট্ সন্তুষ্টচিত্তে সনন্দ লিখিয়া দিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন খাঁ এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "অন্য কোন সময় হইলে এতবড় একটা কাজ সম্পন্ন করিতে হইলে ইংলণ্ডেশ্বর ও কোম্পানীর মধ্যে অনেক পরামর্শ, এবং উভয় পক্ষ হইতেই অভিজ্ঞ রাজদূত প্রেরণের প্রয়োজন হইত। রাজমন্ত্রীগণের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক এবং বিচারের পর ইহার মীমাংসা সম্ভব হইত। কিন্তু একটা গো, মহিষ কিম্বা মেষ বিক্রয় যত সহজে ও শীঘ্র হইয়া যায় তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে ও একপ্রকার বিনা আয়াসেই বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণের ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল।"

এতদুপলক্ষে ক্লাইভ যে উৎসবের আয়োজন করেন তাহাতে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। নিম্নে তাহার একটা হিসাব প্রদত্ত হইল।

একটা বৃহৎ দরবার গৃহ নির্ম্মান	৪৮৫৩ টাকা
বন্য পশুর আহার এবং তাহা দের লড়াই এবং স্থান নির্ম্মাণ বাবত	৩৮৪ „
বাজী পোড়াইবার খরচ	১২১৭৯ „
বন্য পশুর রক্ষকগণের বক্সিস ইত্যাদি	২৪২৬ „
তিনটী প্রকাশ্য ভোজের ব্যয়	৩৯২৭ টাকা
পাণীয় মদ্যের খরচ	৫৪০১ „
মোট	২৯ ২২০ টাকা

১৭৬৬ খৃঃ অব্দের ২৯শে এপ্রিল মতিঝিলের প্রাসাদে দেওয়ান্ কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলার মস্নদ তখ্ত মোবারকের * উপর দেওয়ান ক্লাইভ ও নজিম নজামুদ্দৌলা পাশাপাশি বসিয়াছিলেন।

৫৩ লক্ষ টাকা বৃত্তির পরিবর্ত্তে নবাব বাংলার মোট রাজস্ব তিন কোটী ত্রিশলক্ষ টাকা হারাইলেন!

পুণ্যাহ উৎসবের এক সপ্তাহ পরেই নজামুদ্দৌলার মৃত্যু হয়!

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজগণ যত টাকা পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার

* লর্ড কর্জ্জন মুরশিদাবাদ অবস্থান কালে মোবারক মঞ্জিল প্রাসাদে এই মস্নদের উপর বসিয়াছিলেন। সম্প্রতি উহা কলিকাতার মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

করেন এবং যত টাকা পাইয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

	পাউণ্ড
উপহার স্বরূপ (Present)	২১৬৯,৩৬৬
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ	৩৪২০৮৩৩
সামরিক ব্যয় বাবত	৫৪০২৩৩৩
সর্ব্ববিধ খরচ বাদে রাজস্বের পরিমাণ	১৮৪৯০৩৮২
মোট—	২৯৪৮২,৯১৩

মনিবেগমের নিকট হইতে ক্লাইভ্ ৮৭৪৯৯৫ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে নবাব সায়েস্তাদ্দৌলার সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে বৃত্তির পরিমাণ কমিয়া ৪১৮৬,১৩১ টাকা ৯ আনা হইল। তন্মধ্যে ১৭৭৮৫৪ টাকা এক আনা পারিবারিক খরচের জন্য এবং ২৪০৭২৭৭ টাকা ৮ আনা নবাবের নিজ পদগৌরব রক্ষার্থ নির্দ্ধারিত হইল। দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমকে ২১৬৬৬৬ টাকা ১০ আনা ৯ পাই প্রদান করিতে কোম্পানী সন্ধিপত্রে প্রতিশ্রুত হইলেন।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে নজামুদ্দৌলা কোম্পানীকে যে ১৬ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছিলেন- তাহার তিন লক্ষ টাকা কোম্পানী পরিশোধ করিলেন। অবশিষ্ট তের লক্ষ টাকা ইংরেজের সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত হইল। মীরজাফর ক্লাইভের নামে যে পাঁচলক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টান্তের অনুকরণে নবাব আপনার প্রাপ্য তের লক্ষ টাকা কোম্পানীর হাতে অর্পণ করিয়া বদান্যতায় পিতাকেও অতিক্রম করিলেন; এদিকে দুর্ভিক্ষের পীড়নে বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিল!

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের পুণ্যাহ উৎসবে ভেরেলষ্ট নবাবের দক্ষিণে উপবেশন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ২১৬,৮৭৬ টাকা মূল্যের খেলাত বিতরিত হয়। তন্মধ্যে কৌন্সিলের গবর্ণরের জন্য ৪৬৮৫০ টাকার খেলাত বিতরিত হয়।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পুণ্যাহ প্রথা রহিত করা হয়।

সাইফ্উদ্দৌলা ষোল বৎসর বয়সে নবাব হইয়াছিলেন; মোবারকউদ্দৌলা বার বৎসর বয়সে নবাব হইলেন। মহম্মদ রেজা খাঁকে কারারুদ্ধ করিয়া গবর্ণর হেষ্টিংস মণি বেগমকে নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। এবং মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে নিজামতের দেওয়ান করেন। নবাব মাতা বাসু বেগম জীবিত থাকিতে মণি বেগমকে কেন অভিভাবক করা হইল, এ সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক কারণ এ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হয় নাই। কাগজপত্র পরীক্ষা করিলে দেখা গেল, হিসাবের অনেক গোলমাল রহিয়াছে। মণি বেগমের কৈফিয়ৎ তলব করা হইলে তিনি প্রকাশ করিলেন যে, অনেক টাকা গবর্ণর হেষ্টিংস্কে দেওয়া হইয়াছে।

বিলাতে হেষ্টিংসের বিচারকালে পার্লিয়ামেণ্টে এই সকল উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উত্থাপিত করা হয়। আমরা সময়ান্তরে ভিন্ন প্রবন্ধে সেই সকল বিষয়ের বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিব।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২১এ মার্চ্চ তারিখের সন্ধি অনুসারে বৃত্তির পরিমাণ আরও কমিয়া ৩১,৮১,৯৯১ টাকা ৯ আনা হইল। তন্মধ্যে ১৫,৮১,৯৯১ টাকা ৯ আনা পারিবারিক খরচের জন্য এবং ষোল লক্ষ টাকা নবাবী পদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

ডাইরেক্টরেরা এত বেশী পেন্সন দিতেও আপত্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৭৭২ অব্দের জানুয়ারী মাসে বৃত্তির পরিমাণ আরও কমিয়া ষোল লক্ষ টাকা হইল।* এইরূপে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইল,

* ডাইরেক্টরগণের হুকুম লইয়া বৃত্তির পরিমাণ কমাইবার জন্য যখন হেষ্টিংস্ মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলেন তখন তাঁহার দৈনিক আহারের খরচ স্বরূপ নবাবকে ২০৮০ টাকা দিতে হইয়াছিল। তাঁহার সহকারী মিড্লটন ও ঐরূপ খরচ পাইতেন। তাঁহারা তথায় প্রায় তিন মাস ছিলেন সুতরাং নবাবের প্রায় তিনলক্ষেরও বেশী টাকা ব্যয় হয়। নবাবের বৃত্তির প্রায় এক চতুর্থাংশ সাহেবগণের খানাতেই খরচ হইয়া যায়। হেষ্টিংসের বিচারের সময় বার্ক যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি বলেন, "I believe that there is not a prince in Europe who goes to such expensive hospitality of

তদ্দ্বারা সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এক তহবিলের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বকালে বাংলার সুবাদারগণ সম্রাট প্রদত্ত যে জায়গীর ভোগ করিতেন, তাহার আয়ও ১৬ লক্ষ টাকার কম ছিল না।

পলাশী যুদ্ধের পর ৩০ বৎসরের মধ্যে দেওয়ানী ফৌজদারী, রাজস্ব সংক্রান্ত ও সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধীয় যাবতীয় ক্ষমতা কোম্পানীর হস্তগত হয়।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে ভাইকাউণ্ট ভেলেনটাইন্ নবাব বাবরজঙ্গ ও মণি বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করেন। নবাবের গায়ে বহুমূল্য মণিময় অলঙ্কারাদি ছিল। দরজায় নবাবের উত্তমর্ণগণকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন অলঙ্কারগুলি পাওনাদারের নিকট বন্ধক আছে। তিনি চলিয়া গেলেই আবার তাহারা সেগুলি লইয়া যাইবে!

মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুরের পিতা ফেরেদুনজা ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নবাবীপদ প্রাপ্ত হন।

১৬ লক্ষ টাকা বৃত্তির মধ্যে তিনি নিজের খরচের জন্য ৭॥ লক্ষ টাকা রাখিতে অনুমতি পাইলেন। বাকী ৮॥ লক্ষ টাকা হইতে পরিবারস্থ অপরাপর আত্মীয়গণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইবে এবং যদি ইহা হইতে কিছু টাকা বাঁচে, তবে তদ্দ্বারা নিজামত ডিপজিট ফণ্ড নামে এক তহবিল স্থাপিত হইবে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়।

১৮৫৩ অব্দের পর হইতে কোম্পানী প্রকাশ্য ভাবে নবাবের কতকগুলি সত্ব বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজামত ডিপজিট্ ফাণ্ডের কর্ত্তৃত্ব হইতেও নবাব অপসৃত হইলেন।

এই সকল অভিযোগের উল্লেখ করিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ফেরেদুনজা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় ১৮৬৯ অব্দে তিনি স্বয়ং বিলাত গমন করেন। পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার অভিযোগের বিষয় আলোচিত হয়; কিন্তু কোন প্রতীকারের বন্দোবস্ত হয় নাই।

ইতিমধ্যে অত্যধিক ঋণের দায়ে, মুরশিদাবাদের নিজামত সম্পত্তি নীলাম হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট ঋণ পরিশোধের ভার লইয়া সম্পত্তি আপনাদের জিম্মায় রাখিলেন।

নিরাশায় ভগ্নপ্রাণ ফেরেদুনজা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বৃত্তির উপর নবাব নাজিমি পদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ইচ্ছামত স্থানে বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

সিরাজদ্দৌলা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। ফেরেদুনজা বাংলার শেষ নবাব নাজিম। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ৫ই নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

আজ কোটী কোটী দুর্ভিক্ষ পীড়িত নিরন্ন প্রজার সহিত মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর নীরবে অশ্রুপাত করিতেছেন।†

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

splendour.....Yet it was in the midst of this galling duty, it was at that very moment of his tender sensibility, that from the collected morsels plucked from the famished mouths of hundreds of decayed, indigent and starving nobility, he gorged his ravenous maw with £200 a day for his entertainment..... he never dines with comfort, but where he is sure to create a famine. He never robs from the loose superfluity of standing greatness; he devours the fallen, the indigent, the necessitous. His extortion is not like the generous rapacity of the princely eagle who snatches away the living struggling prey: he is a vulture who feeds upon the prostrate, the dying and the dead."

* মৃত্যুর পরে জাফরগঞ্জে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার দেহ সমাহিত করিবার জন্য যখন লইয়া যাওয়া হইল, তখন দেখা গেল যে, যে পংক্তিতে নবাব নাজিমগণের কবর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই পংক্তিতে কেবল একটী মাত্র কবরের উপযোগী স্থান অবশিষ্ট আছে। অবশেষে তাঁহার দেহ আরবের অন্তর্গত কারবেলার সমাধি ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁহার কুড়িজনের অধিক স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার সন্তান সন্ততির সংখ্যা ১০১ জন। মৃত্যুকালে তাঁহার উনিশটী পুত্র ও বাইশটী কন্যা জীবিত ছিলেন।

† In charity he (Nabab Bahadur) gives and gives liberally; but silent tears trickle down his cheeks, because he feels he cannot give more." Musnad of Mursidabad page 60.

হিন্দুশাস্ত্রে নীলনদী, মিসর দেশ ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য প্রদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চন্দ্রীস্থান সম্বন্ধে পুরাণে নিম্নলিখিত উপকথার উল্লেখ আছে। একদা চন্দ্র ভারতবর্ষে পুরুষদেহ পরিহার করিয়া স্ত্রীরূপ ধারণ পূর্ব্বক নীলনদীর উদ্ভব স্থলের নিকটস্থিত হ্রদ সমূহের সন্নিহিত পর্ব্বতে লুকাইয়া ছিলেন। সূর্য্যের ঔরসে স্ত্রীরূপী চন্দ্রের গর্ভে তাঁহার কতকগুলি সন্তান জন্মে। পুলিনে অর্থাৎ নদীতীরবর্ত্তী সিকতাময় ভূমিতে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহাদের পুলিন্দ নাম হয়। চন্দ্র যে পর্ব্বতে লুকাইয়াছিলেন, সেই পর্ব্বত ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পর্ব্বত হইতে কতকগুলি নদী বহির্গত হইয়াছে। পুলিন্দগণ ঐ সমুদয় নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহারা চন্দ্র ও সূর্য্য ছাড়া আর কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন না।

চন্দ্রীস্থান।

শর্ম্মস্থান।

ইথিওপিয়া, আবিসিনিয়া ও আজান্ দেশের কিয়দংশ লইয়া শর্ম্ম দেশ গঠিত ছিল। উহার চতুঃসীমা ঠিক করিয়া নির্দ্দেশ করা এক্ষণে বড়ই দুরূহ ব্যাপার। শর্ম্মা শব্দ হইতেই এই দেশের নামকরণ হইয়াছে। শর্ম্মার বংশধরগণ মিসর দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া অজাগর পর্ব্বতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দেবসরোবরের নিকটে বসতি করিতে আরম্ভ করে। এককালে মিসর দেশে শনি ও রাহু অতি দুর্দ্দান্ত রাজা হইয়া উঠেন। প্রবাদ আছে দেবগণ তাহাদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পর্ব্বতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত এই যে, শর্ম্মার সন্ততিগণ বলিতে এই দেবগণকেই বুঝিতে হইবে।

শর্ম্মাগণ শান্তিপ্রিয় ছিল। কাহারও অনিষ্টাচরণ করিত না; তাহারা বন্যহস্তী শীকার করিত, হস্তিদন্ত বিক্রয় ও বিনিময় করিত এবং বন্যহস্তীর মাংসও ভক্ষণ করিত।

অবস্থিতি স্থল ও রাজধানী।

তাহারা রূপবতী নামে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। গ্রীকগণ এই নগরীকে র‍্যাপ্টা (Rapta) নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এতদনুসারে ইহার অধিবাসিগণকে র‍্যাপ্টি (Rapti) বা র‍্যাপ্সি (Rapsi) নাম দিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের ধারণা এই যে, ঐ দেশে র‍্যাপ্টি নামে কেবল একটি নগরই ছিল। কিন্তু ষ্টিফেনাসের (Stephanus of Byzantren) মত অন্যরূপ। ষ্টিফেনাস্ একজন গ্রীসিয় বৈয়াকরণিক ও অভিধান রচয়িতা। তিনি একখানা ভৌগোলিক অভিধান রচনা করিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন, "এই দেশে র‍্যাপ্টি নামে দুইটি নগর বিদ্যমান ছিল; তাহার একটি ইথিওপিয়ার রাজধানী আর অপরটি র‍্যাপ্টাস্ (Raptus) নামক নদীর মোহনাস্থিত বন্দরের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার অধিবাসিগণ সমুদ্রবক্ষে সর্ব্বদা বিচরণ করিত এবং পর্ণকুটীরে বাস করিত। এই উভয় র‍্যাপ্টির প্রথমটিই পুরাণ বর্ণিত রূপবতী, কারণ এই নগরী কালী নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া পুরাণে উল্লেখ আছে। দেব সরোবরের বর্ত্তমান নাম জাম্বার (Zambre) বা মরেভি (Moravi)। এই সরোবরের দক্ষিণ প্রান্তের নিকটেই রূপবতী নগরী অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই অনুমানের ভিত্তি এই;—ভৌগোলিক টলেমী বলিয়াছেন, নীলনদী যে হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়াছে র‍্যাপ্টি নগরী তাহারই নিকটে অবস্থিত এবং তিনি আরও বলেন যে নীলনদী উক্ত নগরী হইতে ১৩।১৪ ডিগ্রী দূরে স্থিত। জ্যাম্বার হ্রদটিও উত্তর দক্ষিণে ১৩।১৪

ডিগ্রি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নীলনদী উক্ত হ্রদেরই উত্তর প্রান্ত হইতে বহির্গত হইয়াছে। সুতরাং র‍্যাপ্টি নগর উক্ত হ্রদেরই অপরপ্রান্ত অর্থাৎ দক্ষিণ প্রান্তের নিকটে অবস্থিত। ভৌগোলিক টলেমী দেবসরোবরের নিকটে চিত্রিত মন্দির (Painted temple) নামে একটি পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ উক্ত পর্ব্বতে প্রস্তর গাত্রে খোদিত ও চিত্রিত মিশর দেশীয় চিত্রলিপি (hieroglyphic) ছিল তজ্জন্য উক্ত পর্ব্বতের ঐ আখ্যা হইয়াছিল। এইরূপ চিত্রলিপি আজ কালও মিসর দেশের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। দেবসরোবর ব্যতীত পদ্মবন নামধেয় আর একটি হ্রদের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত ভৌগোলিক বলেন যে এই পদ্মবন হ্রদের তীরে একটি প্রস্তরময় মূর্ত্তি আছে। জনপ্রবাদ এই যে একটি জীবন্ত মনুষ্যই কোনও গুরুতর পাপের শাস্তিস্বরূপ প্রস্তরময় হইয়া গিয়াছে।

ভুবনব্যাপী জলপ্লাবন হইতে সত্যব্রত কেমন অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পান মৎস্যপুরাণে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে এই সত্যব্রতের তিনটি পুত্র ছিল যথা জ্যাপতি, চর্ম্ম ও শর্ম্ম। চা'ম (cham) ও শাম (Sham) যথাক্রমে এই চর্ম্ম ও শর্ম্ম শব্দেরই অপভ্রংশ। এইরূপ অপভ্রংশ কোনও ক্রমেই অসম্ভব নয় কারণ কৃষ্ণ শব্দের অপভ্রংশ কিষণ্ শব্দের প্রয়োগ আমরা প্রায়ই দেখিতে ও শুনিতে পাইয়া থাকি। রাজা সত্যব্রত জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যাপতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর দিকস্থ সমুদয় রাজ্য তাহাকেই দান করেন। এই স্থলে হিমালয় বলিতে উত্তরদিকে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক পর্ব্বতশ্রেণীকে বুঝাইতেছে। ককাশশ পর্ব্বত উক্ত পর্ব্বতমালারই অংশ বিশেষ। রাজা হিমালয়ের দক্ষিণদিকস্থ সমুদয় স্থান শর্ম্মকে দান করিয়াছিলেন। কোনও সময়ে রাজা সত্যব্রতের মদিরাপানে মত্ততা ঘটে। তাহা দেখিয়া চর্ম্ম হাসিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি পিতার বিরাগভাজন হন, এবং পিতৃরাজ্য লাভে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে ভ্রাতৃগণের দাসানুদাস হইয়া থাকিতে হয়। কালক্রমে শর্ম্মের বংশধরগণ দীর্ঘকাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে নীল নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় উপনীত হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন মিশর দেশ কেবল কতকগুলি দুর্দ্দান্ত অসভ্য জনে পরিপূর্ণ, উহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থল নাই। উচ্ছৃঙ্খল অসভ্যজনে পরিবৃত হইয়া তাহাদিগের দলপতি নীলনদীর তটেই পদ্মাদেবীর তপস্যায় নিযুক্ত হন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া পদ্মাদেবী আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "এখানেই একটি মন্দির নির্ম্মাণ কর।" তৎক্ষণাৎ তাঁহারা মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। দুই ক্রোশ দীর্ঘ, এক ক্রোশ প্রশস্ত এবং এক ক্রোশ উচ্চ করিয়া মৃত্তিকার স্তূপ দ্বারা একটি বেদী নির্ম্মিত হইল। পদ্মা দেবীর নাম হইতেই এই মন্দিরের পদ্মা মন্দির ও পদ্মা মঠ এই দুইটি নাম হইল। মন্দির শব্দের অর্থ দেব গৃহ বা প্রাসাদ আর মঠ শব্দের অর্থ বিদ্যালয় বা ছাত্রাবাস। শেষোক্ত নামের সার্থকতা এই যে, এই মন্দিরে স্বয়ং পদ্মা দেবী তাহাদিগকে বিবিধ প্রয়োজনীয় বিদ্যা এবং যক্ষলিপি অর্থাৎ যক্ষগণের লিখন প্রণালী শিক্ষা দেন। শর্ম্মিকগণ মিসর দেশেই বরাবর বাস করিলেন না। কালক্রমে তাঁহারা মিসর দেশ পরিত্যাগ করিয়া অজাগর পর্ব্বতের নিকটে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। পুরাণে উল্লেখ আছে শনি ও রাহুর রাজত্বকালে দেবতাগণ পর্ব্বত শ্রেণীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আর দেবতাগণের অন্তর্গত বলিয়াই গণ্য হইয়াছেন। দেব নহুষ বা ডাইয়োনিসিয়াস (Dionysius)এর আক্রমণের ভয়ে ও দেবতাগণ পলাইয়াছিলেন বলিয়া একটি উপকথা প্রচলিত আছে।

শর্ম্মগণের সৃষ্টি ও নীলনদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন

মিসর দেশে বিব্‌লস্ (Byblos) নামে একটি নগর ছিল। পরে উক্ত নাম বাবেলএ (Babel) পরিণত হয়। গ্রীক ভাষায়ও বিব্‌লস্ 'Byblos) এই

নামটিই গৃহীত হয়। এই নগরই পদ্মা মন্দির বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। নীলনদীর বালবিটাইন্ (Baibitine) শাখা হইতে ক্যাটেমিক (Phatemic) শাখা পর্য্যন্ত একটি খাল আছে। এই খালের তীরেই উক্ত নগর অবস্থিত ছিল। Pentingenerian টেবলে উক্ত খালের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। পুরাণের স্থলবিশেষে উল্লেখ আছে কুমুদ্বতী নদীর তীরে পদ্মা মন্দির নির্ম্মাণ করিবার অল্পকাল পরেই শর্ম্মিকগণ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। কুমুদ্বতী নদীই বর্ত্তমান ইয়ু ফ্রেটস্। এই শর্ম্মিকগণই নীলনদীর তীরে উপস্থিত হইয়া পদ্মা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরদ্বয় অল্পকাল ব্যবধানেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। উভয় মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্যেই শর্ম্মিকগণ ব্যাপৃত ছিল, আর উভয় মন্দিরেরই একই সংস্কৃত নাম, ইহাতেই অনুমান হয় একই দেবতার পূজার জন্য এই উভয় মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার এদিকে নীল নদী ও ইয়ুফ্রেটিস্ এই উভয় নদীর তীরেই ব্যাবেল (Babel) নামধেয় নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমুদয় সামঞ্জস্য দর্শনে অনুমান হয় যে পূর্ব্বোক্ত পদ্মা মন্দির দ্বয়ের মধ্যে একটি ইয়ুফ্রেটিসের তীরস্থ ব্যাবেল (Babel), আর অপরটি নীল নদীর তীরস্থিত (Babel)। ইয়ুফ্রেটিসের তীরস্থ নগরটিই অপরটি হইতে পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে পুরাতন উপাসনাস্থলটি হতাদৃত হইয়া পড়ে। কাজেই প্রাচীন গ্রন্থকারগণের লেখায় পুরাতন Babelএর বড় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। মিসর দেশস্থিত পদ্মা-মন্দির সম্বন্ধে টিকেনাম লিখিয়াছেন এই মন্দির অতি দৃঢ় ছিল। ঐতিহাসিক যুসিডাইডিস্ এবং আরও কেহ কেহ বলিয়াছেন যে লিবিয়ার (Lybia) রাজা ইনেরান্ (Inarus) এই মন্দিরে অবস্থান করিয়াই মিসর দেশীয় ও অথিনীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে দেড় বৎসর কাল সমগ্র পারসীক সেনার অবরোধ সহ্য করিয়াছিলেন। মন্দিরটি জলাভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ভিত্তিটি সুবিস্তীর্ণ করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। তবে পুরাণে উহার যে বিশাল আয়তনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে উহা কাব্য সুলভ অত্যুক্তি বই আর কিছুই নহে।

পদ্মা মঠের নিকটে নীল নদীর যে তিনটি বড় বড় শাখা আছে তাহার একটিকে টলেমী প্যাঠমেটি (Pathmeti) নাম দিয়াছেন এবং ডাইয়োডোরাস ফ্যাটমি (Phatmi) নাম দিয়াছেন। এই উভয় শব্দই সংস্কৃত পদ্ম শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে, কারণ ভারতবর্ষেরই স্থান বিশেষে পদ্ম শব্দ পদম্ ও পতমরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। আবার প্রাচীন মিশরে Phthembathi অথবা Phthemmuthi নামে একটি প্রদেশ ছিল। এই নামটিও পদ্ম শব্দ হইতেই আসিয়াছে। এই শেষোক্ত অনুমানের ভিত্তি এই যে পদ্মা মন্দির বা পদ্মামঠ পূর্ব্বে Prosapitis নামক প্রদেশের অন্তর্গত ছিল কিন্তু আবার Prosopotis ও Phthemmuthi প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং এই পদ্মা মন্দির বা মঠের নাম হইতেই উহা যে প্রদেশে অবস্থিত ছিল তৎপ্রদেশের নাম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। আবার সমগ্র মিশর দেশটির এক নাম পটামিটিস (Potamitis); এই নামের বুৎপত্তিগত অর্থ এই যে Potamosএর উভয়তীরস্থিত দেশ। আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে Potamos শব্দের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বুৎপত্তিগত অর্থ বড় নদী। এই অর্থ ধরিলে Potamitis শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ কেবল এই হয় যে কোনও বৃহৎ নদীর উভয়তীরস্থিত প্রদেশ। কিন্তু এই বুৎপত্তিগত অর্থ তেমন সন্তোষজনক নয় কারণ এই বুৎপত্তি অনুসারে কেবল মিসর দেশ বলিয়া কেন আরও অনেক দেশই উক্ত আখ্যার উপযুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে Potamos শব্দ বিশেষ ভাবে নীল নদীরই বাচক। নীল নদী একটি বৃহৎ নদী, কেবল এই জন্যই যে নীল নদী উক্ত আখ্যা পাইয়াছে তাহা নহে। পদ্ম পুষ্পের সহিত ও এই Potamos নামের সম্পর্ক আছে।

পদ্মামঠ ও পদ্ম, শব্দ হইতে গৃহীত মিশর দেশীয় প্রদেশাদির নাম

পদ্মা মন্দির বা পদ্মামঠের অবস্থিতি স্থল।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে পদ্মা দেবী শর্ম্মিকগণকে যক্ষলিপি শিক্ষা দিয়াছিলেন। আবার ক্রিনিটাস্ (Crinitus) বলেন যে মিশর দেশীয় দেবী ঈশিশ (Isis)ই মিশরদেশে প্রচলিত চিত্র লিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পদ্মবিহারিণী পদ্মাদেবীই আবার মিশর দেশের দেবী ঈশিস্। ইহা হইতেই অনুমান করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় যে যক্ষলিপিই মিশর দেশীয় চিত্রলিপি (Hieroglyphic)। কিন্তু পুরাণে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। হিন্দু শাস্ত্রে তিন প্রকার লিপির উল্লেখ দেখিতে যাওয়া যায়। যথা—দেবনাগরী, পৈশাচী ও যক্ষী। এই তিন প্রকার লিপিরই মূল এক। দেবনাগরী ভারতবর্ষের উত্তরাংশে, পৈশাচী দক্ষিণাংশে এবং যক্ষী ভূটান ও তিব্বত দেশে প্রচলিত। পণ্ডিতগণ দেবনাগরীকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বলেন। কিন্তু দেবনাগরী অক্ষর যেমন সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ তাহাতে ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। এই বর্ণমালার উদ্ভব সম্বন্ধে প্রবাদ এই—অত্রি দেবী দেবগণ হইতে এই বর্ণমালা প্রাপ্ত হন তৎপর তিনি বহুকাল কালী নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করেন, তারপর কাবুলের নিকটবর্ত্তী দেবানিক পর্ব্বতে গমন করেন এবং তথায় দেবনাগর নামে এক নগর স্থাপন করেন। এই নগরের নাম হইতেই বর্ণমালার নাম দেবনাগরী হয়। এই প্রবাদ হইতেও বুঝা যায় যে উদ্ভবের বহুকাল পরে বর্ণমালাটি বিকাশ প্রাপ্ত হইতে হইতে পরে দেবনাগরী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। পালিগণই সর্ব্ব প্রথমে পৈশাচী বর্ণমালা উদ্ভাবন করিয়া, পরে তাঁহারাই ইথিওপিয়া দেশে যাইয়া উহার প্রচলন করেন।

যক্ষলিপিই কি মিশর দেশীয় চিত্র লিপি?

শর্ম্মিকগণ দেবতাগণের অন্তর্গত। পুরাণে যাঁহারা যক্ষ নামে অভিহিত হইয়াছেন ইঁহারা সেই যক্ষ জাতিভুক্ত। ইঁহারা ভারতবর্ষের উত্তরদিকস্থ পর্ব্বতে বাস করিতেন আবার ইথিওপিয়া দেশেও বাস করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বশেষে যে দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন পূর্ব্ব পুরুষগণের নামানুসারেই সেই দেশের নামকরণ করিয়াছিলেন। উক্ত দেশ শঙ্খদ্বীপে অবস্থিত ছিল। ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থে যে প্রদেশ বহিষ্কৃশ দ্বীপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে সম্ভবতঃ শঙ্খ দ্বীপের সেই অংশই উক্ত দেশ।

পালি জাতি।

শর্ম্মাগণ ব্যতীত ভারতবর্ষ ও পারস্য হইতে আরও অনেক জাতি যাইয়া শর্ম্মস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী জাতির নাম পালি। পুরাণে এই জাতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কাশীর দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে নববিন্ধ্যা নামে এক নদী ছিল। ঈর্ণ্ড নামধেয় এক রাজা ঐ নদীর তীরে রাজত্ব করিতেন। ইনি রাজা উগ্রের পুত্র এবং ইঁহার অপর নাম পিঙ্গাক্ষ। নদীটির নাম হইতেই প্রতীয়মান হয় বিন্ধ্য পর্ব্বত উহার উদ্ভব স্থান। এই পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণ দিকে তাঁহার রাজধানী ছিল। উহার এক নাম পল্লী আর অপর নাম পালি। পল্লী শব্দ নগরবাচক যথা ত্রিভিন-পল্লী। পালি শব্দ সম্ভবতঃ পাল (অর্থাৎ পশুপালক) শব্দ হইতে উদ্ভূত। ঈর্ণ্ড অতি পরাক্রমশালী ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা তারাখ্য বিন্ধ্য-পর্ব্বত-বাসী অসভ্য জনগণের মধ্যে রাজত্ব করিতেন—স্বয়ং অতি অধর্ম্ম পরায়ণ ও ক্রুর প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহার অনুচরবর্গ সমস্ত দেশে অত্যাচার করিয়া বেড়াইত। ধর্ম্মশীল রাজা ঈর্ণ্ড পর্ব্বতময় প্রদেশে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত বিধান ও পাথেয় প্রদান দ্বারা কাশী যাত্রিগণের উপকার করিতেন। ইহাতে তদীয় ভ্রাতা তারাখ্যের ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয় এবং তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ঈর্ণ্ডকে পরাভূত করেন। পরাভূত হইয়া তিনি স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। রাজভক্ত পালিগণ পরিবৃত হইয়া রাজা দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে ভগবান্ মহাদেবের কৃপায় শঙ্খ দ্বীপে কালী

নদীর তটে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় শর্ম্মিক গণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং সেই স্থলে অধিবাস স্থাপন করেন। এই স্থানে ইহাঁরা পুণ্য-বতী বা পুণ্য নগরী নামে একটি দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা ও নগর স্থাপন করেন। যে সমুদয় যাত্রিগণ ভক্তি সহকারে এই দেব মন্দিরে আগমন করেন তাহা-দিগের পুণ্য সঞ্চয় হয় ইহাই উক্ত নামের অর্থ। সাধারণের বিশ্বাস কালী নদীর তীরে অনুচ্চ মন্দর পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে ঐ মন্দির এখনও বিরাজিত আছে, আর হিমালয় পর্ব্বতের শিখর দেশে যেমন গন্ধর্ব্বগণ বাস করেন তেমনই এখনও পালিগণ, তাহাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজার অধীনে সুখে স্বচ্ছন্দে ও বিশুদ্ধ আনোদ প্রমোদে বাস্ করিতেছেন। কিন্তু ম্লেচ্ছ ও শ্বেতকায় জাতি বিশেষের সহিত বিবাহ বন্ধন হেতু কতক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়া-ছেন। পুরাণে মন্দর পর্ব্বতের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ বলিয়া বর্ণিত আছে।

গ্রীকগণ যে দেশকে Meroe বা Merhoe বলেন উহা মন্দর পর্ব্বতমালার অন্তর্ভুক্ত। জেসুইট্ (Jesuit) গণের অঙ্কিত মান-

সংস্কৃত মন্দরই গ্রীক মেরো (Meroe)

চিত্রে উক্ত দেশের কেন্দ্রস্থিত এক স্থানের নাম মন্দর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রুস সাহেব তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উহাকে মন্দেরা (Mandera) বলিয়াছেন; এবং তিনি বলেন পুরাকালে এই স্থান পল্লীরাজগণের (অর্থাৎ পশু পালকগণের) রাজধানী ছিল। ঐ প্রদেশের পর্ব্বতের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ। পুরাণেও মন্দর পর্ব্বতের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ বলিয়াই বর্ণিত আছে। এক্ষণে সংস্কৃত মন্দর শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি দেখা যাউক। মৎস্য পুরাণে আ ছে—

মন্দরঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ব ধাতুময়ঃ শুভঃ।
মন্দ ইত্যেব যো ধাতুর পামর্থে প্রকাশকঃ।
অপাং বিদারণাৎ চৈব মন্দরঃ স ক্রিয়াত্যতে॥
১২১।৬১

সুতরাং মন্দর শব্দের অর্থ এই, যে পর্ব্বত জল রাশিকে বিদারণ করে অর্থাৎ পৃথক করিয়া দেয় অর্থাৎ যাহার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ হইতে ভিন্ন ভিন্ন দিকে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। Meroe কে কেন দ্বীপ বলা হইয়াছে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ব্রুস্ সাহেব Meroeর যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তদ্দ্বারাও পুরাণ বর্ণিত ব্যুৎপত্তিগত অর্থই সমর্থিত হইতেছে।

গ্রীকগণের গৃহীত মেরো বা মেটো নামটি সংস্কৃত মূলক কিনা তাহাও একটু আলোচনা করা যাইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি পুণ্য নগরী যেমন রাজ ধানীর নাম তেমনি দেব মন্দিরের ও নাম। পুরা-কালে দেব মন্দিরই পুরোহিতগণের শিক্ষাদানোপ-যোগী বিদ্যা মন্দিরের ও কার্য্য করিত। আবার মঠ শব্দের অর্থ অভিধানে বিদ্যার্থিনাং গৃহং বলিয়া লিখিত আছে। সুতরাং সম্ভবতঃ মেরো বা মেটো শব্দ মঠ শব্দ হইতেই উৎপন্ন। (১) আবার মৃড়, ভগবান্ মহাদেবেরই এক নাম। পালিগণ মহা-দেবেরই উপাসক ছিলেন। সুতরাং হয়তো মৃড় শব্দ হইতেই গ্রীকগণের শব্দ গৃহীত হইয়া থাকিবে। মৃড় শব্দ সম্বন্ধে আমরা পরে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।

মহাদেব পল্লীরাজের প্রতি নৈঋত দিক্ রক্ষার ভারার্পণ করিয়া তাঁহাকে নৈঋত উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। পল্লীরাজ নিকৃষ্ট পিশাচবংশ সম্ভুত। তথাপি তিনি চরিত্র-মাহাত্ম্য হেতু আজিও অষ্টদিক্ পালের জনৈক দিক্ পাল রূপে পূজিত হইতেছেন। দিক্পালগণ জম্বুদ্বীপস্থ কাশী ও অন্যান্য তীর্থ স্থানের রক্ষা বিধানার্থে হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণে করিয়া প্রহ-রীর কার্য্য করেন বলিয়া কথিত আছে।

পল্লীরাজ স্বয়ং জম্বুদ্বীপে জনৈক দিক্পালের কার্য্য করেন বটে, কিন্তু পুরাণে উল্লেখ আছে তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি কালী বা নীল নদীর তীরে বাস করিতেছেন। উক্ত বংশধরগণের মধ্যে

(১) মঠ শ্ছাত্রাদি নিলয়ঃ (অমর) Wilford সাহেবের গ্রন্থে ইংরেজী অক্ষরে Merha শব্দটি লেখা আছে। কিন্তু এই উচ্চারণ বিশিষ্ট কোনও সংস্কৃত শব্দ পাইলাম না। তাই মনে হয় বোধ হয় মঠ, শব্দই লক্ষ্য করা হইয়া থাকিবে।

লুব্ধক নামে এক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা পরে উল্লেখ করিতেছি। হতভাগ্য নীনাসুর এই লুব্ধকেরই পুত্র। ইহার জীবনের শোকাত্মক কাহিনী রাজনীতি নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মিশর দেশের অধিবাসিগণ প্রতি বৎসর ইঁহার মৃত্যু তারিখে শোক করিতেন। নীনা-সুর স্ত্রীর নাম যোগা, ভ্রষ্টা ও যোগাকষ্টা। তাঁহার পুত্র মহাসুর ভ্রমক্রমে স্বীয় মাতার প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। পরে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত চিত্তে আত্মহত্যা করেন। এ দিকে আবার গ্রীক পুরাণে এই সমুদয় ব্যক্তির অনুরূপ কয়েকটি ব্যক্তি প্রাপ্ত হইতেছি। লেয়াস্ (Laius) নামে থিবের একজন রাজা ছিলেন। তিনি ল্যাব্ডেকাসের (Labdacus) পুত্র। তাঁহার স্ত্রীর নাম জোকষ্টা (Jocasta) এবং পুত্রের নাম ওডিপাস্ (Oudipus)। জোকষ্টা ভ্রমক্রমে স্বীয় পুত্র ওডিপাসের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হন। বহুকাল পরে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া আত্মহত্যা করেন। এক্ষণে এই হিন্দু ও গ্রীক উপাখ্যানের সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধহয় এইরূপ অনুমান অসম্ভব হইবে না যে হিন্দুগণের লুব্ধকই গ্রীকদিগের ল্যাব্ডেকাস্, যোগাকাষ্টাই গ্রীক জোকাষ্টা এবং নীনাসুই গ্রীকগণের লেয়াস্। গ্রীক ওডিপাস্ শব্দটি সংস্কৃত যদুপ শব্দ হইতে উদ্ভূত হওয়া বিচিত্র নহে। যদুপ শব্দের অর্থ যদু বংশ সম্ভূত রাজা। বুঝিবা দুরদৃষ্ট মহাসুরেরই যদুপ আখ্যা ছিল।

পালিগণের পূর্ব্বোল্লিখিত বিবরণ স্কন্দ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষে অবস্থান কালেই ইহাদিগের অথর্ব্ব বেদে অধিকার ছিল। তাহারা যখন ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায় তখন গুপ্তভাবে ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। অতএব দেখা যাই-তেছে তাহাদিগের দ্বারাই ভারতীয় চতুর্ব্বেদ মিশর দেশে নীত হইয়াছিল। আবার এ দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে মিশর দেশে হারমিসের (Hermes) (১) গ্রন্থ নামে যে গ্রন্থ আছে তাহা প্রাচীনতম বিষয়ের বর্ণনাপূর্ণ বলিয়া কথিত এবং এই গ্রন্থও বেদের ন্যায় চারিভাগে বিভক্ত। আবার ননাস্ (Nonnus) (২) বলিয়াছেন এই পুস্তক চতুষ্টয়ের প্রথমখণ্ড সৃষ্টির আদি অবধি বর্ত্তমান আছে। ননাসের এই উক্তিও বেদ ও হারমিসের গ্রন্থের একত্বেরই পরিচায়ক কারণ ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেই বর্ত্তমান আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে পালিগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। কাশীর দক্ষিণ ও দক্ষিণ

ভারতবর্ষে পালিবংশ।

পশ্চিম অংশের অধিবাসী পালি-গণের নাম গ্রাম্য ভাষায় পালি ও ভীল। আর ঐ নগরীর উত্তর পূর্ব্বদিকস্থিত পর্ব্বতময় প্রদেশে যে সমুদয় পালিগণ বাস করে তাহাদিগের নাম—সংস্কৃত ভাষায় কিরাত। সিন্ধুনদের তীরে পালি-গণের এক শাখার বাসস্থান। সেই স্থলে তাহারা হারীত নামে পরিচিত। আজ কাল ইহারা জাতি-চ্যুত বটে। কিন্তু প্রাচীনকালে ইহারা অতি প্রতাপশালী জাতি ছিল। কথিত আছে এককালে ইহাদের সাম্রাজ্য সিন্ধুনদ হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত, কেবল পূর্ব্ববঙ্গ কেন, শ্যামদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ম্মকুশল, সচ্চরিত্র, সাহসী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। মহাদেবের প্রতি ইহাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। বাণিজ্য, বিবিধ কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে ইহাদিগের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ইহারাই পৈশাচী নামক বর্ণমালার আবিষ্কর্ত্তা। তাহারা এই বর্ণমালাই ব্যবহার করিত। তাহাদিগের নামানুসারে তাহাদিগের

(১) মারকুরির গ্রীসীয় নাম হারমিস্; ইনি বাগ্দেবী। মিশর দেশীয় অনেক দেবীই এই নামে অভিহিত। হারমিসের গ্রন্থ চতুষ্টয়ে কৃষিবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব, লিখনপ্রণালী, জ্যামিতি, পাটীগণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও অন্যান্য বহু বিষয়ের তত্ত্ব আছে। পুরোহিতগণ এই সমুদয় গ্রন্থ অতি গোপনে রক্ষা করেন—সাধারণকে পড়িতে দেননা।

(২) মিশর দেশের অন্তর্গত প্যানপ্লিস্ নগর ইহার জন্মভূমি। ইনি একজন গ্রীক কবি। ইনি অনেক ঐতিহাসিক এবং অনেক কাল্পনিক কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

অধ্যুষিত স্থান পল্লীস্থান নামে পরিচিত ছিল। পরে রাজপুত্র নামক এক জাতি আসিয়া ইহাদিগকে বিতাড়িত করে। এই নূতন বিজেতৃ-জাতির নাম হইতেই পরে পল্লীস্থান গ্রাম্য ভাষায় রাজপুতনা আখ্যা লাভ করে। পল্লীগণ এককালে অভি-লব্ধ প্রতিষ্ঠ জাতি ছিল। ভারতবর্ষে তাহাদিগের যে দীন ভগ্নাবশেষ আছে তাহাদিগের কথা মনে হইলে বড়ই করুণার উদ্রেক হয়। তাহাদিগের আকৃতির বিশেষত্ব আছে। হিন্দুগণের বিবিধ ভাষা হইতে, মূলতঃ বিভিন্ন না হইলেও তাহাদিগের ভাষারও একটা বিশেষত্ব আছে। তাহাদিগের গ্রামের নাম এখনও পল্লী। ভারতবর্ষে পলিতা বা ভীলাতা নামে অনেক স্থান আছে। এই নাম পল্লীগণ হইতেই আসিয়াছে। পালিরাজ ঈশুর রাজধানীর নাম পল্লী হইলেও প্রাধান্য প্রকাশার্থে

শ্রীপল্লী ও পালিপুত্র।

উক্ত স্থল শ্রীপল্লী নামে অভিহিত হইত; আজকাল যেখানে ভূপাল অবস্থিত সম্ভবতঃ এই স্থানেই এই নগর বিদ্যমান ছিল। ভৌগোলিক টলেমী শ্রীপল্লী শব্দটিকেই সরিপল্ল (Saripalla) করিয়া ফেলিয়াছেন। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে পালিপুত্র শব্দে সমগ্র পালি-জাতিটিকে বুঝায়। সম্ভবতঃ গ্রীক ও রোমানগণ এই পালিপুত্র নামটিই পালিবোথ্রে (Patibothræ) পরিণত করিয়া লইয়াছেন। কেবল শব্দ সাদৃশ্য ব্যতীত এই অনুমানের আরও একটু দৃঢ়ভিত্তি আছে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে সিন্ধুনদ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যামদেশ পর্য্যন্ত এককালে পালিগণের রাজ্য ছিল। তেমনই আবার পালিবোথ্রগণ সম্বন্ধেও প্লিনি বলেন এককালে ইহাদের রাজত্ব সিন্ধুনদ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণ পালিবোথ্রে নামে কেবল এই জাতিটিকেই বুঝিতেন তাহা নহে, উক্ত নামই তাঁহারা পালি রাজধানী শ্রীপল্লীর প্রতিও প্রয়োগ করিতেন। গ্রীকগণ একটি ভুল করিয়াছেন, তাঁহারা বালিপুত্রকে পালিপুত্রের সঙ্গে এক করিয়া ফেলিয়াছেন। বস্তুতঃ বালিপুত্রগণ পালিপুত্র হইতে স্বতন্ত্র জাতি। উহাদিগের রাজধানীর একটি নাম বালিপুত্র. আর এক নাম রাজগৃহ। এই রাজগৃহ নামই পরে রাজমহলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু টলেমী এই রাজমহল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এই নগরই পালিবোথ্রে। তিনি পরিব্রাজকগণের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, রাজমহল বালিপুত্রগণের মণ্ডল মধ্যে অবস্থিত। তিনি এই বাক্যের অর্থ বুঝিতে ভুল করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন, মণ্ডল বংশ যখন পালিবোথ্রে নগরে রাজত্ব করিতেন, তখন এই নগর রাজমহল আখ্যা পাইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, রাজা ঈশুর এক

পিঙ্গাক্ষ ও পিঙ্গাশ শব্দের অর্থ।

নাম পিঙ্গাক্ষ। আবার তাহারই পিঙ্গাশ বলিয়া একটী নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

পিঙ্গাশো মৎস্যভেদেস্যাৎ তথা পল্লীপতাবপি
পিঙ্গাশী নীলিকায়াঞ্চ পিঙ্গাশং জাত্যকাঞ্চনে।
(ইতি বিশ্বঃ)

পিঙ্গাক্ষ শব্দের অর্থ পীতবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট এবং পিঙ্গাশ শব্দের অর্থ কাঞ্চনের ন্যায় পীতবর্ণ। সুতরাং পল্লীরাজের এই দুইটি আখ্যাতেই পীতবর্ণ বাচক একটি শব্দাংশ দেখা যাইতেছে। পল্লীরাজের আদি বাসভূমি, ভারতবর্ষ পরে তথা হইতে যাইয়াই তিনি শঙ্খদ্বীপে বসতি আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের সহিত সংস্রব থাকা বশতঃই তাহার ঐরূপ আখ্যা ছিল। কারণ আমরা দেখিতে পাই, কোনও কোনও বিদেশী জাতি যে যে স্থলে কোনও ব্যক্তি বা স্থানের সহিত ভারতবর্ষের কোনও সম্পর্ক বিদ্যমান আছে, সেই সেই স্থলেই পীতবর্ণের সহিত একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছেন। নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে। আডেন (Aden) হইতে মাস্কট্ (Muscat) পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানের নাম ইমেন (Yemen)। তুরস্ক দেশীয় ভৌগোলিকগণ উক্ত স্থলটি ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়াই গণনা করিতেন, এই জন্যই তথাকার অধিবাসিগণকে তাহারা পীতবর্ণ

ভারতবাসী (Yellow Indian) নাম দিয়াছিলেন। কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ পশ্চিম তীরবর্ত্তী গীলন্ত দেশের প্রদেশ বিশেষের নাম গিলান্ (Ghilan)। তাই উক্ত প্রদেশের আখ্যা Hindul Asfor পীতবর্ণ, ভারতবর্ষ। তুরস্কবাসিগণ কাস্পিয়ান হ্রদকেও পীতসাগর বলেন। আবার, আরব, মিসর ও ইথিওপিয়া দেশে প্যানকিয়া (Panchœa) নামে কয়েকটী জাতি আছে। তাহাদিগের আদিস্থান ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের নামও প্যান্‌কিয়া। সম্ভবতঃ পিঙ্গাশ শব্দ হইতেই এই প্যান্‌কিয়া শব্দ আসিয়াছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে কথা এই যে এই প্যান্‌কিয়া নামধেয় দেশটী কোথায়? এটি কোন্ দেশ? বিখ্যাত ঐতিহাসিক সিসিলী দ্বীপবাসী ডায়োডোরাস্ (Diodorus) বলিয়াছেন বটে যে প্যান্‌কিয়া দ্বারকার নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। তিনি ইউহেমেরাস্ (Euhemerus) এর লেখা হইতে প্যান্‌কিয়ার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত স্থানের বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন উহার নিকটে একটী পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতের বর্ণনা পড়িলে উহা মেরু পর্ব্বত বলিয়াই অনুমান হয়। উক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি ওসিয়ানিডা (Oceanidda) নামক দ্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার বর্ণনা পাঠেও উহা গঙ্গার মোহানাস্থিত সাগরদ্বীপ বলিয়াই বোধ হয়। আর উক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি তিনটি নগরের উল্লেখ করিয়াছিলেন। পুরাণে তদনুরূপ নামধেয় নগরাবলীর উল্লেখ আছে। সেই সমুদয় নগর ভারতবর্ষেরই বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। এই সমুদয় কারণে অনুমান হয় প্যান্‌কিয়া বলিতে সমস্ত ভারতবর্ষকেই বুঝাইতেছে।

মিসর দেশের প্রাচীন কাহিনীতে ওরাস্ (Orus) নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পশুচারণ ব্যবসায়াবলম্বী ছিলেন বলিয়া বর্ণনা আছে। নাম ও বর্ণনাগত সাম্যে মনে হয়, পুরাণ-বর্ণিত ঈশুর্ই ওরাস্ (Orus)। ফিনিসীয় জাতীয় পশুচারকগণ একদা নীলনদীর তীরে রাজত্ব করিয়াছিল। আবার ঈশুর বা ওরাসের এক নাম পিঙ্গাক্ষ। পিঙ্গাক্ষ বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণও নীলনদীর তীরে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ পুরাণোক্ত পিঙ্গাক্ষগণই ফিনিসীয়ান।

পিঙ্গাক্ষগণই ফিনিসীয়ান।

এই অনুমানের সত্যমূলকতা প্রমাণ করিবার জন্য এখানে ফিনিসীয় জাতির প্রাচীন কাহিনী কিয়ৎ পরিমাণে উল্লেখ করা যাইতেছে। অতি প্রাচীন কালে লেবাণ্ট (Levant) সাগরের পূর্ব্বোপকূলে, বর্ত্তমান্ জুডিয়া দেশের ঠিক্ উত্তরে ফিনিসীয় জাতি বাস করিত। গ্রীক ও রোমান্‌গণ উক্ত জাতিটীকে ফিনিসীয়ান নামে এবং তাহাদিগের বসতিস্থলভূত দেশটীকে ফিনিসীয়া নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ফিনিসীয়ানগণ যে প্রথম হইতেই ফিনিসীয়া দেশে বাস করিতেন তাহা নহে। প্রাচীন গ্রন্থকারগণের অনেকেই বলেন ইঁহারা পূর্ব্বে ইরুথেরিয়ান্ (Erutherian) সাগরের তীরে বাস করিতেন। এই ইরুথেরিয়ান্ শব্দের অর্থ বিভিন্ন প্রকার কর' হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন উহা লোহিত সাগর (Red Sea, আবার অন্যান্য লোকে বলিয়াছেন—উহা পারস্যোপসাগর। ঐতিহাসিক জাষ্টিন্ (Justen) পারস্যোপসাগর বলিয়াই লিখিয়াছেন।

পুরাণে অরুণোদধি নামক সাগরের উল্লেখ আছে। সুমেরু পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে অসংখ্য রক্তবর্ণ মণি আছে। সূর্য্যরশ্মি ঐ সমুদয় রক্তবর্ণ মণিতে প্রতিফলিত হইয়া ভারত মহাসাগরে পতিত হইয়া উহার জলকে অরুণরাগে রঞ্জিত করিয়াছে এই জন্যই ইহার নাম অরুণোদধি—ইহাই পুরাণানুমোদিত অরুণোদধি শব্দের অর্থ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও উচ্চারণ সাম্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনুমান হয় Erytherian, এবং অরুণোদধি একই বিষয় বোধক। সুতরাং ফিনিসীয়া দেশে গমন করিবার পূর্ব্বে, ফিনিসিয় জাতির বাসস্থান কেবল পারস্যোপসাগরের বা লোহিত সাগরের তীরেই যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। আরব দেশের দক্ষিণোপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া মালয় উপদ্বীপ

পর্য্যন্ত বিস্তৃত মহাসাগরের যে কোনও অংশের তীরবর্ত্তী প্রদেশে তাহাদিগের বাসস্থান থাকা সম্ভবপর। বিশেষতঃ Justin যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে উক্ত সম্ভাবনা আরও দৃঢ়তর হইতেছে। কারণ তিনি বলেন—ফিনিসীয়ানগণের আদিস্থান প্যারস্যোপসাগর হইতেও বহুদূর পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। তথা হইতে তাঁহারা পরে পারস্যসাগরোপকূলে গিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ভারতবর্ষ হইতেই পিঙ্গাক্ষ আত্মীয়বর্গ সহ ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে যাইয়া অবশেষে নীলনদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। এতদবস্থায় পিঙ্গাক্ষগণ ও ফিনিসীয়ানগণকে এক বলিয়া নির্দ্ধারণ করা সম্ভবতঃ অযৌক্তিক হইবে না। পিঙ্গাক্ষের বংশধরগণ হয়তো দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একদল ফিনিসীয়াতে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং আর একদল আরবের উপকূল দিয়া যাইতে যাইতে আবিসিনীয়ায় যাইয়া উপস্থিত হন। অথবা হয়তো তাঁহারা সকলে একত্র হইয়াই আরবের দাক্ষিণোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হন পরে তাঁহারাই সমুদ্র পার হইয়া নীলনদীর তটে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। এই দুই অনুমানের কোন্‌টী সত্য তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না বটে, কিন্তু এ কথা সত্য যে সমগ্র জাতিটি না হইলেও অন্ততঃ তাহাদিগের কতকাংশ বহুকাল ইমেন্ (Yemen) প্রদেশের তীরবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই—ঐ প্রদেশে প্যান্‌কিয়ান (Panchean) নামে এক জাতীয় লোক বাস করিত। তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে আগত ব'লয়াই সকলে গণনা করিত। আর, প্রাচীন ভৌগোলিকগণ উক্ত প্রদেশস্থিত বহু স্থলের এমন সব নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যে তৎসমুদয় সংস্কৃত মূলক এবং উহাদিগের অনেক নাম এখনও ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। অতঃপর মাইনস্ (Mionos)এর আখ্যান হইতেও পিঙ্গাক্ষ বংশধরগণের অর্থাৎ পালি জাতির আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। র‍্যাডামেন্থাস্ (Rhadamanthus) এবং মাইনস (Mionos) গ্রীক পৌরাণিক আখ্যানে উল্লিখিত দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। র‍্যাডামেন্থাস ক্রিট্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উক্ত দ্বীপে অবস্থান পূর্ব্বক পরে অন্যান্য স্থলে গমনাগমন করিয়া মহা খ্যাতি লাভ করেন, তদীয় ভ্রাতা মাইনস্ ক্রীট্ দ্বীপের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজা। মহাকবি হোমার র‍্যাডামেন্থাস্‌কে পীতকায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদিগের বর্ণনা পাঠে অনুমান হয় যে ইহারা ফিনিসিয়ান বংশোদ্ভব। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, পিঙ্গাক্ষের বংশজাত অর্থাৎ পালি জাতির এক নাম কিরাত। খুব সম্ভবতঃ কিরাত অর্থাৎ ক্রীট্ পল্লীজাতির অবস্থান ভূমি ছিল বলিয়াই উহার নাম ক্রীট হইয়াছিল। সুতরাং র‍্যাডামেন্থাস এবং মাইনস পল্লীরাজ পিঙ্গাক্ষ বংশ সম্ভূত অর্থাৎ কিরাত জাতীয় ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে আর কিরাতগণের অধ্যুষিত ছিল বলিয়া উক্ত দ্বীপের নাম কিরাত হইতে ক্রমে ক্রমে ক্রিটে (Crete) পরিণত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকুঞ্জবিহারী হার।

বোপদেব-প্রসঙ্গ।

(প্রতিবাদ।)

বিগত কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের 'সুপ্রভাতে' শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় "বোপদেব গোস্বামী" ইতি, শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দুই প্রবন্ধে বোপদেব গোস্বামীকে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ১৩১৩ সালের ভাদ্র মাসের "সাহিত্যে" "বোপদেবের পরিচয়" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, মুগ্ধবোধ-প্রণেতা বোপদেব মহারাষ্ট্র, দেশীয় সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। উমেশ বাবু 'সুপ্রভাতে' প্রকাশিত প্রবন্ধে আমার উক্তির খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা যদি সফল হইয়া থাকে, বোপদেব "বাঙ্গালী বৈদ্য" ছিলেন—ইহাই যদি ঐতিহাসিক সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে আমার ক্ষোভের কোনও কারণ নাই।

ভারতের অপর সকল প্রদেশেরই ন্যায় মহারাষ্ট্র দেশেও বহু সংখ্যক অসাধারণ মনীষী ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। কৌটিল্য চাণক্য, বার্ত্তিক-কার কাত্যায়ন, সপ্তশতী-কার শালিবাহন, বৃহৎকথা-প্রণেতা দ্বিতীয় ব্যাসকল্প গুণাঢ্য প্রাকৃত-প্রকাশ-কার বররুচি মহাকবি ভবভূতি, রাজশেখর, দণ্ডী, জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্য, মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর, চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি-প্রণেতা হেমাদ্রি, অভিলাষার্থ-চিন্তামণি নামক সুবৃহৎ কোষের সংগ্রাহক মহারাজ সোমেশ্বর, (১১৩৮ খৃঃ) ধারাধিপতি ভোজ এবং মুকুন্দরাজ, জ্ঞানেশ্বর, একনাথ, তুকারাম, রামদাস, শ্রীধর, বামন পণ্ডিত, মুক্তেশ্বর, মহীপতি, মোরোপন্ত প্রভৃতি অসংখ্য প্রতিভাশালী পণ্ডিত ও কবি সংস্কৃত ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বিবিধ জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থাদি রচনা করিয়া মহারাষ্ট্র দেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রভূমি বহুসংখ্যক রত্নকল্প মহাপুরুষকে বক্ষে ধারণ করিয়া যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা ২।১ জন মনীষীর অভাবে কখনই পরিম্লান হইতে পারে না। বঙ্গদেশেও অল্পসংখ্যক মনীষী জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। যে প্রকারের একজনমাত্র প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাবে পৃথিবীর যে কোন দেশের লোকে আপনাদিগকে ধন্য বলিয়া মনে করিতে পারে, সে প্রকার বহুসংখ্যক অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জাতি-গঠন-ক্ষেত্রেও বঙ্গীয় প্রতিভা কোন অংশে হীন নহে। শিখদিগের গুরু গোবিন্দ সিংহ বঙ্গ মাতারই সন্তান একথা স্মরণ করিলে কোন বাঙ্গালীর হৃদয় না গর্ব্বে স্ফীত হয়? ফল কথা, বঙ্গভূমি প্রতিভা-রত্নে এত দীনা নহেন যে, দুই একজন মনীষীর সংখ্যাধিক্যে তাঁহার গৌরব সবিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অন্ততঃ আমার এইরূপ বিশ্বাস। কিন্তু উমেশ বাবু বোধ হয়, অন্যরূপ বিবেচনা করেন। তাই তাঁহার রচনায়—"বাঙ্গালী বৈদ্য বোপদেবের মহারাষ্ট্রে গমন ঠিক্ মনে করিয়া আমরা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম; এখন তোমরা দশ জনে "মালেধ কুট্টেধ বা"—এইরূপ হা হুতাশ দুই হয়। আমার মনে হয়, যে সকল দেশে বোপদেবের ন্যায় প্রতিভাশালী অসংখ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল দেশের লোকদিগের মধ্যে ২।১ জন মনীষী ব্যক্তিকে লইয়া এরূপ টানাটানি করা ভাল দেখায় না। যে সকল দেশে প্রতিভার দুর্ভিক্ষ বিদ্যমান, সেই সকল দেশে এরূপ কলহ একদিন শোভা পাইলেও পাইতে পারে। তাই বলিয়াছি, বোপদেব "বাঙ্গালী বৈদ্য" বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে আমার ক্ষোভের কোন কারণ নাই। ফল কথা, ঐতিহাসিক তথ্য ও যুক্তি

যে মতের পক্ষপাতী, সেই মত অবনত মস্তকে স্বীকার করাই আমাদিগের পক্ষে বিধেয়। বোপদেব বাঙ্গালী বৈদ্য ছিলেন, ইহাই যদি ঐতিহাসিক সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাই সর্ব্বত্র সাদরে পরিগৃহীত হউক।

ভবিষ্য মহাপুরাণের প্রতিসর্গ পর্ব্বের ৩২ অধ্যায়ে বোপদেবকে "তোতাদরীর" অধিবাসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। "সাহিত্য" পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে ভবিষ্য মহাপুরাণের শ্লোকগুলি বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু এই "তোতাদরী" কোথায়? ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল-নিবাসী অদ্বৈত বংশধর পর্য্যাটক শ্রীবৃন্দাচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় তোতাদরীতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছেন,— "তোতাদরী গিয়াছি। তোতাদরী দাক্ষিণাত্যে, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীভুক্ত দ্রাবিড় দেশান্তর্গত ত্রিচিনাপল্লী জিলার অধীন তাম্রপর্ণী নদী তীরে অবস্থিত জনাকীর্ণ গ্রাম। সেখানকার ভাষা তামিল। বহু সংখ্যক পঞ্চ ু া বড় ব্রাহ্মণ সেখানে বাস করেন। স্থানটি সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। উহার নিকটবর্ত্তী "শ্রীবৈকুণ্ঠম্" দ্বৈতবাদী রামানুজের জন্মস্থান। তোতাদ্রীতে ব্যাকরণবেত্তা বোপদেবের কোনও অনুসন্ধান পাই নাই।"

তোতাদরীর এই ভৌগোলিক অবস্থান যখন আমার নিকট অজ্ঞাত ছিল, তখন ব্যাকরণ-কর্ত্তা বোপদেবকে ভবিষ্য মহাপুরাণোক্ত বোপদেব বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তোতাদরী-নিবাসী বোপদেবকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। কারণ, বৈয়াকরণ বোপদেব তাঁহার "শতশ্লোকী" নামক বৈদ্যক গ্রন্থে আত্ম-পরিচয়-দান-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

> দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহা—
> স্থানং দেবপদাস্পদাগ্রজগণাগ্রণ্যং সহস্রং দ্বিজাঃ।
> তদ্গ্রামেষু ধনেশ কেশববিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌক্রমাৎ
> চক্রে শিষ্যসুতস্তয়োঃ কৃতমিমাং শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥

বোপদেবের "হরিলীলা" ও মুক্তাফল" নামক গ্রন্থে প্রকাশ যে, তিনি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত মহারাষ্ট্র রাজ-মন্ত্রী হেমাদ্রির প্রীতি-সাধনের জন্য ঐ দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় "ভূতপূর্ব্ব "নির্ম্মাল্য" পত্রে "বোপদেবের জাতি-নির্ণয়" প্রবন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকোক্ত "বরদাতটং" অর্থে সন্দিগ্ধ-চিত্তে "বরদা নগরে (?)" লিখিয়াছিলেন; কিন্তু সেই বরদা নগর কোথায়, তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই। আর একজন লেখক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শাস্ত্রী বর্ত্তমান গায়কোয়াড় রাজ্যের রাজধানী বরোদা বা বড়োদাকেই (Baroda) বোপদেবোক্ত "বরদা-তট" বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাহার পর "সাহিত্য" পত্রে এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি লিখিয়াছিলাম—

"বরদাতট অর্থে যদি "বরদা নগরীই" হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, (বেরার প্রদেশের নিকটবর্ত্তী) "চান্দা" নগরের প্রায় ৩৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম কোণে স্থিত "বরদা" বা বর্ত্তমান "ওয়ার্দ্ধা" (Wardha) নগরী বোপদেবের উদ্দিষ্ট ছিল। এই বরদা নগরীতে বোপদেবের বংশধর বিঠ্ঠল আপদেব ১৯০০ সালে তত্রত্য হাইস্কুলে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। বরদাতট শব্দের সরল অর্থ,—বরদা নদীর তীরভূমি। বরদা নদী বিদর্ভ (বেরার) দেশের পূর্ব্ব সীমান্তবাহিনী। ইহার বর্ত্তমান ইংরাজী নাম ওয়ার্দ্ধা (Wardha)। এই বরোদা নদীর পশ্চিম তীরে বিদর্ভ দেশে "সার্থ" নামক গ্রামে বোপদেবের বসতি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ ডাক্তার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার মহোদয় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লিখিয়াছেন—Bopadeva was a native of Berar. ফলতঃ মূল শ্লোকে যখন দেখিতেছি, বোপদেবের পিতা কেশব ও গুরু ধনেশ্বর সার্থ গ্রামে বাস করিতেন, স্বয়ং বোপদেব ঐ গ্রামে অবস্থিতি-পূর্ব্বক "শতশ্লোকী" রচনা করিয়াছেন, তখন ঐ গ্রামেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল—এরূপ অনুমান কি অসঙ্গত? দেবগিরি বা অন্যত্র তাঁহার জন্মভূমি হইলে সার্থ গ্রামের বর্ণনায় "বরং মহাস্থানং" "দেবপদাস্পদাগ্রজগণাগ্রণ্য সহস্র দ্বিজের বসতিভূমি" প্রভৃতি বিশেষণ তাঁহার লেখনী মুখে নিঃসৃত হইত কি না সন্দেহ। বোপদেবের পিতা কেশব ও গুরু ধনেশ উভয়েই যখন পূর্ব্বোক্ত সার্থ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, তখন বোপদেবের বাল্য জীবন বা শিক্ষাকাল যে ঐ গ্রামেই অতিবাহিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমিত হয়।"

উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় পূর্ব্বে "নির্ম্মাল্য" পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"সম্ভবতঃ বোপদেব রাজবৈদ্যের পদ পাইয়া বঙ্গ হইতে মহারাষ্ট্রে গমন করিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধ ও কলাপ ব্যাকরণের সূতিকা-গেহ বঙ্গদেশ, ইহাই আমাদিগের ধারণা।"

তাহার পর "সাহিত্য" পত্রে আমার পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্তব্য গুলি প্রকাশিত হইলে তিনি পূর্ব্ব মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এখন তিনি এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হইতে চাহেন যে, বোপদেব, ধনেশ্বর ও কেশব—ইঁহারা বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ ও অন্ততঃ নামকরণ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন!

তাঁহার এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"গোস্বামী" উপাধিটী বঙ্গদেশের একমাত্র একচেটিয়া সম্পত্তি। বোপদেব যখন নিজ হস্তে ঐ উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে বাঙ্গালী মনে করা অসঙ্গত নহে। তাঁহার এই যুক্তিটী সারগর্ভ কি না, বঙ্গীয় মনীষিগণ তাহার বিচার করিবেন। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মহারাষ্ট্র দেশে অন্ততঃ বিগত তিন চারি শত বৎসর হইতে হরি-ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিদের নামের সহিত "গোসাঞী" পদের প্রয়োগ ভূরি ভূরি প্রচলিত আছে। বোপদেব হরি-ভক্তি-পরায়ণ ছিলেন বলিয়া হরিলীলাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। "গোঁসাঞী" পদটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিতে গেলে গোস্বামী ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

উমেশ বাবুর উত্থাপিত দ্বিতীয় তর্ক এই যে, বোপদেব নিজের এবং ধনেশ্বর ও কেশবের নামের সহিত যখন পিতৃ-নামের সংযোগ করেন নাই, তখন তাঁহারা মহারাষ্ট্র দেশ-জাত ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। এই তর্কের উত্তরে বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান সময়ে মহারাষ্ট্র দেশের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আত্মনামের সহিত পিতৃনাম সংযুক্ত করিবার যেরূপ প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বেও সেরূপ প্রথার অস্তিত্ব মহারাষ্ট্র দেশে ছিল না। উমেশ বাবু এই তথ্য অবগত থাকিলে বোপদেব প্রভৃতির নামের সহিত তাঁহাদিগের পিতৃ-নামের সংযোগ না দেখিয়া তাঁহাদিগকে মহারাষ্ট্রেতর দেশবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইতেন না।

উমেশ বাবুর তৃতীয় তর্ক বঙ্গদেশে মুগ্ধবোধের প্রচার-বিষয়ক। তিনি বলেন, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ যখন বঙ্গের সর্ব্বত্র বহুলরূপে প্রচলিত এবং উহার টীকা টিপ্পনী ও পরিশিষ্টাদির রচয়িতারা সকলেই বাঙ্গালী, তখন বোপদেবের বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কিছু হওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহার এই যুক্তি কতদূর প্রমাণসহ, এইরূপ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন গ্রন্থকারের জন্মস্থান অসংশয়িতরূপে নির্দ্দেশ করা কতদূর সঙ্গত, তাহার বিচার-ভার প্রত্ন-তত্ত্ব সন্ধী পাঠকগণের উপর অর্পণ করাই আমি যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম।

উমেশ বাবু বলেন, "বাসস্থান ও জন্মভূমি সকল সময়ে এক জিনিশ (!) হয় না। সখারাম বাবুও নিজে এখন সপুত্র কলিকাতায় বাস করিতেছেন। অথচ তিনি মহারাষ্ট্রের লোক। এখন কি আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লইব যে, তাঁহাদিগের সকলের জন্মভূমিই বঙ্গদেশ?" উল্লিখিত বাক্যনিচয়ে "মহারাষ্ট্রের লোক" ও "তাঁহাদিগের সকলের" এই দুইটী বাক্যাংশের নিশ্চিতার্থ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। তবে যদি কেহ মনে করেন যে, বর্ত্তমান লেখক, তাঁহার পিতৃদেব, পিতামহী দেবী, পিতৃস্বসা দেবী ও পুত্র-কন্যা প্রভৃতির জন্ম বঙ্গদেশে হইয়াছে, তাহা হইলে কোনও দোষ হয় না। বর্ত্তমান লেখকের বাসস্থান ও জন্মভূমি-বিষয়ক অবস্থার সহিত উমেশ বাবু বোপদেব, ধনেশ্বর ও কেশবের অবস্থার তুলনা করিয়াছেন। তুলনাটী যদি উমেশ বাবুর খাতিরে কেহ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ত্তমান লেখকের ও তাঁহার পিতার জন্মভূমি যেমন বঙ্গদেশ, বোপদেবের ও তাঁহার পিতার জন্মভূমি সেইরূপ মহারাষ্ট্র দেশে ছিল, তাহা হইলে উমেশ বাবু কি সেই সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন?

"সখারাম বাবু কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মহারাষ্ট্রকে বোপদেবের জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার কি আমরা কৈফিয়ৎ তলপ করিতে পারি না?"—এই প্রশ্ন উমেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ ভাষায় পরস্পরের 'কৈফিয়ৎ তলপ" করা কতদূর রুচিসঙ্গত, তাহা বলিতে পারি না। লোকে অধীন কর্ম্মচারীরই কৈফিয়ৎ তলব করিয়া থাকে। মনীষী উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কে সাহিত্যক্ষেত্রে ঐ রীতির প্রবর্ত্তন করিতে সমুৎসুক দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার

নিকট আমরা সৌজন্য শিক্ষা করিবারই আশা করিয়া থাকি। নবীন লেখক-সমাজের সম্মুখে তিনি এরূপ "কৈফিয়ৎ তলব" করিবার আদর্শ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন কেন?

বোপদেবকে মহারাষ্ট্র-দেশ-জাত বলিয়া যে কারণে আমি মনে করিয়া থাকি, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ ইতঃপূর্ব্বেই করিয়াছি। আর ২।১টী কারণের উল্লেখ এস্থলে করিতেছি। পূর্ব্বে বোপদেবকে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিয়া আমারও ধারণা ছিল। তাহার পর ডাঃ ভাণ্ডারকার মহাশয়ের "দক্ষিণাপথের প্রাচীন ইতিহাস" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রথমতঃ আমার বোপদেব সম্বন্ধে পূর্ব্বসংস্কার পরিবর্ত্তিত হয়। তাহার পর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দেখিতে পাই। পরন্তু যখন মহারাষ্ট্র দেশ হইতে সংবাদ পাইলাম, বোপদেবের বংশধরগণ অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান আছেন, এবং তাঁহারা তথায় "দেশস্থ" ব্রাহ্মণ (মহারাষ্ট্র দেশের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ) বলিয়া পরিচিত, শুদ্ধ তাহাই নহে, বহুশতাব্দী হইতে মহারাষ্ট্র সমাজে বোপদেব "দেশস্থ" ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত, মহারাষ্ট্র দেশের আদি কবি "দেশস্থ" ব্রাহ্মণ জ্ঞানেশ্বর, কোনও কারণে সমাজ চ্যুত হইলে সমাজের পক্ষ হইতে বোপদেবই তাঁহাকে শুদ্ধি পত্র দান করিয়াছিলেন,—এই সকল কথা যখন অবগত হইলাম, তখন বোপদেবের মহা-রাষ্ট্রীয়ত্ব সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ কোন সন্দেহ থাকিল না। মহারাষ্ট্রের আদি কবি জ্ঞানেশ্বরকে বোপদেবের প্রদত্ত শুদ্ধি-পত্র জ্ঞানেশ্বর-সম্প্রদায়ের লোকদিগের নিকট অদ্যাপি যে আকারে রক্ষিত আছে, তাহার অনুলিপি আমার পূর্ব্বোক্ত "সাহিত্য" পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি। শুদ্ধিপত্র খানি জ্ঞানেশ্বরের "করযুগলের" পরিবর্ত্তে "চরণ-যুগলে" কেন অর্পিত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র শুদ্ধিপত্রখানি মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এস্থলে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবসর নাই। প্রশ্নসন্ধী পাঠকেরা ১৩১৩ সালের ভাদ্র মাসের "সাহিত্যে" প্রকাশিত "বোপদেবের পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

উমেশ বাবু বোপদেবকে 'বিশ্বপ্রকাশ'-অভিধান প্রণেতার সামসময়িক বা ১০৩১ শকাব্দের (১০৯১ খ্রীঃ) লোক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বোপদেব যে হেমাদ্রির তুষ্টির জন্য "মুক্তাফল" ও "হরিলীলা" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই হেমাদ্রি শকাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক—ইহা বিবিধ তাম্রশাসনের উল্লেখ দৃষ্টে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি যে ১১৮২ শকাব্দের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র-দেশের রাজ-মন্ত্রিত্ব লাভ করেন নাই, তাহা ভাণ্ডারকার মহাশয় অতি সন্তোষ-জনকরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উমেশ বাবু বোপদেবের যে কাল-নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার সহিত হেমাদ্রির দেড়শত বর্ষের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে বিশ্বপ্রকাশ-প্রণেতা মহেশ্বর বোপদেবের বা বোপদেব স্বীয় গ্রন্থের কুত্রাপি মহেশ্বরের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। মহেশ্বর বিশ্বপ্রকাশে কেশব নামক এক ব্যক্তিকে আপনার পিতৃব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উমেশ বাবু প্রখর কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেই কেশবকে বোপদেবের পিতা কেশব বলিয়া অনুমান করিয়াছেন! এ অনুমান সত্য হইলে শকাব্দের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাত কেশবের ও তৎপুত্র হেমাদ্রির আশ্রিত বোপদেবের মধ্যে অন্যূন ১৫০ বৎসরের পার্থক্য কখনই ঘটিত না। এরূপ অবস্থায় উমেশ বাবুর অনুমানপরম্পরা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তরূপে পরিগৃহীত হইবার যোগ্য কি না, পাঠকেরা তাহা বিচার করিবেন।

অম্বষ্ঠ-তত্ত্ব, ব্রাহ্মণের জাতিতত্ত্ব এবং বঙ্গের অপর সদ ব্রাহ্মণদিগের মহারাষ্ট্র দেশে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণে পরিণতি প্রভৃতি বিষয়ে উমেশ বাবুর কল্পনা আমার নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল না। সে সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তাও আমি এ ক্ষেত্রে উপলব্ধি

করিতে অসমর্থ। অতি প্রাচীনকালে এদেশে যে অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল, এক দেশের ব্রাহ্মণের অপর দেশে গমনে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাসের উদ্ধার করা বর্ত্তমান সময়ে একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। এরূপ অবস্থায় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বোপদেবের ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের জাতিতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করাও সম্পূর্ণ দোষশূন্য বলিয়া মনে করা যায় না।

বোপদেব কখনও বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এ কথার প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কেহ দেখাইতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে মহারাষ্ট্র দেশে তাঁহার, তাঁহার পিতার ও গুরুর নিবাস ছিল, তিনি মহারাষ্ট্র রাজ-মন্ত্রীর আশ্রিত ছিলেন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহারাষ্ট্র দেশে প্রাচীনকাল হইতে তিনি মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, এখনও তাঁহার বংশধরেরা মহারাষ্ট্র দেশেই বাস করেন এবং ঐ সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। মহারাষ্ট্র দেশে মুখ্য ব্রাহ্মণেরাও বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। সেখানকার সেনবী-ব্রাহ্মণেরা মূলতঃ গৌড়ই হউন, আর সারস্বতই হউন, তাঁহাদিগের উপাধির সহিত বাঙ্গালী বৈদ্যদিগের সেন উপাধির যতই সাদৃশ্য থাকুক, মহারাষ্ট্র দেশে তাঁহারা গৌণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকেন। বোপদেবের সহিত সেনবীদিগের কোন প্রকার সম্বন্ধের বিষয়ও সে দেশের লোকে জানে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, বোপদেবকে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিয়া মনে করিবার অনুকূলে যে সকল অনুমান বিদ্যমান, তাঁহাকে উচ্চ বংশীয় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিবার অনুকূলে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে বঙ্গদেশে মুগ্ধবোধের প্রচার বাহুল্য, বহুসংখ্যক বঙ্গীয় পণ্ডিত দ্বারা উহার টীকা-প্রণয়ন ও তাঁহার বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর চিরপোষিত সংস্কার ভিন্ন উমেশ বাবুর সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে আর কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই। এই উভয় শ্রেণীর প্রমাণাবলীর বলাবলের বিষয় আলোচনা করিয়া যদি ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, বোপদেবকে মহারাষ্ট্রীয় মুখ্য ব্রাহ্মণ বলা অপেক্ষা "বঙ্গীয় বৈদ্য" বলিয়া নির্দ্দেশ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, তাহা হইলে আমি সানন্দে সেই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিব।

উপসংহারে উমেশ বাবুর প্রতি আমার দুইটী প্রশ্ন আছে। তিনি লিখিয়াছেন—হেমাদ্রির রচিত "চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি" নামক গ্রন্থ "কার্য্যতঃ বোপদেব-কৃত" এবং বোপদেবের কৌশলেই উহা বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। আর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"আমরা ভূয়োদর্শন-বলে অবগত আছি যে, এখনও দাক্ষিণাত্যের মুখ্য ব্রাহ্মণেরা শূদ্র-কন্যাও বিবাহ করিয়া থাকেন। তাহাতে পুত্র হইলে সে দাক্ষিণাত্যের মুখ্য ব্রাহ্মণ হইয়া পড়ে ও কন্যা হইলে সে শূদ্র হইয়া থাকে।" তাঁহার এই দুইটি গুরুতর উক্তির ভিত্তি কি, তাহা তিনি অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন কি?

উমেশ বাবুর প্রবন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতি ও ভ্রমপূর্ণ কল্পনার বাহুল্য অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইল। কিন্তু সে সকলের আলোচনায় লেখনী-ক্ষয় করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলাম না।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

মহাপ্রয়াণ।

সন্ধ্যা আঁধার তখনো নামে নি,
ফুটে নি তখনো তারা,—
ডুবু ডুবু রবি তখনো ডুবে নি
ঘুচেনি কিরণ ধারা!
চাষীর বাঁশরী তখনো সুদূরে
বুঝি কভু শোনা যায়,—
তখনো বিহগ মৃদু মধু সুরে
অসীমে গাইয়ে ধায়।
মালতী ফুলের ঘোমটা খানিয়ে
চাহিছে তখনো ফেলিতে টানিয়ে,
তখনো সমীর বহিছে অধীরে
আকুল উদাস পারা।
'খেয়া'-তরী খানি তখনো সুধীরে
করে আনাগোনা এ তীরে ও তীরে,
শ্রান্ত পথিক যায় ঘরে ফিরে
হয়ে গেছে কাজ সারা!
সন্ধ্যা-আঁধার তখনো নামে নি,
ফুটে নি তখনো তারা,—
ডুবু ডুবু রবি তখনো ডুবে নি
ঘুচে নি কিরণ ধারা!

দেবের আলয়ে তখনো উঠে নি
সন্ধ্যা-আরতি বাজি,—
বালকের দল তখনো ফিরে নি
ভরে লয়ে ফুল-সাজি।
তখনো যে বধূ আলায়ে দেয় নি
তুলসী তলায় বাতি—
কলসী ভরায়ে তখনো আসে নি
মিলন-পুলকে মাতি!
স্নিগ্ধ গোধূলি ধূসর বসন
তখনো করে নি বিজয় কেতন,
তখনো জড়িত রয়েছে শোভন
প্রকৃতির কণা হাসি!

বিরাম-বিদায় মিলি দু'জনায়
করুণ-শিথিল বিপুল ধরায়
তখনো আসন পাতিবারে চায়
সকল ক্লান্তি নাশি'!
দেবের আলয়ে তখনো উঠে নি
সন্ধ্যা-আরতি বাজি'—
বালকের দল তখনো ফিরে নি
ভরে লয়ে ফুল সাজি!

সহসা তপন লুকাল কোথায়
চমকিল দশদিশ;
থমকি দাঁড়াল যা'ছিল যথায়
ভুলে গেল পাখী শিষ।
(শুধু) একটি করুণ রাগিণীর মত
পবন বিলাপি ছুটে;—
দারুণ আঘাতে কাতর জগতে
অশ্রু ছাপায়ে উঠে!
চৌদিকে নিনাদি জাগে হাহাকার,
বীণা-বাদিনীর তন্ত্রী বীণার,
কণ্ঠ-ভূষণ ভারত-মাতার
ছিঁড়িয়া পড়িল এই!—
কবি ভুবনের শ্রেষ্ঠ আসন
আজিরে শূন্য মলিন গহন
চট্টলার চির-গৌরব- রতন
'নবীন চন্দ্র' নেই!
সহসা তপন লুকাল কোথায়
চমকিল দশ দিশ,—
থমকি দাঁড়াল যা ছিল যথায়
ভুলে গেল পাখী শিষ।

অচল শোণিত হিয়ার মাঝারে
লেখনী তেয়াগে আশা—
সংজ্ঞা হারায়ে শোক-পারাবারে
ভেসে যায় ভাব-ভাষা!

হায় রে জননী, রতন তোমার
শেষ রবিকর সনে
গেল কি মিলায়ে আঁধারে অপার
কি মহান অলগনে!
জগৎ যেমন তেমনি রহিবে,
তপন আবার ফিরিয়া আসিবে,
কালি নিশি-ভোরে বিহগ গাহিবে,
মাতিবে আবার সবে;—
শুধু তোর বুকে রাখি মাগো শির
'মা' 'মা' বলে কেহ হবে না অধীর,—
তোর দুখে কারো নয়নের নীর
পড়িবে না ঝরি ভবে!
মাগো, অচল শোণিত হিয়ার মাঝারে
লেখনী তেয়াগে আশা—
সংজ্ঞা হারায়ে শোক-পারাবারে
ভেসে যায় ভাব-ভাষা!

আরতি শঙ্খ কোথা বাজে অই,
জাগে কোথা কোলাহল,—
কহ না আমারে কল্পনা অয়ি,
কেন ধরা টলমল!
আজি এ ভীষণ কাল রজনীতে
উৎসব কারা করে,—
জননীর ব্যথা কাহাদের চিতে
বাজে নাই তিল তরে!
তারকার হারে ভরি দীপ ডালা
গাঁথি অগণিত চারু ফুল-মালা
দাঁড়াইয়ে কেন আছে সুরবালা
বরিতে কি কোন জনে?
কে ওই কিশোর নট-চূড়ামণি
সবাকার আগে দাঁড়ায়ে আপনি
বাজায় বংশী মোহিয়ে অবনী
হরি লয়ে প্রাণ মনে!
আরতি শঙ্খ কোথা বাজে অই,
জাগে কোথা কোলাহল,—
কহ না আমারে কল্পনা অয়ি,
কেন ধরা টলমল!

জগতের যত অমর তনয়
মিলেছে কি হোথা আজ—
মোদের 'নবীনে' করুণা নিলয়
দিবে ঠাঁই ওরি মাঝ?
কোথা হতে ওই আসে দেব রথ
দ্বিতীয় তপন সম—
উজলি উঠিল সারা ছায়া পথ
কি আলোকে নিরুপম!
ওই যে থামিল—ওই কে নামিল—
স্বরগ বাজনা সঘনে বাজিল,
ওই কারা ভুজে কাহারে বাঁধিল
প্রগাঢ় প্রণয় ভরে—
'নর-নারায়ণ' দয়ার সাগর
ওই কার শিরে রাখিলেন কর—
পুলকে মাতিল অমর নগর
কারে ওই বুকে ধরে!
জগতের যত অমর তনয়
মিলেছে কি হোথা আজ—
মোদের 'নবীনে' করুণা নিলয়
দিলা ঠাঁই ওরি মাঝ!

দেববালিকারা অগ্রসরি ধীরে
দেয় মালা কার গলে—
জাগে হুলু রব ফিরে ফিরে ফিরে
লাগে ঢেউ লাজ দলে!
দেবশিশুকুল করতালি দিয়ে
কারে হেরিবারে ধায়—
বৈতালিক দল সুতানে নাচিয়ে
গুণ গীতি কার গায়?
কহ না মানসী, কহ না আমায়,
আমাদেরি কবি ওই কি হেথায়—
ওই হাসিমাখা মুখখানি হায়,
তাঁর কিবা দেখা যায়?
কহ না বারেক, তাঁরে পেয়ে আজ
উৎসব কিবা দেব-গৃহ মাঝ—
পুলকে মাতিল অমর সমাজ
কোল দিয়ে তাঁরে হায়!

দেব বালিকারা অগ্রসরি ধীরে
দিল মালা তাঁরি গলে—
জাগে 'হুলু' রব ফিরে ফিরে ফিরে,
লাগে ঢেউ লাজ দলে!

তোমারি চরণ করিয়া মনন
বিশ্ব শরণ হরি!
মোদের 'নবীন' জীবন নূতন
লভিলা নীরবে ঝরি'!
এবে দেব-লোকে কবির বাঁশরী
তুলিবে অমিয় তান—
তুমি রেখো হরি, নিমগন করি'
শান্তি-সলিলে প্রাণ!

মোরা ধরাবাসী বিরহ-বেদনে
শুধু চেয়ে রব ঊর্দ্ধ নয়নে,
যদি কোন দিন গগনে গগনে
সে সুর বিভাসি উঠে;—
সারা জীবনের কুড়ায়ে ভকতি
তোমারি সঙ্গে করিয়া সারতি
করিব হে দেব, করিব প্রণতি
কবির চরণে লুটে'!
তোমারি চরণ করিয়া মনন
বিশ্ব-শরণ হরি
মোদের 'নবীন' জীবন নূতন
লভিলা আজিকে ঝরি।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

জাপানের কথা।

(সঙ্কলিত)

পৃথিবীর সর্ব্ব দেশের ইতিহাসের ন্যায় জাপানের প্রথম যুগের ইতিহাস কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর সমষ্টি মাত্র। সকল দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে যেমন অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়, জাপানেও সে নিয়মের কোনই ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। জাপানে অতি প্রাচীনকালের দুই একখানি ইতিহাস আছে। একখানির নাম কাজোকী—এখানি ৭১২ খৃঃ লিখিত হয়। দ্বিতীয় খানির নাম 'নাহোংজী'—এখানি পূর্ব্বোক্ত খানির আট বৎসর পরে সঙ্কলিত হয়। দুইখানিই তদানীন্তন সম্রাটের আদেশানুসারে রচিত হয়। প্রাচীনকালে জাপানের আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা এই দুইখানি হইতেই জানা যায়। স্বর্গ ও পৃথিবী পরস্পর হইতে কিরূপভাবে পৃথক্ হইয়া পড়িল, এই পৌরাণিক কাহিনী লইয়াই দুইখানিরই আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম খানিতে ৬২৮ খৃঃ পর্য্যন্ত কালের ও দ্বিতীয় খানিতে ৬৯৮ খৃঃ পর্য্যন্ত কালের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। দুইখানিতেই জাপানের বর্ত্তমান রাজবংশের উৎপত্তির একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়।

রাজবংশ।

উভয় পুস্তকেরই মতে দেবী আমেতারাসু ওমিকামি (দিব্যালোকাধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী) স্বর্গে রাজত্ব করিতেন। শস্যশালী জাপান দেশ শাসন করিবার জন্য, তিনি তাঁহার পৌত্র 'নি-নি-যি-নো-মিকোটো'-কে স্বর্গ হইতে প্রেরণ করেন। সেই সময়ে তিনি পৌত্রকে বলিয়া দেন—"আমার বংশধরগণ জাপানের সম্রাট্ হইবে। তুমি তথায় গমন করতঃ শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হও। স্বর্গ ও পৃথিবীর ন্যায় এই বংশেরও উন্নতি অনন্তকাল স্থায়ী হইবে।" তারপর দেবী, পৌত্রকে একটি মণি, একখানি তরবারী ও একখানি দর্পণ প্রদান করেন। জাপানীরা এই তিনটি দ্রব্যকে স্বর্গ প্রদত্ত সামগ্রী বলিয়া মনে করিয়া অত্যন্ত ভক্তি করিয়া থাকে। আমেতারাসু দর্পণ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন—"ইহাকেই আমার প্রতিভূ বলিয়া জানিও;

এবং আমার প্রতি যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাক, ইহার প্রতিও তদ্রূপ করিবে।" এই দর্পণ পূর্ব্বে টোকিওর রাজপ্রাসাদে ছিল। কিন্তু যে স্থানে মানুষ বসবাস করে, এমন স্থানে রক্ষিত হইলে পাছে দর্পণের পবিত্রতা নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় সম্রাট্ সুজিন খৃঃ পূঃ ৯২তে আর একখানি অবিকল এইরূপ দর্পণ নির্ম্মাণ করিয়া রাজপ্রাসাদে স্থাপন করেন, এবং পূর্ব্বোক্তখানি রাজপ্রাসাদ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া ইসি (Ise) মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র নরনারী জাপানের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এই স্থানে উপনীত হইয়া দর্পণের পূজা করিয়া থাকে; এবং জাতীয় কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে সম্রাট্ স্বয়ং বা তাঁহার কোন প্রতিনিধি এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেবী আমেতারাসুর প্রতিভূ স্বরূপ এই দর্পণখানিকে তৎবিষয় জ্ঞাপন করেন। টোকিওর রাজপ্রাসাদে যে দর্পণ স্থাপিত আছে, তাহার সম্মুখে কোনও উৎসব দিনে সম্রাট্, সম্রাট্-মহিষী, রাজবংশ-সম্ভূত পরিজনবর্গ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা একত্রে মিলিত হইয়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার উদ্দেশ্যে উপাসনাদি করিয়া থাকেন। কোন রাজকর্ম্মচারীকে কার্য্যব্যপদেশে বিদেশে গমন করিতে হইলে, তিনি সম্রাটের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার পর এই স্থানে উপস্থিত হইয়া যাহাতে কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিয়া আসিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক জাপানীর গৃহে "কামিদামা" বা ঈশ্বরবেদী নামে একটি পবিত্র স্থান আছে। সেই বেদীর মধ্যস্থলে 'তায়মা' রক্ষিত হয়। ইসি মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে যে পূজোপহার প্রদত্ত হয়, তাহাকেই 'তায়মা' বলে। প্রতি বৎসর শেষে ইসি মন্দির হইতে এই উপহার সাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়। গৃহস্থেরা তথা হইতেই 'তায়মা' সংগ্রহ করিয়া থাকে। 'তায়মা'ই প্রতি গৃহে ইসি মন্দিরের প্রতিভূ স্বরূপ রক্ষিত হয়। পূর্ব্বোক্ত বেদীর উপরে 'তায়মা' ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার ও শিন্তো মন্দিরের প্রতিভূ রক্ষিত হয়; চাউল প্রভৃতি দ্বারা ইহাদের পূজা হইয়া থাকে। প্রতি রজনীতে পূজা স্থান উজ্জ্বল আলোকে সুশোভিত করা হয়। এইরূপ ভাবে দেবী আমেতারাসু জাপান সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র পূজিত হন।

আমরা কথায় কথায় বহুদূর চলিয়া আসিয়াছি। এখন আবার আমেতারাসুর পৌত্রের কথায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। প্রবাদ এই যে, তিনি প্রথমে কি-উ সু দ্বীপের বর্ত্তমান হি উ-গু প্রদেশে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দুই পৌত্র সমগ্র দ্বীপটি অধিকার করিবার মানসে তথা হইতে বহির্গত হয়েন। কয়েক বৎসর ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর—(সে যুদ্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র মৃত্যুমুখে পতিত হন) কনিষ্ঠ পৌত্রটি বর্ত্তমান যানাতো প্রদেশের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে সুযোগ পান এবং নিহোংজী মতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬৬০ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন।

ইনিই জাপানের প্রথম সম্রাট্। সম্রাট্ জিমু নামে ইনি সাধারণের মধ্যে পরিচিত। জিমু হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সম্রাট্ পর্য্যন্ত বরাবর একই বংশ চলিয়া আসিতেছে; কোন দিন তাহার বিপর্য্যয় ঘটে নাই। জাপানের প্রায় সমস্ত লোকেরই বিশ্বাস যে, তাহারা হয় রাজবংশসম্ভূত, নয় যে সমস্ত ব্যক্তি স্বর্গ হইতে আমেতারাসুর পৌত্রের সহিত জাপানে আগমন করিয়াছিল তাহাদের বংশধর। রাজবংশের অবিচ্ছিন্নতা ও জাপানের এই অদ্ভুত বিশ্বাস তাহাদের জাতিগত একটি বিশেষত্ব। ইহার ফলে জাপানী রাজা প্রজার সম্বন্ধ অতি সুন্দর হইয়াছে; প্রত্যেক জাপানী মনে করে যে, জাপানী জাতিটা এক বৃহৎ পরিবার এবং সম্রাট্ সেই পরিবারের প্রধান। জাপান সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বরাবর জাপানীদের মনে এই ভাব দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই জন্য জাপানে রাজা প্রজায় কখনও বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই। জাপানের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এমন কোনও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, কোনও প্রজা কোন দিন সম্রাটকে পদচ্যুত করিয়া

সেই স্থান গ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে। রাজা প্রজায় এইরূপ ঘনিষ্ঠতারই ফলে জাপান একাধিকবার বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পায় নাই। প্রতিবারই জাপান তাহার শত্রুকে সগৌরবে দূরীভূত করিয়া দেয়। *

তবে একথা সত্য যে মধ্যে একবার রাজসভাসদ্‌গণ ও তৎপরে মিজি অব্দ আরম্ভের পূর্ব্বে সাত শত বৎসর ধরিয়া সামরিক ব্যক্তিগণ রাজক্ষমতা অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলেন, এবং এক রকম তাঁহারাই দেশ শাসন করিতেন। সামুরাইগণ তাহাদের দলপতিকে আর সাধারণ প্রজাবর্গ তাহাদের জমীদারকে সর্ব্বাগ্রে সম্বর্দ্ধনা করিত। কিন্তু তাহা হইলেও এই সময়েও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ ও সাধারণ প্রজাবর্গের নিকট হইতে সম্রাট তাঁহার প্রাপ্য সম্মান হইতে কখনও বঞ্চিত হইতেন না। আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিত। একমাত্র সম্রাটই প্রজাকে গৌরবজনক উপাধি দিবার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তৎপ্রদত্ত সে উপাধির মূল্য প্রকৃত পক্ষে অতি সামান্য হইলেও, এই সময়ে কি সাধারণ প্রজা কি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সকলেই সেই রাজপ্রদত্ত সম্মান লাভের জন্য লালায়িত হইত, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সম্রাট চিরকালই সকল শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে সমান ভক্তি পাইয়াছেন!

জিমু হইতে বর্ত্তমান সম্রাট পর্য্যন্ত ১২২টি ব্যক্তি জাপানের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বা ধর্ম্মশীলতার জন্য, কেহ বা শৌর্য্য-বীর্য্যের জন্য, কেহ সাহিত্য চর্চ্চার জন্য, কেহ বা শাসন দক্ষতার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ব্যারণ কিকুচী বলেন যে, ইহাদের মধ্যে দায়িত্ব জ্ঞান হীন কেহই ছিলেন না, দেশের রাজা হইয়া প্রজাদের সুখ-স্বাস্থ্য বিধানের জন্য যতদূর যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়, কেহই সে বিষয়ে ত্রুটি করিতেন না। প্রজাদের প্রতি তাঁহাদের ভালবাসা অসীম ছিল। পক্ষান্তরে প্রজাগণ রাজাদিগের সদ্‌গুণ রাশিতে মুগ্ধ হইয়া চিরকালই তাঁহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া আসিতেছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার।

রাজ বংশের প্রতি ভক্তিপ্রবণতার সহিত পূর্ব্ব পুরুষ পূজার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। পূর্ব্বোল্লিখিত কাজোকি ও নাহোজি হইতে জানা যায় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও চীন দেশীয় দর্শন জাপানে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে যে শিন্তো ধর্ম্ম জাপানে প্রচারিত ছিল, তাহাতে প্রধানতঃ পূর্ব্বপুরুষ পূজার সহিত প্রকৃতি পূজার কিছু সংমিশ্রণ ছিল। দেবত্ব সম্পন্ন পূর্ব্ব-পুরুষগণের পূজার নিমিত্ত ইসি, অৎসুতা, ইজুমস্ প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত পূর্ব্বপুরুষগণকে লোকে দেশের রক্ষক স্বরূপ মনে করিত এবং রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন গুরুতর বিষয়ের উপস্থিত হইলেই এই সমস্ত মন্দিরের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইত। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে

* ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান বিদেশীয় আক্রমণ ভয়ে ভীত হইয়াছিল। কুবলই খাঁ চীনদেশ অধিকার করিয়া, যাহাতে জাপান তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করে, সেই উদ্দেশ্যে দূতের পর দূত প্রেরণ করেন। জাপানীরা এই প্রস্তাব অপমানকর মনে করিয়া তাহার কোন উত্তর না দেওয়ায়, কুবলাই রাগান্বিত হইয়া ১৫০ খানি পোত প্রেরণ করেন। তৎপরে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে অনেক জাপানী সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু কুবলাইএর সেনাপতি আহুত হওয়ায় ও সমুদ্র মধ্যে ভীষণ ঝড় উত্থিত হওয়ায়, বিপক্ষ সৈন্যেরা জাপান অধিকার করিবার কোনও সুযোগ না পাইয়া ভগ্নমনে প্রত্যাগমন করে। জাপান এই যুদ্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করে। ফলে পরবর্ত্তী কয় বৎসর স্বীয় সামরিক উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করে ও কিউসু উপকূলবর্ত্তী প্রায় শত মাইল ব্যাপী স্থান দুর্গ প্রাচীরাদি দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখে। এদিকে কুবলাই খাঁ জাপান-জয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া দ্বিগুণ উদ্যমে আবার সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করেন, এবং ১২৮১ খ্রীঃ জাপানের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু জাপানীদের যুদ্ধনিপুণতার গুণে তাহারা ষাট দিনের মধ্যেও জাপানে পদার্পণ করিতে পারে নাই। আবার হঠাৎ এক মহা ঝড় উত্থিত হইয়া কুবলাইএর সমস্ত বাহিনী নষ্ট করিয়া ফেলে, যে সমস্ত সৈন্য ঝড় হইতে রক্ষা পায়, তাহারা জাপানীদের হস্তে নিহত হয়। লক্ষ সৈন্যের মধ্যে তিনজন মাত্র এই মহা ধ্বংসের বার্ত্তা লইয়া দেশে ফিরিতে পারিয়াছিল। এই ঝড়কে সাধারণতঃ জাপানীরা ইসিনোকামিকাজে বা ইসির দৈব ঝড় বলিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস যে দেবী অমেতারাহু তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক শাসিত এই দেশকে বিদেশীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ঝড় প্রেরণ করেন।

জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম ও চীন সভ্যতা প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। প্রথমতঃ কোরিয়া হইতে, পরে একেবারে চীন হইতেই এই সভ্যতা স্রোত জাপানে প্রবাহিত হইতে থাকে। সাধারণ লোকের নিকট প্রথম প্রথম এই ধর্ম্ম আশ্রয় পায় নাই। সম্রাট্ বংশীয়েরাই সর্ব্বপ্রথম এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সাধারণকে এই পন্থা দেখাইয়া দেন। এই সময়ে জাপানে দুই দলের সৃষ্টি হয়। সম্রাট্ বংশ ভিন্ন ধর্ম্ম আশ্রয় করাতে রক্ষণশীল প্রজারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাহারা বলিতে লাগিল যে, বিদেশী দেবতা পূজা করিলে দেশীয় দেবতারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন এবং তাহাতে দেশের অত্যন্ত অকল্যাণ হইবে। সংস্কার প্রয়াসীদল কিন্তু সে কথা গ্রাহ্যই করিলেন না, তাঁহারা এই নূতন সভ্যতাকে জাপানের পক্ষে কল্যাণকর জ্ঞান করিয়া তাহার প্রচার উদ্দেশ্যে কৃত সংকল্প হইলেন। পরে 'শোটোকো তৈসি'র সাহায্যে নূতন দলই জয়লাভ করে। চীন সাহিত্যে ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন; বৌদ্ধধর্ম্মের সার মর্ম্মগুলি ইনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন জাপান সিংহাসনের প্রতিনিধি (regent) ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম ও কনফুসিয়ের নীতিকেই সাধারণের নৈতিক ও মানসিক বৃত্তি উন্নত করিবার প্রকৃষ্ট পথ মনে করিয়াছিলেন। একজন উচ্চমনা সাধুপুরুষ বলিয়া তিনি আজ বিশেষরূপ সম্মানিত। তাঁহারই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া পরবর্ত্তী সম্রাট্‌গণ, তাঁহাদের পরিবারবর্গ ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ এই ধর্ম্ম আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও তাঁহারা কখনও পূর্ব্বপুরুষদিগকে অর্থাৎ প্রাচীন দেবতাদিগকে পূজা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয়েন নাই। তাঁহারা পূর্ব্বে যেমন মন্দিরে যাইয়া দেবতাদিগকে পূজা করিতেন, এখনও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। প্রিন্স শোটোকোর রাজ্যকালে (৫৯৭-৬২১ খৃঃ) সাধারণকে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য প্রকাশ্য ভাবে রাজসরকার হইতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু যাহাতে পুরাতন ধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা থাকে ও যাহাতে তাহারা প্রাচীন দেব-দেবীকে অসম্মান না করে, সেইরূপ আদেশ ও প্রদান করা হইত। যে শ্রিন্স শোটোকো একবার সভাসদ্‌বর্গের সহিত মিলিত হইয়া জাপানী দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে এক বিরাট মহোৎসব করেন, আবার তিনিই বৌদ্ধ পুরোহিতগণের সহিত মিশিয়া জাপানের সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী সংগ্রহ করেন। দুঃখের বিষয়, সে সংগ্রহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে সম্রাট্ শোমু একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হইয়াও প্রাচীন দেব-দেবীতে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। একবার কোরিয়াবাসীরা জাপান-সম্রাটকে অপমান করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলে ও আর এক সময়ে মড়কে দেশ প্রজাহীন হইতে আরম্ভ করায়, তিনি স্বয়ং ইসি ও উসি মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ও অন্যান্য মন্দিরে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন।

জাতীয় ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ।

এই সময়ে জাপানে অনেক সুদক্ষ বৌদ্ধ পুরোহিত বাস করিতেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, জাপানীদের পূর্ব্বপুরুষ-পূজেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। তাহা হইতে তাহাদিগকে নিরস্ত করা সুকঠিন। সুতরাং তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণের প্রীতিকর করিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন যে, জাপানের দেবতাগণ (অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষগণ) বুদ্ধদেবের বিভিন্ন মূর্ত্তি; তাঁহারা জাপানবাসীকে বৌদ্ধ ধর্ম্মোক্ত নির্ব্বাণের পথ দেখাইবার জন্য জাপানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ পন্থা অবলম্বন করাতেই জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। *

* ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে খৃষ্টান পাদ্‌রীরা ও ভারতের পুরাণ বৃত্তান্তের সহিত মিল রাখিতে চেষ্টা করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন বলিয়া শুনা যায়।

'দিয়াবাৎসু' বা বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে জাপানের প্রাচীন রাজধানী নারাতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক হইয়া সম্রাট শোমু, দেবী আমেতারাসুর ইচ্ছা জানিবার নিমিত্ত এক জন বৌদ্ধ পুরোহিতকে ইসি মন্দিরে প্রেরণ করেন। দেবী সন্তুষ্ট হইয়া জানাইলেন যে, তাঁহাতে ও বুদ্ধতে কোনই প্রভেদ নাই। বৌদ্ধ পুরোহিত এই কথা সম্রাটকে জ্ঞাপন করিলে সম্রাট তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আর এক জনকে এই কথার সত্য নিরূপণ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া ঐ একই উত্তর প্রাপ্ত হয়েন। শোমুর নির্ম্মিত মন্দির এখনও নারায় বর্ত্তমান আছে। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা এই রূপ কৌশলে বুদ্ধদেবের অবতার গ্রহণ মত আরও বিস্তৃত করিয়া ফেলিলেন। ক্রমে তাঁহারা প্রায় সকল শিন্তো মন্দিরের উপরই নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং বৌদ্ধ মন্দিরের পৌরাহিত্যের সহিত শিন্তো মন্দিরের পৌরাহিত্য আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম দেবতা পূজার সহিত মিশ্রিত হইয়া অতি দ্রুত গতিতে সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্ম যদি পূর্ব্বপুরুষ পূজার বিরুদ্ধবাদী হইত তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ দ্রুতগতিতে প্রচারিত হইতে পারিতনা। যাহ হউক বৌদ্ধধর্ম্ম শেষে শিন্তো ধর্ম্মকে একেবারে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিন্তোধর্ম্মের পুনরুত্থান হইলেও তাহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের শিন্তোধর্ম্ম। তাহার সহিত পূর্ব্ব শিন্তোধর্ম্মের মিল নাই। মিজি অব্দের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে শিন্তো মন্দিরগুলি সংশোধিত হইতে থাকিলে বৌদ্ধ ও শিন্তোধর্ম্ম পরস্পর হইতে অন্ততঃ সরকারী হিসাবে সম্পূর্ণরূপে বিছিন্ন হইয়া পড়ে।

আর একটি কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। জাপানীরা তাহাদের প্রাচীন পূর্ব্ব পুরুষদিগকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করে এবং মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া থাকে। যদি বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানীদের পূর্ব্ব পুরুষ পূজার অনুকুল না হইত, তাহা হইলে ইহা কখনও জাপানীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিত না। পূর্ব্বপুরুষ পূজা জাপানে স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে এ প্রথা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। নানা পরিবর্ত্তন স্বত্ত্বেও তাহাদের এই অটল বিশ্বাস কিছু মাত্র টলে নাই। ইহাই তাঁহাদের জাতীয় চরিত্র গঠনের এক মহাভিত্তি ভূমি স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় জাপানের অন্যান্য বিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষ পূজার উপর ইহা হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান কালেও প্রত্যেক জাপানীর গৃহে 'কামিদা মা'র পার্শ্বে 'বৎসুদান' বা বৌদ্ধবেদী নামে একটি পবিত্র স্থান আছে; ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্বপুরুষগণের নাম লিখিত আছে। শিন্তোধর্ম্মাবলম্বীর গৃহে 'কামিদামার' পার্শ্বে আর একটি 'কামিদামা' আছে। ইহাতে পূর্ব্বপুরুষগণের নাম লেখা আছে। জাপানীদের মধ্যে কতকগুলি উৎসব দিন আছে। সেই সমস্ত দিবসে জাপানীরা পূর্ব্বপুরুষগণের সমাধি ভূমি দর্শন করিয়া বেড়ায় ও পুষ্পাদি দ্বারা সেইগুলি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া থাকে। যখন কোন ব্যাক্তি বিদেশ গমন করে তখন সে যেমন জীবিত আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তেমনি পূর্ব্বপুরুষগণের সমাধির নিকট হইতে বিদায় লয়; এবং বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে সমাধিগুলি দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে জাপানীরা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাঁহাদের কথা ও তাঁহাদের কীর্ত্তি কাহিনী সর্ব্বদা তাহাদের স্মরণ পথে জাগরুক থাকিয়া বংশমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠ হইবার জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করে।

শ্রীহেমেন্দ্র চন্দ্র দাসগুপ্ত।

সেখ সাদি।

সন্তোষ।

আমি সন্তোষ চাই। সন্তোষের মত ধন আর কি আছে। যাহার সহিষ্ণুতা নাই সে কিসের জন্য জ্ঞানের গর্ব্ব করে?

একজন দরিদ্র সাধু রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল আপনি রাজ্যলাভ করিয়াছেন, আর আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমি অতি দীন, লোকে আমাকে মাড়াইয়া চলুক তাহাতে কি? আমি আপনার মত কণ্টক নহি যে অপরের পায়ে ফুটিব।

একজন সাধু তাহার ছিন্ন কন্থা সেলাই করিতেছিল। তাহা দেখিয়া অপরে বলিল, নিকটে একজন দাতা আছেন, চলুন তিনি এখনই আপনাকে নূতন বস্ত্র দান করিয়া ধন্য হইবেন। সাধু বলিল নিজের দরিদ্র জানাইয়া অপরের নিকটে ভিক্ষা করিতে চাহি না। ছিন্ন কন্থাতেই আমি সন্তুষ্ট; কেন ধনীর নিকট ভিক্ষা করিতে যাইব? অপরের সাহায্যে স্বর্গগমনেও আমি নরকের যন্ত্রণা অনুভব করি।

চিকিৎসক উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত; কিন্তু রোগীর স্বাস্থ্য পথ্য ও নিয়মের উপর নির্ভর করে।

দেখিতেছি আহারে তোমার সংযম শক্তি একগাছি কেশ অপেক্ষাও ক্ষীণ, কিন্তু তোমার ঔদারিকতার প্রভাব লৌহ রজ্জু বিচ্ছিন্ন করিতেও সক্ষম।

আহারের উদ্দেশ্য কি—জীবিত থাকিয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করা। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া মনে হয় আহারের জন্যই জীবন।

পরিমিত আহার তোমাকে ধারণ করিয়া রাখিবে। কিন্তু অপরিমিত আহার তোমাকে বহন করিতে হইবে।

যিনি সংযমী তিনি সর্ব্ববিধ কষ্টভোগ করিতে সমর্থ; কিন্তু বিলাসী কষ্টে পড়িলে আশু মৃত্যু তাহার সুনিশ্চিত।

ভিক্ষার লাঞ্ছনা অপেক্ষা উপবাস করা বরং ভাল। যদি অন্তরের কষ্ট জানাইতে হয়, তাহার নিকট গিয়া বল যাহার প্রসন্ন বদন হইতে তুমি সান্ত্বনা প্রত্যাশা করিতে পার।

সিংহ ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেও সে কুক্কুরের ভোজনাবশিষ্ট খাইতে চায় না। ক্ষুধিত হইলে তুমি নীচের নিকটে প্রার্থনা জানাইও না।

মূল্যবান বেশ পরিহিত অপদার্থ লোক, আর সুবর্ণমণ্ডিত কর্দ্দম প্রাচীর উভয়েরই মূল্য এক।

অপরের প্রসাদভোজী অপেক্ষা যিনি নিজ পরিশ্রমে জীবিকা আহরণ করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

ঈশ্বর, যিনি ষড় ঋতুর প্রবর্ত্তক, তিনি প্রত্যেক প্রাণীর প্রয়োজন যথাযোগ্য বিধান করিতেছেন। বিড়ালকে যদি তিনি পক্ষ দিতেন, একটি পক্ষীরও ডিম্ব রক্ষা পাইত না। যিনি তোমাকে দরিদ্র করিয়াছেন, তিনি জানেন কোন্ অবস্থা তোমার পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

মরুদেশ যাত্রী ক্ষুৎপিপাসা কাতর ওষ্ঠাগত প্রাণ জনৈক পথিক পথে যাইতে যাইতে একটি থলিয়া পাইল। আহার্য্য সামগ্রী পরিপূর্ণ মনে করিয়া সহর্ষে খুলিয়া দেখে উহা মণি মুক্তায় পরিপূর্ণ। তখন তাহার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। হায়, ক্ষুধার্ত্তের নিকটে ধূলিমুষ্টি আর সুবর্ণখণ্ড উভয় এক।

আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় নিত্য তৃপ্ত। কিন্তু এক সময়ে জুতার অভাবে বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছিল। সেই সময়ে এক দিন মস্‌জিদে গিয়া দেখি এক-জনের পা নাই। তখন নিজের প্রতি ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিয়া তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিলাম। সে দিন হইতে জুতার অভাব আর অনুভব করি না।

ঊর্দ্ধে হাত দুইখানি তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় কি হইবে, যদি যথাযোগ্য পাত্রে দানের সময় সে হস্ত প্রসারিত না হয়।

সৎবংশ জাত দারিদ্র্যে নিপতিত হইলেও তাহার মহত্ব বিনষ্ট হয় না।

চোর সাধুকে বলিয়াছিল অপরের নিকট মুষ্টি ভিক্ষা করিতে তোমার লজ্জা বোধ হয় না। সাধু বলিল চৌর্য্যাপরাধে রাজদণ্ডে হস্ত বিচ্ছিন্ন হওয়া অপেক্ষা ভিক্ষা প্রশংসনীয়।

নিরবচ্ছিন্ন বলের দ্বারা সৌভাগ্য লাভ হয় না।

বিদেশ যাত্রায় সুখলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ব্যবসায়ী যাহার অর্থের অভাব নাই, অরণ্য পর্ব্বত মরুভূমি সকল স্থানেই তিনি সুখে সঞ্চরণ করিতে পারেন। যিনি বিদ্বান, সুবর্ণ মুদ্রার ন্যায় বিদেশেও তাঁহার সমাদর, তিনি কিছু আর ধনীর সন্তানের ন্যায় নহেন, যে নোটের মত দেশের ভিতরেই তাহার সমাদর, বিদেশে যাহার প্রচলন বা সমাদর নাই। সুন্দর যুবা পিতৃমাতৃতাড়িত হইলেও বিদেশে সম্মান ও আশ্রয় লাভ করে। সুকণ্ঠ গায়ক তাহার বীণা লইয়া বিদেশে গিয়াও অপরকে বিমুগ্ধ করে সেখানে তাহার সম্মানের অভাব কি। সামান্য শিল্পী বিদেশে যাইলেও তাহার উদরান্নের অভাব ঘটে না।

সমুদ্র মহা ভীষণ হইলেও (water fowl) সমুদ্র বিহারী পক্ষী বারিধি বক্ষে বিরাম লাভ করে। কিন্তু উহার তরঙ্গের তাড়নে প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডও তীরে উৎক্ষিপ্ত হয়।

মক্ষিকা দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিলে প্রকাণ্ড হস্তীকেও তাহারা বিপর্য্যস্ত করিতে পারে, সিংহের চর্ম্মও তুলিয়া লইতে পারে।

শত্রু মিত্র সাজিয়া দংশন করিলে সে দংশন অতীব সাংঘাতিক।

অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহাত হইবেই, তাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না।

লোভ পরিত্যাগ কর, রাজার ন্যায় স্বাধীন হও তাহা হইলেই তোমার মনের সন্তোষ মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

মহতের স্মৃতি।*

মহোৎসবের মঙ্গল রাগিণী
বাজিয়া উঠিল অই!
এ শুভ দিবসে এ মাহেন্দ্রক্ষণে
কোথা দেব, তুমি কই?
দূর দূরান্তর করি অতিক্রম
ভকত, পিপাসু আত্মা,
এ মন্দির তলে সমবেত সবে
পূজিবারে পরমাত্মা।
তুমি কেন হায় এস নাই শুধু
পূজিতে সচ্চিদানন্দে,
স্বর্গের দেবতা মর্ত্তের মানব
এক যোগে যাঁরে বন্দে;
তব জীবনেও ধ্রুবতারা যিনি
বিরাজিত প্রতি ছন্দে
আজি কি ভুলিলে চির আকাঙ্ক্ষিত
সে মধুর পরানন্দে?—
না, না সে অমৃতে পেলে একবার
জাগ্রতি অমর রয়
আয়ো এক তাঁতে সকলই যে মিলে
সকলই মঙ্গলময়।
তাইগো সুদূরে থাকিয়াও তুমি
লভিছ আনন্দ রাশি,
শান্ত চিদাকাশে ব্রহ্মের বিকাশে
অমৃত উঠিছে ভাসি।
বিচ্ছেদ পাথারে নাথ সমাগম
মরি কি উজ্জ্বল ভয়।
(নির্জ্জন তপস্যা সাধনের তরে
ও কি গো দেবের বর!!)
পুষ্পাবিষ্ট মৌন মধুপের মত
পরব্রহ্মে লীন আত্মা,
স্বরূপ অমৃত চুম্বিয়া সঘনে
ধ্যায়িছে মহান আত্মা;—
দেখিবারে প্রাণ অতি পিপাসিত
কিন্তু মুক্ত নহে দ্বার,
মনশ্চক্ষে তাই হেরি মহাভাব
পূত হই বার বার।

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

* (মাঘোৎসবের দিনে মন্দিরে পূজ্যপাদ কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের অভাবে লেখিকার হৃদয়ে যে ভাবোদ্রেক হইয়াছিল, তাহাই পরে পদ্যাকারে প্রকাশিত)।

রাণীক দেবী।

সুরথ প্রদেশে গিরনার * পর্ব্বতের পাদমূলে একটী সুন্দর সুরক্ষিত দুর্গ আছে। দুর্গের প্রাকার মূল বেষ্টন করিয়া দীর্ঘ বৃক্ষ বহুল কাননরাজি বর্ত্তমান। এই দুর্গটী অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া "সোণা রেখার" স্বচ্ছ জলরাশি লহর বাধিয়া পর্ব্বত মস্তক হইতে উছল স্রোতে নিম্ন প্রান্তর পথে কল কল গানে চঞ্চল চরণে ছুটিয়া গিয়াছে। কাননের শ্যামল প্রতিচ্ছবি ও প্রভাতের সুবর্ণ কিরণে রঞ্জিয়া "সোণা রেখা" সত্যই একটী সোণা রেখা হইয়া গিয়াছে।

এক দিবস দুর্গ হইতে অকস্মাৎ একটী তূর্য্যধ্বনি হইল; অগণিত সৈন্যবাহিনী দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সোণারেখা নদী তীরে সম্মিলিত হইতে লাগিল। দুন্দুভি নিনাদে চারি দিক মুখরিত হইয়া উঠিল; যদুবংশীয় রাজা ক্ষেন আজ পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

পিতার চারি আজ্ঞার মধ্যে তিনি তিন আজ্ঞাই প্রতিপালন করিয়াছেন। আজ পাটনের পূর্ব্ব দুর্গদ্বার ভগ্ন করিয়া চতুর্থ প্রতিজ্ঞা পালন করিতে চলিলেন। একটী সুন্দর সুসজ্জিত অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজা ক্ষেন দুর্গের বাহিরে আসিলেন; তাঁহার সুগঠিত সুপুষ্ট ও সুন্দর দেহ, আকর্ণ বিশ্রান্ত আঁখি, উজ্জ্বল প্রতিভাব্যঞ্জক এবং দৃঢ় ও অটল প্রতিজ্ঞার অনুব্যঞ্জক; পৃষ্ঠে পরিপূর্ণ তূণীর, স্কন্ধে দীর্ঘ ধনুক ও কটিদেশে তরবারী; মস্তকে উজ্জ্বল মণিমুক্তা খচিত মুকুট। ক্ষেন রাজার আদেশ ক্রমে বিপুল অশ্বারোহী দল অগ্রে অগ্রে ও তৎপশ্চাৎ পদাতিকের দল—"সুরথ কি জয়" "রাজা ক্ষেনগার কি জয়", এই শব্দে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া সোণারেখা পার হইয়া চলিল।

কন্যা জন্ম।

সিন্ধুদেশে পাবার নামক স্থানে রোর পাবার নামে এক রাজা ছিলেন। চন্দ্রের মূলানক্ষত্রে গমন কালে রাজার এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। রাজা দৈবজ্ঞ আনিয়া কন্যার জন্ম নক্ষত্রের ফলাফল জানিতে চাহিলেন। দৈবজ্ঞ বলিল—"এই কন্যা যাহার ঘরে থাকিবে তাহার রাজ্যনাশ ঘটিবে।" রাজা এই অমঙ্গল আশঙ্কায় সন্তান স্নেহে জলাঞ্জলী দিয়া আজ্ঞা দিলেন,—"কন্যাকে রাজ্যের বাহিরে কোথাও রাখিয়া আইস।" এই সংবাদ শুনিবামাত্র কন্যার মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা অন্তে দেখিলেন তাঁহার নয়নের মণিকে মাতৃ অঙ্ক হইতে কাড়িয়া লইয়া নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে।

এই পরমাসুন্দরী মেয়েটীকে যখন রাজ্যের বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইল তখন হরমতি নামে একজন কুম্ভকার তাহাকে লইয়া আপন গৃহে পরম যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিল। হরমতির সন্তানাদি কেহ ছিল না—হরমতি কন্যাটীকে পাইয়া নিজ কন্যার মত স্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিল। কন্যাটী ক্রমে বড় হইল। তাহার অলৌকিক রূপের কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

লাখা ফুলানী নামে তথাকার এক জন সামন্ত রাজার কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছিলে তিনি এ কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন; কুম্ভকার তাহাতে সম্মত না হওয়ায় লাখা তাহাকে বলপূর্ব্বক বিবাহের ভয় দেখাইলেন। হরমতি সেই দিন রাত্রে কন্যাকে লইয়া লাখার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সুরথে উপনীত হইয়া তথায় আত্মীয় গৃহে বাস করিতে লাগিল। কিছু দিন অতীত হইলে পাটনের † পরাক্রমী রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেবের কয়েক জন ভাট মহারাজের বিবাহের উপযুক্ত সর্ব্ব সুলক্ষণা পদ্মিনী রমণী অনুসন্ধানে প্রায় বিফল মনোরথ হইয়া সুরথের সেই গ্রামে আসিয়া উপনীত

* গিরনার—প্রাচীন রৈবতক পর্ব্বত।

† অনহিলপুর পাটন ও পাটন এই দুই নামেই প্রসিদ্ধ।

হইলেন। তাঁহারা তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন কুম্ভকারের ঐ কন্যা রাণীক দেবীকে দেখিতে পাইলেন। বালিকার অতুল রূপরাশি দেখিয়া তাঁহারা আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন। ভাটগণ কুম্ভকারের নিকট যাইয়া সিদ্ধরাজ জয়সিংদেবের সহিত সেই কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। কুম্ভকার আহ্লাদের সহিত স্বীকৃত হইল। কন্যার ইন্দিবর আঁখি, আরক্ত কপোল, অতুলনীয় সুষমা, তাহার কণ্টক প্রচ্ছন্ন ভাগ্যের চতুর্দ্দিকে এক মোহ-জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। কন্যার গোলাপ পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট পাণিতল পরীক্ষা করিয়া ভাটগণ পূর্ণ পদ্মিনী রমণীর সকল চিহ্ন দেখিয়া পাটনে যাইয়া রাজার নিকট তাহার অতুলনীয় রূপ গুণের কথা বর্ণনা করেন।

সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেব বলিলেন—"এই নীচ বংশোদ্ভূতা কন্যা সুন্দরী হইলেও আমি তাহাকে বিবাহ করিতে পারি না।"

ভাটগণ কহিল—

"আঙ্গন আম্বো মহোরিয়ো
সাম্ব পড়ী খরবহার ;
দেবেউপাই দেবড়ী
নহি জাতে কুম্ভার।"

অর্থাৎ একের অঙ্গনস্থিত আম্রবৃক্ষের ফল যেমন অন্যের উদ্যানে পতিত হয় তেমনি এই বালিকা রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কুম্ভকার গৃহে প্রতি-পালিত হইতেছে। এই কন্যা জাতিতে কুম্ভকার নয়।" রাজা ইহা শুনিয়া বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ভাটগণ যৌতুকাদি লইয়া কুম্ভকার গৃহে আসিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া গেলেন।

এদিকে রাজা ক্ষেন পাটন দুর্গের পূর্ব্বদ্বার ভগ্ন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। একদিন তদীয় ভাগিনেয় দেশল আসিয়া রাজ সমীপে নিবেদন করিলেন—আজ আমি আপনার নূতন প্রতিষ্ঠিত "মজেবরি" গ্রাম হইতে আসিয়াছি, তথায় কুম্ভকারের একটী পরমাসুন্দরী রাজবংশ সম্ভূতা পালিতা কন্যা আছে, ইহা আপনারই যোগ্য, সিদ্ধ-রাজ জয়সিংহ এ কন্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া-ছেন ; যদি জয়সিংহ আপনার রাজ্য হইতে এ কন্যাটিকে গ্রহণ করেন তবে আপনারই অপমান।"

রাজা ক্ষেন এই বিবাহে সম্মত হইলেন ; তিনি দেশলকে কন্যা আনয়নার্থ তথায় পাঠাইলেন। কুম্ভকার জয়সিংহ দেবের নিকট প্রথম সম্মত হইয়া-ছিল বলিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিল না। দেশল কুম্ভকারকে বলিলেন, যদি রাজা ক্ষেন বলপূর্ব্বক তোমার কন্যা গ্রহণ করে, তবে সিদ্ধরাজ জয়সিংহ তোমাকে কোন দোষ দিতে পারিবেন না।

কুম্ভকার বলিল—জান না, জয়সিংহদেব বার বৎসর যুদ্ধ করিয়া ধারনগরী অধিকার করিয়াছেন ; তাঁহার অপরিমেয় ধন ও অগণিত সৈন্য, কাজেই এ ব্যাপারে রাজা ক্ষেনের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

দেশল কহিলেন "তুমি বোধ হয় জান না গিরনার দুর্গে ক্ষেন রাজার ৫২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য আছে ; নিজে ক্ষেন রাজা অতুল পরাক্রমশালী তাঁহার ভয় কিসের ?"

সুরথ রাজধানীতে রাজা ক্ষেন গারের নিকট দেশল রাণীক দেবীকে বল পূর্ব্বক লইয়া আসি-লেন। রাণীক দেবী জুনাগর পার হইয়া গিরনার দুর্গ কিনারে "যোগেশ্বরী" ফটকের নিকট রথ হইতে অবতরণ করিয়া প্রস্তর সেতু পার হইয়া নগরদ্বারে প্রবেশ করিবেন এমন সময় একটী প্রস্তরে তাঁহার পা ঠেকিয়া পা একটু কাটিয়া রক্ত বাহির হইল ; রাণীক দেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "ভাগ্যে না জানি কি হয়।"

রাজা ক্ষেন গারের সহিত রাণীক দেবীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। রাজা গিরনারের সকল অধি-বাসীকে বিপুল আয়োজনের সহিত তিনদিন ধরিয়া আহার করাইলেন।

গিরনারের শিখর দেশে আম্বাজী মাতার মন্দির প্রাঙ্গণে নব পরিণিতা বধূর মঙ্গল কামনায় উৎসব আনন্দ চলিতে লাগিল। সেই সময় পাটন হইতে একশত ভাগরী মৃত্তিকা বাসন বিক্রয়ার্থ আসিয়া

গিরনার নগরীর উত্তর দরজার অপেক্ষা করিতে-ছিল। তাহারাও রাজ-বাড়ীতে আহারের জন্য নিম-ন্ত্রিত হইল, কিন্তু জয়সিংহ দেবের বিপক্ষ পক্ষের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অযুক্ত মনে করিয়া তাহারা পাটনে পাঠাইয়া যাইতে পথি মধ্যে লালভাট, চন্দ্রভাট প্রভৃ-তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। লালভাট ও চন্দ্রভাট রাণীরোহণে কন্যা লইয়া যাইবার জন্য উপঢৌকন সহকারে সৈন্য, চতুর্দ্দোলা, রথ ও বাদকদল লইয়া আসিতেছিল। ভাগরীদের নিকট রাণীক দেবীর বিবাহ বার্ত্তা শুনিয়া ভাটগণ পাটনে যাইয়া সকল সংবাদ জয়সিংহ দেবের কর্ণগোচর করিলেন।

সিদ্ধরাজ জয়সিংহদেব এই সংবাদ শুনিবা মাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া এক বিপুল সৈন্য বাহিনী লইয়া সুরথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

সিদ্ধরাজ পাটন হইতে মুঞ্জপুরে পৌঁছিয়া এক রাত্রির মধ্যে এক বিশাল "তালাও" (সরোবর) নির্ম্মাণ করাইলেন ; তৎপর ঝানজুবারায় উপনীত হইয়া একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। তথা হইতে বিরাবগ্রামে পৌঁছিয়া মাতার নামে মিলন সর (সুনসর) বলিয়া একটী বৃহৎ সরোবর ও ওডবানে পৌঁছিয়া আর একটী বৃহৎ "তালাও" নির্ম্মাণ করাইলেন। সুরথ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী সাথলে নামক স্থানে উপনীত হইয়া দুর্গ ও আর একটী বৃহৎ 'তালাও" নির্ম্মাণ করাইলেন।

গৃহ শত্রু।

সোপারেথার তীরে দ্বাদশবর্ষ কাল যুদ্ধ হইল কিন্তু কোন পক্ষই পরাস্ত হইল না। রাজাক্ষেন একবার সিদ্ধ রাজের সমুদয় সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ফেলেন আবার নূতন সৈন্য বাহিনী লইয়া সিদ্ধ রাজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। রাজাক্ষেনের অতুল বীরত্ব কাহিনী ভাট গণ ছন্দবদ্ধ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। একদিন রাজা ক্ষেন অকস্মাৎ দুর্গ হইতে একটী দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া শত্রু পক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া শত্রু সৈন্য মথিত করিয়া ফেলিলেন। গির-নার দুর্গ অটল ও অভেদ্য হইয়া রহিল।

রাজা ক্ষেনগার তদীয় ভাগিনেয় দেশলকে অকারণ সন্দেহ করিয়া ভর্ৎসনা করেন। দেশলের মাতা মৃণাল দেবী ইহা জানিতে পারিয়া দেশলকে কহিলেন—"তুমি তোমার পিতৃ সম্পর্কীয় জয়সিংহ দেবের মুখের গ্রাস কাড়িয়া রাণীক দেবীকে তোমার মাতার ভাগের করে সমর্পণ করিয়াও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে না, এখন তোমার এই নগর পরিত্যাগ করিয়াই যাওয়া উচিত।"

সেই রাত্রেই দেশল তদীয় কনিষ্ট ভ্রাতা বিশলকে লইয়া নগরী পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। যখন ভ্রাতৃদ্বয় দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন তখন ধুদ্ধ ও হামীর নামে দুইজন রাজপুত দুর্গদ্বারে পাহারায় নিযুক্ত ছিল। দেশল তাহাদিগকে বলিলেন—"আজ রাত্রে মালব হইতে কয়েক গাড়ী আফিং আসিবে, তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আমি মধ্যরাত্রিতে ফিরিব, সেপর্য্যন্ত দুর্গদ্বার একেবারে বন্ধ করিও না।"

ভ্রাতৃদ্বয় দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেবের শিবিরে গমন করিলেন। তাঁহারা সিদ্ধরাজকে বলিলেন—"আপনি যে আমাদের পিতৃ পক্ষের আত্মীয় তাহা জানিতাম না, সেই জন্যই আমরা রাণীক দেবীকে মামার করে সমর্পণ করিয়া-ছিলাম, তবুও তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট নন ; আপনি যদি আমাদের সহিত যোগ দেন তবে ক্ষেন্ রাজকে হত্যা করিয়া রাণীক দেবীকে আপনার করে সমর্পণ করিতে পারি।"

গভীর নিশীথে সিদ্ধরাজকে সঙ্গে লইয়া যানা-রোহণে দেশল ও বিশল দুর্গদ্বারে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের সহিত সৈন্য ছিল। ধুদ্ধ ও হামীর দেশল ও বিশলের সঙ্গে গাড়ী দেখিয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া দিল। সিদ্ধরাজের সৈন্যগণ গাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ ধুদ্ধ ও হামীরকে হত্যা করিল। তৎপর তাঁহারা রাজা ক্ষেনের শয়ন প্রাসাদের দিকে ধাবিত হইলেন ; গভীর স্বরে সিঙ্গা বাজিয়া উঠিল ; অতর্কিতভাবে দুর্গের সৈন্যগণ আক্রান্ত হইয়া হত হইতে লাগিল। নিশীথে এই প্রকার কোলাহল শুনিয়া রাজা ক্ষেনগার প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া দেখি-লেন,—নিম্নে অগণিত সৈন্য সমস্ত নগরী বিধ্বংস

করিয়া ফেলিতেছে ; তাঁহার সৈন্যদল এই আকস্মিক বিপদে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া ক্ষেন্‌গার নিমেষের মধ্যে নীচে আসিলেন ; রাণীক দেবীকে বলিলেন—নিম্নে অগণিত শত্রু, ভীষণ বিপদ উপস্থিত, আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি দ্বার অবরোধ করিয়া এই স্থানে অবস্থান কর।

রাজা ক্ষেন্ হস্তে একখানি তরবারী লইয়া একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া শত্রুবাহিনীর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শত্রুদল তাঁহার ভীম-ভৈরব মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। ক্ষেন্ রাজের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সৈন্যদল রাজাকে দেখিয়া বীর বিক্রমে যুঝিতে লাগিল। শত্রুপক্ষ হীনবল হইয়া আসিল। রাজা ক্ষেন্ সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেবকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু সিদ্ধরাজের নিকট দেশল ও বিশলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা এখানে কেন?" তাঁহারা নিরুত্তর রহিলেন। রাজা ক্ষেনের আর বুঝিতে বাকি রহিল না এ সর্ব্বনাশ কাহার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। রোষে ক্ষোভে প্রদীপ্ত হইয়া ক্ষেনরাজ সিদ্ধরাজকে পরিত্যাগ করিয়া দেশল ও বিশলকে আক্রমণ করিলেন। সুযোগ বুঝিয়া সিদ্ধরাজ ক্ষেনরাজকে পশ্চাৎভাগে আক্রমণ করিলেন। যদি তন্মূহুর্ত্তে সিদ্ধরাজের বিপুল অসি প্রতিহত হইত তবে ক্ষেন্‌রাজের খড়্গাঘাতে বিশল ও দেশল ধরণী চুম্বন করিত। সিদ্ধরাজের বিপুল খড়্গাঘাতে বীর রাজা ক্ষেন ধরাশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। নগরী হাহাকারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সমস্ত নগরী মৃত সৈন্যের শবে ভরিয়া গেল। রাজা ক্ষেনের বিপুল সৈন্য একে একে গতায়ু হইল।

তৎপর সিদ্ধরাজকে সঙ্গে করিয়া দেশল ও বিশল রাণীক দেবীর শয়ন প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন।

দেশল রাণীক দেবীকে ডাকিয়া কহিলেন—রাজা ক্ষেন্ জয়ী হইয়া আসিয়াছেন, দ্বার খোল।

রাণীক দেবী দ্বার খুলিলে সিদ্ধরাজকে সঙ্গে করিয়া দেশল ও বিশল গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাণীক দেবীর দুই পুত্র সেখানে ছিল। জ্যেষ্ঠ মানেরো ১১ বৎসর বয়স্ক ; কনিষ্ঠ ভগার চান, ৫ বৎসর বয়স্ক। সিদ্ধরাজ ছোট পুত্রটীকে ধরিয়া হত্যা করিলেন। বড় মানেরোকে ধরিতেই সে ছুটিয়া গিয়া মায়ের পশ্চাতে আচল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, রাণীক দেবী ধীর গম্ভীর স্বরে তাহাকে বলিলেন,—

মানেরো তু ম রোয়, মকর আখ্যোরাতিরো ;
কুলমা লাগে খোয়, মরতান সম্ভারিয়ে।

—মানেরো কাঁদিও না, চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে বংশের অপমান করিও না, তোমার মাকে ভুলে যাও, মরিয়া, বংশের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

সিদ্ধরাজ মানোয়াকে সেখানে হত্যা করিতে অনুচরদিগকে নিষেধ করিলেন ও তৎপরে বলিলেন—"রাণীক দেবী যদি পাটন না যান তবে তাঁহাকে হত্যা করিও।" তৎপর সিদ্ধরাজ তাঁহাকে বিশেষ সতর্কতার সহিত বন্দি করিয়া প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করিয়া লইয়া চলিলেন। বহিঃস্থ প্রাঙ্গণে রাজা ক্ষেন্‌গারের মৃতদেহ দেখিয়া রাণীক দেবী কহিলেন—

"স্বামী উঠো সৈন্য লই,
খড়্গা ধরো ক্ষেন্‌গার ;
ছত্র পতীএ ছাইও,
গড় জুনো গিরনার।"

হে স্বামিন্ উঠ, সৈন্য সংগ্রহ কর, ক্ষেনগার, তুমি খড়্গা ধর, তোমার প্রসিদ্ধ গিরনার দুর্গ ছত্রপতি রাজা ছাইয়া ফেলিলেন।

রাণীক দেবী দুর্গ হইতে বাহিরে কিয়দ্দূরে যাইয়া গিরনারের শৈল শিখর দেখিয়া কহিলেন—

"উচো গঢ়গিরনার, বাদলথী বাতু করে ;
মরতা র ক্ষেবগার, রণ্ডাপো রাণীক দেবড়ী।"

হে সমুচ্চ গিরনার শৈল, মেঘের সহিত কথা কহিতেছ, রাজা ক্ষেন্‌গার মরিয়া গিয়াছেন আর রাণীক দেবীও বিধবা হইয়াছে।

যুদ্ধ জয়ের কয়েক দিন পর দেশল ও বিশল পুরস্কার লাভের জন্য সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেবের নিকট গমন করেন। জয়সিংহ দেব তাহাদিগের নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন পূর্ব্বক রাজ্য হইতে বিদূরিত করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার যথোপযুক্ত পুরস্কার দিলেন।

[সতী]

রাণীক দেবী পাটনে গমন করিলে পর সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেব তাঁহাকে সান্ত্বনা ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। সিদ্ধরাজ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। রাণীক দেবী কেবল অশ্রুপাতে ও অনশনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধরাজ রাণীক দেবীকে বিবিধরূপ প্রলোভন দেখাইয়াও বিবাহের জন্য স্বীকৃত করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি কোথায় থাকিলে সুখী হও।"

রাণীক দেবী সুরথস্থ ওডবান নগরীতে যাইতে চাহিলেন। সিদ্ধরাজ তাঁহাকে সেই থানে লইয়া গেলেন। সেখানে আসিয়া রাণীক দেবী "সতী" হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন ও কেহ ইহাতে বাধা দিলে তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন।

ভোগাব নদী তীরে চিতা সজ্জিত হইল, রাণীক দেবী চিতার উপর স্থির আসনে উপবেশন করিলেন। সিদ্ধরাজ অবশিষ্ট শেষ উপায় টুকু অবলম্বনেও নিরস্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"যদি তুমি প্রকৃত সতী হও তবে অগ্নি ব্যতীতই তোমার চিতা জ্বলিবে।"

রাণীক দেবী বীরাসনে উপবিষ্টা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সূর্য্যের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তৎপর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—

"বারু শহের ওডবান,
ভাগোলে ভোগাবো বায়,
ভোগবতী ক্ষেঙ্গার রাণ,
ভোগব ভোগাবা ধনী।"

—হে সুন্দর সহর ওডবান, তোমার সন্নিকটস্থলে ভোগাব নদী বহিতেছে। আমাকে রাণা ক্ষেন্‌গার ভোগ করিয়াছেন, ভোগাব নদী, তুমি এখন আমাকে ভোগ কর।

তখন এমন একটী উষ্ণ বায়ু প্রবাহ ছুটিয়া আসিল যে ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল।

সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেব একটী পক্ষীকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। রাণীক দেবী পক্ষিটিকে ধরিয়া পুনরায় সিদ্ধরাজের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ও তাঁহাকে বলিলেন,—"যদি পরজন্মে তুমি আমার স্বামী হইতে অভিলাষ কর, তবে এস, আমার সঙ্গে পুড়িয়া মর।"

সিদ্ধরাজ সম্মত হইলেন না। ভোগাব তীরে সহাস্য দেবীমূর্ত্তি পুড়িয়া ছাই হইল। ভোগাব নদী কুলু কুলু গানে রাণীক দেবীর সতীত্ব মহিমা ও শোক গাথা গাইয়া চলিল, সতী রমণীর ভস্মাবশেষ মুছিয়া লইল। সতী দেহের পূত রেণুকণা মাথায় লইয়া দর্শকগণ গৃহে ফিরিল।

রাণীক দেবীর আত্মবিসর্জ্জন স্থলে সিদ্ধরাজ জয়সিংহ দেব একটী বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

* এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। গল্পটী ঐতিহাসিক এবং সম্পূর্ণ সত্য ; প্রাচীন রত্নমালিকা ও প্রবন্ধ চিন্তামণি গ্রন্থ এবং ভাট ও চারণগণের প্রচলিত সঙ্গীত ও কবিতা অবলম্বনে লিখিত হইল।

মালদহের শিল্প ইতিহাসের উপাদান। (১)

গত আশ্বিন মাসে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় আমাকে এই উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে পাঠ জন্য "মালদহ জেলার শিল্প সম্বন্ধীয় ইতিহাসের কিছু কিছু উপাদান" সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন, এবং পরেও অভাবপক্ষে মালদহের সংক্ষিপ্ত "শিল্প বিবরণ" লিখিবার অনুরোধ করেন। আমি নানা কারণে তাঁহাকে সময়ে উত্তর দিতে পারি নাই। নিজের অক্ষমতাও জানাইয়া ছিলাম, কিন্তু তিনি "নাছোড় বন্দা"। কুক্ষণে তাঁহার প্রথম পাণ্ডুয়া দর্শনের পাণ্ডা হইয়াছিলাম, আর গৌড়ের চিতাভস্ম হইতে বিষ্ণুপঞ্জর স্বরূপ রক্ষিত কিঞ্চিৎ রঞ্জিত ইষ্টক প্রসাদ দিয়াছিলাম; তাই এখন আমার সেই ইতিহাস-দেবতা—সাধনায় সিদ্ধিপথে অগ্রসর যজমানের কথা এড়াইতে না পারিয়া, আজ আপনাদের সম্মুখে তীর্থক্ষেত্রের মূঢ় পাণ্ডার মত সুশিক্ষিত সুবিদ্বান্ যজমানগণের সম্মুখে নিজ মূর্খতা ও ধৃষ্টতা প্রকাশে উপস্থিত হইতেছি।

তবে আমার হতাশ হইবার কারণ নাই। পৃথিবীর রাজভাগ্যলিপি নির্ণায়ক যুদ্ধগুলির অন্যতম সুবিখ্যাত পলাসী যুদ্ধের সর্ব্বজনশ্রুত সেই অন্ধকূপহত্যা-ব্যাপারের পর সার্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে যেমন একদিকে সেই অন্ধকূপহত্যাকাণ্ড গগনাঙ্গনে প্রস্ফুটিত পরম শোভমান্ কুসুম-স্তবক স্বরূপে ঐতিহাসিক দূরবীক্ষণে প্রতিফলিত হইল, তেমনই আবার অপর দিকে সেই অন্ধকূপহত্যাকাণ্ডের সভ্যতার অমোঘ নিদর্শন, মর্ম্মর স্মৃতি প্রস্তর, প্রাচ্য রাণী রাজধানী কলিকাতার কমনীয় কণ্ঠে দ্যুতিমতী মণিমালার মধ্যমণি স্বরূপে গ্রথিত হইয়াছে। স্বল্পায়তন মালদহ জেলার সুপ্রাচীন গৌড়-পাণ্ডুয়া টাঁড়া বহু সময় পূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছে। ১৫৭৫ খ্রীষ্টীয় অব্দের পর হইতে ভারতবর্ষ বা বাঙ্গলার ইতিহাসে মালদহের স্থান নাই, মালদহ জেলার শেষ শিল্প সম্ভার সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই পরকরতলগত হইতে আরম্ভ করিয়া এক্ষণে নিতান্ত "দৈন্য দশায়" উপস্থিত হইয়াছে। রাজা রাজড়ার গুণগাথা রাজরাজড়া প্রতিপোষিত ভট্টকবিগণের মুখে মুখে চলিয়া আইসে; বিদ্বজ্জন তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের সেনা সেনাপতিগণের কীর্ত্তি-কাহিনী লেখনী মুখে লিপিবদ্ধ করেন; কিন্তু বণিক শিল্পকার, নরপতিগণের কোষাগার প্রতিনিয়ত পরিপূর্ণ রাখিয়া সানুচর তাঁহাদের প্রতিপোষণ করিলেও, বণিক শিল্পকারের মর্য্যাদা কেহ জানে না, তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী কেহ স্মরণে রাখে না। কাজেই আমার কাজ খুব সহজ,—সেই সর্ব্ববাদিসম্মত আদি পৌরাণিক জল-প্লাবনের সময় হইতে বণিকশিল্পকারের কথা আরম্ভ করিয়া এক নিঃশ্বাসে আমি, গৌড়ারণ্যবাসী কাকভূষণ্ডী, যাহা বলিব, তাহা আপনাদিগকে অবশ্যই ধীরতার সহিত শ্রবণ করিতে হইবে। কাজেই এখন "বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি" স্বরূপ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ সমাপ্ত করিয়া মূল আখ্যানের অবতারণা করিতেছি।

মালদহের শিল্প বিবরণ আলোচনার পূর্ব্বে মালদহ জেলার অবস্থান নির্ণয় আবশ্যক। মালদহ জেলার অস্তিত্ব পূর্ব্বে ছিল না। মোটামুটি ইংরাজ আমলের মালদহ জেলা গত ৫০ বৎসরের মধ্যে গঠিত হইয়াছে। মহানন্দা এই জেলার উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। পূর্ব্বাংশ জেলা দিনাজপুর ও পশ্চিমাংশ জেলা পূর্ণিয়ার অন্তর্গত ছিল। মুসলমান আমলে এই জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ সুবে বেহার ও অবশিষ্ট সুবে বাঙ্গলার অন্তর্গত ছিল। পূর্ব্বাংশ "বরিন্দ" নামে পরিচিত ও পশ্চিম ভাগের উত্তরাংশ

(১) উত্তর বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের যগুড়া অধিবেশনে পঠিত।

ব্যতীত অধিকাংশ গঙ্গাগর্ভ হইতে উৎপন্ন ও "দিয়াড়া" নামে পরিচিত। মুসলমান আমলে ও সেন রাজাগণের সময় মালদহের পশ্চিম ভাগের কতকাংশ রাঢ়, মহানন্দার পূর্ব্বভাগ বরেন্দ্র, এবং উত্তর পশ্চিমাংশ মিথিলা ভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদপেক্ষা প্রাচীনতর কালে দক্ষিণ পশ্চিমাংশ সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণ, রাঢ়াংশ গৌড় ও পূর্ব্বাংশ পুণ্ড্র-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহাভারতীয় যুগে এই জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ কৌশিকীকচ্ছ, তাহার দক্ষিণাংশ অঙ্গ ও মহানন্দার পূর্ব্বভাগ পুণ্ড্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কোন কোন সময়ে মালদহের উত্তর ও উত্তর পূর্ব্বাংশে প্রাচীন জ্যোতিষ ও প্রাক্‌জ্যোতিষপুর রাজ্যের সীমা স্পর্শ করিত। মালদহ জেলার এইরূপ প্রাচীন ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় প্রমাণ সাপেক্ষ, তবে তাহা প্রায় সর্ব্ববাদি সম্মত ও মালদহের শিল্পেতিহাসের উপাদান সংগ্রহ সময়ে তদ্বিষয়ক তর্কের অবতারণা ও মীমাংসার অকারণ "পুঁথি বাড়ে" বলিয়া প্রাচীন জনপদ সমূহের সহিত মালদহ জেলার উক্তরূপ ভূটুম্বিতার বিষয় ধরিয়া লইয়া আখ্যান সূত্র অবলম্বন করিতেছি। এক্ষণে এই পুণ্ড্রাজ্য হইতে, প্রথমতঃ মালদহের শিল্পেতিহাসের উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে।

অতি প্রাচীনকালে গণ্ডকী নদীর পশ্চিম পার্শ্বে আর্য্যগণ যখন কৃষিকার্য্যের সহিত যাগযজ্ঞ ক্রিয়ায় নিরত থাকিয়া পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত জঙ্গল ও জলাভূমির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন নাই, যখন পৌরাণিক বিষ্ণু দেবতার নিকট দেবী গণ্ডকী

"যদি দেব প্রসন্নোহসি দেয়ো মে বাঞ্ছিতো বরঃ।
মম গর্ভগতো ভূত্বা বিষ্ণো মৎপুত্রতাং ব্রজ।" (১)

বলিয়া বিষ্ণুর স্বপুত্রত্ব কামনা করেন নাই, বা বিষ্ণু

শালগ্রামশিলারূপী তব গর্ভজাতঃ সদা।
তিষ্ঠামি তব পুত্রত্বে.....। (২)

বলিয়া দেবী গণ্ডকীর প্রার্থনা পূরণ করতঃ তাঁহার তীর্থত্ব সংস্থাপিত করেন নাই। সেই প্রাচীনকালে বৈদিক বা মহাভারতীয় যুগে, প্রাচ্য ভারতে কতকগুলি অনার্য্য রাজ্য সমুত্থিত হইয়াছিল। এই সকল অনার্য্য রাজ্যগুলি যে অধুনাতন কালের ভীল সাঁওতাল আদি পার্ব্বত্য জাতির মত শিল্পজ্ঞান বর্জ্জিত বর্ব্বর ছিল, রামায়ণ মহাভারত হইতে তাহা প্রতীত হয় না। রামায়ণের রক্ষোঋক্ষ বানরাদি আর্য্য ঋষিগণের মত জ্ঞানসভ্যতাসমুজ্জ্বল না হইলেও যে তাঁহারা শিল্পাদির মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, তাহা আদি কবি বাল্মীকির লঙ্কাকিষ্কিন্ধ্যাদির বর্ণনা এবং রক্ষোঋক্ষ বানর সমাজের চিত্র হইতেই সুস্পষ্টীকৃত হয়। মহাভারতেও (৩) দেখিতে পাই "দানব" ময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সভা নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে পুণ্ড্র প্রভৃতি অনার্য্য মহীপালগণ নিমন্ত্রিত ও সাদরে অভ্যর্থিত হইতেছেন। (৪) প্রাচ্য ভারতের রাজগণের নিকট হইতে ভীম কর স্বরূপ "বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরু, বস্ত্র, কম্বল, মণি, মুক্তা বিদ্রুম," (৫) প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। "পূর্ব্ব দেশের অধিপতিগণ মহামূল্য আসন, শয়ন, যান, মণিকাঞ্চন নির্ম্মিত বিচিত্র কবচ, বিবিধ শাস্ত্র, সুবর্ণখচিত ব্যাঘ্র চর্ম্মাবৃত সুশিক্ষিত অশ্ব-সম্পন্ন বিবিধাকার রথ, বিচিত্র গজ, কম্বল, বহুতর রত্ন, নারাচ ও অর্দ্ধনারাচ প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্র, এই সমস্ত মহৎ বস্তু প্রদান করিয়াও মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে প্রবেশাধিকার পান নাই" (৬) বলিয়া ঈর্ষ্যাকাতর দুর্য্যোধন অন্ধপিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হৃদয়ের যাতনা সহ আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন।

এই পূর্ব্বদেশীয় ভূপতিগণের মধ্যে পুণ্ড্রাজ অন্যতম। পুণ্ড্রাজ, বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধাদি মহীপালবর্গের সহিত "সুশিক্ষিত, পর্ব্বত-প্রতিম, কবরাবৃত, সহস্র কুঞ্জর প্রদান করিয়া" (৭) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভাঙ্গনে প্রবেশ জন্য দৌবারিকের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১) বরাহ পুরাণ। (২) বরাহ পুরাণ। (৩) সভাপর্ব্ব। (৪) সভাপর্ব্ব। (৫) সভাপর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়। (৬) সভা পর্ব্ব, ৫০ অধ্যায়। (৭) সভাপর্ব্ব, ৫১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কঙ্ক নামক একটী জাতি অন্যান্য উপহার দ্রব্য সহ "উর্ণাজ, রাঙ্কব, কীটজ, পট্টজ, কমলসদৃশপ্রভাসম্পন্ন ও কার্পাস নির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র, নিশিত ও আয়ত খড়্গ, ঋষ্টি, শক্তি ও নানাবিধ পরশু" (১) সহ দ্বারদেশে উপনীত ছিল।

মালদহ জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ ও পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশস্থিত একটী সীমাবদ্ধ স্থানে গণেশ বা গঙ্গাই নামে একটী জাতির বাস আছে। ইহাদিগের জাতিগত ব্যবসায় বস্ত্র বয়ন এবং গত লোক গণনার সময় ইহারা আপনাদিগকে হিন্দু তন্তুবায় জাতি বলিয়া পরিচয় লিখাইতে অগ্রসর হইয়াছিল। ইহারা মহানন্দা নদীর হিমগিরি-প্রসূতা কঙ্কাই নামক একটী উপনদীর তীরে বাস করে। তাহাদের মধ্যে

"যাঁহা যাঁহা কঙ্কাই,
তাঁহা তাঁহা গঙ্গাই।"

এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহারা আপন দেবতার নিকট শূকর বলি দেয়। আবার ব্যবহার আকৃতি ও অবয়বে ইহারা সাধারণ আর্য্যকুলোদ্ভব হিন্দু জাতি হইতে ভিন্ন। নেপালের তরাই প্রদেশে ইহাদের আদিম বাসস্থান ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। অবয়বের গঠন প্রণালী অনুসারে ইহারা মঙ্গলীয় জাতির শাখা বিশেষ সদৃশ, (Mongoloid) (২)। শ্রীমদ্ভাগবতে কঙ্ক জাতিকে করূদ, খস, কিরাত হূণ প্রভৃতি হিমালয় প্রান্তবাসী জাতির সহিত একত্র বর্ণিত দেখা যায়। উক্ত ও অপরাপর কারণে হিমগিরিনন্দিনী কঙ্কাই তীরবাসী হিমালয় তলস্থ এই গণেশ বা গঙ্গাই নামক জাতিকে প্রাচীন কঙ্ক জাতির বংশধর এবং দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন বিজিত কৌশিকীকচ্ছ জনপদের অধিবাসী বলিয়া আমার অনুমান হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কৌশিকী কচ্ছপতি মহাবল মহৌজা উপস্থিত ছিলেন বা কোন উপহার দ্রব্য দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। অথচ ভীমসেনের দিগ্বিজয়ে মহৌজা মহাবল নরপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ও বিদিত সমস্ত জনপদ হইতেই রাজসূয় যজ্ঞে উপহার প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। এমন অবস্থায় কৌশিকী কচ্ছ হইতে যুধিষ্ঠিরের রাজচক্রবর্ত্তিত্ব গ্রহণের সময় কোন উপহার প্রেরিত না হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং কৌশিকী কচ্ছ হইতেই যে কঙ্কজাতি উপরিউক্ত উপহার দ্রব্য নিচয় লইয়া গিয়াছিল, ইহা অনুমান করিলে সত্যের অপলাপ হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

রামায়ণে পুণ্ড্রদেশকে "ভূমিঞ্চ কৌশকারাণাং" (৩) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। "কৌশকার দিগের ভূমি" এই বাক্যে কৌশেয়ক তন্তুৎপাদক জন্তু বিশেষের উৎপত্তি স্থান বুঝাইতেছে। মালদহ জেলায় রেশম কীট কোষ কোয়া এই নাম এখনও রামায়ণের কৌশ শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং রামায়ণের মতেও কৌশিকী কচ্ছ জনপদের অন্নদূরে কীট পট্টজ বস্ত্রের উৎপাদন উপকরণ অনায়াস লভ্য ছিল।

রামায়ণে অঙ্গদেশকে "ভূমিঞ্চ রজতাকরাং" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (৪) এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরকে পাতরূপময়পুর (৫) বলা হইয়াছে। এখনও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অর্থাৎ আসামে স্বর্ণ পাওয়া যায়। সুতরাং পুণ্ড্র ও কৌশিকী কচ্ছ জনপদদ্বয় হইতে রজত কাঞ্চনময় উপহার যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নীত হওয়া নিতান্ত কবি কল্পনা নহে।

কার্পাস বৃক্ষ মালদহের বরেন্দ্র অঞ্চলে ও পূর্ণিয়া জেলায় বিরল নহে। শতবর্ষ পূর্ব্বেও পূর্ণিয়া জেলায় ও মালদহে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইত (৬)। এমত অবস্থায় কঙ্ক ও পুণ্ড্রগণের দেশে মহাভারতের সময় যে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হইত, তাহা অনুমান অসঙ্গত নহে।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞদ্বার প্রবেশ কালে পুণ্ড্র

(১) সভাপর্ব্ব, ৫০ অধ্যায়। (২) Census Report of India, 1901, Vol VI, Part I p 410. (৩) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। (৪) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০ সর্গ। (৫) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪২ সর্গ। (৬) Dutt's Economic History of British India, P, 251.

দেশাধিপতির সহস্র কুঞ্জর উপহার প্রদানের কথা মহাভারতে এবং দ্বারাবতী অভিমুখে রণ-যাত্রাকালে নিযুক্ত মাতঙ্গ সমভিব্যাহারে গমন সম্বন্ধে হরিবংশে উক্ত আছে। পুণ্ড্রদেশ প্রান্তে এখনও গজদন্তের কাজ হয়। এমন অবস্থায় "বিচিত্রিত গজদন্ত যুক্ত বিচিত্র কবচ" যে মহাভারতের সময় পুণ্ড্রদেশে প্রস্তুত হইত, তাহাতে সংশয় থাকে না।

যে যে রাজ্যে রেসম পশম কার্পাসাদি জাত বস্ত্র, গজদন্ত খচিত কবচ, রজত কাঞ্চনাদিময় দ্রব্য প্রস্তুত হইত, এবং যে যে রাজ্যের রাজা, রাজ-চক্রবর্ত্তী মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই; সেই সেই রাজ্যে যে রথাদি যান এবং খড়্গ নারাক পরশু আদি রণোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রের প্রাচীন কালেই উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাতে স্বতঃই প্রতীতি জন্মে। সুতরাং রামায়ণ ও মহাভারতের আলোচনায় জানিতে পারা যাইতেছে যে পৌণ্ড্রপতি বাসুদেব এবং কৌশিকী কচ্ছরাজ মহৌজার সময় মালদহ জেলায় উর্ণাজ কীটজ পট্টজ বস্ত্র, পদ্ম প্রভ বস্ত্র, মূল্যবান্ আসন, শয্যা, অশ্বরথাদি যান, গজদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্য, নারাচ খড়্গ পরশু আদি অস্ত্র শস্ত্র, অশ্ব গজের সাজ সজ্জা ইত্যাদি শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন হইত। খৃষ্ট জন্মের অন্ততঃ দ্বাদশ শত বর্ষ পূর্ব্বে পৌণ্ড্রক বাসুদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন সুতরাং আজ হইতে অন্যূন তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মালদহ জেলায় মহাভারত কথিত উপরি উক্ত শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত।

মহাভারতীয় যুগের পর বৌদ্ধ যুগ। মহাভারতীয় যুগের শিল্প বৌদ্ধযুগে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। বৌদ্ধ-পরিব্রাজক হোয়েন্থসাং পুণ্ড্রদেশে আসিয়া এখানে বিংশতিসংখ্যক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও কয়েক শত হিন্দু দেবালয় দেখিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জিদ দেখিলে তথায় বৌদ্ধস্তূপ নির্ম্মিত হওয়ার চিহ্ন সকল পাওয়া যায় (১)। পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ, যোগীভবন, মাধাইপুর, নগরপাড়া দ্বারবাসিনী প্রভৃতি মালদহ জেলার নানা স্থানে বৌদ্ধ যুগের সুগঠিত প্রস্তরময়ী ভগ্ন-প্রতিমা পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে যে মালদহ জেলায় বৌদ্ধযুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য বিদ্যার অভ্যুদয় ও উন্নতি হইয়াছিল।

বৌদ্ধগ্রন্থ অশোক-অবদান অশোকের বৌদ্ধগুরু উপগুপ্তের জনৈক শিষ্য প্রণীত। এই গ্রন্থে অশোক রাজার ভ্রাতা বীতশোকের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পলায়নের উল্লেখ আছে। শুনিয়াছি এই গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের আনুষঙ্গিক বিবরণ আছে। সুতরাং অশোক-অবদানাদি বৌদ্ধগ্রন্থে অনুসন্ধান করিলে, তাহা হইতে মালদহের তদানীন্তনকালীন শিল্পসমাচার সংগৃহীত হইতে পারে।

পৌরাণিক যুগে উপস্থিত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে হরিবংশে পৌণ্ড্রক বাসুদেব রণস্থলে খড়্গ, গদা, চক্র, ধনু ইত্যাদির সহিত দ্বারাবতী-অবরোধ কালে পুরী প্রাকার ভেদ জন্য পাষাণ দারুণ টঙ্ক, কুন্ত, কুঠার, কুণ্ডল, পাষাণ-কর্ষণকর শস্ত্রসমূহ ব্যবহার করিতেছেন। মাগধগণ সেই সময়ে পুণ্ড্রগণ অপেক্ষা উন্নততর অশ্মাস্ত্র, ক্ষেপনীয় মুদ্গর, ঊর্দ্ধক্ষেপনী, শস্ত্রপাতবিঘাত আদি নানাবিধ শস্ত্র ও যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, মহাভারতের সময় অপেক্ষা পৌরাণিক যুগে পুণ্ড্রদেশে যুদ্ধোপযোগী যন্ত্র ও শস্ত্রাদির অধিকতর উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে মাগধগণ পুণ্ড্রগণ অপেক্ষা রণ-বিদ্যোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রে অধিকতর উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন।

(১) It is a noticeable fact that the stones of the Adina Mosqne, while they show on the reverce side unmistakable signs of having been part of a Hindu Temple, also, I think, show signs in some places of having been employed at the base of a Buddhist Stupa. The lower line of stones on whioh the mosque rests, are carved in the form of the well-knowu Buddhist—railing which would scarcely have been executed by a Mahomedan or a Hindu. Mr. Samuels, Magistrate of Malda in the District Census report of Malda no 338 G. Dated the 5th March, 1892.

পৌরাণিক যুগেই পাল, শূর ও সেন বংশীয়গণ গৌড়দেশে শাসনদণ্ড চালনা করিয়াছিলেন এই পাল, শূর ও সেন বংশীয় রাজগণের সময় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা গৌড় দেশে উন্নতিলাভ করে এবং তৎপর শাক্ত সৌর শৈব বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। মালদহ জেলার নানাস্থানে এই সময়ের নির্ম্মিত দেবদেবীর প্রস্তর প্রতিমা ও ধাতুময়ী মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। পুরাতন মালদহের ধাতুময়ী সিংহ বাহিনী প্রতিমা ও পাষাণময় বিগ্রহ শ্যামরায়, ভোলাহাটের প্রস্তর নির্ম্মিত বিষ্ণু বিগ্রহ, ভবানীপুরের পাষাণময়ী চতুর্ভুজ দেবী দর্শন যোগ্য। কানিংহাম সাহেব দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত মালদহের সীমান্তবর্ত্তী দেবতলা নামক স্থানে যে পাষাণময়ী বিষ্ণু প্রতিমা দেখিয়া তাহার ছবি আপন রিপোর্টে (১) প্রদান করিয়াছেন, ভোলাহাটের বিষ্ণু মূর্ত্তি অবিকল তদনুরূপ, তবে তদপেক্ষা বৃহত্তর। দেবতলার মূর্ত্তি ১৮ × ৭॥ ইঞ্চি, কিন্তু ভোলাহাটের মূর্ত্তি ৫৯ × ২৮ ইঞ্চি। এই মূর্ত্তিটী একখানি প্রস্তর খুদিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ভবানীপুরের মূর্ত্তি ৫৮ × ৪৮ ইঞ্চি এবং তাহা রঙ্গপুরের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত বেল আমলার দেবী প্রতিমার অবিকল অনুরূপ। ভোলাহাট ও ভবানীপুরের প্রতিমাদ্বয় অন্যূন ২২ ইঞ্চ বেধবিশিষ্ট একখানি প্রস্তরে খোদিত। উভয় প্রতিমাই তৎকালোচিত বসন ও ভূষণে সজ্জিত। ভবানীপুরের প্রতিমার বসন ঊর্ম্মিমদ (ঢেউ খেলান) ও বুটাদার।

পাল ও সেন রাজগণের সময়ে প্রদত্ত কয়েকখানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে। তাহাতে দেবমূর্ত্তি ও লিপি উৎকীর্ণ আছে। এই সকল ধাতু পাষাণময়ী প্রতিমা ও উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে প্রতীত হয় যে, মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে মালদহ জেলায় তাস্কর ও কাস্ত-পিত্তলকারগণ প্রতিমা নির্ম্মাণে সুন্দর পটুতা লাভ করিয়াছিল।

মালদহ জেলায় গৌরব পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের মসজিদ দরগার ভগ্নাবশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দর্শকগণ বাহ্যদৃষ্টিতে তাহাতে কেবল মুসলমান কালের স্থাপত্য বিদ্যায় উন্নতির পরিচয় পান, কিন্তু একটু সতর্কতার সহিত গৌড় নগরস্থিত ভগ্নাবশেষ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, রাভেন্সা, হাণ্টার, কানিংহাম প্রভৃতি লেখকগণ যে ক্ষুদ্র ভূভাগকে হিন্দু গৌড় বলিয়া উল্লেখ করেন, হিন্দু রাজধানী গৌড় তদপেক্ষা বৃহত্তর ছিল, এবং তাঁহাদিগের নির্দ্দেশিত মুসলমান গৌড় ও প্রাচীন হিন্দু গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয় বিশেষ সতর্কতার সহিত গৌড়ের গড়, পরিখা ও দ্বারগুলির পরীক্ষা করতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে উত্তরে কালিন্দীর তীরবর্ত্তী পিছলি গঙ্গারামপুর হইতে দক্ষিণে জহরপুর ডাঁড়ার তীরস্থ গৌড়েশ্বরী দেবীর স্থান পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে গোপালপুরের নিকটবর্ত্তী জহরাতলার দেবী স্থান হইতে পশ্চিমে চণ্ডীপুরের দ্বারবাসিনী ও পাতালচণ্ডী দেবীর স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদয় ভূভাগ প্রাচীন হিন্দু গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। পাতালচণ্ডী পূর্ব্বে পাটলাচণ্ডী নামে পরিচিত ছিল। গৌড়েশ্বরী, দ্বারবাসিনী, পাটলা চণ্ডী, ও জহরাতলার দেবী গৌড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও দুর্গতোরণ রক্ষাকর্ত্রী ছিলেন। ইহাঁরা স্থানীয় অধিবাসীগণের নিকট এখনও প্রতিবর্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্চ্চনা পাইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

(১) Archeological Survey of India, Vol XV.

সুপ্রভাত

"নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা
আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে
প্রাচীন রজনী নাশো
নূতন ঊষালোকে।"

শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি,এ সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৵০ টাকা।

আজ

ধনীর সুপ্রভাত। গৃহীর সুপ্রভাত।

সৌখীনের সুপ্রভাত! মহিলার সুপ্রভাত।

কারণ,—

বঙ্গ-দেশের কারখানাজাত সাবানের মধ্যে

ন্যাশন্যাল সোপ

অভিনব শিল্পজগতে অভাবনীয় যুগান্তর
ঘটাইয়াছে।

আকারে ও গন্ধের স্থায়িত্বে

ন্যাশন্যাল সোপ

বিলাতী সাবানকে পরাস্ত করিয়াছে!

মূল্য ও যথাসম্ভব সস্তা করা হইয়াছে!!

তাই বলিতেছিলাম শিল্পজগতে আজ

সুপ্রভাত!

বাজারে সর্বত্র প্রাপ্তব্য।

অনারেবল মিঃ এস, পি, সিংহ

মুকুল

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর ;
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

দ্বিতীয় বর্ষ। | চৈত্র, ১৩১৫ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

মালদহের শিল্প ইতিহাসের উপাদান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গৌড়ের পাটলাচণ্ডী পুরাণ-প্রসিদ্ধ দেবতা,—স্কন্দ, মৎস্য ও পদ্মপুরাণে তাহার উল্লেখ আছে। বৃহন্নীলতন্ত্রে চণ্ডীপুরের প্রচণ্ডা দেবী বলিয়া দ্বারবাসিনীর উল্লেখ আছে (১)। এই সকল দেবীর পূর্ব্বে বৃহৎ পাষাণময় মন্দির ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। দ্বারবাসিনী চণ্ডীর বিশাল মন্দির প্রাচীরের ও প্রাচীর-সংলগ্ন স্তম্ভের কিয়দংশ এক্ষণেও বর্ত্তমান আছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয়ের সতর্ক পর্য্যবেক্ষণে দ্বারবাসিনী মন্দিরের ধ্বংসাবশিষ্ট ভাগে "মীনা" করা ইষ্টক (Glazed and enamelled) দৃষ্ট হইয়াছে। বল্লালবাড়ীর টামনা দীঘির (তর্পণ দীঘির) উত্তর পাড়ে কৃষ্ণলাল বাবু একখণ্ড খোদিত মীনা করা ইষ্টক মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত দেখিয়া উঠাইয়া আনিয়াছেন (২)। গৌড়ের ও পাণ্ডুয়ার মস্‌জিদের স্তম্ভগুলি, দ্বারবাসিনী মন্দিরপ্রাচীর সংলগ্ন স্তম্ভের অনুকরণ এবং মস্‌জিদ সমূহে দৃষ্ট "মীনা" করা ইষ্টকের পূর্ব্বেও হিন্দু আমলে তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ পাণ্ডুয়া, গৌড়, পুরাতন মালদহ ও মালদহ জেলার অন্যান্য স্থানের মসজিদগুলি যে বৌদ্ধমন্দির; হিন্দু দেবালয় ভাঙ্গিয়া বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। পাণ্ডুয়ার সাতাইশ ঘর সংলগ্ন পুষ্করিণী উত্তর দক্ষিণে লম্বা ও তাহা হিন্দু নির্ম্মাতার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সুবিশাল আদিনা মসজিদের কতকগুলি প্রস্তর যে বৌদ্ধস্তূপের পাদদেশ গঠনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়। অপর কতকগুলি প্রস্তর দ্বারা দেবদেবী মূর্ত্তি এবং পদ্মপুষ্পাকৃতি দ্বারা বৌদ্ধ

(১) বৃহন্নীল তন্ত্র, ৫ম ওটল।
(২) এই ইষ্টকখানি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয় অক্ষয় বাবুকে দিয়াছেন।

এবং হিন্দু স্থপতি ও ভাস্করের স্মৃতি জাগরুক করে। (১) গৌড়ের পীরুসা মিনারের আকৃতি বৌদ্ধস্তূপ সন্নিকটবর্ত্তী স্তম্ভের কথা স্মরণ করায় এবং গৌড়ের মসজিদগাত্রের ইষ্টক খচিত কারুকার্য্যও হিন্দু স্থাপত্যের প্রমাণ দেয়। ইংরাজ লেখকরাও (২) পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের অধিকাংশ মস্‌জিদে Bengalee Fashion উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে দূরদেশাগত শিল্পীর হস্ত পাঠান-শাসন কালেও গৌড় পাণ্ডুয়ার কারুকার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, পৌরাণিক যুগে এবং পরবর্ত্তী মুসলমান শাসনকালে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও অন্যবিধ কারুকার্য্যের জন্য মালদহ পরপ্রত্যাশী ও পরের নিকট ঋণী ছিল না। সার জর্জ্জ বার্ডউড্ ও জেমস ফারগুসন সাহেব মহোদয় দ্বয়ের মতে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বৌদ্ধ যুগের বৌদ্ধ মন্দির, বিহার, স্তূপ ও স্তম্ভ, পৌরাণিক যুগে শিবালয়, বিষ্ণু-মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ দেবস্থান আদিতে এবং তাহাই আবার পাঠান যুগে মস্‌জিদ্ ও মিনারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মালদহেও তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। এক আদিনা মস্‌জিদই সম্ভবতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তিতে এককালে বৌদ্ধস্তূপ, এককালে রাজতরঙ্গিনী কথিত জয়ন্তরাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধনস্থিত কার্ত্তিকেয় মন্দির (৩) ছিল, পরে ইলিয়াস বংশধর সেকন্দর সাহের কৃপায় তাহা আদিনা মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে। ফলতঃ একই প্রাচীন স্থপতি ও ভাস্করের বংশধরগণ ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন নামে একই প্রণালীতে আপন আপন বংশপরম্পরাগত শিল্প কৌশল, বিহার, মন্দির ও মস্‌জিদ্ গাত্রে প্রকাশ করিয়া আপনাদের চিরঞ্জীব কীর্ত্তিযুক্ত আবির্ভাবের পরিচয় গৌড় পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রদান করিতেছে।

গৌড়ের ভগ্নাবশেষ ব্যতীত, ইতিহাস ও পবন দূত নামক নাটক হইতেও লক্ষণসেনের রাজধানীর বর্ণনা পাওয়া যায়। লক্ষণসেন দেবের পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন ধোয়ী কবি বিরচিত পবনদূত হইতে আমরা জানিতে পারি যে গঙ্গাকালিন্দীসঙ্গমের অনতিদূরে লক্ষ্মণসেনদেবের নির্ম্মিত বিচিত্র কৈলাসোপম বিজয়পুর নামক নগরে তাঁহার অভ্রভেদী সপ্ততল রাজপ্রাসাদ এবং মেঘস্পর্শী অর্দ্ধনারীশ্বর দেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুসলমান লেখকগণের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণসেনের গৌড়,—সুবিশাল সৌধরাশি, মনোরম উপবন, প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া লক্ষণাবতী নাম ধারণ করিয়াছিল। ইহা হইতে মালদহে সেন রাজগণের সময় শিল্পকলার যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

পৌরাণিক যুগে মালদহ জেলার শিল্পগৌরবের পরিচয় অন্যসূত্রে ও ভগ্নাবশেষ সমূহ নিহিত ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য কৌশল হইতে যেরূপে সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার আভাস প্রদান করিলাম। মহাভারতীয় যুগ অপেক্ষা এযুগে যে মালদহের শিল্প গৌরবের অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহার কোন কারণ নাই। যেহেতু মুসলমান শাসন পর্য্যন্ত রাজবিপ্লব বা ধর্ম্ম বিপ্লবে ভারতবর্ষের সনাতন পল্লী-সমাজের শক্তিফলে নাগরিক বা গ্রাম্য সমাজভুক্ত শিল্পকার বা কৃষিজীবীগণের বৃত্তি চালনার কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই; এবং মহাভারতীয়, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগে মালদহ জেলা কোন না কোন রাজত্বের কেন্দ্রশক্তি ও রাজধানীকে আপন বক্ষে ধারণ করিয়াছে। বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগের প্রস্তর ও ধাতুময়ী প্রতিমার বেশভূষা ও সাজসজ্জা হইতে এ যুগেও যে বসন, ভূষণ, শয্যা, যান, অস্ত্র, শস্ত্র, ইত্যাদি নানাবিষয়িনী শিল্পকলা প্রচলিত ছিল এবং পৌরাণিক যুগে দেবদেবীসেবার বহুল প্রচার ফলে যে সুবর্ণ রজত তাম্র, কাংস্য, পিতল, প্রস্তরাদি নির্ম্মিত নানা অর্চ্চনাধার, ভোজনপাত্র, পানপাত্র, ইত্যাদির প্রবর্ত্তন ও উন্নতি হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

(১) Census Report of Malda by Samuels.
(২) Cunningham and Fergusson.
(৩) Raj Tarangini as translated by J. C. Dutt under the title of Kings Kashmere Book IV p.

অতঃপর মুসলমান শাসনকালে মালদহ জেলার শিল্প গৌরবের বিষয় আলোচনা করিব। মুসলমান শাসন কালেই মালদহের শিল্পোন্নতি প্রথমতঃ স্থগিত ও তৎপর তাহার পতন আরম্ভ হইয়া মুসলমান শাসন অন্তর্দ্ধানের সহিত তাহার প্রায় তিরোধান ঘটিয়াছে। এই কালের শিল্পেতিহাস আলোচনায়, বাঙ্গলার রাজধানী পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক।

সম্ভবতঃ সেনরাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রাজা বল্লালসেনদেব পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত নিভৃতে শাস্ত্রালোচনা জন্য গঙ্গাতীরস্থ নবদ্বীপে বিশ্রামাবাস প্রতিষ্ঠিত করেন (১) এবং পরে তদীয় পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব বৈষ্ণবধর্ম্মের শান্তমধুররসাস্বাদনপ্রিয়তা চালিত হইয়া ভক্তভাবুক জয়দেবাদি কবিগণের সহিত নবদ্বীপে গঙ্গানিবাস স্থাপিত করেন। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে বিশ্রামাবাস মাত্র সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের রাজধানী গৌড়নগরীতেই ছিল। মুসলমান অধিকার প্রবর্ত্তনের পরও গৌড়নগর প্রায় সার্দ্ধশতবৎসর তদানীন্তন মুসলমান অধিকৃত বাঙ্গলার রাজধানী ছিল। সন ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে ইলিয়াসসাহ পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে রাজধানী নীত হয়। গৌড়ের অস্বাস্থ্যজনকতার উপলব্ধি করিয়া সুলেমান সাহ ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে গৌড়েরই উপকণ্ঠে টাঁড়া নগরে আপন রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর আকবর সেনাপতি মুনিম খাঁ গৌড়ের সৌধসৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি সম্পদ লক্ষ্য করিয়া গৌড়েই রাজধানী নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সেই মোগল কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের বৎসরেই, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে, গৌড়ে ভয়ানক মহামারি উপস্থিত হইয়া গৌড় জনশূন্য করে এবং পরে সাহ সুজার সময় ব্যতীত গৌড়ের নাম আর ইতিহাসে স্থান পায় নাই। অতঃপর রাজমহল, ঢাকা, ও মুর্শিদাবাদ মুসলমান শাসনকর্ত্তৃবৃন্দের রাজধানী হয় ও মালদহের সহিত রাজধানীর সংস্রব সম্পূর্ণ রহিত হয়। বস্তুতঃ, বঙ্গে পাঠান রাজত্ব অবসানের সহিত, মালদহের নাম বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাস হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

পাঠান শাসনকালে মালদহের শিল্প-গৌরবের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পাঠান রাজগণ অধিকাংশ সময় যুদ্ধবিগ্রহ ও আত্মকলহে ব্যাপৃত থাকিলেও, তাঁহাদিগের সময়ে মালদহের শিল্প-সম্ভারের ততদূর অধঃপতন হয় নাই। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ মধ্যে পাঠান রাজগণ কর্ত্তৃক মসজিদ, মিনার, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, কেনাল, ইষ্টক-প্রস্তর গ্রথিত সুদৃঢ় খিলান, সেতু, বাঁধ ও প্রশস্ত রাজপথ আদি নির্ম্মাণের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) ইহাঁদিগের সময়ে যে কার্পাস ও রেসম নির্ম্মিত অরঞ্জিত ও রঞ্জিত নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহার প্রমাণ বিরল নহে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় পরিব্রাজক পর্টুগাল হইতে আসিয়া গৌড় বাদসাহকে মূল্যবান্ উপহার প্রদান করেন এবং গৌড়ের সমৃদ্ধি দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। (৩) এই সময়ে গৌড়ে দ্বাদশ লক্ষাধিক অধিবাসী, মণিমাণিক্যাদি রত্ন ও রেসম কার্পাস নির্ম্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট বস্ত্রবিপণি ও আতপত্র ছায়াপ্রদ বৃক্ষরাজি শোভিত জনাকীর্ণ রাজপথ, সুদৃশ্য হর্ম্ম্য ও রমণীয় উপবন ছিল। এই সময় মালদহ হইতে তুরস্ক, মিসর ও ইউরোপে জাহাজযোগে কার্পাস ও রেসম নির্ম্মিত বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে প্রেরিত হইত। মুনিম খাঁ কর্ত্তৃক পাঠানবিজয়ের সেই বিপ্লব বহুল বৎসরেও পুরাতন মালদহের ভিকু সেথ ইউরোপীয় রুশিয়ায় প্রেরণ জন্য তিন জাহাজ মালদহী বস্ত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে পারস্য উপসাগরে দৈবযোগে তাহা বিনষ্ট হয়। (৪) ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গ-

(১) দানসাগর।
(২) Archeological survey of India, vol XV. (৩) De Baros.
(৪) Birdwood's Industrial Art of India and Hunter's statistical Account of Malda দ্রষ্টব্য।

দেশে জনৈক ইতালীয় পরিব্রাজক আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ (১) হইতে জানা যায় যে এদেশ হইতে প্রতিবর্ষে ৫০ খানি জাহাজ কার্পাস ও রেসমজাত বস্ত্রে পরিপূর্ণ হইয়া বিদেশে যাইত। এই ৫০ খানি জাহাজের মালের অধিকাংশ যে গৌড় হইতে সংগৃহীত হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ পর্য্যটক (২) বঙ্গদেশে আগমন করিয়া টাঁড়ায় কার্পাস ও কার্পাসজাত বস্ত্রের বিশাল বাণিজ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। গৌড়ের ধন-রত্ন লইয়া গিয়াই সুন্দরবন কাটিয়া বাঙ্গালী কর্ত্তৃক স্বাধীন যশোহর রাজ্যের পত্তন হয় ও বঙ্গ-গৌরব (৩) প্রতাপাদিত্য বারম্বার মোগলগণের বিপুল বাহিনীর প্রতি বিক্রম প্রদর্শনে সমর্থ হন। পাঠান রাজত্বাবসানের স্বল্পকাল পরেই আমরা জাহাঙ্গীর সাহ বাদসাহের আমলে সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানের বরপুঃ মালদহের পট্টবস্ত্র কর্ত্তৃক সজ্জিত হইতে দেখি, এবং আমীর ওমরাহগণ মালদহের চারু কারুকার্য্যবিশিষ্ট পট্টজ-পোষাকে ভূষিত হইয়া আগরায় বাদসাহ দরবারের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন, দেখিতে পাই। এই সময়ে মালদহে উৎকৃষ্ট ও দৃঢ় কাগজ প্রস্তুত হইত এবং তাহা বাদসাহ দরবারে সনদ ফারমান দলিল-দস্তাবেজ লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। মুসলমান শাসনকালে মালদহ জেলায় কামান, বন্দুক, তরবারি ও অন্যান্য লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র সুন্দর রূপে নির্ম্মিত হইত। ধাতুময় বাসন-কোসন এই সময় অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইত। হিন্দুগণের সময় হইতে কানসাট (কাংস্য হট্ট বা কংসহট্ট) ও সাহল্লাপুর কাংস্য পিত্তল প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত ছিল। গৌড় ধ্বংসের পর সাহল্লাপুরের কংস বণিক ও কাংস্যকারগণ বালিগ্রাম ও এখন ইংরেজ বাজারের অন্তর্গত কুতুবপুরে পলায়ন করিয়া বাস করিতেছে, এবং কানসাটের বাসনের কারবার নিতান্ত হীনভাবে হুজরাপুর নবাবগঞ্জে বর্ত্তমান আছে। এই সময়ে অতি অল্প দিন পর্য্যন্ত মালদহের কাংস্যকারগণ কাঁসা পিত্তল ঢালাই করিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিত। সাহল্লাপুরিয়া ঘটী এখন প্রাচীন সাহল্লাপুরের বাসনের কারবারের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

মুসলমান রাজত্ব সময়ে কাষ্ঠ খোদাই কার্য্যেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। মালদহের পুরাতন অট্টালিকাসমূহে কাষ্ঠের উপর নানাবিধ সুন্দর কারুকার্য্য এখনও চৌকাঠ, কপাট আদিতে, আলিসার মহবতে, কাষ্ঠের থাম ও মেহরাপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মালদহের পুরাতন কোন কোন পাকা বাড়ীর আলিসার মহবৎ, প্রস্তর ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ছাঁচে তোলা মৃত্তিকা পোড়াইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, দৃষ্ট হয়। এই সকল মহবৎ এরূপ মজবুদ্ ও সুছাঁদ সমন্বিত ও চিত্রিত যে, তদ্দ্বারা মুসলমানশাসনকালে কুম্ভকারগণের ব্যবসায়েরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, অনুমিত হয়। উক্তরূপ মহবৎ এখন আর কুম্ভকারগণ প্রস্তুত করিতে পারে না।

মালদহ হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত এবং রাজধানী গৌড় বিজন ব্যাঘ্র-শার্দ্দূল নিষেবিত গভীর কাননে পরিণত হওয়ায়, মালদহের সকল শিল্পীরই সংখ্যা ও আয় হ্রাস পায়। তবে বিদেশে মালদহের গরদ, কার্পাস ও মালদহী রেসম কার্পাস মিশ্রিত বস্ত্রের কারবার প্রচলিত থাকায়, তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। মালদহের বস্ত্রশিল্পে আকৃষ্ট হইয়া পর্টুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরাজ প্রভৃতি সকল বণিক জাতিই পুরাতন মালদহে ব্যবসার জন্য আসিয়া কুঠী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পুরাতন মালদহই গৌড় ধ্বংসের পর বস্ত্র ব্যবসায়ের প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়ায়। মোগল, আরমানি প্রভৃতি বিদেশীয় জাতির দ্বাবিংশটী কুঠী পুরাতন মালদহের রুকুণপুর ও মোগলটুলি বিভাগে ছিল। রুকুণপুর ও মোগলটুলি এখন আম্র কাননে পরিণত ও শিবা-শার্দ্দূলের ক্রীড়াস্থল হইয়াছে। পুরাতন মালদহস্থ ইংরাজগণের কুঠী আনুমানিক ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে শায়েস্থা খাঁ নবাবের আমলে নবাব সৈন্যগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত

(১) The Travels of Ludivico divar thema. (২) Ralph Fitch. (৩) নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্য।

হইয়াছিল। মালদহে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইংরাজ কুঠিয়ালগণ উদ্ধত প্রকৃতি বলিয়া পুরাতন মালদহের অধিবাসীগণের সহিত তাঁহাদিগের সদ্ভাব থাকিত না। এই অসদ্ভাবের কথা নবাব দরবারে পর্য্যন্ত উঠে। পরিশেষে সম্ভবতঃ এই অসদ্ভাব ফলে পুরাতন মালদহ হইতে ইংরাজ ইষ্টইণ্ডিয়া রেল-কোম্পানীর কুঠী ইংরাজবাজারে উঠিয়া যায়। যে স্থানে এখন গবর্ণমেণ্টের কাছারী আদালত আছে, সেইস্থলে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী নির্ম্মিত হয়। এই কুঠীতেই পরবর্ত্তীকালে মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের বিচারালয় ও কার্য্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরাজ বাজারকে মালদহ জেলার লোকে সাধারণতঃ "রংরাবাজার" বলে। হিন্দুস্থানে রঙ্গীগণ রংরাজ নামে পরিচিত। ইংরাজবাজার টাউনে পূর্ব্বে বহুসংখ্যক রঙ্গীর বাস ছিল। সেই জন্য তাহা "রংরাজ বাজার" নামে অভিহিত হইয়া অপভ্রংশে "রংরা বাজার" হয়। পুরাতন কাগজপত্রে কোথাও ইংরেজবাজার এই নাম নাই। একালের মানচিত্রে তাহা প্রথম অংরেজাবাদ হইতে পরে ইংরেজবাজার হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান ইংরেজবাজারের তলস্থজমী মকদুমপুরের অন্তর্গত এবং তাহা তত্রত্য একজন মুসলমান বিধবার নিকট হইতে কেম্পানীর পক্ষে সালিয়ানা ২০৲ টাকা হিসাবে বন্দোবস্ত হয়। কলিকাতা কাউন্সিলের অধিবেশন বিবরনীতে তাহার উল্লেখ আছে (১)। ইংরেজবাজারের এই কুঠীতে রেসম প্রস্তুত হইত। রেসম প্রস্তুত জন্য ৭৫০ খাই ছিল এবং দুই সহস্রাধিক লোক এই কুঠীতে কাজ করিত। সৈয়দ গোলামহোসেন স্বপ্রণীত রিয়াজউস সালাতিন (২) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"মালদহ (পুরাতন মালদহ) ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে রেসমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কার্পাস নির্ম্মিত মসলিন বস্ত্রও প্রস্তুত হয়। মালদহের গুটী পোকা হইতে রেসম প্রস্তুত হয়। দ্বাদশবর্ষ অতীত হইল, ইংরাজ কোম্পানী মহানন্দার অপরতীরে (বর্ত্তমান ইংরাজ বাজারে) রেসমের কুঠী স্থাপন করিয়াছেন। কুঠীর অধ্যক্ষ ইংরাজ কোম্পানীর ফরমাইস মত প্রস্তুত রেসমী ও কার্পাস বস্ত্র ক্রয় করেন। এজন্য অগ্রিম দাদন করা হইয়া থাকে।" রিয়াজউস সালাতিন সন ১২০২ বাঙ্গালা সালে প্রণীত হয়। সুতরাং ইহা হইতে সেই সময়েও যে মালদহে রেসমী ও কার্পাস বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত, তাহা জানিতে পারা যাইতেছে।

ইংরাজ কোম্পানী প্রবল হইয়া উঠিলে ইউরোপীয় অন্যান্য জাতি বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করে। স্বদেশের বস্ত্র ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য এদেশের বস্ত্রাদির বিলাতে রপ্তানী ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার আইন বলে বন্ধ হওয়ায় মালদহের বস্ত্র বাণিজ্য শ্রীহীন হইয়া পড়ে। বোম্বাই প্রদেশীয় বণিকগণ পারস্য উপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরে তত্রত্য অধিবাসীগণের জন্য মালদহী কাপড় স্বল্পাধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতেন। তাহার ফলে স্বল্প পরিমাণ মালদহী কাপড় প্রস্তুত হইতেছিল। এই রপ্তানী পরিমান এখন খুব কমিয়া গিয়া মালদহের বস্ত্র ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ তিরোধানের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে বস্ত্র-বাণিজ্যে বাঙ্গালার কোন স্থান মালদহের তুল্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শতবর্ষ পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ লেখক (৩) স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"কি সম্ভ্রান্ত, কি গরিব, সকল পরিবারেরর স্ত্রীলোকেই সূত্র নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের কার্পাস হইতে ২৫ লক্ষ টাকার সূত্র প্রস্তুত করিয়া তাহারা প্রতিবর্ষে ২০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিত। এতদ্ব্যতীত সুজনী নামক সুদৃশ্য ও মজবুত কাঁথাও তাহারা প্রস্তুত করিত এবং তাহাতেও প্রচুর টাকা তাহাদিগের গৃহে আসিত।" এখন স্ত্রীলোকদিগের পরিশ্রমের মূল্য কপর্দ্দক মাত্র নহে। পুরাতন মালদহে মুসলমান স্ত্রীলোকগণ

(১) Wilson's Annals of Early British Administration of Bengal.
(২) রামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত অনুবাদ, ৩৬ পৃঃ। (৩) Buchanon.

বৎসরে দুই চারি খানি মাত্র সুজনী প্রস্তুত করে মাত্র।

উক্ত লেখকের প্রদত্ত বিবরণে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে কেবল রেসমী বস্ত্র প্রস্তুত কার্য্যে সেই সময়ে পুরাতন মালদহে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে সাত শত তাঁত নিযুক্ত থাকিয়া দেড় লক্ষ টাকার বস্ত্র উৎপাদন করিত ও তন্মধ্যে রেসমের মূল্য বাদে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁতিগণের ঘরে থাকিত, অর্থাৎ সেই সস্তার অবস্থায়, টাকায় দুই মন চাউলের সময় প্রত্যেক তাঁতে মাসিক ৬৲ টাকার কম তাহারা লাভ করিত না।

উক্ত ইংরাজ লেখকের বিবরণে আরও জানা যায় যে রেসম কার্পাস মিশ্রিত মালদহী বস্ত্র বয়ন জন্য সেই সময়ে মালদহ নগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে অন্যূন ৮০০০ তাঁত ছিল, এবং এই সকল তাঁতের প্রত্যেকটীতে মাসিক ২০৲ টাকার কম লাভ হইত না। এই হিসাবে মালদহী বস্ত্র হইতে মালদহের তাঁতিগণ অন্ততঃ দেড় লক্ষ টাকা লাভ করিত। এতদ্ব্যতীত প্রায় এক সহস্র তাঁত ইংরাজ কোম্পানীর নিকট দাদন লইয়া তাঁহাদিগের ফরমাইস মত "এলাচি" প্রভৃতি রপ্তানী যোগ্য বস্ত্র প্রস্তুত করিত। আমরা বুকানন হামিণ্টনের সাক্ষ্যে (১) জানিতে পারি যে এখন হইতে একশত বর্ষ পূর্ব্বে মালদহ হইতে সার্দ্ধ দ্বিলক্ষ মুদ্রা মূল্যের মালদহী বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। হাণ্টার সাহেবের অনুসন্ধান মতে (২) চল্লিশ বৎসর পুর্ব্বে ৬০০০৲ টাকার মাত্র মাল রপ্তানী হইয়াছিল, এখন বৎসরে এক হাজার টাকারও মালদহী বস্ত্র প্রস্তুত হয় না।

ইংরাজী ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী রেসম ও কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত না হইয়া যাহাতে কেবল রেসম উৎপাদিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। রেসমের কাটনীদারগণ যাহাতে বাহিরে কার্য্য না করিয়া কেবল কোম্পানীর কুঠিতে রেসম প্রস্তুত করে, তাহার ব্যবস্থা করেন এবং এই ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিলে রেসম কাটনীদারগণের উপর গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। (৩) ইহার ফলে তন্তুবায়গণেরও বস্ত্র বয়নের নানারূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। এই ব্যবস্থায় মালদহে বস্ত্র বয়ন উঠিয়া গিয়া মালদহবাসীগণ কেবল রেসমসূত্র প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে ও তাহার অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হইয়া আসিয়াছে। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগেও মালদহে বড় বড় বস্ত্র-বণিক ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। পুরাতন মালদহের মোকাত্তিপুর গ্রামে এই সময়ে ৭৫০ ঘর তন্তুবায় ছিল এবং বুলচাঁদ শেঠ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বণিকের কলিকাতা হইতে জাহাজ যোগে কার্পাস ও রেসমী বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত ইহা আমরা তাঁহার দৌহিত্রীর নিকট শুনিয়াছি। এখন পুরাতন মালদহে একখানাও তাঁত নাই। জেলার বাহিরে মালদহের কার্পাস বস্ত্র রপ্তানী হয় না, রেসমী বস্ত্রও জেলার বাহিরে অল্প স্বল্প যায়। উক্তরূপ ব্যবস্থার ফলে মালদহে এখন প্রধানতঃ কোয়া প্রস্তুত হয়, ও তাহার অধিকাংশ ইংরাজগণের কলে কাটাই হইয়া বিলাতে যায়, দেশীয় খাই কলে স্বল্প পরিমাণে রেসম প্রস্তুত হয়, ও তাহা বারাণসী, কনজেবেরম্, তাঞ্জোর, নাগপুর, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেরিত হয়।

বস্ত্র বয়ন ও বস্ত্র ব্যবসায় লোপের সহিত এ জেলার সূত্ররঞ্জন ও রঞ্জিত সূত্রের ব্যবসায়ও বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। এখন রঙ্গীগণ আর আপন ব্যবসায়ে নিযুক্ত নাই। তাহারা এখন আর লাক্ষা, কুসুমফুল, কাঁঠাল কাষ্ঠের গুঁড়া, হরিতকী চাকুন্দা, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, তেঁতুল ইত্যাদি সামান্য সামান্য দেশীয় উপাদানে সুন্দর সুন্দর অথচ পাকা রং উৎপাদন করে না। এখন বিলাতী রঞ্জন উপকরণের সাহায্যে অল্পস্বল্প পরিমাণে সূত্র রঞ্জিত হয়।

যে সময়ে রেসম ব্যবসায়ের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময়ে অর্থাৎ গত শতাব্দীর প্রথম-

(১) Hunter's Statistical Account of Malda. (২) Ditto.
(৩) Dutt's Economic History of British India.

ভাগে অনুমান ১৮০৪ কি ১৮০৫ সালে মালদহ জেলায় নীলের চাষ প্রবর্ত্তিত হয়। (১) ইংরাজী ১৮৭৩ সালে প্রায় ২০টী নীলের কুঠী এ জেলায় বর্ত্তমান ছিল ও অন্যূন ৮০,০০০ আশি হাজার বিঘা জমীতে ৮০০,০০০ আট লক্ষ টাকার নীল উৎপন্ন হইত। (২) এই ব্যবসায়ের প্রধান লভ্যাংশভাগী ইংরাজ বণিকগণ ছিলেন। কিন্তু গত ২০ বৎসরের মধ্যে এই ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিয়া এখন ইহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

মালদহে লবণ এবং তাম্রদস্তাদি ধাতু ব্যতীত শিল্পজ কি স্বভাবজাত কি কৃষিজাত কোন দ্রব্যের জন্য মালদহ পরমুখাপেক্ষী ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গত ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এ জেলায় যে যে ব্যবসায়ে যত লোক নিযুক্ত ছিল, তাহা হইতেই সেই সময়ে এ জেলায় শিল্পের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যাইবে। মালদহে ৪০বৎসর পূর্ব্বে নিম্নলিখিতরূপ শিল্পশ্রমজীবী আপনাপন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল :— (৩)

কাষ্ঠের কাজের জন্য করাতিয়া	৩৩ জন
সূত্রধর	৮৬৩ „
নৌকা নির্ম্মানকারী	৯৪ „
গরুর গাড়ী নির্ম্মাতা	৪০ „
অন্য উৎকৃষ্ট গাড়ী নির্ম্মাতা	১৬ „
কাংস্যকার, পিত্তলকার	৫৬১ „
লৌহকার	৭৬৫ „
স্বর্ণকার	১১২৫ „
জহুরী	৩ „
টীনের কার্য্যকার	৮ „
কুম্ভকার	৯৪৬ „
মাদুর নির্ম্মাতা	৩৪ „
পাখা	১ „
পেটারাদি বেতের জিনিষ	৬২ „
মালা প্রস্তুত কারক	৩৮ „
খেলানা „	৩০ „
হুকা প্রস্তুত কারক	৫২ জন
শঙ্খের জিনিস „	১৬১ „
সোলার নানাবিধ ফুল ফল ও হ্যাট আদি	৬ „
তাঁত	২ „
কার্পাসসূত্র	১০২ „
কার্পাস বস্ত্র বয়ক	৪৮৫৪ „
রেশম বস্ত্র „	২৮৭ „
দরজি	৩৬৯ „
রঞ্জন কার্য্যকারক	৬৫ „
স্বর্ণ লেস্ প্রস্তুত কারক	১ „
জুতা „	৮৭২ „
ছাতা „	৭ „
খোদকারি কার্য্য-কারক	৭ „
ভাস্কর	২ „
কাগজ প্রস্তুত কারক	১ „

এতদ্ব্যতীত কাগজ কাটিয়া বাণ্ডিল, ঝাড়, তাজিয়া ফুল ফল বাগান ইত্যাদি, মোম হইতে নানাবিধ ফুল ফল, জেলার বিল খাল হইতে লব্ধ ঝিনুক হইতে চূণ ও তাহা হইতে পালিসের ব্যবহার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট চূণ, ও অন্য নানাবিধ শিল্প মালদহে প্রচলিত ছিল। তার ও সোলার পাতার সাহায্যে সলমার কার্য্য খুব প্রচলিত ছিল। বিশেষজ্ঞদিগের মতে মালদহের সলমা বাঙ্গালার সকল জেলা হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত কিন্তু তাহা এখন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার হাউইগীরগণ অতি সুন্দর নানাবিধ আতোষবাজী প্রস্তুত করিত, এখন আর তাহার কারবার নাই বলিলেই চলে। মালদহে বড় বড় নৌকা প্রস্তুত করিবার কারখানা তুলসীহাটা, মুরালিপুর ও ইংরাজ বাজারে ছিল। তাহাতে ময়ূরপঙ্খী, মধুকর, ভ্রমর, বজরা, বে-আইন আদি চারু-শিল্প পরিচায়ক নৌকা ও মাল বোঝাই করিবার উপযোগী বড় বড় নৌকা ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও প্রস্তুত হইত। এখন এই সকল নৌকা বা চারু কারুকার্য্য পরিচায়ক বাক্স, সিন্দুক,

(১) রিয়াজ উস্‌সালাতিন। (২) Hunter' statistical Account of Malda.
(৩) Hunter' sstatistical Account of Malda.

চৌকাঠ, কপাট আদি প্রস্তুত হয় না। ছাতা, জুতা, কাগজ, লেস প্রস্তুত হয় না, সোনা, সলমা ও কাটা-কাগজের শিল্প প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, ভাস্কর কেহ নাই। যে মালদহ হইতে মস্‌লিন বয়নকারী ঢাকায় গিয়া ঢাকার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিল, সেই মালদহে জোলার মোটা গামছা ভিন্ন কার্পাস বস্ত্র পাওয়া যাইত না। "স্বদেশী" প্রচারের পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী ও তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়দিগের চেষ্টায় ও উৎসাহে জোলারা ব্যবহার্য্য পরিধেয় ধুতি সাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখানে নিপুণ স্বর্ণকার আর নাই, ঢাকা হইতে স্বর্ণকার আসিয়া স্থানীয় মহিলাগণের মন রক্ষা করিতেছে। মালদহের দরজিগণ রঙ্গপুর, দিনাজপুর রাজসাহী ইত্যাদি জেলায় যাইবার সময় "বাঙ্গলা যাইতেছি" বলিয়া আপনাদিগের প্রাচীন গৌরবময়ী জন্মভূমিকে স্মরণ করিত। এখন এখানে ভাল কাট ছাঁট পাইতে হইলে বাবুদিগকে কলিকাতার দরজির আশ্রয় লইতে হয়। অল্পদিন পূর্ব্বেও মালদহের রাজমিস্ত্রীগণ পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহে সম্ভ্রান্ত ধনিগণের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে যাইত, এখন অন্য স্থানের রাজমিস্ত্রীর সাহায্য ভিন্ন মালদহের ধনিগণ নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতে পারেন না। মালদহের বিলখাল হইতে ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া মালদহের চুণিয়াগণ স্থানীয় চুণের প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে না, সিলেটের পাথুরে চুণ দ্বারা মালদহের চুণের অভাবের পরিপূরণ হইতেছে। ফলতঃ মালদহের প্রতি বিশ্বকর্ম্মার কৃপা একেবারে অন্তর্হিত ও তাঁহার অর্চ্চনা এ জেলা হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিশ্বকর্ম্মার অকৃপায়, লক্ষ্মী বিমুখ হইয়াছেন এবং ষষ্ঠীদেবীও শিল্পকারগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন নাই এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগের প্রতি মহিষ-বাহনের দৃষ্টি বিশেষরূপ পতিত হইয়াছে।

চিরদিন সমান যায় না। কালনেমির আবর্ত্তনে পুরাতন বিদায় লইতেছে; নূতন আগমন করিতেছে; উন্নত নত হইতেছে, নত উন্নত হইতেছে; চীরধারী বন্য সুসভ্য, সুসংস্কৃত হইতেছে, সুবর্ণমণ্ডিত পট্টবস্ত্রপরিধায়ী, চীরধারী বন্য মানবের দশা প্রাপ্ত হইতেছে। যে মালদহের কীটজ বস্ত্রের স্মৃতি সীতান্বেষণে বানর প্রেরণ সময়ে কপীশ্বর সুগ্রীবের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল; যে মালদহের কীটজ ঊর্ণাজ ও কার্পাসজাত বস্ত্রাদি, হস্তিদন্তখচিত নানাবিধ দ্রব্যও আয়ুধাদি মহারাজা রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে মালদহের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য ভাস্বরতা গৌড় পাণ্ডুয়ার চিতাভস্মস্তূপ উদ্ভিন্ন করিয়া প্রকাশিত হইতেছে, ও রঙ্গপুর, দিনাজপুর, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে গৌড় হইতে নীত ইষ্টক প্রস্তরখণ্ড সকল যাহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে; যে মালদহের প্রাসাদাট্টালিকা ধ্বংস করতঃ ইষ্টক খনন জন্য নবাবভাণ্ডারে পার্শ্ববর্ত্তী জমীদারগণ সালিয়ানা আট হাজার টাকা নজরানাস্বরূপ প্রদান করিতেন, (১) যে মালদহের বস্ত্রবাণিজ্য পুরাকালে রোমক ও মিসর দেশে ও অধুনাতন কালে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও পর্টুগাল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছিল, যে মালদহের সুধাধবলিত সৌধসঙ্ঘের বর্ণনা কবি-লেখনীতে নাটকাদি অলঙ্কৃত করিয়াছে; যে মালদহ জেলার সুনিপুণ শিল্পীগণের চারু কারুকার্য্যে গৌড় মহানগরী দ্বাদশ লক্ষাধিক অধিবাসী, সুবিমল, সুন্দর প্রাসাদ, নয়ন-রঞ্জন উদ্যান, সুপ্রশস্ত, জনাকীর্ণ রাজপথ, মরকতমণি, মৌক্তিক-সুবর্ণাদি বিজড়িত বসন ভূষণাদি শোভিত বিপণিনিচয় বক্ষে ধারণ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে পর্টুগীজ

(১) In the Revenue returns of Bengal at the time of its transfer to the Company, there was an annual levy of Rs. 8000, as "Gaur brick Royalty," from landholders in the neighbourhood of Gaur who had the exclusive right of dismantling its remains.

Vide Gour, in Encyclopaedia Britanica.

পর্য্যটকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল; যে মালদহের পট্টবস্ত্র সাদরে জগজ্জ্যোতিঃ সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের কমনীয় কলেবর-কান্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিল, যে মালদহে বাণিজ্যলক্ষ্মীর সুদীর্ঘকাল অধিষ্ঠান হেতু এখানে "সওয়া প্রহর সুবর্ণ বর্ষণের" প্রবাদ প্রচলিত আছে, সেই মালদহ এখন বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, শিবা, শ্বাপদ তাড়াইয়া, পতিত ভূমি সকল নিরলস ভাবে আবাদ করিয়াও অনাহারে জীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ; তাহার তাঁতি, কর্ম্মকার হাহাকার করিতেছে, ঢেঁকি, যাঁতা ঠেলিয়াও তাহাদের উদর পূর্ণ হইতেছে না। রাজদ্বারে গতায়াত ও রাজসেবাও তাহার জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে অশক্ত। মালদহ ঠেকিয়া শিখিয়াছে:—

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।
স্তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি॥
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং।

পরিশেষে বোধ হয় ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে শিখিবে:—

ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

প্রেরণা।

মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি ওই শুনা যায়,
নব ঊষা জাগিয়াছে ভারতের গায়।
নব যুগে নব বল বিধাতার দান,
লভিয়া কৃতার্থ হও ভারত-সন্তান।
পূত বারি ঢাল সবে আবিলতা মাঝে,
সংযম নিষ্ঠার ভরে সাজ নব সাজে।
দীনতা বৈরাগ্য দুই বর্ম্মের ভিতর,
সুরক্ষিত রাখ ভাই, দুর্ব্বল অন্তর।
অনন্ত সাধনা লও, ধীর শান্ত ভাবে,
অস্থিরতা মলিনতা সুদূরে পলাবে।
ভারতের তপোবন ওই বিদ্যমান,
কত শত মহাঋষি হবেন উত্থান!
নব বল লভ সবে নব প্রেরণায়,
ভারত-জননী সেবি ধন্য এ ধরায়—
হও হে সন্তান সবে, লভহ চেতনা,
মঙ্গলের শঙ্খ-ধ্বনি নহে ত কল্পনা।
এ যে শক্তি মহাশক্তি নহে প্রভু ভুল,
প্রেরণা তাঁহারি হাত, যিনি সর্ব্ব মূল!
ভীরু প্রাণে জাগিয়াছে বিধির করুণা,
ভুলিও না, ভুলিও না—এ মহা প্রেরণা!

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

কিসা গোতমী ও বুদ্ধ।

পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। বুদ্ধের জীবনচরিত ও বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র যে কত ভাষায়, কত রকমে লিখিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বুদ্ধের জীবনচরিত আলোচনা করা সম্বন্ধে একটী প্রধান অন্ত-রায় এই যে তাঁহাদের বংশক্রমের (কুলজীর) কোন হিসাব পাওয়া যায় না। ইহার উপর, একই নামের অনেক লোক একই সময়ে বিদ্যমান থাকায় কে যে কোন ব্যক্তি তাহা ঠিক করা অত্যন্ত কঠিন। বুদ্ধের জীবনচরিতেরও সকল ঘটনা পর্য্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ হয় নাই। যাঁহারা বুদ্ধের জীবনচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সক-লেই ইহার সত্যতা সম্যক্‌রূপে অনুভব করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। একই ঘটনা নানা গ্রন্থে নানা ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নানা ভাবে বর্ণিত একই ঘটনা প্রকৃত পক্ষে একই কিনা তাহা ঠিক করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বাঙ্গালা দেশে বুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাদের অনেক স্থলে তিব্বতীয় গ্রন্থে বা সিংহলীয় গ্রন্থের বর্ণনার সহিত প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আজ সেইরূপ একটী আখ্যায়িকার আলো-চনা করিব।

কিসা গোতমী শ্রাবস্তী নগরের এক মহা সমৃদ্ধি-শালী ধনাঢ্যব্যক্তির পত্নী ছিলেন। তাঁহার পতির ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা ছিল না। দুঃখের বিষয়, ইঁহার পতি একটীমাত্র শিশু পুত্র রাখিয়া বিবাহের কয়েক বৎসর পরে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শিশুটী কতিপয় বৎসর পরে পিতার অনুগমন করে। সে দেখিতে অতিশয় সুন্দর ছিল।

কিসা একমাত্র পুত্রশোকে একান্ত অধীরা হইয়া পড়িলেন। মৃত পুত্রদেহ স্কন্ধে লইয়া তিনি দ্বারে দ্বারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন কেহ মৃত-সঞ্জীবন ঔষধ দ্বারা তাঁহার শিশুটীকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন কিনা। সকলেই কাতর অন্তঃ-করণে বলিলেন ইহার কোনও ঔষধ নাই। কিন্তু হায়! পুত্র বৎসলা হতভাগিনী জননীর প্রাণ এ কথায় কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। তিনি এ কথা বিশ্বাস করিলেন না; মৃত পুত্রদেহ স্কন্ধে লইয়া পাগলিনীর ন্যায় সম্মুখে যাঁহাকে পাইতেন তাঁহাকেই মৃত-সঞ্জীবন ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করি-তেন। অবশেষে তাঁহার সহিত এক বৃদ্ধ বৌদ্ধ শ্রমণের সাক্ষাৎ হয়। বৌদ্ধ-ভিক্ষু বলিলেন, "হে মাতঃ! তুমি ভগবান বুদ্ধের নিকট গমন কর। তিনি তোমাকে ইহার ঔষধ প্রদান করিবেন।" এখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য, মহাত্মা বুদ্ধ অলৌকিক ঘটনা সকল (miracles) সংঘটন করিতে পারি-তেন। যখনই কাহাকেও তাঁহার ধর্ম্মে সন্দিহান-বশতঃ দীক্ষিত হইতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিতেন তখনই মহাত্মা বুদ্ধ কিম্বা তাঁহার কোনও প্রিয় শিষ্য * যাদু দেখাইয়া তাঁহাকে দীক্ষিত করিতেন। এ কথাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন, বৌদ্ধ শ্রমণগণ যাদুবিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বুদ্ধ শিষ্যগণকে লইয়া যেখানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন কিসা মৃত পুত্রদেহ স্কন্ধে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া মহাত্মা বুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! আপনি অনেক ঔষধ জানেন, অনুকম্পাপূর্ব্বক হত-ভাগিনীর এই একমাত্র মৃতপুত্রের পুনর্জ্জীবনের ব্যবস্থা করুন।" প্রশান্তমূর্ত্তি মহাত্মা বুদ্ধ উত্তর করিলেন "হে প্রিয় ভগিনি! তুমি নগরে গমন কর; যে গৃহে ইতিপূর্ব্বে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, দাস কিম্বা দাসী কাহারও মৃত্যু হয় নাই, এমন কোন একটী গৃহ হইতে এক মুষ্টি কৃষ্ণ সর্ষপ আনয়ন কর, আমি তোমার ঔষধের

* Performed magical feats—Rockhill.

ব্যবস্থা করিয়া দিব।" * মহাত্মা বুদ্ধের কথা শুনিয়া গোতমী সানন্দচিত্তে সর্ষপ আনয়নের জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু হায়! অসংখ্য বাড়ী ঘুরিয়াও এমন একটী বাড়ী পাইলেন না যেখানে এক মুষ্টি কৃষ্ণ সর্ষপ সংগ্রহ করিতে পারেন। প্রত্যেক বাড়ীতেই শুনিলেন, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, দাস, দাসী কাহারও না কাহারও মৃত্যু হইয়াছে। যতই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, ততই কিসার মন প্রশান্তভাব ধারণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ কিসার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল, ক্রমশঃ তিনি বুঝিতে পারিলেন সংসার অনিত্য, আজ যাহা আছে, কাল তাহা নাই। শোক, জরা, মৃত্যু বিশ্বসংসারকে ওতপ্রোত-ভাবে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহার হাত এড়াইবার উপায় নাই। তিনি মৃতপুত্র দেহ শ্মশানে নিক্ষেপ করিয়া নিম্নলিখিত গাথা গাহিতে গাহিতে মহাত্মা বুদ্ধের নিকট গমন করিলেন।

"ন গামধম্মো নো নিগমস্‌স ধম্মো
"ন চাপি'য়ম্ এককুলস্‌স ধম্মো
সব্ব লোকস্‌স সদেবকস্‌স এসেব
ধম্মো যদিদং অনিচ্ছতাভি"

সকল বস্তুই অনিত্য। এই অনিত্যতা গ্রাম, নগর বা বংশ বিশেষের ধর্ম্ম নহে। ইহা সকল লোকের ও দেবগণের ধর্ম্ম।

মহাত্মা বুদ্ধ, কিসার বৈরাগ্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া ও সমাহিতচিত্ত অনুভব করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গোতমি! তুমি কি সর্ষপ পাইয়াছ?"

গোতমী পূর্ণ প্রাণে আপন মনে গাহিলেন,—

"সব্বলোকস্‌স সদেবকস্‌স এসেব ধর্ম্ম, ইহা সর্ব্বলোকের, সকল দেবতার ধর্ম্ম। হে ভগবন্! আমার সর্ষপের প্রয়োজন নাই, সর্ষপের কাজ আমার নিষ্পন্ন হইয়াছে, আমার চিত্ত স্থির হই-য়াছে।"

তখন বুদ্ধ গোতমীকে বলিতে লাগিলেন—

"তং পুত্তপসুসম্মত্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তং গামং মহোঘংহ্ব মচ্চু আদায় গচ্ছতি॥
ন সন্তি পুত্তা তাণায় ন পিতা ন পি বান্ধবা।
অন্ত কেনাহধি পন্নস্‌স নত্থি ঞাতিসু তাণতা॥
এত মথবসং ঞত্বা পণ্ডিতো সীল সংবুতো।
নিব্বাণ গমনং মগ্গং খিপ্পমেব বিসোধয়ে॥" †

মহান জলপ্রবাহ যেমন সুপ্ত গ্রামকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ পুত্রে এবং পশুতে ব্যাসক্ত চিত্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু লইয়া যায়। পুত্রও ত্রাণ করিতে পারে না, পিতাও পারেনা, বন্ধুরাও পারেননা, মৃত্যু যাহাকে অধিকার করে জ্ঞাতিদিগের দ্বারা তাহার পরিত্রাণের সম্ভাবনা কোথায়? সুশীল ও পণ্ডিতজন এই সকল বাক্যের তত্ত্ব অবধারণ করিয়া সত্বর নির্ব্বাণ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ মার্গকে (অষ্টাঙ্গ মার্গকে) অবলম্বন করেন।

মহাত্মা বুদ্ধের নিকট উপরোক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া কিসার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—

রতিয়া জায়তে সোকো রতিয়া জায়তে ভয়ং।
রতিয়া বিপল মুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং॥ ‡

আসক্তি হইতেই শোক উৎপন্ন হয়, আসক্তি হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। যিনি অনাসক্ত, তাঁহার শোক নাই, তাঁহার ভয় কোথায়?

কামতো জায়তে সোকো কামতো জায়তে ভয়ং।
কামতো বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোক কুতো ভয়ং॥ ‡

*——— ———I pray thee, find
Black mustard seed a tola; only mark
Thou take it not from any hand or house
Where father, mother, child or slave hath died
Arnold.

† ধম্মপদং—মগ্গবগ্গো বীসতীমো ১৫।১৬।১৭ গাথা।
‡ „ —পিয়বগ্গো সোলসমো ৬।৭।৮।৪।৫"

কামনা হইতে শোক উৎপন্ন হয়, কামনা হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। যিনি বিমুক্তকাম হইয়াছেন, তাঁহার শোক কোথায়, ভয়ই বা কোথায়?

তনহায় জায়তে সোকো তনহায় জায়তে ভয়ং।
তনহায় বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতোভয়ং॥ *

তৃষ্ণা হইতে শোক উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। যিনি তৃষ্ণা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার শোক নাই, ভয় কেমন করিয়া থাকিবে?

পিয়ত্তো জায়তে সোকো পিয়ত্তো জায়তে ভয়।
পিয়ত্তো বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতোভয়ং॥ *

প্রিয়বস্তু হইতে শোক উৎপন্ন হয়, প্রিয়বস্তু হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। যিনি প্রিয়বস্তু হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার শোকও নাই ভয়ও নাই।

তিনি আরও বুঝিলেন—

প্রেমতো জায়তে সোকো প্রেমতো জায়তে ভয়ং।
প্রেমতো বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতোভয়ং॥ *

প্রেম হইতে শোক উৎপন্ন হয়, প্রেম হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। যিনি প্রেমের হাত এড়াইতে পারিয়াছেন, তাঁহার শোক নাই, তাঁহার ভয় নাই।

কিসা আর সংসারে ফিরিলেন না। বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুনী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র॥

জাপান সাম্রাজ্য এবং তাহার শাসন পদ্ধতি।

প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটী দ্বীপপুঞ্জ লইয়া জাপান সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে। এই দ্বীপগুলি সমস্তই পর্ব্বতময়। আগ্নেয়গিরির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইলেও এখন পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক একান্নটী বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে অনেকগুলিই আজ পর্য্যন্তও অগ্নি উদ্গীরণ করায় জাপানে প্রতি বৎসর ২।৩ শতবার অল্প বিস্তর * ভূমিকম্প হইয়া থাকে। পুরাকালে জাপান যখন অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হইত তখন তাহার শাসন পদ্ধতি কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ ছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। তৎকালীন রাজপুরুষগণের যদিও সাম্রাজ্য বৃদ্ধির প্রতি সেরূপ দৃষ্টি ছিল না, তথাপি জাপানকে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কোনও জাপানীর বিদেশে গমন কিংবা কোনও বিদেশীয়ের জাপানে আগমন, সমাজ এবং রাজবিধান দ্বারা নিষিদ্ধ থাকায় সে সময়ে জাপানীরা বহির্জগতের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিতেন না। যে সমস্ত জাপানী যুবক শিক্ষা কিংবা বাণিজ্যার্থে বিদেশে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশে গমন করিতেন এবং যে সকল খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ শত শত বাধা সত্ত্বেও ধর্ম্ম প্রচারার্থে জাপানে যাইতেন, তাঁহারা যে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কত জনই যে অবিচারে প্রাণ হারাইয়াছেন তাহা স্বয়ং ভগবান ব্যতীত আর কেহ জানেন না। এটী আমার আলোচ্য বিষয় নহে, সুতরাং অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

বর্ত্তমান 'মিকাদো' (Emperor) সিংহাসনে আরূঢ় হইলে 'মেজি' (Enlightened Era of Reformation) অব্দ আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে জাপানের শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। এক্ষণে উহ সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য 'ছাঁচে ঢালার' ন্যায় হইয়াছে।

জাপানের শাসন পদ্ধতি রাজতন্ত্র হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা প্রজাতন্ত্রের রূপান্তর মাত্র; কারণ

* ধম্মপদং—পিয়বগ্‌গো সোলসমো ৬।৭।৮।৪।৫ গাথা।

† সাধারণ জাপানীদের বিশ্বাস এই যে জাপান একটী বৃহৎ মৎস্যের পৃষ্ঠোপরি অবস্থিত। ক্লান্ত হইয়া উক্ত মৎস্যটী যখনই পাশ ফিরিতে চেষ্টা করে অমনি জাপান কাঁপিতে থাকে। ভূমিকম্প সম্বন্ধে জাপানীদের সহিত হিন্দুদের মত প্রায়ই একরূপ।

উহাতে প্রজাবর্গের অভিলষিত সমস্ত অধিকারই আছে। প্রজাসাধারণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া প্রতিনিধিগণ রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া রাজকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। সুতরাং গবর্ণমেন্ট স্বেচ্ছাচারী হইয়া কিছুই করিতে পারেন না। ফল কথা এই যে জাপানের রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তির মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। প্রজাবর্গের হিতসাধনার্থে এবং সম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে উভয়দল একমত হইয়া কার্য্য করায় জাপানীদের নিকট সমস্ত কার্য্যই সহজসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রাজা প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনার্থে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকায় প্রজাবর্গ তাঁহার নিতান্ত অনুগত। এবং এই কারণেই সম্রাট্ কিংবা সাম্রাজ্যের কোনও বিপদে তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পাত করিতেও কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত নহেন। বিগত চীন-জাপান এবং রুষ-জাপান যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সম্রাটের প্রতি অটল ভক্তি এবং স্বদেশের প্রতি অনুপম প্রেম প্রদর্শন করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে এখানে রাজা এবং প্রজার সম্বন্ধ পিতা এবং পুত্রের ন্যায়। হিন্দুর আদর্শ রাজা রামচন্দ্র সত্যযুগে যেরূপ পূজিত হইয়াছিলেন, জাপানের বর্ত্তমান সম্রাট এই কলিযুগে সেইরূপ পূজিত এবং সম্মানিত হইতেছেন। প্রজাগণের হস্তে তাঁহার প্রাণের কোনও আশঙ্কা নাই, এই ধ্রুব বিশ্বাসটী জাপ-সম্রাটের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকায় তিনি আত্ম-রক্ষার্থে উপযুক্ত প্রহরী (Body guard) পর্য্যন্ত রাখেন না। আমি অনেকবার তাঁহাকে জনতাপূর্ণ রাস্তার বাহির হইতে এবং ট্রেণে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু একবারও তাঁহার সহিত দুই জনের অধিক প্রহরী দেখি নাই। প্রহরী ব্যতীতও তাঁহাকে বাহির হইতে দেখিয়াছি। সকল দেশেই দেখিতে পাই, সম্রাটগণ, এমন কি তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ পর্য্যন্ত, প্রজাদের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। কিন্তু জাপ সম্রাট কি ভাগ্যবান পুরুষ! প্রজাবর্গের উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস থাকিবার আর একটী বিশেষ কারণ এই যে পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্তও একজন সম্রাট প্রজা কর্ত্তৃক নিহত হন নাই। জাপানের পক্ষে এটী কম গৌরবের কথা নহে।

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে বিগত চীন-জাপান যুদ্ধের পর হইতে জাপান সাম্রাজ্যের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বিগত চীন-জাপান এবং রুষ-জাপান যুদ্ধের ফলে 'ফরমোজ' দ্বীপটী (জাপানীরা যাহাকে 'তাইরাং' বলেন) এবং মাঞ্চুরিয়ার খানিক অংশ জাপান সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি কোরিয়াধিপতি নাকি রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় জাপান গভর্ণমেণ্টকে উহা রক্ষা করিতে অনুরোধ করেন এবং এই কারণেই কোরিয়ার শাসনভার জাপানের হস্তে পড়িয়াছে। এই গেল জাপানী জনসাধারণের মধ্যে একদলের অনুমান। আর একদলের মতে কোরিয়ানগণ অশিক্ষিত এবং আলস্যপরবশ হওয়ায় জাপান গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া উহার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এই দ্বিতীয় অনুমানটীই সত্য, নচেৎ কোরিয়াধিপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যুবরাজকে তথায় বসাইবার কারণ কি? এই যুবরাজ (বর্ত্তমান রাজা) আজকাল জাপান গভর্ণমেণ্ট হইতে 'মসহারা' লইয়া জাপানে শিক্ষালাভ করিতেছেন এবং কোরিয়ার শাসনদণ্ড প্রিন্স 'ইতো', (জাপানের প্রকৃত নির্ম্মাতা) আরও কয়েকজন জাপানী উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণের সাহায্যে চালাইতেছেন। কোরিয়ান্‌গণ শাসন কার্য্যে প্রতিবন্ধক হওয়ায় তাঁহাদিগকে একে একে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করান হইতেছে। শুনিতে পাই কোরিয়ানগণ আত্ম-নির্ভরশীল হইলে তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। জাপানের যদি এই অভিপ্রায় বাস্তবিকই হয়, তাহা হইলে উহা কি সাধু!

জাপান সাম্রাজ্য আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার অধিবাসিগণ আকারে খর্ব্বাকার হইলেও, এবং তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম হইলেও, প্রত্যেক

জাপানীর ভিতরে যে তেজঃপুঞ্জ নিহিত রহিয়াছে তাহার পূর্ণবিকাশ হইতে না হইতেই সমগ্র জগৎ চমকিত হইয়াছে। জানি না, জাপ-হৃদয়ে 'বুসিদো'র (Spirit of the Knights) পূর্ণ বিকাশে জড় জগতে কি পরিবর্ত্তন ঘটিবে! সূর্য্যোদয়ে কুমুদিনীকে যেরূপ শ্রীয়মানা হইতে দেখা যায়, জাপ-শক্তির জাগরণে পার্শ্ববর্ত্তী শক্তি-পুঞ্জেরও (neighbouring powers) মনে ভীতির সঞ্চার হওয়ায়, তদবস্থাপন্ন হইতে হইয়াছে। জাপানের নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহের অধিকারীগণ জাপ-তেজে অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপ এবং আমেরিকার সংবাদ পত্র সমূহ পূর্ব্ব হইতেই স্ব স্ব গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিতেছে।

পাঠকবর্গ! মনে করিবেন না যে, বৃহৎ বৃক্ষের ছায়াতলে বসিয়া আছেন বলিয়া আপনাদের কোনও বিপদ নাই। অতি সত্বরই আপনাদিগকেও জাপানীদের বিশ্বব্যাপী 'জালে' পড়িয়া 'হাবুডুবু' খাইতে হইবে। জাপানের রাজশক্তি আপনাদিগকে আপাততঃ স্পর্শ করিতে নাও পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। রাজশক্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রবলা শক্তি আপনাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত। এই শক্তির ফল আজ আপনারা প্রায় ২০০ বৎসর ভোগ করিয়া আলস্যের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, নচেৎ আজ পরিধানের বস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার বাতি দিবার দিয়াশলাই পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে কেন আনাইতেছেন? আপনাদেরও বিদেশীয় অন্যান্য জাতিদের ন্যায় হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ এবং বুদ্ধি কৌশল আছে, তবে কেন নিরাশ্রয় অন্ধের ন্যায় তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছেন? দিন দিন আপনাদের কি দশা হইতেছে তৎপ্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিয়া নিজ পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখুন। নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন এবং যাহা নিজেরা তৈয়ারী করিতে অক্ষম তাহা বিদেশ হইতে কারিকর আনাইয়া কিম্বা বিদেশ হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়া দেশে প্রস্তুত করুন; নচেৎ জীবন ধারণের আর কোন উপায় নাই।

এস্থলে 'স্বদেশী' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি, আশা করি তজ্জন্য পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। প্রায় চারি বৎসর হইল আমরা 'স্বদেশী' মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। জাপানীরা শিল্প-বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্য যেরূপ আকুল, আমাদিগকেও স্বদেশী বিস্তারের নিমিত্ত তদনুরূপ ব্যগ্র হওয়া উচিত। স্বদেশী বিস্তারের পথে যত কণ্টক রহিয়াছে একে একে তাহা উৎপাটন করিতে হইবে। স্বদেশী বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাশক্তির সম্যক্ জাগরণ অনিবার্য্য এবং এই জাগ্রত শক্তি যত রাজশক্তির সহিত মিলিত হইয়া (in co-operation) কার্য্য করিবে, ততই প্রজার এবং সাম্রাজ্যের এবং প্রভুর মঙ্গল সাধিত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে স্বদেশী মন্ত্রটী নিতান্ত তুচ্ছ করিবার জিনিষ নহে। এই পথ ভ্রষ্ট হইলে সভ্যজগতে আমরা অতি অপদার্থ এবং মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব।

প্রকৃত স্বদেশীর পুণ্যস্রোত ভারতবাসীদের হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া থাকিলে আজ তাহাদিগকে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের জন্য জগতের সমস্ত বণিক্ জাতির অধীন হইতে হইত না। যে মন্ত্রের অভাবে আমরা এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, শুভক্ষণে সেই মন্ত্র আজ ভগবান্ আমাদের কর্ণে দিয়াছেন। ইহাই আমাদের অস্ত্র এবং ইহাই আমাদের শস্ত্র। এই অস্ত্র পরিচালনা করিতে শিখুন, অভীষ্টসিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। কারণ কথায় বলে "বিষস্য বিষমৌষধং" আর যদি অবহেলা পূর্ব্বক আমরা এই সুযোগ ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে আমাদের দশা যে কি ভয়ানক হইবে তাহা কল্পনারও অতীত।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

বৈদিক সাহিত্যের অনুশীলন।

ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।

যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥ যজুঃ।৩০।৩॥

"হে সচ্চিদানন্দানন্তস্বরূপ পরম কারুণিক পরমেশ্বর, হে অনন্তজ্ঞানবিজ্ঞানবিদ্যাধার, হে সূর্য্যাদি বিশ্বস্রষ্টা, হে জ্ঞানবিজ্ঞানানন্দপ্রদ, আপনি আমাদের সমুদয় দোষ ও দুঃখ দূর করিয়া যাহাতে আমাদের কল্যাণ হয়, সুখ হয় তাহা আমাদিগকে প্রদান করুন।"

পূর্ব্বকালে ভারতে আর্য্য সভ্যতার অত্যুন্নতির সময়ে, ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিবর্ণের স্ত্রী পুরুষ সকলেই বৈদিক সাহিত্যের অনুশীলন করিতেন, সকলেই স্বাধ্যায়ব্রত প্রতিপালন করিতেন। এখন হয়ত অনেকের নিকট এই কথা অসম্ভব বা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা বৈদিক অথবা ঔপনিষদিক সাহিত্যের কিঞ্চিন্মাত্রও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এই কথা আদৌ নূতন বোধ হইবে না। প্রাচীন আর্য্যগণ বেদকে রৌদ্র, বৃষ্টি বায়ুর ন্যায় সকল মনুষ্যের উপজীব্য বলিয়া বোধ করিতেন। পাছে কাহারও কোন সন্দেহ হয়, সেই জন্য বেদে এ সম্বন্ধে অতি স্পষ্ট উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

যজুর্ব্বেদে ভগবানের উক্তিতে,—

যথেমাং বাচং কল্যাণী মাবদানি জনেভ্যঃ।

ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥"

॥ যজুঃ।২৬।২॥

"আমি যেমন সমস্ত মনুষ্যের জন্য এই পরম কল্যাণকরী ঋগ্বেদাদি বেদবাণীর উপদেশ দিতেছি, তোমরাও এইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র দাস দাসী ও অত্যন্ত নীচ ব্যক্তিকেও ইহার উপদেশ দিবে,—অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি করাইবে।"

স্পষ্টভাবেই এই উপদেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বৈদিক সাহিত্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতীয় বেদপারগ ঋষি ও ব্রহ্মবাদিনী, বৈদিক সূক্ত রচয়িত্রী মহিলার বিস্তর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ সেই উন্নতযুগে আধুনিক সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর ও ভেদনীতিসঙ্কুল জাতিভেদের সৃষ্টি হয় নাই। গুণ, কর্ম্ম, স্বভাব অনুসারেই মানবের সামাজিক সম্মান স্থির হইত। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের দুই পথ সাধারণতঃ সাধকদিগের অধিকার ভেদে অনুসৃত হইত। ক্ষত্রিয় জাতি জ্ঞানকাণ্ডের পথ প্রদর্শক ও উন্নতিবিধানকারী বলিয়া পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছেন। জাতিভেদের বাঁধাবাঁধি থাকিলে এরূপ হওয়া সম্ভবপর হইত না।

ক্রমশঃ কৃত্রিম ভেদ আসিয়া উপস্থিত হইল। মনুসংহিতায় এই সময়ের অনেকটা বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ত্রিবর্ণই বেদাধ্যয়ন, যজন এবং দান করিবেন, ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ অধ্যাপন, যাজন বা প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন না। ক্ষত্রিয়ের জীবিকা প্রজাপালন, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্যাদি স্থির হইল। শূদ্রের পক্ষে দাসত্ব বা সেবাই বিধিসঙ্গত বৃত্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। (১)। চারিবর্ণের ভেদ অনেকটা পাকাপাকি হইয়া পড়িল এবং চতুর্বর্ণের অনুলোম প্রতিলোম সংযোগে

(১) "অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥৮৮॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥৮৯॥

বিবিধ মিশ্রজাতির সৃষ্টি হইল। শূদ্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন রহিত করিবার জন্য শাস্ত্র প্রণীত হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ আইন ব্যবহারে বড় একটা আসিতে পারে নাই; কারণ ঐ শাস্ত্রেই শূদ্রের নিকট অধ্যয়নকারী ও শূদ্রের অধ্যাপক ব্রাহ্মণের যথেষ্ট নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। (১) ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে তখনও সমাজে শূদ্র-গুরু ও শূদ্র-শিষ্য ব্রাহ্মণ অনেক ছিলেন,—নচেৎ তাঁহাদিগের নিন্দার কথা শাস্ত্রে থাকিত না। সমাজে মিথ্যাবাদী বা তস্কর না থাকিলে ঐরূপ লোকের নিন্দার কথাও সমাজের শাসনী-ব্যবস্থায় থাকিতে পারে না। সুতরাং বিদ্বান ও ধার্ম্মিক শূদ্র মনুসংহিতার সময়ে অনেক ছিলেন এবং সমাজ তাঁহাদিগকে গুণানুসারে ব্রাহ্মণ্য, ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব প্রদান করিতেন। একথা আমার কল্পিত নহে, মনুসংহিতাই সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছেন। (২) মনুসংহিতায় শূদ্রদিগের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন পরোক্ষ-ভাবে নিষিদ্ধ হইলেও উহা পাপের কার্য্য বলিয়া গণ্য হয় নাই, এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষেও যাজন এবং অধ্যাপনা পাতিত্যজনক বলিয়া উক্ত হয় নাই। মনুসংহিতার পরবর্ত্তী সময়ে সমাজ যখন অধিকতর কৃত্রিম হইতে চলিল, জাতিভেদের বন্ধন যখন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল, বর্ণভেদ যখন গুণকর্ম্ম স্বভাবভেদ বশতঃ না হইয়া জন্মগত হইল, তখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধ্যাপন এবং যাজন ও শূদ্রের অধ্যয়ন তপস্যাদি একেবারে পাতিত্যজনক হইল; (৩) এমন কি অহিংসাপরায়ণ, ব্রহ্মজ্ঞানদর্পিত ব্রাহ্মণ বিধান করিলেন যে জপহোমপরায়ণ শূদ্রকে রাজা প্রাণদণ্ড দিবেন। এইরূপে ধীর ধীরে সমাজ হইতে বিদ্যার অন্তর্ধ্যান এবং তথায় অবিদ্যার আবির্ভাব হইতে লাগিল। যদিও দ্বিজাতির বিশে-যতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদপাঠ ও বেদজ্ঞানলাভ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত রহিল, এমন কি তাহার জন্য নানারূপ মাথার দিব্য পর্য্যন্ত দেওয়া হইল,—(৪) তথাচ বিদ্যাদেবী ভারত হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। আগে সকল বর্ণের মধ্যেই বিদ্যার অনুশীলন ছিল, জ্ঞানের আদর ছিল, বিদ্বান ও জ্ঞানী হীনবর্ণ হইতে উচ্চবর্ণে উন্নীত হই-তেন, অজ্ঞান, মূর্খ ব্যক্তি উচ্চবর্ণ হইতে অবনত হইত,—তখন সমাজ সজীব ছিল। বিদ্যা ও জ্ঞান শ্রেষ্ঠতার চিহ্ন ছিল, সকলেই তাহার উপাসনায় নিযুক্ত হইতেন। এখন ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হই-

পশূনাং রক্ষণং দানং মিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ ॥৯০॥
একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুকর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মন সূয়য়া ॥৯১॥”
মনুঃ। প্রথম অধ্যায়।

“এয়োধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥৭৭॥
বৈশ্যং প্রতিতথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ।৭৮।”
মনুঃ। দশম অধ্যায়।

(১) শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ড-গোলকৌ ॥ মনু। ৩।১৫৩ ॥

(২) শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যা ত্তথৈবচ ॥ মনু ॥১০।৬৫ ॥

(৩) বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রোজপহোম পরশ্চয়ঃ।১৯
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ তথাঽবিক্রেয়বিক্রয়ঃ।
যাজ্যং চতুর্ভিরপ্যেতৈঃ ক্ষত্রবিট্‌ পতনং স্মৃতম্ ॥২০॥ অত্রি ॥

(৪) বেদমেব সদাভ্যস্যেত্তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে ॥ মনু ॥২ ১৬৬॥
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ ঐ ।২।১৬৮॥

লেন (১); সমাজে তাঁহার সম্মান অতুল, অপরিমেয়; তিনি বিদ্বান হউন বা মূর্খ হউন, তিনি সকলের পূজ্য (২); কোন বর্ণই আর তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতার দাবী করিতে পারিবেন না, এরূপ আইন হইল। আর কি রক্ষা আছে? ব্রাহ্মণবর্ণ সকলের শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর দেবতা, রাজার গুরু সমাজের ব্যবস্থাদাতা, ইত্যাকার সামাজিক সমস্ত শক্তিই হস্তে লইলেন। এই অবস্থায় যাহা স্বাভাবিক, এইরূপ অবস্থায় অপরাপর সমাজে যাহা ঘটিয়াছে, ভারতে তাহাই ঘটিল। ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপরতাবশতঃ সমাজের অপর জাতিদিগকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত বিদ্যা, জ্ঞান এবং সামাজিক শক্তি একচেটিয়া দখল করিতে গিয়া উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইলেন। প্রতিযোগি-তার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল, সমাজে আর বিশ্বামিত্রের মত ব্রহ্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়, জনকের মত জ্ঞানী নৃপতি, এবং যাজ্ঞবল্ক্যের মত ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিলেন না। ক্রমাগত আইনের উপর আইন হইয়া সমাজকে অষ্টবন্ধনে আবদ্ধ করিল। ঔপ-নিষদিক ব্রহ্মজ্ঞান, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ উঠিয়া গিয়া কঠোর কাম্য যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র যজ্ঞকুণ্ড হইতে ধূম উঠিয়া দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, লক্ষ লক্ষ পশুর শোণিতে ধরা প্লাবিত হইতে লাগিল, কচিৎ কখনও নরবলিও চলিতে লাগিল। হিংসার দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করিবার একটা বৃথা আকাঙ্ক্ষা যাজ্ঞিকদিগের মনে উদিত হইল,—তাহার অনুকূলে নূতন নূতন ছন্দে নূতন নূতন মন্ত্র গঠিত হইতে লাগিল,—পশুশোণিত স্রোতের সহিত সোমরসের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। পতঞ্জলি দর্শনের অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এবং শৌচ সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানের আদেশ (৩) কোথায় ভাসিয়া গেল,—উপনিষদের সে আত্মতত্ত্ব, সে ব্রহ্মজ্ঞান কোথায় উড়িয়া গেল! শোণিতস্রোতে, হিংসাদ্বেষে স্বার্থপরতায় ভারত ভূমি কলঙ্কিত হইয়া উঠিল,—প্রকৃতই ভারতের দুর্দ্দিনের সূত্রপাত হইল।

এই হিংসামূলক স্বার্থকলুষিত যাগযজ্ঞের উপর ক্রমে অনেক লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিল। ইহা স্বাভা-বিক নিয়ম। ধর্ম্মের নামে এরূপ অত্যাচার কখনও অধিক দিন স্থায়ী হয় না। পবিত্রতাময় পরম পিতার সন্তান মানবশিশুর হৃদয়ে একটী সহজ, স্বাভাবিক পবিত্র ভাব বিদ্যমান আছে। অত্যাচার অনাচার দেখিলে মানব মনের এই ভাব স্বতঃই বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। যজ্ঞের পুরোহিত ঠাকুর বুঝাইলেন বটে যে বৈদিক হিংসা হিংসা নহে,—প্রজাপতি যজ্ঞের নিমিত্তই পশুর সৃষ্টি করিয়াছেন, যজ্ঞে হত পশু একেবারে স্বর্গে গমন করে, সুতরাং যজ্ঞে পশু হনন হিংসা নহে, উপকার ইত্যাদি, কিন্তু মন তাহা মানে না। এক চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন “ঠাকুর, যজ্ঞে পশুবধ করিলে পশুর যদি স্বর্গলাভ হয়, তাহা হইলে তোমার পিতৃদেবকে যজ্ঞে বলি প্রদান কর না কেন? পিতার স্বর্গ কে না চায়?” (৪) এই প্রশ্ন শুনিয়া পুরোহিত ঠাকুরের আক্কেল গুড়ুম হইয়া গেল, তিনি যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে না পারিয়া শেষে প্রশ্নকারীকে নাস্তিক ইত্যাদি গালাগালি দিয়া তাড়াইলেন। প্রশ্নকারী তাড়া খাইয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শান্ত

(১) জন্মনা-ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে ॥ অত্রি।১৪০॥

(২) অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।
প্রণীতশ্চা প্রণীতশ্চ যথাগ্নি দৈবতং মহৎ ॥ মনু।৯।৩১৭॥
দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম্? ॥ পরাশর।৮ ৩২॥

(৩) তত্রাহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ ॥ যোগ সূত্র। সাধন ॥৩০॥
শৌচ সন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ঐ। সাধন। ৩২॥

(৪) পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে? ॥ চার্ব্বাক দর্শন।

হইল না, প্রত্যুত তাঁহার হৃদয়ে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইল। ভারতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যখন এইরূপ বিপ্লব, তখন লোকরক্ষাকারী নারায়ণের আসন টলিল। এই বিপ্লব সময়েই করুণার অবতার, জ্ঞানের জলন্ত মূর্ত্তি, বৈরাগ্যের সুবর্ণ প্রতিমা মহামুনি শাক্যসিংহ সাম্য ও মৈত্রীর পতাকা হস্তে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার আহ্বানে কি মাদকতা ছিল, তাহাতে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত, রাজা হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত, বৈরাগী হইতে বিলাসিনী পর্য্যন্ত সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িল। আবার ভারত একচ্ছত্রা হইল। সাম্যের সুবর্ণ শৃঙ্খলে, একতার মোহিনী মায়ায় আসিন্ধু হিমালয় এক হইল। অহিংসা, করুণা, মৈত্রীর মহিমা সর্ব্বত্র গীত ও প্রচারিত হইল। শান্তি স্থাপিত হইল।

ভারতের প্রবল পরাক্রম সম্রাট্ ও নৃপতিগণ নবধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভারতের ভিতরে ও বাহিরে এই ধর্ম্মের প্রচার করিতে লাগিলেন। দলে দলে প্রচারকগণ ভারত হইতে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্ব, পশ্চিমে, চারিদিকে নানাপথে বহির্গত হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে এই ধর্ম্মের বিস্তার করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষ, তিব্বত, চীন, জাপান, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, সিংহল, ভারতসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ, তাতার, মানচুরিয়া, সাইবিরীয়া প্রভৃতি এসিয়া মহাদেশের প্রায় সমুদয় অংশ এবং ইয়ুরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ স্থান এই বিশ্ববিজয়ী ধর্ম্মের ভাস্বরতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ভারতের ব্রাহ্মণাদি আর্য্যগণের অধিকাংশই এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বেদপাঠ অথবা বৈদিক সাহিত্যের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান গোতমবুদ্ধ পণ্ডিতবর্গের সেব্য সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া সাধারণ লোক-ব্যবহার্য্য পালীভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। পালীভাষাতেই শত শত ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত হইল, পালীভাষা জগতের বৌদ্ধভাষা বলিয়া গৃহীত হইল। উপাসকের অভাবে বৈদিকধর্ম্ম মৃতপ্রায় হইয়া রহিল।

প্রায় পঞ্চশতবর্ষ এই প্রকারে গত হওয়ার পর, কালের অপরিহার্য্য নিয়মে পরমপবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মে বিকৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাচীনকালে সরল ও সহজ পুণ্যময় বৈদিক ধর্ম্ম যেপ্রকারে বিকৃত হইয়া হিংসা-বহুল অসার যাগযজ্ঞে পরিণত হইয়াছিল, কালবশে নানা প্রকার অসার নিয়মাদি প্রচারিত ও নানা প্রকার কদর্য্য ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উহাকে বিকৃত করিয়া ফেলিল। বৌদ্ধধর্ম্মের শত শত থাক বা শ্রেণী বিভাগ হইল এবং বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্যদিগের ভিতরে স্বার্থ এবং কামনা প্রবেশ করিল। বৌদ্ধধর্ম্মের এই দুরবস্থা কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল। বৈদিক ধর্ম্মমহাদ্রুমের মূল হইতে পুরাণ এবং বৌদ্ধ-অনাচারের মধ্য হইতে তন্ত্র বাহির হইল। বেদ ও উপনিষদের প্রকৃত অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা বহু দিন হইতে লোপ পাওয়ায় পুরাণগুলি যথাযথভাবে বৈদিক ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে পারিল না। বেদ বেদান্তের এক, অদ্বিতীয়, অনন্ত পরব্রহ্মের স্থলে শত শত দেবদেবীর কল্পনায়, নানাবিধ উপধর্ম্মের ব্যাখ্যায় এবং প্রাচীন বৈদিক উপাখ্যানসমূহের বিকৃত, বিস্তৃত ও পরিবর্ত্তিত উপন্যাসে পুরাণগুলি পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভেদ বুদ্ধির তাড়নায় নানা প্রকার উপাসক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইল এবং বৈদিক সময়ের গুণকর্ম্মস্বভাবানুরূপ স্বাভাবিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্থলে কৃত্রিম অস্বাভাবিক জাতি উপজাতির সৃষ্টি ও তাহাদিগের উপাস্য ও আচরণীয় উপধর্ম্মসমূহের প্রবর্ত্তন হইল। সমাজে ব্রাহ্মণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্মান প্রতিষ্ঠিত হইল কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির উৎকর্ষের দিকে কাহারও লক্ষ্য রহিল না। মহাপুরাণ, উপপুরাণ, তাহার শাখা প্রশাখা প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ রচিত হইয়া সমাজকে লক্ষ লক্ষ অংশে বিভাগ করিয়া মৃতবৎ করিয়া তুলিল। বৈদিক স্বাধ্যায়, বৈদিক আলোচনা ও বেদান্তের উপদেশ সকলে ভুলিয়া গেলেন।

এই সময়ে শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্যের উত্থান। তিনি নিজ অমানুষী প্রতিভাবলে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ অনাচার এবং পৌরাণিক আবর্জ্জনা

দূর করিয়া দিয়া পুনশ্চ বৈদিক বা বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদ প্রচার করতঃ সমগ্র ভারতকে একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহার সময়ে তিনি সে বিষয়ে সফলকামও হইয়াছিলেন। আবার বহু দিনের পর ভারতবর্ষে ঔপনিষদিক জ্ঞানকাণ্ডের মহিমা বিঘোষিত হইল। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করিয়া, তাঁহার প্রচারিত অমোঘ অদ্বৈতবাদ ভারতে চিরজাগরূক রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসাশ্রমের অভিনব সংস্কার পূর্ব্বক এক সন্ন্যাসি সম্প্রদায় গঠিত করিয়া ভারতের স্থানে স্থানে মঠ স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু হায়! ভারতে বুঝি ভগবানের অভিশাপ আপতিত হইয়াছে! বেদ ও বেদান্তের অনুশীলনের অভাবে আবার পৌরাণিক উপধর্ম্মগুলি জাগিয়া উঠিল ও শঙ্করের সাধের মঠগুলি বিলাসের রাজধানী রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া তথায় ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে নিত্য অধর্ম্মের অভিনয় হইতে লাগিল। এদিকে পৌরাণিকগণ বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতাররূপে গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধমঠ, তীর্থ ও বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া ভারতে বুদ্ধদেবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট করিলেন।

তন্ত্রের কথা অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। বুদ্ধদেব বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করেন নাই, বৌদ্ধগণ বেদ গ্রহণ না করায় "নাস্তিক" নাম পাইয়াছিলেন;—তন্ত্র সেই বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াই ঘোষণা করিলেন, "কলিতে বেদ ও বৈদিক ধর্ম্ম বাতিল ও নামঞ্জুর, তন্ত্রই কলিকালের ভরসা।" পুরাণশাস্ত্র ও বৈদিক ধর্ম্মের অনুকারী ও অনুযায়ী সুতরাং তন্ত্র পুরাণের বিরুদ্ধেও যুদ্ধঘোষণা করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করিতেন না, তন্ত্রেও জাতিভেদ প্রধানতঃ অস্বীকৃত হইল। তন্ত্র বলিলেন,

"প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্ববর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্ববর্ণা পৃথক্ পৃথক্॥"

পুরাণ বিধবার বিবাহ নিষেধ করিলেন, তন্ত্রমতে শৈব বিবাহ নাম দিয়া বিধবা বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইল। পুরাণ মদ্য ও মাংসাদির নিষেধ করিলেন, তন্ত্রমতে মদ্য মাংসাদি "মোক্ষদা হি যুগে যুগে" বলিয়া প্রশংসিত হইল। তন্ত্র এই প্রকারে পৌরাণিক মতের বিরুদ্ধে নিজমত প্রচার করিলেন, পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রকে "অসচ্ছাস্ত্র," "পাষণ্ড মত" এবং "মোহ-শাস্ত্র" নাম দিয়া উহার যথেষ্ট নিন্দা করিলেন। তন্ত্রমতে ধর্ম্মের নামে কত প্রকার অধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল তাহার বর্ণনা করিতে গেলে প্রকাণ্ড এক গ্রন্থ হইয়া পড়ে। জীব-হিংসা (নরবলি পর্য্যন্ত) মদ্যপান ও নানাবিধ অনৈতিক আচরণে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ বঙ্গদেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। এইরূপ অত্যাচার দর্শনে আবার মানুষের হৃদয় কাঁদিল এবং নবদ্বীপে মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব হইল। অহিংসা, জীবে-দয়া ও সর্ব্বজীবে প্রেম এই উদার মত লইয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিতে বহির্গত হইলেন, সেই প্রেমের বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত হইয়া গেল, কত লোক ধন্য হইয়া গেল। বঙ্গ এবং উৎকল ঐ প্রেমধর্ম্মে ধন্য হইয়া উঠিল। প্রদেশান্তরে রামানুজ, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভক্তি প্রধান ধর্ম্মের প্রচার করিয়া দেশব্যাপী তান্ত্রিকাচারকে অনেক মন্দীভূত করিলেন।

কিন্তু কালে এই বৈষ্ণব মতেরও বিকৃতি ঘটিয়াছে। এখন সমগ্র ভারতীয় হিন্দু সহস্র সহস্র জাতিতে, ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে, বিভক্ত হইয়া ভেদনীতির চরম উদাহরণ স্থল হইয়াছে। হিন্দু সমাজ মুখে বেদকে অপৌরুষেয় এবং বৈদিক ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈদিক স্বাধ্যায়, বৈদিক সাহিত্যের অনুশীলন, বৈদিক অনুষ্ঠানাদির প্রতিপালন দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সমস্ত কলিকাতা রাজধানীতে লক্ষাপেক্ষ ও অধিক ব্রাহ্মণ আছেন কিন্তু প্রকৃত স্বাধ্যায়ী অগ্নিত্রী অথবা পঞ্চযজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণ একজনও আছেন কি না সন্দেহ, বোধ হয় নাই। বেদ বেদান্ত-

পাঠী ব্যক্তি যদি পুরাণ সমুদয় পাঠও করেন, তিনি পৌরাণিক কোটী কোটী দেব-দেবীকে এক পর-ব্রহ্মের বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বেদ বেদান্তের অধ্যয়ন লোপ পাওয়ায় আমরা পৌরাণিক উপন্যাসকে পৌরাণিক দেব-দেবীকে তথাশ্রুত অর্থে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদিগের মধ্যে এই ধর্ম্মভেদ এমন প্রবল হইয়াছে যে নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব শক্তিকে প্রণাম করেন না, শাক্ত ও শালগ্রাম শিলাকে প্রস্তর বা লোষ্ট্রবৎ মনে করেন। একজন নিষ্ঠাবান গোঁড়া শাক্ত ও বৈষ্ণবে যত প্রভেদ, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হিন্দু ও একেশ্বরবাদী মুসলমানেও তত প্রভেদ নাই।

আমাদের মধ্যে বেদাধ্যয়ন লুপ্ত হওয়ায় নানা প্রকার ভ্রান্ত সংস্কার, নানা বিকৃত ধারণা লোকের মনে স্থান পাইয়াছে। বৈদিক নানা উপাখ্যান বিকৃত, অতিরঞ্জিত অথবা উপন্যাসাকারে বিবৃত হওয়ায় লোকে সেই গুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন; অথচ তাহাদের মূল সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। অনেকেই এখন অনুমান করিতেছেন যে বৈদিক ঋষিগণ জড় প্রকৃতির নানামূর্ত্তি যথা সূর্য্য, অগ্নি, মেঘ, বিদ্যুৎ, জল প্রভৃতির পূজা ও উপাসনা করিয়া গিয়াছেন অথচ সেই ভ্রান্ত অনুমানের মূলে সত্য কতটুকু আছে তাহা কেহই অনুসন্ধান করিতেছেন না। ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে বেদান্ত বা উপনিষদের কিন্তু পশার হওয়ায় এদেশেও আজিকালি বেদান্ত শাস্ত্রের কিছু মর্য্যাদা দেখা যায় কিন্তু শ্বেতাঙ্গ মুনিগণ বেদশাস্ত্র বুঝিতে গিয়া ভুল করায় তাঁহাদের এতদ্দেশীয় শিষ্য প্রশিষ্যদিগের মধ্যেও বেদের প্রচার হয় নাই এবং তজ্জন্য বেদের সম্বন্ধে কুসংস্কার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে দুই একটী পৌরাণিক উপন্যাস ও তাহাদিগের বৈদিক মূল পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া দেখাইব যে বৈদিক সাহিত্যের অনুশীলন রহিত হওয়ায় হিন্দু সমাজে কি অনর্থ আপতিত হইয়াছে!

যাঁহারা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে দেবরাজ ইন্দ্রের চরিত্র কি ভয়ানক গর্হিত রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে এবং অহল্যার পাপাচরণের কথা পুরাণে, রামায়ণে, কথকের কথায়, যাত্রাগানে সর্ব্বত্র পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইতেছে। রামায়ণে, বাল্মিকী প্রণীত রামায়ণে, অহল্যার পাপ ইচ্ছাকৃত বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং "কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব-বিচক্ষণ" গৌতম পত্নীকে প্রস্তরে পরিণত করিয়া ছাড়িয়াছেন। আমরা সেই সকল উপন্যাসের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া এই প্রবন্ধকে কলঙ্কিত করিব না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মার পাপের আখ্যান লিখিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস তদীয় কুমারসম্ভব মহাকাব্যে এই উপন্যাসের প্রতিধ্বনি করিতে ক্ষান্ত হন নাই (১)। ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুগণ এই দুইটী উপন্যাস সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হিন্দুগণ পুরাণের প্রমাণে বিশ্বাস করেন যে সত্যযুগে সমস্ত লোক ধার্ম্মিক ছিলেন এবং তৎকালে অধর্ম্ম অনাচার পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল না, তাঁহারাই আবার অম্লান-বদনে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন যে এই ঘোর কলিকালেও অতিশয় অধার্ম্মিক নরপশুও যে পাপ করিতে পারে না, সেই শুভ সত্যকালে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং দেবরাজ ইন্দ্র ও পরমপবিত্রা ঋষিপত্নী সেই জঘন্য পাপাচরণ করিয়াছিলেন! আমরা অনেক নিষ্ঠাবান পৌরাণিক হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "আপনারা কিরূপে এই পাপের কথা বিশ্বাস করেন?" তাঁহারা কেহই সদুত্তর দিতে পারেন নাই। কেহ "দেবতার লীলা" কেহ "পুরাণের

(১) অভিলাষ মুদীরিতেন্দ্রিয়:
স্বসুতায়ামকরোৎ প্রজাপতিঃ।
অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়া—
মভিশপ্তঃ ফলমেতদন্বভূৎ॥ কুমার সম্ভবম্।৪।৪১॥

কাহিনী কি মিথ্যা হইতে পারে?" কেহবা "ওসব কিছুই বুঝি না" এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। আমরা এরূপ অলস, অকর্ম্মণ্য ও মৃতপ্রায় হইয়াছি, আমাদের চরিত্রের এতদূর শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে যে এরূপ দারুণ ঘৃণাকর উপন্যাস অনায়াসে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি এবং স্ত্রী-পুত্রকন্যা একত্র হইয়া এই সকল উপন্যাস কথকের মুখে ও যাত্রাগানে শুনিয়া আসিতেছি! ভ্রমেও আমাদিগের মনে প্রশ্ন উঠে না যে, যে দুষ্কার্য্য নিতান্ত অধম মানবেও করিতে অক্ষম, আমাদের পূজ্য, উপাস্য দেবগণ তাহা কিরূপে করিতে পারিলেন?

হায়! আমাদের কি দারুণ অবনতিই ঘটিয়াছে! আমাদের দেবদেবীগণ যদি এরূপ অমানুষ পাপে পাপী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেবক—আমাদিগের এরূপ দশা কেন না হইবে? যে জাতি ভগবানে পাপ কল্পনা করিতে পারে, সে জাতি পাপী হইবে না ত আর কে হইবে? কিন্তু সুখের বিষয়, প্রকৃত পক্ষে এ সব কল্পনা নিতান্তই কল্পনা মাত্র,—পৌরাণিকগণ কেবলমাত্র নিতান্ত সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার্থ উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছিলেন,—আমরা না বুঝিয়া উপন্যাসকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া এই অনর্থ করিয়াছি। বিষ্ণুশর্ম্মার "পঞ্চতন্ত্র" গ্রন্থে শৃগাল-বক বৃকাদি পশু ছন্দোবন্ধ সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। নির্ব্বোধ শিশু উহা পাঠে মনে করে বুঝি সেকালে পশুপক্ষীগণ এইরূপই পণ্ডিত ছিল। আমরাও অনেকে এই শিশুর মত পৌরাণিক উপন্যাসকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। উহা যে মিথ্যা কথা, তাহা একবারও ভাবি না। এক্ষণে আমরা বৈদিক সাহিত্য অবলম্বনে ঐ দুই উপন্যাসের মূলের অনুসন্ধান করিব এবং দেখাইব যে কি সুন্দর রূপকময় আখ্যানের কি বিকৃত উপন্যাসই প্রচারিত হইয়াছে। বৈদিক উপাখ্যানে কোনরূপ পাপ কথার ছায়া পর্য্যন্তও নাই। হায়! কুক্ষণে ভারতে বৈদিক সাহিত্যের অনুশীলন রহিত হইয়া পৌরাণিক সাহিত্যের বহুল প্রচার হইয়াছিল! কুক্ষণে জ্ঞান সূর্য্যের অস্ত হইয়া অবিদ্যান্ধকারে ভারতাকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল!

শত-পথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের তৃতীয় কাণ্ড তৃতীয় প্রপাঠকে একটী স্থলে "ইন্দ্র-গোতম পত্নী অহল্যার জার" এইরূপ বর্ণনা আছে। নিরুক্ত গ্রন্থের সাহায্য লইয়া অর্থ করিলে ইহার এই মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়, ইন্দ্র-সূর্য্য, যেহেতু সূর্য্য হইতেই যাবৎ ঐশ্বর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে। অহল্যা-রাত্রি, অহর্দিনং লীয়তেহস্যাং তথাদ্রাত্রিরহল্যোচ্যতে, অর্থাৎ অহঃ বা দিবস যাহাতে লীন হইয়া যায় তিনি অহল্যা বা রাত্রি। তিনি গোতম পত্নী—গোতম-চন্দ্র, গস্থতীতি গৌরিতি গোত্তমশ্চন্দ্র। অলঙ্কারের হিসাবে রাত্রিকে চন্দ্রের স্ত্রী বলিতে পারা যায় এবং কবিরা তাহাই চলিয়া থাকেন। জৃষ্ বয়োহানৌ, জৃষধাতুর অর্থ বয়োহানি, যাহা হইতে জরা (বৃদ্ধত্ব) শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। অত্র স সূর্য্য ইন্দ্রো রাত্রে-রহল্যায়া গোতমস্য চন্দ্রস্য স্ত্রিয় জার উচ্যতে। কুতঃ। অয়ং রাত্রে জরয়িতা। সূর্য্য রাত্রির বয়োহরণ করেন বা রাত্রিকে জরা প্রদান করেন, সুতরাং সূর্য্য রাত্রির জার। জার শব্দ জৃষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, তাহা বলাই বহুল্য। দেখুন এইত বৈদিক উপখ্যান,—হইাতে পাপ দূরে থাকুক, কোনরূপ অশ্লীলতার নামমাত্রও নাই।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থের তৃতীয় পর্ব্বের ৩৩।৩৪ কণ্ডিকাতে নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী পাওয়া যায়।

"প্রজাপতির্বৈ স্বাং দুহিতরমভ্যধ্যায়দ্দিবসিত্যন্য অহুরুষমিত্যন্যে তামৃশ্যো ভূত্বা রোহিতীভূত্বামভ্যৈৎ। তস্য যদ্রেতসঃ প্রথমমুদদীপ্যত তদসাদিত্যো ভবৎ॥"

সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই,—প্রজাপতি সবিতা বা সূর্য্যের নাম। (শতপথ কা ১০। অ ২। ব্রা ৭। কং ৪॥) অতি প্রত্যূষে উষানাম্নী সূর্য্য কন্যার জন্ম হয়, পুনশ্চ সেই রক্তবর্ণা উষা নাম্নী কন্যার আদিত্য নামে পুত্র হইয়া থাকে এবং এই পুত্রের জনক সূর্য্য! পুনশ্চ ঋগ্বেদে পর্জন্য পিতা এবং পৃথিবী মাতার সহযোগে ওষধিরূপ সন্তানের উৎপত্তির উপাখ্যান লিখিত আছে। জল হইতে

পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে ইহা বেদশাস্ত্র বিহিত এবং বিজ্ঞান সম্মত সুতরাং পিতা ও কন্যার সহযোগে সন্তানের উৎপত্তির রূপকমূলক উপাখ্যান বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। এইরূপকমূলক উপাখ্যানেও কোন অশ্লীলতার ছায়া নাই।

ইন্দ্র এবং প্রজাপতির কলঙ্কমূলক পৌরাণিক উপন্যাসের মূল আমরা দেখিলাম। সেই মৌলিক উপাখ্যানে কলঙ্কের কোন কথা নাই,—থাকিতেই পারে না। বেদে মূর্ত্তি বিশিষ্ট কোন দেব দেবতার কোন হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় থাকার কথা বেদের কোন স্থানে লিখিত নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা কোনরূপ ঐন্দ্রিয়িক পাপাচরণের উপন্যাস বেদে স্থান পাইতে পারে না। পুরাণকার কোনও অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বৈদিক সরল ও সহজ রূপকমূলক উপাখ্যান হইতে এই বীভৎস ও জঘন্য উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি হয়ত, মনুষ্যদিগকে সাধারণ দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, অথবা ইন্দ্রিয়সমূহের দুর্দ্দমনীয়তা প্রদর্শনের নিমিত্ত, (১) অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই কদর্য্য উপন্যাস গড়িয়াছিলেন। তিনি নিজে বৈদিক গল্পগুলি জানিতেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার পাঠকগণও বেদের উপখ্যানাবলীর সহিত সুপরিচিত, সুতরাং কেহই এই উপন্যাসকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র দেবরাজের, প্রজাপতির অথবা ঋষি পত্নীর অবমাননা করিবেন না। কবিবর মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র পৌরাণিক আখ্যায়িকাবলম্বনে তাঁহাদের কাব্যাবলী রচনা করিয়া নিজ নিজ রচিত কাব্যে কত নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়াছেন,—তাঁহারা পুরাণকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহা করেন নাই। এখন যদি লোকে পুরাণ পাঠ ত্যাগ করিয়া পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি ভুলিয়া গিয়া কাব্য লিখিত বিষয়গুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে ফল হয়, আমরা বেদ পাঠ ত্যাগ করিয়া, বৈদিক উপাখ্যানগুলি ভুলিয়া পৌরাণিক কবির কল্পিত উপন্যাসগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করায় ঠিক সেই ফল হইয়াছে। আমরা এত নীচ হইয়াছি, আমাদিগের নৈতিক চরিত্রের এত অধঃপতন হইয়াছে যে আমাদিগের পূজ্য এবং উপাস্য দেবরাজ ইন্দ্র এবং প্রজাপতি ব্রহ্মাকে পশুর অধম বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি না! পরম পবিত্র সত্যকালের এক অসামান্যা সাধ্বী ঋষি পত্নীকেও আমরা এমন ঘৃণিত পাপে পাপিনী মনে করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেছি না! যে জাতির ঋষি মুনি ও দেবদেবীগণ অপবিত্র, সে জাতির মঙ্গলের আশা কোথায়? আবার বাঙ্গালার জল-বায়ুর গুণে কৃত্তিবাস পণ্ডিত কল্পনার মাত্রা আরও চড়াইয়া অহল্যাকে সত্যসত্যই প্রস্তরে পরিণত করিলেন! তাঁহার এই কল্পনা আরব্যোপন্যাসের ধীবরের কাহিনীকেও পরাস্ত করিয়াছে!

বৈদিক সাহিত্যের অনুশীলন লোপ পাওয়ায় আমাদের কি অসাধারণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদত্ত হইল। বিস্তৃতভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ভারতে যখন বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা ছিল, ভারতীয় আর্য্যগণ যখন বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত ছিলেন, তখন আর্য্য সমাজে সুখের দিন ছিল। ধর্ম্মের নামে অসংখ্য সম্প্রদায়, জন্মভেদে অসংখ্য জাতিভেদ, মানুষে মানুষে ভ্রাতায় ভ্রাতায় দারুণ বিদ্বেষ ঘৃণা ও ঈর্ষ্যা প্রচলিত ছিল না। গুণ কর্ম্মস্বভাবানুসারে মনুষ্যের সম্মান অসম্মান স্থিরীকৃত হইত। তেত্রিশ কোটী দেবদেবী পূজা লক্ষ লক্ষ ব্রতোপবাসের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র এক অদ্বিতীয় অনন্ত সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের স্তুতি উপাসনা এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা আচরিত হইত।

(১) মনুষ্যের ইন্দ্রিয় বৃত্তি অতিশয় বলবতী এবং বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বদা তৎসম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। এই সম্বন্ধে মহর্ষি মনুর উপদেশঃ—

"মাত্রা স্বস্রাদুহিত্রা বা নবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপিকর্ষতি॥
মনু।২।২১৫॥

সমাজে সর্ব্বত্র অকৃত্রিম সাম্য ও মৈত্রীর অধিকার অব্যাহত ছিল।

বৈদিক শিক্ষা, বৈদিক ধর্ম্ম, বৈদিক আচার ভুলিয়া ভারতীয় হিন্দু আজ ৩৬০০ জাতিতে বিভক্ত। ধর্ম্ম প্রধানতঃ চৌকা এবং লোটার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, 'জাতি' প্রধানতঃ বাহ্যিক কপটতায় পরিণত হইয়াছে। ব্রাহ্মণবর্ণ বিদ্যাজ্ঞান বৈরাগ্যাদির উৎকর্ষহেতু একদিন সমাজের গুরু এবং নেতৃ পদ পাইয়াছিলেন, আজ লোভ স্বার্থপরতা ও কপটতাহেতু সেই ব্রাহ্মণবর্ণ ১৮০০ শত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শত শত শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীরই ব্রাহ্মণ মনে করেন তাঁহার অপেক্ষা পবিত্র ব্রাহ্মণ আর কেহই নাই এবং অপর সকলেই নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ! এমনই আত্মবঞ্চনা! অথচ অধুনা ব্রাহ্মণের সে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, সে সন্ন্যাস, সে বৈরাগ্য কিছুই নাই! এক কথায়, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিবার কোন লক্ষণ নাই। উপনিষৎকার ব্রাহ্মণের যে পরিভাষা করিয়াছিলেন (১) আজি সেরূপ ব্রাহ্মণ কোথায়? বৈদিক ধর্ম্মের, বৈদিক সাহিত্যের অনাদরই আমাদের এই অধোগতির হেতু। আমরা আশা করিয়াছিলাম বুঝি শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়,—শাক্ত বৈষ্ণব সৌরশিখ্ ব্রাহ্ম আর্য্য প্রভৃতি সকলকে এক বিরাট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিজ নামের গৌরব রক্ষা করিবেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যে আমরা হতাশ হইয়াছি। তাঁহারা বেদ ভগবানকে বহুমূল্য স্বর্ণসূত্র খচিত কৌশেয় বস্ত্রে ভাল করিয়া বাঁধিয়া মাথায় করিয়া মহাসমারোহে, ঢাক ঢোল বাদ্য সহকারে নগর ভ্রমণ করিবার পক্ষপাতী,—বেদ ভগবানকে "এতে গন্ধপুষ্পে" দিয়া পূজা করিতে উৎসুক কিন্তু বেদ ভগবানের বন্ধন-ডোর খুলিতে রাজী নহেন। ভারতধর্ম্ম মণ্ডল আমাদের এই গোলের উপর আর এক মহাগণ্ডগোল বাধাইবার প্রয়াসী। ভগবান দয়া করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন বেদ ভগবানের বাহ্য পূজার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রকৃত পূজা আরব্ধ হউক এবং আমরা বিশ কোটী হিন্দু সমবেত হইয়া সেই এক, অদ্বিতীয় অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমপুরুষের ভজনা করি। ভগবান আমাদিগকে সুমতি প্রদান করুন। আমরা যেন একতায়, ভ্রাতৃভাবে সকলে মিলিত হইয়া বিধাতার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা পূরণ করিতে পারি।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

সাধক।

(১)

অনন্তের অসীমের অণু রেণু কণা,
তাহে সৃষ্ট মানব জীবন,
সে নহে নশ্বর-চূর্ণ অপূর্ণ কামনা,
সে ত নহে সাধের স্বপন।

(২)

কত কাল কত বর্ষ রবি-রশ্মি পথে
অলোকের দীপ্ত আলো ঘটা,
আলোকিছে মরহিয়া যুগ যুগ হ'তে,
অমরের অমৃতের ছটা।

(১) "যঃ কশ্চিদাত্যানমদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মিষড়্ভাবেত্যাদি সর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্তানন্দস্বরূপং স্বয়ং নির্বিকল্পমশেষকল্পাধারমশেষ ভূতান্তর্য্যামিত্বেন বর্ত্তমানমন্তর্বহিশ্চাকাশাবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাবমপ্রমেয়মনুভবৈক বেদ্যমপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎসাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদি দোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদি রহিতো দম্ভাহংকারাদিভিরসংস্পৃষ্টাচেতাবর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ সএবব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতিহাসনোমভিপ্রায়ঃ অন্যথা ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব॥" বজ্রসূচিকোপনিষৎ।

ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। মাডাগাস্কর দ্বীপের "ডোডো" পক্ষীর ন্যায় সম্প্রতি ইনি লুপ্ত।

(৩)

মহতী তপস্যা করে সপ্তর্ষি সাধক,
চাহি দেব-আশীর্ব্বাদ বর,
ধ্যান মগ্ন—গিরি শিরে জ্বলন্ত পাবক,
নির্লিপ্ত নিষ্কাম নিরন্তর।

(৪)

উদ্দীপ্ত অনল বক্ষে কাঞ্চন যেমতি
লভে সদা নিজ বিশুদ্ধতা,
এ মহা সাধনা বলে নরের তেমতি,
চিত্তশুদ্ধি—মনুষ্যত্ব তথা।

(৫)

দু'দিনের তরে নহে মানব-জীবন,
সম্মুখে অনন্ত আছে তার,
তাই রে সাধক মাগে অমূল্য রতন—
কামনা—লালসা নাহি আর।

(৬)

কি এক অমূল্য মণি মহা সিন্ধু-তলে,
কত যুগ আছে লুক্কায়িত,
এই মহা সাধনার পূর্ণ তপোবলে,
উদ্ধারিবে সে চির বাঞ্ছিত।—

(৭)

সে যে কি প্রাণের ধন—ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রেম,
আছে তাহে কত কি মহিমা,
সে শুভ্র পবিত্র জ্যোতি জগতের ক্ষেম,
কে জানে সে অসীমের সীমা!

(৮)

আছে হেথা জরা মৃত্যু আছে অকুশল,
ঋষিগণ ফিরি নাহি চায়
সেই যে কল্যাণ শুভ স্বতঃ সুমঙ্গল,
ধ্যান মগ্ন তারি সাধনায়।

(৯)

কোন শান্ত তপোবনে হিমাচল শিরে,
সাবিত্রী গায়ত্রী করে ধ্যান,
পারিজাত স্নাত শুভ-মৃদুল সমীরে,
জাগে নিত্য সামবেদ গান!

(১০)

হইবে সাধনা সিদ্ধ—শত বর্ষ হোক,
চিত্তে নাহি ব্যর্থতার ভয়,
প্রার্থিত লভিয়া হবে অজর অশোক,
চির তৃপ্ত চির মৃত্যুঞ্জয়।

শ্রীমানকুমারী বসু।

হিন্দুশাস্ত্রে নীলনদী, মিসর দেশ ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য প্রদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পালেস্তাইন্।

পালেস্তাইন্ এই নামটি পল্লীস্থান শব্দ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। পালেস্তাইন্ নামে দুইটি প্রদেশ আছে। একটি ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস্ নদীর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। আর একটি ভূমধ্যসাগরের তীরস্থিত। সামারিটান্ (Samaritan, জাতি প্রথমে ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস নদীর পূর্ব্বদিকবর্ত্তী পালেস্তাইনেই বাস করিতেন। এই দেশে অধিবাসকালে ইঁহারা এতদ্দেশবাসী প্রাচীন অধিবাসিগণ হইতে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। পরে ইঁহারা এই স্থল পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী পালেস্তাইনে যাইয়া বসতি করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি পালিজাতি সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ হইতেই বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে যাইতে

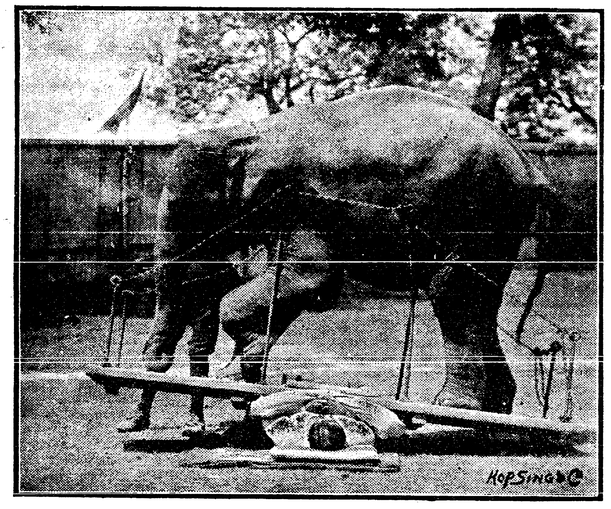

হস্তী বক্ষে রামমূর্ত্তি।

যাইতে অবশেষে নীল নদীর তীরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সামারিটান্ জাতি পালি-জাতিরই শাখা বিশেষ এবং সেই জন্যই তাহাদিগের অধ্যুষিত প্রদেশ পালেস্তান্ অর্থাৎ পল্লীস্থান আখ্যা লাভ করিয়াছিল। সামারিটান্‌গণ ভূমধ্যসাগরের তীরে আসিয়া কিছুকাল আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই চলিতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে উক্ত প্রদেশে ইহুদি ও ফিনিসিয়ান্ এই দুইটিই অতি গণ্য-মান্য ও পরাক্রমশালী জাতি ছিল। তাই কালক্রমে এই পরাক্রমশালী জাতিদ্বয়ের অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় সামরিটান্‌গণ উহাদিগের সহিত সম্পর্ক প্রতিপাদনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাই তখনও ইহারা ইহুদিগণের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ জ্যাকবকেই (Jacob) আপনাদিগেরও পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বলিতে লাগিল, আবার কখনও বা বলিতে লাগিল ফিনিসিয়ানগণের পূর্ব্বপুরুষ পিঙ্ক্যাস্ (Pinkhas) অর্থাৎ পিঙ্গাক্ষই তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। ইহুদিগণ সামারিটানদিগকে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ Jacobএর বংশধর বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা ইহাদিগের প্রতি অবমাননাজনক ফিলিষ্টাইন্ (Philistine) নামটিই প্রয়োগ করিয়াছেন। এইস্থলে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ফিলিষ্টাইন্ নামটির সহিত একটা ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল বটে কিন্তু এই শব্দটিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পালেষ্টাইন শব্দ হইতে, সুতরাং পরোক্ষে পল্লীস্থান শব্দ হইতেই উদ্ভূত।

আবার, বাইবেলে উল্লেখ আছে পালেস্তাইন প্রদেশে পেলেটি (Peleti) এবং কেরেথি (Kerethi) নামক দুইটী জাতি বাস করিত। বাইবেলের অনেক ব্যাখ্যাকারগণ এই কেরেথি শব্দের উচ্চারণ কেরেতি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছি ভারতবাসী পালি জাতির শাখা বিশেষের নামও কিরাত। সুতরাং কেরেথি বা কেরেতি কিরাত বলিয়াই অনুমান হয়। আবার, পালেস্তাইন ক্রীট (Krita) বলিয়া একটি স্থান আছে। ভূমধ্য সাগরের পশ্চিমাংশে কিউ-রেটিস্ (Curetes) অথবা ক্রীট্ (Crete) নামধেয় একটি দ্বীপও বিদ্যমান। সম্ভবতঃ এই সমুদয় নামের মূলেও কিরাত শব্দটিই বর্ত্তমান। আবার, জেরুজালেমের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গাজা নামে একটী নগর আছে। অতি প্রাচীনকালে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এই নগরে জুপিটার ক্রিটাস্ (Jupiter Cretaeus) নামে এক দেবতার উপাসনা হইত। সম্ভবতঃ এই নাম হিন্দু দেবতা ক্রীটেশ্বর নামেরই প্রকার ভেদ মাত্র। এক্ষণে পেলেতি নামটীর মূল অনুসন্ধান করা যাক্। পালিতা এখনও ভারতবর্ষের কথ্য ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কাটিবার গোহেলবার বিভাগে আজিও পালিতানা নামে একটি রাজ্য বর্ত্তমান আছে। যোধপুরের অন্তর্গত একটি নগর আজিও পালী নামে খ্যাত। এই নামধেয় আরও অনেক স্থান ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছে। মিশর দেশেও এই পালিতা নামটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ হিরোডোটাস্ মিশর দেশীয় পুরোহিতগণের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া লিখিয়াছেন যে ফিলিটিয়াস্ (Philitius) নামক এক রাজা একদা মিশর দেশ লুঠ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম নীল নদীর তীরে গরু চরাইতেন এবং তিনিই পরে পিরামিড্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সুতরাং এই সমুদয় নাম আলোচনা করিয়াও দেখা যাইতেছে, ইহাদের প্রত্যেকের নামের অন্তরালেই পালি বা পল্লীস্থান, শব্দ বিদ্যমান আছে। আবার তাল অথবা তীলতা শব্দের মূলেও পালি শব্দই ক্রীড়া করিতেছে।

পল্লীরাজ কালীনদীর তীরে যাইয়া প্রথমে যে মট মুড় ও নগর স্থাপন করিয়াছিলেন উহার নাম Meroe. পুণ্যবতী বা পুণ্যনগরী। আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি গ্রীকগণ উক্ত নগরটিকেই Meroe নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই মেড়, Meroe নামে কি ভাবে উদ্ভূত হইল এস্থলে সংক্ষেপে তাহাই আলোচিত হইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় ট, ঠ, ড ও ঢ এই কয়েকটি অক্ষরের যে কোনটি

স্বরবর্ণদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলে অনেক সময় ড়, এর মত উচ্চারিত হয়। সুতরাং সংস্কৃত মঠ (ছাত্রাদি-নিলয়) শব্দই পরিবর্ত্তিত হইয়া মেড়ু হওয়া অসম্ভব নহে। আর ট বর্গীয় বর্ণের ড়, রূপে পরিবর্ত্তন কেবল যে সংস্কৃত ভাষাতেই আছে তাহাও নহে। গ্রীক ভাষায় ও তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে Troglodytica দেশটি গ্রীক দেশে মিডো (Midoe) এবং মির্হো (Mirhoe) এই উভয় নামেই পরিচিত ছিল। আবার প্লিনির বর্ণনা পাঠে বুঝা যায় তিনি Midoe নামে যে নগরের উল্লেখ করিয়াছেন উহাই মেড়ু (Meroe)। আবার সংস্কৃত ও গ্রীক এই উভয় ভাষাতেই ড, এই বর্ণটি ড়, রূপে যেরূপ অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায় ট বর্গীয় অন্য বর্ণ :কয়টি তেমন হয় না। এই সৌসাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা Meroe শব্দের উদ্ভব সম্বন্ধে আর একটী অনুমানে উপনীত হইতে পারি। তাহা এই যে Meroe শব্দ মৃড় শব্দ হইতে উদ্ভূত। মৃড় মহাদেবেরই নামান্তর। এই অনুমানের সত্যতা সম্বন্ধে একটী প্রধান যুক্তি এই যে পালিগণ প্রায় সকলেই মৃড় বা মহাদেবের উপাসক ছিলেন। এই মৃড় দেবের নামানুসারেই স্পেণ্ড প্রদেশস্থিত একটী স্থানের নাম ও মৃড় ছিল। টলেমী এই স্থানকে Mareura নাম দিয়াছেন আর উক্ত প্রদেশের অধিবাসীগণ ঐ স্থানকে মেরু বলিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালে কিরূপে নগর প্রতিষ্ঠিত হইত সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও পূর্ব্বোক্ত অনুমান দৃঢ় হয়। কোনও নগর যত বড় সমৃদ্ধিশালীই হউক না কেন প্রাচীন হিন্দুগণ উহার স্থাপন-বৃত্তান্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রায়ই লিখিয়া যান্ নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা দেবমন্দির ও তীর্থস্থানের স্থাপন বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। উক্ত বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বহুকাল পর পর পরস্পর নিকটবর্ত্তী স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক একটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই উহার চতুর্দ্দিকে এক এক দল লোক বসতি স্থাপন করিয়াছে। অবশেষে দেবমন্দির নিচয়ের চতুর্দ্দিকস্থ অধিবাসীগণের সমবায়ে এক একটী নগরের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং পালিগণের উপাস্যদেব মৃড় হইতে পালি রাজধানী Meroe অর্থাৎ পুণ্যবতী নগরীর নামকরণ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমান দৃঢ়ীকরণার্থে আমরা আরও কয়েকটি কথা উল্লেখ করিতেছি। পুরাণে উল্লেখ আছে ইতরাজা মিশরদেশ ও ইথিওপিয়াতে রাজত্ব করিতেন, কালী নদীর তীরে তাঁহার রাজধানী ছিল, আর উক্ত রাজধানীতে যে সমুদয় দেবমন্দির ছিল তন্মধ্যে মৃড় ও মৃড়ানী (অর্থাৎ পার্ব্বতী)র মন্দির সর্ব্ব প্রধান ছিল তজ্জন্য রাজধানী মৃড় বা মৃড়স্থান আখ্যালাভ করিয়াছিল। আবার ষ্টিফেনাস উল্লেখ করিয়াছেন যে সিসিলী দ্বীপের অন্তর্গত সাইরাকিউজ (Syracuse) নগরে মেরুসিয়াম্ (Merusium) নামে যে একটি দুর্গ আছে উহার নাম ইথিওপিয়া দেশের অন্তর্গত মেরু নামক স্থান হইতে আসিয়াছে। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে মেরুসিয়ামে Meroessa Diana নামক দেবীর পূজা হইত। সম্ভবতঃ এই দেবীই মৃড়েশ্বরী বা মৃড়ানী। ইথিওপিয়ার অন্তর্গত মেরু নামধেয় যে স্থান হইতে মেরুসিয়ামের নাম করণ হইয়াছে খুব সম্ভবতঃ উক্ত স্থানেও মৃড়েশ্বরী বা মৃড়ানী এবং মৃড়শ্বরের পূজা হইত এবং এই মৃড় হইতেই মেরু নামের উদ্ভব হইয়াছিল।

অপর কেহ কেহ মেরু এই নামটির উদ্ভব সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণা করেন। তাঁহারা বলেন মিডিয়া ও পারস্যের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজা কামবাইসিস্ (Cambysis) যখন ইথিওপিয়া বিজয় করিতে আসিয়াছিলেন সম্ভবতঃ তিনিই উক্ত স্থানের নামকরণ করিয়া যাইয়া থাকিবেন। তাঁহার স্ত্রী ও ভগিনী এতদুভয়ের Meroe এই নাম ছিল। সম্ভবতঃ এই নাম হইতেই বিজয়ী রাজা উক্ত নাম বিজিত দেশের নগর বিশেষের প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই অনুমান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

প্রথম কথা এই যে কামবাইসিসের অভিযান এই নগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল কি না তদ্বিষয়েই সন্দেহ আছে। তৎপর কথা এই যে তিনি মিশর ও ইথিওপিয়াতে আসিয়া যেরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহাতে কখনও তিনি উক্ত দেশবাসিগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। এতদবস্থায় তাঁহার প্রদত্ত একটী নাম উক্ত দেশে বহুল প্রচার লাভ করিবে এরূপ সম্ভাবনা করা যায় না। তারপর, তিনি মেরু-নামধেয়া ভগিনী ও স্ত্রী এই উভয়েরই প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদিগের প্রতি তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। আবার এই দেশে আসিয়া নানা দৈব দুর্ব্বিপাকে তাঁহার বহু সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে। সুতরাং এই দেশের প্রতিও তাঁহার তেমন অনুরাগ জন্মিয়াছিল মনে হয় না। অতএব স্ত্রী বা ভগিনীর নামানুসারে স্থান বিশেষের নামকরণ এবং ইথিওপিয়া দেশান্তর্গত নগর বিশেষের নামকরণ, এই উভয়ই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

শৈবরত্নাকর নামক গ্রন্থে ঐত রাজার উপাখ্যান আছে। তাহা হইতেও মেরু নগরের অনেকটা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত রাজা বহুকাল রাজত্ব করার পর মেরু নগরেই তনুত্যাগ করেন। সাধারণের বিশ্বাস স্বয়ং মৃড় অর্থাৎ মহাদেবই ঐত রাজার রূপধারণ করিয়া মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার আখ্যানটি নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

নীলনদীর তীরে দেবতা ও দৈতগণের মধ্য বহুকাল যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল। দৈত্যরাজ শঙ্খাসুর সমুদ্রে বাস করিতেন, রাত্রিযোগে সৈন্যসামন্ত লইয়া স্থলভাগে অবতরণ করিয়া লুঠপাঠ করিতেন, আবার রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। সুতরাং দেবতাগণ বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া উঠিলেন। আবার ক্রৌঞ্চদ্বীপের রাজা ক্রকও তাহাদিগকে অন্যদিক দিয়া আক্রমণ করিলেন। এই উভয় দলের সৈন্যগণই অতি উচ্ছৃঙ্খল নরখাদক ছিল। এই উভয় সৈন্যদলে যখন পরস্পর দেখা হইত তখনও তুমুল যুদ্ধ বাধিত। এইরূপে ইহারা শস্যশ্যামল প্রদেশকে বৃক্ষলতাবিহীন মরুভূমিতে পরিণত করিয়া ফেলিল। বিষম বিপদে পতিত হইয়া হতাবশিষ্ট অধিবাসিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল যে এই বিষম বিপদ হইতে আমাদিগের রক্ষা বিধান করিতে পারে আমাদিগকে এমন রাজা দাও। এই প্রার্থনায় তাহারা ইতঃ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল। সমস্ত দেশ হইতে এই ইতঃ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রার্থনার অব্যবহিত পরেই প্রবল ঝড় বহিতে আরম্ভ করিল, কালী নদীর জল সঙ্ক্ষোভিত হইয়া উঠিল এবং তরঙ্গ মধ্যে বিপুল সেনা সমভিব্যাহারে এক বীরপুরুষ আবির্ভূত হইয়া বলিলেন 'অভয়ং'। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র দৈত্যগণ পাতালে প্রবেশ করিল, শঙ্খাসুর সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইলেন এবং তাঁহার সেনাদল আত্মরক্ষার্থে পলায়নপর হইল। এই মহাপুরুষই পরে ঐত আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি স্বয়ং ভগবান্ মৃড় দেবেরই আংশিক অবতার। ইনি সমগ্র শঙ্খ দ্বীপে, বর্ব্বর দেশে, মিশ্রস্থানে এবং অর্ব্বস্থানে অর্থাৎ আরবদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি পুনরানয়ন করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজত্বকালে কুটীলকেশ ও হাস্যশীল জাতিগণ পুনরায় তাহাদিগের পুরাতন আবাসে ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র আবার ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যেস্থলে তিনি নীল নদীর মধ্য হইতে উদ্ভূত হন, সেই স্থলের নাম ইত বা ইতস্থান এবং তাহার রাজধানীর নাম মৃড় বা মৃড়স্থান। তাঁহার নাম হইতেই তাঁহার বংশধরগণের ঐত আখ্যা হইয়াছে আর উক্ত দেশের নাম হইয়াছে ঐতেয়। প্রাচীন বৈদেশিক শব্দে ও সাহিত্যে পূর্ব্বোক্ত আখ্যানটীর অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষায় নীল নদীর এক নাম ইটস্ (aetos)। উক্ত ভাষায় ইটস্ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ঈগল পক্ষী। গ্রীকগণ ইটস্ শব্দ হইতেই ঐত নামটি উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া বলেন। তবে তাঁহারাও বলেন যে একটা প্রবল বন্যার পর হইতেই নীল নদী উক্ত নামে অভিহিত

হইতে আরম্ভ করে, আর ঐ বন্যায় ইথিওপিয়ানগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা শৈবরত্নাকরের উল্লিখিত আখ্যানটিতেও পাইয়াছি যে নীলনদীর জল সঙ্ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবার পরই রাজা ইত—ঐ নদীর তরঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আখ্যায়িকার এই অংশের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রীকগণের উক্তিরও সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। আবার, কথিত আছে প্রবল বন্যার সময় প্রমিথিয়াস্ (Prometheus) মিশর দেশে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ এই প্রমিথিয়াস্ শব্দ প্রমথেশ শব্দেরই অপভ্রংশ। আবার এই প্রমথেশ শব্দ মৃড় অর্থাৎ মহাদেবেরই আখ্যা বিশেষ। এবং এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই—প্রমথগণের অর্থাৎ পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের রাজা। ভগবান্ মহাদেব প্রমথেশ রূপে একটা জাতির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হন্। ঐতগণের প্রধান উপাসনাস্থান তাহাদিগের রাজধানী মৃড় স্থানের অনতিদূরবর্ত্তী ছিল বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। আবার এদিকে ষ্ট্রাবো ও ডাইয়োডোরাস্ মেরু নগরের নিকটে অবাতুম (Avatum) নামে একটী তীর্থ স্থান ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খুব সম্ভবতঃ এই অবাতুম্ই উক্ত উপাসনা স্থান। সম্ভবতঃ এইস্থানকেই টলেমী ট্যাথিস্ (Tathis) এবং প্লিনি তাতু (Tatu) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রুস সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে উহার বর্ত্তমান নাম কারগস্ (Kurgos) এবং এই স্থান মেরু নগরের এত নিকটবর্ত্তী যে এই স্থানই উক্ত নগরের পোতবন্দর।

কৃষ্ণের জননী দৈবকীর পিতার নাম উগ্রসেন। তাঁহার পুত্র কংস অতি দুর্দ্দান্ত ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং অতি কঠোরতা ও স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতার সহিত রাজত্ব করিতেন। তাঁহার জ্ঞাতি যাদবগণের প্রতি তিনি বড়ই দুর্ব্ব্যবহার করিতেন। তাহাদের কেহ তাঁহার নিকটে আসিলেই তিনি অমনি বলিয়া উঠিতেন যাতু অর্থাৎ দূর হও। কালক্রমে কংস রাজার ঈর্ষ্যা ও অবজ্ঞা সূচক যাতু, নামটি এতটা প্রসার লাভ করিল যে যাদবগণ তাঁহাদের গোত্রনাম যাদবের পরিবর্ত্তে যাতু নামেই আখ্যাত হইতে লাগিলেন। কংস দৈবকীর কয়েক পুত্রের বিনাশ সাধন করেন। কিন্তু কৃষ্ণ রক্ষা পান্ এবং পরে তিনি অত্যাচারী কংসের প্রাণবধ করিয়া উগ্রসেনকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উগ্রসেন সার্ব্বভৌম নৃপতি হইয়া উঠেন। কৃষ্ণের বাল্যকালে বহুসংখ্যক যাদব কংসের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ভারতবর্ষ হইতে যাইয়া বহিষ্কুশ দ্বীপেও আবিসিনিয়ার পর্ব্বতময় প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উহাদিগের দলপতি যাতুর উপাধি ছিল যাদবেন্দ্র। সম্ভবতঃ এই যাদবেন্দ্র শব্দ হইতেই আবিসিনিয়ার পর্ব্বতাবলীর নামকরণ হইয়াছিল। উক্ত পর্ব্বতসমূহের নাম ঔরেমিদ্র (Ouremidre) বা আর্দোয়েমিদ্র (Ardwemidre) এবং উক্ত নামের অর্থ এই যে রাজা অরওয়ের (Arwe) দেশ। যাদবেন্দ্র শব্দটি ইয়ারেবিন্দ (Yarevinda) রূপে সময় সময় উচ্চারিত হয়। সুতরাং মনে হয় অপভ্রংশের মাত্রা আরও কিছু বর্দ্ধিত হইয়াই যাদবেন্দ্র শব্দটিই আবিসিনিয়ার পর্ব্বতাবলীর নাম উবেমিদ্র বা আদ্রোয়ামিদ্রে পরিণত হইয়াছে। অতঃপর যাতুপগণের ও ইথিওপিয়ানগণের মধ্যে চরিত্র বিষয়েও সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত আছে, ভারতবর্ষ হইতে আগত ঔপনিবেশিকগণ (অর্থাৎ যাতুপগণ) অতি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, ধর্ম্মভীরু এবং ভক্তিভাজন। আবার প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ ইথিওপিয়ানগণের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও ঐরূপ। ষ্টিফেনাস (Stephanus), ইউসেবিয়াস (Eusebius), ফিলষ্ট্রেটাস্, (Philostrotus) এষ্টেথিয়াস (Eustathius) এবং আরও অনেক ঐতিহাসিকগণ বলেন যে ইথিওপিয়ানগণ সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ হইতেই জনৈক দলপতির নেতৃত্বাধীনে আফ্রিকায় আগমন করিয়াছিলেন। তবে উক্ত ঐতিহাসিকগণ দলপতির নাম বলিয়াছেন (Aetus) অর্থাৎ ঐত। ইঁহারা নাম করিতে ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন।

যাতুপ ও ইথিয়প (Ethiop)

যাতুর পরিবর্ত্তে ঐত বলিয়াছেন। ঐত রাজা কখনও ইথিওপিয়া দেশে যান নাই। সুতরাং তিনি ইথিওপিয়ানগণের দলপতি হইতে পারেন না। Paschal chronicle গ্রন্থে য়্যান্দাবেরিয়াস্ (Andabarius) নামক একজন সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী ভারতবাসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই য়্যান্দাবেরিয়াস্ নামটি ইথিওপিয়ানগণের নেতা যাদবেন্দ্রেরই অপভ্রংশ। যাতুগণের দলপতির নাম যাতুপ থাকাই খুব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। আর তাহাদিগের অধ্যুষিত দেশ দেশবাসিগণের নামানুসারে যাতুপের নামে অভিহিত হওয়া খুব স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। আবার পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ য, এর উচ্চারণ ঠিক করিয়া করিতে পারেন না। তাহারা য, কে জ রূপেই উচ্চারণ করিয়া বসেন। সুতরাং তাঁহাদের মুখে যাতুপ এবং যাতুপের এই নামদ্বয় যথাক্রমে জাতুপ ও জাতুপের এইরূপ উচ্চারণ লাভ করিবে বলিয়াই আশা করা যাইতে পারে। এই অনুমানের সত্যমূলকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহজনক প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। UniverSal History নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে ইথিওপিয়ানগণ আপনাদের দেশকে, ইটওপিয়া ও জৈটিওপিয়া (Zaitiopia) এই উভয় নামেই অভিহিত করিত। আবার গ্রীসীয় পৌরাণিক আখ্যায় বলীতে যে Arthiop ইথিয়পের উল্লেখ দৃষ্ট হয় শব্দগত ও কার্য্যগত সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইনি এবং যাতুপ একব্যক্তি বলিয়া নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে এককালে Aeria ও গোষেন্ নীল নদীর তীরে নানাস্থানে পালি (অর্থাৎ পত পালক) গণ বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং উক্ত প্রদেশের নানাস্থানের নামের সহিত পালিগণের নাম বিজড়িত আছে। কেবল নীলনদীর তীরবর্ত্তীস্থান বা মিশর দেশের সহিতই যে পালিগণের সম্পর্ক ছিল তাহা নহে। সমগ্র মহাদেশটির নামকরণের সহিতও তাঁহাদিকের সম্পর্ক ছিল। উক্ত মহাদেশের একটী প্রাচীন নাম আরিয়া (Arria)। উক্ত নামটি আহীর অর্থাৎ আভীর শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। আবার মিশর দেশের প্রান্ত ভাগে একটি প্রদেশ আছে উহার নাম গোষেন্ (Goshen) এই শব্দটিও ঘোষেণা বা ঘোষায়ণ শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। ঘোষ শব্দের অর্থ এইস্থলে আভীর পল্লী। আর এই গোষেন্ প্রদেশের রাজধানীর নাম ছিল Abaris (আবেরিস্) বা (Avaris) এই নামও আভীর শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র।

ক্রমশঃ।

শ্রীকুঞ্জবিহারী হার।

প্রকাশ।

বজ্র যবে রুদ্র তেজে
তেজে দিলে বুক,
অশ্রু গেল রুদ্ধ হয়ে
যেন শিলা স্তূপ।
দু'প্রহরে এল অমা
আঁধারি নয়ন,
ঘন ঘটা ঘিরে এল
ঘোর প্রভঞ্জন।
কি ভৈরব রুদ্র রাগে
দুঃখ হল সাথী,
রুক্ষ জটা বিস্তারিয়া
দিল শয্যা পাতি।
বৈরাগ্য উদাস বেশে
দিল আলিঙ্গন,
নৈরাশের শূন্য হাসি
করিল বরণ।
সন্ধ্যা ক'রে দিয়ে গেল
নিয়ে সন্ধ্যা তারা,
চির রাত্রি রেখে গেল
চির শান্তি হারা।

বিপদের কাল মেঘে
আবরে গগন,
বিশ্বের দুর্ভাগ্য আসি
বরিল জীবন।
সহসা হৃদয়াকাশ
উদ্ভাসিয়া তুমি,
প্রিয় হতে প্রিয়রূপে
কে তুমি গো স্বামী।

ভগ্ন হৃদে দীপ্তরূপে
দেখা দিলে নাথ,
দুঃখের গৌরবে আজ
নব সুপ্রভাত।
তুমি যার দগ্ধ হৃদে
প্রকাশ আত্মায়,
শত ঝঞ্ঝা পদতলে
তার ভেসে যায়।

বঙ্গনারী।

কঃ পন্থা।

স্বর্গগত আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের শোচনীয় অপঘাত মৃত্যুতে দেশের সর্ব্বস্থানে যেরূপ আতঙ্ক সঞ্চারিত হইয়াছে, দেশের সর্ব্ব প্রকারের লোক যে ভাবে এই কার্য্যের প্রতি ঘৃণা ও বিরাগ প্রদর্শন করিতেছেন এবং যাহাতে এইরূপ অপকার্য্য আর ঘটিতে না পারে, বিপ্লবকারীগণের ষড়যন্ত্র যাহাতে সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য সকলেই যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেশের লোকে এইরূপ কার্য্যকে কিরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কি চরমপন্থী, কি মধ্যপন্থী সকলেই এক-বাক্যে তীব্র ভাষায় হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত করিয়া এইরূপ দুষ্কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। যদি এই সমবেত চেষ্টার ফলে দেশ হইতে এইরূপ বিপ্লব সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিব যে, আশুতোষ স্বদেশের এই মঙ্গল সাধন করিবার জন্যই নিজ প্রাণ দিয়াছেন; তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু দ্বারাও তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলের পথই উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই মৃত্যু তাঁহার পরিবারবর্গের পক্ষে এবং আমাদের সকলের পক্ষে অত্যন্ত শোককর, হৃদয়-বিদারক হইলেও যদি এই অপঘাত মৃত্যুই দেশের শেষ অপঘাত মৃত্যু হয়, যদি এইরূপ বিপরীত-পথচারী, উষ্ণ-মস্তিষ্ক যুবকগণ ইহা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, তাহা হইলে বুঝিব যে ভগবান এই হতভাগ্য দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই আশুতোষের ভাগ্যে এই বিধান করিয়াছেন।

এই গত হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে নানারূপ চিন্তা এই ক্ষুদ্র লেখকের মনে অনেক সময় উদিত হয়। আমি রাজনীতিজ্ঞ নহি, রাজনীতি বিষয়ক আন্দোলন আলোচনাতে থাকিবার সামর্থ্যই আমার নাই। আমি আবাল্য মাতৃভূমি, মাতৃভাষা এবং স্বজাতি (ভারতবাসী)কে ভালবাসিতে শিখিয়াছি মাত্র। বাল্যকাল হইতেই ভারতভূমির কেহ নিন্দা করিলে, মাতৃভাষার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে এবং স্বদেশীয়-দিগের কোন নিন্দা শুনিলে আমার প্রাণে কেমন একটা বেদনা লাগে। আবাল্য আমি এই মাতৃ-ভূমির উৎপন্ন বস্তু-জাত ভালবাসি, বাঙ্গলা পুস্তক পত্রিকা ভালবাসি এবং দেশের লোকদিগকে ভাল-বাসি। 'ভালবাসি' বলিতে আমি মাত্র ইহাই বলিতেছি যে তাঁহাদের নিন্দা শুনিলে প্রাণে ব্যথা লাগে, তাই বুঝি যে ভালবাসি। নতুবা আমি যে সেই ভালবাসার জোরে কাহারও কোন উপকার করি-য়াছি তাহা নহে। সেটা আমার নিজের দোষ, নিজের অক্ষমতা, নিজের অপটুতা। যাহা হউক, কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে সংস্পৃষ্ট না থাকিলেও,

এই কারণেই এবিষয়ে নানারূপ চিন্তা না আসিয়াই পারে না। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, সুতরাং আমার ধারনাও ক্ষুদ্র, চিন্তাও ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র হইলেও, সঙ্কীর্ণ হইলেও চিন্তাটা আসে এবং তাহা বলিতেও ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছাটাকে কোনরূপেই দমন করিতে না পারিয়া, অনেকের নিকট উপহাসাস্পদ হইবার আশঙ্কা নিশ্চিত জানিয়াও তাহাকে ব্যক্ত করিতে প্রয়াসী হইলাম। আশা করি, বিশেষজ্ঞগণ এই আদার ব্যাপারীটিকে অতি সাহসের জন্য ক্ষমা করি-বেন। এই কিছুকাল মধ্যে যে কয়েকটি হত্যাকাণ্ড এইভাবে সংঘটিত হইল, তাহার নায়কেরা সকলেই যুবক। ইহাদের সহিত স্বতঃপরতঃ ভাবে কোন পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি সংসৃষ্ট আছেন, ইহার কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই সব যুবকগণ কোন বিশিষ্টনীতিবিশারদ চালকের অধীনে থাকিয়া এই সব কার্য্য করিতেছে, ইহা বিশ্বাস করিবার কোনই হেতু নাই। দেশের মধ্যে যাঁহারা স্বদেশ-হিতদত্তপ্রাণ, যাঁহারা রাজনীতি-শাস্ত্রবিশারদ এবং দেশের নেতৃপদের উপযুক্ত, তাঁহাদের রাজনৈতিক মতামত যতই বিভিন্ন হউক না কেন, তাঁহারা কখনও এরূপ অপকার্য্যের প্রশ্রয়দাতা হইতে পারেন না। জগতের অতীত ইতিহাস আলোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে এইরূপ হত্যাকাণ্ড দ্বারা কোনও দেশে কোন প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বাতুল ভিন্ন অন্য কেহ এই উপায়ে দেশের স্বাধীনতা লাভের আশা করিতে পারে না। দুই দশজন কর্ম্মচারী বিনাশ করিয়া, দশ বিশজন শাসনকর্ত্তার উচ্ছেদ সাধন দ্বারা যদি দেশের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না! এই উপায়ে পবিত্রা ভারতভূমি নররক্তে কলুষিতা হইতে পারেন, দেশের শান্তি অন্তর্হিতা হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইবে না!

একথা আমাদের সামান্য ধারণাতেই যখন দৃঢ় সত্য বলিয়া বোধ হয় তখন দেশনায়কগণের নিকট যে তাহা এইভাবে প্রতিভাত হয় একথা নিশ্চিত রূপেই বলা যাইতে পারে।

এই সকল অত্যাচার নিবারণ কল্পে গবর্ণমেণ্ট যে দলন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত হয় তাহারা অনেক সময়ই বৃথা নির্দ্দোষীগণের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে একথা যে খুবই সত্য তাহার প্রমাণ আজকাল প্রতিনিয়তই আমরা পাই-তেছি, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার কোন আব-শ্যকতা দেখি না। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এমন কোন প্রণালী অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন যে যাহাতে এইরূপ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের ক্ষম-তার অযথা পরিচালন হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অনেক কর্ম্মচারী এই উপলক্ষে নিজ খয়ের-খাঁ গিরি বেশী করিয়া দেখাইবার জন্য অনেক সময় তিলকে তাল করিয়া তুলেন, এবং তদানুসঙ্গিক অত্যাচার ও প্রজা সাধারণের পীড়নকর নানা ব্যবস্থাও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এটা যাহাতে না হইতে পায় তাহার উপায় বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই বিষয়েও আর একটি প্রধান সমস্যা হই-তেছে অবিশ্বাস। সরকার বাহাদুর দেশের ভাল ভাল লোকের উপরও একটুও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না; দেশের লোকেরাও সরকার বাহাদুরের প্রত্যেক কার্য্যই সন্দেহের চক্ষে দেখিতে-ছেন। কোন লোক এইরূপ ষড়যন্ত্রের অপরাধে দোষী কি না তদ্বিষয়ে দেশের দশজন প্রতিষ্ঠাবান্ লোক যাহা বলিবেন গবর্ণমেণ্ট তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না; আবার গবর্ণমেণ্ট যাহা কাহারও সম্বন্ধে বলিবেন, দেশের লোকেও তাহা ঠিক সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিবে। এইটাই আমার কাছে সকলের অপেক্ষা গুরুতর সমস্যার কথা বোধ হয়। রাজা ও প্রজার মধ্যে এইরূপ অবিশ্বাসের কণামাত্রও বিদ্যমান থাকিলে সুখ শান্তিতে বাস করা উভয় পক্ষেরই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য এই ভাবটা দূর করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

গবর্ণমেণ্ট সমস্ত জাতিটাকেই অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিবেন না; তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের

সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করুন। গবর্ণমেণ্ট নিজ সামরিক বল ত যথেষ্ট ভাবেই প্রস্তুত রাখিয়াছেন; সুতরাং বিপ্লবের জন্য ভীত হইবার কোন কারণ নাই। দেশের লোকেদের উপরে যদি বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের প্রতি এই বিপ্লব নিবারণের আংশিক ভার অর্পণ করেন, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন তাহা হইলে বোধ হয় ক্রমেই এই অবিশ্বাসের আগুণ নিবিয়া গিয়া পুনরায় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া যতদূর ধারণা হয় তাহাতে গবর্ণমেণ্ট আজকাল বাঙ্গালী মাত্রকেই ঘোর অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেছেন। বাঙ্গালী কেহ কোনখানে গেলে সে বুঝি বিপ্লববীজ ছড়াইতে আসিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হয়। সুতরাং তাহার গমন, আগমন, অবস্থান, চাল-চলন, প্রভৃতির উপর কর্ম্মচারীগণ অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। ইহা হইতে সরকার বাহাদুরের অবিশ্বাস বাঙ্গালীর উপর কতখানি তাহা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালী হইলেই তাহার উপর এইরূপ সন্দেহ হওয়ার কারণে বাঙ্গালীদের মনে একটা ব্যথা লাগা বিচিত্র কি? তবে সরকার বাহাদুর বলিতে পারেন বাঙ্গালীদের মধ্য হইতেই যখন এই সব হত্যা কাণ্ডের নায়ক বাহির হইতেছে তখন আমাদের সে সন্দেহ ত হইতেই পারে! আমরা কেমন করিয়া বুঝিব যে কে সাধু, কে অসাধু? সুতরাং আমরা নির্ব্বিচারে সকলের উপরই দৃষ্টি রাখিতেছি। এ কথাও একেবারে ভিত্তিহীন তাহা বলিতে পারি না। এইরূপ হওয়া মানব স্বভাব। "আঁধার ঘরে 'সাপ', তো সকল ঘরেই সাপ" এই প্রবাদেরই সার্থকতা এক্ষেত্রে উদ্ভাসিত।

গবর্ণমেণ্টের এই বিশ্বাস অপনোদন করার ভার যে কতক পরিমাণে আমাদের উপর ন্যস্ত নাই তাহা আমার মনে হয় না। এইরূপ হত্যাকারীদলের সহিত জনসাধারণের কোন সহানুভূতি নাই। স্বর্গীয় আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের অপঘাত মৃত্যুর পর দেশনায়কগণ প্রকাশ্য সভায় ইহা ঘোষণা করিয়াছেন; ইহা দ্বারাই এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইতে পারে! ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তরল মস্তিষ্ক যে সব যুবক এই কুপথে পদার্পণ করিয়া এই উপায় দ্বারা স্বদেশের মঙ্গল ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তৎসাধনে স্বীয় জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া এপথ হইতে নিবৃত্ত করার জন্য যত্ন লওয়া উচিত। দেশের লোকেরা বলিতে পারেন যে তাহাদিগকে কেমন করিয়া চিনিব? যখন তাহারা এইরূপ এক একটা কার্য্যের অভিনয় করিবার জন্য সংসার রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ আসিয়া দেখা দেয় তখনই তাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই তখন সাবধান করিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে রাজকীয় আইনই তখন তাহাদের উচিত দণ্ডবিধান করিবে। আগে হইতে তাহাদিগকে পাইব কোথায়? তাহারা গুপ্তভাবে মনোমধ্যে কি ধারণা পোষণ করে তাহা কেমন করিয়া জানিব? তাহা সত্য। কিন্তু সকলেই যদি যুবকদলের মধ্যে মনে প্রাণে প্রচার করিতে থাকেন যে ঐরূপ সব কার্য্য দ্বারা কেবল দেশের অনিষ্টই করা হইতেছে—দেশের মঙ্গল কিছু করা হইতেছে না তাহা হইলে তাহাতে নিশ্চয়ই সুফল হইবার সম্ভাবনা আছে। যুক্তি দ্বারা, বিচার দ্বারা, ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে ভাবে যখন আবশ্যক সেইরূপ করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য যে দেশ ভক্তি, দেশ প্রীতি ও দেশোন্নতির প্রয়াস এবং এইরূপ হত্যাকাণ্ড সাধন ও বিপ্লব উৎপাদনের চেষ্টা ইহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এইরূপে বিজাতীয় বিদ্বেষপোষণ করিলেই দেশের উন্নতি করা হয় না, দেশ স্বাধীন করা যায় না। যদি সকলের সমবেত চেষ্টা এইদিকে প্রধাবিত হয় তাহা হইলে আমার বোধ হয় এই অস্বাভাবিক দোষ অপনোদিত হইতে পারে। স্বদেশের প্রতি ভক্তি দেখাইবার, স্বদেশের উন্নতি কল্পে প্রাণ উৎসর্গ করিবার শত সহস্র পথ পড়িয়া রহিয়াছে, তদবলম্বনে প্রকৃতই দেশকে উন্নত করা হইবে।

যে সমুদয় যুবক একটা ভ্রান্ত ধারণাবশে উত্তেজিত হইয়া এই সব অপকার্য্য করিয়া তৎপরিণামে নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে তাহাদের হৃদয়ের একটা অসাধারণত্ব আছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে কারণ পরম্পরাতেই হউক তাহারা এই ভুল বিশ্বাস মনে স্থির করিয়াছিল যে এই উপায়েই দেশের মঙ্গল হইবে; এবং দেশের মঙ্গল হইবে এই বিশ্বাসেই তাহারা এই কার্য্য করিয়াছে, তাহার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। কিন্তু যদি এই সব জীবন এই অকার্য্যে ব্যয়িত না হইয়া দেশের প্রকৃত উন্নতির জন্য অর্পিত হইত, এই সব যুবক যদি ফাঁসি কাষ্ঠে না ঝুলিয়া আজীবন কৌমার ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক এক একজন এক একটি গ্রামের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকল্পে আপনার জীবন ব্যয় করিত; গ্রাম্য স্বাস্থ্য বিধান, নিরক্ষর পল্লীবাসী কৃষকগণের মধ্যে শিক্ষার বিমল আলোক প্রচার, ললনাকুলের হৃদয়-বৃত্তির উন্মেষ ও প্রসার, তাঁহাদের শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের বন্দোবস্ত, গ্রাম্য কুপ্রথা কুসংস্কার আদির উচ্ছেদ সাধন, গ্রাম্যবালক কিশোর ও যুবকগণের চরিত্র গঠন, কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষার বিস্তার, ইত্যাদি শত সহস্র প্রকার উপায়ের মধ্যে যে কোনটি অবলম্বন পূর্ব্বক দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধনের চেষ্টা পাইত এবং যদি সেই সব চেষ্টায় দুই একটিও অল্প পরিমাণেও সার্থকতা লাভ করিত তাহা হইলে সে কি সুখের কথা হইত! তাঁহাদের সদৃষ্টান্ত প্রণোদিত হইয়া আরও অনেকে এইরূপ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় পূর্ব্বক প্রকৃত দেশ সাধনা ব্রত পালন করিতে উদ্যুক্ত হইত। এইরূপ নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী দলের কার্য্যে যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইত, গ্রামবাসীগণ প্রথমে হয়ত অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলেও ক্রমে তাঁহাদের অকপট পরার্থপরতায় মুগ্ধ হইয়া যে তাঁহাদিগকে পূজা করিত ও তাঁহাদের নির্দ্দেশানুবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব গ্রামের উন্নতি করিতে যত্নপর হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। সেটা কি সুখের বিষয় হইত একবার ভাবিয়া দেখুন; কিন্তু দুঃখের বিষয় দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহাদের দেশের মঙ্গল করিবার চেষ্টা বিপথে পরিচালিত হইয়া এই সব অমূল্য জীবন অকালে শেষ হইয়া গেল।

এই সমুদয় বিষয়ে সকলের সংযতভাবে কার্য্য করাই ভাল বলিয়া মনে হয়। অপরিণত-বয়স্ক যুবকগণ রাজনৈতিক গূঢ়তত্ত্ব সমূহ ধারণা করিতে পারগ নহে, সুতরাং তাহার বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রণোদিত করিতে যাওয়া আগুণ লইয়া খেলা করা। এজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা নিতান্তই প্রয়োজন। এইসব বিষয়ে বালকগণকে তাহাদের বিবেক বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া প্রবীণগণের উপদেশ অবহেলা করিয়া কার্য্য করিতে দেওয়া কখন ঠিক মনে করিনা। এই সব বিষয়ে তাহাদের বিবেকবুদ্ধি সদসৎ বিচার করিয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিতে অশক্ত। যাঁহারা বহুকাল এই সব আন্দোলন করিয়া চুল পাকাইয়াছেন তাঁহাদেরই মধ্যে যখন নানা বিভিন্ন মত, তখন এবিষয়ে বালকগণের বিবেকের উপর নির্ভর করা সমীচিন নহে। তাহাদের স্বাধীনতা সংযত করা নিতান্ত প্রয়োজন। যদি তাহাদিগকে উভয় দিক দেখাইয়া দিয়া সবভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় তবে তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। সেও আমার মতে কলেজের ছাত্রগণের জন্য। স্কুলের ছাত্রগণ নিতান্তই অপরিণত বয়স্ক, এবং সর্ব্বদা ঝোঁকের উপরেই কাজ করিতে উৎসাহশীল; তাহাদিগকে এইরূপ রাজনৈতিক গুরুতর বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে না দেওয়াই কর্ত্তব্য। স্বদেশের প্রতি ভক্তি, স্বদেশের জনসাধারণের প্রতি প্রীতি, স্বদেশের দ্রব্যজাত ব্যবহার করিবার প্রযত্ন এ এককথা আর রাজনৈতিক আন্দোলনে মিশিয়া যাওয়া আর এক কথা। একথা সকলেই বুঝেন।

দেশের মঙ্গল করিবার জন্য যথেষ্ট পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে যাহাতে কাহারও সঙ্গে কখন বিরোধ ঘটিবে না। আগে সেই গুলি লইয়া আরম্ভ করিলে ক্ষতি কি? আমার বিবেচনায় সেগুলিতে বেশী ত্যাগ স্বীকার, বেশী চেষ্টা বেশী পরিশ্রম আবশ্যক। একটী গ্রামে বাসয়া

সেই গ্রামের জনসাধারণের মানসিক শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে বদ্ধ পরিকর হইয়া নিজস্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জীবনপাত করা কি মহান্, কি পবিত্র! কোন কোনও ক্ষেত্রে দেশ সেবকের সম্মান যেরূপ কার্য্যে যেরূপ ভাবে দেখান হয় তাহাতে দেশ সেবক সম্মানটা অনেকের কাছে সহজ লভ্য বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বক্তা যিনি তিনি খুব উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা দিয়া পরদিনই সে স্থান পরিত্যাগ করেন, তাঁর উত্তেজনা স্থানীয় যুবকদলে সংক্রামিত হইয়া তাহাদিগকে তাঁর উপদেশ প্রতিপালনে ব্রতী করে; তার ফলে তাহাদিগকে যদি বিপদে পড়িতে হয় তখন সে ভোগ তাহাদিগকেই ভুগিতে হয় একথা অস্বীকার করা যায় না। যদি সহজেও কার্য্য উদ্ধার করা যাইতে পারে, যদি কাহারও সঙ্গে বিরোধ না করিয়াও কোনক্রমে কাজ উদ্ধারের পন্থা বাহির করা যাইতে পারে তবে সেইটাই করা কি আগে উচিত নহে? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তো তাই বোধ হয়! কোনও জাতির উপর অবিমিশ্র ঘৃণাও দ্বেষ পোষণ করিয়াই অন্য জাতি উন্নত হইতে পারে না অথবা তাহা না করিলে স্বজাতি প্রীতি দেখান যায় না ইহা আমার বুদ্ধিতে আসে না। কোনও ধর্ম্মের উপর অযথা অবিমিশ্র দ্বেষ করিয়াও কেহ ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হন না। অপিচ ধার্ম্মিক ব্যক্তি সকল ধর্ম্মের সত্যকেই সার বলিয়া গ্রহণ করেন। ইংরাজের কাছে এখনও অনেকের শিখিবার জিনিষ রহিয়াছে; আমাদের নিজ চরিত্র গঠিত হইতেও এখনও অনেক বিলম্ব আছে ভগবানের আশীর্ব্বাদে এই স্বদেশী সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত দেশ ভক্তির ভাব দেশে আবির্ভূত হইয়াছে; ধীর ভাবে স্থিরভাবে দেশের শিল্প বাণিজ্য স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে থাকিবে। যত দিন তাহা সম্পূর্ণ না হয় ততদিন অপেক্ষা করিতেই হইবে। যে বল এক সের তুলিতে সক্ষম হয় নাই তাহাকে একবারে এক মণ তুলিতে বলিলে সে তাহা পারিবে কেন?

তাই আমার নিবেদন, যাহাতে দেশের অশান্তির ভাব দূর হইয়া শান্তি স্থাপিত হয়, রাজা প্রজায় বিদ্বেষ ভাব বিদূরিত হইয়া বিশ্বাস ও নির্ভয়ের ভাব আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের ও স্বজাতির স্থায়ী প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়, দেশের যুবক রমণী কুলের শিক্ষা ও সাধনার উন্নতি হয় সকলে সেই দিকে সর্ব্ব প্রযত্নে মনোযোগ দিন।

তদ্দ্বারাই দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। দেশের উন্নতি প্রকৃত সাধনা সাপেক্ষ। বহুকাল নির্জ্জীবতার পর, বহু প্রকারে বিশ্বনিয়ন্তার সনাতন নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার পর দুই এক বৎসরে একটি জাতীয় জীবন গঠিত হয় না; জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয় না বলিয়া ক্ষুদ্র আমার নিকট বোধ হয়।

প্রকৃত কর্ম্মী সন্ন্যাস ব্রত আশ্রয় করিয়া দেশের কোথায় কোথায় কুশিক্ষার বীজ আছে, কুসংস্কার আছে তাহা অনুসন্ধান করুন, কোথায় কোন পতিত অন্ধকারময় গুহায় রহিয়াছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করুন, তাহাদিগকে শিক্ষা দিন, উন্নত করুন, রমণী গণের চিত্তবৃত্তির প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দিন, তাঁহাদের সন্তানগণের চরিত্র গঠনের ভার তাঁহাদের উপর দিয়া তাহাদিগকে সে ভারবহনের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করুন, দেশের কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করুন, আরও কলকারখানা স্থাপনের আয়োজন করুন; দেখিবেন দেশ আপনিই উন্নত হইয়া উঠিতেছ, তাহাকে তখন 'ওঠ' 'ওঠ' বলিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে না। বেলুনে যেমন উপযুক্ত পরিমাণে বাষ্প সঞ্চিত হইলে সে নিজের জোরেই উঠিতে চেষ্টা করে, দড়ি দড়ার বাঁধনে বাঁধিয়া রাখা কষ্টকর হয়, দেশেরও সেইরূপ উপযুক্ত সময় হইলে আপনিই সে উঠিবে। সেই উপযুক্ত সময় গঠন করিয়া তোলা আমাদেরই বিমুষ্যকারিতার উপর নির্ভর করে। ইহাই যেন সকলে মনে রাখেন। আর বেশী কি বলিব।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বর্ষশেষ।

১

ক্ষীণা শ্যামা তটিনীর পরপারে ওই
ঘনকুঞ্জ শিরে,
তিমির বসনে ঢাকা সন্ধ্যা ছায়া খানি
নামে ধীরে ধীরে।
নিখে গেছে দিবালোক,—ধীরে পড়ে ঢলি
বসন্তের বেলা,
গোধুলির মৃদু আলো নদী জল মাঝে
খেলে শেষ খেলা।
কোকিল চম্পক শাখে অলস তন্দ্রায়
গাহে শেষ গান,—
পাপিয়া আকাশ তলে ঘোষিছে সপ্তমে
বর্ষ অবসান!

২

প্রকৃতি চাহিয়া আছে বিনিদ্রনয়নে
সন্ধ্যা-তারা পানে,
গাহিছে বিদায়-গীতি অধীর সমীর
উদাস পরাণে!
কি অব্যক্ত হাহাধ্বনি উঠি ধরাতলে
ব্যাপিছে গগন,
কাননে পাদপরাজি কি গম্ভীর ধ্যানে
র'য়েছে মগন!
এ মহা মুহূর্ত্তে আজি বিশ্ব চরাচর
নীরব সকলি,—
মহাকাল-সাগরের অনন্তে মিশায়ে
বর্ষ যায় চলি!

৩

কোন শুভ্র প্রভাতের উজল আলোকে
এসেছিলে তুমি!
কি হর্ষ আশার মাঝে নিল তোমা বরি
দীনা বঙ্গভূমি!
আবাহন-গীতি তব গাহিল ভারত
কর্ম্ম কোলাহলে,
মায়ের মন্দির পানে শতেক সন্তান
গেল দলে দলে!
সঞ্জীবনী স্পর্শে তব শীতল শিরায়,
লভিলা চেতন;
কালের আহ্বান-ভেরী উঠিলে বাজায়ে,
ওহে পুরাতন!

৪

তার পর আকাশের পশ্চিম কোনায়
ঘন ঘটা করি,
কি তীব্র মূরতি ল'য়ে বজ্র এল নামি,
বঙ্গবক্ষ প'রি!
নভব্যাপী মেঘজাল, অন্ধকার ঘন,
অশনি হুঙ্কার,
গগনের কোনে কোনে অগ্নিরেখা ছুটে
করি হাহাকার!
প্রলয়ের দূতদল ভীষণ তাণ্ডবে
ফিরে নৃত্য করি,—
বুঝি আজ যুগান্তের পাপের পশরা
ডুবাইবে তরী!

৫

হে ভৈরব! আজি এই শান্ত তপোবনে
জ্বালি দাবানল,
কি উন্মত্ত ধ্বংস-লীলা খেলি গেলে হায়,
ভীষণ, চঞ্চল!
শান্তির আলয় ওই শ্যামল প্রান্তরে
স্নিগ্ধ বনচ্ছায়,
কি অগ্নি উঠিল জ্বলি আঁখির পলকে
উল্কা শিখা প্রায়!
হ'ল ভস্মীভূত কত সুখ নিকেতন
সোণার সংসার;
মাতা, পত্নী, ভগিনীর বহিল নয়নে
তপ্ত অশ্রুধার।

৬

যাও দূরে—অতীতের গিরিচূড়া হ'তে
পড় ঝাঁপ দিয়া,
নিম্নে যথা বিস্মৃতির অতল সলিল
উঠে উচ্ছ্বসিয়া!
জননীর ক্রোড় হ'তে ল'য়েছ টানিয়া
পুত্র প্রিয়তম,
সাধ্বীর অঞ্চল হ'তে ল'য়েছ কাড়িয়া
রত্ন অনুপম!
ভ্রাতারে রেখেছ কোথা দূরে, ভগিনীর
বক্ষ শূন্য করি,—
হে অশিব! হে নিষ্ঠুর! আর্ত্ত বঙ্গ
যাও পরিহরি!

৭

তবু শুধু বিচ্ছেদের অমঙ্গল বাণী
রুদ্র কণ্ঠে তব
বাজে নাই, ধ্বনিছে গম্ভীরে চেতনার
শুভ শঙ্খ রব।
উঠিছে জাগিয়া সবে, তেজে ছিন্ন করি
মোহের বন্ধন,
অন্তরের রুদ্ধ দ্বারে হ'তেছে আঘাত
শোণিত স্পন্দন!
জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যগগনে, চাহে সবে
সুখ-সূর্য্যপানে,—
নয়নে বিজলী খেলে আজি, আত্ম-বোধে,
আত্ম অভিমানে।

শ্রীসন্তোষকুমার বসু।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বস্তুতঃ ঐন্দ্রজালিকদিগের এই সকল অত্যদ্ভুত কার্য্য মানব বুদ্ধি এবং শক্তির অতীত বলিয়া বোধ হয়। এই সকল কার্য্য এ প্রকার কৌশল ও নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল যে তাহা সাধারণ মানবের ক্ষমতার অতীত সন্দেহ নাই। আমি অবগত হইয়াছি যে এই বিদ্যাকে "সেম্‌নিয়ান" বিদ্যা বলে এবং ইহা ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে প্রচলিত। সাধারণ মানবের শক্তির বহির্ভূত কতকগুলি ক্ষমতা কোন কোন মানবের মধ্যে থাকা বশতঃ তাহারা এই আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়।

একদা আরবদেশবাসী চল্লিশবর্ষ বয়স্ক এক ব্যক্তি আমার দর্শন প্রার্থী হইয়া রাজধানীতে আগমন করেন। তিনি যখন পরিচিত হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন' তখন দেখিলাম যে তাঁহার একটি হস্ত নাই, তাহা একেবারে স্কন্ধদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে জন্মাবধিই তাঁহার হস্ত নাই, অথবা তিনি যুদ্ধে এই হস্তটি হারাইয়াছেন। আমার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি প্রথমতঃ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, যে অলৌকিক কারণে তিনি এই হস্তটি হারাইয়াছেন তাহা অপরে শুনিলে কখনও বিশ্বাস করিবেন না বরং তাঁহাকে উপহাস করিতে পারেন। সেই জন্য তিনি ইহার কারণ কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে একান্ত অনুরোধ করিলে তিনি ইহার কারণ নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন করেন :—

"আমার বয়স যখন পঞ্চদশ বৎসর ছিল, তখন আমি পিতার সহিত তারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম। ষাট দিন সমুদ্র দিয়া নানা দিকে ভ্রমণ করিবার পর ভীষণ ঝড়ের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হইলাম। এই প্রবল ঝড় তিন দিন এবং তিন রাত্রি সমভাবে বহিয়াছিল। ঝড়ের সময় মুসলধারে বৃষ্টিপাত হইত, অনবরত বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত হইত

এবং সমুদ্রের জল এরূপ ভীষণ রূপে গর্জ্জন করিত যে তাহা অবর্ণনীয়। এই বিপদের উপর আবার জাহাজের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া ডেকের উপর পড়িয়া গেল, অনেক নাবিক মাস্তুলের আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। আর কিছুক্ষণ ঝড় স্থায়ী হইলে জাহাজ ডুবিয়া যাইত কিন্তু তৃতীয় দিনে ঝড় থামিয়া যাওয়াতে আমরা ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইলাম, যদিও তখন আমরা গন্তব্য স্থল হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এই প্রকারে কয়েক দিন ধরিয়া অনির্দ্দিষ্ট দিকে এবং অজানিত পথে যাইতে যাইতে একদিন সমুদ্রের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। আমরা ইহার নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলাম যে ইহা পর্ব্বত নহে একটী বৃহৎ দ্বীপ। দ্বীপটি অসংখ্য অট্টালিকাপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী-পূর্ণ এবং সুদৃশ্য বনরাজি শোভিত। জাহাজে যে পানীয় জল ছিল তাহা ফুরাইয়া যাওয়াতে আমরা এই দ্বীপে নঙ্গর করিলাম। কয়েকটি মৎস্যজীবীর নিকট হইতে জানিলাম যে এই দ্বীপটী পর্টুগীজ-দিগের অধিকৃত এবং ইহাতে বহুলোকের বসবাস আছে কিন্তু একটিও মুসলমান নাই। অধিকন্তু, দ্বীপ বাসীর সহিত কোনও অজানিত লোকের সংশ্রব নাই। আমাদের জাহাজ নঙ্গর করিবামাত্র, একজন পর্টুগীজ কাপ্তান ও আর একজন কর্ম্মচারী জাহাজে আসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমুদয় যাত্রীকে তীরে লইয়া গেলেন। তাঁহারা বলিলেন যে কোন কার্য্যের জন্য তাঁহাদের একটি বিশেষ লোকের প্রয়োজন, আমাদের ভিতর হইতে সেইপ্রকার একটী লোক পাইলে, তাঁহারা তাঁহাকে রাখিবেন এবং অন্য সব লোককে ছাড়িয়া দিবেন। বন্দরটি তাঁহাদেরই অধিকৃত এবং আমরা সম্পূর্ণরূপে তাহা-দের কৃপার অধীন বলিয়া তাঁহাদের এই আশ্চর্য্য-জনক প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হইলাম। তৎ-ক্ষণাৎ জাহাজের সওদাগর, দাস, নাবিক প্রভৃতি বারশত যাত্রীকে তীরে নামান হইল এবং একটি গৃহে রাখা হইল। তথা হইতে তাহারা আমা-দিগকে এক এক করিয়া ডাকিয়া পাঠাইতে লাগি-লেন এবং প্রত্যেকের গাত্রবস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া একজন ডাক্তার তাহার শরীরের প্রত্যেক স্থান পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। এই প্রকারে আমার ভ্রাতা এবং আমাকে পরীক্ষা করিবার পর ডাক্তার যখন আমাদিগকে পর্দ্দার ভিতরে কয়েকটি লোকের হস্তে দিলেন তখন আমরা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমার ভ্রাতা এবং আমি ব্যতীত জাহাজের সমুদয় লোককে চলিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া হইল। তাঁহারা যে চিহ্ন অন্বেষণ করিতেছিলেন তাহা তাঁহাদের দেহে না পাওয়াতে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। জাহাজের বার শত লোকের মধ্যে কোন্ অপরাধে আমরা দুইজন বন্দী হইলাম তাহা জানিবার জন্য পিতা অনেক তর্কবিতর্ক করিলেন, অশ্রুজলের সহিত অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু তাঁহাদের পাষাণ হৃদয় গলিল না, তাঁহারা ভ্রূকুটি সহকারে পিতার বাক্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন।

তৎপরে তাঁহারা আমাকে এবং আমার ভ্রাতাকে একটি দূরস্থানে লইয়া গিয়া দুইটি পৃথক গৃহে রাখিলেন; এই দুই গৃহের দরজা পরস্পর সম্মুখীন ছিল। প্রতি প্রাতঃকালে তাঁহারা আমাদিগের আহারের জন্য সাদা রুটি, মধু এবং মুরগীর কাবাব আনিয়া দিতেন। এই প্রকারে দশদিন অতিবাহিত হইল। এই দশ দিনের পর জাহাজের কাপ্তান জাহাজ ছাড়িবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আমার পিতা বলিলেন যে তিনি পর্টুগিজদিগের নিকট তাঁহার পুত্রদের জীবন ভিক্ষার জন্য গমন করিতে ইচ্ছা করেন। এই জন্য দুই, তিন দিন বিলম্ব করিতে তিনি কাপ্তানকে অনুরোধ করিলেন। পিতা বন্দরের অধিপতির নিকট আমাদিগের মুক্তির জন্য একান্ত কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, কিন্তু সব বৃথা হইল। আমাদিগকে মুক্তি প্রদান না করাতে তাঁহারা বন্দর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এক দিবস আমাদিগের দেহপরীক্ষক ডাক্তার এবং দশজন পর্টুগীজ আমার ভ্রাতার ঘরে

প্রবেশ করিয়া তাঁহার গাত্র বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে একটী টেবিলের উপর উপুড় করাইয়া শোয়াইলেন। তৎপরে তাঁহারা ভ্রাতার দেহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া আমার গৃহে আসিয়া আমার দেহও ঐরূপে পরীক্ষা করিলেন। পুনরায় তাঁহারা আমার ভ্রাতার গৃহে গমন করিয়া একটা বড় পাত্রের উপর তাঁহার মস্তক রাখিয়া হস্তে একটী তীক্ষ্ণধার ছুরী লইলেন। আমাদের গৃহের দ্বার পরস্পর সম্মুখীন ছিল বলিয়া ভ্রাতার গৃহে যাহা হইতেছিল সমুদয়ই আমি দেখিতে পাইতেছিলাম। ভ্রাতার কাতর ক্রন্দন এবং অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা ছুরিকা দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং মস্তক হইতে নিঃসৃত রক্ত দ্বারা ঐ পাত্রটি পূর্ণ করিলেন। রক্তস্রোত থামিয়া গেলে তাঁহারা ফুটন্ত তৈলপূর্ণ একটী পাত্রে ঐ রক্ত ঢালিয়া দিলেন এবং একটি হাতা দ্বারা ক্রমাগত নাড়িয়া তৈল ও রক্ত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত করিয়া ফেলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বলিব কি, তৎপরে তাঁহারা ভ্রাতার মস্তকটি লইয়া দেহের সহিত যুক্ত করিয়া উপরোক্ত মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা যুক্তস্থান জোরের সহিত মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। মর্দ্দন শেষ হইলে ভ্রাতাকে এই অবস্থায় রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তিন দিন পর তাঁহারা আসিয়া আমাকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিয়া বলিলেন, যে কার্য্যের জন্য আমরা বন্দী হইয়াছিলাম, তাহা আমার ভ্রাতার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা মাটীর নীচে একটি স্থানের প্রবেশ দ্বার আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে এই স্থানে অগণিত রত্ন ও স্বর্ণ আছে। আমি ইচ্ছা করিলে এই স্থানে নামিয়া রত্নরাশি লইতে পারি। প্রথমতঃ আমি তাহাদের কথা অবিশ্বাস করিয়া, ভাবিলাম যে তাহারা আমাকে আবার কোন্ বিপদের মুখে প্রেরণ করিতেছে। কিন্তু তাহাদের একান্ত ও সাগ্রহ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হইলাম। আমি গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং পঞ্চাশটি ধাপ অবতরণ করিয়া চারিটি প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইলাম। সাতিশয় বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম যে, প্রথম প্রকোষ্ঠে আমার ভ্রাতা সুস্থদেহে বসিয়া আছেন। তিনি পর্টুগীজদিগের বসন পরিধান করিয়াছেন, মস্তকে মণি মুক্তা সমন্বিত টুপী, পার্শ্ব দেশে হীরক খচিত তরবারী এবং মণি মুক্তা শোভিত যষ্ঠী ধারণ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে তিনি আমাকে দেখিয়াই ঘৃণা ও উপেক্ষার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইলেন। আমার অতি তাঁহার এইপ্রকার বিরূপভাব দর্শন করিয়া আমি নিতান্ত ভীত হইলাম, আমার শরীরের মজ্জা যেন জল হইয়া গেল। আমি তৎপরে সাহস করিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের মধ্যে গমন করিয়া দেখিলাম যে এই স্থানে রাশি রাশি হীরক, চুনী, মুক্তা, মরকত এবং অন্যান্য রত্নরাজি অপর্য্যাপ্তরূপে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তৃতীয় প্রকোষ্ঠ অগণিত স্বর্ণরাশি এবং চতুর্থ প্রকোষ্ঠ রৌপ্যরাশিতে পূর্ণ হইয়া আছে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার রত্নের মধ্যে আমি কোনটি লইব তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না! অবশেষে স্থির করিলাম যে একটি হীরক এক তাল স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান। সুতরাং কাপড় পূর্ণ করিয়া আমি হীরকই লইব মনে করিয়া যেমন তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছি, অমনি অন্তরীক্ষ হইতে এমন এক দারুণ আঘাত পাইলাম যে, সে স্থানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। পলায়ন করিবার সময় দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের সম্মুখ দিয়া যাইবার কালে আমার ভ্রাতাকে সেই গৃহে দেখিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই গৃহ হইতে বাহির হইয়া তরবারী দ্বারা আমাকে ভীষণরূপে আঘাত করিলেন। আমি এই আঘাত এড়াইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, পরন্তু আমার দক্ষিণ হস্ত স্কন্ধ দেশ হইতে বিচ্যুত হইল। এই প্রকারে আহত হইয়া আমি নিদারুণ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রবেশ দ্বারের দিকে দৌড়িলাম এবং উপরে

উঠিয়া পড়িলাম। এই স্থানে পূর্ব্ব বর্ণিত পর্টুগীজ ডাক্তার ও তাঁহার সহকারীদিগকে দেখিলাম। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন নীচে গিয়া আমার হস্তখানি লইয়া আসিল এবং চূণ, সুরকি দ্বারা গহ্বরের মুখ বন্ধ করিয়া পর্টুগীজ শাসনকর্ত্তার নিকট আমাকে লইয়া গেল। এতক্ষণ আমার কর্ত্তিত স্থান হইতে প্রবল বেগে রক্তধারা নির্গত হইতেছিল। আমি শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, শত শত নরনারী এবং বালক বালিকা তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ঔৎসুক্য সহকারে আমাকে দেখিতে লাগিল। শাসনকর্ত্তা পূর্ব্বকথিত ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া আহত স্থানে একটি ঔষধ লাগাইবামাত্র, উহা সম্পূর্ণরূপে জুড়িয়া গেল এবং ঘা শুকাইয়া গেল। শাসনকর্ত্তা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমাকে নয় হাজার নয় শত টাকা, রত্নখচিত সাজসজ্জা বিশিষ্ট একটি অশ্ব, এবং একদল কৃতদাস কৃতদাসী উপহার প্রদান করিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা আমার উপকার সাধন করিবেন তাহাও বলিলেন। তৎপরে তাঁহারা আমাকে বিদায় দিলেন। ডাক্তারের ঔষধে আমার আহত স্থান এরূপ নির্দ্দোষরূপে আরাম হইল যে এক্ষণে আমাকে দেখিলে লোকে মনে করিবে যে, আমি জন্মাবধিই এইরূপ হস্তবিহীন। এক মাস পরে আমি আর একটি জাহাজে আরোহণ করিয়া আমার গন্তব্য স্থানে গমন করিলাম।" *

পর্টুগীজগণ যাদু বিদ্যায় পারদর্শী উপারোক্ত ঘটনা যাদুবিদ্যাসম্ভূত বলিয়া আমি মনে করি। বঙ্গদেশীয় ঐন্দ্রজালিকগণও এই বিদ্যায় অভিজ্ঞ। সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে মাণ্ডো দুর্গ সুবিখ্যাত। নিম্নলিখিত বিস্ময়জনক ঘটনা হইতে এই দুর্গের উৎপত্তির বিষয় জানা যাইবে।

হিন্দুস্থানের কোন নগরের একজন দরিদ্র অধিবাসী প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতময় জঙ্গলে একটি কুঠার লইয়া কাঠ কাটিতে যাইত। এই কাঠ কাটিয়া সে যাহা উপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারাই তাহার সংসার চলিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে এই কুঠার মেরামত এবং তীক্ষ্ণ করিবার জন্য সে একটি কর্ম্মকারের বাড়ী ইহা লইয়া যাইত। একদিন কাঠুরিয়া যখন কাঠ কাটিতেছিল, তখন তাহার কুঠার একটি প্রস্তরের গাত্রস্পর্শ করে। যে কোন বস্তু ইহার সংসর্গে আসিত তাহাকে স্বর্ণে পরিণত করাই এই প্রস্তরের গুণ ছিল। প্রস্তর স্পর্শ করিবামাত্র কুঠারটি স্বর্ণময় হইয়া গেল। কাঠুরিয়া তাহা বুঝিতে না পারিয়া কর্ম্মকারকে বলিল, "তুমি এ কি করিয়াছ? আমার জীবনোপায় স্বরূপ এই কুঠারের ধার ত একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অধিকন্তু ইহা তামায় পরিণত করিয়া দিয়াছে।" কর্ম্মকার কাঠুরিয়া অপেক্ষা বুদ্ধিমান থাকায় সকলি বুঝিল। সে কাঠুরিয়াকে বলিল, "এই কুঠারটি আমাকে প্রদান করিলে আমি তোমাকে একটি নূতন কুঠার অর্পণ করিব। কিন্তু যে প্রস্তর তোমার কুঠারটি নষ্ট করিয়াছে, অগ্রে তাহা আমাকে দেখাও।" নির্ব্বোধ কাঠুরিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই স্থানে লইয়া গেল এবং প্রস্তরটি দেখাইয়া দিল। কর্ম্মকার আনন্দের সহিত তাহা বহন করিয়া নিজের গৃহে লইয়া গেল এবং স্ত্রী, পুত্র কাহাকেও প্রস্তরের তত্ত্ব না বলিয়া ইহা লৌহ সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং কাঠুরিয়াকে একটি নূতন কুঠার প্রদান করিয়া বিদায় দিল। তৎপরে এই সৌভাগ্যবান কর্ম্মকার তাহার নিকটে যত লৌহ ছিল সব স্বর্ণে পরিণত করিতে লাগিল। ক্রমে সে একটি বিশাল অট্টালিকা প্রস্তুত করিল। বাৎসরিক ৬ হাজার হইতে ৯ হাজার টাকা বেতনে বহু সমর বিদ্যা নিপুণ যোদ্ধা নিযুক্ত করিল। অধীন কর্ম্মচারীবর্গের প্রতি তাহার দয়া এবং দানের কথা পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়াতে পৃথিবীর নানা স্থানের বীর ও সুধীবর্গ তাহার নিকট আসিয়া একত্রিত হইলেন। সে সকলকেই সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আপন গৃহে স্থান দিল। তাহার যে অক্ষয় ভাণ্ডার সঞ্চিত ছিল তাহা হইতে অনায়াসে এই বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহিত

* এই গল্পটি আরব্য উপন্যাসের সিন্ধুবাদ বণিকের গল্পের মধ্যে সন্নিবেশিত হইতে পারে।

হইতে লাগিল। এই অক্ষয় রত্ন ভাণ্ডারকে সুদৃঢ় স্থানে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য সে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং তদনুরূপ স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। বহু অনুসন্ধানের পর চারিটী অভ্রভেদী পর্ব্বত বেষ্টিত একটি বিস্তৃত উপত্যকা দেখিতে পাইয়া সে ইহা সমর বিদ্যা অনুসারে গড়বন্দি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। তৎপরে আর কালব্যয় না করিয়া সে কুড়ি হাজার মিস্ত্রি লইয়া একদিকে কার্য্য আরম্ভ করিল এবং তাহার পুত্র আর কুড়ি হাজার মিস্ত্রি লইয়া বিপরিত দিক হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। এই প্রকার কার্য্য করিতে করিতে ত্রিশ বৎসর পরে পিতা পুত্র এক দিকে মিলিত হইল। এই দুর্গের বেড় ৪২ মাইল এবং ইহা প্রস্তুত করিতে এত ব্যয় হইয়াছিল যে তাহা গণনা করা মানবের অসাধ্য। এই দুর্গের দশটি সিংহ দ্বার এবং চারি দিকে চারিটী নির্গম দ্বার প্রস্তুত হইল। পর্ব্বতোপরি স্থাপিত প্রত্যেক সিংহদ্বার হইতে পর্ব্বতের সানুদেশ পর্য্যন্ত ৫০ হাজার ধাপ ছিল। দুর্গের মধ্যে একটি বিশাল ও উচ্চ মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মস্‌জিদের মধ্যে এক হাজার প্রকোষ্ঠ ছিল এবং প্রতি শুক্রবারের উপাসনার জন্য প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রকাণ্ড দুর্গের মধ্যে প্রকাশ্য উপাসনার দিন বিপুল জনসমাগম হইত এবং হাজার প্রকোষ্ঠই মনুষ্যে পূর্ণ হইয়া যাইত। মস্‌জিদের সমান্তরাল ভাবে একটি বৃহৎ অতিথিশালা এবং কর্ম্মকারের পরিবারবর্গের সমাধির জন্য একটি উচ্চ গোলঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গোল ঘরের অভ্যন্তরে চারিটি গরম জলের ফোয়ারা স্থাপিত করা হইয়াছিল। ফোয়ারা হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া যে দ্রব্য নির্গত হইত তাহা ক্রমশঃ একত্রীভূত হইয়া রাশিকৃত প্রস্তরে পরিণত হইত। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মর্ম্মর প্রস্তর অপেক্ষাও দৃঢ় এবং উৎকৃষ্ট ছিল। কর্ম্মকারের আত্মীয় স্বজনের সমাধির জন্য ইহা রক্ষিত হইত। এই জাঁকাল উপাসনালয় নির্ম্মিত হইলে এবং ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ কর্ম্মকার কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে বরহান্‌পুরের রাজার পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণার্থ বারাহান্‌পুরের রাজার দূত কর্ম্মকারের নিকট উপস্থিত হইল। কর্ম্মকার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কন্যার সাজসজ্জা এবং যাত্রার আয়োজন করিতে ব্যাপৃত হইল। তৎপরে সে কন্যাকে দূতের হস্তে অর্পণ করিল। যাত্রার প্রাক্কালে স্বর্ণপ্রস্তুতকারী প্রস্তরের একখণ্ড একটি স্বর্ণখচিত বস্ত্রে বাঁধিয়া কর্ম্মকার তাহা কন্যার পাল্কীর মধ্যে রাখিয়া বলিল যে সে যেন রাজাকে বলে যে বিদায়ের সময় তাহার পিতা তাহাকে এই উপহার প্রদান করিয়াছেন। ইহা দেখিতে সামান্য বটে কিন্তু তাহার পিতা ইহার পরিবর্ত্তে দুই লক্ষ টাকা পাইলেও ইহা পরিত্যাগ করিতেন না কেবল কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃই তিনি ইহা তাহাকে প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে কর্ম্মকার এই প্রস্তরের গুণ কন্যাকে বুঝাইয়া দিল। সে মনে করিয়াছিল যে বরহান পুরের রাজা ইহা হইতেই প্রস্তরের অসাধারণ গুণ বুঝিতে পারিবেন। দূতের সমভিব্যাহারে মাণ্ডোর রাজকুমারী বহু অনুচর লইত তাপ্তীনদীর তীরে অবস্থিত বারহানপুর নগরে যাত্রা করিল। চারিদিনের পরে তাহারা নর্ম্মদা নদীর তীরে উপস্থিত হইল। এই স্থানে বরহানপুরের রাজা বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় কর্ম্মচারীগণসহ কন্যার অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কন্যাকে স্বর্ণ এবং সুসজ্জিত অশ্ব দ্বারা খেলাত অর্পণ করিয়া তাহাকে সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু রাজা রাজবধূর উপযুক্ত কোন প্রকার জাঁকজমক এবং বহুমূল্য যৌতুক না দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন যে ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ কন্যার পিতা এই অভাব পুর্ণ করিয়া দিবেন।

ক্রমশঃ।

তৃতীয় বর্ষ। বৈশাখ, ১৩১৬। ১০ম সংখ্যা।

সুপ্রভাত

"নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা
আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে
প্রাচীন রজনী নাশো
নূতন উষালোকে।"

শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি,এ সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৶০ টাকা।

আজ

ধনীর সুপ্রভাত ! গৃহীর সুপ্রভাত !

সৌখীনের সুপ্রভাত ! মহিলার সুপ্রভাত !

কারণ,

বঙ্গ-দেশের কারখানাজাত সাবানের মধ্যে

ন্যাশন্যাল সোপ

অভিনব শিল্পজগতে অভাবনীয় যুগান্তর

ঘটাইয়াছে।

আকারে ও গন্ধের স্থায়িত্বে

ন্যাশন্যাল সোপ

বিলাতী সাবানকে পরাস্ত করিয়াছে !

মূল্যও যথাসম্ভব সস্তা করা হইয়াছে !!

তাই বলিতেছিলাম শিল্পজগতে আজ

সুপ্রভাত !

বাজারে সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত।

(বরোদার গাইকোয়ারের মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।)

সুপ্রভাত

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর ;
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

দ্বিতীয় বর্ষ। | বৈশাখ, ১৩১৬ সাল। | ১০ম সংখ্যা।

নববর্ষ।

নববর্ষের আগমনে আমরা সর্ব্বাগ্রে সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চরণে প্রণত হই। বিগত বৎসরের মর্ম্মন্তুদ বেদনা এবং প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া তিনি যে আমাদিগকে এই নববর্ষে উপনীত করিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি। বাংলা দেশের উপর দিয়া এই বৎসরে যে ঝড় ও ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে তাহা তাঁহারই বেদনার দান। এই দান অর্পণ করিয়া তিনি আমাদিগকে যে মহতী শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন তাহার ফল সুদূর ভবিতব্যের গর্ভে নিহিত। এই দৃশ্যতঃ অমঙ্গলের মধ্যে যে পরামঙ্গলের বীজ উপ্ত রহিয়াছে তাহা তাঁহারই প্রসাদে আমরা দেখিতে সমর্থ হইয়াছি। আমাদিগকে নিগ্রহ-বিড়ম্বিত করিয়া তিনি যে মহান্ লক্ষ্যের প্রতি আমাদিগকে উদ্বোধিত করিতে চাহেন, তাহারই আভাস প্রদান করিয়াছেন, এই নিগ্রহ লাঞ্ছনা উৎপীড়ন দ্বারা তিনি এই পতিত দেশে সুপ্রভাতের সূচনা করিয়াছেন। সুতরাং বিগত বৎসরের মর্ম্ম-ভেদী যাতনা, দারুণ নিরাশা এবং শোকের অগ্নিকে আমরা বরণ করিয়া লইয়া নূতন বর্ষে প্রবেশ করি।

গত বৎসরের প্রারম্ভে যখন ইহাকে আমরা আশা, উৎসাহ এবং আনন্দের সহিত আমাদিগের দুঃখ পরিম্লান গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিলাম তখন জানিতে পারি নাই যে এবৎসরের সন্তাপই তীব্রতর এবং পরীক্ষা কঠিনতর হইবে। আজ নববর্ষের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেছি বিগত বর্ষে কত গৃহ ছারখার হইয়াছে, কত সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কত বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাংলা দেশের আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিকে কেবল বিজলীর খেলা এবং বজ্রনিনাদ শোনা গিয়াছে। ভগবান রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া বাংলা দেশকে দুঃখের অনিবার্য্য ক্লেশে ক্লিষ্ট

করিয়াছেন। স্বদেশের মঙ্গল সাধন কল্পে কত সন্তান বিপথে গিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অসাধারণ ত্যাগ, সহিষ্ণুতা এবং অলৌকিক স্বদেশ-প্রেম আমাদিগকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রকার অলৌকিক গুণাবলী সমন্বিত হইয়া ও তাঁহারা বিপথে পরিচালিত হইয়া আপনাদিগের অমূল্য জীবন শেষ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া হৃদয় সন্তপ্ত হইতেছে। তাঁহাদের ন্যায় ধৈর্য্যশীল, অধ্যবসায় সম্পন্ন সন্তানবৃন্দ এই মরলোকে অবস্থিতি করিয়া যদি ভগবানের পুণ্য কার্য্যে জীবন ঢালিয়া দিতেন তবে হয়ত এ দেশের অধিক উপকার সাধন করিতে পারিতেন। অপর দিকে, যে সকল স্বদেশ সেবক ধর্ম্মকে মাথায় রাখিয়া অপরাজিত চিত্তে দেশের সেবা করিয়াছেন যখন তাঁহাদিগের নিগ্রহের কথা স্মরণ করি তখন ভাবি ভগবান যুগে যুগে ইঁহাদিগের ন্যায় সাধু কর্ম্মীদিগকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মহান্ কার্য্যের উপযুক্ত করিবার জন্য এই প্রকারেই তাঁহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া লইয়া থাকেন। অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে হইলে কাঞ্চন কসিত করিয়াই লওয়া হয়। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য তপস্বীগণ এই প্রকারেই নিজের জীবন আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।

আপাততঃ অন্যায়ের জয় পরিদৃশ্যমান হইলেও পরিশেষে সত্য ও ন্যায়ের জয় হইবেই ইহা ধ্রুব সত্য। বিধাতা বঙ্গবাসীকে বিপদ ও দুঃখের অগ্নিশিখার মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া কোন্ অচিন্ত্যনীয় কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছেন কে বলিবে?

আজ নববর্ষের শুভ্র, সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল প্রভাতে তবে আর ম্রিয়মান হইয়া থাকিব না। আজ তবে আনন্দ কলের সহিত পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে নববর্ষকে আমাদিগের দুঃখদগ্ধ কুটীরে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লই। এই বর্ষে বিধাতা আমাদিগকে কোন্ ধনে ধনী করিবেন, কোন্ নূতন সম্পদে অভিষিক্ত করিবেন তিনিই জানেন। আমরা কেবল তাঁহার মঙ্গলময় বিধান পূর্ণ করিবার জন্যই সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব। অন্যায় অবিচারে উৎপীড়িত হইয়াও আমরা যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া না পড়ি। যে সুপ্রভাতে আমরা মহা জাগরণের আভাস পাইয়াছি, তাহা বিধাতার ইঙ্গিতেই সমুদিত বলিয়া যেন আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। ঝড় ঝঞ্ঝাঘাতে, দুর্দ্দিনের দুঃসহ ক্লেশ আমাদিগকে যেন কর্ত্তব্যসাধনে বিরত না করে। যে কঠোর তপস্যায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা সাধনাসাপেক্ষ। স্বল্প দিনে তাহা উদ্‌যাপিত হইবে না। আমাদের দেশে যে সকল সাধুগণ দেহকে নিগৃহীত করিয়া পূজার্চ্চনা করেন, তাঁহারাই তপস্বী। কিন্তু উপর্য্যুপরি বিপদপাতে হতাশ না হইয়া, কর্ত্তব্য সাধন পথের শত শত বাধা বিঘ্ন দূরে ফেলিয়া দিয়া বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের দিকে চাহিয়া নির্ভীক অন্তরে, শান্ত সমাহিত চিত্তে যিনি কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়া যান তিনিই প্রকৃত তপস্বী, অকৃত্রিম সাধক। ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে থাকিয়া ঈশ্বরকে মস্তকে রাখিয়া তাঁহারই অর্পিত আদেশ প্রতিপালন করিয়া যাইব। সে পথে দুঃখ যদি আসে তাহা সহিতেই হইবে, বিপদ যদি আসে তাহা বহন করিতেই হইবে। ইহাতে নিরাশ বা ভগ্নোদ্যম হইলে চলিবে না; বিপদ দেখিয়া পশ্চাদ্‌পদ হইলে আর উপায় নাই। নিপীড়িত, নিগৃহীত নিঃসহায়ের অন্তরের বেদনা তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তার অন্তরেই বাজিবে, তিনি ইহার প্রতিকার অবশ্যই করিবেন। আজ বাংলা দেশে মেঘাবৃত প্রাবৃট্ যামিনী দেখিয়া শঙ্কিত হইব না। তাহারই পশ্চাতে যে সুপ্রভাতের ক্ষীণ রশ্মি রেখা দেখা যাইতেছে, তাহাই আমাদিগকে আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল করুক। বিধাতার বিধানই এই যে, দুঃখের পর সুখ আসে, রাত্রির পর দিন এবং অন্ধকারের পর আলোক দেখা যায়। দুঃখ, সন্তাপে দগ্ধীভূত না হইলে সুখের মর্ম্ম অনুভব করা যায় না। দুঃখশোধিত হৃদয়ের ভাবরাজি ভগবানের চরণে অঞ্জলি অর্পিত হইবার উপযুক্ত নির্ম্মাল্য। জগতের যে সকল তপস্বিগণ পর্ব্বত-প্রমাণ প্রতিবন্ধক ঠেলিয়া ফেলিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের

স্বর্গীয় আদর্শ আমাদিগকে নবজীবনের পথে অগ্রসর হইতে উদ্বুদ্ধ করুক। আমরা ত্যাগী, কর্ম্মী, সংযমী তপস্বীরূপে মহা সাধনায় প্রবৃত্ত হই। আমাদিগের মধ্যে যজ্ঞীয় অগ্নি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহা সংরক্ষণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হই। ভগবান আমাদিগের বহ্নি ধৌত বিশুদ্ধ জীবন তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত করুন। আমরা উন্নত মস্তকে, অকম্পিত পদে, অক্ষুব্ধ অচঞ্চল চিত্তে তাঁহারই কার্য্য যেন সম্পাদন করিতে পারি। আমাদিগের মধ্য হইতে মোহ পাপ চলিয়া যাউক, দুঃখ দুর্দ্দিনের অবসান হউক। আজ নববর্ষের শুভ প্রভাতে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের চরণে ভক্তি আপ্লুত কণ্ঠে নিবেদন করি;—

"তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি,
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি।"

অতীত ও বর্ত্তমান।

মনুষ্য জীবন একটি ধারাবাহিক কর্ম্ম প্রবাহ। কর্ম্ম সমষ্টি লইয়াই মনুষ্য জীবন। এই কর্ম্ম জ্ঞানমূলক, শুধু সহজ প্রবৃত্তি প্রণোদিত নহে। তাই ইতর জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যকে উচ্চাসন প্রদত্ত হইয়া থাকে। আহার নিদ্রা ভয় জীবমাত্রেই সাধারণ কিন্তু মনুষ্যের দুইটী জিনিষ বেশী আছে—তাহা জ্ঞান ও ধর্ম্ম। এই দ্বিবিধ উপাদান আছে বলিয়াই মনুষ্যের এত উৎকর্ষ, এত প্রভুত্ব। সাধারণ প্রাণী সহজ প্রকৃতিও সংস্কার বলে কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্য তাহার প্রত্যেক কার্য্যে নিজের ইচ্ছাশক্তি এবং স্বাধীন প্রবৃত্তি লইয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। এই কর্ম্মই তাহার সুখ দুঃখের জনক, এবং এই কর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্য মনুষ্যত্বহীন। মনুষ্যই সৃষ্ট জগতের সৌন্দর্য্য ভোক্তা—মনুষ্য না থাকিলে এই অনন্ত মধুরিমাময়ী প্রকৃতির লীলা কেহ বুঝিতে বা উপভোগ করিতে পারিত না। সমগ্র সৃষ্ট জগৎ অর্থশূন্য উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া পড়িত। তাই মনুষ্য সৃষ্টির ললাম শেষ বিবর্ত্তন, চরম উৎকর্ষ। অন্য অন্য ইতর প্রাণীর জীবনের কোনই লক্ষ্য নাই সৃষ্টি প্রবাহে কেবল তৃণ খড়ের ন্যায় ভাসিয়া যায়, কিন্তু মনুষ্যের একটা লক্ষ্য আছে তাহার নাম মনুষ্যত্ব এবং ইহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। যাহা ব্যতীত যে বস্তুর অস্তিত্ব থাকেনা, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। সুতরাং যাহা না থাকিলে মনুষ্য সংজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইয়া পশুসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহার বিশেষত্ব, এবং তাহার প্রাপ্তিই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। আমরা যাহা চাই এবং যাহা পাইলে আনন্দিত হই, পাইব আশায় উদ্বুদ্ধ হই—আত্মার অনুকূল বেদনীয় সেই পরম পদার্থই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ শোক চাই না, কারণ তাহারা আমাদের আত্মার প্রতিকূল বেদনীয়, এবং দুঃখপ্রদ। আমরা যাহা কিছু কামনা করি, তাহা লাভ হইলেও পুনরায় পদার্থান্তর লাভের আশা করিয়া থাকি। এইরূপে আশা আমাদিগকে এক অনন্ত আকাঙ্ক্ষা জালে বিজড়িত করিয়া ফেলে। অন্যদিকে আমাদের অগণ্য শত্রু বিকট মুখব্যাদান করিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে মৃগরাজ পর্য্যন্ত সকলেই মনুষ্যের শত্রু। কোন্ মুহূর্ত্তে মনুষ্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে—এই জন্য আকুল উদ্বিগ্ন। এইরূপ বহুবিধ আকুলতা, উদ্বিগ্নতা ও রোগ শোকের নামই দুঃখ। দুঃখ আবার ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হয়। যথা, আধ্যাত্মিক, আধি ভৌতিক, আধি দৈবিক। আধ্যাত্মিক আবার দ্বিবিধ, শারীর এবং মানস। রোগ শারীরিক দুঃখ। দিব্যশ্রী-মনোজ্ঞ-পান ভোজনাদির অভাব মানসিক দুঃখ। গন্ধর্ব্বাদি হইতে যে ভীতি হয় তাহাই আধি দৈবিক দুঃখ, এবং ব্যাঘ্রাদি জাত দুঃখকে আধি ভৌতিক

দুঃখ বলে। এই দুঃখত্রয় হইতে আত্মরক্ষা বা দুঃখ নিরাকরণের নামই মুক্তি বা পরম পুরুষার্থ। স্থূলতঃ রোগ নিবারণের উপায় ঔষধ, আধি ভৌতিক ও আধি দৈবিক দুঃখ নিরাকরণের উপায় সাবধানতা এবং মানসিক দুঃখ নিবারণের উপায় দিব্যশ্রী-মনোজ্ঞ পান-ভোজনাদি, কিন্তু এই সর্ব্ব প্রকার ঔষধই ক্ষণিক দুঃখ নিবৃত্তির হেতু। সুতরাং যাহা দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত ও একান্ত নিবৃত্তি সাধিত হয়, তাহাই আমাদের লক্ষ্য বা অভিলষিত বস্তু। জড় (প্রকৃতি) ও চৈতন্যের (পুরুষের) ভেদ জ্ঞান হইতেই দুঃখ নিবারিত হয়। এই ভেদ জ্ঞানই আমাদের মুক্তি, ইহা ভাব (Positive) পদার্থ নহে, ইহা একটী সম্পূর্ণ অভাব (Negetive) পদার্থ বা অবস্থা বিশেষ মাত্র। সেই চিরবাঞ্ছিত অবস্থা লাভ করা কর্ম্ম বিশেষানুষ্ঠান সাপেক্ষ এবং সেই কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে আমাদের চিরচঞ্চলা সহস্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা সঙ্কুচিত ও বহুবিষয়-বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত করিবার প্রয়োজন। এবং এই সংযম শিক্ষার মূলীভূত কারণ একমাত্র একাগ্রতা সাধন। চিত্তবিক্ষেপ দূর করিবার উপায় ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন "তৎপ্রতিষেধার্থ মেকতত্ত্বাত্যাগ" এই একতত্ত্ব বা একাগ্রতা সাধন করিতে হইলে আরও কয়েকটী আনুষঙ্গিক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান চাই। তাহা প্রধানতঃ (১) পরিবার (২) সমাজ (৩) রাজশক্তি। পরিবারবর্গের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের প্রেম, স্বার্থত্যাগ ও সহানুভূতি লাভ করিয়া আমরা পরস্পর নিরুপদ্রবে, জীবন যাপন করিতে পারি। সমাজ আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া আছে। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য কত অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, লক্ষ্য প্রাপ্তির প্রতিকূল দুর্নীতিরূপ মহাশত্রুদিগকে প্রশমিত করিয়া রাখিতেছে, অন্যদিকে রাজা, দস্যু তস্কর, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির হস্ত হইতে সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা করিতে যত্নবান। এইরূপ আমাদের নিজ দেশের রাজশক্তি—সমাজ শক্তিই যে কেবল আমাদের একাগ্রতা সাধনের সহায়, তাহা নহে; পৃথিবীর সমস্ত সমাজ, সমস্ত রাজশক্তিই ঐ মহাসাধনের অনুকূল না হইলে আমাদের লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়া সুদূর পরাহত। এই জন্য সমাজ বিপ্লব, রাষ্ট্র বিপ্লব, প্রভৃতি আমাদের এত ভীতিবিধায়ক। এক কথায় সমগ্র পৃথিবীতে কোনও সমাজই যদি কাহারও অশান্তি বা অনিষ্ট সাধন না করে, তাহা হইলে পৃথিবী এক পরম পবিত্র মঙ্গল নিকেতন হইয়া উঠে। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে মনুষ্য জীবন একটা ঘোরতর সংগ্রাম ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপে এক শক্তি অন্য শক্তিকে বিনষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট, এক সমাজ অন্য সমাজকে গ্রাস করিতে উদ্যত, এ উহার মুখের গ্রাস বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবে; এই প্রবৃত্তি দ্বারা সমগ্র ইউরোপখণ্ড উত্তেজিত। ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঘোর সংগ্রামে সকলেই উন্মত্ত। সেই উন্মত্ততার অবাচ্ছনীয় কলুষিত তরঙ্গ আমাদের শান্তি প্রবণ চির পবিত্র সমাজ দেহকে ঘাত প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। তাই আমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত—শান্তিহারা। তাই আমাদের একাগ্রতা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! অকিঞ্চিৎকর পার্থিব কোলাহলে আমাদের চিরন্তন লক্ষ্য হইতে আমরা ভ্রষ্ট হইয়াছি। কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় জানিনা আমরা আর কত কাল অনন্ত অম্বরে ছুটিয়া বেড়াইব। আমাদের শিল্প গিয়াছে, বাণিজ্য গিয়াছে, কৃষিলব্ধ ধন গিয়াছে; বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা ও ধর্ম্মহীনতায় পারিবারিক সুখ শান্তি চিরতরে বিলীন হইয়াছে। আমাদের সমাজে পাপীর দণ্ড নাই, ধার্ম্মিকের নিগ্রহ আছে; কৃতীর পুরস্কার নাই, নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষা নাই; অধর্ম্মের প্রশ্রয় আছে। অন্য দিকে বৈদেশিক বণিক-ব্যাঘ্র করাল বদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। যাঁহারা সমাজের ভরসাস্থল তাঁহারাও সান্নিপাত বিকার গ্রস্থ রোগীর ন্যায় স্বীয় কাল্পনিক পিপাসা প্রশমিত করিবার জন্য উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল প্রাণে দিগ্‌বিদিক কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান শূন্য হইয়া পরমপুরুষার্থ

ভুলিয়া যাইতেছে। চিত্তের একাগ্রতার পরিবর্ত্তে আছে কেবল ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতা আর অরুন্তুদ আত্মগ্লানি। এইরূপে উচ্চতম পারলৌকিক ভাবনা হইতে বিচ্যুত হইয়া কাম-গন্ধ দুষ্ট নিকৃষ্ট ঐহিকতায় আমাদের সমাজ বিজড়িত হইতেছিল। ত্রিদিবের চিরানন্দপ্রদ অমৃত ধারা লাভে বঞ্চিত হইয়া অন্ধ তমসাচ্ছন্ন অতল নিরয়গর্ভে নিমগ্ন হইতেছিল। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে অবতরণ করিয়া নিম্নতম স্থূল বহির্জগতের অকিঞ্চিৎকর খেলা ধূলা, মান অভিমান, দুরাকাঙ্ক্ষা ও পর-পীড়নে আত্ম বিক্রয় করিয়া চরম-লক্ষ্য বিস্মৃত হইতেছিল। জানিনা কোন করুণা-প্রবণ দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায় নরদেবতা "বন্দেমাতরম্" রূপ বিজয়-দুন্দুভি নিনাদে বিনষ্টপ্রায় বিলাসসুপ্ত জনসমাজকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, স্বদেশপ্রীতির পূত মন্দাকিনী ধারায় সঞ্জীবিত করিয়াছে। আর সে সঙ্কীর্ণতা নাই, মোহ কুহেলিকা ভাঙ্গিয়াছে, পর-মুখ-প্রেক্ষিতার তিক্ত আস্বাদ এতদিনে অনুভূত হইয়াছে। আত্মাদর ও স্বাবলম্বন বৃত্তির শান্তোজ্জ্বল আলোক তরঙ্গে মনীমসচিত্তপ্রাসাদ পাপান্ধকার নির্ম্মুক্ত হইয়াছে। দূরাগত বীণা-ধ্বনিবৎ ত্রিদিবের স্বর্ণ সিংহাসন হইতে জানিনা কোন অশরীরী জীবের সুধা মধুর আশ্বাস বাণী কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মনঃপ্রাণ অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃতরসে আপ্লুত করিয়া তুলিতেছে। ধীরে ধীরে সেই পরম মঙ্গলময় পর-জীবনের অসীম কর্ত্তব্য-কাহিনী মনঃরাজ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে অনাবিল চিন্তা লহরী অস্ফুট কলতানে হৃদয়নিহিত সংবৃত্তিগুলি প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, আর ভাবনা কি? দুর্ভিক্ষ সম্পীড়িত হতভাগ্যদের করুণ আর্ত্তনাদে স্বদেশ-প্রেমানুপ্রাণিত মহাত্মাদের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। আজ বঙ্গললনাগণ স্বহস্তে বরণ ডালা লইয়া স্বদেশের কৃতী সন্তানবৃন্দকে সুগ্রথিত পুষ্পমাল্যোপহারে সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন। আনন্দসূচক তূর্য্যধ্বনিতে শুদ্ধান্তঃপুর মুখরিত—শিল্পীকুলের ক্ষীণবাহুতে বল সঞ্চার হইয়াছে, বস্ত্র বয়ন যন্ত্র সূতাতন্তু দূরে নিক্ষেপ করিয়া শ্রুতি সুভগ অনুচ্চ নিঃস্বনে প্রোৎসাহিত শিল্পীকুলের কর্ম্মকুশলতা বিজ্ঞাপন করিতেছে, এদৃশ্য কি মনোহর! কি আশ্বাসপ্রদ!

স্বামী স্ত্রী, পিতা পুত্র, ভ্রাতা ভগিনী সকলেই এক প্রাণে একমনে স্বদেশহিত ব্রত উদযাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প। মাতৃ প্রদত্ত মোটা কাপড় অক্ষুব্ধ-চিত্তে সকলেই গ্রহণ করিতেছে, কারণ স্বর্গাদপি গরীয়সী লবণাম্বুমেখলা, ভারত জননীর মঙ্গল-কল্পে স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার রূপ মহামন্ত্রে সকলেই দীক্ষিত। ইহাতে ভেদ বুদ্ধি নাই, সঙ্কোচ নাই, আছে শুধু পরার্থ-পরতা ও আত্মত্যাগ। ভারত সন্তানগণ যেন এই পুণ্যময় যুগে দধীচির দেবদুর্ল্লভ ওজস্বিতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; যুগ ধর্ম্মের এই পবিত্র সন্ধিস্থলে সংসার লীলাভিনয় করাও এক প্রকার সৌভাগ্য! অন্যদিকে বিদেশীয় শিল্পীগণ অবজ্ঞা মিশ্রিত তিরস্কার বাক্যে নব প্রবুদ্ধ ভারতসন্তানগণকে নিরস্ত ও নিরুৎসাহ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত ও বিলাসিতার আপাত মধুর অপবিত্র কূলে নিক্ষেপ করিবার জন্য দিন-যামিনী প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ভারত সন্তান চিরন্তন অভ্যাস গুণে অবিচলিত ও অক্ষুব্ধ। এ আত্মসংযম স্বরৃত্তি বৈদেশিক শিল্পী নিধনে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র; এইবার তাঁহাদের স্বার্থপরতার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইবে, ভারতবাসীর কঠোর সাধনায় ভগবানের আসন টলিয়াছে, আধি ভৌতিক দুঃখের বুঝি অবসানের দিন আমাদের আসিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদি ভ্রাতাগণ! "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির দিগন্তারাবী, বিজয়ভেরী বাজাইয়া মনঃ তুরঙ্গের রশ্মি-আকর্ষণ পূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতা সাধন কর এবং সমাজ শাসনে দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিয়া বীরের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া যাও। জীবন সংগ্রামে তোমার জয় হইবে। যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই দেখিতে পাইবে, জীবনের চরম সাধন মনুষ্যত্ব তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তোমার নির্গমন পথে দণ্ডায়মান আছে, আর স্মিত-প্রফুল্ল-বদনে অঙ্গুলিসঙ্কেতে মুক্তি

মার্গ তোমাকে দেখাইয়া দিতেছে। স্বার্থ পঙ্কিল সংসারের কলুষতা-দুষ্ট বায়ু স্তর ছড়াইয়া যেন কোন অপাপবিদ্ধ চিরশান্তিময় জীবনের দিকে তুমি অগ্রসর হইতেছ; আর তোমার সেই আনন্দময় অভিযান নিরীক্ষণ করিবার জন্য ঐ দেখ নবজাগ্রত জাপান নির্নিমেষনয়নে তোমার প্রতি দৃষ্টি যোজনা করিয়া রহিয়াছে। এইবার তোমার বিষম আত্মপরীক্ষা!!!

শ্রীঅবনীনাথ লাহিড়ী।

বিজয়ী।

দুঃখের সনে সখ্য মধুর
বেদনা গরবময়,
লাঞ্ছনা শত, ভূষণের মত
সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া রয়!

কঠিন শৃঙ্খলে পুষ্প মালিকা
পুলক পরশ কত,
জীবন ব্যাপিনী সন্তোষ-সুখ
স্বরগ-ধারায় স্নাত!

পরাণ পুরিত ভকতি উৎস;
শিরেতে অভয় বর,
বিশ্ব-প্লাবিনী প্রেমের বন্যা
কোথাও রাখেনি পর।

নির্ম্মল ললাট প্রতিভাদীপ্ত,
আননে অরুণাভাস,
বন্ধন মুক্ত দৃপ্ত জীবন
মরণ চরণে দাস!

অযুত কর্ম্মে অটুট শান্তি
শ্রান্তির নাহিক লেশ,
ত্যাগের মন্ত্রে, দীক্ষিত পূত
মহান্ বিজয়ী বেশ!

* * * * *

জননি!
তোর ধন্য পুত্র; সার্থক সেই
অমিত উদ্যম আশা,
সার্থক তাঁর মানব জনম,
এ ভব ভবনে আসা।

শ্রীলাবণ্যলেখা আইচ।

বৌদ্ধযুগে বিক্রমপুর।

বৌদ্ধযুগ ভারতের বাহ্য সম্পদের উন্নতির যুগ। সে সময়ে সমগ্র ভারতব্যাপী মিলনের যে সুমহান্ মঙ্গল ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল, সেই সাম্য সংস্থাপক নীতি ও ধর্ম্মের পবিত্র গৌরব গরিমা

বৌদ্ধযুগ। বর্ত্তমান সময়েও আমরা হৃদয়ে অনুভব করিয়া অপূর্ব্ব শান্তি ও প্রীতি বোধ করিয়া থাকি। যদিও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রখর তেজোসূর্য্য শঙ্করের অভ্যুদয়ে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি জগতের বক্ষ হইতে তাহা চিরদিনের জন্য মুছিয়া যায় নাই! এমন ত্যাগী সন্ন্যাসী জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। রাজার ছেলের ভোগৈশ্বর্য্য পরিহার, জগতের সমুদয় মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরহিতার্থ আত্ম-বিসর্জ্জন, কি অপূর্ব্ব মহিমাজ্ঞাপক! সংসার-যাতনা-ব্যথিত নরনারীর সমক্ষে ইনিই অমৃতের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। গম্ভীর আরাবে ভারত বক্ষে "নির্ব্বাণ মুক্তির" অপূর্ব্ব সত্য সকলকে শুনাইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—"এস, এস, নরনারী, আমি অমৃত পাইয়াছি, সে অমৃত তোমাদিগকে দিব।" হায়! কোথায় সেই দিন? কল্পনালোকে অতীতের সেই সুন্দর কাহিনী ভাবিয়া হৃদয়ে ভক্তির উদয় না হয় এমন নরনারী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ বিক্রমপুরে কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা বিবৃতির জন্য আমরা বাধ্য হইয়াই এখানে একটু প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলাম।

চাণক্যের কৌশলে নন্দবংশ ধ্বংসের পর ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি

চন্দ্রগুপ্ত। হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত ভারতের ভদ্রবাহু নামক জনৈক জৈন যতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এ সময়ে বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মণাচার এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহাঁর অধিকার সময়ে পাটলি পুত্র নগরে জৈনদিগের শ্রীসঙ্ঘ আহূত ও জৈন অঙ্গশাস্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়। চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ বিরোধী ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে "বৃষল" বলিয়া লাঞ্ছিত করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের পরে ৩১৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তৎপুত্র বিন্দুসারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজা অশোকের অভ্যুদয় হয়। ইহাঁর সময়েই বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করে। ইনিও সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন এবং

মহারাজা অশোক। ইহাঁর ভোজনশালায় শত শত পশু বধ হইত। রাজা অশোক রাজ্যাভিষেকের সময়ে প্রথম জৈন, পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অশোক প্রিয়দর্শী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পরে উহার প্রচারের নিমিত্ত নানা দেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন, এমন কি সুদূর ইউরোপ ও আফ্রিকা পর্য্যন্তও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ তাঁহার প্রচারকগণ গমন করিয়াছিল. ইহাঁর সহিত তৎকালীন প্রায় সমুদয় রাজন্যবৃন্দেরই মিত্রতা ছিল। অশোকের সময় বঙ্গদেশের অবস্থা তাদৃশ গৌরবজনক ছিল না। তাঁহার অধীনে বঙ্গদেশ নানা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত হইয়া এক একজন সামন্ত রাজার শাসনাধীনে ছিল।

এ সময় হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইতে থাকে। মহারাজা অশোকের সময় ইহা

পালবংশীয় নৃপতিগণ। পূর্ণরূপে আধিপত্য লাভ না করিলেও পালরাজবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরে ইহা বিশেষরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বৌদ্ধধর্ম্মের মহৎ আদর্শে দীক্ষিত হইয়া পালবংশীয় নৃপতিগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। (১) খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে পাল-

(১) The next rulers we hear of belenged to the Boonheahs or Buddist Rajahs Three of the Booneah Rajahs took up their abode in this District, and in that portion of it lying to the north of the Booriganga and Dulleserry, where the sites of their capitals are still to be seen. Just Pal

বংশীয় নৃপতিগণ শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ২য় শূরপালের পরে (১০৭৮-১০৯১) তদীয় সহোদর রামপাল সিংহাসনারোহণ করেন। (১০৯১-১১০৩) গৌড়ে ও বঙ্গের নানা স্থানে এই মহাত্মার কীর্ত্তিসমূহ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল গ্রাম ও এই রামপালের নামানুযায়ীই হইয়াছে। (১) ইহা কতদূর সত্য তাহা সুধী পাঠকবর্গই বিচার করিবেন; কারণ রামপালের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ ও বিভিন্ন জন-কপোল কল্পিত প্রমাণ বিদ্যমান। ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি অসত্য তাহা অতীতের অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন গহ্বর হইতে উদ্ধার করা সুকঠিন।

পালবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ কোন্ প্রদেশের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন তাহার কোনও ধারাবাহিক বিবরণ জানিতে পারা যায় না। বোধ হয় গৌড়ের মূল পালবংশীয় নৃপতিবৃন্দের কোন শাখা পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তালিপাবাদ পরগণায় মাধবপুরে যশোপাল, ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ার শিশুপাল এবং সাভারের নিকটস্থ কাটি বাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিতেন। এই হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব রঙ্গপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বিক্রমপুরের রামপালে অদ্যাপিও "হরিশ পালের দীঘি' নামক একটী দীঘি বর্ত্তমান আছে। প্রবাদানুযায়ী এই হরিশ্চন্দ্রের বংশেই বৌদ্ধ নৃপতি মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। মানিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের মহত্ত্ব, স্বার্থত্যাগ ও নানাবিধ গুণাবলী আজও পূর্ব্ববঙ্গে যোগীজাতির মধ্যে গীত হইয়া থাকে। গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গোপীপাল নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। *

মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্ব সময়ে (৯৮০ খ্রীঃ অঃ) বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে বৌদ্ধ মহাতান্ত্রিক ও পরমজ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিষ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ যতি (২), ইহার পূর্ব্ব নাম আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ ছিল। অবধূত জেতারি নামক জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া পরিশেষে ইনি ত্রিপিটক, বৈশেষিক দর্শন ও যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদিগের ন্যায় দর্শন ইত্যাদি পাঠ করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করতঃ একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমপুরের গৌরব, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিক্রমপুরবাসী অনেকে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও জানেন না। নানাশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করতঃ অবশেষে তিনি সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া বৌদ্ধদিগের ত্রিশিক্ষা নামক তত্ত্বগ্রন্থে জ্ঞানলাভার্থ কৃষ্ণগিরির বিহারস্থ রাহুল গুপ্তের নিকট গমন করেন। এস্থানে তিনি বৌদ্ধদিগের গুহ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুহ্যজ্ঞান বজ্র নামে অভিহিত হন, তৎপরে প্রায় উনবিংশ বর্ষ বয়সে দন্তপুরীর মহাসঙ্ঘিকাচার্য্যের শীল রক্ষিতের নিকট পবিত্র বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত হ'ন এবং উক্ত মহাত্মার নিকটই

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

resided at Moodubpore in the Pargonnah of Toolipabed. Haris Chander at Cotebarry near Sabar, and Sisoopal at Copassia in Bhowal. * * * (Taylor's Topography)

"The Bhuija or Buddhist Rajas (founders of the Pal dynasty of the Kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took up their abode in this District, to the north of Boori ganga, and Dhaleswari, where the sites of their capital are still to be seen." Hunter's statistical Account of Dacca.

(১) বিশ্বকোষ ৩১৬ পৃষ্ঠা পালরাজবংশ। 'সাহিত্য' ১৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। P, 118. 'প্রাচীন বাঙ্গলা' শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

* যোগীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোকে আনন্দিত॥

(২) Indian Pandits in the lands of snow by Rai Sarat Ch. Das Bahadur C. I. E.

তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধিলাভ করেন। দীপঙ্কর তৎকালীন সমুদয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া সুবর্ণদ্বীপস্থ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান আচার্য্য চন্দ্রগিরির নিকট গমন করিয়া সে স্থানে দ্বাদশবৎসরকাল অবস্থান করেন। তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরের নিকট অদ্যাপি তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর C. I. E. মহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি যে তিব্বতে স্বয়ং বুদ্ধদেব হইতেও দীপঙ্করের প্রতি তদ্দেশবাসী বৌদ্ধ লামাগণ অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দীপঙ্করের নামোচ্চারণ করিলেই তাঁহারা করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মহান্ আত্মার উদ্দেশে হৃদয়-জাত ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। দীপঙ্কর ১০৮ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য পতি দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্রচোল কর্ত্তৃক আনুমানিক ১০১১ কি ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হন। পালবংশীয় নৃপতিগণের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্ম বিক্রমপুর হইতে লয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক সময়ে যে ইহা বিক্রমপুরের চতুর্দ্দিকে বিশেষরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহা অনুমান করাও সুকঠিন। * পালরাজগণ যে বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা বিক্রমপুরের প্রায় প্রতি গ্রাম হইতে প্রাপ্ত এবং পুকুর ও দীর্ঘিকা ইত্যাদি খননে উত্তোলিত নানাপ্রকারের প্রস্তর গঠিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সমূহ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পদ্মাসনোপবিষ্ট ধ্যানস্থ বৌদ্ধের সৌম্য মূর্ত্তিগুলি প্রকৃত পক্ষেই শিল্পীর অদ্ভুত শিল্প-কৌশলের পরিচায়ক। দুঃখের বিষয় যে অধিকাংশ মূর্ত্তিরই ছিন্ন নাসিকা, সেজন্য এসকল মূর্ত্তিকে বিক্রমপুরবাসীগণ 'নাককাটা বাসুদেবে'র মূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। জনপ্রবাদ এইরূপ যে উড়িষ্যা প্রদেশের পাঠান রাজগণের দুর্দ্দান্ত হিন্দুবিদ্বেষী সেনাপতি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলিরও এইরূপ অঙ্গহীন হইতে হইয়াছিল বিক্রমপুরে এমন পল্লী অতি বিরল যেখানে ঈদৃশ মূর্ত্তি দুই একটী বিদ্যমান নাই

বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।

জৈনপতি রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গের পালবংশীয় নৃপতি গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হইলে পূর্ব্ববঙ্গ হীনবল হইয়া পড়ে, সে সময়ে বঙ্গদেশে একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেই সুযোগে বর্ম্মবংশীয় ভূপালগণ বিক্রমপুর অধিকার করেন। এই বংশের কোন্ নৃপতি সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্ববঙ্গের সিংহাসনারোহণ করেন তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

বিক্রমপুরে বর্ম্মবংশের অভ্যুদয়।

তবে শিলালিপি, তাম্রশাসন ও বৈদিককুল গ্রন্থ ইত্যাদিতে হরিবর্ম্মদেব নামক এক বৈষ্ণব নৃপতির বিশেষগুণ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বৈদিককুল সম্ভূত রাঘবেন্দ্র কবিশেখর ও ইহাঁর বহু গুণবত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে এ স্থানে সে সকলের আর উল্লেখ করলাম না। এই বর্ম্মবংশ শূরবংশের অন্যতম শাখা, ইহাঁরা পূর্ব্বে কাশীপুর বর্ত্তমান 'কাশীয়ারী' নামক স্থানের নরপতি ছিলেন। বর্ম্মবংশীয়েরা যখন বিক্রমপুর অধিকার করেন, সে সময়ে পদ্মানদী বিক্রমপুরের দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল; এখন উহা মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়াতেই বিক্রমপুর উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই বংশের হরিবর্ম্মা, জ্যোতিবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মার নাম বিশেষ সুপরিচিত। † পাল ও বর্ম্মবংশের ক্রমিক অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল

* As a state religion, Buddhism perished with the state. With the passing of the Pal dynasty it disappeared as completely from Vikrumpur as if it had never been. "Romance of an Eastern capital" by Bradley. Bart.

† সাহিত্য ১৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা পালরাজবংশ শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও নগেন্দ্র বাবুর বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য।

রাজগণের অবনতির সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপ বিক্রমপুর হইতে লুপ্ত হইতে থাকে, তদ্রূপ বর্ম্মবংশের অভ্যুদয়ে ও সেনবংসের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় পূর্ব্বগৌরব লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বর্ষারতি।

আবার জননী, এসেছে আবার
নবীন বর্ষ,
এসেছে নূতন আলোক মাঝার
চেতনা-হর্ষ!
পুরাতন ধরা আজি অভিনব,
দিকে দিকে তব মধু উৎসব,
কুসুমে সমীরে, কূজনে মিহিরে,
অমিয় স্পর্শ!
এসেছে জননী, পূজিতে তোমারে
নবীন বর্ষ!

মনে পড়ে মাগো, সেই একদিন
রজনী-অন্ত,
তখনো অবনী সুপ্তি-বিলীন,
বিজন পন্থ!
হেরিনু সহসা দু'টী আলো রেখা,
পূরব-পশ্চিম হতে দিল দেখা,
আশীষে কাহার অতুল অপার
সুষমাবন্ত!
তখন জননী, ঘুচিছে আঁধার
রজনী-অন্ত!

ঘোষেছিল মাগো, শুভ 'সুপ্রভাত'
তখনি বিশ্ব,—
বিস্ময়ে সবে করে আঁখিপাত
কি মহা দৃশ্য!
মৃত বলে' যারা আছিল ঘৃণিত,
তারা জাগরিত চির উত্থিত—
মরণের ভয় কিছু নয়-নয়-
কে কহে নিঃস্ব!
ঘোষে 'সুপ্রভাত' কিবা শিবময়
তখনি বিশ্ব!

তারপর মাগো, এল কত ঝড়
তোমার বক্ষে,—
নিভেনি আলোক উজ্জ্বলতর
আপন লক্ষ্যে!
রুদ্র বিষাণ উঠিল বাজিয়া
অযুত বজ্র গেল গরজিয়া
অটল পুলক, একটি পলক
পড়েনি চক্ষে!
স্নিগ্ধ শীতল যেন মা পাবক
তোমার বক্ষে!

তুমি মা শুনালে কি অভয়-বাণী
সবার মর্ম্মে,
ছুটে এল সবে শঙ্কা নাহি জানি'
তোমার কর্ম্মে!
হৃদয়-শোণিত করিয়া মুক্ত
পূজিল চরণ হাজার ভক্ত,
লভিল তোমারে বুকের মাঝারে
জীবন-ধর্ম্মে!
তুমি মা দানিলে অভয় সবারে
অ-বল মর্ম্মে!

নবীন বর্ষে দাও আজ তবে
নবীন শিক্ষা,—
অনল মন্ত্রে জাগরিত ভবে
মহান দীক্ষা!
কর মা সত্য জীবনের ব্রত,
অবিচল পণ রহুক সতত,
অন্যায়-বাঞ্ছ পুণ্যের সাজ
হউক ভিক্ষা!
নবীন বর্ষে, দাও মাগো আজ
নবীন শিক্ষা!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ঘোষ-যাত্রা।

মহাভারতের কথা। ধৃতরাষ্ট্র তনয় দুর্য্যোধন এখন ভারতের সম্রাট। কর্ণ ও শকুনির কুমন্ত্রণার ফলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় দুর্য্যোধনের নিকট নিজ রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্ত হারাইয়া ভ্রাতৃগণ ও রাজ্ঞী দ্রৌপদী দেবীকে লইয়া দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনে গিয়াছেন। দুর্য্যোধন সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হইয়া মহা সুখে সাম্রাজ্য ভোগ করিতেছেন।

দুর্য্যোধনের সুখের শেষ নাই। এই স্বর্ণপ্রসূ শস্যশ্যামলা স্বভাবসুন্দরী ভূলক্ষ্মী তাঁহার একায়ত্ত। অতুল ঐশ্বর্য্য, নবীন যৌবন, লোকললাম সুন্দরী শিরোমণি পত্নী, যুদ্ধে অপরাজেয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ-প্রমুখ মহারথবৃন্দ তাঁহার সহায়, সন্তানবৎসল পিতা-মাতা নিত্য তাঁহার প্রতি আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতেছেন,—তাঁহার অভাব কিসের?

খলের অসাধ্য কিছুই নাই। খল স্বর্গেও নরকের সৃষ্টি করে। দুর্য্যোধনের মাতুল শকুনির মত ঈর্ষাপ্রবণ, দ্বেষপূরিত, হলাহলময় হৃদয় বুঝি আর কাহারও নাই! শকুনি দেখিলেন, পাণ্ডবেরা নির্ব্বাসিত, দুর্য্যোধন মহা সুখে সাম্রাজ্য ভোগে নিমগ্ন,—শান্তি সকল স্থানে বিরাজমান। শকুনির হলাহলময় হৃদয় ইহা সহ্য করিতে পারিল না, তিনি আগুন জ্বালাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

রাজমাতুল শকুনি কর্ণের সহিত কত কি কুমন্ত্রণা করিলেন। অবশেষে তিনি দুর্য্যোধনের নিকটে গিয়া বলিলেন, "রাজন্, এখন তোমার মত ক্ষমতাশালী, সৌভাগ্যবান, ধনজনবাহনসম্পন্ন সম্রাট এই বিশাল ভারতবর্ষে আর কে আছে? স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার সম্পদ দেখিয়া লজ্জা বোধ করেন। এখন সেই অবিনীত, অভাগ্য পাণ্ডবগণ কোথায়? শুনিতে পাই, তাহারা বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত দ্বৈতবনে এক সরোবর সন্নিধানে বাস করিতেছে। তাহারা এখন রাজ্যচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট এবং দরিদ্র, তুমি রাজ্যেশ্বর শ্রীমান ও সুসমৃদ্ধ; এই সময় একবার চল, সকল প্রকার রাজচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া তাহাদিগকে দর্শন দেও। তাহারা স্বচক্ষে তোমার শ্রী দর্শন করুক। তুমিও তাহাদিগের দুর্দ্দশা নয়ন ভরিয়া দেখ। পুত্র; ধন ও রাজ্যলাভ হইলে যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, শত্রুদিগের দুঃখ দর্শনে তদপেক্ষা সমধিক প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। তুমি ভ্রাতৃগণ ও মহিষীগণ সহিত মহার্ঘ রত্নালঙ্কারখচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া বল্কলাজিনধারী ভীমার্জ্জুন-নকুল সহদেব বেষ্টিত যুধিষ্ঠিরকে ও চীরপরিহিতা অভিমানিনী যাজ্ঞসেনীকে দর্শন কর। দ্রৌপদী তাহার এই দুর্দ্দশার সময় মহার্হ বসনভূষণধারিণী রাজমহিষীগণকে দেখিয়া মরণাধিক ক্লেশ পাইবে। শত্রুদিগের হৃদয়ে ক্লেশ দিবার এরূপ সুবিধা কদাপি পরিত্যাগ করিও না।"

রাজা দুর্য্যোধনের স্বভাব নিতান্ত কলুষিত এবং তাঁহার হৃদয় স্বভাবতঃ মলিন। মাতুলের এই নীচ মন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। ঐশ্বর্য্যশালী হইলেই লোকে মহৎ হয় না। হায়! মানুষের হৃদয় কতদূর নীচ হইতে পারে, শকুনির এই প্রস্তাব তাহার কেমন প্রমাণ দিতেছে! রাজ্যভ্রষ্ট ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কত ক্লেশে তাঁহার অনুগত ভ্রাতৃগণ এবং পতিপ্রাণা মহিষীকে লইয়া বনবাস সময় অতিবাহিত করিতেছেন, নানারূপ প্রাণসঙ্কট বিপদে আপতিত হইয়াও সযত্নে নিজ ধর্ম্মধনকে রক্ষা করিতেছেন,—কোথায় এ সময়ে জ্যেষ্ঠতাত পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহার প্রতি কৃপা ও সমবেদনা দেখাইবেন,—না এই বিপদের সময় তাঁহাদের হৃদয়ে অসহ্য যাতনা উদ্রেকের নিমিত্ত উপায়ের উদ্ভাবনে ব্যগ্র হইলেন! যাহা হউক, মাতুলের প্রস্তাব দুর্য্যোধনের সম্পূর্ণ মনোমত হইলেও তিনি এই দুর্বাসনা পূরণের পথ দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেন, "মাতুল,—আপনার প্রস্তাব বড়ই সাধু,—আমারও নিতান্ত ইচ্ছা যে শত্রুদিগকে আমাদের এই সৌভাগ্য দেখাইয়া আসি

এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বচক্ষে তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া আনন্দিত হই। বনমধ্যে বনবাসিনী কাষায়ধারিণী দ্রৌপদীকে দেখিব, ইহার পর সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? যদি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মহাবল ভীমসেন আমাকে অসামান্য সম্পত্তিসম্পন্ন অবলোকন করেন, তাহা হইলে আমার প্রাণ প্রফুল্ল হইবে এবং আহ্লাদের আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু উপায় কি? পিতা সর্ব্বদাই পাণ্ডুনন্দনগণের পক্ষপাতী; তাহাদের জন্য শোক করেন এবং তাঁহার বিশ্বাস যে তাহারা আমাদের অপেক্ষা শৌর্য্যে বীর্য্যে ও তপস্যায় শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তিনি আমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারুন আর নাই পারুন, আমাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদের নিকটে যাইতে দিবেন না।"

অসাধারণ চতুর শকুনি দুর্য্যোধনকে নিজ প্রস্তাবে এরূপ সম্মত ও আগ্রহযুক্ত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং উৎসাহের সহিত বলিলেন, "বৎস! আমি যখন তোমার মন্ত্রী, তখন ভাবনা কি? বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বঞ্চনা করিতে কতক্ষণ? দ্বৈতবনে ও তাহার নিকটে আভীরপল্লী আছে, তাহা তুমি অবগত আছ। সেই আভীরগণের তত্ত্বাবধানে তোমার লক্ষ লক্ষ ধেনু বৃষভাদি রহিয়াছে। সেই বৃষভ, গাভী ও বৎসগণের পরিদর্শন, সংখ্যা নির্দ্ধারণ ও তাহাদিগকে রাজচিহ্ন দ্বারা মুদ্রিত করণ তোমার শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমি তোমার পিতার নিকট এই কর্ত্তব্যের উল্লেখ করিয়া অনুমতি চাহিলেই অনুমতি পাইবে। অধিকন্তু মৃগয়ার কথাও বলিতে পার। বৃদ্ধ নরপতি ত অনুমতি দিবেনই, বরঞ্চ তাঁহার পুত্র রাজধানীর ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যপালনার্থ ঘোষপল্লী গমনে তৎপর হইয়াছে দেখিয়া পরমানন্দিত হইবেন।"

মাতুলের পরামর্শ ভাগিনেয়ের নিকট অতি উপাদেয় বোধ হইল। পুত্র অম্লানবদনে এই চাতুরী পরিপূরিত মিথ্যা বাক্যে পিতাকে প্রতারিত করিলেন! শকুনি যে বাগুরা-বিস্তার করিয়াছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র বিশ্বস্ত হৃদয়ে তাহাতে পদার্পণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বদ্ধ হইলেন। তিনি যোগ্যপুত্র রাজেশ্বর দুর্য্যোধনের মুখে আভীরপল্লী পরিদর্শনের প্রস্তাব শুনিয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়া বলিলেন, "পুত্র, মৃগয়া উত্তম বটে এবং ধেনুগণের পর্য্যবেক্ষণ করাও আবশ্যক; কিন্তু বিশেষ সাবধানে তথায় গমন করিবে। কারণ, আমি শুনিয়াছি, নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা তথায় অবস্থিতি করিতেছে। পাণ্ডবেরা সকলেই তপোবলসম্পন্ন ও মহারথ; তোমরা কেবল কপটতাচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া অনেক কষ্ট দিয়াছ। যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক, তিনি সেই ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু ভীমসেন মহাক্রুদ্ধস্বভাব এবং দ্রুপদরাজনন্দিনীও সাতিশয় তেজস্বিনী, কদাচ ক্ষমাপর নহেন। তোমরা তাহাদের নিকটেও যাইবে না। নচেৎ একখণ্ড অগ্নি যেমন অতি অল্প সময় মধ্যে বিশাল তৃণ স্তূপকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, পাণ্ডবের ক্রোধবহ্নিও তোমাদিগকে সেইরূপ নষ্ট করিয়া ফেলিবে।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের চর্ম্ম চক্ষু দুইটি অকর্ম্মণ্য থাকিলেও তাঁহার জ্ঞান চক্ষুর দীপ্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল; তাই তিনি পুত্রগণের কল্যাণ কামনায় উল্লিখিত উপদেশ প্রদান করিলেন। শঠ শকুনি বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধের হৃদয়ে সন্দেহের বায়ু বহিতেছে। তাই পাপিষ্ঠ অগ্রসর হইয়া কপট বিনয় সহকারে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কেন বৃথা সন্দেহ-পীড়ায় ক্লেশ পাইতেছেন? আমরা মৃগয়ার আনন্দ উপভোগ করিতে অভিলাষ করিয়াছি,—আমরা আমাদের ধেনুগণের তত্ত্বাবধান ও অঙ্কন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। আমরা আমাদের কার্য্য করিব; পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদের কোনও রূপ বিবাদ করিবার বাসনা দূরে থাকুক, আমরা তাহাদের আশ্রমের নিকটেও যাইব না। আপনি নিশ্চিন্ত হউন।"

বৃদ্ধ মহারাজ অগত্যা নিরস্ত হইলেন। তথাচ তিনি আজ্ঞা করিলেন, দুর্য্যোধন প্রবীণ অমাত্যবর্গকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। এই অনুমতি পাইবামাত্র "সাজ সাজ" রব পড়িয়া গেল। দুর্য্যোধন তাঁহার প্রিয় বয়স্য কর্ণ, মাতুল শকুনি, দুঃশাসনাদি প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সহস্র সহস্র মহিলা এবং মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া দ্বৈতবনে যাত্রা করিলেন। পৌরগণ স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত চলিল। অষ্ট সহস্র রথ, তিন অযুত হস্তী, নবতি শত অশ্ব ও সহস্র সহস্র পদাতি রাজার অনুবর্ত্তী হইল। অসংখ্য শকট, দোকান, বণিক, বন্দী ও মৃগয়াশীল পুরুষ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধনের এই ঘোষযাত্রা মহাবীর সেকন্দর শাহের দিগ্বিজয় যাত্রাকেও লজ্জা দিয়াছিল সন্দেহ নাই।*

এইরূপ মহাসমারোহের সহিত চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে ভ্রাতৃবন্ধু বয়স্য-স্বজন পরিবৃত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন মহাদম্ভে দ্বৈতবনে চলিলেন। পথে বহু গ্রাম নগর ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ এই বিশাল বাহিনী দ্বৈতবনের নিকটস্থ হইল। পথপ্রদর্শকগণ রাজাকে নিবেদন করিল যে, তাঁহার গোপপল্লী নিকটস্থ হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া রাজা আদেশ প্রচার করিলেন যে, আর অগ্রসর হওয়ার আবশ্যকতা নাই। পরিচারকগণ তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ছায়াবিহুল, মহীরুহসম্পন্ন, প্রসন্ন সলিলশালী এক সর্ব্বগুণযুক্ত প্রদেশে তাঁহার বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিল এবং রাজার গৃহের নিকটেই তাঁহার প্রিয় বয়স্য ও ভ্রাতৃগণের আবাসস্থান প্রস্তুত করিল।

দুর্য্যোধন এই স্থানে বাসকরতঃ প্রথমে বৃষভ ধেনুবৎসাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি গাভী বৃষ ও বৎসগণকে যথাবিধি অঙ্কিত করিয়া তাহাদের গণনা লইলেন। গোপালকদিগের সাহায্য লইয়া এই পরিদর্শন কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক গোপ-গোপীদিগের পরিচয় লইলেন। গোপযুবক এবং গোপবালাগণ রাজসন্দর্শনে অতীব হৃষ্ট হইয়া বিবিধ অলঙ্কার এবং রঞ্জিতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নৃত্যগীত করিতে লাগিল। রাজা তদীয় আত্মীয় স্বজন ও মহিষীকুল পরিবেষ্টিত হইয়া দেবদেবীবেষ্টিত পুরন্দরের ন্যায় শোভাধারণ পূর্ব্বক আভীর নরনারীর নৃত্যগীত দর্শন শ্রবণে পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হইলেন। নৃত্যগীতকারীগণ রাজসন্নিধানে অন্নবস্ত্র ও প্রচুর পারিতোষিক পাইয়া কৃতার্থ হইল।

ধেনুপাল পরিদর্শনের পর মৃগয়া ব্যাপার। গভীর অরণ্য মধ্যে বৃহৎ বৃক্ষশাখে মঞ্চ সমূহ নির্ম্মিত হইল এবং তদুপরি রাজা নিজ মহিষীর সহিত আরোহণ করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও বয়স্যসমূহ নিজ নিজ পত্নী সমভিব্যাহারে ধনুঃশরাদি বিবিধ আয়ুধ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন মঞ্চারোহণ করিলেন। মৃগয়াশীল পুরুষেরা বহুসংখ্য শিক্ষিত হস্তী ও অসংখ্য পদাতি সৈন্য লইয়া চক্রাকারে অরণ্যভাগ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নানাবিধ উচ্চ চীৎকার ও বাদ্যোদ্যমে ধরণী বিকম্পিত করিয়া ক্রমশঃ চক্রপরিধি হ্রস্বতর করিতে করিতে কেন্দ্রস্থ মঞ্চাভিমুখে আরণ্যপশু যূথকে তাড়াইয়া আনিতে লাগিল। হস্তীর বৃংহিতে, অশ্বের হ্রেষায়, গণ্ডারের গর্জ্জনে ভল্লুকের ফুৎকারে, মহিষের চীৎকারে, মৃগয়ামত্ত জন্তুনিবহের কর্ণভেদী কোলাহলে, "ঐ বরাহ" "ঐ ব্যাঘ্র" "ঐ গণ্ডার" ইত্যাকার উৎসাহ বাণীতে বনভূমি একেবারে আঘ্রাত হইয়া উঠিল। লক্ষ্যনিপুণ বীরগণের শানিতশরের আঘাতে কত শত শার্দ্দূল কুরঙ্গ প্রাণ হারাইল, বর্ষাফলকে বিদ্ধ হইয়া কত বরাহের জীবন গেল, কত ভল্লুক ভল্লাগ্রে নিহত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই! মৃত পশুর শোণিতশবে বনভূমি শ্মশান মশানে পরিণত হইল! হায়! নিরীহ নিরপরাধ প্রাণিকুলের প্রাণ লইয়া ক্রীড়া না করিলে ধনের গৌরব, রাজত্বের মহত্ব ও সম্ভ্রমের মহিমা ঘোষিত হয় না! এইরূপ শত সহস্র পশু শোণিতে নির্দ্দয় দুর্য্যোধনের মৃগয়া পিপাসার শান্তি হইল। এইবার তিনি ঘোষযাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে কয় দবস মৃগয়াদি ক্রীড়ায় সুখভোগ করার পর রাজা দুর্য্যোধন হর্ষোৎফুল্ল মুখে শকুনিকে বলিলেন "মাতুল, আমাদিগের এই যাত্রার আনু-

* ইহা আমাদের অতিশয়োক্তি নহে, মহাভারত বনপর্ব্বে ঘোষযাত্রাপর্ব্ব দ্রষ্টব্য।

সাঙ্গিক ইতর আমোদ প্রমোদ ত যথেষ্ট হইল, এখন সেই মুখ্য আমোদ লাভের আয়োজন করা হউক। সেই দীন দরিদ্র বনবাসী যুধিষ্ঠির কোথায় বাস করিতেছে? তাহাদিগকে আমার এই শ্রীসম্পদ দেখাইবার নিমিত্ত উৎকট আগ্রহ জন্মিয়াছে। আপনি সত্বর এ বিষয়ে মনোযোগী হউন।"

শকুনি ও হাস্যমুখে উত্তর দি'লন "রাজন্, আমি কি আর নিশ্চিন্ত আছি? যুধিষ্ঠিরাদির সংবাদ লইবার জন্য চারিদিকে চর প্রেরণ করিয়াছিলাম; অদ্য প্রত্যুষে সংবাদ পাইয়াছি যে যুধিষ্ঠির এইস্থানে অনতিদূরে এক সরোবর তীরে গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছে এবং অদ্য সে নানা ব্রাহ্মণ সাহায্যে বিবিধ বস্তু উপকরণ যোগে দ্রৌপদীর সহিত এক-দিবস সাধ্য এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছে। অদ্যই উহাদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তোমার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে উহাদিগের মর্ম্মচ্ছেদ করিবার উত্তম অবসর। আজি তথায় অনেক ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছেন; তাঁহাদিগের সম্মুখে তেজস্বিনী দ্রৌপদী রত্নালঙ্কার ভূষিতা রাজমহিলাদিগকে দেখিয়া অবমাননার তুষানলে কিরূপ দগ্ধ হইবেন, তাহা ভাবিতেও আমার আনন্দ হইতেছে। আমি পরিচারকবর্গকে আদেশ দিয়াছি, তাহারা এখনই ঐ সরোবরের চারিদিকে তোমার ক্রীড়াভবন প্রস্তুত করিবে এবং নানাবিধ খাদ্যপেয় ফল পুষ্পপত্র দ্বারা ঐ সকল গৃহ সজ্জিত ও পূর্ণ করিবে। তথায় কলাকুশল নৃত্যগীত নিপুণ গায়কগায়িকাগণ তোমার মনোরঞ্জনের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। তুমি অদ্যই তোমার মহান্ মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ এতক্ষণে আমার আদেশ প্রতিপালিত হইয়া গেল, তুমি এখনি সে সংবাদ পাইবে।"

দুর্য্যোধন মাতুলের এবম্বিধ কার্য্যতৎপরতার পরিচয় পাইয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতেছেন এমন সময়ে শকুনি প্রেরিত পরিচারকবর্গের মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, আমরা দ্বৈতবনের সরোবরের চারিদিকে আপনার ক্রীড়াভবন নির্ম্মাণ করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বিতাড়িত হইয়াছি।" ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দুর্য্যোধন এই সংবাদে অতিশয় কুপিত হইয়া ভৃত্যদিগকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "কে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে?" ভৃত্য বিনীতভাবে নিবেদন করিল "মহারাজ, আজি কুতিপয় দিবস হইতে সুররাজ ইন্দ্রের সখা গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ বহুশত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সমভিব্যবহারে লইয়া ঐ স্থানে বনভ্রমণে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের বাসস্থান এখনও তথায় রহিয়াছে। গন্ধর্ব্বেরাই আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।" পরক্ষমতাসহিষ্ণু দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্বদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার মানসে চতুরঙ্গিণী সেনা সজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন। প্রবীন অমাত্যেরা বারবার নিষেধ করিলেন,—'গগনচারী দেবযোনি গন্ধর্ব্বলোকের সহিত মনুষ্যের যুদ্ধ কখনই মঙ্গলদায়ক নহে' ইত্যাদি কত বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। মহাবীর কর্ণের সেনাপতিত্বে মহতী কৌরবসেনা গন্ধর্ব্বদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিল।

দেখিতে দেখিতে উভয়পক্ষে ঘোর সংগ্রাম বাধিয়া গেল। কৌরবসেনা ভারতে অজেয়, তদুপরি মহাবীর কর্ণের বীরত্ব; গন্ধর্ব্বেরা প্রথমে তাহাদিগের বেগ সহ্য করিতে পারিলনা। অনেক গন্ধর্ব্ব হতাহত হইল। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ সংবাদ পাইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার অসাধারণ বীর্য্যে ও দৈবী মায়ায় কুরুসৈন্য অচিরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল,—সেনাপতি কর্ণও পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন এবং ভ্রাতৃগণ ও মহিষীগণ সহিত রাজা দুর্য্যোধনকে বন্দী করতঃ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিজ রাজধানী সুমেরু শৃঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

পাপের উপযুক্ত শাস্তি হইল সন্দেহ নাই। মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া রাজা দুর্য্যোধন বনবাসী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং রাজ্ঞী দ্রৌপদীর মর্ম্মে আঘাত দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু গন্ধর্ব্বদ্বারা তাঁহার সমস্ত সৈন্য পরাস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন, যাবতীয় ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠিত এবং শেষে ভ্রাতৃগণ ও স্ত্রীগণ সমভি-

ব্যাহারে তাহাদের বন্দী হইয়া কারাক্লেশ ভোগ করিতে চলিলেন! এই বিষম বিপদে তিনি অসহায় ও অনাথ। কর্ণ ও শকুনি পলায়নপর হইলে আর কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? কুরুকুলের বৃদ্ধ অমাত্যগণ, যাঁহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে দুর্য্যোধনের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, এইরূপ সহসা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সকলে মিলিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন।

ভীমসেন সেই সকল বৃদ্ধ দীনভাবাপন্ন দুর্য্যোধনের অমাত্যগণকে কহিলেন, "আমরা সাতিশয় যত্নবান হইয়া বিবিধ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করতঃ যে কার্য্য করিতাম, আজি গন্ধর্ব্বেরা তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে আমাদিগের শুভার্থী ব্যক্তিও ভূমণ্ডলে আছেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন মনে করিয়াছিল সে নিজে পরমসুখে থাকিবে আর আমরা শীত-বাত-বৃষ্টি প্রভৃতিতে বনবাসে নিতান্ত ক্লেশ পাইব। অদ্য সে তাহার স্বকর্ম্মের ফলভোগ করুক।"

এরূপ অবস্থায় ভীমের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সাধারণ মানুষের মনে এরূপ ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অজাতশত্রু, ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হৃদয় পার্থিব কলুষতা শূন্য এবং স্বর্ণনদীর স্রোতের ন্যায় নির্ম্মল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভীমসেনকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "ভাই, কৌরবেরা এখন বিপন্ন, এখন কি এমন কথা বলিতে আছে? জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ প্রায়ই হয়, তাহা বলিয়া কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না। যদি অপর কোন ব্যক্তি বংশের অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কুলজাত সৎপুরুষদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা একমতাবলম্বী হইয়া পরকৃত দৌরাত্ম্যের প্রতিকার করেন। গন্ধর্ব্বেরা দুর্য্যোধন ও অবলাকুলকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমাদিগের কুলে কলঙ্কার্পণ করিতেছে; অতএব এক্ষণে আত্মকুল রক্ষা ও শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত তোমরা শীঘ্র উত্থিত ও সজ্জিত হও। হে ভীম, তুমি অর্জ্জুন নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া সুযোধনকে * গন্ধর্ব্ব হস্ত হইতে বিমোচন কর। শত্রুও শরণাপন্ন হইলে তাহাকে রক্ষা করিতে হয়; শত্রুকে রক্ষা করা বরপ্রাপ্তি, রাজ্যলাভ ও পুত্রোৎপত্তির তুল্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। সুযোধন বিপদাপন্ন হইয়া তোমারই বাহুবলে জীবনলাভের অভিলাষ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? যদি আমার যজ্ঞ আরব্ধ না হইত, তাহা হইলে আমিও তোমাদিগের সঙ্গে ধাবমান হইতাম।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে ভ্রাতৃগণকে বুঝাইয়া গন্ধর্ব্বরাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার উদারহৃদয় শত্রু মিত্র সকলেরই জন্য উন্মুক্ত। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে তাঁহার কর্ত্তব্য পরিস্ফুট। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ হয় যথার্থ বটে, কিন্তু অন্য একব্যক্তি ভ্রাতাকে আক্রমণ করিলে উভয় ভ্রাতা এক হইয়া সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে উত্থিত হওয়াই নীতিসঙ্গত। এই নীতি রক্ষিত হইলে কুলধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম কখনই নষ্ট হইতে পারে না। কুক্ষণে রাঠোর কুলপাংশুল জয়চাঁদ এই নীতি পদদলিত করিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছিল। নচেৎ—

"পার হ'য়ে সিন্ধুনদী
আসিতে কি পারিত যবন?"

ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেব চারি ভ্রাতা অগ্রজের আদেশ শিরোধার্য্যপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরেই অর্জ্জুনের সহিত চিত্ররথের সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয়াদি হইল। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন অর্জ্জুনের পিতৃ বন্ধু,—অর্জ্জুনের উপর তাঁহার অগাধ প্রেম। চিত্রসেন অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধনের এই ঘোষযাত্রার উদ্দেশ্য সমস্তই বলিয়া দিয়া কহিলেন "প্রিয় ধনঞ্জয়, দুর্য্যোধন মনে করিয়াছিল যে তোমরা বনমধ্যে অনাথের ন্যায় বাস করিতেছ, এই সময় বিবিধ দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সম্পত্তি সমভিব্যাহারে এখানে আসিলে

* যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে "সুযোধন" বলিতেন।

সে তোমাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমোদ পাইবে এবং দ্রৌপদীকে উপহাস করিবে। তোমার পিতা আমার প্রিয় সখা ইন্দ্র উহার এই দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে যথোচিত শাস্তি দিবার জন্য আমাকে অনুমতি করিয়াছেন। আমি ভ্রাতৃগণ ও নারীগণ সহিত দুর্য্যোধনকে ইন্দ্রের চরণে উপহার প্রদান করিব।" অর্জ্জুন বিনীতভাবে বলিলেন "পিতঃ, দুর্য্যোধন আমাদের ভ্রাতা, আপনার জন; উহাকে মুক্ত করা ধর্ম্মরাজের একান্ত অভিপ্রেত। যদি আপনি আমাদের প্রিয় কার্য্য করিতে চাহেন, দুর্য্যোধনকে সভার্য্য, সভ্রাতৃক পরিত্যাগ করুন।" চিত্রসেন পুনশ্চ বলিলেন "বৎস, এই পাপাত্মা তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে আসিয়াছিল, উহাকে মুক্ত করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মরাজ এই দুষ্টের অভিপ্রায় জানিতেন না। চল, তাঁহার নিকট গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করি, পরে তিনি যাহা কহিবেন, তাহাই করা যাইবে।"

চিত্রসেন বন্দী দুর্য্যোধনকে সঙ্গে লইয়া যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট পাপাত্মা দুর্য্যোধনের পাপ অভিসন্ধির আদ্যান্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজ সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণান্তর কৌরবগণ ও তাহাদিগের মহিলাবর্গকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং চিত্রসেনকে যথোচিত পূজা করিয়া বলিলেন "পূজ্যপাদ গন্ধর্ব্বরাজ, আপনি পরম সামর্থ্যশালী হইয়াও যে আমার এই দুর্মতিগ্রস্ত ভ্রাতা দুর্য্যোধন ও ইহার আত্মীয়স্বজন কাহারও হানি করেন নাই বা মহিলাকুলের অবমাননা করেন নাই তাহাতে আমার যথেষ্ট উপকার করা হইয়াছে। আপনার দয়ায় আমাদিগের কুলমান রক্ষা হইল। আপনার কি অনুমতি প্রতিপালন করিব বলুন"

চিত্রসেন যুধিষ্ঠিরের সৌজন্যে পরম প্রীতিলাভ করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং দুর্য্যোধনও সপরিবারে হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের এই অমানুষিক সদয় ব্যবহারে দুর্য্যোধনের হৃদয়ে যে অভিমান ও অবমাননার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, ইহজীবনে আর তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই।

খলের উপকার করিলে সে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, উপকারকারীর প্রতি আরও রুষ্ট হইয়া উঠে। সজ্জনের অপকার করিলেও তিনি অপকারকারীর হানির চেষ্টা করেন না, প্রত্যুত আবশ্যক হইলেই তাহার উপকার করিয়া থাকেন। "পাপ কর্ম্মের ফল অশুভ" ইহাই ঘোষ-যাত্রা গল্পের নীতি।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

হিন্দুশাস্ত্রে নীলনদী, মিসর দেশ ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য প্রদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নিষধ পর্ব্বত।

আবিসিনিয়া দেশস্থ পর্ব্বত সমূহের সংস্কৃত নাম নিষধ। এই সমুদয় পর্ব্বত হইতেই নন্দা, ক্ষুদ্রতর কৃষ্ণা (Tacazze) এবং শঙ্খাঙ্গ (March) এই নদী তিনটি বহির্গত হইয়াছে। আবার ভারতবর্ষের উত্তরাংশস্থিত পর্ব্বত বিশেষের নামও নিষধ। এই নামের সাদৃশ্য কোথা হইতে হইল আমরা এই স্থলে তৎসম্বন্ধে একটুকু আলোচনা করিতেছি। হিন্দুগণের বিশ্বাস যে বিষুব রেখার উত্তরদকবর্ত্তী প্রদেশে যেমন এক মেরু আছে, তেমনই উক্ত রেখার দক্ষিণদিকবর্ত্তী প্রদেশেও এক মেরু আছে। আর কেবল মেরুর অস্তিত্ব বলিয়া নয়, আরও অনেক

বিষয়েই বিষুবরেখার উভয় দিগ্বর্ত্তী প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। উত্তরদিগ্বর্ত্তী প্রদেশে গঙ্গা একটি প্রধান নদী আর দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী নীলা একটি প্রধান নদী। গঙ্গা নদী সমতল ভূমিতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে যথাক্রমে তিনটি পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। এই তিনটি পর্ব্বতশ্রেণীর নাম হিমালয়, নিষধ ও হেমকুট। তেমনই আবার নীলা নদী ও পর্য্যায়ক্রমে তিনটি পর্ব্বতমালার মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এতদবস্থায় শেষোক্ত শৈলমালাত্রয়ের ও যথাক্রমে হিমালয়, নিষধ ও হেমকুট নাম হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। এই জন্যই আবিসিনিয়া দেশস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর নাম নিষধ পর্ব্বত। অতঃপর আফ্রিকার পর্ব্বত বিশেষের নাম যে হিমালয় ছিল তাহার অনুকূলেও যথেষ্ট যুক্তি পাওয়া যায়। আফ্রিকা মহাদেশে বরফাবৃত শিখরযুক্ত একটী পর্ব্বত শ্রেণী অর্থাৎ হিমালয় আছে এই বিশ্বাস কেবল যে হিন্দুগণেরই ছিল তাহা নহে। প্রাচীন মিশরদেশবাসী, গ্রীক ও রোমানগণের ও এই বিশ্বাসই ছিল। আধুনিক পরিব্রাজকগণও বলেন যে আফ্রিকার স্থানে স্থানে বরফ পতিত হয়। তবে এই দক্ষিণ মেরুপ্রদেশস্থিত পর্ব্বতের হিমালয় নামটি ততটা প্রচলিত নহে। উহার সাধারণ নাম শীতান্ত অর্থাৎ শীতের অন্ত বা শেষসীমা। উত্তর হিমালয়ে দেবগণের বাসভূমি। সুমেরুপর্ব্বতের নিকটে দেবগণের প্রিয় মানসসরোবর অবস্থিত। দেবগণ কখনও বা স্বচ্ছন্দে কুঞ্জবনে উপবেশন করিয়া কাল বর্জ্জন করেন আবার কখনও বা বিমানে বা স্বর্গীয় যানে আরোহণ করিয়া শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। দক্ষিণ হিমালয়েও এতদনুরূপ সকলই বিদ্যমান আছে। মানসসরোবরের ন্যায় সেখানেও দেবসরোবর নামে একটি সরোবর আছে। উত্তর হিমালয়ের মানসসরোবরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটুকু সন্দেহ উপস্থিত হইলেও হইতে পারে। কারণ সাধারণতঃ যে হ্রদটি মানসসরোবর নামে অভিহিত সেটি পুরাণবর্ণিত বিন্ধ্যসর বই আর কিছুই নহে, তবে তিব্বত ও বুখারার মাল ভূমি এতদুভয় প্রদেশের মধ্যস্থিত স্থানে একটি সরোবর আছে বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। এইটিই পুরাণ বর্ণিত মানসসরোবর। দক্ষিণ হিমালয়স্থিত দেবসরোবর নামক হ্রদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এরূপ কোনও সন্দেহের কারণ নাই। উত্তর হিমালয়ান্তর্গত সুমেরুর ন্যায় দক্ষিণ হিমালয়েও দেবসরোবরের দক্ষিণে এক মেরু আছে। সেখানেও দেবগণ শূন্যমার্গে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কারণ পুরাণে উল্লেখ আছে নীলনদীর উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে অনেক মনোরম কুঞ্জবন আছে। সেই সমুদয় কুঞ্জবন দেবগণের ক্রীড়াস্থলী। তাঁহারা বিমানে চড়িয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়াও থাকেন। গ্রীক ভাষায় দক্ষিণ-মেরু বাচক একটি শব্দও স্বর্গীয় যান বা বিমানের নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্লিনি য়াগাথেমেরাস্ (Agathemerus), (১) টলেমী প্রভৃতি প্রাচীন ভৌগলিকগণ দক্ষিণ মেরুর অবস্থিতি স্থল এবং চতুঃসীমা নির্দ্ধারণ ও করিয়াছেন।

হাস্যশীল জাতি।

পুরাণে এই জাতির উল্লেখ বিরল বটে কিন্তু তাই বলিয়া দুষ্প্রাপ্য নহে। ইহাদিগের উদ্ভব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। একদা রাজা সত্যব্রতের মদিরাসেবনে উন্মত্ততা ঘটিলে তাঁহার পুত্র চর্ম্ম তদ্দর্শনে হাস্য সংবরণ করিতে পারিয়াছিলেন না। তদবধি তাঁহার হাস্যশীল নামক আখ্যা হইয়া পড়ে এবং তাঁহার বংশধরগণও উক্ত আখ্যায় অভিহিত হন। কথ্য ভাষায় হাস্যশীল শব্দটিই সংক্ষিপ্ত হইয়া হাস্য এবং একটুকু উচ্চারণ বিকৃতি হেতু হাংসেলিশ্ আকার ধারণ করে। আরব্য ভাষায় ইহাদিগের নাম হাবাশিস্ (Habashis)। এই হাবাশিস্ শব্দটিও সংস্কৃত হাস্য শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

(১) খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত জনৈক লেখক। ইনি গ্রীক ভাষায় একখানা ভূগোল (A Compendium of Geography) প্রণয়ন করিয়াছেন।

হিন্দুগণের বিশ্বাস চর্ম্মের বংশসম্ভূত হাস্যশীল জাতিই আফ্রিকার কাফ্রি জাতি, আর ইহারাই আবিসিনিয়ার আদিম নিবাসী। আবিসিনিয়া দেশের কিয়দংশ কুশদ্বীপে আর অবশিষ্টাংশ নিজ শঙ্খদ্বীপে অবস্থিত। Pocock সাহেব নীলনদীর জলপ্রপাতের সন্নিহিত স্থলে শুনিতে পাইয়াছিলেন উক্ত প্রদেশের পশ্চাতে বহিষ্কুশদ্বীপে সাতটি পর্ব্বত আছে। হিন্দুগণের নিকটে সাত এই সংখ্যাটি বড়ই প্রিয় তাই তাঁহারা ভূমণ্ডলকে সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করিয়াছেন। আবার এক একটি দ্বীপে সাতসাতটি প্রধান প্রদেশ, পর্ব্বত ও নদী আছে বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বহিষ্কুশ দ্বীপের অন্তর্গত প্রদেশাদির নাম লিখিত হইল।

প্রদেশ	পর্ব্বত	নদী
আপ্যায়ন	পুষ্পবর্ষ	নন্দা
পারিভদ্র	কুমুদাদ্রি	রঞ্জনী
দেববর্ষ	কুন্দাদ্রি	কুহ
বমণক	বামদেব	সরস্বতী
সুমনস	শতশৃঙ্গ	সিনিবালি
সুরোচন	সরম	অনুমতি
অভিজ্ঞাত	সহস্রশ্রুতি	রাকা

বর্ব্বর দেশ।

বহিষ্কুশ দ্বীপ ও নিজ শঙ্খদ্বীপ এতদুভয়ের মধ্যে নীল নদীর তীরে বর্ব্বর দেশ অবস্থিত। অতএব সায়েন (Syene) হইতে আরম্ভ করিয়া নীলনদীর সহিত ক্ষুদ্রতর কৃষ্ণার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগই উক্ত দেশভুক্ত। আজ পর্য্যন্তও ঐ দেশ বার্বারা (Barbara) এবং বার্বার (Barbar) নামে কথিত হইয়া থাকে। পুরাণকারগণ আর একটি ব্যাপক অর্থেও বর্ব্বর শব্দ প্রয়োগ করিতেন। সেই অর্থে এই শব্দটি আফ্রিকার অন্তর্গত উত্তপ্ত বালুকাময় সমগ্র ভূখণ্ডকেই বুঝাইত। প্লিনি উল্লেখ করিয়াছেন নীলনদীর তীরে একটি অনুর্ব্বর ও উত্তপ্ত স্থান ছিল (Loca arida et ardentia)। বর্ণনা সাম্যে প্রতীয়মান হইতেছে যে ইহাই হিন্দুপুরানোক্ত বর্ব্বর দেশ। হিন্দুগণ বলেন এককালে বর্ব্বর দেশ অতি উর্ব্বর ও মনোরম ছিল. পরে সূর্য্য উক্ত প্রদেশের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে এবং শনির প্রকোপ বশতঃ উহা অনুর্ব্বর ও উত্তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই দেশের প্রধান নগরের নাম ছিল বর্ব্বর স্থান, এই নগর নীলনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই নগরে বর্ব্বরেশ্বর দেবের একটা বিখ্যাত মন্দির ছিল। তমোবংশগণ বর্ব্বরস্থানে বাস করিতেন। প্লিনি বলেন নীলনদীর পূর্ব্বতীরে Syene হইতে ১২৯ মাইল দূরে তমঃ নামে একটি নগর ছিল। সম্ভবতঃ এই তমঃই বর্ব্বর দেশের প্রধান নগর বর্ব্বরস্থান। তমস্ শব্দের অর্থ অন্ধকার। শনির প্রতিও তমঃ এই নামটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, আর শনির বংশধরগণই বর্ব্বর দেশে বাস করিতেন বলিয়া সাধারণের অনুমান। ইহারা অর্দ্ধ অনাবৃত দেহে ও অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় থাকিত বলিয়া বর্ণিত আছে। বর্ব্বর দেশের বর্ত্তমান অধিবাসিগণের সহিতও এই বর্ণনার অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা নিম্নে একটি উপকথার উল্লেখ করিতেছি। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্গত হইলেও এই স্থলে ইহার অবতারণা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

তমঃ এর দুই স্ত্রী। একের নাম স্থবিরা এবং অপরের নাম জড়তা। প্রথমোক্ত স্ত্রীর গর্ভে উহার সাতটি পুত্র জন্মে; উহাদিগের নাম যথাক্রমে মৃত্যু, কাল, দাব, উল্কা, ঘোর, অধম ও কণ্টক। আর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে মান্দ্য ও গুলিক নামে দুই পুত্র জন্মে। মান্দ্যের পুত্রগণের নাম অশুভ, অরিষ্ঠ, গুল্ম ও প্লীহা। গাধ ও গ্রহিল ইহারা গুলিকের পুত্র। এই সমুদয় নামের শব্দগত অর্থ যেমন বিভীষিকা জনক তেমনই এই সমুদয় ব্যক্তিও বড়ই জঘন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। পুরাণে উল্লেখ আছে সত্যব্রতের পৌত্র অরমের যখন মৃত্যু হয় ঠিক সেই সময়েই তমঃ মিশর দেশ হইতে বিতাড়িত হন এবং তাহারই সন্তানগণ যাইয়া বর্ব্বর দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কপিনাশ যখন এই দেশ লুণ্ঠন করেন তখন তমঃএর পৌত্র গুল্ম এই দেশের রাজা

ছিলেন। এই দেশের বর্ত্তমান নাম নিউবিয়া। ভারতীয় ভৌগোলিকগণের মতে ইহা বহিষ্কুশ দ্বীপ এবং শঙ্খদ্বীপ এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এই দেশের অন্তঃপাতী নীলনদীর মোহানার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে রাহুর সন্তানগণ বাস করিতেন। এই সম্পর্কে আমাদিগকে আর একটি জ্যোতিষী উপকথার অবতারণা করিতে হইল। এই উপাখ্যানটি চিন্তামণি নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

রাহু কোনও কোনও স্থলে একটি ভীষণ জলচর সর্পরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, আবার কখনও গ্রাহ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

রাহু, গ্রাহ ও গ্রীক।

গ্রাহ শব্দের সাধারণ অর্থ হাঙ্গর আবার কখন কখনও ইহা কুম্ভীরের একটি প্রতিশব্দ। তবে গ্রাহের বর্ণনা পাঠে মনে হয়, উহা প্রকৃত পক্ষে জন্তুবিশেষের নাম নহে, কবিকল্পনাসম্ভূত ভীষণ জন্তুবিশেষের নাম মাত্র। রাহুর ছয় পুত্র যথা ধ্বজ, ধূম্র, সিংহ, লগুড়, দণ্ড ও কর্ত্তন। ইহার প্রত্যেক নামই এক একটি ধূমকেতুকে বুঝাইতেছে। উপকথায় উল্লেখ আছে রাহুর মস্তক বিষ্ণু চ্ছেদন করিয়াছিলেন। তাহার দেহের অধোভাগ কেতু অর্থাৎ ড্রেগণের পুচ্ছরূপে পরিণত হয় আর উর্দ্ধ ভাগের নাম রাহুই থাকে। প্রবাদ আছে যে, রাহু (অর্থাৎ রাহুর দেহের উর্দ্ধ ভাগ) যখন ভূমিতে পতিত হয়, তখন পিথিনাশ উহা গ্রহণ করিয়া উহাকে রাহু স্থান নামক স্থলে স্থাপিত করেন। তদবধি উক্ত স্থানে রাহুর উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়, রাহু অনেক ভবিষ্যদ্বাণী বলিতেন। ভোজবাজি বলে যেমন কাটামুণ্ডে কথা বলে তেমনই ইহুদি লেখকগণের গ্রন্থেও কাটামুণ্ডে কথা বলিবার আখ্যান পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত রাহুর বৃত্তান্ত হইতেই ইহুদি লেখকগণ ইহার আভাস পাইয়াছিলেন। এই উপকথার অন্তরালে আমরা নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক সত্যের আভাস পাই। রাহু একজন প্রজাপীড়ক নৃপতি ছিলেন। তাই তিনি ভীষণ হিংস্রজন্তু রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণও তাঁহারই ন্যায় লোকের অহিত সাধনেই রত ছিলেন। ইহাদিগের নাম হইতেই এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। রাহু পিথিনাশের অধ্যুষিত দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের নামানুসারে রাহুস্থান নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাহুর নিজের নাম গ্রাহ ছিল এবং তদনুসারে তাঁহার বংশধরগণও গ্রাহ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই গ্রাহগণ গ্রীকদিগের আদিপুরুষ। কারণ মিশর দেশ হইতেই সর্ব্ব প্রথমে গ্রৈ (Graii) অথবা গ্রীক (Greek) জাত গ্রীস্ দেশে যাইয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার হিসিয়ড্ (Hesiod) তাঁহার Theagony নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আফ্রিকা দেশে গ্রাইয়া (Graia) নামে এক জাতীয় রমণীর বাস ছিল তাহাদের গায়ের রং অতি সুন্দর ছিল, তাহারা Phorey এবং কেতু (Ceto) হইতে উদ্ভূত। তবে কথা এই গ্রীকগণ গ্রাইয়া (Graia) নামে অভিহিত হইতে ভালবাসিতেন না। হিন্দু পুরাণে রাহুর যেরূপ বীভৎস চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাও হয় ত গ্রাহকে পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হইবার একটা কারণ হইতে পারে। আর রাহু যতদূর ঘৃণনীয় ভাবে চিত্রিত হইয়াছেন প্রকৃত পক্ষে তাঁহার চরিত্র ততদূর কালিমাপূর্ণ ছিল কি না এতদ্বিষয়েও সন্দেহ করা যাইতে পারে কারণ রাহুরও পূজা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। জেরম্ (Jerom) বলিয়াছেন, মিশর দেশের পূর্ব্বাংশে এবং আরব দেশে রাহুর উপাসনা হইত। কোথাও কোথাও বা রাহু হয়লাল্ (Hailal) বা লুসিফার (Lucifer) রূপে পূজিত হইয়াছেন। অতি ঘৃণনীয় চরিত্র হইলে কে কখন পূজা পাইয়া থাকে? অন্ততঃ তাঁহার উপাসকগণের চক্ষে তিনি নিতান্ত কলুষিত-চরিত্র ছিলেন না এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

Barbaros—বর্ব্বর।

পুরাণকারগণের মতে নীল নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরবর্ত্তী বালুকাময় মরুভূমি বর্ব্বর (Barbaros) দেশের অন্তর্গত। Herodotus বলেন, মিশর দেশবাসিগণের ভাষায় যাহারা কথা বলিতে পারিতেন

না, তাহাদিগকেই তাহারা বার্বারস্ (Barbaros) নাম দিয়াছিলেন। মরুভূমির অধিবাসিগণই কেবল তাহাদের প্রতিবেশী ছিল কাজেই Barbaros নামে তাঁহারা মরুভূমির অধিবাসিগণকেই বুঝিতেন। শনির বংশধরগণই বর্ব্বর দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তাঁহারা লোক চক্ষে নিষ্ঠুর ও প্রতারক জাতি বলিয়া গণ্য হইতেন। তাই কালক্রমে উক্ত শব্দটিও উক্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির বাচক হইয়া পড়িল। গ্রীকগণ মিশর দেশ হইতে নূতন উপনিবেশে আসিবার সময় এই শব্দটিও সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তবে কাল ও স্থান পরিবর্ত্তনে শব্দটির অনেকটা অর্থ বিকৃতি ঘটিয়াছিল।

পুরাণে উল্লেখ আছে বর্ব্বর দেশে, নীল নদীর তটে কৃষ্ণগিরি নামক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে।

কৃষ্ণগিরি।

আবার ব্রুস্ সাহেব তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি নীল নদীর তীরে কৃষ্ণবর্ণ ও বৃক্ষলতাবিহীন এক পর্ব্বত শ্রেণী দেখিতে পাইয়াছিলেন, এই পর্ব্বত শ্রেণীই কৃষ্ণগিরি। এই পর্ব্বতের গুহাতেই তমোবৎস জাতি বাস করিতেন।

নীলনদী উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ বর্ব্বর দেশ অতিক্রম করিয়া নিজ শঙ্খদ্বীপে প্রবেশ করিয়াছে এবং

হেমকূট।

তৎপর হেমকূট (সুবর্ণ পর্ব্বত) ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। আরবগণ ওলাকি (Ollaki) নামক এক পর্ব্বতশ্রেণীর কথা বলিয়াছেন। গ্রীকগণ পাঙ্কিসস্ (Panchrysos) নামক যে পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছেন উহা ওনাকি পর্ব্বত মালারই অংশ বিশেষ। সম্ভবতঃ এই পাঙ্কিসসই পুরাণোক্ত হেমকূট। টলেমীও সুবর্ণ পর্ব্বত অর্থাৎ হেমকূটের উল্লেখ করিয়াছেন। নীলনদী উক্ত পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিবার পর কর্দ্দম স্থানে প্রবেশ করিয়াছে। কর্দ্দমস্থান শব্দে মিশরদেশীয়

কর্দ্দম স্থান।

উর্ব্বর উপত্যকা প্রদেশই সূচিত হইতেছে। বর্ষে বর্ষে জলপ্লাবনে ক্রমশঃ কর্দ্দম সঞ্চিত হইয়া বহুকালপরে এই উপত্যকা প্রদেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। পুরাণে কর্দ্দমস্থানের বর্ণনা অতি ভয়ঙ্কর। কোনও জীবজন্তু নাকি এখানে আসিতে সাহস পাইতনা। এই প্রবাদের অন্তরালে বোধহয় একটি সত্য বিদ্যমান আছে। সমুদ্রগর্ভ হইতে এই ভূভাগ যখন প্রথম উত্থিত হইল তখন এই স্থল সর্প, কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্রজন্তুসঙ্কুল ছিল। সুতরাং সে কালে এখানে মানুষ আসিতে সাহস করিত না। পরে কালক্রমে এখানে মনুষ্যের বসতি হইতে থাকে এবং এই স্থান শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উঠে।

মিশ্রস্থান—গুপ্তস্থান।

আমরা যে কর্দ্দমস্থানের উল্লেখ করিলাম উহা মিশ্রস্থানের অন্তর্গত বলিয়া পুরাণে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। মিশ্রস্থানের শব্দগত অর্থ এই যে, যে স্থলে বিভিন্ন জাতীয় লোক মিশ্রিত অর্থাৎ মিলিত হইয়া বাস করে। এই শব্দটি কখনও নিম্ন-মিশর দেশ বাচক আবার কখনও বা সমুদয় মিশর দেশ বোধক। কোনও কোনও প্রাচীন গ্রন্থে সমগ্র মিশর দেশ বুঝাইবার জন্য গুপ্তস্থান শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। চতুর্দ্দিকে সুরক্ষিত ইহাই আগুপ্ত শব্দের অর্থ। আর সুপবিত্র তীর্থ স্থলের প্রতিও গুপ্ত, এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পুরাকালের ভৌগোলিকগণ যে স্থানটিকে কপ্টস্ (Coptos) নাম দিয়াছেন খুব সম্ভবতঃ উহাই গুপ্তস্থান। উচ্চারণ গত সাদৃশ্য ব্যতীত এই অনুমানের আর একটি কারণ এই যে প্রাচীন ভৌগোলিকগণ Coptos বা মিশর দেশ যেমন তিনটি অংশে বিভক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তেমনই পুরাণকারগণ গুপ্তস্থান তিন খণ্ডে বিভক্ত বলিয়া লিখিয়াছেন। এই খণ্ডত্রয়ের

তপোবন, মিশ্রদেশ অরণ্য, অটবী।

প্রথমটির নাম তপোবন, ইহার শব্দগত অর্থ কঠোর তপস্যা সাধনের উপযুক্ত স্থান ইহাই সম্ভবতঃ উচ্চ-মিশর বা থিব (Thebais)। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম নিম্ন মিশর দেশ উহারই অপর নাম কপ্টক-দেশ। উহাই নিম্ন-মিশর বা হেপ্টানমিস্ (Heptanmis)। আর তৃতীয় খণ্ডের নাম অরণ্য ও অটবী। নীলনদীর মোহানার চতুষ্পার্শ্বে একটি নিবিড় অরণ্য ছিল।

উক্ত প্রদেশই নীলনদীর ব-দ্বীপ। তৃতীয় খণ্ড দ্বারা এই প্রদেশই সূচিত হইতেছে। মিশরদেশের আদিম অধিবাসিগণই এই দেশে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল নীলনদীর মোহানার চতুর্দ্দিকে একটি বিশাল বন। এই বনের কতকাংশ তাহাদের নিকট নিবিড়তম ও দুর্ভেদ্য বলিয়া বোধ হইল তাই এই অংশের নাম রাখা হইল অটবী। অবশিষ্টাংশ জনমানবহীন হইলেও তাহাদের নিকট একবারে দুর্ভেদ্য বলিয়া বোধ হইল না। তাই সেই অংশের নাম রাখা হইল অরণ্য। অতি প্রাচীনকাল হইতেই তপোবন নামক স্থানটি ধর্ম্মচর্চ্চার সবিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আদি খ্রীষ্টিয়ান্ সন্ন্যাসিগণও ভগবদুপাসনার অভিপ্রায়ে Thebes এর অরণ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। দৃষ্টান্তচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে আবট প্যাকোমিয়াস্ (Abbot Panchomius) শিষ্যবৃন্দ সহকারে ট্যাবেনা (Tabenna) র অরণ্যে আসিয়া এক আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উক্ত আশ্রমের ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান আছে। আজকাল ট্যাবেনা নামে অভিহিত একটি দ্বীপের নিকটে উক্ত ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। আবার সিকার্ড (Sicard) বলিয়াছেন যে এককালে যে স্থলে থিব নগর বর্ত্তমান ছিল পূর্ব্বোক্ত ভগ্নাবশেষ উহারই নিকট অবস্থিত। তপোবনই যে Thebes তাহা এক প্রকার নিঃসন্দেহ। কারণ পুরাণকারগণ তপোবনের অন্তর্গত বলিয়া যে সমুদয় স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশের অবস্থিতিস্থল থিবে থিবেইয়াস্ (Thebaius) এবং থিবেনাইট্স্ (Thebinites) এই উভয় শব্দই Thebai শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু শেষোক্ত শব্দটি তপোবন বা ট্যাবেনা (Tabenna) শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সকল ভাষারই একটা স্বভাব এই যে বিদেশী কোনও শব্দ গ্রহণ করিলে তাহাকে কতকটা পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজের মতন করিয়া গড়িয়া লয়। এই তপোবন শব্দটির ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। আরবগণ ট্যাবেনা শব্দটিকে মেডিনাট্যাবিনা (Medinatabina) আবার তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত শব্দটিকে মেডিনাট ট্যাবু (Medinataba) রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। বোধ হয় ট্যাবু (tabu) শব্দ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তপো শব্দ হইতেই আসিয়াছে। তপোবন প্রদেশের অন্তর্গত সর্ব্বপ্রধান স্থানের নাম কর্দ্দমস্থলী। পুরাণে উল্লেখ আছে, কর্দ্দমস্থলী একটি সুপ্রসিদ্ধ দেবমন্দির। ইহার সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যান এই যে—গুপ্তেশ্বর ও তৎপত্নী গুপ্তস্থান অর্থাৎ কপ্টস্ (Coptos) এর নিকটে, নীল নদীর কর্দ্দমের নিম্নে বহুকাল লুক্কায়িত ছিলেন। অবশেষে উভয়ে কর্দ্দমাক্ত গাত্রে কর্দ্দমস্থলীতে আবির্ভূত হন। এই জন্যই ইহাঁরা কর্দ্দমেশ্বর ও কর্দ্দমেশ্বরী আখ্যা লাভ করেন। Aiguptos শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে গুপ্ত শব্দের রক্ষিত এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। গুপ্ত শব্দের আর একটি অর্থ লুক্কায়িত। এই পৌরাণিক আখ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যে গুপ্ত শব্দটি লুক্কায়িত এই অর্থে গ্রহণ করিয়াও Aiguptos শব্দের একটি সুসঙ্গত অর্থ হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় দন্ত্যবর্ণ সাধারণতঃ উচ্চারণ করিতে সময় সময় অসম্পূর্ণ ভাবে উচ্চারিত হয়, তাই কর্দ্দম শব্দই কদম্রূপে উচ্চারিত হওয়া খুব সম্ভব। আর এই কদম্ শব্দ হইতেই গ্রীসীয় পৌরাণিক দেবতা ক্যাড্মাসের Cadmus) নামের উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দু ও গ্রীসীয় পৌরাণিক আখ্যানের সাদৃশ্য বর্ণনা কালে 'আমরা' এই ব্যুৎপত্তির সত্যতা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব।

মিশ্রস্থান।

হিন্দুশাস্ত্রে এই দেশ মিশ্র এবং মিশ্রেণ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই নামের অর্থ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে এই দেশ বিমিশ্র জাতির বাসস্থান ছিল—বিভিন্ন জাতীয় লোক পরস্পরের সুবিধার জন্য একত্র বাস করিত বটে, কিন্তু তাহারা যত্ন সহকারে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিত। নিজ নিজ প্রদেশের চতুঃসীমানা লইয়া এবং অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্মমত লইয়া ইহারা পরস্পর বিবাদ করিত।

ইহাদের বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত স্বয়ং ব্রহ্মা ঈশ্বররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই ব্রহ্মার মিশ্রেশ্বর আখ্যা হয়। এদিকে বাইবেলেও একটি বিমিশ্র জাতির (Mingled people) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই সম্ভবতঃ হিন্দু পুরাণোক্ত বিমিশ্র জাতিই বাইবেলের Mingled people। আরবগণ মিশর দেশ ও তাহার রাজধানীকে মিস্‌র্ (Misr) নাম দিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে তাঁহারাও সংস্কৃত মিশ্র শব্দটিই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে কেন মিশ্র এই নামটি এই দেশের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা যে কোনও বৃহৎ নগরকেই উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। আরবগণের ভাষায় মিস্‌র্ (Misr) শব্দের দ্বিবচনের পদ আল্‌মিশ্রান্ (Almisran) তজ্জন্য তাহারা কুশা ও বাস্রা নগরীদ্বয়কে আল্‌মিশ্রান্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। হিব্রু ভাষায় মিস্‌র্ শব্দের বহুবচনের পদ মিস্রিম্ (Misrim) তাই বাইবেলে মিস্রিম্ শব্দ মিশর দেশের অধিবাসিগণকে বুঝায়। মেজর (Mazor) বা মাসুর (Masur) শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বাইবেলের অনুবাদকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে বটে। কিন্তু বিশপ লোয়েথ্ (Bishop Loweth) কতিপয় ব্যাখ্যাকারের মতানুসরণ করিয়া উক্ত শব্দের অর্থ মিশর দেশই করিয়াছেন। ষ্টিফেনাস্ বলেন ফিনিসিয়ান্‌গণের ভাষায় নাকি এই দেশের নাম মাইয়ারা (Myara)। কিন্তু নিশ্চয়ই Stephanus এই স্থলে মাইসারা (Mysara) স্থলে মাইয়ারা বলিয়া ফেলিয়াছেন। সুইদাস্ (Suidas) এবং ইসুবিয়াসের (Eusebius) মতে এই দেশের নাম ছিল মেষ্ট্রেইয়া (Mestraia) কিন্তু সম্ভবতঃ এই শব্দটী মেষ্ট্রেইয়া না হইয়া মেস্রেইয়া (Mesraia) হইবে আর এই মেশ্রেইয়া শব্দ মিশ্রের শব্দেরই অপভ্রংশ এবং মিশ্রেয় শব্দটিও মিশ্র হইতেই উদ্ভূত। সুতরাং মনে হয় ফিনিসিয়ানগণ এই দেশের হিন্দু পুরাণোক্ত নাম অর্থাৎ মিশ্র শব্দই গ্রহণ করিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি মিশ্রদেশের অপর নাম কণ্টক দেশ। এই স্থানে কণ্টকময় বৃক্ষ বহু পরিমাণে বিদ্যমান ছিল সেই জন্যই এই নামকরণ হইয়াছিল। ইংরাজী য়্যাকেস্থাস্ (Acanthus) শব্দটির সহিত কণ্টকদেশ এই নামটীর উচ্চারণগত ও অর্থগত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

মিসর দেশ এককালে সমুদ্র গর্ভে ছিল।

মিশর দেশীয় পুরোহিতগণের ধারণা এই এবং মিশর দেশে অবস্থান কালে হিরোডোটাসেরও এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, এককালে নীলনদীর জলপ্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত মিশর দেশীয় সমগ্র ভূভাগ সমুদ্র গর্ভস্থ ছিল। এই ধারণাটি সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, এতদনুরূপ একটি ধারণা পুরাণেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জলময় প্রদেশ পরে কিরূপে স্থলে পরিণত হইল? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে বসিয়া অন্য জাতির ন্যায়, হিন্দুগণও আখ্যায়িকাচ্ছলে আপনাদিগের চিত্তবৃত্তির অনুরূপ একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বর প্রকাশ নামক গ্রন্থ হইতে আমরা সেই আখ্যানটির সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। একদা নিজ শঙ্খদ্বীপে প্রমোদ নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। শঙ্খোদধির তীরে তাঁহার বাসস্থান ছিল। সেই দেশ তৎকালে কেবল ম্লেচ্ছ ও অসভ্য রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ ছিল। বেদজ্ঞ ও ধর্ম্মোপদেশদানক্ষম একটি ব্রাহ্মণও তথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। তজ্জন্য ধর্ম্মপ্রাণ রাজা মনে মনে বড়ই দুঃখিত থাকিতেন। অবশেষে তিনি শুনিতে পাইলেন—বর্ব্বর দেশে পিথি, পিথিনাশ বা পিথিঋষি নামক একজন ঋষি বাস করেন। ধর্ম্মপরায়ণতা ও ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিখ্যাত। ইহা শুনিয়া রাজা স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বহু অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে শঙ্খদ্বীপে লইয়া আসিলেন। পিথিনাশ এই দেশে আগমন করিয়া এতদ্দেশবাসিগণের চরিত্র সংশোধন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইতেছে দেখিয়া তিনি বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়া এক-

দিন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে কুশোদক হস্তে লইয়া সমুদ্রতীরে যাইয়া যেই তিনি শঙ্খোদধিকে অভিশাপ প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন অমনি সমুদ্রদেব তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কি অপরাধে অপরাধী?" ঋষি উত্তর করিলেন, "রাজা আমাকে যে দেশে আনিয়াছেন ইহা অতি অপবিত্র দেশ। আমি এখানে থাকিতে পারি না। তুমি এই দেশ বিধৌত করিয়া চলিয়াছ। ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে আমাকে একটি পবিত্র স্থান দেও যেন আমি তথায় অবস্থান করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারি।" তন্মুহূর্ত্তেই শঙ্খসাগর শত যোজন দূরে সরিয়া গেল এবং ঋষি সমুদ্র পরিত্যক্ত সমগ্র ভূভাগের অধিকারী হইলেন। রাজা এই আশ্চর্য্যজনক সংবাদ শ্রবণে আনন্দে অধীর হইলেন এবং এই নবাধিকৃত স্থানের উপর এক সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহার নাম হইল পিথিস্থান এবং পিথিঋষি রাজা প্রমোদের শত কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বেদান্ত প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার অনেক শিষ্য জুটিল।

পিথিস্থান কোথায়?

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লিখিত আছে পিথিঋষির কন্যা পৈথিনী প্রায় প্রতিদিনই কর্দ্দমেশ্বর মহাদেবের পূজা করিতে যাইতেন। এই কর্দ্দমেশ্বরের মন্দির কর্দ্দমস্থলী অর্থাৎ থিব নগরে অবস্থিত ছিল। অতএব পিথিস্থান কর্দ্দমস্থলী বা থিব নগর হইতে অধিক দূরে অবস্থিত ছিল না। বাইবেলে পাথ্‌রস্ (Pathros) নামক একটি নগরের উল্লেখ আছে। গ্রীক ব্যাখ্যাকারগণ উক্ত নগরকে Pathures নাম দিয়াছেন এবং প্লিনি উহাকেই Pathuris বলিয়াছেন; আর প্লিনির লেখা হইতেও প্রতীয়মান হয় যে এই নগর থিব নগর হইতে অধিক দূরে অবস্থিত ছিল না। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই নগরই পুরাণোক্ত পিথিস্থান। এই নগর যে উচ্চ মিশর প্রদেশে অবস্থিত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। টলেমী যে স্থানকে ট্যাথিরিস্ (Tathyris) বলিয়াছেন উহাও সম্ভবতঃ এই স্থান। হয় ত ভুলক্রমে টলেমী প, এর স্থলে ট, করিয়াছিলেন অথবা এমন হইতে পারে যে, ইথিওপিয়ানগণ প, উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া তাহার স্থলে ট, উচ্চারণ করিয়া থাকে, এই জন্য টলেমী এই নিয়মেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। এরমেন্থ (Ermenth) এর নিকট হইতে নীল নদীর একটি শাখা বাহির হইয়া মেম্‌নোনিয়ামের (Memnonium) নিকটে আবার মূল নদীর সহিত মিশিয়াছে। ইহাতে একটি বৃহদাকার দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার টলেমীর লেখা হইতে বুঝা যায়, পিথিস্থান নগরটি থিব নগরের পশ্চিমে এবং উক্ত নগর হইতে অনধিক ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। সুতরাং উক্ত নগর পূর্ব্বোক্ত দ্বীপেই অবস্থিত হইয়া থাকিবে।

প্রাচীন মিশর দেশবাসিগণের বিশ্বাস এই যে, নীল নদীর জলপ্রপাত স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মেম্ফিস্ (Memphis) নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উচ্চ মিশর প্রদেশ এককালে সমুদ্র গর্ভস্থ ছিল। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় উল্লেখ আছে সমুদ্র শত যোজন সরিয়া গিয়াছিল। উক্ত স্থানদ্বয়ের ব্যবধানও প্রায় শত যোজনই বটে। সমুদ্র দেব তাঁহার

নভঃস্থান ও Memphis.

পরিত্যক্ত স্থল পুনরধিকার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু মহাদেব নভেশ্বর রূপে অবতীর্ণ হইয়া উক্ত আক্রমণের প্রয়াস ব্যর্থ করিয়াছিলেন। ইহাই নভঃস্থান অর্থাৎ মেম্ফিজের উৎপত্তি বৃত্তান্ত। মিশ্র স্থানে যে সমুদয় প্রধান প্রধান স্থান ছিল এককালে নভঃস্থান তাহাদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। সম্ভবতঃ নভঃস্থান নিম্নলিখিত প্রদেশ সমূহে বিভক্ত ছিল। যথা—

(১) উগ্রস্থান—গ্রীকগণের উকোরিয়াস (Uchareus) ই সংস্কৃত উগ্র। এই শব্দ হইতেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। (২) নভঃ ইহাই বাইবেলে উল্লিখিত নফ্ (Noph) (৩) মিশ্র। (৪) মোহনস্থানই হয় ত বর্ত্তমান Mohaunan (৫) লয়স্থান

বা লয়বতী। সাধারণে এই শব্দটি লয়াতি বলিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকে, এই স্থানই বোধ হয় Lete অর্থাৎ Letepolis এর সীমান্ত প্রদেশে স্থিত।

মিশ্রস্থানে একটি হ্রদ আছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ উহাকে (Maeris) মারিস নামে অভিহিত করিয়াছেন। আর হিন্দু পুরাণেও অশ্রুমতী নামে একটি হ্রদের উল্লেখ আছে। আমরা এ স্থলে বিশ্বেশ্বর প্রকাশ নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা আছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। পেতি-

Maeris, অশ্রুমতী ও রোদন স্থান।

শুক স্বীয় দেহ হইতে আত্মা পৃথক্ করিতে পারিতেন। তিনি একদা পৃথিবীতে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আরোহণ করেন। তাঁহার পত্নী মারিসা তাঁহাকে পরলোকগত মনে করিয়া অরণ্যে গমন পূর্ব্বক একটা পাহাড়ের উপর বসিয়া এত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন যে সেই অশ্রুজলে এক হ্রদের সৃষ্টি হইলে উহার নাম অশ্রুতীর্থ হয়। এই হ্রদের জল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ষ্ট্রাবো, (Strabo) মেরিস্ (Maeris) হ্রদের জলের বর্ণও এইরূপ বলিয়াই লিখিয়াছেন। পেতিশুকের পুত্র মেধি বা মেধশুকও সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাতার নিকট উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারই ন্যায় কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন্। ইঁহারা এত গভীর ও দীর্ঘ কালব্যাপি তপস্যা করিয়াছিলেন যে তজ্জন্য সাধারণ দেবতাগণ আপনাদিগের ক্ষমতা হ্রাসের আশঙ্কা করিতেছিলেন। অবশেষে পতিব্রতা মারিসা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বিষ্ণুলোকে যাইয়া স্বীয় ভর্ত্তার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহাদের পুত্র উভয়ের প্রেতঃকৃত্য সম্পাদন পূর্ব্বক তথায় একটি সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার মাতা যে স্থলে বসিয়া অশ্রু বিমোচন করিয়াছিলেন সেই স্থলে বিষ্ণুর মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। এই জন্যই এই স্থলের নাম রোদন স্থান হয়। এই তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে যাইয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন যাহারা এই হ্রদে স্নান করিবে, তাহারা সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইবে, তাহাদের এই সংসারের মায়ার বন্ধন ঘুচিবে এবং তাহারা মরণান্তে বিষ্ণুলোক লাভ করিতে পারিবে। আর যাহারা রোদন স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেবের উপাসনা করিবে তাহারা স্বর্গ সুখভোগে অধিকারী হইবে এবং তাহাদেরর পুনর্জন্মের যাতনা ভোগ করিতে হইবে না। মেরিস হ্রদ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনও হ্রদেরই অশ্রুতীর্থের সহিত অথবা তদন্তর্গত মেধি বা মেধিস্থান নামক দ্বীপের সহিত, কি নামগত কি অবস্থাগত সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। মেধিশুক উক্ত দ্বীপের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন—তাঁহার নামানুসারে উক্ত দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে। গ্রীকগণ বলেন উক্ত তীর্থস্থিত দুইটি প্রতিমার মধ্যে একটি রাজা মরিসের (Moeris) এবং অপরটি তাঁহার রাণীর। কিন্তু পুরাণ পাঠে জানা যায় উহার একটি বিষ্ণু অর্থাৎ অসিরিসের (Osiris) প্রতিমূর্ত্তি এবং অপরটি মরিসের মাতা—মারিসার প্রতিমূর্ত্তি। তবে এই দেবমূর্ত্তিটি পরলোকগত রাজার মূর্ত্তি বলিয়াও গণ্য করা যাইতে পারে কারণ পরলোক প্রাপ্তির পর রাজা ভগবান্ বিষ্ণুতেই লীন হইয়াছিলেন। পুরাণে নীলনদীর তীরদেশস্থিত তিনটি হ্রদের নামের সহিত অশ্রু শব্দের সম্পর্ক আছে। প্রথমটির নাম শোকাশ্রু ইহা অশ্রুতীর্থেরই নামান্তর—দ্বিতীয়টি হর্ষাশ্রু এবং তৃতীয়টি আনন্দাশ্রু। শেষোক্ত হ্রদদ্বয়ের প্রত্যেকের সহিত এক একটি পৌরাণিক আখ্যান সম্বন্ধ আছে। প্রেতলোকস্থিত নদীগণের মধ্যেও একটির নাম অশ্রুমতী।

ক্রমশঃ।

শ্রীকুঞ্জবিহারী হার।

চাতকের পরিণাম।

১

গ্রীষ্মে দিবা মধ্যভাগে,
সন্তাপিত রবি-রাগে,
ধরাপৃষ্ঠ,—বহে যেন শ্বাস,
বহ্নিজ্বালা খরতর
মিশ্রিত, কি ভয়ঙ্কর!
পশ্চিমের প্রবল বাতাস!
জ্বলন্ত গগন তলে,
ধূ ধূ ধূ কেবলি জ্বলে,
অতি তীব্রতর সৌর কর;
বাহিরে চলে না দৃষ্টি,
বুঝি দগ্ধ হয় সৃষ্টি,
সর্ব্ব জীব আকুল অন্তর!

২

ক্ষুদ্র দেহ যত্নে ঢাকি'
উচ্চ বৃক্ষশাখে থাকি',
ঊর্দ্ধমুখে শুষ্ককণ্ঠে চায়
চাতক "ফটিক জল";
ক্রমে ক্ষীণ কণ্ঠ-বল,
বৃথা এ প্রার্থনা বুঝি হায়!
দিবা শেষে আসে উড়ে,
পশ্চিম আকাশ যুড়ে,
কাল মেঘ, দিক্ আঁধারিয়া;
চাতক যাচিতে জল,
বাড়ায়ে পক্ষের বল,
তা'র দিকে চলিল উড়িয়া।

৩

শুষ্ককণ্ঠ, আশা বুকে,
প্রার্থনার ভাষা মুখে,
চাতক "ফটিক জল" যাচে;
উঠিল তুমুল ঝড়,
বৃক্ষ ভাঙ্গে মড় মড়,
যেন মত্ত দৈত্য রণে নাচে!
তবু নাহি ভয় তা'র,
ঊর্দ্ধমুখে বার বার,
যাচে জল করুণ ভাষায়;
যে বক্ষে বজ্রের ঠাঁই,
সে বক্ষে করুণা নাই,
পূর্ব্বে কেন বোঝেনি সে হায়!

৪

হাসি' উপেক্ষার হাসি,
ছড়ায়ে বিদ্যুৎরাশি,
করকা বরষে জলধর;
দুঃখে আঁখি ছল্ ছল্,
ঘুচিল পক্ষের বল,
বায়ুবেগে চাতক কাতর।
ভিক্ষুকের একি দণ্ড!
বৃহত্তম শিলাখণ্ড,
পড়িল চাতক-বক্ষ প'রে;
চূর্ণ হ'ল ক্ষুদ্র বক্ষ,
ভগ্ন বলহীন পক্ষ,
মূর্চ্ছিত সে ধরাতলে পড়ে!

শ্রীচণ্ডীচরন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেয়েলি শাস্ত্র।

বহুকাল হইতে কতকগুলি বিধি নিষেধ ব্যবস্থা সংসারে গৃহিণীদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, সে গুলিকে আমরা সাধারণতঃ মেয়েলি শাস্ত্র বলিয়া অবহেলা ও উপহাস করি, কিন্তু একটু স্থিরভাবে প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সব সংস্কার বা 'শাস্ত্রের' মূলে স্বাস্থ্য, মিতব্যয়িতা প্রভৃতির সংশ্রব বর্ত্তমান আছে। যে সমস্ত কার্য্য সংসারে অনুষ্ঠিত হইলে অস্বাস্থ্য, অমিতব্যয়, অসংযম প্রভৃতির সমাবেশ হইতে পারে, সেই গুলির উপরই একটা না একটা কঠিন মত বাধা দিবার উদ্দেশ্যে নিষেধ ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে। আবাল্য সেই সব শাসনের অধীন থাকিয়া সংসারের পুত্র কন্যাগণও সেই সব দোষ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। পূর্ব্বকালে গৃহিণীগণের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব থাকায় তাঁহাদের সেই সব নিষেধ বিধি সংসারের সকলেই নির্ব্বিচারে অবনতমস্তকে পালন করিত, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের প্রথমে যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই বর্ব্বরতাসূচক, এই অনিষ্টকর ধারণা নব্য শিক্ষিতগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় প্রাচীনা গৃহিণীগণের এই সব ব্যবস্থা একেবারেই হেয় হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের টোট্‌কা ঔষধ মুষ্টিযোগগুলিও যেমন অনাদরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাঁহাদের ঐ সব শাস্ত্রও সেইরূপেই ক্রমাগত অপ্রতিপালিত হইয়া এখন অচল হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কয়েকটি কারণে আমার এই সব মেয়েলি শাস্ত্রের মূলানুসন্ধানে ঔৎসুক্য জন্মে; তাহার ফলে আমি দেখিতে পাই যে, যদিও ঐ সব বিধি নিষেধের কারণ ও যুক্তি প্রাচীনাদিগের নিকট পাওয়া যায় না, তথাপি তাহাদের কারণ ও যুক্তি নাই তাহা নহে। প্রত্যেক কার্য্যে কারণ ও যুক্তি প্রদর্শন অশিক্ষিত লোকদিগের নিকট ততটা হৃদ্য হয় না, তদপেক্ষা একটা দিব্য দেওয়ার মত ভয় দেখাইয়া দিলে বেশী কাজ হয়; এই জন্যই "লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়" অথবা এইরূপ একটা দিব্য দিয়া এক একটি সূত্র প্রচারিত হইয়াছে। ঐ সব দিব্যের ক্ষমতা রমণীগণের মনে এতই অধিক যে তাঁহারা উহা ধর্ম্ম কার্য্যের অঙ্গীভূত করিয়া সেইরূপ শ্রদ্ধার সহিত উহা পালন করিয়া থাকেন। আমরাও যদি ঐ সব 'সূত্র' মানিয়া চলি তবে তাহাতে আমাদের পাণ্ডিত্যাভিমানের কোন খর্ব্বতা হইবে না, পাপ ভাগীও হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, অথচ তাহাতে সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য একটু বাড়িবে বই কমিবে না। যে উদ্দেশ্যে ঐ সব সূত্র প্রণীত হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য (spirit) লোকে ভুলিয়া গিয়া এখন কেবল বাহ্যাবয়ব (form) লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছে তাহা সত্য, কিন্তু তথাপি তাহাতেও কোন ক্ষতির কারণ নাই।

অদ্য আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করিতেছি। পাঠক পাঠিকাগণ নিজেরাও চেষ্টা করিলে আরও অনেক সূত্রের মূল প্রাপ্ত হইবেন আশা করি, এবং হয়ত তখন তাঁহারাও আমার সঙ্গে বলিবেন—

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন!"

১। আহারের পরেই শয়ন করিতে নাই, অর্থাৎ নিদ্রা যাইতে নাই।

আমি যখন ১৩।১৪ বৎসর বয়স্ক, তখন একদিন আহারান্তে শয়ন করার অপরাধে পূজনীয়া মাতৃস্বসা কর্ত্তৃক বিশেষরূপে ভর্ৎসিত হইয়াছিলাম। জোর করিয়া তিনি আমাকে কিছুকাল বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়?" তিনি উত্তর দিলেন, "পেত্‌নীতে পেট চেটে যায়, গা হাত পা শুকিয়ে যায়।"

বিকটাকৃতি তালপ্রাংশু প্রেতিনী তাহার সূর্পবৎ সুবৃহৎ জিহ্বা দ্বারা আমার ক্ষুদ্র উদরটি চাটিয়া লইয়া যাইবে, আমার স্বভাবতঃই শীর্ণ হস্তপদ তাহার সেই লেহনপ্রভাবে শীর্ণতর হইবে সে আশঙ্কা

তখন আমার মনে হইয়াছিল কি না মনে নাই, তবে সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত যে আমি আহারান্তে কখন নিদ্রা যাই না তাহা ঠিক। তখন একটু একটু ইংরাজী পড়িতেছিলাম, সুতরাং অশিক্ষিতা মাতৃষসার ঐ শাসনটিকে নিতান্তই নিরর্থক পীড়ন বলিয়া মনে করিয়া থাকিব বোধ হয়। তারপর বহু বৎসর গত হইলে কোন প্রসিদ্ধ বিলাতী ডাক্তারী পুস্তকে একদিন পড়িলাম যে আহারান্তে নিদ্রা যাওয়াটা অন্যায়; উহাতে ভুক্ত বস্তু ভাল মত জীর্ণ হইতে পারে না। তারপর আমাদের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাদিতেও উহারই পোষক প্রমাণ পাইলাম। এমন কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট ইংরাজী পাঠ্য পুস্তকের শেষাংশে যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিষয়ক অংশ আছে তাহাতেও ঐ মাতৃষসার নিষেধবাণী প্রকটিত রহিয়াছে।

এখন দেখিতেছি তাঁহার ঐ নিষেধবাণী হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত নহে; উহা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের যুক্তি অনুসারেই প্রণীত ও গৃহস্থালীতে প্রচারিত হইয়াছে। ভুক্ত দ্রব্য ভাল জীর্ণ না হইলে তাহা দ্বারা শরীর পুষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং "হাত পা শুকিয়ে উঠে।" তাহা হইলেই পেত্নীর পেট চাটিয়া লওয়ার কথাটাও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নব্যা গৃহিণীগণ যদি নিজ নিজ সন্তানগণের প্রতি এই নিষেধ বাণী প্রচারিত করেন তবে তাহাতে তাঁহাদের উপহসনীয়া হইবার কোন আশঙ্কা দেখিনা। প্রত্যুত তাঁহাদের নয়ন-পুত্তলীগণের স্বাস্থ্য এই শাসনাধীনে উন্নতই হইবে আশা করা যায়। অতএব প্রাচীনাগণের বিধি হইলেও ইহা নব্য সংসারে নির্ব্বিবাদে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।

২। রাত্রিতে ঘর ঝাঁট দিয়া সে আবর্জ্জনা জঞ্জাল বাহিরে ফেলিবে না। ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিবে এবং পরদিন প্রাতে ফেলিবে। ইহা না করিলে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সে বাড়ী ত্যাগ করেন।

এই মেয়েলি শাস্ত্রের অন্তরালেও যে একটি সাবধানতা বর্ত্তমান তাহা বোধহয় সহজেই বোধগম্য হয়। ঘরের মধ্যে অসাবধানতাপ্রযুক্ত, পয়সা, সিকি, আধুলি, দুয়ানি, অথবা ঐরূপ কোন মূল্যবান্ কি আবশ্যকীয় ধাতু আমাদের অজ্ঞাতসারে পড়িয়া যাইতে পারে। রাত্রিতে তেমন আলোকের সুপ্রতুল না থাকায় গৃহ মার্জ্জনকালে ঐ সব জিনিস আমাদের চোখে না পড়ারই সম্ভব; সুতরাং আবর্জ্জনার সহিত সেগুলিও বাহিরে আস্তাকুঁড়ভুক্ত হইয়া অপ্রাপ্য হইতে পারে, সেই জন্যই এই নিষেধ। লক্ষ্মী গৃহকর্ত্রীর এইরূপ অনবধানতার ফলে যদি ছাড়িয়া যান তবে সেজন্য তাঁহাকে চঞ্চলা বলিয়া তিরস্কার করা যাইতে পারে না। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি যে নষ্ট দ্রব্য ঘরের আবর্জ্জনার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এই ব্যবস্থাটির গায়ে প্রাচীনা গৃহিণীগণের ছাপ মারা থাকিলেও নবীনাগণ ইহাকে আদর করিলে ক্ষতিগ্রস্থ ত হইবেনই না, বরং সময় সময় লাভবান হইতে পারেন। কোন উৎসবাদির সময় যে ঘরে ভাণ্ডার রাখা হয় সে ঘর ঝাঁট দিয়া বাহিরে ফেলিবে না, এ শাস্ত্রও স্থানে স্থানে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি। যতদিন সে ভাণ্ডারের কার্য্য থাকিবে সে কয়দিন, কি দিন, কি রাত্রি ঘর ঝাঁট দিয়া আবর্জ্জনা জমা করিয়া রাখিবে, ফেলিয়া দিবে না। ইহার মূলেও ঐ সাবধানতা। বিবাহাদি উৎসব সময়ে কর্ত্তা কর্ত্রীগণ সকলেই কিছু ব্যস্ত থাকেন, তখন আবর্জ্জনা ভাল করিয়া দেখিবার অবসর ঘটে না, উৎসব অন্তে অবসর পাইলে তখন তাহা দেখিয়া পরে ফেলা যাইতে পারে। তাহাতে অনেক সময় অনেক জিনিস পাওয়াও যায়। হইতে পারে সেগুলি সামান্য জিনিস, হয়ত তাহা হইতে ৫টা সুপারি, ১০টা এলাচ, ৩০টা লবঙ্গ, এক পোয়া মরিচ, ইত্যাদি রকম জিনিসই পাওয়া গেল; কিন্তু সুগৃহিণীর পক্ষে ইহার কিছুই সামান্য বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। অপব্যয় অপচয় হওয়া সুগৃহিণী কখনই দেখিতে পারেন না। "তৃণ হতে কার্য্য হয় রাখিলে যতনে" এই তাঁহার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। বর্ত্তমান প্রসঙ্গের নিষেধটিও সেই অপব্যয় নিবারণের উদ্দেশ্যেই প্রণীত হইয়াছে অতএব তাহা কখনই উপেক্ষনীয় নহে।

৩। একঘরে দুই প্রদীপ জ্বালিবে না; দিনের বেলায় সাধারণতঃ প্রদীপ জ্বালান অকর্ত্তব্য। কোন শুভ কার্য্য বা দেবারাধনা স্থলে কেবল ইহার অন্যথা হইবে। নতুবা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী চমকিয়া উঠেন।

এই নিষেধাত্মক শাস্ত্র প্রাচীনা গৃহিণীগণের এমনই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহারা দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বালান অথবা এক গৃহে একাধিক প্রদীপ জ্বালিতে দেখিলে অতিশয় ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া দিতেন। এই বিধানটিও যে অপব্যয় অপচয় নিবারণের উদ্দেশ্যেই ব্যবস্থিত তাহা বিস্তৃত করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। এইরূপ অপব্যয়ের প্রাচুর্য্য দেখিলে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর ত চমক লাগিবার কথাই; বাড়ীর কর্ত্তাদেরও চমক লাগিয়া যায়, বিশেষতঃ আজ কালকার বাজারে। এটিকেও কুসংস্কারের অন্তর্গত বলিতে পারা যায় না।

৪। খড়ের ছাউনি ঘরের চাল হইতে খড়ের কাঠি লইয়া দাঁত খিলি করিবে না, কি আগুণ জ্বালাইবে না; ইহা করিলে "উচ্ছন্ন" যায় অথবা ঘরে আগুণ লাগে।

যৌবনের প্রথমাবস্থায় আমি একদিন ঘরের চাল হইতে একটা কাঠি লইয়া দাঁত পরিষ্কার করিতে যাইতেছি, ইতিমধ্যে আমার পূজনীয়া কোনও প্রাচীনা আসিয়া তাহা নিবারণ করিলেন এবং আমাকে তিরস্কারচ্ছলে আজকাল ইংরাজি শিক্ষার প্রাবল্যের সঙ্গে সঙ্গে যে কেবল ম্লেচ্ছাচারেরই প্রতিপত্তি হইতেছে, সনাতন আচার ব্যবহারসমূহ যে হেয় হইয়া যাইতেছে, সুতরাং উৎসন্ন যাইবার আর যে বিলম্ব নাই, ঘোর কলি যে ভীষণ বদন-ব্যাদান করিয়া আর্য্যাচারগুলিকে গ্রাস করিতেছে ইত্যাদি সম্বন্ধে লম্বা এক বক্তৃতাই করিয়া ফেলিলেন। আমি বেচারা একেবারে অবাক হইয়া গেলাম এবং এই সামান্য খড় কাঠিটাকে আকর্ষণ করার সঙ্গে সনাতন আর্য্যাচারসমূহের 'ঘোর কলি' কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইবার কি নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা ভাল প্রণিধান করিতে পারিলাম না। শেষে ইহার মধ্যে একটু প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া বুঝিলাম ইহারও অন্তরালে সেই অপব্যয়-নিবারিণী শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে। ঘরের চাল হইতে 'দণ্ড খড়িকা' সংগ্রহ করিতে থাকিলে অল্প দিনের মধ্যেই চালের সে অংশ ধ্বংসের পথে যে অনেকটা অগ্রসর হইবে, চাল হইতে খড় লইয়া আগুন জ্বালান হইলে সে ঘরে যে শীঘ্রই আগুন লাগিবে অর্থাৎ চাল আর থাকিবে না তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব ইহার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিতে গিয়াই উপযুক্ত নিষেধ বিধানের সৃষ্টি। অনেকে ইহাকে অতিরিক্ত সাবধানতা বলিতে পারেন, তাহা বলুন; এরূপ সাবধানতা একটু অতিরিক্ত হইলে ক্ষতি নাই; বরং লাভই আছে, সুতরাং তাহাতে আপত্তি কি?

অদ্যকার মত এই চারিটি "মেয়েলি শাস্ত্রের"ই বিশ্লেষণের চেষ্টা করিলাম। সময়ান্তরে ক্রমে ক্রমে আরও দেখাইবার ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞান-রাজ্যের সংবাদ।

(১) কৃত্রিম সৌর জগৎ। *

জার্ম্মানির বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রফেসার আর্থার করন্ সম্প্রতি মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) সম্বন্ধে এক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া এপর্য্যন্ত কেহই কল্পনা ছাড়াইয়া বাস্তবিকতার মধ্যে আসিতে পারেন নাই। প্রফেসার করন্ এই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার নব-কল্পিত মূল সূত্র (Theory), পরীক্ষাদ্বারা বিশদরূপে সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

তিনি একপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, এইরূপ ব্যাপার সাধারণ লোকের নিকটও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যে নিয়মে বৃক্ষের ফল পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয় অথবা নভোমণ্ডলের গ্রহ নক্ষত্রাদি পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ইহাও দূরত্ব ও বেগ বিষয়ে ঠিক সেই নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়। অপর কোন শক্তির সাহায্য ব্যতীত একটী ক্ষুদ্র পদার্থ আপনা আপনি অপর পদার্থকে আকর্ষণ করিবে, এটা ইতিপূর্ব্বে সকলের নিকটই অবিশ্বসনীয় ও অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু যাঁহারা করণের উদ্ভাবিত যন্ত্র দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সে সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে।

তিনি প্রথমে অনুমান করেন, মাধ্যাকর্ষণ অনমনীয় আধারের মধ্যে স্থিতিস্থাপক পদার্থের কম্পনের ফল স্বরূপ। † এইরূপ ধারণা করিবার কারণ এই যে পৃথিবী, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্ত স্থিতিস্থাপক পদার্থই চতুর্দ্দিকে ঈথারের দ্বারা পরিবেষ্টিত। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ ঈথারকে অনমনীয় এবং অপ্রসারণশীল বলিয়া মনে করেন। আধুনিক বিজ্ঞানে ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জড় পদার্থ অবিরাম কম্পনশীল। প্রফেসার করন্ বলেন এই কম্পন বেহালার তারের কম্পনের মত; এবং অনুমান করেন এই সকল কম্পন এইরূপ জটিল ভাবের যে ইহা হইতে সৌরজগতে গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে পরিলক্ষিত বিপ্রকর্ষণ শক্তিরও উদ্ভব হইয়া থাকে।

কৃত্রিম উপায়ে মাধ্যাকর্ষণ উৎপন্ন করিবার জন্য তিনি যে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার গঠন-প্রণালী নিতান্ত সরল রকমের। একটী ধাতুময় গোলক নলদ্বারা একটী সিলিণ্ডারের সহিত সংযুক্ত আছে। গোলকের ভিতরে কি হয়, না হয়, দেখিবার জন্য তাহার পৃষ্ঠে কাচের জানালা আছে। সিলিণ্ডারের একমুখে খুব পাতলা পটহের (membrane) ঢাক্‌নি। এই পাতলা ঢাক্‌নী একটী বৈদ্যুতিক ভ্রামক যন্ত্রের দ্বারা (electric motor) কম্পিত করান হয়। বায়ুপূর্ণ, ইণ্ডিয়ারবারের দুইটী বিভিন্ন আকারের গোলা ধাতুময় গোলকের অভ্যন্তরে রাখা হয়; বড়টী দৃঢ়রূপে সংযুক্ত থাকে, ছোটটী যদৃচ্ছাক্রমে নড়িতে পারে। তৎপর সমস্ত যন্ত্রটী জলে পরিপূর্ণ করিয়া বৈদ্যুতিক মোটার চালাইয়া দেওয়া হয়। এক্ষণে পটহের কম্পনজনিত জলের চাপের ন্যূনাধিক্য হেতু রবারের গোলা দুইটী যথাক্রমে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইতে থাকে। এই প্রসারণ ও আকুঞ্চন ক্রিয়া এত দ্রুত সম্পন্ন হয় যে তাহা চক্ষে দেখিয়া উপলব্ধি করা যায় না। যেহেতু জল অনমনীয়, সুতরাং এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দুইটী স্থিতিস্থাপক পদার্থ এক অনমনীয় আধারের মধ্যে কম্পিত হইতেছে। কিছুক্ষণ পরে যখন কম্পনের বেগ আকর্ষণ জন্মাইবার উপযোগী হয়, তখন ক্ষুদ্র গোলাটী বৃহত্তর গোলার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং যতই তাহার নিকটে যায়, ততই ভূকেন্দ্রাভিমুখীন বৃক্ষচ্যুত

* বর্ত্তমান বর্ষের ওয়েষ্ট মিনষ্টার গেজেটে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।

† Gravitation is merely the result of the vibration of elastic bodies in an inelastic medium.

ফলের স্থায় তাহার বেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে শক্তির বলে উক্ত গোলা আকর্ষিত হয় তাহা যে মাধ্যাকর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা নিউটনের গতিবিজ্ঞান মূলক অঙ্কশাস্ত্রের (Dynamics) নিয়মের সহিত এক করিয়া সহজেই প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে জলের ভিতরে সৌর জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইয়াছে। কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে যখন বৃহৎ গোলকের অভ্যন্তরে অবলম্বনরহিত ইণ্ডিয়া রবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহগুলি সূর্য্যের চারিদিকে আপন আপন কক্ষ পথে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তখন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

প্রফেসার করণের নূতন আবিষ্কারের ফলে, জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণের গবেষণার পথ প্রশস্ত হইয়া পড়িবে।

(২) শয়নের ব্যবস্থা।

দুইজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক সম্পূর্ণ নূতন একটী তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। তাহার মূলভিত্তি এই :—চুম্বকের কোন বিশেষ স্থানে সম্পাদিত শারীরিক অথবা মানসিক কার্য্য অনুসারে আমাদের দৈহিক এবং স্নায়বীয় কর্ম্মক্ষমতার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। *

উক্ত নিয়ম যেমন কার্য্য সম্বন্ধে খাটে, ঠিক তেমনি বিশ্রাম অথবা কর্ম্মরহিত অবস্থা সম্বন্ধেও প্রযুজ্য হইতে পারে। এইরূপে তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, পুর্ব্ব অথবা পশ্চিম দিকে মাথা না রাখিয়া উত্তর অথবা দক্ষিণ শিরে শয়ন করা সুনিদ্রার পক্ষে সুবিধাজনক।

যে যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন তাহার নাম স্থেনোমিটার (Sthenometer or Force indicator)। একটী কম্পাসের অভ্যন্তরস্থ চুম্বক শলাকার অক্ষের সহিত সংলগ্ন করিয়া একগাছি তৃণ শয়ানভাবে রাখা হয়। এক্ষণে কাচের উপরে তৃণের কোন স্থান লক্ষ্য করিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্থাপন করিলে দেখা যায়, যে পরিমাণে শরীরস্থ স্নায়বিক বৈদ্যুতিক প্রবাহ (Nervous Fluid) অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া নির্গত হয়, সেই পরিমাণে তৃণ গাছি, ৯০ ডিগ্রীর ভিতরে সঞ্চালিত হয়।

অনেক স্থলে তৃণ অঙ্গুলীর দিকে আকৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে, বিশেষতঃ যাঁহাদের হিষ্টিরিয়ার ভাব আছে, তাঁহাদের বেলা তৃণ আকৃষ্ট না হইয়া দূরে সরিয়া যায়।

এইরূপ বহুতর পরীক্ষার পরে তাঁহারা দেখিয়াছেন উত্তর ও দক্ষিণ শিয়রে শয়ন করিলে শরীরস্থ বৈদ্যুতিক শক্তি অধিক পরিমাণে ক্ষয় হয়, সুতরাং সহজেই সুনিদ্রা হয়। কিন্তু পূর্ব্ব অথবা পশ্চিমদিকে মাথা রাখিয়া শুইলে শরীরস্থ বৈদ্যুতিক প্রবাহ খুব অল্প পরিমাণে নির্গত হয় ; অর্থাৎ কার্য্য করিবার জন্য আমাদের যে পরিমাণ উত্তেজনার প্রয়োজন তাহা প্রায় থাকিয়া যায়। সুতরাং শরীর সহজে অসাড় হইয়া পড়ে না।

আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেরাও পূর্ব্ব পশ্চিম শিয়রে শয়ন করে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কয়জনে জানে?

(৩) অজ্ঞাত প্রদেশের অনুসন্ধান।

লণ্ডনের রয়েল জিয়োগ্রাফিকাল সোসাইটীর ভূগোলকের পৃষ্ঠে অনেকগুলি কাল দাগ আছে ; তাহাতে বুঝা যায়, পৃথিবীর মধ্যে কত স্থান এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকার কুড়ি লক্ষ বর্গমাইল ও আরবের দক্ষিণ পুর্ব্বাংশে প্রায় চারি লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত স্থান সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানা যায় নাই।

ডাক্তার স্বেন হেডি তিব্বতের অনেক স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। ডাক্তার ষ্টীন্ নক্সা প্রভৃতি লইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিতেছেন।

কাপ্তান ওলিয়ন্ চীন তিব্বতীয় সীমান্তে অনুসন্ধান করিতে করিতে তিব্বতীয় জাতির মধ্যে একদল মোঙ্গলীয় অধিবাসীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

* The muscular and nervous energy is increased or decreased according as action, whether physical or mental, is being performed at certain point of the compass.

ডিউক এব্রুজি ও ডাক্তার সংষ্টাফ্ এই গ্রীষ্মকালে হিমালয়ের অজ্ঞাত স্থানসমূহের অনুসন্ধানে আসিতেছেন।

নিউগিনির অভ্যন্তর, সাহারার পাহাড়, মেরু প্রদেশ, উত্তর মহাসাগরের দ্বীপ স্পিট্‌স্, বার্গেনের সন্নিহিত স্থান ও আলাস্কার মেকেঞ্জি নদী প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অভিযান প্রেরিত হইয়াছে।

সম্প্রতি জনৈক আবিষ্কারক উত্তর মেরুর দিকে অগ্রসর হইয়া ৮৮ ডিগ্রী অক্ষরেক্ষায় পৌঁছিয়াছেন। সেই স্থানে ইংরাজের পতাকা স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানকে পৃথিবীর প্রায় চৌম্বক মেরু (magnetic pole) বলা যাইতে পারে।

ভারতে যাঁহারা ভৌগলিক গবেষণার জন্য বৃত্তিভোগ করিতেছেন, (Research scholars), তাঁহারা কি করিতেছেন?

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

কিসা গোতমী ও বুদ্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাজা শুদ্ধোধন পুত্রের জন্ম দিন হইতেই পুত্রের ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। কি করিলে পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া সংসারে বসবাস করেন তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদাই অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিতেন। অবশেষে সকলেই এক বাক্যে পরামর্শ দিলেন যে সিদ্ধার্থকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিলে তাঁহার সকল প্রকার বিকৃতি দূরীভুত হইবে।* তদনুসারে সিদ্ধার্থ ষোড়শ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে রাজা শুদ্ধোধন গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত, এই তিন ঋতু যাপনার্থ তাঁহার জন্য "রমা" "সুরমা" এবং "শুভা" নামক নবতল, সপ্ততল ও পঞ্চতল বিশিষ্ট তিনটী সুরম্য প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া দেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে এখন তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার রাজ্যোন্নতি দর্শন মানসে এবং তাঁহাকে সংসার মায়ায় আবদ্ধ করিবার ইচ্ছায় রাজা শুদ্ধোধন শাক্যনৃপতিবৃন্দকে তাহাদিগের বয়ঃপ্রাপ্তা সুন্দরী দুহিতাদিগকে আপন অন্তঃপুরে পাঠাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। শাক্যনৃপতিবৃন্দ এই ঘোষণা পত্র প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধার্থের সুগঠিত অঙ্গ সৌষ্ঠবের ও কমনীয় কান্তির বহু প্রশংসা করিয়া তাঁহার বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ব্যায়াম, রণকৌশল প্রভৃতি ক্ষত্রোচিত শিক্ষার অভাব বশতঃ অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থতা প্রদর্শন করাইয়া আপন আপন কন্যা অর্পণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। রাজা শুদ্ধোধন এ সংবাদে একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া পুত্রকে সকল কথা জানাইলেন। অতঃপর সিদ্ধার্থ নানাপ্রকার রণকৌশল, ব্যায়াম প্রভৃতি ক্ষাত্র গুণাবলী প্রদর্শন করিলে পর শাক্য নৃপতিবৃন্দ সানন্দে স্বকীয় রূপলাবণ্যময়ী কন্যাদিগকে নানাপ্রকার আভরণে ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া রাজান্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন।† তৎসময়ে রাজান্তঃপুর প্রায় ৪০০০০ চল্লিশ হাজার নৃত্যগীতাভিজ্ঞা রমণীতে পরিপূর্ণ ছিল।‡ গোতমী ও তাহাদের মধ্যে একজন। §

* * * Love.
Will cure these thin distempers————Edwin Arnold.

† Thereupon the Sakya tribes sent their daughters superbly decorated——George Turnour.

‡ There were forty thousand dancing and singing girls——Ibid.
So at that time the Bodhisattra's wives were Gopa, Mrigadja etc. and 60,000 attendant women.—Rockhill.

§ This was the ante-chamber of the Prince;
But at the purdah's fringe the sweetest slept——
Gunga and Gotami—chief ministers
In that still House of Love——Edwin Arnold.

কেবলমাত্র যশোধরা যুবরাণী পদে অভিষিক্তা ছিলেন।

সিদ্ধার্থ, অপ্সরাপরিবৃত দেবরাজকুমারের ন্যায়, প্রাসাদে ও প্রমোদ উদ্যানে নৃত্য গীত প্রভৃতি আমোদ প্রমোদেই দিন অতিবাহিত করিতেন। তিনি যখন প্রমোদোদ্যানে বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইতেন তখন রাজাজ্ঞানুসারে মানব জীবনের শোক দুঃখ যন্ত্রণা প্রকাশক কোন প্রকার অশোভনীয় দৃশ্য যাহাতে তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইতে না পারে এবং যে পথ দিয়া তিনি শকটারোহণে গমন করিতেন সেই সব পথ ছত্রধ্বজ পুষ্প পত্র মাল্যাদির দ্বারা সুশোভিত ও সুবাসিত গন্ধ-পূর্ণ জল দ্বারা অভিষিক্ত করিবার জন্য বিধিমত ব্যবস্থা করা হইত। কোন প্রকারে যাহাতে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার না হইতে পারে তাহার জন্য সদাসর্ব্বদাই বন্দোবস্ত করা হইত। কিন্তু লীলাময় বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা! মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার জন্য, এক উন্নততর, মহত্তর জীবন নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সিদ্ধার্থের সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞানের সময় উপস্থিত, এখন তাঁহার আমোদ প্রমোদে ও বিলাস লীলায় মত্ত হইলে চলিবে কেন? সেই জন্য দেবতাগণ স্থির করিলেন যে, ভবিষ্যৎ সূচক ঘটনা সংঘটন দ্বারা এখন তাঁহার মনকে সংসারাসক্তি হইতে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। *

একদিন যেমন সিদ্ধার্থ শকটারোহণে নগরদ্বার অতিক্রম করিয়া প্রমোদোদ্যানে গমন করিতেছিলেন, সকল প্রকার পূর্ব্ব সাবধানতা সত্ত্বেও একজন দেবতা জরাজীর্ণ অতি-বৃদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া পথিমধ্যে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধার্থ তাঁহাকে দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিং সারথে পুরুষ দুর্ব্বল অল্পস্থাম
উচ্ছুষ্ক মাংস রুধিরত্বচ স্নায়ু নদ্ধঃ।
শ্বেতশিরো বিরল দন্ত কৃশাঙ্গরূপ
আলম্ব দণ্ড ব্রজতেঽসুখং স্খলন্ত॥

হে সারথি! এই দুর্ব্বল, অস্থির, রক্তমাংসবিহীন, শুষ্ক স্নায়ু প্রকাশমান, শ্বেতমস্তক, বিরল দন্ত, ক্ষীণাঙ্গ পুরুষটি কে? অতি কষ্টে অস্থিরগতিতে দণ্ড ধারণ-পূর্ব্বক গমন করিতেছে কেন?

সারথি উত্তর করিল—

এষোহিদেব পুরুষো জরয়াভিভূতঃ
ক্ষীণেন্দ্রিয় সুদুঃখিত বলবীর্য্যহীনো।
বন্ধুজনেন পরিভূত অনাথভূতঃ
কার্য্যাসমর্থ অপবিদ্ধ বনেবদারু॥

হে দেব! এই পুরুষ জরা দ্বারা আক্রান্ত, ইহার ইন্দ্রিয় সকল ক্ষীণ হইয়াছে, এ অতি কাতর, ইহার শক্তি সামর্থ্য নাই, অসহায়, বনমধ্যে জীর্ণ কাষ্ঠের ন্যায় অকর্ম্মণ্য বলিয়া আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সিদ্ধার্থ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

কুলধর্ম্ম এষ অয়মস্য হিত্বং ভণাহি
অথবা সর্ব্বজগতোঽস্য ইয়ং হ্যবস্থা।
শীঘ্রং ভণাহি বচনং যথভূতমেতৎ
শ্রুত্বা তথার্থমিহ যোনি সঞ্চিন্তয়িষ্যে॥

হে সারথি! ইহা কি ইহার কুলধর্ম্ম, না জগৎ সংসারের এই অবস্থা? তুমি শীঘ্র ইহার প্রকৃত উত্তর প্রদান কর, তোমার কথা শুনিয়া আমি ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে চিন্তা করিব।

সারথি উত্তর করিল—

নৈতস্য দেব কুলধর্ম্ম ন রাষ্ট্রধর্ম্মঃ
সর্ব্বে জগস্য জরযৌবন ধর্ষ য়াতি।
তুভ্যং হি মাতৃ পিতৃ বান্ধব জ্ঞাতি সংঘো
জরয়া অমক্তং নহি অন্যগতিজনস্য॥

হে দেব! ইহা ইহার কুলধর্ম্ম বা গ্রাম্যধর্ম্ম নহে। জগতের সকল লোকেই জরা যৌবন কর্ত্তৃক অভিভূত হয়। তুমি, তোমার পিতা মাতা, আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতিবর্গ, কেহই জরার হাত এড়াইতে পারিবে না, জগজ্জনের আর অন্য গতি নাই।

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন—

* The dewatas, saying to themselves 'the time is at hand for prince Siddhatto to attain omniscience' let us present to him predictive signs——Turnour.

ধিক সারথে অবুধবালজনস্য বুদ্ধিঃ
যদ্ যৌবনেন মদত্ত জরাং ন পশ্যী।
আবর্ত্তয়াশ্বিহ রথং পুনরহং প্রবেক্ষ্যে
কিং মহ্য ক্রীড়রতির্ভর্জরয়াশ্রিতস্য॥

হে সারথি! অজ্ঞানজনের বুদ্ধিকে ধিক্! যে বুদ্ধি যৌবন মদে মত্ত হইয়া জরাকে দেখিতেছে না। তুমি রথ ফিরাও, আমি ইহাকে আবার দেখি। জরাশ্রিত জনের আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন কি? তিনি সেদিন প্রমোদোদ্যানে না গিয়া বিষণ্ণ মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

অপর একদিন নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া যেমন তিনি প্রমোদোদ্যানে প্রবেশ করিবেন, এমন সময়ে একজন ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখিতে পাইয়া তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিং সারথে! পুরুষ রূপ বিবর্ণ গাত্রঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয়েভি বিকলো গুরু প্রশ্বসন্তঃ।
সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক উদরাকুল প্রাপ্ত কৃচ্ছ্রা
মূত্রে পুরীষ স্বকি তিষ্ঠতি কুৎনীয়ে॥

হে সারথি! শরীরের রং বিবর্ণ হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল বিকল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, সর্ব্ব শরীর শুষ্ক, অতি অতি কষ্টে ক্ষুন্নিবারণ করিয়া আপনার মলমূত্রে অবস্থান করিতেছে, এ ব্যক্তি কে?

সারথি উত্তর করিল—

এষোহি দেব পুরুষ পরমং গিলানো
ব্যাধীভয়ং উপগতো মরনান্ত প্রাপ্তঃ।
আরোগ্য তেজ রহিত বলবিপ্রহীনো
অত্রানবী প্রশরণ হ্যপরায়ণশ্চ॥

হে দেব! এ ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্থ, অত্যন্ত অসুস্থ আরোগ্য শক্তি রহিত, মৃত্যু ইহার নিকটবর্ত্তী। ইহার বলহীন হইয়াছে, রক্ষা পাইবার কোনরূপ আশা নাই দেখিয়া অশরণ হইয়া পড়িয়াছে।

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন—

আরোগত্যা চ ভবতে যথ স্বপ্ন ক্রীড়া
ব্যাধিভয়ং চ ইসীদৃশ ঘোর রূপম্
কোনাম বিজ্ঞপুরুষো ইম দৃষ্ট্বা বস্থাং
ক্রীড়ারতিঞ্চ জনয়েৎ শুভ সংজ্ঞিতাং বা।

দেখিতেছি আরোগ্যতা স্বপ্ন ক্রীড়ার ন্যায় অলীক। ব্যাধি সকল অতীব ভয়ঙ্কর। কোন্ বিজ্ঞ পুরুষ এই অবস্থা দেখিয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত হইতে বা জগতে সুখ আছে বলিয়া ভাবিতে পারেন!

এ দিনও তাঁহার প্রমোদোদ্যানে যাওয়া হইল না!

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মিত্র।

নন্দকুমার।

নন্দকুমার সম্বন্ধে অনেক প্রবীণ এবং বহুদর্শী লেখক অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে আমার ন্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নন্দকুমার সম্বন্ধে কিছু বলা কোনরূপে সমীচীন নহে। তৎকালীন বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে হইলেই সৈয়র মুতাক্ষরীণকে নির্ভর করিতে হয়। আমি এই মূল্যবান্ পুস্তকপাঠে নন্দকুমার সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছি পাঠকবর্গকে তাহাই মাত্র জানাইব। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় নন্দকুমারকে ভিন্ন চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিখিল বাবুর চিত্র সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন করিব, ভরসা করি তিনি ইহার উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

মুতক্ষরীণ রচয়িতা নন্দকুমারকে 'a man of an intriguing spirit' বলিয়া গিয়াছেন। পলাসীর যুদ্ধের পর ক্লাইবের অনুগ্রহে নন্দকুমার মিরজাফর খাঁর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। ইতিপূর্ব্বে তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পদচ্যুতও হইয়াছিলেন। যে কারণে তিনি পদচ্যুত হন সে প্রসঙ্গ আমরা পরে

অবতারণা করিব। মীরকাসেম আলি খাঁর সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইলে মীরজাফর পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসেন। আসিবার কালীন নন্দকুমারকে সঙ্গে আনিতে চাহিলে গবর্ণর ভান্‌সিটার্ট সাহেব কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কাউন্সিলের সভাপতি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মীরজাফরের উপর নন্দকুমারের এত প্রভাব থাকাতে ঐরূপ প্রকৃতির লোককে মুর্শিদাবাদে মীরজাফরের সঙ্গে দিলে অনেকের বিশেষ অমঙ্গল হইবে। (১) যাহা হউক খাঁ সাহেব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিয়া কাউন্সিলে পুনঃ পুনঃ এইরূপ ভাবে পত্র দিতে লাগিলেন যে অগত্যা একপ্রকার বিরক্ত হইয়াই সদস্যগণ তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগমনে আদেশ দিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে এইরূপ ভয়ানক প্রকৃতির (২) লোক যাহাতে অপরকে বিপদে না ফেলাইতে পারে তজ্জন্য ভ্যান্সিটার্ট সাহেব একখানি পুস্তকে নন্দকুমারের আমূলবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

নন্দকুমার মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই মহম্মদ রেজা খাঁর প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন। রেজা খাঁ বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন। তিনি রাবিয়া বেগমের (৩) জামাতা ও ঢাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু বাধ্য হইয়া তিনি এই নূতন দেওয়ানের তোষামদে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই তোষামদীতে কোনই ফল হইল না এবং রেজা খাঁ কিছুতেই নিস্তার পাইলেন না। নন্দকুমারের পরামর্শে মীরজাফর খাঁ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিয়া, বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিলেন। রেজা খাঁর অদৃষ্টে আরও কিছু ছিল কিনা বলা যায় না (৪) কিন্তু ভগবৎ কৃপায় মুর্শিদাবাদের কুঠীর অধ্যক্ষ এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাতে আর তাঁহারা অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন না। বিশেষতঃ রেজা খাঁর সৌভাগ্যবশতঃ নবাব শীঘ্রই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়াতে, নন্দকুমার রেজা খাঁর আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নবাব শীঘ্রই কালকবলে পতিত হইলেন। নন্দকুমার বৃদ্ধ নবাবের উপরে কতটা ক্ষমতা পরিচালন করিতেন মুতক্ষরীণ রচয়িতার এই দৃষ্টান্ত পাঠ করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে মুতক্ষরীণকার বলিতেছেন যে নবাব মৃত্যুর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের সন্নিকটস্থ কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন। "Several persons of credit have affirmed that some moments before his demise. he had on 'Nandacoomar's' persuation ordered to be brought to him some water that had been poured in libation over the idol at Kirat-Conah (a famous temple of the Gentoos in the neighbourhood of Mursidabad) and that some drops of it were poured down the dying man's throat ; this being the last water which he tasted " (৫)

মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মীর নিজামদ্দৌলা (৬) বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। নন্দকুমার তাঁহার পূর্ব্বপদেই বহাল থাকেন। কিছুদিন এইভাবেই কার্য্য চলিতে লাগিল এবং নন্দকুমার একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে কাউন্সিলের সদস্যগণের আদেশে নন্দকুমারকে কলিকাতায় যাইতে হইল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে

(১) Nanda Kumar, a man of intriguing spirit who having already vexed numbers of persons of distinction throughout the province would avail himself of his ascendant over his master, to attack indiscriminately whomsoever he chose to demolish. Seiur Mutaqherin। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত এন্, এন, ঘোষ মহাশয় ও এই কথা বলিয়াছেন। "Nanda Kumar with indiscriminate spite threw mud at many."

(২) A man of dangerous character and endless intrigues. Seiur Mutaqhurin.

(৩) রাবিয়া বেগম সিরাজের মাতৃস্বসা আমিনা বেগম এবং ঘসেটী বেগমের ভগিনী।

(৪) "Moreover would have proceeded further"——Seir Mutaqherin

(৫) মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে নিখিলবাবু এ ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬) মীরজাফরের জ্যেষ্ঠপুত্র মীরনের বৃত্তান্ত অবশ্য সকলেই অবগত আছেন।

নন্দকুমারের আত্মীয় ও অনুচরবর্গ একপ্রকার তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াই তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহতভাবে পরিচালন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেব নন্দকুমার সম্বন্ধীয় সকল বৃত্তান্ত এক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা জর্জ্জ ভান্সিটার্ট "হুসিয়ার জঙ্গকে" (১) কাউন্সিলে, এই পুস্তক পাঠের আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। কাউন্‌সিলে, এই পুস্তক পঠিত হইলে সদস্যগণ নন্দকুমারকে কলিকাতার বাহিরে যাইতে নিষেধ করিলেন কিন্তু তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন না। এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল। সিরাজদ্দৌলার পতনের কিছুদিন পরে নন্দকুমার ক্লাইভের মুন্সী ও ক্লাইভ 'লর্ড' উপাধি ভূষিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার (তখন কর্ণেল ক্লাইভ) দেওয়ান ছিলেন। সুতরাং ক্লাইভের প্রিয়পাত্রকে পদচ্যুত করিতে সম্ভবতঃ কাউন্সিলের সদস্যগণের সাহসে কুলায় নাই। নন্দকুমার ক্লাইভের প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং সদস্যগণও ক্লাইভ ফিরিয়া আসিলে সমস্ত বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করাইয়া নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিবেন এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। নন্দকুমার বিশেষ ভরসা করিয়াছিলেন যে ক্লাইভের সাক্ষাৎ প্রাপ্তিমাত্র তিনি মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ লর্ড ক্লাইব কলিকাতা পৌছামাত্রই উপরোক্ত পুস্তক তাঁহাকে পাঠ করিয়া শোনান হইল। নন্দকুমারকে ক্লাইব কিছু অনুগ্রহ দেখাইবেন এরূপ তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই পুস্তক পাঠে নন্দকুমারের প্রতি তৎকালীন ভারতের ভাগ্য বিধাতার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল। নন্দকুমার সেই মুহূর্ত্তেই পদচ্যুত এবং একপ্রকার নজরবন্দী হইলেন। কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের সীমার বাহিরে যাইবার তাঁহার ক্ষমতা থাকিল না।

লর্ড ক্লাইব স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন ও Regulating Act বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। কয়েক বৎসর এইরূপ ভাবেই কাটিল। ইতিমধ্যে এই নূতন আইনানুসারে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জেনারেল ক্লেভারিং, কর্ণেল মনসন্ এবং মিঃ ফ্রান্সিস্ বিলাত হইতে কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হইয়া এদেশে আসিলেন। হেষ্টিংস সাহেব (২) গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। পদচ্যুত হওয়াবধি নন্দকুমার উপেক্ষিত অবস্থাতেই কাল কাটাইতেছিলেন। হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে কোন অনুগ্রহ দেখান নাই। নন্দকুমার সুবিধা বুঝিয়া এই দলেই যোগদান করিলেন। নূতন দলের সহিত যোগদান করিবামাত্র জেনারেল ক্লেভারিং বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহাকে নিজ দলভুক্ত করিয়া লইলেন এবং নন্দকুমারের প্ররোচনায়ই কতকগুলি অর্থলোভী লোকও এই দলের সহিত নিজেদের স্বার্থ বিজড়িত করিল। (৩)

গবর্ণর ও সদস্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর এবং কাউন্সিলে গবর্ণরের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে, হেষ্টিংস্ বৈর নির্য্যাতনের উপায় দেখিতে লাগিলেন এবং নন্দকুমারকে (৪) শিক্ষা দিবার জন্য বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এই সময়ে হেষ্টিংস্ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে নন্দকুমার অনেক সময়ে অনেক বড়লোকের মোহর জাল করিয়া হুণ্ডি প্রস্তুত করিতেন। নন্দকুমার বোলাক দাস নামক এক শ্রেষ্ঠির নাম ও মোহর জাল করিয়া কোম্পানীর কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার বিচার হয়। বিচার ফল সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং সে প্রসঙ্গের বেশী অবতারণা করিবার

(১) তৎকালে এইরূপ উপাধি দেওয়া হইত। কর্ণেল ক্লাইব কর্ণাট যুদ্ধে খ্যাতি অর্জ্জন করার পর তাঁহাকে সবৎজঙ্গ (steady and tried in war) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

(২) মুতক্ষরীণ অনুবাদক বরাবর হেষ্টিংস্ সাহেবকে (Hustin) হাষ্টিন সাহেব বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

(৩) "Numbers of covetious men, fond of trouble and dissensions joined this party"——Seir Mutqherin.

(৪) That man of wicked disposition and an infamous character.—- Seir Mutaqherin.

কোন প্রয়োজন দেখি না। জেনারেল ক্লেভারিং নন্দকুমারকে বিশেষ আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন এবং বধ্যভূমিতে নীত হইলেও নন্দকুমার যেন কোনরূপ ভয় না পান এরূপ আশ্বাসও দিয়াছিলেন। কিন্তু ইম্পি সাহেবের বিচারে কিছুতেই কিছু হইল না। হিজীরার ১১৮৯র জেনাদি মাসের ১৭ই তারিখে (১৭৭৫।৫ই আগষ্ট) তারিখে নন্দকুমার বধ্যভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে অর্পণ করা হয়। নগদ ৫২ লক্ষ টাকা এবং প্রায় তদ্রূপ মূল্যের সম্পত্তি সমস্তই রাজা গুরুদাস প্রাপ্ত হন। একটী ক্ষুদ্র বাক্সে অনেকগুলি বড় বড় লোকের নামের জাল শীলমোহরও পাওয়া যায়।

মুতক্ষরীণ রচয়িতা নন্দকুমারকে উপরোক্ত ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। নিখিল বাবু নন্দকুমারকে রাণা রাজসিংহ ও ছত্রপতি শিবাজীর সহিতই এক প্রকার তুলনা করিয়াছেন। আমি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ সুতরাং আমি যে কয়েকটী প্রশ্নের অবতারণা করিতে সাহস করিতেছি তিনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া সেগুলির উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

আমার প্রথম বক্তব্য, এ বিষয়ে মুতক্ষরীণকারের বৃত্তান্ত বিশ্বাস যোগ্য কি না? অবশ্য মুতক্ষরীণকার নন্দকুমার সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা যে বিশ্বাসযোগ্য নিখিল বাবু বলিতে পারিবেন না কারণ তাহা হইলে তিনি নন্দকুমারকে যে গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন তাহার কিছুই থাকে না। মুতক্ষরীণের intrinsic worth যে অত্যন্ত বেশী ইহা সকল দেশের সকল ঐতিহাসিকেরাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নিখিল বাবু ও নন্দকুমার সম্বন্ধে এবং অপরাপর অনেক স্থলেই মুতক্ষরীণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতিরঞ্জিত বলিয়া যদি তিনি বা আমরা মুতক্ষরীণকে কেবলমাত্র এই প্রসঙ্গেই বিশ্বাস স্থাপন না করি তাহা হইলে অন্যত্রও আমাদের মুতক্ষরীণকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আর মুতক্ষরীণ রচয়িতার পক্ষপাতিত্বই স্বীকার করিয়া তিনি এ প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত এবং অবিশ্বাসযোগ্য এরূপ ধরিয়া লইতে হয় তাহা হইলে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে নিখিল বাবু বার্কের বক্তৃতা হইতে যে সমস্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন তাহাও অনেকাংশে অতিরঞ্জিত। যদি দুই দিক্ হইতেই "ছাট্ কাট্" করিতে হয় তবে নন্দকুমার কোনক্রমেই আদর্শ পুরুষরূপে চিত্রিত হইতে পারেন না।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার "Life of Maharajah Nabakissen" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে "Some recent Bengalee writers have made a hero of Nancomar". এই প্রসঙ্গে নিখিল বাবু অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবারও বলিতেছি যে আমি অনভিজ্ঞ; কেবলমাত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু। সুতরাং যদি সমসাময়িক ইতিহাস ধরিতে হয় তবে আমরা নন্দকুমারকে কিছুতেই "Hero" বলিতে পারি না। নিখিল বাবু "মুর্শিদাবাদ কাহিনী"র ৩১৯ পৃষ্ঠায় বার্ক হইতে "The character here given of him is that of an *excellent patriot*" উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ঐ স্থলেই বার্ক তাঁহাকে যে "Great Rajah Nunda Coomar" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ইহাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। নন্দকুমার কতদূর patriot ছিলেন আমরা সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে মাত্র এই বলিতে চাই যে বার্ক নন্দকুমারকে যে "Great Rajah বলিয়াছিলেন তাহার অর্থ 'মহারাজা'—"great"এর উপর যে বেশী কিছু emphasis দিয়া একথা বলিয়াছিলেন, "great"এর সাধারণ অর্থ মহা ব্যতীত যে অন্য অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা নহে। "যিনি তাঁহাকে এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই প্রভুকে পরিত্যাগ করেন" "এই অকৃতজ্ঞতার জন্য তিনি তাঁহার নবপরিচিত ইংরাজদিগের হস্তে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করেন এবং পরিশেষে জীবন বলি দেন।" (উদ্ধৃত অংশ নিখিল বাবুর কথা)। ইহা

সেই সর্ব্বনিয়ন্তারই কার্য্য বলিতে হইবে। ৩০৭ পৃষ্ঠায় নিখিল বাবু লিখিয়াছেন যে "প্রবঞ্চনা, প্রতারণা দোষে তাঁহাকে যে কালিমা মণ্ডিত করা হইয়াছে, আমরা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না" কিন্তু নন্দকুমার যে সিরাজদ্দৌলাকে স্পষ্টতঃই প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন তাহাত নিখিল বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বেশী কমে বড় যায় আসে না। যাঁহাকে আদর্শ বলিয়া লোকসমাজে ধরিতে চাই, যাঁহাকে শিবাজী বা রাজসিংহের সহিত তুলনা করিতে চাই, তাঁহার স্বীয় প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর বিপক্ষ পক্ষে যাওয়া কোন প্রকারেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। "নন্দকুমারের সহায়তায় ইংরাজেরা চন্দননগর অধিকার করেন" (৩৪৪ পৃষ্ঠা); একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নন্দকুমারকে আমরা কি বলিয়া ঠিক্ করিব? আদর্শ হওয়া দূরে থাকুক তাঁহাকে traitor ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। যিনি অস্তমিত সূর্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রদীপ্ত ভাস্করের আরাধনা করিতে পারেন তিনি যে "তাঁহার প্রভু ও স্বদেশের স্বত্ব রক্ষার জন্য" জীবনাহুতি দিয়াছিলেন ইহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার মনে হয়, নন্দকুমার যে timeserver 'কালানুবর্ত্তী লোক' ইহা হেষ্টিংস সাহেব স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে ইংরাজদের আর ক্ষতি না করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই নন্দকুমারকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কূটনীতিকুশল রাজনীতিজ্ঞের ইহাই সমীচীন বোধ হইয়াছিল।

৩৩৬ পৃষ্ঠায় নিখিল বাবু বার্ক হইতে দুই ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"And the general obloquy of the English nation, was an account of his attachment to his own prince and the liberties of his country."

ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে নন্দকুমার যদি সিরাজদ্দৌলাকেই পরিত্যাগ করিতে পারেন তবে মিরজাফরকেও তো তিনি সুবিধা পাইলে পরিত্যাগ করিতেন। না করিবার কি কারণ ছিল?

৩২৯ পৃষ্ঠায় আছে "মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনের মুন্সীর যে এরূপ রাজনৈতিক শক্তি ছিল তাহা আমরা এই প্রথম শুনিলাম।" আমার এ সম্বন্ধে বক্তব্যও অতি সামান্য। "party feeling"-এর বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে অনেক কথা বলিয়াছিলেন একথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। মুতক্ষরীণ হইতে অনেক বাদ দিলেও নন্দকুমারের কলঙ্ককালিমা ধৌত হয় না। বার্ক হইতে অনেক বাদ দিলে নন্দকুমারের আদর্শতার কিছুই থাকে না।

নিখিল বাবু তাঁহার 'কাহিনীর' ৩০৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে অন্যান্য বাঙ্গালীর ন্যায় বৈদেশিকগণের পদলেহন না করিয়া তিনি যে স্বদেশের স্বত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে।" পরে ৩৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে "ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে ইংরাজরা সেই সময়ে আমীরচাঁদকে দিয়া নন্দকুমারকে ১২০০০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।" নিখিল বাবু ইহার উত্তরে লিখিতেছেন যে "নন্দকুমার এরূপ নীচান্তঃকরণ ছিলেন না যে, ১২ হাজার টাকার ন্যায় সামান্য অর্থে তিনি এইরূপ পাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি সিরাজের পরিণাম চিন্তা করিয়াই ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়।" Orme প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন নিখিলবাবু তাহাতে আস্থাস্থাপন করিতে পারেন না। "এই ১২০০০ হাজার টাকা প্রদানের বিষয়ে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে।" এই সন্দেহের কারণ আমরা ভালরূপে দেখিতে পারিতেছি না। (১) নিখিলবাবু যে কারণ

(১) এই চাকুরী পাইবার পূর্ব্বক্ষণেই নন্দকুমারকে ঋণ করিয়া পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিয়া নবাব দরবারে যাইতে হইত। এরূপ লোকের পক্ষে এই সামান্য টাকা না লওয়া সম্ভব কিনা বিচার্য্য।

দেখাইতেছেন যে টাকা সামান্ত (১২০০০ হাজার টাকা সামান্ত ?) এবং নন্দকুমার নীচান্তঃকরণও ছিলেন না তাহার প্রমাণ কিছু দেখাইতে পারেন কি ? কিন্তু যে পাষণ্ড নিমকহারামী করিয়া বিপন্ন প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর বিপক্ষদলে যোগ দিতে পারে সে কি নীচান্তঃকরণ নহে ? নিখিল বাবু নিজেও কি তাহা স্বীকার করিতেছেন না ? ৩৪২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে "কিন্তু তিনি যখন চতুরতা পূর্ব্বক প্রভুকে সতর্ক হইবার জন্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তখন তিনি যে সর্ব্বথা নিন্দনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।" এবং পরেও ৩৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। "কিন্তু ইংরাজদিগকে প্রকারান্তরে সহায়তা করায় প্রভুর প্রতি যে তাঁহার অকৃতজ্ঞতা দেখান হইয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" সুতরাং নিখিল বাবু নন্দকুমারকে 'সর্ব্বথা নিন্দনীয়' ও 'অকৃতজ্ঞ' বলিতেছেন। অথচ নন্দকুমারের টাকা লওয়ার সম্বন্ধেও কিছু সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ প্রকারের ব্যক্তিকে কিছুতেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি না। বিশেষতঃ যে প্রভু নন্দকুমারের বুদ্ধিমত্তাও কার্য্যদক্ষতার মুন্সী ছিলেন—যদি নন্দকুমারের পক্ষে রাজনৈতিক শক্তির ব্যবহার প্রযুজ্য হইতে পারে তবে কি নবকৃষ্ণের পক্ষে তাহা প্রযুজ্য হইতে পারে না ?

অনেক বলিয়াছি। আর একটী মাত্র কথার অবতারণা করিয়া ক্ষান্ত হইব। নন্দকুমারের ফাঁসীর সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলিতে চাহিনা। ওয়াল্‌স এবং বিভারিজ ছুজনেই বিজ্ঞ, বহুদর্শী ও প্রবীণ। তাঁহারা যখন ইহাকে judicial murder এবং 'grave miscarriage of justice" বলিয়া গিয়াছেন তখন এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। ইতিপূর্ব্বে রাধাচরণ মিত্রের জাল-করা অপরাধে ফাঁসির হুকুম হয় কিন্তু কলিকাতার অধিবাসিগণ ইহাতে আপত্তি করিয়া কাউন্‌সিলে আবেদন করায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইয়াছিল। যাহাতে প্রাণদণ্ড না হয় তজ্জন্ত নবাব মোবারকউদ্দৌলা ও অনুরোধ করিয়াছিলেন; সে অনুরোধ উপেক্ষিত হইয়াছিল। [illegible]যুক্ত [illegible]গেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে "It would appear that public opinion was expressed in all unmistakeable way &c &c. নবাব নাজিমের উপরোধ অপেক্ষা কলিকাতাবাসীর আবেদনের মূল্য যে অধিক ছিল ইহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। তৎকালীন নবাব নাজিমের ক্ষমতা কতদুর ছিল সে বিষয় বিচারকরা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে নিখিল বাবু ফ্রান্‌সিস সাহেবের যে পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন যে "This is a delicate subject and rather open to speculation than discussion." আমি এই মতে মত দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

নন্দকুমার সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে কপর্দ্দক শূন্য ছিলেন। তিনি দরবারে যাইতে হইলে ঋণ করিয়া পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিতেন। সিরাজদ্দৌলার চাকুরীও বেশী দিন করেন নাই। মীরজাফরের দেওয়ানীও বেশীদিন ভোগ করিতে পারেন নাই। তত্রাপি "রাজপাট জমিদারী" "বাঙ্গলার অধিকারী," "ঘোড়াডিঙ্গি," "ফোহারা তেহাঁস" "সোণর গুলতি বাস" ইত্যাদি কথা ও মৃত্যুকালে অগাধ সম্পত্তি, যাহা তাঁহার পুত্র গুরুদাসকে অর্পণ করা হয়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সদুপায়ে অর্জ্জন করা সম্ভব পর কিনা এবং হেষ্টিংস ও কাউন্‌সিল নন্দকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার পুত্রকে রীতিমত বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এই ছুইটী বিষয়ও বিচার্য্য। হেষ্টিংস ইচ্ছা করিলে নন্দকুমারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন তাহা করেন নাই ইহাও বিচার্য্য। সুপ্রসিদ্ধ বেভারিজ সাহেব তাঁহার History of Indiaয় চন্দননগর দুর্গ ইংরাজকর্ত্তৃক ফরাসীদের নিকট হইতে অধিকৃত হওয়ার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "Some assistance was also expected from Nuncoomar who was encamped with a body of troops in the vicinity: but Omichand had succeeded in bribing him not to interfere". (৩য় খণ্ড ৫৬৪ পৃষ্ঠা) এবং Roydurlav, the dewan advanced with a detachment within 20 miles of Hooghly and would have been in time to attempt the relief of Chandarnagore, had not Nuncoomar treacherously assured him on the contrary,

ভারত-মঙ্গল।

(১)

প্রতাপচন্দ্র আপনার শান্ত পল্লিকুটীরে যখন সুখের সংসার পাতিয়া বসিয়াছিলেন, অন্ধ আশা যখন তাঁহাকে শত মধুর বাণী শুনাইতেছিল, সেই সময়ে একদিন তাঁহার পত্নী, ছেলে এবং মেয়েটিকে স্বামীর কোলে রাখিয়া পরলোক যাত্রা করিলেন। প্রতাপচন্দ্রের গৃহের প্রদীপ, নয়নের আলোক নিভিয়া গেল। ছেলেটির বয়স তখন ছয় বৎসর, মেয়েটির ছুই।

পুরাতন ভৃ[illegible]আজি[illegible]ণীর ছেলেমেয়ে ছুটিকে বুকে করিয়া মানুষ করিতে লাগিল। মা ঠাকরুণ তাহাকে নিজের ছেলের মত দেখিতেন। এখন তিনি স্বর্গে চলিয়া গেছেন; তাঁর ছেলেমেয়েকে আজিম না দেখিলে কে দেখিবে ? চোখের জল মুছিয়া বৃদ্ধ আপন কর্ত্তব্য করিতে লাগিল।

সারাদিন আজিম দাদার কোলে ভাইবোনের এক রকম করিয়া কাটিত, সন্ধ্যাবেলায় আজিমের শত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইত। ছোট মেয়ে উমার সমস্ত দিনের মাতার অভাব সন্ধ্যাবেলায় জাগিয়া উঠিত। আজিম সমস্ত হৃদয় দিয়া সান্ত্বনা করিত, পিতা কোলে লইয়া বেড়াইতেন, বালক অমর শত প্রকারে আদর করিত, কিছুতেই উমার কান্না থামিত না।

অদূরে বায়ু পদ্মার বিশাল বক্ষে আঘাত করিয়া গভীর স্বর তুলিত। প্রতাপচন্দ্র তাহাতে আপনার অশান্ত হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেন। করযোড়ে রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিতেন—"প্রভু! প্রভু! সন্তানকে একি পরীক্ষা কর্‌ছ !" কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া উমা ঘুমাইয়া পড়িত।

পক্ষিণী শাবক ফেলিয়া অনন্ত আকাশে উড়িয়া গিয়াছে। শূন্যনীড়ে শাবক ছুটিকে রক্ষা করিবার ভার প্রতাপচন্দ্রের উপর। কেমন করিয়া এ ভার সুচারুরূপে বহন করিতে হইবে ? বক্ষের বিন্দু বিন্দু রক্ত দান করিলে এ কর্ত্তব্য পালন করা হইবে কি ? তাহা দান করা কত সহজ ! যে পক্ষিণী এমন করিয়া আপন সন্তানকে ফেলিয়া পলাইয়া গেল তাহার প্রাণ কেমন কঠিন ! শিশু হৃদয়ের অধীর আর্ত্তনাদে সে কেমন করিয়া স্থির হইয়া আছে ?

সময় বসিয়া থাকেনা। যে ঘটনার কল্পনাও এক সময়ে অসম্ভব ছিল, তাহাই ঘটে; তারপর যার অভাবে একদিন চক্ষের সমক্ষের সমস্ত আলোক একে একে নিভিয়া গিয়াছিল, দিন চলিবে না বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই দিনও চলিয়া যায়— স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায় !

প্রতাপচন্দ্রের দিন চলিয়া গেল। উমা এখন আর মায়ের জন্য কাঁদেনা, মাকে সে ভুলিয়া গিয়াছে। অমরের মার স্মৃতি ছাপার মত মনে পড়ে, প্রতাপের অশান্ত হৃদয় শান্ত হইয়াছে। তিনি পত্নীকে ভুলিয়া গিয়াছেন কি ? না। পত্নী আপনার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি উমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। আকৃতি ও প্রকৃতিতে উমা মার অনুরূপ হইয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

(২)

প্রতাপচন্দ্র এখন মিথিলার একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁর ছেলে মেয়ে দুটি আছে, সুতরাং সংসার আছে; কিন্তু সংসারের বন্ধন কিছুই নাই। সকল কর্ত্তব্য করেন, কিন্তু সব নির্লিপ্ত ভাবে। প্রস্তুত হইয়া আছেন ডাক পড়িলেই যাইবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ছেলেমেয়ে ছুটির কি হইবে ?—ভগবান ভাবিবেন। যতক্ষণ আছি কর্ত্তব্য করিব, তার পরের কথা ভাবিব কেন ? ঈশ্বর কি নাই ? এই চিন্তাও এখন আর প্রতাপকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না। তিনি আত্মজয়ী, সকল বন্ধনমুক্ত।

অমর ও উমা বড় হইয়াছে; তাহারা ছুইজনে কলিকাতায় পড়িতেছে। পিতা বাড়ীতে আছেন।

আর আজিম? আজিম চিরবিশ্বাসী ভৃত্য প্রতাপচন্দ্রের কাছে আছে।

বন্ধুবান্ধবহীন এই নির্জ্জন স্থানে প্রতাপচন্দ্রের একক জীবন কিরূপে কাটে?—একবার দেখিতে ইচ্ছা করে।

প্রাতে উঠিয়া প্রার্থনা করিয়া প্রতাপচন্দ্র স্নান করেন। স্নানান্তে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপাসনায় বসেন। উপাসনা হইতে উঠিয়া কিছুক্ষণ বাগানে বেড়ান; তাহার পর অধ্যয়নে মন দেন। দুপ্রহরে আহারান্তে অল্প বিশ্রাম করেন। বিশ্রামের পর আবার অধ্যয়নে বসেন। সারা দিনের প্রখর আলোটি যখন নিষ্প্রভ হইয়া আসে তখন প্রতাপ বেড়াইতে বাহির হন, এবার আর বাগানে নয়; নদীর তীরে, ধানের ক্ষেতে, চাষা, তাঁতী, নাপিতদের পর্ণকুটীরে।

সন্ধ্যা বেলায় বিরাটকায় বৃক্ষের নীচে প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রতাপচন্দ্রকে ধ্যান মগ্ন দেখা যায়। দিবা অবসানে শয্যায় যাইবার পূর্ব্বে তিনি একবার বাহিরে আসিয়া বসেন। এই সময়ে প্রতিদিন প্রতাপচন্দ্রের বহির্বাটী পাড়ার যত দীন দুঃখীতে পূর্ণ হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে এইখানেই রাত্রি কাটায়। কিছুক্ষণ ইহাদের সুখদুঃখ, অভাব অভিযোগ, চাষবাসের কথা শুনিয়া প্রতাপচন্দ্র ঈশ্বরকে প্রণামান্তর শয়ন করেন।

তাঁহার দিবারাত্রির মানবসঙ্গী একমাত্র আজিম। আর ছুটীর সময়ে অমর ও উমা আসিয়া তাঁহার নিস্তব্ধ তপোবনকে হাস্যমুখরিত করিয়া তোলে, তাঁহার উপাসনা, অধ্যয়ন আহার বিহারের সাথী হয়; তার পর ছুটী ফুরাইলে পশ্চাতে অপরিমিত নির্জ্জনতা ফেলিয়া চলিয়া যায়।

(৩)

একদিন কলিকাতার ছাত্রাবাসে অমরনাথ অপরিচিত হস্তের একখানি চিঠি পাইল। দুই তিনবার শিরোনামা পড়িয়া চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল। একি! একি লেখা! অমর কিছুই বুঝিতে পারিল না। বুঝাইয়া দিবার জন্য পাশের বন্ধুর হাতে চিঠিখানা দিল। বন্ধু পড়িয়া গম্ভীর ভাবে অমরের মুখের দিকে চাহিল। অমর বলিল—"বুঝিয়ে দাও; আমি কিছু বুঝতে পারছি না—পড়।" বন্ধু পড়িল। চিঠিতে অমরের পিতার মৃত্যু সংবাদ দিল। বিনা রোগে, বিনা ক্লেশে প্রতাপচন্দ্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। আজিম তিন চার মাইল দূর হইতে এক ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। ডাক্তার বাঙ্গালী। আসিয়া দেখিলেন মৃত্যু হইয়াছে। মৃতদেহের সৎকার করিয়া তিনি আজিমের কথামত অমরনাথকে চিঠি লিখিয়া দিয়া গেলেন। ছিল।

অমর মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। উমা বালিকা বিদ্যালয়ে। চিঠিখানা লইয়া সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিল।

অমরের কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই উমা চমকিয়া উঠিল। অমর যন্ত্রচালিতের ন্যায় চিঠিখানা উমার হাতে দিল। উমা পড়িল—তাহাতেই সব বুঝিল। ধীরে ধীরে চিঠিখানা সামনের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সে নতনেত্রে দাদার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল;—একবিন্দু অশ্রু পড়িল না, একটী কাতর বাণী তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না—শুধু নতনেত্রে নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এইরূপে সেদিন নীরবে একটিও কথা না কহিয়া ভাইবোনে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

উমা যখন বাহিরে আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। তখনই মেয়েদের উপাসনার ঘণ্টা পড়িল। উমা ধীরে ধীরে আসিয়া এক কোণে আপনার জায়গায় বসিল। যখন উপাসনা হইয়া গেল তখন সে উপরে যাইয়া আপনার ক্ষুদ্র শয্যার উপরে শুইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের 'কারাকাহিনী' আছে।

য় বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। ১১শ সংখ্যা।

সুপ্রভাত

"নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা
আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে
প্রাচীন রজনী নাশো
নূতন উষালোকে।"

শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি,এ সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৵০ টাকা।

আজ

ধনীর সুপ্রভাত ! গৃহীর সুপ্রভাত !

সৌখীনের সুপ্রভাত ! মহিলার সুপ্রভাত !

কারণ,

বঙ্গ-দেশের কারখানাজাত সাবানের মধ্যে

ন্যাশন্যাল সোপ

ছল।

অভিনব শিল্পজগতে অভাবনীয় যুগান্তর

ঘটাইয়াছে।

আকারে ও গন্ধের স্থায়িত্বে

ন্যাশন্যাল সোপ

বিলাতী সাবানকে পরাস্ত করিয়াছে !

মূল্যও যথাসম্ভব সস্তা করা হইয়াছে !!

তাই বলিতেছিলাম শিল্পজগতে আজ

সুপ্রভাত !

বাজারে সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য।

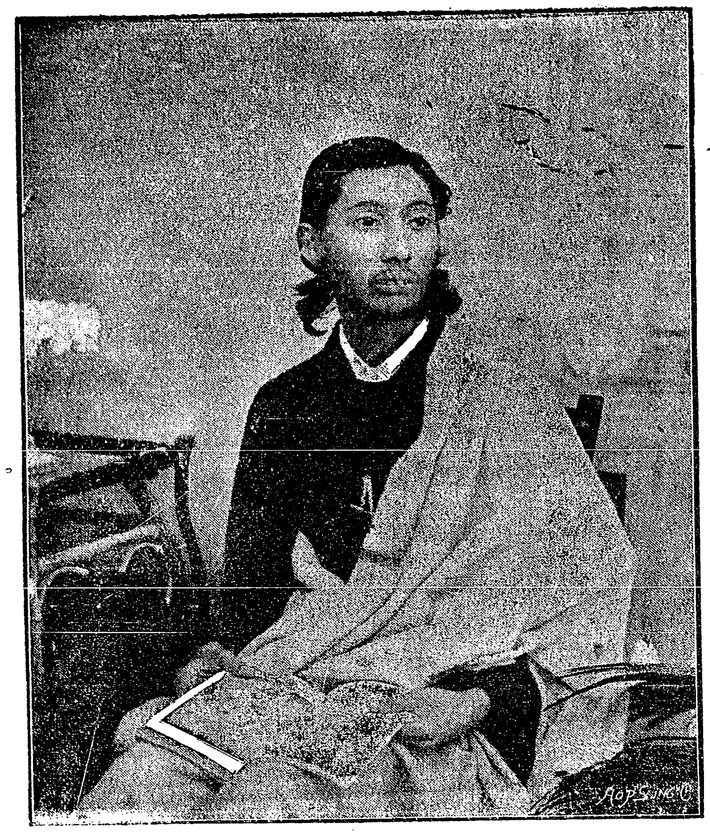

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

সুপ্রভাত

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর ;
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

দ্বিতীয় বর্ষ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

স্বাধীন।

১

কে আমারে হায়, বাঁধিবারে চায়
নিগড়ে,
জননী, আমি যে তনয় তোমারি!
কোন্ সে মানব ধরে সেই বল
কত রে,
জননী, সাধ যায় আজি নেহারি!

২

তরুণ রবিটী সোনার ছবিটী
আহা রে,
জননী, আসে যায় নিতি ভুবনে ;—
কে রাখে শকতি তার চির-গতি
বিহারে,
জননী, রোধিতে নয়ন-হেলনে!

৩

বায়ু বহে যায় বাসনা যেথায়
তাহারে,
জননী, কে পারে রাখিতে বাঁধিয়া,
নদীর প্রবাহ কে ফিরাবে হায়,
পাথারে,
জননী, যখন সে ছুটে নাচিয়া!

৪

অনল কেমনে রাখিবে গোপনে
যতনে,
জননী, বসনে কেবলি ঢাকিয়া;—
ভীষণ অশনি ফিরে কি অমনি
জীবনে,
জননী, কাহারে কখনো রাখিয়া!

৫

তেমতি কঠোর এ হৃদয় মোর,
তেমতি
জননী, স্বাধীন আমার প্রকৃতি!
কোন্ সে জগত পাগলের মত
আরতি
জননী, করিছে নাশিতে স্ব-রীতি

৬

তোমার তনয় কারে করে ভয়,
আশীষে
জননী, মরণে করেছ অমিয়া;
বিফলে কে সব করে কলরব
কালি সে
সুদূরে দাঁড়াবে নামিয়া।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

হিন্দু রাজার কর্ত্তব্য।

(মহাভারত হইতে গৃহীত।)

পাণ্ডুরাজ-নন্দন ধর্ম্মশীল ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র তনয় পাপবুদ্ধি পাপাত্মা দুর্য্যোধনের বিবিধ ছলনাজাল হইতে মুক্তি-লাভ করতঃ ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় ও সুমন্ত্রণায় এই রাজ্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষ সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। মহাবীর অর্জ্জুন যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত একযোগে বিখ্যাত খাণ্ডব নামক মহারণ্য দগ্ধ করিয়া ভগবান হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিলেন এবং সেই সময়ে খাণ্ডব বন নিবাসী ময়নামক দানব-রাজকে সপরিবারে রক্ষা করায় দানবপতি ময় অর্জ্জুনের নিতান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় উপকৃত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, "মহাবীর ধনঞ্জয়, আপনি ক্রোধান্বিত কৃষ্ণ এবং প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে সপরিবারে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনার প্রত্যুপকার করিব।" উদার-হৃদয় বীরশ্রেষ্ঠ সব্যসাচী কহিলেন, "হে মহাসুর, তোমার মঙ্গল হউক, তোমার যে আমি উপকার করিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমি পরম পুরস্কৃত হইয়াছি;—তুমি আমার প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকিও, আমিও তোমার প্রতি পরম প্রীত রহিলাম।" দানবপতি ময় অর্জ্জুনের এই বীরোচিত উদার বাক্য শ্রবণে অধিকতর আগ্রহের সহিত বলিলেন, "প্রভো, আপনি স্বীয় মহত্ত্বানুরূপ বাক্যই বলিয়াছেন, কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা যে প্রীতিপূর্ব্বক আপনার কিঞ্চিৎ উপকার করি। আমি দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা,—আপনি দয়া করিয়া আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার কিছু অবসর দিন; আমাকে হতাশ করিয়া ব্যথিত করিবেন না।" অর্জ্জুন বলিলেন, "হে কৃতজ্ঞ, তুমি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে অভিলাষ করিতেছ,—এই নিমিত্ত তোমার দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু তোমার এই ইচ্ছা ব্যর্থ হয় এবং তুমি তন্নিমিত্ত দুঃখিত হও, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।"

অর্জ্জুনের এবম্প্রকার আজ্ঞা পাইয়া দানবরাজ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "বাসুদেব, আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কোন্ প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব?" শ্রীকৃষ্ণ ময়-দানবের এইরূপ আগ্রহাতিশয় সন্দর্শনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে শিল্পকর্ম্মবিশারদ, যদি তুমি নিতান্তই আমার প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানে মানস করিয়াছ, তবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এরূপ এক সভা নির্ম্মাণ কর যে, মনুষ্যগণ উহাতে উপবেশন পূর্ব্বক ভাল করিয়া দেখিলেও যেন কদাচ তাহার অনুকরণ করিতে না পারে। দেব, অসুর ও মানব লোকে যেখানে যত উৎকৃষ্ট সভা আছে, তাহাদের প্রত্যেকের যাবতীয় গুণ যেন তব নির্ম্মিত সভাতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ধরাতলে ঐ সভা যেন সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত হয়।"

দানবপতি ময় শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিতচিত্তে সভার জন্য স্থান নির্ণয় করিয়া লইলেন এবং অত্যুৎকৃষ্ট উপকরণ সমূহ সংগ্রহ করতঃ ঐ সভা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অমানুষ শিল্প শক্তিসম্পন্ন দানবরাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক অলোকসামান্য সভা প্রস্তুত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজ ভ্রাতৃবর্গ এবং পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণকে পুরোভাগে লইয়া ঐ সভা সন্দর্শন করিলেন। ময়দানবের শিল্পচাতুর্য্য দেখিয়া

দর্শকবৃন্দ ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শিল্পিবর ঐ সভাস্থলে এক অপূর্ব্ব সরোবর প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ঐ সরোবরের সোপান সকল মণিনির্ম্মিত, জল অতি স্বচ্ছ, পঙ্কশূন্য এবং বিবিধ বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল শুক্তিশম্বুক ও মৎস্যসমূহে পরিপূর্ণ। নীলমণিপ্রভ মৃণালে পরিশোভিত নয়নাভিরাম পত্রদলে সমলঙ্কৃত দিব্য সৌরভ পূর্ণ সহস্র সহস্র শুভ্র শতদল-কমল কহ্লার জালে উহার অত্যদ্ভুত মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। হংস, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক্ প্রভৃতি জলবিহঙ্গমগণ তীরে ও নীরে বিচরণ করিয়া জনগণের নয়নের তৃপ্তি বিধান করিতে লাগিল। নানাবিধ বহুমূল্য রত্নজালে ঐ জলাশয়ের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছাদিত হইয়াছিল। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সরোবর-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াও সহসা উহাকে সরসী বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই; প্রত্যুত তাঁহারা অজ্ঞানতাবশতঃ উহার উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই সভার উভয় পার্শ্বে ফলপুষ্প-কিসলয়োপশোভিত সুশীতল নীলবর্ণ ছায়াসম্পন্ন মনোরম বহুবিধ উন্নত পাদপাবলী সন্নিবেশিত ছিল। ফলতঃ ময়দানব নির্ম্মিত সভা প্রকৃত পক্ষেই ভূতলে অতুলনীয় হইয়াছে বলিয়া সকলে শিল্পিবরের যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিলেন।

সভা নির্ম্মাণ কার্য্য যথা সময়ে সুসম্পন্ন হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সুন্দর সভা গৃহে প্রবেশ করতঃ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নানা দেশ হইতে সামন্ত রাজবর্গ আগমন করতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মান করিলেন। ভারতের প্রধান প্রধান ঋষিবৃন্দ তথায় আসিয়া ধর্ম্মরাজকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেবগুরু বৃহস্পতি অপেক্ষাও বিদ্বান্ নীতিনিপুণ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণার সহিত ভূমণ্ডলে অপ্রতিদ্বন্দ্বি বীরাগ্রগণ্য ভীমার্জ্জুনের বীর্য্য এবং যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মতেজঃ মিলিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে এক পবিত্র তেজোময় ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত করিল। ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যে ও যশে পরিপূরিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা অবলোকন করিয়া অসূয়াপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হইতে লাগিল।

মহাগুণসম্পন্ন ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ মহামতি যুধিষ্ঠির আদর্শ হিন্দু নরপতিরূপে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছেন, এমন সময় একদা দেবর্ষি নারদ তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন। দেশ প্রচলিত নানা উপকথায় এবং বাঙ্গালা কবিদিগের রচিত গ্রন্থসমূহে দেবর্ষি নারদের যে কুচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। কুমার ব্রহ্মচারী ব্রহ্মপুত্র নারদ ব্রহ্মতেজে তেজোময় মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি সমস্ত বেদ, উপনিষদ, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ সমুদয় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তাঁহার মত রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি পারদর্শী ব্যক্তি দৃষ্ট হইত না; তিনি মেধাবী, প্রমাণনিষ্ঠ কবি ও পুরাকল্প বিশেষজ্ঞ ছিলেন। যান, আসন, সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি রাজনীতির প্রত্যেক অঙ্গে তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন, ফলতঃ তাদৃশ কার্য্যকুশল ব্যক্তি অতীব বিরল ছিল। শিষ্যগণকে কিরূপ কৌশলে উপদেশ প্রদান করিলে তাহাদের জ্ঞান এবং ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়, তাহা তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। কি কঠোর যুদ্ধবিদ্যা, কি কোমল সঙ্গীত বিদ্যা অথবা কলা কৌশলময়ী শিল্পবিদ্যা, সর্ব্ব বিদ্যাতেই তাঁহার সমান অধিকার ছিল। সুরগুরু বৃহস্পতিও বাগ্মিতায় তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না;—অধিক কি দেবর্ষি নারদের মত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগুণোপেত তেজস্বী ব্যক্তি আর দ্বিতীয় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম ধর্ম্মশীল ব্রহ্ম-জ্ঞানবান দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভাস্থ হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা ধর্ম্মরাজের সন্তাষণ করিলেন। দেবর্ষিকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার অনুজগণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর বসিতে আসন

প্রদান করিয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন। মহর্ষি রাজার এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের বিনীত ব্যবহারে অতিশয় প্রসন্ন হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন এবং রাজা প্রজা সকলের মঙ্গল কামনায় রাজাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাচ্ছলে অতি মূল্যবান সদুপদেশ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আপনার বিষয় বিভব যেরূপ অতুল, চঞ্চলা কমলা অচলা হইয়া আপনার গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া কেবলমাত্র বিষয় চিন্তায় নিরত থাকিতে থাকিতে ধর্ম্ম চিন্তা ত ভুলিয়া যান না? অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে নৃপতিগণ কমলার প্রসাদ লাভ করতঃ বিষয়-বিষে এমন জর্জ্জর চিত্ত হয়, যে ধর্ম্মের কথা আর তাহাদের মনে স্থান পায় না। আসন্ন মৃত্যু মানব যেমন প্রাণপ্রদ ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া কুপথ্য ভোজনে আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করে, বিষয়মদমত্ত লোকের চিত্তও তদ্রূপ ধর্ম্মকথা ও ধর্ম্মানুশীলন পরিবর্জ্জন করিয়া বিবিধ ব্যসনে লিপ্ত হইয়া থাকে। আপনি যযাতি, পুরু প্রভৃতি প্রখ্যাতযশা পুণ্যশীল নরপতিদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যেমন যথারীতি সামঞ্জস্য সহকারে ধর্ম্ম অর্থ এবং কামের অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ত্রিবর্গের সেবা করিতেছেন ত? আপনি আপনার নিজ রাজ্যের ও চতুর্দ্দিকস্থ রাজ্যসমূহের বলাবল অনুসন্ধান করিয়াছেন ত? যে রাজা নিজের ও অপরের বলাবল প্রকৃত রূপে জানেন না, তিনি কেমন করিয়া অপরকে পরাভূত করিয়া নিজ শ্রী ও সম্পদের বৃদ্ধি করিতে পারিবেন? আপনার বিশাল রাজ্যের প্রত্যেক স্থানে কৃষিকার্য্যের প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারেন ত? কৃষকার্য্যই প্রজাগণের জীবিকার উপায়, কোন কারণে কৃষিকার্য্যে ব্যাঘাত হইলে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও প্রজাহানি হইয়া থাকে। তজ্জন্য কৃষককুলের রক্ষা সর্ব্বাগ্রে উচিত। বাণিজ্য রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির আর এক উৎকৃষ্ট উপায়, আপনার রাজ্যে সর্ব্ববিধ বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে ত? দুর্গ সংস্কার, সেতু সংস্কার, রাজপথ নির্ম্মাণ ও সংস্কার রীতিমত ভাবে সম্পাদিত হইতেছে ত? আয় ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্য্য এবং জনপদ সমূহের পর্য্যবেক্ষণ যথারীতি সুসম্পন্ন হইতেছে ত? আপনার সর্ব্ব প্রকার প্রজা ত সুখে বাস করিতেছে? তাহাদের মনে সন্তোষ এবং অকপট রাজভক্তি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে ত? প্রজার অসুখ হইলে তাহাদের মনে সন্তোষের হ্রাস হয় এবং অসন্তুষ্ট প্রজামণ্ডলীর রাজভক্তিও হীন হইয়া পড়ে। প্রজাদিগের রাজভক্তি রাজ্যের প্রধান শক্তি। পররাজ্যের গূঢ়চারী কপট দূত সকল আপনার বা আপনার অমাত্যগণের মন্ত্রণার বিষয় জানিতে পারে না ত? কে প্রকৃত শত্রু, কে প্রকৃত মিত্র এবং কে বাস্তবিক উদাসীন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া তাহাদের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন ত? অবসর বুঝিয়া যুদ্ধ অথবা সন্ধি স্থাপন করেন ত? নিজের মনোমত, বৃদ্ধ, সচ্চরিত্র, সৎকুলজাত, অনুরক্ত এবং নিপুণ ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া থাকেন ত? মন্ত্রণাই সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রধান হেতু। আপনার মন্ত্রিগণ সকলেই শাস্ত্রবিশারদ ও রাজ্যশাসনক্ষম বিচক্ষণ ব্যক্তি ত? আপনার রাজ্য ত এরূপ সুরক্ষিত আছে যে শত্রুপক্ষেরা আক্রমণে অথবা বিলুণ্ঠনে সমর্থ নহে? রাজ্যের দুর্গসমূহ, রাজপথসমূহ এবং সেতুসমূহ সুসংস্কৃত থাকিলে রাজ্য নিরাপদে থাকে। আপনি অতি নিদ্রার বশবর্ত্তী নহেন ত? রাত্রিকালে অর্থ চিন্তা করিয়া থাকেন ত? একাকী অথবা বহুজনে পরিবৃত হইয়া মন্ত্রণা কার্য্য করেন না ত? মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমের অধীন, একাকী মন্ত্রণা করিলে ভ্রমবশতঃ বিপদপাত হইতে পারে, আবার বহুজনের সমক্ষে যে মন্ত্রণা করা যায় তাহা প্রায়ই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এজন্য বিশ্বস্ত সুদক্ষ কতিপয় মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করা বিধেয়। তাহা হইলে মন্ত্রণা কদাপি জনপদ মধ্যে প্রচারিত হইতে পারে না। অল্প আয়াস ও অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইতে পারে অথচ যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের উপকার সাধিত হয়, এরূপ

কার্য্যে কদাপি আলস্য করিয়া বিঘ্নোৎপাদন করেন না ত? কৃষক সম্প্রদায় আপনার পরোক্ষে আপনার নিন্দা করে না ত? কারণ প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ ব্যবহার নিতান্তই সম্ভব। কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ধার্ম্মিক শাস্ত্রপারদর্শী বিচক্ষণ পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়া সেই কার্য্যের সকল দিক উত্তমরূপে পরীক্ষা করতঃ কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়া থাকেন ত? কুমারদিগের শিক্ষার নিমিত্ত যথোপযুক্ত গুরু নিয়োগ করিয়াছেন ত? শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে শাস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরপুরুষগণের নিকট শস্ত্রবিদ্যা এবং কলা কোবিদ্‌গণের নিকট শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করা বিধেয়। সহস্র মূর্খের দ্বারা যে উপকার না পাওয়া যায়, একজন পণ্ডিতের নিকট ততোধিক উপকার পাওয়া গিয়া থাকে। আপনি যথাযুক্ত ধন ও সম্মান দ্বারা পণ্ডিতদিগের আদর সৎকার করেন ত? আপনার রাজ্যস্থ দুর্গসমূহে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য, জল এবং ব্যবহার্য্য অন্যান্য দ্রব্য সঞ্চিত আছে ত? অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির অভাব নাই ত? শিল্পিগণ এবং যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ যোদ্ধৃবর্গ তথায় সর্ব্বদা সতর্কতা সহকারে কালযাপন করিতেছে ত? আপনার সুদক্ষ চরগণ বিপক্ষ পক্ষীয় রাজগণের রন্ধ্রসমূহ অবগত হইয়া সর্ব্বদা সেই সকল সংবাদ আপনার নিকট প্রেরণ করে ত? বিপক্ষদিগের অজ্ঞাতসারে এই কার্য্য সম্পাদিত হয় ত? বিনয়সম্পন্ন, অসূয়াবিহীন, সৎকুলজাত শ্রুতিস্মৃতিনিপুণ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ত? বিধিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, সরল ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকে হোমকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ত? আপনার জ্যোতির্ব্বিদগণ নিজ অধীত শাস্ত্রে নিপুণ, সর্ব্বপ্রকার উৎপাত গণনায় দক্ষ ত? যেরূপ কার্য্যে যেরূপ লোক আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপ বুঝিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন ত? আপনার মন্ত্রিবর্গ আপনাকে অকপট হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি করে ত? মহাকুলপ্রসূত, শৌর্য্যবীর্য্য গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন, কার্য্যদক্ষ ও প্রভুপরায়ণ সুযোগ্য ব্যক্তিকেই ত সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন? সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ, প্রবল পরাক্রান্ত, সচ্চরিত্র, সাহসী সৈনিক পুরুষদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন ত? নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগের প্রাপ্য বেতন দিতে কখনও ত্রুটি হয় না ত? তাহা হইলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট ঘটনা এবং বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে। সৎকুলজাত প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক ত আপনার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে? তাহারা ত আপনার নিমিত্তে রণক্ষেত্রে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে? সমস্ত রণকার্য্য নির্ব্বাহার্থ একজন মাত্র হঠকারী অবিবেকী এবং যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন নাই ত? যদি কোন ব্যক্তি তাহার নিজ প্রাণ বিপন্ন করিয়া আপনার কোন কার্য্য উদ্ধার করিয়া দেয়, সে ত আপনার নিকটে সম্যক্ পুরস্কৃত এবং সমধিক সম্মানিত হইয়া থাকে? জ্ঞানালোকসম্পন্ন কৃতবিদ্য অতি বিনীত গুণবান্ ব্যক্তিদিগকে ত যথোচিত ধন দান দ্বারা আদর করা হয়? মহারাজ, যাহারা কেবল আপনার উপকার করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত অথবা হস্তপদাদি অঙ্গবিহীন হইয়া যাবজ্জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গকে এবং বিকলাঙ্গ হতভাগ্যদিগকে যথারীতি ভরণ পোষণ করিতেছেন ত? ক্ষীণবল বা যুদ্ধে পরাজিত শত্রু ভীত হইয়া আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করিলে পুত্রবৎ স্নেহে তাহাকে রক্ষা করেন ত? শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া নিজ সৈন্যবল এবং অর্থবল বুঝিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকেন ত? পিতা মাতা যেমন সমুদয় সন্তানকে সমান প্রীতি করিয়া থাকেন, তেমনি আপনিও ত রাজ্যের যাবতীয় প্রজাকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন? প্রচণ্ড এবং নির্দ্দয় দণ্ড বিধান করিয়া প্রজাবর্গকে ত অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া থাকেন না? রণনিপুণ সৈন্যগণের ব্যবসায় ও জয়লাভ সামর্থ্য বুঝিয়া তাহাদিগকে অগ্রিম বেতন প্রদান করিয়া থাকেন ত? শত্রু পক্ষের মধ্যে পরস্পর ভেদ সাধন নিমিত্ত তাহাদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে যথাসময়ে ধনাদি উপহার প্রদান পূর্ব্বক

তাহাদিগকে বশীভূত রাখা হয় ত? স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া ইন্দ্রিয়মত্ত শত্রুগণকে আক্রমণের সুবিধা কদাপি পরিত্যাগ করেন না ত? যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে সাম দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ নীতি প্রয়োগ দ্বারা কার্য্য সকল করিবার চেষ্টা করা হয় ত? পররাজ্য আক্রমণ করিবার সময়ে নিজ অধিকার সুদৃঢ় ভাবে রক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হয় ত? বিপক্ষ রাজগণকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ত? আপনার সমস্ত কর্ম্মচারী আপনার পরম অনুগত আছে ত? যে সকল পাচক ভৃত্যাদি আপনার খাদ্য, গাত্র মার্জ্জনের বস্ত্র এবং পরিধেয় প্রস্তুত ও রক্ষা করিয়া থাকে তাহারা আপনার পরম বিশ্বস্ত ত? আপনার অনুরক্ত কর্ম্মচারিগণ ত ধান্যাগার, ধনভাণ্ডার, হস্তী-অশ্ব-রথাদিবাহনসমূহ, আয়ুধাগার নিয়মিত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে? আপনি আপনার প্রজা এবং ভৃত্যাদি অধীন লোককে তাহাদের বিপদের বিপদের সময় যথাবিধি রক্ষা করিয়া থাকেন ত? আপনার আয়ের এক নিয়মিত অল্পাংশ দ্বারা আপনার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হয় ত? যে ব্যক্তি অপরিমিত ব্যয় করে, তাহার বিনাশ নিকটস্থ। বৃদ্ধ লোক, জ্ঞাতিবর্গ, গুরুজন, বণিক, শিল্পী, আশ্রিত, দীন দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে ধনধান্যাদি প্রদান দ্বারা ত অনুগ্রহ করিয়া থাকেন? আয় ব্যয় গণনায় সুদক্ষ ব্যক্তিবর্গ আপনার রাজ্যের আয় ব্যয় সকল পূর্ব্বাহ্ণেই ঠিক করিয়া রাখে ত? এরূপ পূর্ব্বাহ্ণে ভবিষ্যৎ আয় ব্যয়ের হিসাব ঠিক না করিলে আয় ও ব্যয় বিভাগে নানা বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। সুদক্ষ এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ বিনা দোষে ও অবিচারে ত কর্ম্মচ্যুত হয় না? যাহার যেরূপ শক্তি, তাহাকে তদ্রূপ কার্য্যে নিয়োগ করা হয় ত? চোর, ডাকাত, শঠ প্রভৃতি দুরাচার ব্যক্তিগণ নিরীহ প্রজাদিগের উপরে অত্যাচার করিতে সক্ষম হয় না ত? রাজপুত্রগণ, রাজমহিষীগণ অথবা আপনি কি আপনার ভ্রাতৃগণ যথেচ্ছাচার করতঃ প্রজাদিগের পীড়া উৎপাদন করেন না ত? রাজ্যের কৃষককুল সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে ত? তাহাদিগের কৃষিকার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত রাজ্যের স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ তড়াগাদি জলাশয় সকল নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন ত? জলের জন্য কৃষকগণকে আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না ত? তাহাদিগের গৃহে অন্ন অথবা বীজাদির অভাব নাই ত? আবশ্যক হইলে বিনা সুদে অথবা অল্প সুদে তাহাদিগকে ধান্যাদি ধার দেওয়া হয় ত? জনপদের প্রাজ্ঞ এবং বীরপুরুষগণ আপনার প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া আপনার মঙ্গল চিন্তা করিতেছে ত? নগরাদির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পল্লীগ্রামগুলি নগরের ন্যায় এবং অতি অপরিষ্কৃত গোয়ালাপাড়া গুলি পল্লীগ্রামের মত পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবার সুব্যবস্থা আছে ত? রাজ্যের নগর সমুদয় আপনার একান্ত বশীভূত রহিয়াছে ত? রাজ্যের কোন স্থানে পর্ব্বত অরণ্যাদি আশ্রয় করিয়া দলবদ্ধ দস্যুদল প্রজাপুঞ্জের অহিতসাধন করিতেছে না ত? অন্তঃপুরের মহিলাদিগের সৎশিক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার যোগ্য পাত্রে অর্পিত হইয়াছে ত? যে সে স্ত্রীলোকের নিকট রাজ্যের কোন গোপনীয় কথা প্রকাশ করা হয় না ত? কোন বিপদ আপতিত হইলে তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায় না করিয়া সুখ ভোগে মত্ত হইয়া পড়েন না ত? রাত্রির দুই প্রহর নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া শেষ প্রহরে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ত? যথা সময়ে বেশভূষা পরিধান করতঃ প্রবীণ ও সুদক্ষ অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাগণকে দর্শন দিয়া থাকেন ত? দেহরক্ষক বিশ্বস্ত সৈন্যবৃন্দ সর্ব্বদা অস্ত্রপাণি হইয়া আপনার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে ত? কে প্রিয়, কে অপ্রিয়, কে সাধু, কে অসাধু তাহার যথোচিত বিচার করিয়া তদনুসারে ব্যবহার করিয়া থাকেন ত? শারীরিক পীড়া হইলে সুবিজ্ঞ বৈদ্যদিগের পরামর্শানুযায়ী ঔষধ এবং পথ্য সেবন করিয়া থাকেন ত? মানসিক পীড়ায় সাধু প্রকৃতি বৃদ্ধদিগের নিকট সৎপরামর্শ গ্রহণ করিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন ত? আপনার বৈদ্যগণ চিকিৎসা শাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শী,

ঔষধাদি প্রয়োগচতুর এবং বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত আছেন ত? বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের অভিযোগ শ্রবণ কালে আপনি সর্ব্ব প্রকার লোভ, মোহ এবং পক্ষপাত রহিত হইয়া তাহাদের বিচার করিয়া থাকেন ত? লোভ মোহ বা প্রণয়ের বশীভূত হইয়া কাহারও বৃত্তিরোধ করেন না ত? আপনার পৌর ও জানপদবর্গ বিপক্ষের নিকট হইতে গোপনে ধন গ্রহণ করিয়া আপনার অনিষ্ট চেষ্টা ত করিতেছে না? দুর্ব্বল শত্রুকে বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক সাতিশয় পীড়িত করিতেছেন না ত? প্রধান প্রধান সামন্ত রাজগণ আপনার প্রতি অনুরক্ত আছেন ত? তাঁহারা আবশ্যক হইলে আপনার জন্য স্ব স্ব প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত আছেন ত? আপনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং সজ্জনগণের সমাদর করিয়া থাকেন ত? শোক মোহ অথবা লোভে আপনার ত বুদ্ধিভ্রংশ হয় না? বিনা দোষে কাহারও দণ্ড হয় না ত? অপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না ত? নাস্তিকতা, মিথ্যা, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরর্থক চিন্তা, অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার প্রচার, মঙ্গল কার্য্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি রাজদোষ সকল ত আপনি পরিত্যাগ করিয়াছেন? এই সকল দোষ বদ্ধমূল রাজ্যেরও ধ্বংসসাধন করে। আপনার বেদাধ্যয়ন ধনোপার্জ্জন এবং বিদ্যা শিক্ষার ত ফললাভ হইয়াছে?

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উল্লিখিত প্রশ্ন পরম্পরা দ্বারা যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা শুনিয়া মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম ও অভিবাদন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, "হে তপোধন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব। আপনার উপদেশে আমার প্রভূত উপকার হইল। আপনার ন্যায় অগাধ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের সদয় উপদেশ না পাইলে আমাদের মত সাধারণ লোকের দ্বারা রাজ্যপালনরূপ দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব। আপনি যে ন্যায়ানুগত রাজধর্ম্মের বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন, আমি সাধ্যানুসারে তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি। পূর্ব্বকালে পুণ্যশ্লোক নরপতিবৃন্দ যে সকল সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহাদেরই অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আমার অসামর্থ্যপ্রযুক্ত তাহাতে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারি না।" দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজের এই বিনয়গর্ভ বচন শুনিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ, আপনি প্রবল শক্তিসম্পন্ন, অদ্বিতীয় কর্ম্মকুশল এবং ধার্ম্মিক চূড়ামণি; কৃষ্ণের নীতি, ভীমের বল, অর্জ্জুনের শৌর্য্য এবং আপনার ধর্ম্ম আপনার রাজ্যের চারিটি দৃঢ় স্তম্ভ। আপনি যে কুরুবংশের অলঙ্কার স্বরূপ আদর্শ নরপতি হইয়া পৃথিবী পালন করিবেন তাহার আশ্চর্য্য কি? আপনি আপনার এই পুণ্যময় কর্ম্মফলে ইহলোকে অপ্রতিম ঐশ্বর্য্য ভোগ করতঃ পরলোকে স্বাশ্বত সুখের অধিকারী হইবেন সন্দেহ নাই।"

দেবর্ষি নারদের প্রশ্নে আদর্শ হিন্দু নরপতির কর্ত্তব্যের বিষয় অতি সংক্ষেপে অথচ আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত কথিত হইয়াছে। সেই অতি প্রাচীনকালে ভারতে রাজা প্রজার সম্বন্ধ কেমন সরল ও মধুর ছিল, রাজগণ প্রজারঞ্জনকেই কিরূপ সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহার সুন্দর পরিচয় এই প্রস্তাব হইতে পাওয়া যায়। অপর দিকে রাজ্য শাসন প্রণালী কিরূপ উন্নত ছিল, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা কতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আক্ষেপের বিষয়, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের ঈর্ষ্যা ও অভিমানে এ হেন উন্নত সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল! আত্মকলহেই ভারতের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হইল।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রতিকার উপায়।

কি করিলে আমাদের দেশের অবস্থা ভাল হয়, এ প্রশ্নটি আমার সদাই মনে আসে। প্রশ্নটি মনে উঠিয়াছে অনেক দিন হইতে, কিন্তু সম্প্রতি ইউরোপে কিছুদিন থাকিয়া ও সেখানকার সব উন্নতিশীল লোকদের অবস্থা দেখিয়া এ বিষয়ে আমার প্রায়ই ভাবনা আসে। কোনও লোকের ভিতরে রোগের বীজ থাকিলে সে যেমন দিন দিন শুখাইয়া যায়—আর তার অবস্থা দিন দিন পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আর তার রক্ষা নাই, কেবল দিন গণা মাত্র, আমাদের দেশেরও ক্রমেই ক্ষীণ অবস্থা দেখিলে ঠিক সেই কথাই মনে আসে।

আমাদের দেশের লোকের ধন ক্রমেই কমিতেছে, তাই এত দুর্ভিক্ষ। দেশের লোকের স্বাস্থ্য দিন দিনই খারাপ হইয়া যাইতেছে—তাই এত রোগ ও অকাল মৃত্যু। কৃতবিৎ লোকেরা অল্প বয়সেই মারা যান। ছেলেরা স্কুলে পড়িতে পড়িতেই রোগগ্রস্ত হয় ও অনেকে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। শিশু বয়সে এত মৃত্যু কোথাও নাই। তিনটির ভিতর একটি মারা যায়।

আর ইহার ফলে কি দাঁড়াইতেছে—দিন দিন আমাদের দেশের লোক সংখ্যার বৃদ্ধি ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ৩০ বৎসর আগে যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল হাজারে ২৩ জন, আজ ত্রিশ বছর পরে তার অপেক্ষা কমিয়া গিয়া তার তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ হাজারে ৭ জন মাত্র হইয়াছে। আর প্রতি জনের বাৎসরিক আয় ১০ বৎসর আগে যত ছিল, তাহা অপেক্ষা কমিয়াছে। তালিকাটি নিম্নে দিতেছি।

ভারতে হাজার করা।

১৮৮২	২৩ জন বৃদ্ধি।
১৮২৯	৭ „ „
১৯০২	৫ জন মাত্র।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, আমাদের দেশের কি কি প্রকার চেষ্টা বেশী হইয়াছে। বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখিলে জানা যায়, নানা রকমের রোগ আসিয়া আমাদের ঘেরিয়াছে। যথা—

১। দারিদ্র্য রোগ।
২। সামাজিক ব্যাধি।
৩। অশেষ প্রকার সংক্রামক ব্যাধি।

দারিদ্র্য রোগের দ্বারা লোকে দুর্ভিক্ষ অনশনে বা অর্দ্ধাশনে মারা যায়। দিন দিনই এই রোগের প্রকোপ আমাদের দেশে বাড়িতেছে। ধন উপার্জ্জনে বিশেষ পটু এমন অনেক বিদেশীয় জাতি আসিয়া আমাদের দেশ হইতে ব্যবসায় বাণিজ্যে অনেক অর্থ উপায় করিয়া তাহা দেশ হইতে বাহিরে লইয়া যাইতেছেন। আর আমরা সে সব বিষয় এখনও ভাল করিয়া দেখি নাই, বুঝি নাই, ভাবি নাই। এ দেশের মানুষদের বুদ্ধি আছে বটে দেশে এখনও কতক টাকাও আটক আছে, কেবল লোকের এখনও সুবুদ্ধি হয় নাই। টাকা এবং লোক উভয়ই চাই বটে, তবে টাকা অপেক্ষাও লোকের আবশ্যক। এখানকার লোকে টাকা নিজ নিজ হাতে সচ্ছল থাকিলেও ব্যবসা বাণিজ্যে ফেলে না। ধনী লোকদের অধিকাংশ টাকাই জমিদারীতে ন্যস্ত। তাতে আয়াস বিনাও অনেক লাভ হয়। তাই অন্য অনেক লাভবান ও অনেক আয়াসসাধ্য কাজ, যথা ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে টাকা ফেলে না। এ সব টাকা আমাদেরই ঘরের টাকা, একজন অন্যের কাছ হইতে লয় মাত্র। ব্যবসা বাণিজ্যেতে কিন্তু তা অপেক্ষাও দেশের অনেক টাকা বাড়ে।

সামাজিক ব্যাধি—সেইটিই বিষম ও দারুণ। তাহা হইতেই আমাদের এত বেশী দুর্দ্দশা হইতেছে। বহুকালের পুরাতন সে সকল ক্ষতিকর আচার ব্যবহারে আমাদের অন্তর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে! তার ভিতরে প্রধান কতকগুলির নাম করি।

বাল্য বিবাহে অত্যন্ত জাতীয় দুর্ব্বলতা আসিয়াছে। চির বৈধব্য নিয়মে লোক সংখ্যা বড়ই কমিয়া যাইতেছে। ছেলে হইবার বয়সে চার ভাগের এক ভাগ রমণী বিধবা বলিয়া তাহাদের দ্বারা আর সমাজের লোক বৃদ্ধি হয় না। এইরূপ নিষ্ঠুর চির বৈধব্যই যে লোক না বাড়িবার অন্যতম একটি কারণ তা বেশ বুঝা যায়। কারণ ভারতবর্ষে মুসলমানগণ যে কত শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতেছে তা দেখিলেই বুঝা যায়। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু হইতে তারা সংখ্যায় প্রায় এক চতুর্থাংশ মিলিয়ন কম ছিল। এখন তারা অত পরিমাণে বেশী। তার ফলে পরে এই দাঁড়াইবে যে, হিন্দু হইতে মুসলমান সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া পরে সংখ্যায় অধিক হইয়া পড়িবে। লোকের দেহ, মনের বল ও জাতীয় জীবনের শক্তি নষ্ট করিতে আমাদের সামাজিক প্রথার মত আর কোনও কারণ পারে না।

জাতিভেদের দরুণ একতা নাই। একজন একজনকে যদি ওরূপ ভাবে ঘৃণা করে—মিলন কখনও কি হইতে পারে?

সমুদ্র যাত্রা বাধা ছিল বলিয়া লোকে এত শতাব্দি ধরিয়া বিদেশে বাহিরে যাইতে পারে নাই, তাই চোখও খুলে নাই। লোকের দেখিয়া শিখিবার মতি হয় নাই ও চেষ্টাও আসে নাই।

তা ছাড়া আমাদের জলবায়ুর দোষেও অনেকটা হইয়াছে। গরম ও ভিজে স্যাঁৎসেঁতে দেশের লোকের স্বাস্থ্য সহজেই খারাপ হয়। আমাদের কলিকাতা সমুদ্র হইতে ১২ হাত মাত্র উঁচু। কলিকাতায় ৫ হাত মাটির নীচের জল পাওয়া যায়। যেমন ঘর বাড়ীতে লোণা ধরে, মানুষের শরীরেও ঐরূপ উৎপাত হয়। তাই দেহ এমন দুর্ব্বল, মন এমন অস্বাভাবিক ও উৎসাহ ও আনন্দহীন। অধিকাংশ লোকেই অকালে শরীর মন ভাঙ্গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। শিক্ষিত লোকেরা ত্রিশ হইতে চল্লিশের ভিতরই স্বাস্থ্য ভঙ্গের আভাস পান। অধিকাংশ লোকের মন্দাগ্নি, বহুমূত্র ও যক্ষ্মা ঐ বয়সেই হয়।

আর তা ছাড়া আমাদের শাসনকর্ত্তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে এত বেশী ঝোঁক যে আমাদের দেশের লোকের স্বাস্থ্যহানিকর কত কাজ ঐ খাতিরে করিতে তাঁহারা কিছুই কুণ্ঠিত হন নাই। চারিদিকে যে সব রেল চালাইয়াছেন, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে সাঁকো না থাকায় রেল রাস্তায় এ পারের জল ও পারে ভালরূপে যাইতে না পারায় সে স্থানের মাটি সর্ব্বদাই ভিজা থাকে। তাই এই সকল স্থানে অনেক জায়গায় রেল যাওয়ার পর হইতেই ম্যালেরিয়ার এত প্রাদুর্ভাব। এ দেশে যত লোক মরে তার অর্দ্ধেক ঐ রোগে। তাতে শুধু লোক সংখ্যা কমে না, জাতিটিও ভুগিয়া ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়া যায়। তা ছাড়া পাট পচানতে সে সব দেশের জল কত দূষিত হইয়াছে। ঐ সকল দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিসূচিকা হয়। এই কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দুই ধারের গঙ্গাতীর দেখ না। কতগুলি মিল বা কল কারখানা হইয়াছে। তাদের সবগুলির আবর্জ্জনা গঙ্গা জলে ফেলা হয়। তাতে সে জল কত দূষিত হয়। আমাদের দেশে গঙ্গাধারে এখনও কত লোক ঐ জল খান ও তাতে নিত্য স্নান করেন। তাঁদের তাতে স্বাস্থ্যের কত ক্ষতি হয়। কিন্তু প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার তা শুনেন না।

এ সকল অসুবিধা থাকতেও আমরা নিজেদের ভালোর জন্য যতটা চেষ্টা করতে পারি—তাও করি না। সমাজের অনেকগুলি ব্যাধির প্রতিকার করা আমাদের হাতেই আছে, তাতে আমাদের চেষ্টা নাই। এমন বিজ্ঞ ব্যক্তিও দেখা যায়, যাঁর কাছ হইতে স্পষ্ট কথা শুনিবে যে, তাঁর বিশ্বাস ও সকলে কিছু আসে যায় না। অনেক দিন কাজ না করিলে যেমন কাজে আলস্য বাড়ে, আমাদের ঘুমের ঘোরও সেইরূপ।

সমাজ সংস্করণে প্রধান এই কয়টি অচিরে দরকার—রমণী জাতির উন্নতি। তাঁহাদের উপর শত শত বৎসর ধরিয়া অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াই আমাদের এত দুঃখ ও অধঃপতন। অতি বর্ব্বর জাতিদের ভিতরও এরূপ নৃশংস ব্যবহার দেখা যায় না। তাঁদের জন্ম হইতে মৃত্যুর দিন অবধি—বাল্যবিবাহ, চির বৈধব্য, অশিক্ষা ও অবরোধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়া কতই যন্ত্রণা দিই। যিনি কেবল শুধু শারীরিক দুর্ব্বলতা হইতে না দেখিয়া ভাল করিয়া সকল অবস্থা বিচার করেন, তিনিই বুঝিবেন যে, রমণী জাতির অবস্থার উপরই সমাজের অবস্থা উঠে নামে। মনোবিজ্ঞানে ও সমাজ বিজ্ঞানে জানা যায় যে, মনুষ্যের মনে ও সমাজেই তার অনিবার্য্য কারণ আছে। প্রকৃত পক্ষে মাতাই ছেলের শিক্ষাদাত্রী। ছেলে লইয়াই ভবিষ্যতে দেশের অবস্থা ফিরে। তাই দেশের রমণীদের উপরই দেশের ভাগ্যচক্র ন্যস্ত আছে। একা থাকিলে আমি বার বার এই মধুর কবিতাটি আবৃত্তি করি;

—"তোরা না জাগিলে ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

অন্তরের ভিতর হইতে সে বিশ্বাসের উৎস আমার আপনা হইতেই উঠে।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

কিসা গোতমী ও বুদ্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একদিন তিনি যেমন পশ্চিম দ্বার দ্বারা উদ্যানে যাইতেছিলেন, একটী মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কিং সারথে পুরুষো মঞ্চোপরি গৃহীতঃ
উদ্ধৃত কেশনখ পাংশু শিরে ক্ষিপন্তি।
পরিচারয়িত্ব বিহরন্তবস্তাড়য়ন্তঃ
নানা বিলাপ বচনানি উদীরয়ন্ত।

হে সারথে! এই লোকটীকে মঞ্চের উপর লইয়া যাইতেছে কেন? লোকে কেশ ও নখ কাঁপাইতেছে ও মাথায় ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছে কেন? কেনই বা ঐ সকল লোক বক্ষ চাপড়াইতেছে এবং নানা প্রকার বিলাপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে?

সারথি উত্তর করিল—

এষোহি দেব পুরু যা মৃত্যু জম্বুদ্বীপে
নহি ভূয় মাতৃ পিতৃ দ্রক্ষ্যতি পুত্রদারাম্
অপহায় ভোগ গৃহ মাতৃ পিতৃ মিত্র জ্ঞাতি সংঘং
পরলোক প্রাপ্তু ন হি দ্রক্ষ্যতি ভূয় জ্ঞাতিম্।

হে দেব! ইহার জম্বুদ্বীপে মৃত্যু হইয়াছে। পুনরায় এ ব্যক্তি পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রকে দেখিতে পাইবে না। গৃহ পিতা মাতা বন্ধু আত্মীয়স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করিয়া এ ব্যক্তি পরলোকে গমন করিতেছে। আত্মীয়স্বজনকে এ ব্যক্তি আর দেখিতে পাইবে না।

তখন সিদ্ধার্থ কহিলেন—

ধিক্ যৌবনেন জরয়া সমভিশ্রুতেন
আরোগ্য ধিক্ বিবিধ ব্যাধি পরাহতেন।
ধিক্ জীবিতেন পুরুষঃ ন চিরস্থিতেন
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতি-প্রসঙ্গেঃ॥
যদি জর ন ভরেয়া নৈব ব্যাধির্ণ মৃত্যুঃ
তথাপি চ নহা দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিং পুন জরব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবন্ধাঃ
সাধু প্রতিনিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোযম্॥

যৌবনকে ধিক্ যাহার পশ্চাতে জরা অতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছে। আর আরোগ্যকেও ধিক্ যাহা নানা প্রকার ব্যাধি দ্বারা সর্ব্বদাই পরাহত হইতেছে। জীবন ধারণেও ধিক্ কারণ লোক চিরস্থায়ী নহে। আমোদ প্রমোদে মত্ত পণ্ডিতজনকে ধিক্। যদি সংসারে জরা ব্যাধি মৃত্যু না ও থাকিত তাহা হইলেও মানুষকে পঞ্চস্কন্ধ ধারণ করিয়া মহা

দুঃখ ভোগ করিতে হইত। জরা ব্যাধি মৃত্যু আমাদের নিত্য সহচর। রথ ফিরাও, আমি ইহার মুক্তির উপায় চিন্তা করিব।

এ দিনও তাঁহার প্রমোদোদ্যানে যাওয়া হইল না।

পরিশেষে একদিন উত্তর দ্বার দ্বারা প্রমোদোদ্যানে যাইবার সময় তিনি একজন মুণ্ডিত মস্তক কষায় বস্ত্র পরিহিত ধর্ম্মব্রত বৃদ্ধ ভিক্ষুককে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শান্তিতে পূর্ণ, গম্ভীর ও উজ্জ্বল। ইহাকে দেখিয়া তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিং সারথে পুরুষ শান্ত প্রশান্তচিত্তঃ
নোৎক্ষিপ্ত চক্ষু ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী
কাষায় বস্ত্রবসনো সুপ্রশান্তচারী
পাত্রং গৃহীত্ব নচ উদ্ধত উন্নতঃ বা।

হে সারথি! এই শান্তশীল, প্রশান্তচিত্ত স্থির নেত্র, কাষায় বস্ত্র পরিহিত এ ব্যক্তি কে? ইনি উদ্ধতও নন, অবনতও নন, ভিক্ষা পাত্র হস্তে ধারণ করিয়া ধীর স্থিরভাবে বিচরণ করিতেছেন ও অন্তকালের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন; ইনি কে?

সারথি উত্তর করিল—

এষোহি দেব পুরুষ ইতি ভিক্ষুনামা
অপহায় কামতয়ঃ সুবিনীতচারী
প্রব্রজ্য প্রাপ্তঃ সমমাত্মন এষমাণো
সংরাগ দ্বেষ বিগতে তিষ্ঠতি পিণ্ডচর্য্যা।

হে দেব, এই ব্যক্তি একজন ভিক্ষু। ইনি কামনা বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া বিনীত আচার অবলম্বন করিয়াছেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া আত্মার শান্তির অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন। ইনি রাগদ্বেষ শূন্য হইয়া যৎসামান্য আহার সংগ্রহ করিতেছেন।

সারথির কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থের মন গলিয়া গেল, তিনি পুনঃ পুনঃ ভিক্ষুককে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিয়া উঠিলেন—

সাধু সুভাষিত মিদং মম রোচতে চ
প্রব্রজ্য নাম বিদুভিঃ সততং প্রশস্তা।
হিতমাত্মনশ্চ পর সত্ত্বহিতঞ্চ যত্র
সুখ জীবিতং সমধুরমমৃতং ফলঞ্চ॥

হে সারথি! তুমি যাহা বলিলে তাহা অতি মিষ্ট ও সুন্দর। ইহাতে আমার মন আকৃষ্ট হইতেছে; জ্ঞানীগণ সর্ব্বদাই প্রব্রজ্যার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহা অবলম্বন করিলে মানুষ নিজের ও পরের হিতসাধন করিয়া সুখে জীবন যাপন করিতে পারে। সুমধুর অমৃত লাভ ইহার ফল।

এ দিন তিনি আর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না, প্রমোদোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, জ্ঞানীগণ প্রব্রজ্যার সর্ব্বদাই প্রশংসা করিয়া থাকেন; ইহাতে আত্মহিত ও পরহিত দুই সাধন করিয়া মানুষ সুমধুর অমৃত ফল লাভ করিয়া থাকে।

সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস গ্রহণের চিন্তা করিতে করিতে প্রমোদোদ্যানে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে তিনি আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলেন! নর্ত্তকী ও গায়িকার সুমধুর নৃত্য গীতাদিতে তিনি সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। দিবাবসানে অনুচর সহচর পরিবৃত হইয়া তিনি শকটারোহণে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এমন সময়ে যুবরাণী যশোধরা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। রাজা শুদ্ধোধন আনন্দে অধীর হইয়া পুত্রকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সিদ্ধার্থ শুনিয়া বলিলেন, "রাহুল! আবার নূতন বন্ধন!" রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পৌত্রের "রাহুল" নামকরণ করিলেন।

সিদ্ধার্থ যখন নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন পরম রূপবতী রাজবংশোদ্ভবা কিসা * গোতমী তাঁহার পরম রমণীয় প্রাসাদের দ্বিতলে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি সিদ্ধার্থের কমনীয় কান্তিতে মুগ্ধা হইয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া গাহিয়া উঠিলেন—

নিব্বুতানু সা মাতা নিব্বুতানু স পিতা।
নিব্বুতানু সা নারী যেষায়ণ ঈদিশোগতি॥

* At that moment a virgin of royal extraction named *Kisa Gotami* who was in the bloom of of personal beauty.....was standing in the upper story of his superb palace—Turnour.

সেই মাতাই সৌভাগ্যবতী সেই পিতাই ভাগ্যবান এবং সেই নারীই (পত্নী) ধন্যা যাঁহারা এইরূপ সৌভাগ্যবান ব্যক্তির আত্মীয়। *

সিদ্ধার্থ প্রাণ মনের সহিত এ গাথা শ্রবণ করিলেন ও ভাবিলেন, "এ স্তুতিবাদ আমারই শ্রবণ যোগ্য। আমি নির্ব্বাণ লাভেচ্ছু আমার আজিই গৃহ ত্যাগ করিয়া মুক্তি অন্বেষণে বহির্গত হওয়া উচিত। আর না! আর না!!" তৎপরে তিনি কিসাকে বহুমূল্য মণি হার তাহার এই সুমধুর গাথার জন্য উপহার প্রদান করিলেন!

জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা ও নশ্বরতা প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মহিত ও পরহিতার্থে মুক্তি প্রয়াসী হইয়া সেই রাত্রেই সিদ্ধার্থ পদ্মপলাশলোচনা মণিরত্ন-বিভূষিতা মনোহরা প্রেমময়ী পত্নী, সদ্যজাত শিশু, পরম স্নেহশীল পিতা, অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিলেন।

এ কিসা গোতমী কে?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

* এই গাথাটি Mr. Rhys David সিদ্ধার্থের ভগিনীর মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছেন:—
"A young girl his cousin sang a stanza, Happy the father, happy the mother, happy the wife of such a son and husband?
Mr. Rockhill বলেন সিদ্ধার্থ যখন রাজগৃহ শশ্মানভূমিতে শব ও গলিত শবদেহ দেখিয়া বিষণ্ণ মনে মৃগজা নগরে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন শাক্য দুহিতা তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া এই গাথা গান করেন। Monsieur G. Lafont বলেন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এই গাথা গান করেন।

ভাবোচ্ছ্বাস। †

ও চিত্র দর্শনে, শুধু পড়ে মনে,
ব্রহ্মতেজ পূর্ণ মূর্ত্তি,
নির্জ্জন সাধনে হতেছে সবনে
আরো দিব্য ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি!
সদা মুক্ত তুমি, বন্ধন তোমার
হায় কি করিতে পারে?
জ্যেষ্ঠতাতের প্রিয়তম শ্লোক
এস গাই ভক্তি ভরে—
সকলত্রোবা, বিকলত্রোবা,
সাধনাঢ্যোবা, বিধনাঢ্যোবা,
সংসারেস্মিন যোজিতচিত্ত
শোচতি শোচতি শোচত্যেব।
যোগরতোবা, ভোগরতোবা,
সঙ্গরতোবা, সঙ্গবিহীনো,
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্ত
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।
তাঁর সাথে ভেদ ঘটাতে ক্ষণেক
নাহি পারে ত্রিজগৎ,
চির বাঞ্ছিতের সুধাস্নিগ্ধ পদে
রাজিছ রাজিববৎ;—
বড় সাধ দেখি স্তব্ধ বনসম
কেমন সে কারাভূমি,
তার কোন গৃহ পবিত্রিত করি
বিরাজিত যোগী তুমি;
কে কে ভাগ্যবান সেবকের দল
সেবা ভার লভিয়াছে,
কোন প্রহরীরা কি সৌভাগ্যশালী
তোমারে ঘেরিয়া আছে;
ইচ্ছা অতিক্রমি শত বাধা দলি
ছুটে যাই, নমি পদে,
না, না বিঘ্ন তব হবনাকো মোরা
ডুবে থাক সুধা হ্রদে—
হিমাচল ক্রোড়ে মহর্ষির মত
সঞ্চয় করহ সুধা,
ফিরিবে যখন বিতরিবে নরে
মিটিবে আত্মার ক্ষুধা।

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

† পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের চিত্র দর্শনে।

আমেরিকায় জগদীশচন্দ্র।

আজকালকার দিনে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট বোধহয় বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম অবিদিত নাই। ইঁহার প্রণীত নূতন গ্রন্থ সমূহ বোধ হয় অনেক বিজ্ঞান-তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিগণ পাঠ করিয়াছেন, এবং আশা করি সাধারণের নিকট বসু মহাশয়ের, নব প্রকাশিত গ্রন্থনিচয়ের নামও অবিদিত নাই। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের স্বজাতীয় বাঙ্গালী সন্তান বলিয়াই আমাদের গর্ব্ব করিবার ক্ষমতা আছে। জগতের প্রত্যেক বিজ্ঞান-সমাজ এবং প্রত্যেক বিজ্ঞান-সমিতি তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। শুধু বিজ্ঞান নহে, একাধারে রসায়নশাস্ত্র, শরীরবিদ্যা এবং মনস্তত্ত্বে তাঁহার ন্যায় আর একজনও ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কতক তথ্যকে ভ্রান্ত বলিয়া তিনি যে সকল সত্য বাহির করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত জগতে এমন কোন বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি তাহার বিরুদ্ধে বাক্যব্যয় করিতে পারেন। ভারতবর্ষে প্রকৃত ঋষির ন্যায়ই জগদীশচন্দ্র সত্য সম্পাদনে একাগ্রমনা ছিলেন। তিনি সেই সত্য জগতে প্রচার করিবার জন্য পৃথিবীর সমগ্র বিজ্ঞান সমাজে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। লোকেরা দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। বিদেশে তাঁহার সম্মান কতদূর এবং বিজ্ঞান সমাজ তাঁহাকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিতেছে তাহাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

জগদীশচন্দ্র বিলাত হইতে আমেরিকায় (U. S. A.) গিয়াছেন। বিলাতের বিজ্ঞান-সমিতি তাঁহাকে বিশেষ ভদ্রতার সহিত এবং মান্যের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। আমেরিকাস্থ ভারতীয় বিদ্যার্থীগণ এবং তদ্দেশীয় অন্যান্য বিজ্ঞান-সমাজও তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। বলা বাহুল্য তথাকার ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের মন বসু মহাশয়ের আগমনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে বসু মহাশয়কে Baltimore সহরের বৈজ্ঞানিকগণ একটি সভা আহূত করিয়া আহ্বান করিয়া লইয়া যান, বসু মহাশয় তথায় একটি বক্তৃতা দিয়া অশেষ ধন্যবাদ এবং প্রশংসাভাজন হন। ইহার পর বৈজ্ঞানিক-প্রবর Illinois নামক স্থানে গমন করিয়া তথাকার বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে আহূত এবং সম্মানিত হন। Illinois সহর হইতে বসু মহাশয় প্রথমে, Wisconsin এবং পরে Chicago সহরে গমন করেন। উক্ত নগরীদ্বয়ের বৈজ্ঞানিক সমিতি, সহরের লোকদিগকে আহ্বান করিয়া জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার আয়োজন করিতে থাকেন এবং বিজ্ঞান সমিতিতে তিনি অন্যান্য সহর হইতে Wisconsin এবং Chicagoতেই বিশেষ-ভাবে সম্মানিত এবং কিঞ্চিৎ পুরস্কৃতও হইয়াছিলেন, আমরা তাহারা কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি।

Wisconsin সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাচার্য্য ইহার পূর্ব্বে এক বৎসর কাল ধরিয়া বসু মহাশয়ের যন্ত্রাদির সাহায্যে নানা বিষয় অনুসন্ধান করিতেছিলেন কিন্তু ভদ্রলোক কোন পরীক্ষাতে তেমন কৃতকার্য্য না হওয়ায় বসু মহাশয়ের তথ্য এবং পরীক্ষা (Experiment) সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। বসু মহাশয়কে অধ্যাপক এই সম্বন্ধে জ্ঞাত করান্ এবং জগদীশচন্দ্র অধ্যাপক মহাশয়ের অসম্পূর্ণ পরীক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া তাঁহার সন্দেহ দূর করেন। এতদিন ধরিয়া অধ্যাপক যে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, আর একদিনে বসু মহাশয়ের হস্তে তাহা কৃতকার্য্য হইল দেখিয়া, তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা এবং কৌশলের পরিচয় পাইয়া বৈজ্ঞানিকটি অবাক্ হইয়া গেলেন! উক্ত অধ্যাপক, বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত নূতন যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্র সেগুলিকে

আরও সরল এবং সম্পূর্ণ করিয়া দুই বৎসর পরে বিক্রয় করিবেন বলেন। Wisconsin হইতে জগদীশচন্দ্র Chicago সহরে গমন করেন, সেখানকারও বৈজ্ঞানিক সমিতি আপনাদের সভা স্থাপিত করেন এবং তথাকার বৈজ্ঞানিক সমিতির সভাপতি সাধারণের নিকট ডাক্তার বসুর পরিচয় দিবার সময় বলিয়াছিলেন,—"এই যাঁকে আপনারা সাম্‌নে দেখিতেছেন, ইনি একজন ভারতবর্ষীয়, জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ইঁহার আবিষ্কার জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। পুরাতন ভারতবর্ষ যেমন দর্শন, ধর্ম্ম ও নৈতিক বিষয়ে সমগ্র সভ্যজাতীর মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল, বর্ত্তমান ভারতও যে বিজ্ঞানে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে।" সত্যই বসু মহাশয় তাড়িৎ সম্বন্ধীয় যন্ত্র এত সহজে প্রস্তুত করিতেছেন যে বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছেন। বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই বসু মহাশয়কে স্থূলদর্শী এবং কৌশলী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার যন্ত্র আর দুই বৎসর পরে সমগ্র জগতে প্রকাশিত হইবে। Chicago হইতে বসু মহাশয় Michigan সহরে যাত্রা করেন। তথায় পৌঁছাইলে নগরবাসীগণ অত্যন্ত সমাদরের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। এখানে শেষ দিনের বক্তৃতায় Michigan Universityর কর্ত্তৃপক্ষগণ বসু মহাশয়কে ৩০০৲ তিন শত টাকা উপহার দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক স্থানে অর্থ পুরস্কার পাইয়াছেন।

আমরা ভারতবাসী হইয়া তাঁহার আবিষ্কারের কথা বুঝিতে পারি না,—ইহা কি কম দুঃখের কথা! অন্য কোন দেশে জগদীশচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলে লোকেরা তাঁহাকে কিরূপ সম্মান করিত বলা যায় না। কিন্তু হায় রে ভারতবাসী! চক্ষু মেলিয়া দেখ, যাঁহারা যথার্থ বিদ্বান তাঁহারাই বিদ্বানের সমাদর করিতে পারেন। অযোগ্য দেশে যোগ্য পুরুষের জন্ম,—তাঁহার অবমাননা। জাগ্রত হও, ভারতবাসী জাগ্রত হও, একবার জগতের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখ তোমাদের অবস্থান উন্নতির কত নিম্ন সোপানে। "উত্তিষ্ঠঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্যোবরান্নিবোধতঃ।" ওঠ, জাগ; এই যে মনীষীগণ তোমাদের গুরু, তাঁহাকে তোমরা স্মরণ কর,—তোমরা তাঁহাদের শিষ্য হ'ও। সার্থক হবে দেশ,—আর ধন্য হবে ভারতবাসী।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

একান্নবর্ত্তী পরিবার ও স্ত্রীশিক্ষা।*

বিগত অধিবেশনদ্বয়ে আলোচিত স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে যে সমুদয় প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল তন্মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা অন্যতম। এই একান্নবর্ত্তীতার সহিত স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতির প্রণালী নির্ণয় এতই অধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট যে একের ঔৎকর্ষ্যাপকর্ষ আলোচিত না হইলে অন্যের পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। এজন্য গত অধিবেশনের শেষভাগে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি কর্ত্তৃকই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল যে একান্নবর্ত্তীতার প্রথাই আগামী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় নির্ণীত হউক। কিন্তু তখন অস্মদের এ ধারণা আদৌ ছিল না যে, কথা কহিবার সাহসিকতা প্রকটন করার অপরাধে পত্র কর্ত্তন করিবার ভারে এই দীনকেই পীড়িত হইতে হইবে। শেষে দেখা গেল যে উক্ত প্রবচনের সার্থকতা এক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইল। রাত্রি ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকায় এবং ধর্ম্ম সভার

* নিয়াগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত।

আদেশ পালনে তৎপরতায় পাত্রান্তর নির্ব্বাচনের ক্লেশাসহিষ্ণু সভ্য মহোদয়গণ এই নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিকেই প্রবন্ধ লিখিবার যোগ্যপাত্ররূপে মনোনীত করিলেন। সমিতির আদেশ শিরোধার্য্য করিতে আমি বাধ্য; সুতরাং "রোগী যথা নিম খায় নয়ন মুদিয়া" আমি যথাসাধ্য তৎপ্রতিপালনে চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপ প্রবন্ধ লিখিতে যেরূপ জ্ঞান, গবেষণা এবং ভূয়োদর্শন আবশ্যক, এ ক্ষুদ্র লেখকের সেরূপ কিছুই নাই; সংগ্রহের সুবিধাও এখানে বড়ই কম; সুতরাং এপ্রবন্ধে কেহ যেন নানা গ্রন্থোদ্যান সংগৃহীত কোটেসন কুসুম সৌরভের প্রত্যাশা না করেন, করিলে আদমাপ্তি বৃথা অপেক্ষা করিয়া শেষে নিরাশার উষ্ণশ্বাসে স্বীয় স্বীয় গুম্ফ শ্মশ্রু আকম্পিত করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে হইবে। আর একটি কথাও আগেই বলিয়া রাখা ভাল। শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয় প্রবন্ধ শ্রবণেচ্ছু বন্ধুগণকে আমন্ত্রিত করিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রবন্ধ শ্রবণ ব্যপদেশে স্বীয় কল্পনাকটাহপক্ক সুমধুর রসাল রচনা নোদকামিষ্ট সম্ভারে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, সে রসাস্বাদ মাধুরী স্মৃতি এখনও সভ্যবৃন্দের অন্তরে অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ অদ্যকার এ আমন্ত্রণে তাঁহাদের সাহিত্যিক ক্ষুধা তদ্রূপ ভূরি ভোজন প্রত্যাশায় তীক্ষ্ণা হইয়া সাগ্রহে পরিবেশন সময় প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু সমিতি এবার যে মোদককারের প্রতি খাদ্য প্রস্তুতের ভারার্পণ করিয়াছেন তাহার মূলধন অতি সামান্য; শিক্ষার কারিগরীও আদৌ নাই, সুতরাং সে অতি কষ্টে যৎসামান্য নিম্নশ্রেণীর খাদ্য ভীত ভীত ভাবে সভার ভাণ্ডারে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে; তাহা সুপ্রচুরও নহে, আস্বাদেও ভাল নহে; সুতরাং সমিতি ইহার মূল্য নির্ব্বাচন কালে এ কারিগর কলঙ্কের প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থাই করুন, আপাততঃ উপস্থিত মহোদয়গণের ক্ষুন্নিবৃত্তি হওয়াই সন্দেহ, পরিতৃপ্তি দূরে থাকুক; কেবল তাঁহাদের কষ্ট স্বীকার মাত্রই লাভ হইবে একথা আগেই জানাইয়া খালাস থাকা ভাল।

অপার কৌশলী জগদীশ্বরের সৃষ্ট এই পৃথিবীতে যে অসংখ্য জীবজাতি বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনস্থিত মানব জাতির সামাজিক ক্রমবিকাশ তত্ত্ব অতি জটিল এবং নানা রহস্য পূর্ণ। আদিম মানবগণ কি ভাবে বাস করিত, কি ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, কি ভাবে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিত, কি নিয়ম প্রণালীতে বদ্ধ ছিল সে সমুদয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের গভীর গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়া নানা ভাবে নানা আকৃতিতে আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত হইতেছে। প্রাচীন গ্রন্থাবলী, শিলালিপি, তাম্র শাসন, পিরামিড্, ক্রমলেক্, ভূগর্ভ প্রোথিত প্রাসাদ নগর্য্যাদির আবিষ্ক্রিয়া ইত্যাদি উপকরণ ঐ সব পণ্ডিত মণ্ডলীর আরব্ধ কার্য্যে নিরন্তর সহায় স্বরূপ কার্য্য করিতেছে। এই সমুদয় আলোচনার ফলে মানব জীবনের আদিম অবস্থার অনেক তত্ত্ব স্পষ্টীকৃত হইয়াছে ও হইতেছে সন্দেহ নাই। এই সমুদয় তত্ত্ব সিদ্ধান্ত যে সর্ব্বদাই অবিসংবাদী তাহা নহে। তবে ইহাদের মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত নির্ব্বিচারে সকলের দ্বারাই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে তাহা এই যে অতি আদিমকাল হইতেই মানব সামাজিক জীব। মানব একাকী থাকিতে ভালবাসে না; দশজনে মিলিয়া মিশিয়া একত্র বাস করিতেই ইচ্ছা করে, ইহাই তাহার প্রকৃতি। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মানব সমাজ বদ্ধ হইয়া, পরিবার সংগঠন করিয়া বাস করিয়াছে ইহার প্রমাণ সর্ব্বত্রই এত অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে যে ইহা বিশ্বজনীন সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। যে কালে বিবাহ বন্ধন পবিত্র ধর্ম্ম-কার্য্য বলিয়া প্রথিত ছিল না, যে সময় একই রমণী একদা বহু পুরুষের জায়া স্বরূপে গণ্যা হইয়া সৃষ্টি প্রবাহে সন্তান বাহিত্ব রক্ষা করিতেছিল, যে সময় দায়াধিকার পিতৃবংশানুক্রমিক না হইয়া মাতৃবংশানুসারী ছিল, সেই অতি আদিমাবস্থারও পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত মানব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিয়াছে, তাহারও সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। এই প্রবৃত্তিরও নিদান তত্ত্বানুসন্ধান করিলে দেখিতে

পাওয়া যায় যে জীব জগতের নিম্নস্তরেও এই মিলিয়া থাকিবার একটা আকর্ষণ অতি স্থূল ভাবে বিদ্যমান আছে; সে আকর্ষণ স্ত্রীজাতির মধ্যেই অধিক পরিস্ফুট; পালনী শক্তি এ জগতে স্ত্রীজাতিকে আশ্রয় করিয়াই কার্য্য করে। এই পালনী শক্তির প্ররোচনায় হৃদয়ের স্নেহ প্রবৃত্তির আকর্ষণ স্ত্রীজাতিকে একত্র থাকিতে নিযুক্ত করে। স্ত্রী সন্তান প্রসব করিয়াই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না। যতই উচ্চ স্তরে আরোহণ করা যায় ততই এই প্রবৃত্তির ক্রম বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। কূর্ম্ম, বল্লী, দংশ মশকাদি জীবজন্তু প্রসব করিয়াই স্বীয় দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয় কিন্তু পক্ষী অণ্ডজ হইয়াও প্রসবমাত্রাবসিত দায়িত্ব নহে, তাহাকে খাদ্যাহরণ ও রক্ষা ব্যপদেশে স্বীয় শাবকের সাহায্য করিতে হয়; তাহার পর শাবক উড়িতে শিখিলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া তাহাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কৌশল শিখাইয়া দেয়। এই প্রবৃত্তি কুক্কুর, বিড়াল, এবং গবাদি পশুর মধ্যেও প্রায় এই ভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এইটি সহজাত সংস্কার বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে।

মানব সমাজের আদিম স্তরেও আত্মরক্ষা এবং সন্তান পালনের উদ্দেশ্যে সাহায্য নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ক্রমে যেমন মানব হৃদয় বিকশিত হইতে লাগিল, তাহার আসঙ্গ লিপ্সা কেবল মাত্র সন্তান পরিপালনেই পরিতৃপ্ত হইল না। স্ত্রী একাধিক পুরুষের স্ত্রী হইয়া যেন নিজকে নিতান্তই অসংযতা এবং পশুধর্ম্মিণী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই পশু ধর্ম্মের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার একটা আকাঙ্ক্ষা যেন তাহার প্রাণের মধ্যে কোনও অদৃশ্য শক্তি দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তাহারই ফলে ক্রমশঃ স্ত্রী পুরুষ সম্মিলন বিবাহ বন্ধনে পরিণত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহের সৃষ্টি করিল। মানব পশু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মানব ধর্ম্মের প্রথম স্তরে আরোহণ করতঃ সন্তান প্রতিপালন ও তাহার শিক্ষা দীক্ষা বিধান পূর্ব্বক উপযুক্ত বয়স্ক হইলে তাহার ইচ্ছামত পত্নী নির্ব্বাচন করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে অনুমোদন করিতে লাগিল। ক্রমে এই সাধনার যুগ গত হইতে লাগিল; তখন পিতা পুত্র হইতে, ভ্রাতা ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন ভাবে বাস করিতে যেন মর্ম্ম স্থানে একটু বেদনা বোধ করিল, যে স্নেহ তন্তু বাল্য হইতে যৌবন পর্য্যন্ত অন্তমর্ম্ম সীবন করিয়া রাখিয়াছিল, যে প্রীতি বন্ধন শয়নে ভোজনে এবং বিচরণে পরস্পরকে এতকাল দৃঢ় সম্বদ্ধ রাখিয়াছিল, তাহাকে ছিন্ন করিয়া যাইতে যেন অন্তর কম্পিত হইল। তাই সে স্নেহময় জনক এবং স্নেহময়ী জননীর অনাবিল করুণা মৃতধারায় এতকাল পরিপুষ্ট হইয়া, প্রীতিনিলয় সহোদরের সহজ বান্ধবতার সুমধুর আস্বাদ এতকাল উপভোগ করিয়া, এখন তাহাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিল না। সে নিজ স্বাতন্ত্র্যের সুখ সুবিধা হৃদয়ের কোমল বৃত্তির নিকট বলিদান দিল। প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ পিতামাতার পরিণত বয়সে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজে যৌবন তরঙ্গোচ্ছাসে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যাইতে সে চাহিল না। তাঁহাদিগের সেই স্নেহ ছায়াতলে থাকিয়াই সুখ বিলাস এবং কর্ত্তব্য উভয় সাধনের একত্র সমাবেশ করিল। এ সাধনায় মানবজীবন আরও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল; তাহার মানবত্বের অন্তরালে দেবত্বের পবিত্র আভা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তাহাই মনুষ্যত্ব বলিয়া খ্যাত হইল। ক্রমে মানব তদপেক্ষাও আর এক স্তর ঊর্দ্ধে যখন উঠিল তখন তাহার হৃদয় ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না, সে যখন শুনিল যে সে যেকালে নিজে ক্ষীর সর নবনী পুষ্ট হইয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া সুখ অনুভব করিতেছে, তাহারই ভগিনী অথবা তাহারই পিতৃষসা তখন অনাহারে জীর্ণাশীর্ণা হইয়া কঠিন মৃত্তিকাতলে শয়ন পূর্ব্বক সাগ্রহে মরণ দেবতাকে হৃদয়ে বরণ করিতেছে, তখন তাহার মনুষ্যত্ব আহত হইয়া উঠিল; সে দুঃখে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ সেই ভগিনী, পিতৃষসা অথবা তদবস্থ আত্মীয়া অথবা

আত্মীয়কে উদ্যোগী হইয়া আহ্বান করিল এবং স্বীয় আত্ম পরিধেয়ের অংশ তাহাদের সহিত সানন্দে বিভাগ করিয়া উপভোগ পূর্ব্বক অন্তরে একটি তৃপ্তি অনুভব করিল। সে তৃপ্তি ক্ষীরসরে হয় নাই, সুখ শয্যায় দিতে পারে নাই, তাহা অননুভূতপূর্ব্ব, আনন্দঘন! ইহারই ঊর্দ্ধে বিশ্বজনীন প্রেমের আসন; ইহারই পরিপুষ্টি এবং বিস্তৃতিতেই শেষে "বসুধৈব কুটুম্বকম্"এর উৎপত্তি এবং তাহাই মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি এবং সমাপ্তি।

এইরূপে মানব সৃষ্টির আদিমকাল হইতে বহু সহস্র যুগ যুগান্তের মধ্য দিয়া স্বীয় স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্ররোচনায় ক্রমে ক্রমে সমাজ গঠন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। পশুধর্ম্মের নিম্ন স্তর হইতে ধীরে ধীরে সে ক্রমোন্নতি স্তরে উপনীত হইয়াছে; কিন্তু সেই আদিমকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমুদয় অবস্থার ক্রম বিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলে তাহার অন্তরালে এই সত্যই নিগূঢ় ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একত্রে মিশিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি মানবের হৃদয়ে স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক বৃত্তির নিয়োগ বলেই মানব সমাজ গঠিত হইয়াছে, এই বৃত্তির উন্নতির সহিতই সমাজের উন্নতি ও পুষ্টির সম্বন্ধ। এই অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্নেহ সূত্রে গ্রথিত হইয়া একত্র বাস প্রবৃত্তি মানবত্বের একটি ধর্ম্ম। এই প্রবৃত্তি কিরূপে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া সমাজের বিভিন্ন অবস্থা সংগঠিত করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত ধারণা আমি ব্যক্ত করিলাম, ইহা অন্য কাহারও দ্বারা সমর্থিত কি না তাহা আমি জানি না। সুধীগণ তাহার বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবেন আশা করি।

এই সমাজ স্তরের ক্রমোন্নত গঠন পর্য্যালোচনা করিলে ইহার অন্তরালে আরও একটি সত্য প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমার বোধ হয়। সেটি এই পশুধর্ম্ম হইতে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব।

মানবের অন্তরে যে স্বর্গীয় জ্যোতি নিহিত আছে, তাহারই আলোকে মানব স্বীয় জীবনকে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিবার জন্য একটি সহজ আকাঙ্ক্ষা নিজ মনে মনেই অনুভব করিয়াছে, সেই দৈবশক্তি প্রেরিত হইয়াই সে স্বার্থের পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া কেবল নিজকে লইয়া সুখী হইতে পারে নাই, স্বচ্ছন্দবিহারী হইয়া নিজ আহার বিহার দ্বারাই তৃপ্তি অনুভব করিতে পারে নাই, অপরের জন্যও তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। এই যে অতৃপ্তি, এই যে চাঞ্চল্য, এই যে পরার্থে স্বার্থ সংকোচ করিবার প্রবৃত্তি ইহারই মূলে সেই শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, সেই দৈব ভাবের বীজ, সেই ভগবচ্ছক্তির প্রেরণা যাহার সম্যক্ স্ফুরণে এবং প্রতিষ্ঠাতে প্রেমের ব্যক্তি এবং পুষ্টি, যাহার গুণে মানব দেবত্বে উপনীত হয়। ইহাই মানবের বিশেষত্ব; এবং এ বিশেষত্ব তাহার স্বায় চেষ্টায় প্রস্তুত নহে, ইহা তাহার সহজাত। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া তাহার ধর্ম্ম কর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ, তাহার জীবনের সাফল্য, বৈফল্য পরিব্যক্ত এবং ইহারই তুলাদণ্ডে তাহা বিচারিত হয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য একান্নবর্ত্তীতাও মানবের এই প্রবৃত্তি সঞ্জাত তাহা বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহাদের একত্রাবস্থানই স্বভাবের অভিপ্রেত, তাহারা একত্রে মিলিয়া মিশিয়া অন্যান্যের সুখ দুঃখের অংশভাগী হইয়া বাস করিয়াই এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায়। আর্য্য হিন্দু সমাজের আদিম ইতিহাস যতদূর পর্য্যন্ত জানা যায় তাহাতে বুঝা যায় যে সে সমাজে স্ত্রীর বংশানুযায়ী দায়াধিকার প্রথা প্রচলিত নহে, পিতার বংশানুসারেই তাহা নির্ণীত হইত; সুতরাং এক স্ত্রীর বহু পতিত্ব মানব সমাজের যে স্তরে সম্ভব হইত, হিন্দু সমাজ সে স্তরে অবস্থিত ছিল না। তাহা তদপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং সেই সময় হইতেই একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা সে সমাজে প্রচলিত আছে।

এই একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা হিন্দু সমাজের একটা বিশেষত্ব বলিতে পারা যায়। ঠিক এই ভাবে এই প্রথা অন্য কোন সমাজে চলিত আছে বলিয়া বোধ হয় না। একটু অনুধাবন করিলে একটি বিষয় আমাদের মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হয় তাহা

এই যে হিন্দু সমাজের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার প্রথা প্রভৃতি প্রায় প্রধান প্রধান অঙ্গগুলির মধ্যে একটা বিশ্বজনীন ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, সকলের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াই যেন এ গুলি প্রণীত হইয়াছে। ধর্ম্ম জগতে দৃষ্টিপাত করুন, একদিকে কল্যাণদায়িনী শ্রুতি মাতার ন্যায় স্নেহরসামৃতধারা-নিসিক্ত মধুর ভাষায় জ্ঞানী মুমুক্ষুকে "সত্যং শিবং সুন্দরং, একমেবা দ্বিতীয়ং"এর মনোমোহিনী বিশ্বব্যাপিনী মূর্ত্তির বিরাট রূপ দর্শনে মুক্তিকে হস্তস্থিত আমলকবৎ সুপ্রাপ্য করিতে আহ্বান করিতেছেন, অন্যদিকে মধ্যাধিকারীকে ধর্ম্মতত্ত্বের উচ্চতম সোপানে আরোহণের উপায় স্বরূপ ধ্যানমূর্ত্তি কল্পনায় প্রোৎসাহিত করিবার জন্য পুরাণাদি শাস্ত্র সখার ন্যায় সুমিষ্টভাবে উপদেশ প্রবাহ বর্ষণ করিতেছেন। অশিক্ষিত, মূর্খ নিম্নাধিকারীকেও কোনও না কোনরূপে ধর্ম্মপথে স্থিত করিবার জন্য সহজ ধারণা পূজোপাসনা ব্রত নিয়মাদি প্রণীত হইয়াছে। দস্যু তস্করাদি সমাজের অতি নিম্ন স্তরের লোক যাহাদিগকে অন্যে ঘৃণা করিয়া দূরে টানিয়া ফেলিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্ম তাহাদের জন্যও বেদনা অনুভব করিয়া তাহাদের উপযোগী অবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। ভক্তিমার্গের তত্ত্ব জিজ্ঞাসুকে ভক্তি পথের সর্ব্ব নিম্ন হইতে সর্ব্বোচ্চ সোপান প্রদর্শন করিয়াছেন, জ্ঞানীকে জ্ঞানোপদেশ তত্ত্বের চরম সীমায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, কর্ম্মীর জন্য এই অনন্ত জগতের ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছ হইতে হিমালয়ের ধবলশৃঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র প্রসারিত রাখিয়াছেন। আশ্রমীর জন্য ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ হইতে মানব সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য পৃথক পৃথক রূপে উপদেশ করিয়াছেন; এই একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার অভ্যন্তরেও সেই প্রেম বন্ধন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূলে যে পরার্থে স্বার্থ বিসর্জ্জনের ভাব দেদীপ্যমান তাহাই মানব জীবনকে উন্নতির প্রাসাদে উন্নীত করিবার প্রধান এবং প্রশস্ত সোপান। মানব নিজ পত্নী ও পুত্র কন্যার জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, সেটা তাহার সামান্য কর্ত্তব্যের অন্তর্গত।

কিন্তু যখন তাহার হৃদয় তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া স্বীয় ভ্রাতা, ভগিনী এবং অন্যান্য দূর সম্পর্কিত আত্মীয় আত্মীয়াগণের সুখ দুঃখের দিকেও দৃষ্টি প্রদান করে, তাহাদের কষ্টে কষ্ট অনুভব করে এবং তৎপ্রতিকারে যথাসাধ্য চেষ্টা করে; তাহাদিগকে স্বীয় উপার্জ্জনের অংশ দান করিয়া পোষণ করে, তখন সে আর সেই সামান্য কর্ত্তব্য করিতেছে না; তাহা অপেক্ষা সে অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

এ জগতে স্বার্থই যদি সর্ব্বস্ব না হয়, স্বীয় উদর পূরণ এবং অন্যান্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই যদি মানব জীবনের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত না হয়, উশৃঙ্খল উদ্দাম প্রবৃত্তির তাড়নে যথেচ্ছ কার্য্য করাই যদি মনুষ্যত্ব না হয়, তাহা হইলে এ কথা প্রত্যেককেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে যে, স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা একান্নবর্ত্তীতার আদর্শ অধিক প্রশংসনীয় ও মহীয়ান। যে সমুদয় গুণ মানব হৃদয়ে বিকশিত হইলে তাহাকে উন্নত করে, যে সমুদয় প্রবৃত্তির স্ফূরণে মানব আপন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া অপরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া সুখী হয়, এই একান্নবর্ত্তীতা তাহাদিগকেই ভিত্তিস্বরূপ করিয়া গঠিত হইয়াছে। যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য মহৎ, সে উদ্দেশ্য মানব জীবনের উন্নত গুণাবলীর সমাবেশ করা। স্বভাবতঃই যাহারা একত্র বাসের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, একই পিতৃ পিতামহের রক্তের সহিত তাহাদের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিনিচয় যাহাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে, তাহারা পারস্পরিক সুখ দুঃখের ভাগী হইয় জীবন ধারণ করিবে, একের বিপদে অন্যে পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে, একের সম্পদে অন্যে সুখ ভোগ করিবে, ইহা যেন জগৎ স্রষ্টারই অভিপ্রেত। সুতরাং এই একান্নবর্ত্তী পরিবার অস্বাভাবিক উপাদানে গঠিত হয় নাই। স্বাভাবিক মনুষ্যত্বই ইহার ভিত্ত। স্বাতন্ত্র্য পরায়ণ ইউরোপীয় সমাজের ধর্ম্ম পুস্তক তাঁহাদিগকে স্বাতন্ত্র্যই শিক্ষা দেয়, তাহাদের বাইবেলে উল্লিখিত বচন হইতেই তাহা বুঝা যায়। তাহাতে উক্ত হই-

য়াছে যে, মানুষ স্বীয় মাতা পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার পত্নীর প্রতিই অনুরাগী হইবে এবং এক দেহ হইয়া যাইবে। খৃষ্টিয় সমাজ এই স্বাতন্ত্র্য ভিত্তির উপরই স্থাপিত। তাঁহাদের সমাজ অনুসারে তাঁহারা আচরণ করিতে থাকুন, তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থের আদেশ তাঁহারা পালন করুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যাঁহারা তদনুকরণ চিকীর্ষু হইয়া থাকেন, তাঁহাদের জন্য দুই এক কথা বলা আবশ্যক।

এই বিষয়ক কথা বলিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা বলিয়া আমার মনের একটা ভাবের অভিব্যক্তি করিতে বড়ই অভিলাষ হইয়াছে। সুতরাং সেইটাই আগে বলিয়া লইয়া অন্য বক্তব্য বলিব। সেটি একটি শব্দের অর্থগত পরিবর্ত্তন মাত্র। শব্দটি 'পরিবার'। এই পরিবার শব্দটি আসল সংস্কৃত; বহু প্রাচীনকাল হইতে ইহা গৃহের আত্মীয় স্বজন, পুত্র কন্যাদি সকলের সমষ্টি বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। তখন পরিবার বলিতে পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, বন্ধু খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত, তাঁহাদের পত্নীগণ এবং বাটীর ভৃত্যবর্গাদি সকলের সমষ্টি বুঝাইত। সুতরাং তৎকালে ইহার অতীব প্রশস্ত অর্থ ছিল; এই শব্দটির অভ্যন্তরে তাৎকালিক জনগণের উদার হৃদয় লুক্কায়িত ছিল। তারপর এই 'পরিবার' সংস্কৃতের ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঙ্গলা ভাষার ঘরে আসিয়া পড়িল; বাঙ্গলার স্থান তখন অতি সঙ্কীর্ণ ছিল বোধ হয়, তাই অতগুলি জনসমষ্টির বৃহৎ পরিবারটির স্থান তিনি কুলান করিতে না পারিয়া ক্রমে কাটছাঁট আরম্ভ করিয়া দিলেন; তাহার ফলে "ছিল দাঁড়ি হ'ল তুল, কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল" হইয়া দাঁড়াইল। খুড়া, জ্যেঠা দূরে থাকুন, পিতা মাতাও এই পরিবর্জ্জন বিধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না, তাঁহারা সকলে নিতান্ত সাধুসঙ্গে পৃথিগত পরিবারের অঞ্চলতলে র'হিলেন বটে, কিন্তু ব্যবহারিক বাঙ্গলা তাঁহাদিগকেও স্থান দিতে কষ্ট বোধ করিল, তাঁহারা ইহার অর্থভাগী হইতে বঞ্চিত হইলেন, কেবল নিতান্তই আত্মীয়া, আপনার জন 'একা এবাদ্বিতীয়া' গৃহিণী ঠাকুরাণী পরিবারের সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। বাঙ্গলার কথিত ভাষায় 'পরিবার' অর্থে গিন্নি ব্যতীত আর কাহাকেও বুঝায় না। আমাদের যুবক বাঙ্গলা কথায় কথায় পরিবার আনেন, পরিবারকে আদর করেন, পরিবার পাঠাইয়া দেন, কিন্তু বিদ্যা-বয়োবৃদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত অত বড় বৃহৎ পরিবারটাকে ইচ্ছামত টানা হেঁচড়া করিতে সাহসীই হন না, সুতরাং তিনি কথায় কথায় দূরে থাকুক জীবনেও একবার পরিবার আনিতে সাহস করেন না।

এখন বৃদ্ধ সংস্কৃতের পরিবারে আর যুবক বাঙ্গলার পরিবারে কত পৃথক। শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই ভাষার অথবা শব্দের অর্থের উন্নমনাবনয়নের সঙ্গে মানব হৃদয়ের ভাবের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকে, শব্দের অর্থের উন্নমনে হৃদয়ের প্রশস্ততা এবং অবনয়নে সঙ্কীর্ণতা অনেক স্থানেই প্রকাশ পায়। এ ক্ষেত্রেও তদনুসারে বিচার করিলে আমাদের মনোভাব প্রশস্ত কি সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়।

আমরা বুঝি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আত্মীয় স্বজনাদি সকলকেই আপনার জন ভাবিয়া পরিবারের অন্তর্গত করিয়া লইয়া যেমন ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, আমরা তেমনই সঙ্কীর্ণ হৃদয় হইয়া এক পত্নীকেই আপনার জন মনে করিয়া পরিবারের একাধিপত্য প্রদান করিয়াছি; অন্য সকলকে আপনার জন বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। ইহা বিজাতীয় সংঘর্ষণ শিক্ষার ফল কি না, তাহার বিচারের ভার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সুধীবর্গের উপরই সবিনয়ে অর্পণ করিতেছি। আমার নিজের এই শব্দের অর্থ পার্থক্য আলোচনায় যাহা মনে হইয়াছে তাহাই মাত্র এখানে নিবেদন করিলাম।

পূর্ব্বে আমাদের সমাজ যেরূপ উন্নত ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখন তাহা হইতে যেন অধঃপতিত হইয়াছে বোধ হয়। পূর্ব্বে স্বজন পোষণে লোকের যেরূপ আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল এখন তাহা দেখা যায় না। ইহার নানা কারণই থাকিতে

পারে। দেশের বর্ত্তমান দারিদ্র্যও ইহার একতম কারণ বটে, তবে পাশ্চাত্য আদর্শের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই তাহাও বলিতে পারি না। অতএব পাশ্চাত্য দেশ প্রচলিত স্বাতন্ত্র্য এবং অস্মদেশীয় একান্নবর্ত্তীতা এতদুভয়ের তুলনায় সমালোচনা না করিবার চেষ্টা করা মন্দ নহে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, এই একান্নবর্ত্তীতা উদার প্রেম বীজেরই তরু। নিঃস্বার্থতা ইহার কাণ্ড। সংযম, বাধ্যতা, জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তন, পরস্পর সহানুভূতি ইত্যাদি ইহার শাখা প্রশাখা এবং শান্তি ও মঙ্গল ইহার ফুল ও ফল। এই অপূর্ব্ব বৃক্ষ হিন্দু সমাজ প্রাঙ্গণে বহু শতাব্দী হইতে শোভা পাইতেছে। ইহা হিন্দু সমাজের একটি বিশেষত্ব হিন্দু শাস্ত্রও ইহাকে প্রশংসা করিয়া পুনঃ পুনঃ মানব সাধারণকে উপদেশ করিয়াছেন যে, পিতা মাতা বর্ত্তমানে ভ্রাতৃগণ একত্র এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিবে। ইহাতে এ কথা অবশ্য বুঝায় না যে পিতা মাতার অবর্ত্তমানে তাহাদিগকে পৃথক হইতেই হইবে। তবে পৃথক হইবার প্রয়োজন বোধ করিলেও তাঁহারা বর্ত্তমানে তাহা পারিবে না এই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। শাস্ত্রের এই আদেশ সমাজ শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য; সুতরাং একান্নবর্ত্তীতা হিন্দু সমাজে ধর্ম্ম্যা ক্রিয়া বলিয়াই পরিগণিত।

এই জন্যই হিন্দু স্বভাবজ স্নেহ প্রবৃত্তির প্রভাবের আদেশের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় পৃথক পৃথক পরিবার হইতে আনীতা ভার্য্যাগণ এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে অন্যান্য নিরাশ্রয়া, দুঃস্থা, অনাথা আত্মীয়াগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পিতা মাতা প্রভৃতি পূজনায়গণের স্নেহ শাসনের ছায়ায় পরম সুখে কালাতিপাত করিতে শিক্ষিত হয়, আর পাশ্চাত্য জগতের যুবক উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় অভিপ্সিতা ভার্য্যা সংগ্রহ করিয়া লইয়া পিতা মাতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে বাস করে।

জগতে পিতা মাতার যেরূপ সন্তানের পালন, শিক্ষা, দীক্ষার সম্বন্ধে কতকগুলি অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য আছে, সন্তানেরও সেইরূপ পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি কতকগুলি সাধারণ কর্ত্তব্য আছে। উভয় পক্ষের কর্ত্তব্যই উভয় পক্ষে সর্ব্ব প্রযত্নে পালনীয়। এই কর্ত্তব্যের মধ্যে আনুগত্য এবং বার্দ্ধক্যে ভরণ পোষণ সন্তানগণের পক্ষে পিতা মাতার প্রতিপালনীয় প্রধান কর্ত্তব্য। সন্তান যদি উপযুক্ত বয়ঃ হইয়া পিতা মাতার সংশ্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া কেবল নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিই আগ্রহবান হইল, তাহা হইলে তাহার সহিত পশু পক্ষীর শাবকগণের পার্থক্য কোথায় থাকিল? তাহার মনুষ্যত্ব কোথায় থাকিল? সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, যে মানব যে পরিমাণে আত্মস্বার্থ, আত্ম-সুখস্বচ্ছন্দতা আত্মস্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া পরার্থে উৎসৃষ্ট জীবন হইতে পারিয়াছে, আত্ম বিসর্জ্জনের স্বর্গীয় প্রভা যে হৃদয়ে যে পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই মানব সেই পরিমাণে উন্নত; সেই হৃদয় সেই পরিমাণে স্বর্গীয়। সর্ব্বশাস্ত্র একই সত্য উদ্ভাসিত হইলে তাহা বিশ্বজনীন সত্য বলিয়া খ্যাত হয়; তাহাই ভগবানের প্রকৃত প্রত্যাদেশ বলিয়া স্বীকৃত হয়; সমাজেও তাহারই প্রতিষ্ঠা। অতএব সমাজের যে প্রথায় মানবকে স্বার্থের বন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া প্রীতির বন্ধনে গ্রথিত করে, যে প্রথায় একজন মানবকে আর দশ জনের জন্য সহানুভূতি সম্পন্ন করিয়া তাহাদের হৃদয় ক্ষেত্র হইতে শোক দুঃখ-উৎপাটিত করিয়া সুখ শান্তি ও প্রীতি বীজ বপন করিতে প্ররোচিত করে, যে প্রথায় মানবকে আপন স্বাতন্ত্র্য ভুলিতে শিক্ষা দিয়া "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" এই উপদেশ মন্ত্রস্বরে প্রদান করে এবং তৎসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র তাহার সম্মুখে নিয়ত স্থাপিত করে, যে প্রথায় ধর্ম্মবীজ মানব হৃদয় ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যে প্রথায় মানবকে বিলাসকলার আপাত মনোরম সুখ শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া কর্ত্তব্যসাধনে প্ররোচিত করে, ব্যষ্টি-

তের ব্যথা ঘুচাইতে, দুঃখীর অশ্রু মুছাইতে, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হইতে প্রবর্ত্তিত করে সে প্রথাকে কেমন করিয়া কুপ্রথা বলিব? কেমন করিয়া বলিব যে, এই প্রথাই হিন্দু সমাজ উৎপাদনের মূল? কোন্ প্রাণে স্বীকার করিব যে, এই প্রথাই হিন্দু সমাজের অশেষ অকল্যাণ সাধন করিতেছে?

পক্ষান্তরে আমরা বলিতে চাই, এই অশেষ শুভকরী প্রথাই হিন্দুর জীবনের উন্নতির মূল। হিন্দুর যাহা কিছু হৃদয়ের উন্নতি, যাহা কিছু তাহার ভাল, যাহা কিছু উন্নত তাহাই এই প্রথা প্রসূত। এই প্রথা বাল্যকাল হইতেই কথায় ও কার্য্যে শিশুগণের সমক্ষে যে স্বার্থত্যাগের পবিত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে, গুরুজনের প্রতি সম্মান ও বাধ্যতার শিক্ষা প্রদান করে, নিজ প্রয়োজন সাধনে, স্বার্থের সম্পূরণে অন্যের সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে, অন্যের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে উপদেশ করে, অন্যের জন্য সাময়িক দুঃখ কষ্ট অসুবিধা সহ্য করিতে পরামর্শ দেয়, অন্যের মনোবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক কার্য্যে অগ্রসর হইতে প্রণোদিত করে, প্রেম-বন্ধনে স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ভাল থাবারটুকু পর্য্যন্ত আর পাঁচজন শিশুর সহিত অংশ পূর্ব্বক খাইতে উপদেশ করিয়া হৃদয়ের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দেয়, যথেচ্ছ কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিকে সংযমের কঠিন নিগড়ে বদ্ধ করিয়া তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করায়; সেই সব শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত শিশুর হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া তাহার হৃদয়ে মনুষ্যত্বের একটা উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে, মানব জীবন যে আহার নিদ্রা ভয় প্রবৃত্তি মাত্র সকল পশু জীবন নহে, তাহার অভ্যন্তর হইতে যে সেই অনন্ত জ্যোতিঃ স্বরূপ প্রজাপতির ভাস্বর দীপ্তিকণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তদ্বিষয়ে তখন হইতেই তাহার অস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়া যায়। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে সে অস্পষ্ট স্পষ্টীকৃত হয়, সে অব্যক্ত ব্যক্ত হয়; অন্যের পরার্থে জীবন উৎসর্জ্জন করিতে দেখিয়া সেও 'পরের সুখে আত্ম-বিসর্জ্জন' শিক্ষা করে। যে প্রথায় এই মহতী শিক্ষা দান করে, যে প্রথার স্নেহ শীতল ক্রোড়ে সহজ ভাবে মানব জীবন দেবভাবে গঠিত হয় কেমন করিয়া সে প্রথার নিন্দা করিব? কেমন করিয়া সে প্রথার উচ্ছেদ কামনা করিব?

যাহারা সংযমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে চায় না; যাহারা নিবৃত্তির সুখ অনুভব করিতে ইচ্ছা করে না, যাহারা উশৃঙ্খল ভাবে কামনা সাগরে জীবন তরণী ভাসাইয়া দিয়া প্রবৃত্তির বাতাসে আকাঙ্ক্ষার পাল তুলিয়া দিয়া নিজে নিশ্চেষ্টভাবে মুদিত নয়নে তাহাতেই শয়ান থাকিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা করে, সংযম কর্ণে যাহারা সে তরণীর গতি পরিবর্ত্তন অথবা নীয়মন করিতে অপারগ, স্বার্থের পশরাই যাহাদের তরণীর একমাত্র পণ্য, আত্মসুখই যাহাদের চরম লক্ষ্য, ইহসংসারের অশন বসন শয্যা অলঙ্কারই যাহাদের একমাত্র আকাঙ্খনীয় বস্তু, তাহারাই এই প্রথার শীতল ছায়াতলে বিশ্রাম করিতে চায় না; তাহারাই ইহার মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া ইহাকে না'না দোষ দুষ্ট বলিয়া বৃথা নিন্দা করে। অতএব যাঁহারা এ প্রথার নিন্দা করেন, তাঁহারা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া তাহা করেন ইহা বলিলে অন্যায় হয় না। আমরা এ স্থলে আসল আদর্শের কথা ধরিয়াই বলিতেছি তাহা বলা বাহুল্য। যদি বর্ত্তমানে তাহার বিকৃতি ঘটিয়া থাকে, তবে তাহার সংস্কারই বাঞ্ছনীয়, উচ্ছেদ নহে। আমাদের সামাজিক ব্যাধির কবিরাজী চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য, ডাক্তারী বীর চিকিৎসার অস্ত্র প্রয়োগ করিতে যাওয়া বাতুলতা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক বৈদ্য সন্তানও স্বীয় পৈত্রিক চিকিৎসা প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া ডাক্তারী অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োগ সমাজ শরীরে করিবার জন্য উৎসুক; একান্ত বর্ত্তীতাও তাঁহাদের হস্তে নিস্তার পায় নাই। এই প্রথাতে অনেক দোষ প্রবেশ করিয়াছে সেজন্য ইহাকে পরিত্যাগ করা কি সমীচীন অথবা ইহার সংস্কার সাধনাই বাঞ্ছনীয়? আমাদের দোষেই তাহা খারাপ হইয়াছে, তাহার জন্য সেই প্রথাকে দোষী করিকে যাওয়া আর কবিরাজ কর্ত্তৃক পাঁচন চিকিৎসায় গোক্ষুর ব্যবস্থিত হওয়ায় রোগী কর্ত্তৃক গো-হত্যা করিয়া তাহার ক্ষুর আহৃত হইবার ফলে ব্যবস্থায় দোষারোপ করা একই প্রকারের মূর্খতা বলা যায়। অতএব আমাদের মতে এই প্রথার সদুদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার মধ্যে যা কিছু ময়লা মাটি আবর্জ্জনা কলঙ্ক প্রবেশ করিয়াছে, তাহা মুক্ত করিয়া ইহার প্রকৃত রূপ প্রকাশিত করাই ভাল। সকলেই এই প্রথার মধ্যে বাস করেন; হৃদয় একটু প্রশস্ত করিয়া দৃঢ় ভাবে ন্যায়পথে ইহাকে চালিত করিলে বোধ হয় একমাত্র এই প্রথার দ্বারাই জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতি অনেক সাধিত হইতে পারে। আমরা সংসারে এই প্রথার সুফল সমূহ প্রথমে আলোচনা করিয়া এবং পারস্পরিক কর্ত্তব্য বিচার করিয়া তাহার পর ইহার দোষের উল্লেখ করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রত্যাবর্ত্তন।

সুদীর্ঘ তপস্যা অন্তে এস আজ ফিরে
তৃষিত এ কর্ম্মক্ষেত্রে, হে তাপসবর!
জননী দাঁড়ায়ে আছে পরাইতে শিরে
বিজয় মালিকাখানি, শীতল সুন্দর।
বাজিছে মঙ্গলশঙ্খ মায়ের মন্দিরে,
বন্দনা গাহিছে তব মুগ্ধ ভ্রাতৃদল,—
অযুত হৃদয় হ'তে উঠিছে গম্ভীরে
আবাহন-গীতি তব, প্লাবি নভতল!
নিরাশা তামস মাঝে ভবিষ্য গগনে
দৃষ্টি তব আছে স্থির, লক্ষ্য অবিচল,
দেখায়েছ পথহারা দেশবাসীগণে,
ঊষার অরুণ আভা, দীপ্ত সমুজ্জ্বল!
এস দেব, এস ফি'র, কেটে গেছে রাত,
আসিছে অদূরে ওই শুভ সুপ্রভাত!

শ্রীসন্তোষকুমার বসু।

আবাহন।

(১)

আজ মুক্তি সাথে দণ্ড মাথে
আসিলে কি গো সন্ন্যাসী।
বিভুর কৃপায় নিরদয়
ব্যূহচক্র ভেদ করি।
বঙ্গভূমির সন্তান ধীর
মায়ের তরে উচ্ছ্বসি,
তুমি দেশ হিতে তৃপ্ত চিতে
ত্যাগের মন্ত্র প্রচারী।

(২)

সপ্তরথি এল যবে
শত বজ্র উদ্ভাসি,
অমানিশা এল যবে
দিগন্তর ছাইয়া;
ভৈরবের মহা নৃত্যে
রুদ্র তালে নিষ্পেসি,
বক্ষ হতে নিল যবে
হৃদপিণ্ড ছিনিয়া;

(৩)

স্নেহে বক্ষ দীর্ণ হল
শোক স্রোতে উথলি,
মহাসিন্ধু পদে তোরে
শিশু সম অর্পিল।
শত ঝঞ্ঝা মধ্যে ছিনু
বজ্রাহত অপেক্ষি;
কৃপা স্রোতে উচ্ছ্বসিয়ে
কবে তুই ফিরিবি।

(৪)

তবে এস আজ তপ্ত বঙ্গে
মাতৃ অঙ্কে সন্ন্যাসী,
ব্রহ্ম জ্ঞানে সাম্য প্রেমে
দশদিশি উল্লাসি!
যবে ত্যাগ মন্ত্রে দীপকেতে
মাতৃ নাম গাহিলে।
মাতৃপদে পদ্মাসনে
হৃদি তন্ত্রী বাঁধিলে।

(৫)

এল গর্জ্জে বায়ু রুদ্র তেজে
কুজ্ঝটিকা ছায়।
দুঃখানলে পূর্ণাহুতি
দিলে মার পায়।
দিলে অগ্নি যজ্ঞে নিজাত্মারে
পূত অর্ঘ সম,
হবিরূপে পুণ্য হোমে
চিত্ত নিরুপম।

(৬)

শত বজ্র ঘেরে তোরে
বিশ্ব ত্রস্ত হয়,
বিশ্ব প্রেমে সিদ্ধ সাধক
ব্রহ্ম তেজে রয়।
তবে এস সৌম্য মাতৃভক্ত
জয়ী পরীক্ষায়;
নির্ব্বাসন বাণে বিদ্ধ
দীন বঙ্গে আয়।

বঙ্গনারী।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ।

বোমার মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি লাভের পর
'সুপ্রভাতের' জন্য বিশেষ করিয়া
ফটো তোলা হইয়াছে।

নন্দকুমার।*

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় নন্দকুমার সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমার প্রতি যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি নিম্নে যথাসাধ্য সেগুলির উত্তর প্রদান করিতেছি। উত্তর গুলি তাঁহার রুচিকর হইবে কি না বলিতে পারি না। কারণ, তিনি নন্দকুমারকে যেরূপ চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের উত্তরে যে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, সেরূপ ভরসা অল্প, তবে আমরা নন্দকুমারকে যেরূপ বুঝিয়াছি, তদনুযায়ী তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিতেছি, উহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহা সাধারণে বিচার করিবেন।

যোগীন্দ্র বাবুর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি দুই চারিটি কথা বলিতে চাহি। যোগীন্দ্র বাবু আপনাকে অনেক স্থলে অনভিজ্ঞ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তাহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে তিনি প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ন্যায় প্রশ্নগুলি করেন নাই। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রথমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। তাঁহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সন্দেহ নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যোগীন্দ্র বাবু সৈয়র মুতাক্ষরীণ পড়িয়া নন্দকুমার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়াই ফেলিয়াছেন; এবং সেই ধারণা বলে আমাদের লিখিত নন্দকুমার সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু বলিতে পারি না। তাহা হইলেও তিনি যখন আপনাকে তাহাই বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, তখন আমরা তাহাই মানিয়া লইলাম। আশা করি, তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ন্যায় আমাদের কথা কয়টিই শুনিবেন, এবং সে বিষয়ে সন্দেহ হইলে সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য অন্যত্র চেষ্টা করিবেন। কেবল সৈয়র মুতাক্ষরীণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যেন নিশ্চিন্ত না হন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

এইখানে আমি একটি কথার অবতারণা করিতে চাহি। জগতের বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমরা সকলেই সেই বৈজ্ঞানিক যুগের লোক। কাজেই আমাদিগের সকল বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সকলেই অবগত আছেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী iuductive method এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, অথবা inductive method কেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলা যাইতে পারে। এই inductive method বিজ্ঞান শাস্ত্রের ন্যায় সকল শাস্ত্রেই প্রযোজ্য। ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব সে প্রণালী পরিত্যাগ করিলে বর্ত্তমান যুগে কদাচ আদৃত হইতে পারিবে না। সেই জন্য আমরা ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে inductive methodএর প্রয়োগ দেখিতে চাহি। তদনুসারে কেবল একটি মাত্র ঘটনা বা একখানি মাত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমরা সমীচীন মনে করি না। কারণ, তাহা বৈজ্ঞানিক রীতি বিরুদ্ধ। যোগীন্দ্র বাবু যদি সেই রীতি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আমরা বিশেষরূপ আনন্দ লাভ করিতাম। তিনি যদি কেবল সৈয়র মুতাক্ষরীণের বর্ণনার উপর নির্ভর না করিয়া নন্দকুমার সম্বন্ধে যাবতীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন ও নিজে সমস্ত গুলির বিচার করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। তাহা হইলে তাহা আমাদের মতবিরুদ্ধ হইলেও আমরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতাম না। আমরা সিদ্ধান্ত অপেক্ষা প্রণালী অনুসরণের গুরুত্বেরই পক্ষপাতী। যোগীন্দ্র বাবু যদি সেই প্রণালী অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে আমরা সাহস সহকারে

* গত সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের প্রবন্ধের উত্তর।

বলিতে পারি যে, তিনি অন্ততঃ এটুকু স্বীকার করিতেন যে, নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন মত আছে, এবং উভয় মতেরই ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

এক্ষণে যোগীন্দ্র বাবুর জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতেছে। যোগীন্দ্র বাবু প্রথমে বলিতেছেন যে, নিখিল বাবু নন্দকুমারকে রাণা রাজসিংহ ও ছত্রপতি শিবাজীর সহিতই এক প্রকার তুলনা করিয়া গিয়াছেন। যোগীন্দ্র বাবুর এ উক্তি কি প্রকৃত? যোগীন্দ্র বাবু বোধ হয় আমাদের লিখিত প্রবন্ধটি একটু অন্য চক্ষে দেখিয়াছেন, অথবা তাহাতে বিশেষরূপ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। আমরা লিখিয়াছি,—

"মহারাজ নন্দকুমারের জীবনের প্রত্যেক কার্য্য সমালোচনা করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে অনেক স্থান ও সময়ের আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা অসম্ভব। তবে আমরা এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বাস্তবিক, মহারাজ নন্দকুমার তৎকালীন প্রবঞ্চক ইংরেজ কোম্পানীর হস্ত হইতে তাঁহার প্রভুর ও স্বদেশের স্বত্ব রক্ষার জন্য আপনার জীবন বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। সে বিষয়ের কোন বিরুদ্ধ তর্ক আমাদের মনে স্থান পায় না। তবে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য যে একেবারে স্বার্থশূন্য ছিল, সে কথাও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না। শিবাজী বা রাজসিংহের ন্যায় তাঁহার উদ্দেশ্য মহত্তর বা নির্ম্মলতর না হইতে পারে, তথাপি সে উদ্দেশ্যেরও যে যথেষ্ট মূল্য আছে, ইহাও অনায়াসে স্বীকার করিতে পারা যায়, বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে অন্যান্য বাঙ্গালীর ন্যায় বৈদেশিকের পদলেহন না করিয়া তিনি যে স্বদেশের স্বত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে।" নন্দকুমার সম্বন্ধে উহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। উপরোক্ত বর্ণনায় আমরা তাঁহাকে রাজসিংহ বা শিবাজীর সহিত তুলনা করি নাই। তবে তিনি যে মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য জীবন বলি দিয়াছিলেন, তাহার প্রশংসা করিয়াছি মাত্র।

যোগীন্দ্র বাবুর প্রথম বক্তব্য মুতাক্ষরীণকারের বৃত্তান্ত বিশ্বাস যোগ্য কি না? এই প্রশ্ন করিয়াই তিনি নিজেই আবার তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, আমরা তাহা বিশ্বাস যোগ্য বলিতে পারিব না। কারণ, তাহা হইলে আমরা নন্দকুমারকে যে গৌরবে ভূষিত করিয়াছি, তাহার কিছুই থাকে না। অবশ্য আমরা মুতাক্ষরীণকারের সহিত এক মত হইতে পারি না। তাহা হইলেও তাঁহার বর্ণিত ব্যাপার গুলি বিশ্বাস্য কি অবিশ্বাস্য তাহার একটা উত্তর আমরা দিবার চেষ্টা করিতেছি। মুতাক্ষরীণকার নন্দকুমারকে বলিতেছেন, "a man of an intriguing spirit" সে কথা আমরা একেবারে অস্বীকার করি না। আমরাও বলিয়াছি, "তবে সুচতুর ইংরাজ জাতির কূট নীতির সহিত তাঁহার প্রতিভা ও বুদ্ধির সংঘর্ষণ ঘটায়, কখন কখন তাঁহাকে যে কূট বুদ্ধির পরিচয় দিতে হইয়াছে, ইহা একেবারে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতিবলে তাঁহার যতদূর কৌশল ও চতুরতা প্রকাশ করার প্রয়োজন হইয়াছিল, ততদূর সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।" স্বীয় প্রভু ও স্বদেশের হিতের জন্য তিনি তৎকালীন প্রবঞ্চক ও শঠ ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে শঠ নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে a man of an intriguing spirit বলিলে তাঁহার গৌরবের হানি হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। মুতাক্ষরীণকারের দ্বিতীয় কথা এই যে, নন্দকুমারকে ভয়ানক প্রকৃতির লোক জানিয়া তিনি যাহাতে অপরকে বিপদে ফেলিতে না পারেন, তজ্জন্য গবর্ণর হেনরী ভান্সিটার্ট একখানি পুস্তকে নন্দকুমারের আমূল বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা জর্জ্জ ভান্সিটার্টকে তাহা দিয়া যান। জর্জ্জ তাহা কাউন্সিলে পাঠ করেন, তাহাতে সদস্যগণ নন্দকুমারকে কলিকাতার বাহিরে যাইতে নিষেধ

করেন। পরে ক্লাইব ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি উক্ত পুস্তক শ্রবণ করিয়া নন্দকুমারকে পদচ্যুত ও নজরবন্দী করেন।

হেনরী ভান্সিটার্ট তাঁহার সেই পুস্তকখানিতে কি লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে নন্দকুমার সম্বন্ধে তাঁহার যে মন্তব্য ছিল তাহা তাঁহার লিখিত "A narrative of the transactions in Bengal" নামক মুদ্রিত পুস্তক হইতে আমরা যাহা জানিতে পারি তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি,—

"As to Nund Coomar, he had hitherto made himself remarkable for nothing but a seditious and treacherous disposition, which had led him to perpetrate the most atrocious acts against our government, having been detected and convicted by the voice of the whole Board, in encouraging and assisting our enemies in their designs against Bengal; taking the opportunity of the indulgence granted him, of living in Calcutta, under the Company's protection, to make himself the channel for carrying on a correspondence between the Governor of Pondicherry, and the Shahzada then at war with us. During the Subahship of Jaffier Alee Cawn, he had distinguished himself by fomenting quarreis between him and the Presidency. After the promotion of Cossim Allee Cawn, he became as active, but with greater success, in inventing plots, and raising jealousies against him. This gave him an ascendency over some of the members of the Board, and made him a party object; by which and an unparalleled perseverance, he was unable to set the whole community in a flame. Such was the man whom the Nabob chose for the administration of his affairs, and whole exaltation to this rank, he made a condition of his acceptance of the Subaship."

ইহা হইতে কি এরূপ বুঝা যায় না যে, নন্দকুমার তৎকালীন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নানা প্রকার চেষ্টা করায় কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন? এবং সেই চেষ্টা যে তাঁহার স্বীয় প্রভু ও স্বদেশের উদ্ধার সাধনের জন্য তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ভান্সিটার্টের উক্ত উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, নন্দকুমার তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁহাদের ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলেন। তবে হেনরী ভান্সিটার্টের লিখিত সে পুস্তকে আর কিছু ছিল কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না।

ভান্সিটার্টের লিখিত উপরোক্ত বিবরণের সহিত মুতাক্ষরীণের বর্ণনা মিলাইলে আমাদের সিদ্ধান্ত যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহারই উপকরণ উভয় গ্রন্থ হইতে বাছিয়া লওয়া যায়। মুতাক্ষরীণের intrinsic worth আমরাও একেবারে অস্বীকার করি না। অবশ্য তাহা তাহার ঘটনা নির্দ্দেশের জন্য, কিন্তু তাহার মতামত আমরা শিরোধার্য্য করি না। তাহার বলিয়া কেন, কোন গ্রন্থ বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের মত আমরা শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত নহি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা inductive method এর পক্ষপাতী। সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের বা গ্রন্থ বিশেষের মত, আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত ঐক্য হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাকে বিশিষ্ট প্রমাণ স্থলে উপস্থাপিত করিয়া থাকি। সেই জন্য আমরা অনেক স্থলে মুতাক্ষরীণকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তাহার মত আমরা সকল সময়ে গ্রহণ করিতে পারি নাই। মুতাক্ষরীণে সমসাময়িক ঘট-

নার বিবরণ থাকিলেও তাহার মতামত যে নিরপেক্ষ তাহা কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারিবেন না। কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের সহিত মুতাক্ষরীণকারের যে ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল, তাহা তাঁহার গ্রন্থ অনুশীলন করিলে সুচারুরূপে বুঝা যায়। ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই মূল গ্রন্থের অনুবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। রেমণ্ড বা হাজী মুস্তাফা তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পুরণ করিয়া সেই অনুবাদ গ্রন্থ তাঁহারই নামে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, মুতাক্ষরীণকার পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি সমসাময়িক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিলেও তাঁহার মতামত যে নিরপেক্ষ ছিল, তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে ইংলিশম্যান পত্রে বাঙ্গলার রাজনৈতিক ব্যাপারের ঘটনাবলী প্রকাশিত হইয়া যেরূপ মতামত প্রকাশিত হইতেছে, শত বৎসর পরে কোন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু এই সময়ের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে লিখিত বিবরণাদির সহিত ঐক্য করিয়া তাহার কিরূপ worth প্রদান করিতে পারেন, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মুতাক্ষরীণে অনেক পরিমাণে যে সেইরূপ মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অন্যান্য গ্রন্থের সহিত আলোচনা করিলে সুচারুরূপে বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য আমরা তাহাকে ইংলিশম্যানের সহিত তুলনা করিতে চাহি না। কিন্তু তাহা যে পক্ষপাতিত্ব দোষে অনেক পরিমাণে দুষ্ট তাহা অস্বীকার করা যায় না। এরূপ স্থলে মুতাক্ষরীণের মত যে সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই আমরা বিবেচনা করিয়া থাকি।

মুতাক্ষরীণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে তাহাতে লিখিত দুই একটি বিষয়ের কথা বলিয়া আমরা যোগীন্দ্র বাবুর অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দানে চেষ্টা করিব। মুতাক্ষরীণকার মহম্মদ রেজা খাঁর সহিত নন্দকুমারের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি রেজা খাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া নন্দকুমারের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। রেজা খাঁ কিরূপ ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, যে রেজা খাঁর চাউলের একচেটিয়া ব্যবসায় তাহার অন্যতম কারণ। তদ্ব্যতীত নিজামতের তহবিল তছরুপাত প্রভৃতি ব্যাপার যাঁহার দ্বারা ঘটিয়াছিল, তিনি যে কিরূপ ব্যবহার পাইতে পারেন তাহা সাধারণে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

মুতাক্ষরীণকার আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, নন্দকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার অগাধ সম্পত্তি সহ তাঁহার বাক্সে অনেকগুলি বড় বড় লোকের নামের জাল সীল মোহরও পাওয়া যায়। এইটি মুতাক্ষরীণকারের গ্রন্থ ব্যতীত আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য সমসাময়িক ব্যক্তি যাঁহারা নন্দকুমারকে অন্যভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ইহার উল্লেখ করেন নাই। অন্য কোন স্থানে ইহার বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করায়, আমরা মুতাক্ষরীণকারের উপরোক্ত উক্তিকে স্বীকার করিতে পারি নাই।

তাহার পর যোগীন্দ্র বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, আমরা তৎসম্বন্ধে অনেক কথা খরচ করিয়াছি লিখিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবুর উক্তি সম্বন্ধে কেন আমাদিগকে অনেক কথা খরচ করিতে হইয়াছে, তাহা বোধ হয় যোগীন্দ্র বাবু মুর্শিদাবাদকাহিনীর ২য় সংস্করণে পাঠ করিয়া থাকিবেন। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। বার্ক নন্দকুমারকে যে Great Rajah Nonda Comur বলিয়াছেন, যোগীন্দ্র বাবু এই Great Rajahকে মহারাজা অর্থ করিতে চাহেন। বার্ক মহারাজা কথাটীর অনুবাদ যে Great Rajah করিয়াছেন, তাহা যোগীন্দ্র বাবু ব্যতীত আর কেহ স্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। বার্ক মহারাজা কথাটি ব্যবহারের ইচ্ছা করিলে Maharajahই বলিতেন। কারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি অনেক বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। তাহার নবাব, বাদশাহ রাজা, মহারাজা এ সমস্ত কিছুই তাঁহার অবিদিত ছিল না। আমার একজন বন্ধু বর্ত্তমান উপাধিধারী

রাজা মহারাজাদিগকে রহস্য করিয়া King, Great King বলিয়া থাকেন। বার্ক যদি সেইরূপ Great King কথাটি ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলেও শোভা পাইত। কিন্তু তিনি মহারাজার স্থলে Great Rajah ব্যবহার করিয়াছেন ইহা আমাদের বুদ্ধিতে আসেনা। তাহার পর বার্ক যে Party feeling এর বশবর্ত্তী হইয়া নন্দকুমারকে Patriot বলিয়াছেন ইহাও যোগীন্দ্র বাবুর কল্পিত উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে নন্দকুমার যোগীন্দ্র বাবুর মতে পাষণ্ড ও নগেন্দ্র বাবুর মতে Villain, বার্কের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাকে অন্যরূপ না দেখিলে কেবল যে Party feeling এর বশে ঐরূপ চিত্রিত করিবেন, ইহা কাহারও মনে লয় না। তবে Party-feelingএ অতিরঞ্জন হইতে পারে। অতিরঞ্জন অর্থে বর্ণান্তরীকরণ নহে। যাহার যে বর্ণ আছে তাহাকে গাঢ় করিয়া তোলার নাম অতিরঞ্জন। একটি প্রাচীন কথা আছে যে, "নহি নীলং শিল্পি সহস্রেনাপি শক্যং পীতং কর্ত্তুম্।" শিল্পি সহস্র কদাচ নীলকে পীত করিতে পারে না, সেইরূপ নন্দকুমারকে কৃষ্ণ জানিয়া বার্কের ন্যায় পুরুষ কখনও তাঁহাকে পীত করিতে চেষ্টা পাইতেন না। বার্ক নন্দকুমারের Patriotism এর কিছুমাত্র প্রমাণ না পাইলে যে তাঁহাকে Patriot রূপে চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। নন্দকুমারের পরমশত্রু ওয়ারেন হেষ্টিংসের অভিমত তাহার সমর্থন করিতেছে। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"He (Mr. Hastings) thinks it but justice to make a distinction between the violation of a trust, and an offence committed against our government, by a man who owed it no allegiance, nor was indebted for protection; but on the contrary, was the actual servant and minister of a master whose interest naturally suggested that kind of policy which sought, by foreign aids and the diminution of the power of the company, to raise his own consequence and re-establish his authority. He has never been charged with any infidelity to the Nabob Meer Jaffier, the constant tenor of whose politics, from his first accession to the Nizamat till his death, correspond in all points so exactly with the artifices which were detected in his minister, that they may be as fairly ascribed to the one as to the other; their immediate object was, beyond question the aggrandisement of the former, though the latter had ultimately an equal interest in their success. The opinion which the Nabab himself entertained of the services and of the fidelity of Nuncomar evidently appeared, in the distinguished works which he continued to shew him of his favour and confidence of the latest hour of his life. His conduct in the succeeding administration appears not only to have been dictated by the same principles, but if we may be allowed to speak favourably of any measures which oppose the views of our government, and aimed at the support of our adverse interest, surely it was not only not culpable but even praise-worthy. He endeavoured (as appears by the extracts before us) to give consequence to his Master, and to pave the way to his independence by attaining a fireman from the king for his appointment to the Subahship; and

he opposed the promotion of Mahamed Reza Cawn because he looked upon it as a supercession of the rights and authority of the Nabab." (Extract of the proceedings of the Committee of Circuit at Cossimbazar, dated the 28th of July 1772).

বার্ক এই সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই নন্দকুমারকে Patriot বলিয়াছিলেন।

তাহার পর যোগীন্দ্র বাবু নন্দকুমারের ইংরাজ হস্তে চন্দননগরের অর্পণ করার কথা উল্লেখ করিয়া সিরাজ-উদ্দৌলার প্রতি তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার কথাটি কিছু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং সাধারণকে সেই দোষটি বিশেষ রূপে দেখাইয়া নন্দকুমারের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আমাদের উক্তিও মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবশ্য চন্দননগর অর্পণ যে নন্দকুমার চরিত্রের ভীষণ কলঙ্ক তাহা আমরা অস্বীকার করি নাই, এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নন্দকুমারকে জীবন বলি দিতে হইয়াছিল। ইহা আমরা সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছি। কিন্তু যোগীন্দ্র বাবু যে বলিয়াছেন, নন্দকুমার সুবিধা পাইলে হয় ত মীরজাফরকেও পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, ইতিহাস তাহা স্বীকার করে না। মীরজাফরের পরিত্যাগ করার অনেক সুবিধা ছিল। সে সময়ে ইংরাজ কোম্পানীর অসীম প্রভুত্ব। সুতরাং তৎকালে ইচ্ছা থাকিলে নন্দকুমার অক্ষম মীরজাফরের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা না করিয়া অনায়াসে ইংরাজদিগের সহিত যোগ দিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তিনি ঘোর বিপদ মস্তকে লইয়াও যখন মীরজাফরের ও বঙ্গদেশের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন চন্দননগর অর্পণ তাঁহার জীবনের ভ্রম ব্যতীত কদাচ তাঁহার চরিত্র-ধর্ম্ম বলা যায় না। তাহার পর নন্দকুমারের ইংরাজদিগের নিকট হইতে ১২ হাজার টাকা লওয়ার কথায় আমাদের যে আস্থা নাই সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এক্ষণেও তাহাই বলিতেছি, কারণ ১২ হাজার টাকা হুগলীর ফৌজদারের নিকট অতি সামান্য অর্থই ছিল। হুগলীর ফৌজদারের বেতন অনেক ছিল। তদ্ব্যতীত হুগলী প্রসিদ্ধ বন্দর হওয়ায় ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে ফৌজদারের অনেক টাকা প্রাপ্য ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস খাঁজেহান নামক এক ব্যক্তিকে বার্ষিক ৭২০০০ টাকায় হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে নিজে বৎসরে ৩৬ হাজার টাকা ও তাঁহার দেওয়ান কান্তবাবু হাজার টাকা উৎকোচ লইতেন। সেই পদের লোকের পক্ষে ১২ হাজার টাকা যে সামান্য তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। অমের্ণ বলিয়াছেন বলিয়াই যে মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ যুক্তির সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারি না। হুগলীর ফৌজদারী প্রাপ্তির পূর্ব্বে নন্দকুমার হুগলীর দেওয়ান হন, শুল্ক বিভাগ হইতে অনেক অর্থ তিনি উপার্জ্জন করেন, যদিও তৎপূর্ব্বে তিনি অর্থকষ্টে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু হুগলীর দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া তিনি অনেক অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নিকট ১২ হাজার টাকা যে সামান্য ইহা আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি। ১২ বার হাজার টাকার জন্য নন্দকুমার কদাচ এরূপ একটি গুরুতর পাপ করেন নাই।

যোগীন্দ্র বাবু আমাদের লিখিত নবকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় মাসিক ৬০ টাকা বেতনের মুন্সীর যে এরূপ রাজনৈতিক শক্তি ছিল, তাহা আমরা এই প্রথম শুনিলাম। এইটুকু মাত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, নন্দকুমারও ক্লাইভ সাহেবের মুন্সী ছিলেন, তবে নন্দকুমারের ন্যায় নবকৃষ্ণে রাজনৈতিক শক্তি প্রযোজ্য হইতে পারে না কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাহি যে যোগীন্দ্র বাবু আমাদের উক্তির পূর্ব্বে যদি নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের উক্তিটি উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে সাধারণে তাহার বিচার করিতেন। তিনি না করিলেও আমরাই তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"What learned historians have been able to observe after a long and careful observation, Nubkissen saw at once with the shrewd eye of a practical statesman. Nubkissen, so far as he helped the consummation, did so out of the same necessity which compelled Englishmen to invite William of Orange to occupy the throne rendered vacant by the constructive abdication of James II."

এ সময়ে নবকৃষ্ণ ৬০ টাকার মুন্সী, নন্দকুমার ক্লাইভের মুন্সী ছিলেন না, তবে তিনি সামান্য কার্য্য হইতে শেষে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাতে নবকৃষ্ণ অপেক্ষা রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ হওয়ার সম্ভব ছিল। তবে ঘোষ মহাশয় নবকৃষ্ণকে যেরূপ রাজনৈতিক প্রতিভা সম্পন্ন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, আমরা নন্দকুমারকে ততদূর করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমরা লিখিয়াছি, তাঁহাতে রাজনৈতিক শক্তির বীজ ছিল, কিন্তু অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই।

যোগীন্দ্র বাবুর শেষ কথা এই যে, নন্দকুমারের হত্যায় কলিকাতাবাসিগণের মত থাকায় তাহাদের মতের মূল্য যে নবাব নাজিমের মত অপেক্ষা অধিক তাহা সকলে স্বীকার করিবেন। আমরা তাহা স্বীকার করি না, এবং সকলেই যে তাহা স্বীকার করিবেন, এরূপও বোধ হয় না। কারণ নবাব নাজিমের মত অপেক্ষা কলিকাতাবাসিগণের মতের মূল্য অধিক ইহা কখনই বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ কলিকাতাবাসী অর্থে কি ওয়ারেন হেষ্টিংসের পদলেহনকারী জনকয়েক চাটুকার? কলিকাতার সাধারণ লোক যে ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অনেকে এই হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে গঙ্গা জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, অনেকে কলিকাতা হইতে বালি প্রদেশে গিয়া বাস করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের ত কথাই নাই। ফলতঃ যোগীন্দ্র বাবুর এরূপ উক্তি অত্যন্ত লজ্জাকর সন্দেহ নাই।

আমরা যোগীন্দ্র বাবুর প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য উত্তর দানে চেষ্টা করিয়াছি। কেবল দুই একখানি গ্রন্থের মতের উপর নির্ভর করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমরা সমীচীন মনে করি না। সত্যনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচারের পর যেরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হয়, তাহাই সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। আমরা কোন গ্রন্থের দোহাই দিতেছি না। নন্দকুমারের যে সমস্ত সৎকীর্ত্তি আজিও তাঁহার জন্মভূমিকে অলঙ্কৃত ও মুখর করিয়া রাখিয়াছে, যিনি মৃত্যুকালে বীরপুরুষের ন্যায় আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, কেবল মাত্র সেইরূপ তাঁহার জীবনের দুই একটী ঘটনায় তাঁহাকে জনসাধারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিয়া যিনি উমিচাঁদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, তিনি যদি Hero হন, এবং তাঁহার জন্য যদি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের চেষ্টা হয়, তাহা হইলে নন্দকুমারকে Hero বলিলে বোধ হয় তত দোষের হইবে না। উপসংহার কালে যোগীন্দ্র বাবুকে একটি কথা বলিতে চাহি। তিনি যখন আপনাকে বারম্বার তত্ত্বজিজ্ঞাসু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তখন আমরা বোধ হয় তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিলে তত দোষের হইবে না। সে উপদেশ আর কিছুই নহে,—

"Read and you will know"

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

কারাকাহিনী।

১৯০৮ সনের শুক্রবার ১লা মে আমি বন্দেমাতরম্ আফিসে বসিয়াছিলাম তখন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী আমার হাতে মজঃফরপুরের একটি টেলিগ্রাম দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম মজঃফরপুরে বোমা ফ'টিয়াছে, দুটি য়ুরোপীয়ান স্ত্রীলোক হত। সেদিনের এম্পায়ার কাগজে আরও পড়িলাম, পুলিস কমিশনার বলিয়াছেন আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না তখন যে আমিই এই সন্দেহের মুখ্য লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিসের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লবপ্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্ত নেতা। জানিতাম না যে এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বৎসরের কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গেই যতই বন্ধন ছিল, সবই ছিন্ন হইবে, এক বৎসর কাল মানবসমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে। আবার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তথায় সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নূতন মানুষ, নূতন চরিত্র, নূতন বুদ্ধি, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া নূতন কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে। বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস, বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রমবাস। অনেকদিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম; উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্ম্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরম দয়ালু সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন কুটীরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার। আমার জীবনে এই আশ্চর্য্য বৈপরীত্য বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে আমার হিতৈষী বন্ধুগণ আমার যতই না উপকার করুন, অনিষ্টকারীগণ—শত্রু কাহাকে বলিব, শত্রু আমার আর নাই—শত্রুই অধিক উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা অনিষ্ট করিতে গেলেন, ইষ্টই হইল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোপ দৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম। কারাগৃহ বাসে আন্তরিক জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কয়েকটী বাহ্যিক ঘটনা মাত্র বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যাহা কারাবাসের মুখ্য ভাব তাহা প্রবন্ধের প্রারম্ভে একবার উল্লেখ করা ভাল বিবেচনা করিলাম। নতুবা পাঠকগণ মনে করিবেন যে কষ্টই কারাবাসের সার। কষ্ট যে ছিল না তাহা বলা যায় না, কিন্তু অধিকাংশ কাল আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছে।

শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিলাম, ভোরে প্রায় ৫টার সময় আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র ঘরটী সশস্ত্র পুলিসে ভরিয়া উঠিল; সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান, ২৪ পরগণার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদকুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্ত্তি, আর কয়েকজন ইন্‌স্পেক্টার, লাল পাগড়ি, গোয়েন্দা, খানাতল্লাসীর সাক্ষী। হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক কামানসহ একটী সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল। শুনিলাম, একটী শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষ আমার ভগিনীর বুকের উপর পিস্তল ধরে, তাহা স্বচক্ষে দেখি নাই। বিছানায় বসিয়া আছি, তখনও অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থা, ক্রেগান জিজ্ঞাসা করিলেন, অরবিন্দ ঘোষ কে, আপনিই কি? আমি বলিলাম, আমিই অরবিন্দ ঘোষ। অমনি

একজন পুলিসকে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে বলেন। তাহার পর ক্রেগানের একটি অতিশয় অভদ্র কথায় দুজনের অল্পক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা হইল। আমি খানাতল্লাসীর ওয়ারেণ্ট চাহিলাম, পড়িয়া তাহাতে সহি করিলাম। ওয়ারেণ্টে বোমার কথা দেখিয়া বুঝিলাম, এই পুলিস সৈন্যের আবির্ভাব মজঃফরপুরের খুনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কেবল বুঝিলাম না আমার বাড়ীতে বোমা বা অন্য কোন স্ফোটক পদার্থ পাইবার আগেই body warrantএর অভাবে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে। তবে সেই সম্বন্ধে বৃথা আপত্তি করিলাম না। তাহার পরেই ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্থানী কনষ্টেবল সে দড়ি ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময়েই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র বসুকে পুলিস উপরে আনে, তাহাদেরও হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি, প্রায় আধ ঘণ্টার পর কাহার কথায় জানি না, তাহারা হাতকড়ি ও দড়ি খুলিয়া লয়। ক্রেগানের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্ত্তে ঢুকিয়াছেন, যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট আইন ভঙ্গকারী, আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্র কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া পড়িলেন। বিনোদ বাবু তাঁহাকে আমার সম্বন্ধে কি বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার পর ক্রেগান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি নাকি বি,এ পাস করিয়াছেন? এইরূপ বাসায় এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়াছিলেন, এই অবস্থায় থাকা কি আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক নহে?" আমি বলিলাম, "আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই থাকি।" সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন, "তবে কি আপনি ধনী লোক হইবেন বলিয়া এই সকল কাণ্ড ঘটাইয়াছেন?" দেশহিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ বা দারিদ্র্য ব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থূলবুদ্ধি ইংরাজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিলাম না।

এতক্ষণ খানাতল্লাসী চলিতেছে। ইহা সাড়ে পাঁচটার সময় আরম্ভ হয় এবং প্রায় সাড়ে এগারটায় শেষ হয়। বাক্সের ভিতর বা বাহিরে যত খাতা, চিঠি, কাগজ, কাগজের টুক্‌রা, কবিতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ যাহা পাওয়া যায়, কিছুই এই সর্ব্বগ্রাসী খানাতল্লাসীর কবল হইতে মুক্তি পায় না। খানাতল্লাসীর সাক্ষীদের মধ্যে রক্ষিত মহাশয় যেন একটু মনঃক্ষুণ্ণ; পরে অনেক বিলাপ করিয়া তিনি আমাকে জানাইলেন পুলিস তাঁহাকে কিছু না বলিয়া হঠাৎ ধরিয়া লইয়া আসে, তিনি আদবে খবর পান নাই যে, তাঁহাকে এমন ঘৃণিত কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। রক্ষিত মহাশয় অতি করুণ ভাবে এই হরণ কাণ্ড বর্ণনা করেন। অপর সাক্ষী সমরনাথের ভাব অন্যরূপ, তিনি বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত প্রকৃত রাজভক্তের ন্যায় এই খানাতল্লাসীর কার্য্য সুসম্পন্ন করেন, যেন to the manner born। খানাতল্লাসীতে বিশেষ কোন উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হয় নাই। তবে মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে এটা কি নূতন ও ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা যে মাটি ভিন্ন আর কিছু নয়, এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক, এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। আমি খানাতল্লাসীতে বাক্স খোলা ভিন্ন আর কোন কার্য্যে যোগদান করি নাই। আমাকে কোন কাগজ বা চিঠি দেখান বা পড়িয়া শুনান হয় নাই, মাত্র অলকধারীর একখানা চিঠি ক্রেগান সাহেব নিজের মনোরঞ্জনার্থ উচ্চৈঃস্বরে পড়েন। বন্ধুবর বিনোদ গুপ্ত তাঁহার স্বাভাবিক ললিত পদবিন্যাসে ঘর কম্পিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, শেল্‌ফ হইতে বা আর কোথা হইতে কাগজ বা চিঠি বাহির করেন, মাঝে মাঝে "অতি প্রয়োজনীয়, অতি প্রয়োজনীয়" বলিয়া তাহা ক্রেগানকে সমর্পণ করেন। এই প্রয়োজনীয়

কাগজগুলি কি তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সেই বিষয়ে কৌতূহলও ছিল না, কারণ আমি জানিতাম যে আমার বাড়ীতে বিস্ফোরক পদার্থের প্রস্তুত প্রণালী বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কোনও কাগজ থাকা অসম্ভব।

আমার ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার পর পুলিস পাশের ঘরে আমাদের লইয়া যায়। ক্রেগান আমার ছোট মাসীর বাক্স খুলেন, একবার দুইবার চিঠিতে দৃষ্টিপাত করেন মাত্র, তৎপরে মেয়েদের চিঠি নিয়ে দরকার নাই, এই বলিয়া তাহা ছাড়িয়া যান। তারপর একতলায় পুলিস মহাত্মাদের আবির্ভাব। একতলায় বসিয়া ক্রেগান চা পান করেন, আমি এক পেয়ালা কোকো ও রুটি খাই, সেই সুযোগে সাহেব তাঁহার রাজনৈতিক মতগুলি যুক্তি তর্ক দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। আমি অবিচলিতচিত্তে এই মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিলাম। তবে জিজ্ঞাসা করি, না হয় শরীরের উপর অত্যাচার করা পুলিসের সনাতন প্রথা, মনের উপরও এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করা কি unwritten lawএর চতুঃসীমার মধ্যে আসে? আশা করি, আমাদের পরম মান্য দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন।

নীচের ঘরগুলি ও নবশক্তি আফিসের খানা তল্লাসীর পর পুলিস নবশক্তির একটি লোহার সিন্দুক খুলিতে আবার দোতালায় যায়। আধ ঘণ্টা চেষ্টা করিয়া যখন অকৃতকার্য্য হইল, তখন তাহা থানায় লইয়া যাওয়াই ঠিক হইল। এইবার একজন পুলিস সাহেব একটী দ্বিচক্র যান আবিষ্কার করেন, তাহার উপর রেলের লেবেলে কুষ্টিয়ার নাম ছিল। অমনি কুষ্টিয়ায় সাহেবকে যে গুলি করে তাহারই বাহন বলিয়া এই গুরুতর প্রমাণ সানন্দে লইয়া যান।

প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমরা বাটী হইতে যাত্রা করিলাম। ফটকের বাহিরে আমার মেসো মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু গাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। মেসো মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার হইলে?" আমি বলিলাম, "আমি কিছুই জানি না, ইহাঁরা ঘরে প্রবেশ করিয়াই গ্রেপ্তার করেন, আমার হাতে হাতকড়ি দেন, বডি ওয়ারেণ্ট দেখান নাই।" মেসো মহাশয় হাতকড়ি হাতে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বিনোদ বাবু বলিলেন, "মহাশয়, আমার অপরাধ নাই, অরবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, আমিই সাহেবকে বলিয়া হাতকড়ি খুলাইয়া নিলাম।" ভূপেন বাবু অপরাধ জিজ্ঞাসা করায় গুপ্ত মহাশয় নরহত্যার ধারা দেখাইলেন; ইহা শুনিয়া ভূপেন বাবু স্তম্ভিত হইলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। পরে শুনিলাম, আমার সলিসিটর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রে ষ্ট্রীটে আসিয়া থানাতল্লাসীতে আমার পক্ষে উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুলিস তাঁহাকে ফিরাইয়া দেয়।

আমাদের তিনজনকে থানায় লইয়া যাওয়া বিনোদ বাবুর ভার। থানায় তিনি আমাদের সঙ্গে বিশেষ ভদ্র ব্যবহার করিলেন। সেইখানেই স্নান ও আহার করিয়া লালবাজারে রওয়ানা হইলাম। লালবাজারে কয়েক ঘণ্টা বসাইয়া রয়ড্ ষ্ট্রীটে লইয়া যায়, সেই শুভ স্থানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইলাম। রয়ড্ ষ্ট্রীট ডিটেক্‌টিভ পুঙ্গব মৌলবী শাম্‌স-উল আলমের সহিত আমার প্রথম আলাপ ও প্রীতি স্থাপন হয়। মৌলবী সাহেবের তখন তত প্রভাব ও উৎসাহোত্তম হয় নাই, বোমার মামলার প্রধান অন্বেষণকারী কিম্বা নর্টন সাহেবের prompter বা জীবন্ত স্মরণ শক্তিরূপে তিনি তখন বিরাজ করেন নাই, রামসদয় বাবুই তখন এই মামলার প্রধান পাণ্ডা। মৌলবী সাহেব আমাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতিশয় সরস বক্তৃতা শুনাইলেন। হিন্দুধর্ম্ম ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের একই মূলমন্ত্র, হিন্দুদের ওঙ্কারের ত্রিমাত্রা অ উ ম, কোরাণের প্রথম তিন অক্ষর অ ল ম, ভাষাতত্ত্বের নিয়মে "ল"য়ের বদলে "উ" ব্যবহার হয়, অতএব হিন্দু ও মুসলমানের একই মন্ত্র। তথাপি নিজের ধর্ম্মের পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, মুসলমানের সঙ্গে আহার করা হিন্দুর পক্ষে নিন্দনীয়। সত্যবাদী হওয়াও ধর্ম্মের একটী প্রধান

অঙ্গ। সাহেবেরা বলেন, অরবিন্দ ঘোষ হত্যাকারীদলের নেতা, ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা বড় দুঃখ ও লজ্জার কথা, তবে সত্যবাদিতা রক্ষা করিতে পারিলে situation saved হয়। মৌলবীর দৃঢ় বিশ্বাস বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের ন্যায় উচ্চ চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাই করিয়া থাকুন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মৌলবী সাহেব নিজের মত ছাড়িলেন না। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রবল ধর্ম্ম ভাব দেখিয়া আমি অতিশয় চমৎকৃত ও প্রীত হইলাম। নিজে বেশী কথা বলা ধৃষ্টতা: মাত্র বিবেচনা করিয়া নম্রভাবে তাঁহার অমূল্য উপদেশ শুনিয়া লইলাম এবং তাহা সযত্নে হৃদয়ে অঙ্কিত করিলাম। এত ধর্ম্মভাবে মাতোয়ারা হইয়াও মৌলবী সাহেব ডিটেক্‌টিভগিরি ছাড়েন নাই। একবার বলিলেন, "আপনি যে আপনার ছোট ভাইকে বোমা তৈয়ার করিবার জন্য বাগানটি ছাড়িয়া দিলেন, বড় ভুল করিলেন, ইহা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই।" তাঁহার কথার অর্থ বুঝিয়া আমি একটু হাসিলাম; বলিলাম, "মহাশয়, বাগান যেমন আমার, তেমনি আমার ভাইয়ের, আমি যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, বা ছাড়িয়া দিলেও বোমা তৈয়ারী করিবার জন্য ছাড়িলাম, এ খবর কোথায় পাইলেন?" মৌলবী সাহেব অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না না আমি বলিতেছি যদি তাহা করিয়া থাকেন।" এই মহাত্মা নিজের জীবন চরিতের একটী পাতা আমাকে খুলিয়া দেখাইয়া বলিলেন "আমার জীবনে যত নৈতিক বা আর্থিক উন্নতি হইয়াছে, আমার বাপের একটী অতিশয় মূল্যবান উপদেশই তাহার মূল কারণ। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, সম্মুখের অন্ন কখনও ছাড়িতে নাই। এই মহাবাক্য আমার জীবনের মূলমন্ত্র, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়াছি বলিয়া আমার এই উন্নতি।" ইহা বলিবার সময় মৌলবী সাহেব যে তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইল যেন আমিই তাঁহার সম্মুখের অন্ন। সন্ধ্যা বেলায় স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। তিনি আমার উপর অত্যন্ত দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, সকলকে আমার আহার ও শয্যা সম্বন্ধে যত্ন করিতে বলিলেন। পরমুহূর্ত্তে কয়েকজন আসিয়া আমাকে ও শৈলেন্দ্রকে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে লালবাজার হাজতে লইয়া যায়। রামসদয়ের সহিত এই একবার মাত্র আমার আলাপ হয়। বুঝিতে পারিলাম লোকটী বুদ্ধিমান ও উদ্যমশীল কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী স্বর চলন সবই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক, সর্ব্বদা যেন তিনি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছেন। এইরূপ এক একজন আছে যাহাদের শরীর বাক্য চেষ্টা যেন অনৃতের অবতার। তাহারা কাঁচা মনকে ভুলাইতে মজবুত, কিন্তু যাহারা মনুষ্য চরিত্রে অভিজ্ঞ বা অনেক দিন লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে তাহাদের নিকট প্রথম পরিচয়েই তাহারা ধরা পড়ে।

লালবাজার দোতালায় একটী বড় ঘরে আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে রাখা হইল। আহার হইল অল্পমাত্র জলখাবার। অল্পক্ষণ পরে দুইজন ইংরাজ ঘরে প্রবেশ করেন, পরে শুনিলাম একজন স্বয়ং পুলিশ কমিশনার হালিডে সাহেব। দুইজনে এক সঙ্গে আছি দেখিয়া হালিডে সার্জ্জেণ্টের উপর চটিয়া উঠিলেন, আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, খবরদার এই লোকটীর সঙ্গে যেন কেহই না থাকে বা কথা বলে। সেই মুহূর্ত্তেই শৈলেনকে অন্য ঘরে সরাইয়া বদ্ধ করে। আর সকলে যখন চলিয়া যায়, হালিডে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই কাপুরুষোচিত দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া আপনার কি লজ্জা করে না?" আমি বলিলাম "আমি লিপ্ত ছিলাম, ইহা ধরিয়া লইবার আপনার কি অধিকার?" ইহার উত্তরে হালিডে বলিলেন, "আমি ধরিয়া লই নাই, আমি সবই জানি।" আমি বলিলাম, "কি জানেন বা না জানেন আপনারাই অবগত, এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি।" হালিডে আর কোন কথা বলিলেন না।

সেই রাত্রে আমার আর কয়েকজন দর্শক আসে, ইহারাও পুলিস। ইহাদের আসার মধ্যে এক রহস্য নিহিত ছিল, সে রহস্য আমি আজ পর্য্যন্ত তলাইতে পারি নাই! গ্রেপ্তারের দেড় মাস আগে একটী অপরিচিত ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তিনি বলেন, "মহাশয় আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নাই, তবে আপনার উপর ভক্তি আছে বলিয়া আপনাকে সতর্ক করিতে আসিলাম, আরও জানিতে চাই আপনার কোননগরের কোনও লোকের সঙ্গে কি আলাপ আছে, সেইখানে কখন কি গিয়াছিলেন বা সেখানে বাড়ী আছে কি?" আমি বলিলাম, "বাড়ী নাই, কোননগরে একবার গিয়াছিলাম, কয়েকজনের সঙ্গে আলাপও আছে।" তিনি বলিলেন, "আর কিছু বলিব না, তবে ইহার পর কোননগরের কাহারও সহিত দেখা করিবেন না, আপনার ও আপনার ভাই বারীন্দ্রের বিরুদ্ধে দুষ্টেরা ষড়যন্ত্র করিতেছেন, শীঘ্রই আপনাদিগকে তাহারা বিপদে ফেলিবে। আর আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।" আমি বলিলাম, "মহাশয় এই অসম্পূর্ণ সংবাদে আমার কি উপকার হইল আমি বুঝিতে পারিলাম না, তবে উপকার করিতে আসিয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ। আমি আর কিছু জানিতে চাই না। ভগবানের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তিনিই সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিবেন, সেই বিষয়ে নিজে চেষ্টা করা বা সতর্ক হওয়া নিষ্প্রয়োজন।" তাহার পরে এই সম্বন্ধে আর কোনও খবর পাই নাই। এই আমার অপরিচিত হিতৈষী যে মিথ্যা কল্পনা করেন নাই, এই রাত্রে তাহার প্রমাণ পাইলাম। একজন ইনস্পেক্টর আর কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া কোননগরের সমস্ত কথা জানিয়া লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, কোননগরে কি আপনার আদি স্থান? সেখানে বাড়ী আছে কি? সেইখানে কখনও গিয়াছিলেন? কবে গিয়াছিলেন? কেন গিয়াছিলেন? বারীন্দ্রের কোননগরের সম্পত্তি আছে কি? এইরূপ অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাপারটা কি ইহা বুঝিবার জন্য আমি এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। এই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলাম না, তবে প্রশ্নগুলির ও পুলিশের কথার ধরণে বোঝা গেল যে পুলিসে কি খবর পাইয়াছে তাহা সত্য কি মিথ্যা এই অনুসন্ধান চলিতেছে। অনুমান করিলাম যেমন তাই মহারাজের মোকদ্দমায় তিলককে ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও অত্যাচারী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং সেই চেষ্টায় বোম্বে গবর্ণমেণ্ট যোগদান করিয়া প্রজার অর্থের অপব্যয় করিয়াছিলেন,—তেমনই এ স্থলেও কয়েকজন আমাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

রবিবার সমস্ত দিন হাজতে কাটিয়া গেল। আমার ঘরের সম্মুখে সিঁড়ি ছিল। সকালে দেখিলাম কয়েক জন অল্প বয়স্ক বালক সিঁড়িতে নামিতেছে। মুখ চিনি না, কিন্তু আন্দাজে বুঝিলাম ইহারাও এই মোকদ্দমায় ধৃত, পরে জানিতে পারিলাম ইহারা মাণিকতলার বাগানের ছেলে। এক মাস পরে জেলে তাহাদের সঙ্গে আলাপ হয়। অল্পক্ষণ পরে হাত মুখ ধুইতে আমাকেও নীচে লইয়া যায়—স্নানের বন্দোবস্ত নাই, কাজেই স্নান করিলাম না। সেই দিন সকালে আহারের মধ্যে ডাল ভাত সিদ্ধ, কয়েক গ্রাস জোর করিয়া উদরস্থ করিলাম তাহার পর তাহা ত্যাগ করিতে হইল। বিকাল বেলা মুড়ি। তিন দিন ইহাই আমাদের আহার ছিল। কিন্তু ইহাও বলিতে হয় যে সোমবারে সার্জ্জেণ্ট আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চা ও রুটী খাইতে দিলেন।

পরে শুনিলাম আমার উকিল, কমিশনারের নিকট বাড়ী হইতে আহার দিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, হ্যালিডে সাহেব তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাও শুনিলাম যে, আসামীদের সঙ্গে উকিল বা এটর্ণির দেখা করা নিষিদ্ধ। জানি না এই নিষেধ আইনসঙ্গত কি না? উকিলের পরামর্শ পাইলে আমার যদিও সুবিধা হইত, তবে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল না বটে, কিন্তু তাহাতে অনেকের মোকদ্দমার ক্ষতি হইয়াছে। সোমবারে কমিশনারের নিকট আমাদের হাজির করে। আমার সঙ্গে অবিনাশ ও শৈলেন ছিল,

সকলকে ভিন্ন ভিন্ন দল করিয়া লইয়া যায়। আমরা তিনজনই পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে পূর্ব্বে গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম এবং আইনের জটিলতা কতকটা অনুভব করিয়াছিলাম বলিয়া তিনজনই কমিশনারের নিকট কোনও কথা বলিতে অস্বীকৃত হই। পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেট থর্ণহিলের কোর্টে আমাদের লইয়া যায়। এই সময় শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত, ম্যানুয়েল সাহেব আর আমার একজন আত্মীয়ের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ম্যানুয়েল সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুলিসে বলে আপনার বাড়ীতে অনেক সন্দেহজনক লেখা পাওয়া গিয়াছে, এইরূপ চিঠি বা কাগজ কি ছিল?" আমি বলিলাম, "নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ছিল না, থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অবশ্য তখন মিষ্টার পত্র '(sweets letter)' বা 'scribbling'এর কথা জানিতাম না। আমার আত্মীয়কে বলিলাম, "বাড়ীতে ব'ল কোন ভয় যেন করে না, আমার নির্দ্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে।" আমার মনে তখন হইতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইহা হইবেই। প্রথম নির্জ্জন কারাবাসে মন একটু বিচলিত হয়, কিন্তু তিনদিন প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটানর ফলে নিশ্চলা শান্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস পুনঃ প্রাণকে অভিভূত করে।

থর্ণহিল সাহেবের এজলাস হইতে আমাদের আলিপুরে গাড়ী করিয়া লইয়া যায়। এই দলে ছিল নিরাপদ, দীনদয়াল, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র দাসকে চিনিতাম, একবার মেদিনীপুরে তাঁহার বাড়ীতে উঠি। কে তখন জানিত যে এইরূপ বন্দীভাবে জেলের পথে তাঁহার সহিত দেখা হইবে। আলিপুরে আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে কতক্ষণ থাকিতে হইল, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আমাদিগকে হাজির করা হয় নাই, কেবল ভিতর হইতে তাহার হুকুম লিখাইয়া আনে। আমরা আবার গাড়ীতে উঠিলাম, তখন একটী ভদ্রলোক আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "শুনিতেছি ইহারা আপনার নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, হুকুম লেখা হইতেছে। হয় ত কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে দিবে না। এইবার যদি বাড়ীর লোককে কিছু বলিতে চান, আমি সংবাদ পৌঁছাইয়া দিব।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু যাহা বলিবার ছিল, তাহা আমার আত্মীয়ের দ্বারা জানান হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে আর কিছু বলিলাম না। আমার উপর দেশের লোকের সহানুভূতি ও অযাচিত অনুগ্রহের দৃষ্টান্তরূপে এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম। তৎপরে কোর্ট হইতে আমরা জেলে গিয়া জেলের কর্ম্মচারীগণের হাতে সমর্পিত হই। জেলে ঢুকিবার আগে আমাদের স্নান করায়, জেলের পোষাক পরাইয়া পিরাণ, ধুতি, জামা সংশোধিত করিবার জন্য লইয়া যায়। চারি দিন পরে আমরা স্নান করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম। স্নানের পর তাহারা সকলকে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়, আমিও আমার নির্জ্জন কারাগারে ঢুকিলাম, ক্ষুদ্র ঘরের গরাদ বন্ধ হইল। ৫ই মে আলিপুরে কারাবাস আরম্ভ। ৬ই মে নিষ্কৃতি পাই। ক্রমশঃ।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

ভারত-মঙ্গল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেরপর।)

উমার পশ্চাতে তাহার সঙ্গিনী ইন্দু উপরে আসিল। উমাকে শয্যায় দেখিয়া সে বলিল—"উমা, এখনই শুয়েছ যে? পড়তে যাবে না?" উমা কিছু বলিল না।

ইন্দু কাছে আসিয়া দেখিল উমা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া আছে। জোর করিয়া হাত টানিয়া লইয়া ইন্দু বলিল—"উমা কি হয়েছে?" উমা নিরুত্তর। "আমাকে বল্‌বে না, উমা? বল কি হয়েছে?" উমা কিছুই বলিতে পারিল না, কাঁদিতেও পারিল না।

দুই হাতে উমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অনেক আদর করিয়া ইন্দু বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; অবশেষে কোনই উত্তর না পাইয়া অভিমান করিয়া নীচে পড়িতে গেল।

যে চিঠিখানা অমর উমাকে পড়িতে দিয়াছিল, উমা তাহা টেবিলের উপর রাখিয়াছিল; অমরেরও সেটা লইবার কথা মনে হয় নাই। চিঠিখানা সেই রকম টেবিলের উপরেই পড়িয়াছিল। ভৃত্য আলো দিয়া গেলে মেয়েরা সেই ঘরে আসিয়া পড়িতে বসিল। একটি মেয়ে চিঠিখানা পাইয়া 'কার, চিঠি ভাই?' বলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"অমরনাথ কে?"

এই সময়ে ইন্দু বই লইয়া সেই ঘরে পড়িতে আসিতেছিল। 'অমরনাথ কে?' এ প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারিল না। বিস্মিত মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করিল—"অমরনাথ কে, জান?"

ইন্দু তখন উমার উপর অভিমান করিয়াছে, মনে মনে বড় রাগ করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আজ রাগ করিতে পারিতেছে না। তাই জোর করিয়া রাগ দেখাইয়া বলিল—"কে আবার? উমার দাদা।" ইন্দু উমার বন্ধু, তার কথা সব জানে।

"অ্যাঁ? উমার দাদা? কি ভয়ানক! উমা কোথায়?"

ইন্দু বিস্মিত ভাবে মেয়েটির চোখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"কেন? উমা উপরে।"

কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে মেয়েদের মধ্যে সংবাদ প্রচার হইয়া গেল যে, উমার বাবা মারা গিয়াছেন। এই সংবাদ মেয়েদের বুকে হঠাৎ আঘাত করিয়া সকলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। পিতা মাতা, ভাই ভগিনীকে ছাড়িয়া আসিয়া যে মেয়েরা বোর্ডিংএ বাস করে, তাহাদের মধ্যে একটা ভালবাসা জন্মিয়া যায়। সে ভালবাসা বড় সুন্দর। এই বোর্ডিং-বাসিনী বালিকাগণ কেহ কাহারও নিকট আর পর থাকে না, আপন ভগিনীর মত হইয়া যায়।

ইন্দু শুনিবামাত্র উপরে উমার কাছে আসিয়াছিল; এখন সব মেয়েরা দলে দলে আসিতে লাগিল। নিতান্ত ছোট মেয়েটি, সে বড় একটা কিছু বুঝিল না, সে-ও 'উমাদিদি'কে দেখিতে আসিল। সকলেই উমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ব্যস্ত হইল।

উপরে মেয়েদের গোলমাল শুনিয়া শিক্ষয়িত্রী আসিলেন। তিনি কথা বলিবার আগেই উমার পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। মেয়েদিগকে নীচে যাইতে বলিয়া তিনি উমার শয্যা প্রান্তে আসিয়া বসিলেন।

মেয়েরা নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে নামিয়া গেল। ইন্দুর সেদিন আর পড়া হইল না; কেবল অঞ্চল প্রান্তে অশ্রু মুছিতে লাগিল। পড়া কোন মেয়েরই বড় হইল না।

শিক্ষয়িত্রী উমার কাছে বসিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন; উমা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। আশ্চর্য্য মেয়ে! এই সময়ে চোখে এক ফোঁটা জল নাই! শিক্ষয়িত্রী অবাক্ হইলেন।

শয্যায় যাইবার সময় হইলে আবার একবার সকলে উমার কাছে আসিল। শিক্ষয়িত্রী আবার সকলকে শয়ন করাইয়া চলিয়া গেলেন; কেবল ইন্দু নিঃশব্দে উমার শিয়রে বসিয়া রহিল। সকলে হৃদয়ে সমবেদনার ব্যথা লইয়া শয়ন করিল।

বাল্যকালের ভালবাসা যেমন পবিত্র, তেমনি সুকোমল। ইহাতে কোন প্রকার স্বার্থের গন্ধ নাই, কিন্তু উহা বেশী আঘাত সহে না; নহিলে বাল্যকালে যাহাদের জন্য অকপটে কাঁদিতে হইয়াছে, বড় হইলে সেই তাহাদেরই কথা মনে থাকে না কেন? তখন তাহাদের জন্য এক বিন্দু অশ্রুও পড়ে না কেন? বুঝি অল্পেই ইহার মৃত্যু হয়!

(৪)

পরদিন সকালে উঠিয়া ইন্দু দেখিল বিষম জ্বর, উমার ক্ষুদ্র দেহখানিকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। শুষ্ক মুখে শিক্ষয়িত্রীদিগকে সে এই সংবাদ দিল।

যতদূর সম্ভব উমার সেবা ও চিকিৎসা হইতে লাগিল; ইন্দুর অক্লান্ত সেবা, সমস্ত মেয়েদের ভগিনি-স্নেহ, শিক্ষয়িত্রীদিগের উদ্বিগ্ন যত্ন, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা যাহা পারিল করিল, তবু জ্বরটা একেবারে ছাড়িল না; একটু একটু জ্বর প্রতিদিন হইতে লাগিল। পল্লীর উন্মুক্ত বায়ুতে ভাল হইতে পারে আশা করিয়া, অবশেষে অমর উমাকে লইয়া পিতৃ গৃহে যাত্রা করিল।

পথের কষ্টে উমা একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। শূন্য গৃহে পৌঁছিয়াই আজিমের সঙ্গে দেখা হইল। উমার নিজের ঘরে শয্যার উপরে তাহার অচেতনপ্রায় দেহখানিকে শায়িত করিয়া আজিম একটা পাখা লইয়া মাথার কাছে মাটীতে বসিল। উমা একবার চোখ মেলিয়া চাহিল না, যেন কিছু বুঝিতেও পারিল না; অমর ম্লান মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে আজিম ডাকিল—"উমা—দিদি!" উমা চোখ মেলিল। এতক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিলেও বাড়ীতে আসিয়াছে, কি হইতেছে উমা সব বুঝিতে পারিতেছিল, কিন্তু সব যেন অস্পষ্ট; কি একটা আবিলতা আসিয়া তাহার চোখের সম্মুখের সমস্ত জিনিসের উপর ছায়া ফেলিয়াছিল।

উমা চাহিলে আজিম আস্তে আস্তে দুই একটী করিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিল;—তাহার শরীরের কথা, বাড়ীর কথা, অমরের কথা। প্রতাপচন্দ্রের কথা বলিতেই আজিমের অশ্রু প্রবাহ বাধা মানিল না; দুই গণ্ড বাহিয়া প্রবলবেগে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। পিতার কথা শুনিয়া, আজিমের অশ্রু দেখিয়া আজ উমা কাঁদিতে পারিল। বালিসে মুখ লুকাইয়া বড় কান্নাই কাঁদিল।

অমরের মনে হইল দুর্ব্বল শরীরে এই ক্রন্দনের ফল ভাল হইবে না। একবার ভাবিল আজিমকে সেখান হইতে উঠাইয়া দিবে; কিন্তু কিছু বলিল না, যেমন ছিল তেমনি নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল।

কাঁদিয়া উমার ভাল হইল। পাষাণের মত হৃদয়ভার খানিকটা লঘু হইয়া গেল। চোখ মুছিয়া সে দাদাকে আহারে পাঠাইয়া দিল; আজিম তাহার কাছে থাকিতে চাহিলে তাহাকেও জোর করিয়া দাদার তত্ত্বাবধানে পাঠাইল।

সকলে চলিয়া গেলে উমা চিন্তায় মগ্ন হইল। এতক্ষণ তাহার চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না, শরীর মনের উপর একটা জড়তা আচ্ছন্ন করিয়াছিল; কাঁদিয়া সে জড়তা কাটিয়া গেল। কিন্তু মনে যে চিন্তা প্রবেশ করিল, সে চিন্তা আর গেল না। বাবা কবে কি বলিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন; বাবা উপাসনা করিতেন, ঈশ্বরকে ডাকিয়া তিনি সকল দুঃখ ভুলিতেন; এখন তিনি কোথায় আছেন? আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন কি? আমরা কেন দেখিতে পাই না? আমি মরিয়া গেলে দেখিতে পাইব কি? বাবা এখন মার কাছে গিয়াছেন; আমি মরিলেই ত তাঁদের কোলে যাইতে পারি। মরিলে সকলেই তো ঈশ্বরের কাছে যায়, তবে আমার কেন বাবার সঙ্গে দেখা হইবে না? আমি মরিয়া গেলে দাদা একা কি করিবেন? তাঁর বড় কষ্ট হইবে। তার চেয়ে আমরা দুজনে এক-সঙ্গে তাঁদের কাছে যাই না কেন? বালিকা

শয্যায় শুইয়া রাত্রি দিন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার একমাত্র আকাঙ্খা হইল—তাহার ও তাহার দাদার এক সঙ্গে মৃত্যু।

আহারের পর অমর ও আজিম আসিল। পূর্ব্ব রাত্রে পথে জাগরণের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া উমা বার বার অমরকে শুইতে যাইতে বলিল। অমর গেলে, তাহাকে ছাড়িয়া আজিম কিছুতেই যাইতে চাহিল না। রাত্রে যে তাহার কাছে জাগিবার কোনই দরকার নাই, যদিই দরকার হয় তাহা হইলে দাসীকে ডাকিবে ইহাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া উমা আজিমকেও শয়ন করিতে পাঠাইয়া দিল।

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত উমার ঘুম হইল না। উমা কেবল ভাবিতে লাগিল। ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সে একবার চারিদিকে চাহিল। দেখিল মৃদু প্রদীপ জলিতেছে; ঘরে কেহ নাই। দাসী দ্বারের কাছে শুইয়া আছে।

ক্ষীণস্বরে উমা একবার দাসীকে ডাকিল। কেহ উত্তর দিল না। উমা উঠিয়া বসিল। প্রদীপের আলোতে দেখিল দাসী বড় সুখে ঘুমাইতেছে। তাহার এই সুখের নিদ্রা ভাঙ্গিতে উমার ইচ্ছা হইল না। সারা রাত সে নিজে ঘুমায় নাই।

উমা দেখিল ঘরেই জলের কুঁজা রহিয়াছে। অপরের সাহায্য ব্যতীত সে উঠিতে পারে না; তবু চেষ্টা করিয়া উঠিয়া নিজেই জলপান করিয়া আসিল। শেষ রাত্রে আলো হইবার কিছু পূর্ব্বে উমা ঘুমাইয়া পড়িল।

অমরের আশা বিফল হইল। সে ভাবিয়াছিল বাড়ীতে আসিলে উমা ভাল হইবে। উমা ভাল হইল না। সে কখন কাঁদে না, কিন্তু কখন হাসেও না শিশুকাল হইতেই উমা শান্ত, ধীর প্রকৃতি; এখন তাহার সরল নির্ম্মল হাসি একেবারে নিভিয়া গেল। তাহার চিরদিনের ক্ষীণ দেহ এই আঘাত সহিতে পারিল না। মৃত্যু দিনে দিনে তাহার শীতল স্পর্শে উমার রক্তিম কপোল পাণ্ডু করিয়া দিতে লাগিল।

আশ্চর্য্য! অমর ইহা দেখিতে পাইল না! তাহাকে পরামর্শ দিবারও কেহ নাই। সে উমার চিকিৎসার্থ আবার তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। তখনও মায়াবিনী আশা অমরের মনের মধ্যে বসিয়া তাহার মায়া বীণায় ঝঙ্কার দিতেছিল।

অমর উমাকে লইয়া গেল; সঙ্গে গেল আজিম। সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সে উমার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিল।

দীর্ঘকাল চিকিৎসাতেও কোনও ফল হইল না। অমর না বুঝুক, উমা বুঝিল যে, এ পৃথিবীতে তাহার আর বেশী দিন থাকিতে হইবে না; তাহাদের চারিদিকের লোকেরাও ইহা বুঝিল। উমা বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার পিতা যে স্থানে শেষ নিশ্বাস ফেলিয়াছেন, উমা সেই স্থানে আপনার অন্তিম শয্যা বিছাইতে চায়।

উমা আবার তাহার পিতৃ গৃহে চলিল—মরিতে।

ক্রমশঃ।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

কারাকাহিনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

তৃতীয় বর্ষ। আষাঢ়, ১৩১৬। ১২শ সংখ্যা।

সুপ্রভাত

"নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা
আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে
প্রাচীন রজনী নাশো
নূতন উষালোকে।"

শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি,এ সম্পাদিত।

মূল্য সডাক ২৷৵০ টাকা।

আজ

ধনীর সুপ্রভাত ! গৃহীর সুপ্রভাত !

সৌখীনের সুপ্রভাত ! মহিলার সুপ্রভাত !

কারণ,

বঙ্গ-দেশের কারখানাজাত সাবানের মধ্যে

ন্যাশন্যাল সোপ

অভিনব শিল্পজগতে অভাবনীয় যুগান্তর
ঘটাইয়াছে।

আকারে ও গন্ধের স্থায়িত্বে

ন্যাশন্যাল সোপ

বিলাতী সাবানকে পরাস্ত করিয়াছে !

মূল্যও যথাসম্ভব সস্তা করা হইয়াছে !!

তা ... বজগতে আজ

সুপ্রভাত !

বাজারে সর্ব্বত্র প্রাং

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ।

(সুরাট কংগ্রেসের পর বরোদায় গমন করিলে বরোদা কলেজের ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই ফটো তুলিয়া তাঁহাকে উপহার দেন।)

সুপ্রভাত

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর ;
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

দ্বিতীয় বর্ষ। | আষাঢ়, ১৩১৬ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

সুপ্রভাত।

রজনী শেষে বিজন দেশে
কি শুভ নব লগনে
আসিনু জাগি শুনিয়া গীতি-বিহগের,
তিমির নাশি' মিহির আসি
উদিত চিত গগনে ;
সুপ্রভাত ভাতিল পূত জীবনের !
গগনে, বনে, প্রান্তরে,
ভবনে, মনে, অন্তরে,
কিরণ ধারে ঝরে তরুণ সত্য
জীবন-পারে মরে মরণ অন্ত।
নবীন সাজে জীবন রাজে
করি প্রভাতে সঞ্চর
শান্তিমাখা উজল আভা উদয়ের।
ক্লান্তি নাই, ভ্রান্তি নাই,
ছিন্ন ঘন সংশয় ;
পড়িল খসি গ্রন্থিরাশি হৃদয়ের।
আজি সুদূরে অন্তিকে,
বাজে মধুরে তন্ত্রীতে,
মঙ্গলের সরস গীতি ওঁকারে।
অঙ্গ-ভরি হরষ প্রীতি সঞ্চারে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মেগাস্থেনীসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদিগের জ্ঞান।*

অলিম্পিক-অব্দ গণনার প্রারম্ভ কালে (খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে) উপনিবেশ-সমূহের ইতিহাস হইতে গ্রীকগণ পৃথিবী সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মহাকাব্য যুগের জ্ঞান হইতে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। কারণ, হোমর প্রভৃতি মহাকবিগণ কাব্যবর্ণিত ঘটনা ও স্থানসমূহ স্বীয় সৌন্দর্য্য বোধের উপযোগী করিয়া রচনা করিতেন; সুতরাং তাঁহাদের বর্ণিত বিষয় সমূহের কতকগুলি অপ্রকৃত বর্ণে অনুরঞ্জিত, কতকগুলি কল্পিত, এবং অপর কতকগুলি তাঁহাদিগের জীবনকালে অজ্ঞাত না হইলেও কাব্যোল্লিখিত উপাখ্যানের সহিত সংশ্রবরহিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, যদিও হোমরের সময়ে গ্রীকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিল না, তথাপি, মহাকবিগণ উহার উল্লেখ করিয়াছেন কি না, অথবা উল্লেখ করিলেও তাঁহারা যতদূর জানিতেন, ততদূর বর্ণনা করিয়াছেন কি না, সন্দেহের বিষয়। হোমর "অডীসী" নামক মহাকাব্যের প্রথম সর্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অতি সামান্য ভাবে অস্পষ্টরূপে এই কয়েকটী কথা বলিয়াছেন :—

"পৃথিবীর প্রান্তদেশবাসী ইথিয়োপীয়েরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই ভাগে বিভক্ত।" † সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'ইণ্ডিয়া' (ভারতবর্ষ) এই নামটীও হোমরের বহুযুগ পরে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু পঞ্চাশৎ হইতে ষষ্ঠি অলিম্পিক-অব্দে (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে) গ্রীকদিগের জ্ঞানালোচনা ও সাহিত্য চর্চ্চা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই সময়ে কাব্যের অবনতি আরম্ভ হয়, কিন্তু গভীর মনোনিবেশ সহকারে বিশ্বতত্ত্বের অনুসন্ধান ও আলোচনার সূত্রপাত হয়—কবিদিগের নিকট অজ্ঞাত না হইলেও উহা পরিহাসের বিষয় ছিল। কিন্তু গ্রন্থকারগণ কাব্যালোচনা ত্যাগ করিলেও প্রাচীন কাব্যকল্পিত বিষয়সমূহ বিশ্বাস করিতে বিরত হইলেন না; তাঁহাদিগের মধ্যে অতীতের প্রতি অনুরাগ ও এক প্রকার কল্পনা-প্রিয়তা রহিয়া গেল; সুতরাং তাঁহারা ন্যায্য রূপেই উপাখ্যান লেখক নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। তথাপি, বিবেচনা শক্তি ও বিচার প্রণালী অঙ্কুরাবস্থায় থাকিলেও এই তত্ত্বানুসন্ধানের যথেষ্ট উন্নতি হইল। প্রথমে দর্শনের উৎকর্ষ সাধিত হইল। দর্শনের পর ভূগোল বিদ্যা এবং ভূগোল বিদ্যার পর ইতিহাস জন্মগ্রহণ করিল। প্রথম ভূগোলকার প্রধানতঃ দার্শনিক ছিলেন; এবং ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ যোগ্য, তিনি ভূগোল-কার ছিলেন।

মিলীটস্‌বাসী এনাক্ষিমন্দার (Anaximander) প্রথম ভৌগোলিক। তিনি একটি নির্ঘণ্ট পত্রে সমুদয় পৃথিবীর বিবরণ প্রদান করেন। ইহাতে ভারতবর্ষের কোনও উল্লেখ ছিল কি না, নিশ্চিন্তরূপে বলা যায় না; কারণ এ বিষয়ে কোনও অবিসংবাদী প্রমাণ নাই। আমরা দেখিতে পাই, এনাক্ষিমন্দারের কিয়ৎকাল পরেই, হিকেটেয়স্ (Hecataeus) ও হীরডটস্ (Herodotus) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানিতেন; কিন্তু ইহা হইতে কিছুই অনুমান করা যায় না, কারণ ইঁহারা উভয়েই স্কাইলাক্ষের (Scylaxএর) নিকট ঋণী।

ষষ্টি অলিম্পিক-অব্দে (খৃঃ পূঃ ৫৪০ সনে) পারস্যরাজ দারায়স্ হিষ্টস্পিস্ কারিয়ণ্ডাবাসী স্কাই-

* Dr. R. A. Schwanbeck কর্ত্তৃক সঙ্কলিত Megathenis Indica নামক গ্রন্থের ভূমিকার অনুবাদ।

† Dr. Schwanbeck এক সুদীর্ঘ পাদটীকায় দেখাইয়াছেন যে হোমরের সময়ে গ্রীকগণ ভারতবর্ষের সহিত পরিচিত ছিল, এবং 'ইথিয়োপীয়' বলিতে আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ, উভয় দেশের অধিবাসীই বুঝাইত।

ল্যাক্‌কে সঙ্গীসহ সিন্ধুনদের প্রবাহ আবিষ্কার করিতে প্রেরণ করেন। এই ভ্রমণ সম্বন্ধে হীরডটস্ তাঁহার ইতিহাসের পঞ্চম ভাগের ৪৪শ অধ্যায়ে বলিতেছেন—"স্কাইলাক্ষ্ ও তাঁহার সঙ্গিগণ পাক্‌টায়িকা দেশ ও কাশ্যপপুর হইতে যাত্রা করিয়া সিন্ধুনদ বাহিয়া পূর্ব্বদিকে, উদয়াচলাভিমুখে গমন করিয়া সমুদ্রে উপস্থিত হন; তৎপর সমুদ্র পথে পশ্চিম মুখে যাত্রা করিয়া ত্রিশ মাসে স্বদেশে উপনীত হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেখান হইতে ইজিপ্টের রাজা ফিনিসীয়দিগকে অর্ণবযানে সিবিয়া প্রদক্ষিণ করিতে প্রেরণ করেন।" স্কাইলাক্ষ্ এই আবিক্রিয়া-যাত্রা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার প্রমাণ এই যে, অনেক গ্রন্থে ইহাঁর কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং বাইজেন্টিয়ামবাসী ষ্টিফেন্‌স এবং ষ্ট্রাবো ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো বলেন, এই নৌ-যাত্রা সম্বন্ধে যে গ্রন্থখানি বর্ত্তমান আছে, তাহা স্কাইলাক্ষ্ কর্ত্তৃক লিখিত—ইহা কিন্তু ভুল। স্কাইলাক্ষের গ্রন্থের যাহা যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতে বোধ হয়, তিনি সিন্ধুনদ, কাশ্যপপুর এবং পাক্‌টায়িকা দেশের বৃত্তান্ত ভিন্ন ভারতীয় জাতি সমূহ সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান লিখিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল উপাখ্যান হইতেই ফিলষ্ট্রাটসের গ্রন্থে ছায়াপদ, * দীর্ঘশিরাঃ প্রভৃতি এবং টেট্‌জার গ্রন্থে ছায়াপদ একচক্ষুঃ ইত্যাদি জাতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

স্কাইলাক্ষের পরে মিলীটস্‌বাসী হিকটেয়স্ এবং হিকটেয়সের পরে হীরডটস্ ভারতবর্ষের বর্ণনা করেন। হীরডটস্ স্ব-প্রণীত ইতিহাসের তৃতীয় ভাগের ৯৮শ হইতে ১০৬ষ্ঠ অধ্যায়ে পারস্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে ভারতবর্ষের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। হিকটেয়স্ কৃত "পৃথিবীর মানচিত্র" নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত নামগুলি দৃষ্ট হয়—সিন্ধু, সিন্ধুতীরবাসী ওপিয়াই জাতি, কালাটিয়াই জাতি, গান্ধার দেশীয় কাশ্যপপুর নামক নগর, ভারতীয় এগ্রাটি নগর। ইহাদিগের সহিত ছায়াপদ এবং বোধ হয় 'পিগমাই' (Pygmaei = বামন) এ দুটী নামও যুক্ত হইতে পারে। হীরডটসের ইতিহাসে, সিন্ধুনদ, কাশ্যপপুর, পাক্‌টুয়িকী ভূমি, গান্ধারবাসী, কালাটিয়াই বা কালাটিয়াই এবং পদইয়ই (Padaioi—) এই সকল নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং হিকটেয়স্ ও হীরডটস্ উভয়েই ভারতবর্ষে বালুকাময় মরুভূমির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনজন গ্রন্থকারের এবম্প্রকার ঐকমত্য, অন্যান্য স্থলে তেমন সুস্পষ্ট না হইলেও এই জন্যই সম্ভাবিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় যে শেষোক্ত দুইজন, প্রথমোক্ত স্কাইলাক্ষের অনুসরণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, নামগুলি ঠিক একই রূপে উচ্চারিত হইয়াছে। কারণ, ভারতীয় কাশ্যপপুর নাম Kaspapyrosএ রূপান্তরিত হইয়াছে—গ্রীকগণের পক্ষে এ প্রকার রূপান্তরিত করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না। কিন্তু হিকটেয়স্ নামটী এইরূপে উচ্চারণ করিয়াছেন; হীরডটস্ ও স্কাইলাক্ষের নৌ-যাত্রা বর্ণনা কালে এবং নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় বলিতে যাইয়া নামটী ঐরূপই লিখিয়া গিয়াছেন। হীরডটসের ইতিহাসের অনেক সংস্করণে ঐ নাম Kaspatyros রূপে বিকৃত হইয়াছে—তাহা মুদ্রাকর-প্রমাদ। Skiapodes বলিয়া ভারতের কোনও নাম নাই—উহা বোধ হয় "কায়াপদ" নামের অপভ্রংশ। তাহা হউক বা না হউক, ভারতীয় নাম অনেক রূপে গ্রীক ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে। অধিকন্তু বোধ হয় Kalatioi নামটী হিকটেয়স্ ও হীরডটস্ একই উৎস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ এই গ্রীক নামটী কোনও প্রকারেই অক্ষরে অক্ষরে ভারতীয় নামে রূপান্তরিত করিতে পারা যায় না। তৎপর এথেনীয়স (Athenoeus) স্কাইলাক্ষ্ ও হিকটেয়স্ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে বোধ হয়, এই দুইজনের মধ্যে বিলক্ষণ ঐক্য আছে। হিকটেয়সের গ্রন্থের কয়েকটী নাম ও বাক্য মাত্র বর্ত্তমান আছে। হীরডটস্ বিভিন্ন দেশের রীতিমত বর্ণনা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার বিবরণ অনেক পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য। তিনি

* গ্রীক Skapodes—ইহাদিগের পদ এত বৃহৎ ছিল যে, তাহা ছাতার ন্যায় রৌদ্র নিবারণ করিত।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মুখপত্র স্বরূপ সামান্য কিছু বলিয়া সিন্ধুনদ হইতে বিস্তৃত বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন। এবং উহার নিকটবর্ত্তী জাতিসমূহের বর্ণনা করিয়া কাশ্যপপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। কাশ্যপপুর হইতেই তাঁহার ভূবৃত্তান্তের শেষ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য স্থানের বর্ণনাতেও হীরডটস্ যে সর্ব্বত্র স্বীয় জ্ঞানের অনুসরণ করিয়াছেন তাহা নহে; অনেক সময়েই তিনি হিকটেয়সের নিকট ঋণী, ইহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। যেমন অন্যান্য দেশের, তেমনি ভারতবর্ষের বিবরণ দিতে যাইয়া তিনি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পারসীকদিগের নিকট হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার ইতিহাসে "পারসীকগণ বলে" "পারসীকগণের মধ্যে প্রবাদ আছে," ইত্যাদি কথা পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, হিকটেয়স্ ও হীরডটস উভয়েই স্কাইলাক্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন; সুতরাং গ্রীকদিগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে জ্ঞান ছিল তাহা ইহাঁদিগের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণেও বৃদ্ধি পাইয়াছিল কি না, সন্দেহের বিষয়। হিকটেয়সের সমকালীন বা পরবর্ত্তী, মিলীটসবাসী ডাইওনিসিয়স্ (Dionysius), লাম্পসকোসবাসী খারণ (Charon), লেস্বস্‌বাসী হেলানিকস (Hellanicos) সম্বন্ধে এই জ্ঞান বৃদ্ধির আশা আরও অল্পই করা যাইতে পারে। ইহাঁরা পারসীক জাতির বর্ণনাচ্ছলে এবং ডাইওনিসিয়াস্ তাঁহার ভূগোল বিবরণে ও খারণ স্বকৃত 'ইথিওপীয়' নামক গ্রন্থে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই;

ভারতবর্ষের বর্ণনায় স্কাইলাক্সের নিকট যাঁহারা ঋণী, তাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহাঁদিগের পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর তত্ত্বজিজ্ঞাসু টসিয়াস (Ctesius) প্রাদুর্ভূত হন। ইনি ক্লিডস্ (Cnidus) নগরের অধিবাসী ছিলেন। ইহাঁর বিবরণ স্কাইলাক্সের গ্রন্থ হইতে কতদূর গৃহীত, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; তবে ইহা নিসন্দেহ যে ইনি এমন অনেক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা স্কাইলাক্সের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ Skiapodes Otoliknoi, Henotiktontes উল্লিখিত হইতে পারে। সে যাহা হউক, টিসিয়সের বর্ণনা প্রণালী স্কাইলাক্সের প্রণালীর অনুরূপ—কারণ উভয়েই অদ্ভুত ও অতি প্রাকৃত বিষয়ের বর্ণনা করিতে ভাল বাসেন। কিন্তু ইহাঁর গ্রন্থ নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যা বর্ণনায় পরিপূর্ণ হইলেও প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ও অপরাপর অনেকে ইহাঁর প্রতি অন্যায়রূপে দোষারোপ করিয়া ইহাঁকে অপরাধী সাব্যস্থ করিয়াছেন। যে হেতু, ইনি পারসীকদিগের প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং বোধ হয় স্কাইলাক্সের গ্রন্থ হইতে কোন কোন বৃত্তান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা জানেন যে অধিকাংশ স্থলেই ভারতবর্ষীয় কিম্বদন্তীর সহিত টিসিয়াসের বর্ণনার ঐক্য আছে। তবে, ইনি এই জন্য সকলের নিন্দাভাজন হইয়াছেন যে, ইনি ভারতীয় উপাখ্যানগুলি নির্ব্বিচারে সন্দেহ মাত্র না করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে নিজে যাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, এমন কাহিনীও বিবৃত করিয়াছেন। এ কথাও বলা উচিত যে, টিসিয়াসের গ্রন্থ প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সেই অংশই বর্ত্তমান আছে, যাহা উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। ফোটিয়স (Photius) তাহার যে চুম্বক করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত কদর্য্য, কারণ "ভারতবর্ষের বিবরণ" (Indica) অধিকাংশই বিনষ্ট হওয়াতে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা তিনি কথামালার আকারে গ্রথিত করিয়াছেন। Indica গ্রন্থের অষ্টম ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।* সে যাহা হউক, তিনি কোন কোন বিষয়ে

* তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত ন্যায়বান্। তিনি তাহাদিগের আচার ব্যবহার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনাও করিয়াছেন। (৮ম অধ্যায়)। তিনি ভারতবাসীদিগের ন্যায়পরায়ণতা এবং রাজগণের মহানুভবতা ও মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। (১৪শ অধ্যায়)।

ভারতবর্ষের সত্য ও যথাযথ বিবরণ দিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা অসঙ্গত হইবে। কারণ টিসিয়সের মতে জাতি বর্ণনা (Ethnography), জীব জন্তুর বৃত্তান্ত (Natural History) বিশেষতঃ ভূগোল বিবরণ উপাখ্যানের সহিত জড়িত। টিসিয়সের গ্রন্থের যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতে দেখা যায়, সিন্ধুনদের উভয় তীরবর্ত্তী যে সকল প্রদেশ স্কাইলাক্স পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, টিসিয়স তৎসম্বন্ধেও অজ্ঞ ছিলেন। এই জন্য মনে হয়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান উন্নতি লাভ না করিয়া বরং অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

টিসিয়সের সময় হইতে সেকেন্দর সাহার (Alexanderএর) সময় পর্য্যন্ত গ্রীকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিশ্চিততর জ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই। যাঁহারা ঐ দেশ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে কিছু লিখিতেন, তাঁহারাও পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদিগেরই অনুসরণ করিতেন, এইরূপ দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাঁহাদিগের লিখিবার প্রণালী হইতে প্রমাণিত হইতেছে, তাঁহারা স্কাইলাক্স্ ও হিকেটেয়স অপেক্ষা বরং হীরডটসেরই অধিক অনুসরণ করিতেন। ক্নিডাসবাসী ইয়ুডক্সাস (Eudoxus) এবং কুমীবাসী ইফরাস্ (Ephorus) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও হীরডটস হইতে গৃহীত।

এই দুই যুগে গ্রীকগণ অপরাপর জাতি অপেক্ষা এই ভূভাগের সহিত অধিকতর পরিচিত ছিল। এবং এই সময়ে তাহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী তাহাদিগের প্রতি নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন। একজন গ্রন্থকার নিজেই এই ভূভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং আর একজন স্বদেশ-সন্নিহিত পারস্যরাজ্যের রাজধানীতে বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঐ ভূভাগ সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর অনুসন্ধানের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার তুলনায় ভারতবর্ষ বিষয়ে তাঁহাদিগের জ্ঞান অতি অল্পই ছিল। ঐ দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অদ্ভুত অজ্ঞতা ও তন্নিবন্ধন বহুবিধ ভ্রম বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই সকল ভ্রম হইতেই সেকেন্দর সাহার ভারতীয় অভিযানে অনেক ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল।

সেকেন্দর সাহার সময় হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আর এক যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগে গ্রীক ও মাকিদনীয়দিগের পর্য্যবেক্ষণ প্রণালী ও বিচার শক্তি উন্নতি লাভ করে; সুতরাং তাহারা নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছে। ইহারা সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিপাশা ও সিন্ধুনদের মুখ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ আবিষ্কার ও পর্য্যবেক্ষণ করে। যদিও ইহার পূর্ব্বে স্কাইলাক্স ঐ সমস্ত প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করেন, তথাপি কালধর্ম্ম ও পর্য্যবেক্ষণ প্রণালী পরিবর্ত্তিত হওয়াতে মাকিদনীয়েরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করিয়াছে। মনে হয়, তাহারা নিজেরাও ইহা অবগত ছিল, কারণ কেহই স্কাইলাক্স্ বা হিকেটেয়স্, হীরডটস্ বা টিসিয়াসের নামোল্লেখ করে নাই। এই সময়ে যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁহারা সকলে একই প্রণালীতে বিপাশার পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহ দর্শন করিয়াছিলেন; অধিকন্তু তাঁহারা হিমালয় ও তাম্রপর্ণীর মধ্যস্থিত ভূভাগ সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন—কিন্তু এই শেষোক্ত স্থলে তাঁহারা অতি অল্পই বিশ্বাসযোগ্য। তাঁহারা ভারতবাসীদিগের প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছেন, কেবল তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহাদিগের এই ক্ষেত্রে স্বাধীন বিচার শক্তির অভাব ছিল। ভূপৃষ্ঠের জ্ঞান সহসা অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যাহা হয়, এ স্থলেও তাহাই হইয়াছিল। পূর্ব্বতন যুগে গ্রীকগণ যে সমস্ত দেশ প্রথম আবিষ্কার করে বা অস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে, সেকেন্দর সাহার সহচরগণ কেবল সেই সমস্ত দেশই দর্শন করে, অথবা সূক্ষ্মতররূপে পর্য্যবেক্ষণ করে। এজন্য গ্রীকদিগের চিত্তে পূর্ব্বে যাহা সত্য ও মিথ্যা, বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য কাহিনীর সহিত জড়িত ছিল, ক্রমে তাহা অন্তর্হিত হইল। কারণ বিদেশে বিশেষতঃ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বিষয় গ্রীকগণ স্বচক্ষে দেখিয়া

বর্ণনা করিলেও, যাহারা কখনও স্বদেশের বাহিরে গমন করে নাই, তাহারা তাহা বিশ্বাস যোগ্য মনে করিত না, এবং পরবর্ত্তীকালের সমালোচকগণ তাহা নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করিত। এই সময়ে পুঞ্জীভূত তত্ত্বসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু সুধীগণ তাহা জ্ঞান সাহায্যে পরিমাপ ও পরীক্ষা করিতে কিম্বা কোনও নির্দ্দিষ্ট বিধির অধীনে আনয়ন করিতে পারেন নাই; সুতরাং লেখকদিগের হস্তে এমন কোনও নিয়ম বা কষ্টিপাথর রহিল না, যদ্দ্বারা সত্য হইতে মিথ্যা পৃথক্ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই জন্য তাঁহারা কল্পনা সাহায্যে মনে যাহা কিছু চিত্রিত করিতেন, তাহাই বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাস-প্রবণতা হইতেই বিচার প্রণালী আবার প্রাথমিক অবস্থায় উপস্থিত হইল। তৎপর লেখকগণের মধ্যে অনেকেই সৈনিক পুরুষ ছিলেন; তাঁহারা যেমন অজ্ঞ ও শিক্ষাবিহীন ছিলেন, তেমনি তাঁহাদিগের বিচার শক্তিরও একান্ত অভাব ছিল। আর বিশ্বাসপ্রবণতার পূর্ব্বোক্ত কারণ যে কেবল সেকেন্দর সাহার সমকালীন গ্রন্থকারগণেই বিদ্যমান ছিল, তাহা নহে; তাহা মেগাস্থেনীসকেও স্পর্শ করিয়াছিল—যদিও তিনি অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ছিলেন না।

সকলেই জানেন যে, Baeto, Diognetus Nearchus, Oneseritus, Aristobulus, Clitarchus, Androsthenis এবং সেকেন্দর সাহার অপরাপর সহচরগণ তাঁহার বা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি, ঐ সকল গ্রন্থের যে টুকু বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতে আমরা এই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, তাঁহারা স্বয়ং যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং যাহা লোকপরম্পরায় অবগত হইয়াছিলেন (কিন্তু বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেন নাই) সমস্তই সত্যানুরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন কি না, অথবা ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জাতিসমূহ সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট কি না, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। আমরা এ বিষয়ে যতদূর বিচার করিতে সক্ষম, তাহাতে বলিতে হয়, এই প্রশ্নের উত্তর তাঁহাদিগের অনুকূল নহে। তাঁহারা ভারতবর্ষের সংস্থান (topography) পরিশ্রম সহকারে নির্ণয় করিয়াছেন বটে—কারণ তাহা না হইলে যুদ্ধ বিগ্রহ অসম্ভব—কিন্তু ঐ দেশের জীবজন্তু সম্বন্ধে অতি সামান্যই লিখিয়া গিয়াছেন,—অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অকিঞ্চিৎকর। গ্রীকগণ সহজে অপর জাতির মন এবং আচার ব্যবহার অনুসন্ধান ও চিন্তা পূর্ব্বক আয়ত্ত করিতে পারিত না; উক্ত গ্রন্থকারগণের মধ্যে ত এই শক্তির একান্ত অসদ্ভাব ছিল। ইঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যায়, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, পর্য্যবেক্ষণ শক্তির সূক্ষ্মতা, ধীরতা ও দৃঢ়তা বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। এজন্য যে সকল বিষয় গ্রীকদিগের আচার ব্যবহারের একেবারে বিপরীত ও যাহা অত্যন্ত অদ্ভুত, তাঁহারা কেবল সেই সমুদায়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। অপরের চক্ষে যাহা একান্ত আবশ্যক এরূপ অত্যন্ত গুরুতর বিষয়গুলিও, যেমন দেবার্চ্চনা ও বিভিন্নজাতির সমাজ সংস্থান—তাঁহারা সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই। তাঁহারা এই সমুদায় বিষয়ের কতকগুলির মিথ্যা বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; কতকগুলি সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী ভূখণ্ডের কোন কোনও স্থানে প্রচলিত থাকিলেও একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন। সেকেন্দর সাহা যেমন কেবল ভারত সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিতে পারেন নাই, তেমনি এই সকল গ্রন্থকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান কেবল আরব্ধ করিয়া গিয়াছেন, উহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই, কারণ, তাঁহারা ভারতবর্ষের একাংশ মাত্র আংশিকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

মেগাস্থেনীসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদিগের জ্ঞান এই প্রকার ছিল।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

হিন্দুশাস্ত্রে মিসর দেশ, নীলনদী ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য প্রদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শঙ্খদ্বীপ।

শঙ্খ শব্দে সমুদ্রের শম্বুক বুঝায় এবং সময় সময় বড় বড় শম্বুক মাত্রকেই বুঝায়। সুতরাং শঙ্খদ্বীপ শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ শম্বুক দ্বীপ। লোহিত সাগরে অতি বড় বড় সুন্দর সুন্দর শম্বুক যথেষ্ট আছে এবং এই জন্যই বোধ হয় উক্ত সাগর পুরাকালে শঙ্খাব্ধি বা শঙ্খোদধির অংশ বিশেষ বলিয়াই পরিগণিত হইত। আমরা এই স্থলে নিজ শঙ্খদ্বীপের কথা আলোচনা করিতেছি। ষ্ট্রাবো (Strabo) বলিয়াছেন এই দেশের অধিবাসিগণ শম্বুক দ্বারা গাত্রাভরণ করিত এবং মাদুলী স্বরূপেও শম্বুকের মালা পরিধান করিত। আবার পুরাণে উল্লেখ আছে এই দেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ গিরিগুহায় বাস করিত—সেই সমুদয় গুহার আকৃতি শম্বুকের মতন এবং প্রবেশ দ্বারও শম্বুকের মুখের মতন ছিল, সেই জন্যই উক্ত দেশের নাম শঙ্খদ্বীপ হইয়াছে। আবার অন্যমত এই যে সমুদ্রতরঙ্গ দ্বারা তটদেশে বিক্ষিপ্ত অসংখ্য শম্বুক কালক্রমে পুঞ্জীকৃত হইয়া যে সমুদয় পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদেরই গহ্বরে মানবগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। শম্বুক গহ্বরে বসতি করার ধারণাটা একটুকু অদ্ভুত রকমের বটে তবে গ্রীকগণের মধ্যেও এই ধারণাটি প্রচলিত ছিল কারণ তাহাদের পৌরাণিক আখ্যায়িকাতেও উল্লেখ আছে, নেরাইটিস্ (Nerites) এবং কামদেব (Cupid) লোহিত সাগরেরই তীরে শম্বুক গহ্বরে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন। এই সমুদয় বিভিন্ন মত পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা যায় যে পুরাকালের মানবগণ যে দেশকে ট্রগ্‌লোডিটিকা (Trogloditica) বলিতেন, সঙ্কীর্ণ অর্থে শঙ্খদ্বীপ শব্দের অর্থ সেই দেশ এবং লোহিত সাগরের সমগ্র পশ্চিম উপকূলই উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল আর ব্যাপক অর্থে, শঙ্খদ্বীপ সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশকেই বুঝাইত।

বাইবেলে ট্রগ্‌লোডিটিকা দেশের অধিবাসিগণের এক নাম শাকিম (Sukim)। শাক (Suca) শব্দ গর্ত্তবাচক তাই গর্ত্তবাচক শাক শব্দ হইতেই শাকিম্ নামটি আসিয়াছে। এই শাক শব্দের আরও কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়। যথা লতামণ্ডপ (Arbour), সাময়িক আশ্রয়স্থান (booth = a temporary shelter, slight hut) ও পটমণ্ডপ (tent)। এই সমুদয় অর্থের প্রতি প্রণিধান করিলে বুঝা যায়, এই প্রদেশের অধিবাসিগণ পর্ব্বতে যে সমুদয় নৈসর্গিক গহ্বর পাইয়াছিলেন, অথবা তাহা যে কোনও প্রকারে উৎকীর্ণ করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, সেই সমুদয় গহ্বরই বাসস্থল বা আশ্রয়স্থলরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বসতিস্থলরূপে ব্যবহৃত গহ্বরগুলির নাম তাঁহারা শাক রাখিয়াছিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে যাইয়াই মনে হয় সম্ভবতঃ এই সমুদয় গহ্বরের গঠন ও প্রবেশ দ্বার শঙ্খের মতন ছিল, তাই শঙ্খ শব্দ হইতে শাক শব্দ উদ্ভূত হইয়াছিল।

কোনও কোনও পুরাণে শঙ্খদ্বীপ শব্দের আর একটি সঙ্কীর্ণতর অর্থ আছে। সেই অর্থে শঙ্খদ্বীপ শব্দ শঙ্খনাগ নামক সর্পরাজের অধ্যুষিত দেশ। আবিসিনিয়া দেশের অন্তর্গত টাইগার (Tigre) প্রদেশ ও হুবাব্ (Habab) পর্ব্বত লইয়া উক্ত দেশ অবস্থিত। উক্ত দেশের আর এক নাম শঙ্খবন—এই প্রদেশের বর্ণনা অতি রমণীয়। বহুসংখ্যক

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদী উক্ত দেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বিচিত্র বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ কানন বিরাজ করিতেছে। কালীনদী হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত এই দেশ বিস্তৃত; ইহার দৈর্ঘ্য এক শত যোজন অর্থাৎ ৪৯২ মাইল। এই দেশের প্রধান নদীর নাম শঙ্খানিগা, উহারই পরবর্ত্তী নাম Mareb; এই দেশের রাজধানী সমুদ্র তীরের অনতিদূরে অবস্থিত, ইহার নাম কোটিমী। দ্যুতিমান্ নামধেয় পর্ব্বতের অংশ বিশেষ এই কোটিমীর নিকটবর্ত্তী। মহার্ঘ ধাতু ও মণিমুক্তাদি প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়াই পর্ব্বতের নাম দ্যুতিমান্। এই দেশ শত যোজন দীর্ঘ বলিয়া বর্ণিত আছে এবং Tigre প্রদেশের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে হুবাব্ পর্ব্বতের উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক রেখা টানিলে তাহাও প্রায় শত যোজন দীর্ঘই হয়। এই দেশের রাজা শঙ্খনাগ ও গরুড় সম্বন্ধে ত্রৈবাণিক আখ্যান আছে। আমরা শীঘ্রই তাহার উল্লেখ করিতেছি। নাগ ও গরুড় কি তৎসম্বন্ধে কতকটা মতভেদ আছে। ধর্ম্মশাস্ত্র নামক গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ আছে যে, নাগ ও গরুড় মানব জাতিরই দুইটি বংশের নাম। অত্রি মুনিই উক্ত উভয় বংশের পূর্ব্বপুরুষ। আবার পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভাষায় নাগ বা উরগ অর্থ সর্প আর গরুড় বা সুপর্ণ শব্দে বৃহদাকার পক্ষীবিশেষ বুঝায়। প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার বিভাগানুসারে গরুড় কোন জাতীয় পক্ষী অথবা পারস্য কবি সাদির উল্লিখিত Simory-এর ন্যায় উহা শুধু কবি-কল্পনা-সম্ভূত মাত্র কি না, আমরা আর সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। এক্ষণে শঙ্খনাগ ও গরুড়ের আখ্যান বর্ণিত হইতেছে।

সর্পরাজ প্রথমে শঙ্খদ্বীপ হইতে অনেকটা পূর্ব্বদিকে চক্রগিরি নামক পর্ব্বতে বাস করিতেন। খগরাজ গরুড় অতিশয় প্রতাপশালী ছিলেন সুতরাং সর্পরাজের প্রজাগণের প্রতিদিনই খগরাজকে একটি করিয়া সর্প যোগাইতে হইত। অবশেষে সর্পরাজ এইরূপ অপমানজনক কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রজাগণ খগরাজের নিকট যে সমুদয় সর্প প্রেরণ করিতেন, তিনি তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিতে লাগিলেন। ইহাতে গরুড় সর্পজাতি ও সর্পরাজের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। খগরাজের এই তর্জ্জন কার্য্যে পরিণত হইত, কিন্তু তাঁহারা আত্মরক্ষার এক প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিলেন—কালীনদী ও সমুদ্র এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী শঙ্খদ্বীপের অংশ বিশেষে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের এক আবাস স্থল ছিল। উক্ত আবাস ভবনের সন্নিকটেই শঙ্খবন অবস্থিত। সর্পগণ গরুড়ের ভয়ে কুমার কার্ত্তিকেয়ের শরণাপন্ন হইয়া শঙ্খবনে বসতি স্থাপন করিলেন। অধিকতর শৌর্য্যবীর্য্য সম্পন্ন কার্ত্তিকেয়ের সম্মুখীন হইতে গরুড়ের সাহস হইল না। সর্পগণ নিরাপদে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। প্রবাদ এই, সর্পরাজ শঙ্খনাগ প্রজাগণ সহ এখনও তথায় নিরুপদ্রবে রাজত্ব করিতেছেন, আর যাহারা শঙ্খনাগের বার্ষিক ও দৈনিক পূজা করিয়া থাকে, তাহারা প্রভূত ধন প্রাপ্ত হয়। শঙ্খনাগের আর এক নাম শঙ্খমুখ কারণ তাঁহার মুখ শঙ্খের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ছিল। তিনি যে পর্ব্বতে বাস করিতেন, তাহারও এক নাম শঙ্খমুখই ছিল। টলেমী সর্প পর্ব্বতের (Mountains of Snakes) উল্লেখ করিয়াছেন, সেই পর্ব্বত পরে হুবাব্ (Hubab) নামে অভিহিত হয়। আবার এই হুবাব্ শব্দ জহেরির (Jauheri) মতে সর্পজাতির সাধারণ সংজ্ঞা এবং ময়দানির (Maidani) মতে উহা সর্পের প্রকার বিশেষের নাম। শঙ্খবন নামধেয় যে প্রদেশের কথা এই স্থলে লিখিত হইতেছে গ্রীকগণ এই প্রদেশকে অফউসা (Ophiusa) বলিতেন, আবার তাঁহারা সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ আফ্রিকা মহা দেশটির প্রতিও উক্ত নাম প্রয়োগ করিয়াছেন। শঙ্খনাগ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ এই যে, তাহার বিষাক্ত ও উত্তপ্ত নিঃশ্বাস বায়ুতে, তাহার বসতি স্থলের চতুর্দ্দিকে শত যোজন পরিমিত স্থানের যাবতীয় জীবজন্তু ও বৃক্ষলতা পুড়িয়া ছারখার হয়। হুবাব্ পর্ব্বত হইতে সামুম্ (Samum) নামক এক প্রকার উত্তপ্ত ও বিষাক্ত বায়ু সমগ্র মরুভূমি ব্যাপিয়া

প্রবাহিত হইয়া প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ইহাই শঙ্খনাগের নিঃশ্বাস বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। অগস্তি ও আস্তিক এই মুনিদ্বয় যথাক্রমে এই ভীষণ অনিষ্টপাত নিবারণের প্রয়াস পান। এই উদ্দেশ্যে অগস্তি ঋষি শঙ্খবনে যাইয়া উক্ত প্রদেশের রাজধানী কোটিমী নগরের অনতিদূরে, সমুদ্র তীরে এক বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেআগিলেন। তাঁহার নামানুসারে উক্ত বাটীর নাম অগস্তি ভুবন হইল। নাগকুল দমনের জন্য তিনি কোনও কঠোর উপায় অবলম্বন করেন নাই, তাই তাঁহার চেষ্টায় কোনও ফল দর্শিল না। পরে আস্তিক মুনী যাইয়া কঠোরতর উপায় অবলম্বন করিলেন এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইলেন। সর্পরাজ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। মুনি সর্পরাজের দেহ অতি শয় খর্ব্ব করিয়া ফেলিলেন সেই অবধি এখন তাহাকে সামান্য একটা মৃতপাত্রে পুরিয়া রাখা যায়। প্রবাদ এই যে, এখনও কালীনদীর তীরে তাহার বাস ভবনের নিকটে যাইয়া দলে দলে লোক তাহার পূজা করিয়া থাকে। হেরেদি (Heredi) নামক এক জাতীয় সর্প সমগ্র মিশর দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। সম্ভবতঃ ইহাই হিন্দু পুরাণোক্ত সর্পরাজ। মুসলমানগণ বলেন যে, উক্ত নামধেয় জনৈক সেখই উক্ত সর্পে পরিণত হইয়াছিলেন। আবার খ্রীষ্টিয়ানগণ বলেন, বাইবেলের টবিট (Tobit) নামক গ্রন্থে য্যাস্‌মোডিয়াস্ (Asmodius) নামে যে এক প্রকার সর্পের উল্লেখ আছে উহাই উক্ত সর্প। আবার পারস্যোপন্যাসে আস্‌মুগ্‌দিব্ (Ashmughdib) নামে এক প্রকার সর্পের উল্লেখ আছে, কাহার কাহারও মতে উহাই উক্ত সর্প। কেহ কেহ এতদূরও বলিয়াছেন যে, কোনও কোনও হিন্দু পরিব্রাজক উক্ত সর্প স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন।

পর্ব্বতের এক নাম নগ। নাগ শব্দ এই নগ শব্দ হইতে উৎপন্ন তাই নাগ শব্দের এক অর্থ শঙ্খনাগ হস্তিরাজ। পার্ব্বত্য সর্প, আর এক অর্থ পার্ব্বত্য অর্থাৎ বন্যহস্তী। তাই কোনও কোনও গ্রন্থে এরূপও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শঙ্খভবনে এক নাগ অর্থাৎ হস্তী রাজা ছিলেন। দেশের নামানুসারে তাহার নাম হইয়াছিল শঙ্খনাগ। শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রজাবৃন্দ উক্ত হস্তিরাজের বধ সাধন করেন। উহাদিগের অস্থি Tacazze নদীর তীরে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হয়। তদবধি উক্ত নদী অস্থিমতী আখ্যা ধারণ করে।

ইতিপূর্ব্বে শঙ্খবন প্রদেশের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিজ শঙ্খদ্বীপের অন্যান্য অংশে শঙ্খাসুরের রাজত্ব ছিল। শঙ্খাসুরের রাজপ্রাসাদ মধ্য সমুদ্রে অবস্থিত ছিল। কিন্তু তাহার প্রজাগণ আফ্রিকা মহাদেশের উপকূলের নিকটস্থ শম্বুক সমূহের মধ্যে বাস করিত। তাহাদিগের সম্বন্ধে বর্ণনা বড়ই ভয়ঙ্কর। তাহারা সাক্ষাৎ রাক্ষসের অবতার স্বরূপ ছিল, নরমাংস ভক্ষণ করিত। নিশাকালে বাহির হইয়া সমতল প্রদেশে লুটপাট করিত; স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকা ধরিয়া লইয়া যাইত এবং জীবন্ত অবস্থায়ই তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিত। আবিসিনিয়া দেশে আমমাংস ভক্ষণের প্রথা আছে; বুঝি বা এই প্রথাই পূর্ব্বোক্ত আখ্যানাংশের ভিত্তিভূমি। এই আখ্যায়িকা হইতে অনুমান হয় শঙ্খাসুরগণ সমুদ্রতীরস্থিত পর্ব্বত গহ্বরে বাস করিত। আফ্রিকার উপকূলে একটা বড় উপসাগরের মধ্যস্থলে সুয়েকেম্ (Suekem) নামে একটী দ্বীপ আছে। শঙ্খাসুরগণের রাজা সম্ভবতঃ ঐ দ্বীপস্থ পর্ব্বত গহ্বরে বাস করিতেন, সেই জন্যই তিনি সমুদ্র গর্ভে বাস করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। হিব্রু ভাষায় Sukh শব্দের বহুবচন Sukhim, এই Sukhim শব্দ হইতেই উক্ত দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে। কাজেই এই নামের মূলে সংস্কৃত শঙ্খ শব্দ ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রাচীন ভৌগোলিকগণ এই দ্বীপের যে যে নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি নামের অর্থ দেবগণের রক্ষা বিধানের স্থান (Harbour of preserving Gods)। আবার ভাগবতাদি গ্রন্থে উল্লেখ আছে, শ্রীকৃষ্ণ একদল

দেব সেনা লইয়া শঙ্খাসুরকে আক্রমণ ও পরাভূত করেন এবং তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহার আবাসস্থল শঙ্খ হইতে তাহাকে বহির্গত করিয়া তাহার বিনাশ সাধন করেন। ইহাতেই দেবগণ রাক্ষস শঙ্খাসুরের হস্ত হইতে রক্ষা পান। সম্ভবতঃ এই ঘটনা হইতেই পূর্ব্ব কথিত দ্বীপের এক নাম দেবগণের রক্ষা বিধান স্থান হইয়াছে।

আমরা এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছি যে, পুরাণকারগণ শঙ্খদ্বীপের আদিম অধিবাসিগণকে কখনও সর্প, কখনও হস্তী এবং কখনও রাক্ষস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শাঙ্খায়ন নামে এক জাতীয় লোকেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাই প্রকৃত Trogloditica বা শাঙ্গল। শাঙ্গল শব্দের শেষ বর্ণ ল একটি তদ্ধিত প্রত্যয়, যথা ভাগল (ভাগ্যবান্), সিংহল (সিংহ সদৃশ) বঙ্গল (Bengal, বঙ্গদেশীয়), তাই শাঙ্গল শব্দের অর্থ সম্ভবতঃ শঙ্খ দেশীয়। অত্রিমুনি শাঙ্খায়নগণের আদিপুরুষ। পুরাণে উল্লেখ আছে, ইনি ব্রহ্মার মানস পুত্র। ব্রহ্মা ইঁহাকে প্রজাপতি নিযুক্ত করিয়া বেদ প্রদান করিয়া বলিলেন, "তুমি বহু প্রজার সৃষ্টি কর এবং তাহাদিগকে বেদ হইতে সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম শিক্ষা দেও।" অত্রি ঋষি প্রথমতঃ শঙ্খদ্বীপ হইতে অনেক দূর পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছিলেন, তথায় সর্ব্ব প্রথমে তুহিন রশ্মি নাম্নী মনোরমা কন্যা উৎপন্ন করেন। তারপর শঙ্খনাগ নদী বিধৌত প্রদেশে আগমন পূর্ব্বক শঙ্খমুখ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শ্বেতগিরিতে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় পিতৃদেব ব্রহ্মার ধ্যানপরায়ণ হইলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শীঘ্রই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া প্রচারিত হইল। ঐ দেশে যে মুষ্টিমেয় লোকের বাস ছিল, তাহারা সকলেই আসিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এই ঋষির সমস্ত দিবারাত্রি ধ্যান ও ধর্ম্মানুষ্ঠানেই কাটিয়া যাইত, মন্দালোকময় উষাকাল টুকুই শুধু তাঁহার বিলাস ভোগের সময় ছিল।

শাঙ্খায়ন ও শাঙ্গল।

যাহা হউক, কালক্রমে তিনি একটি বৃহৎ জাতির সৃষ্টি করেন এবং অন্যান্য হিন্দুগণের ন্যায় উক্ত জাতিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত হয়। অত্রি ঋষির জ্যেষ্ঠ পুত্র শাঙ্খায়ন রূপবান্ ও শক্তিশালী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অতি অধার্ম্মিক, উদ্ধত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিতেন এবং পর্ব্বত গহ্বরে বাস করিতেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও সন্তানগণের চরিত্রও তাঁহা হইতে কোনও অংশে উৎকৃষ্টতর ছিল না। সাধুশীল প্রজাপতি অত্রি সন্তানগণের পাপাচরণে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া যুক্তিবলে তাহাদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করার জন্য বৃথা প্রয়াস পাইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিরূপে পর্ব্বত গাত্রস্থ বাসের উপযুক্ত গহ্বর নির্ম্মাণ করিতে হয়, বৃক্ষতলে লতাপাতা দ্বারা কুঞ্জভবন নির্ম্মাণ করিয়া পল্লী সংগঠিত করিতে হয়, আর কেমন করিয়া গোমহিষাদি গৃহপালিত পশুর থাকিবার ঘর তৈয়ার করিতে হয়, অত্রি শাঙ্খায়ন প্রভৃতিকে এই সমুদয় শিখাইলেন, তাহাদিগকে যথেচ্ছ আহার করিতে অনুমতি দিলেন আর আদেশ করিলেন, "তোমরা বরাবর এই পর্ব্বতে বাস করিও, এই পর্ব্বত তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অধ্যুষিত, ইহার নাম অত্রিস্থান। এই স্থানের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিও।" তাহাদিগের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া সিন্ধুনদীর নিকটবর্ত্তী এক দেশে আসিলেন এবং তথায় দেবানিক পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। উষাকালীন বিহারের কুফল তিনি সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তাই দেবানিক পর্ব্বতে আগমন অবধি উক্ত অভ্যাস পরিত্যাগ করিলেন, এইখানে আসিবার পর তাঁহার যে সমুদয় সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহারা সকলেই ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র হইয়াছিল। উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে বর্ত্তমান কাবুলের নিকটে নগর নামে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রাধান্য প্রকাশার্থে উক্ত নগর সাধারণতঃ দেবনগর নামেই অভি-

হিত হইত। আমরা এই উপাখ্যানে দেখিতে পাইয়াছি, প্রজাপতি অত্রির প্রথম বয়সের সন্তানগণ সকলেই দুশ্চরিত্র ছিলেন, আর পরিণত বয়সের সন্তানগণ ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র হইয়াছিলেন। আবার ইহুদিগণের Talmond নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, আদমের দেড় শত বৎসর বয়স হওয়ার পূর্ব্বে যে সমুদয় সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহারা সকলেই রাক্ষস হইয়াছিল। ইহুদিগণ ভারতবর্ষীয় অনেক উপকথার অনুকরণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাহাদিগের প্রতিবেশিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়াই তাঁহারা এই সমুদয় উপকথা শিখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রতিবেশী শঙ্খদ্বীপবাসিগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অত্রির উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। আদমের সন্ততিগণের চরিত্রের কথা সম্ভবতঃ এই অত্রির উপাখ্যান হইতেই উদ্ভূত।

অত্রিস্থান শ্বেতগিরির উপর অবস্থিত—এই শ্বেতগিরি শঙ্খনাগ নদী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

অত্রিস্থান কোথায়? শাঙ্খায়ন কাহারা?

আবার ব্রুস্ সাহেব তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে Ambatzaada অর্থাৎ শ্বেত পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন এই অম্বাজাদা শাঙ্গলগণের প্রধান উপনিবেশ। সুতরাং ম্যারেব অর্থাৎ শঙ্খনাগ নদী হইতে এই অম্বাজাদা বা শ্বেতগিরির ব্যবধানও অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং অনুমান হয় যে, অত্রিস্থান যে শ্বেতগিরির উপর অবস্থিত বলিয়া পুরাণে উল্লেখ আছে, উহাই অম্বাজাদা। পুরাণে শাঙ্গলগণের পল্লীর (অর্থাৎ লতামণ্ডপ) বিস্তৃত বিবরণ আছে, আবার ব্রুস্ সাহেবের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও তৎসমুদয়ের আমূল বিবরণ আছে। এই উভয় বিবরণ প্রায় সর্ব্বাংশে একরূপ। তবে প্রভেদ এইমাত্র যে পুরাণে লিখিত ঐ সমুদয় পল্লী অর্থাৎ লতামণ্ডপ সর্ব্বদাই চর্ম্মাবৃত থাকিত, কিন্তু ব্রুস্ সাহেব এই কথার উল্লেখ করে নাই। এখনও ভারতবর্ষের পালিগণ যে সমুদয় লতা মণ্ডপের আশ্রয়ে বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে, তৎসমুদয়ের প্রতি পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সর্ব্বাংশে প্রযোজ্য। পুরাণে শাঙ্খায়নগণ শ্বেতকায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—আবার শাঙ্গলগণ কৃষ্ণকায়। এই পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদিগের অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, শাঙ্খায়নগণই শাঙ্গলগণের পূর্ব্বপুরুষ। জলবায়ুর পরিবর্ত্তন বশতঃ বহুকাল পরে অধিবাসিগণের গায়ের রক্ত পরিবর্ত্তিত হওয়া কোনও রূপেই অসম্ভব নহে। এই ক্ষেত্রে অতি প্রাচীনকালের শাঙ্খায়নগণ অপেক্ষা তাহাদেরই বংশসম্ভূত শাঙ্গলগণের গাত্রের বর্ণ মলিন হইয়া পড়িয়াছে বলা যাইতে পারে। এই যুক্তিটি ততটা দৃঢ়তার সহিত উপস্থাপিত করিতে না পারিলে এতদনুকূলে আর একটি প্রধান যুক্তি আছে। খুব সম্ভবতঃ আদিমও অকৃত্রিম শাঙ্গল বংশগণের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে উক্ত বংশ অন্যান্য হীন বংশের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, তাই শ্বেতবর্ণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবর্ণ দেখা দিয়াছে। আদিম শাঙ্গলগণ যে শ্বেতকায় ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ প্লিনির উক্তি উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্লিনি লিখিয়াছেন—এক জাতি শ্বেতকায় ইথিওপিয়ান নীলনদীর পশ্চিম তীরে বাস করিত। ইথিওপিয়ার অংশ বিশেষ ও তথাকার অধিবাসিগণের নামের সহিত অত্রি ও আত্রেয় শব্দের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীকগণ ইথিওপিয়ার অংশ বিশেষকে এথেরিয়া (Aetheria) বলিতেন এবং তথাকার অধিবাসীদিগকে এথেরু (Etheru) বলিতেন। ষ্ট্রাবো বংশবিশেষকে এথেরু নামে অভিহিত করিয়াছেন। Tacazze এবং Mareb নদীর সম্মিলন স্থলের চতুঃপার্শ্বে বাস করিত, এমন এক জাতিকে টলেমী Attiri নাম দিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহারাই ষ্ট্রাবোর বর্ণিত এথেরু নামধেয় বংশ। এই এথেরু ও Attiri শব্দ আত্রেয় (অত্রির গোত্রাপত্য, অত্রি বংশোদ্ভব) শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শাঙ্গলগণের পূর্ব্বপুরুষ শাঙ্খায়নগণ নিরক্ষর বা বিদ্যাহীন ছিলেন না। সমুদয় বেদ তাহাদের আয়ত্ত না থাকিলেও বেদের অংশ বিশেষে তাহাদিগের জ্ঞান ছিল। ক্রমশঃ।

শ্রীকুঞ্জবিহারী হার।

শা সুজার শেষ জীবন। *

সুলতান শা সুজা বা শাহ্ সুজা শাজহাঁ বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র। ১০৪৯ হিজিরা অর্থাৎ ১৬৩৯ খৃঃ, ২৪ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃনিয়োগক্রমে বাঙ্গালার মস্‌নদে আরোহণ করেন। পাছে ক্ষমতাশালী হইয়া পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেন, এই আশঙ্কায় প্রবীণ চতুর বাদশাহ, উজীর আশফ্‌খাঁর পুত্র ও সম্রাজ্ঞী নূরজহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, শায়েস্তা খাঁকে বেহারের শাসনকর্ত্তা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার গুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল যে সুজার ক্ষমতা বাঙ্গালায় যেন অপ্রমিত হইয়া না উঠে। সুজা ১০৪৯ হইতে ১০৫৭ হিঃ, অর্থাৎ ১৬৩৯ হইতে ১৬৪৭ খৃঃ পর্য্যন্ত আট বৎসর, বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যোগ্যতা ও সুবিচারের সহিত বাঙ্গালা শাসন করেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাদশাহ কোনও পুত্রকে কোনো ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া নিরলস থাকিতেন না। অতএব অষ্টম বৎসরের পর শা সুজাকে কাবুলের শাসন কার্য্যে পরিবর্ত্তন ও নবাব ঐৎকাদ্ খাঁকে বাঙ্গালার মস্‌নদে স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বসুখ ও সর্ব্বসমৃদ্ধিপূর্ণ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির পরিবর্ত্তে কাবুলের দুরারোহ গিরিসঙ্কট শাহ্‌জাদাকে কোন প্রকারেই প্রলোভিত করিতে পারে নাই। দুই বৎসরকাল যাবৎ এখানে (ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্টের কথায়) "প্রায়শ্চিত্তের মত কালযাপন করিয়া" † সম্রাটের নিয়োগক্রমে তিনি পুনরায় বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত হন। নয় বৎসরকাল অর্থাৎ ১৬৫৭ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালার শাসন দণ্ড পরিচালন করেন। সাময়িক ইতিহাস আলোচনা করিলে এরূপ বোধ হয় যে, তাঁহার সুশাসনে অনেক বিষয়ে দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু ১৬৫৭ খৃঃ যখন শাহ্ জাহাঁর পীড়ার সংবাদ ভারতময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ও শা সুজার প্রলুব্ধ নেত্র পিতার ময়ূর সিংহাসনের উপর নিপতিত হয় ও সিংহাসনে কৌশলে চতুর চূড়ামণি আওরঙ্গজেব সমারূঢ় হন সে সময় হইতেই সুজার ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্ন হন। এ প্রবন্ধ সে সময়কার কথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কুক্ষণে শাহ্‌জাহাঁ বাদশাহের পীড়ার সংবাদ ভারতবর্ষময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল! উনত্রিংশৎ বর্ষব্যাপী তাঁহার সুশাসন মোগল অধিকৃত ভারতের সর্ব্বত্র শান্তি, সুবিচার ও প্রাচুর্য্য বিস্তার করিয়াছিল। রাজকোষ সমৃদ্ধ, রাজধানী বিবিধ অপূর্ব্ব স্থাপত্যকীর্ত্তিতে সমলঙ্কৃত অথচ আধুনিক রাজনীতির অনুকরণে এ সব সমৃদ্ধির জন্য প্রজাকে অতিরিক্ত করভারে হৃতসর্ব্বস্ব হইতে হয় নাই! সুবিজ্ঞ মন্ত্রীর নির্ব্বাচন ও নিয়োগে, রাজ্যের সর্ব্বত্র বাদশাহের সতর্ক পর্য্যবেক্ষণে সুবিচার ও সুশাসনের অভাব হয় নাই। এ সম্বন্ধে সকল ঐতিহাসিকই প্রায় একমত। এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সম্রাট্ শাহ্‌জহাঁর রাজসভার মত অতুল ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধিতে সমলঙ্কৃত রাজসভা ও তাঁহার রাজধানীর মত জগতে অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থাপত্যবৈভবে সমৃদ্ধ তদানীন্তর কোন রাজধানীই ত ছিল না, জগতের ইতিহাসেও বিরল ছিল। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলা অন্যায় হয় না যে, যদি কেহ আধুনিক ভারতে "মেমোরিয়েল হল" নামে তাহার স্থাপত্য কীর্ত্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে প্রয়াসী হন, তবে সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ লেখনী সে প্রয়াসকে কেবল শূন্যগর্ভ অসার গর্ব্বের নিষ্ফল বিড়ম্বনা বলিয়া চিরদিনই উপহাস করিবে! সে যাহা হউক, যখন বাদশাহের কঠিন পীড়ার সংবাদে সমস্ত ভারত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাঁহার পরস্পর যুযুৎসু চারিটী পুত্র সিংহাসনপ্রার্থী হইয়া রাজধানী মহানগরী দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

"পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতি",—"Uneasy lies the head that wears a crown"—কবিদের এ অমূল্য নীতি বহুবার জগতের ইতিহাসেরবহু দৃষ্টান্তে প্রমাণিত ও সমর্থিত হইয়াছে। শাহ্ জহাঁর পীড়ার সংবাদ পাইয়াই তাঁহার সন্তানবর্গের মনে বিদ্রোহের অভিলাষ উদ্রিক্ত হইল, কিন্তু সর্ব্ব প্রথমে সুজাই বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের শাসনকর্ত্তারূপে, মুরাদ গুজরাটের সিংহাসনে, সুজা বাঙ্গলার মস্‌নদে ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দারা পিতার পীড়ার সময় পিতার প্রতিনিধি স্বরূপে পিতার নিকট ছিলেন। যখন শাহজাহানের পীড়ার সংবাদে রাজ্যময় তুমুল অশান্তির ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল, সুদূর বাঙ্গালায় যে সে বিপ্লববঞ্ঝাবাত্যা বিঘূর্ণিত হয় নাই এরূপ নহে। ষ্টুয়ার্টের কথায় তখন শা সুজার "বীণা ও রবাবের মধুর কাকলীতে মুখর" রাজধানী ও রাজসভা "সমরভেরী ও পটহের রণোৎসাহসূচক কর্কশ নিনাদে দিঙ্মণ্ডল পূরিত হইয়াছিল।"

কিন্তু শা সুজা সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিলেও পরস্পর যুধ্যমান ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে কিরূপে বীরহৃদয় অথচ সাংসারিক অভিজ্ঞানশূন্য মুরাদ, সিংহাসনের যথার্থ ন্যায্য অধিকারী ও শাজহাঁ যাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে একান্ত মনে প্রয়াস করিয়াছিলেন, সেই সরল উদার হৃদয় দারা * ও বিলাসী শা সুজাকে অতিক্রম করিয়া চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মী কিরূপে চতুর চূড়ামণি আওরঙ্গজেবকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন—কিরূপে উন্নত বৈরাগ্য ও ধর্ম্মানুরাগের মোহময় কঞ্চুকে আবৃত হইয়া এই নরকলঙ্ক, পিতাকে কারারুদ্ধ ও সহোদর ভ্রাতাদের রক্তে মোগল সিংহাসনের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিল, সে কথা ইতিহাসে অনল অক্ষরে অঙ্কিত আছে। এ প্রবন্ধে সে সব নরক না ঘাঁটিয়া হতভাগ্য শা সুজার শেষ জীবন ক্রূর আওরঙ্গজেবের দ্বারায় কিরূপ বিষময় হইয়াছিল, তাহাই বর্ণনা করিতে প্রয়াসী হইব।

শা সুজা পিতাকে কারারুদ্ধ, ভ্রাতৃত্রয়কে বন্দী ও আওরঙ্গজেবকে পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় দেখিয়া প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অবশেষে মন্ত্রীদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী পরামর্শের পর স্থির হইল যে, আপাততঃ কোন ছলনায় কূটবুদ্ধি আওরঙ্গজেবকে স্থগিত রাখিয়া সমরোদ্যোগের আয়োজন ও নূতন সম্রাটকে তাঁহার নবাধিকৃত উচ্চ পদমর্য্যাদার জন্য অভিনন্দন-পত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

কিন্তু এ সহজ উপায়ে সুজা ধূর্ত্ত শিরোমণি আওরঙ্গজেবকে প্রতারিত করিতে পারেন নাই। দার্শনিকেরা জীবন সংগ্রামে যাহাকে "যোগ্যের জয়" (Survival of the Fittest) বলেন, ধূর্ত্ততা যদি সে 'যোগ্যতার' এক প্রধান অংশ হয় তবে অন্যান্য রাজকীয় গুণের সহিত আওরঙ্গজেব সে গুণ বহু পরিমাণে সহোদরদের অপেক্ষা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সাহসী, বীর, রাজোচিত গুণগরিমায় সমলঙ্কৃত অগ্রজের উপস্থিতি সত্ত্বেও অনুজ কি উপায়ে মোগল সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, এই রহস্যের প্রধান কারণও এই। পিতৃপিতামহের ক্ষুণ্ণ পন্থা, বিশেষতঃ, প্রপিতামহ মোগলকুলরবি আকবরের প্রদর্শিত সরল উদার রাজনৈতিকমার্গ আওরঙ্গজেবের সময় কিরূপে বঙ্কিম ও দুর্গম হইয়া আসিয়া মোগল রাজ্যকে ধ্বংশের পথে অগ্রসর করিতেছিল, তাহা আমরা "প্রবাসী" পত্রে 'লাল কুয়র' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতাপ্রিয় অপরিণামদর্শী কর্জ্জন-প্রমুখ রাজনীতিজ্ঞদের পক্ষে ইহাতে অনেক শিখিবার বিষয় আছে। এ কারণেও এ স্থলে এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে পুনরালোচনা করিলাম। সে যাহা হউক, আওরঙ্গজেব সুজার পাতিত এ ফাঁদে

* এ প্রবন্ধে মুসলমানী শব্দ যথাযথ transliterate করিবার বাঙ্গালার কোনরূপ প্রথা না থাকায় অনেক উচ্চারণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। এজন্য উক্ত সাহিত্যে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ হইয়াও পারস্য শব্দের যথাযথ বাঙ্গালায় উচ্চারণ শুদ্ধ করিতে পারি নাই তজ্জন্য অভিজ্ঞ পাঠকের ক্ষমা প্রার্থনা করি।

† "For two years however, Shujaa was compelled to do penance in Kabul."— Charles Stewart.

* "The noble but impetuous Dara."—Charles Stewart.

পা দিলেন না। সুজা প্রেরিত দূতকে সাদর সম্ভাষণে তাহার প্রভুর ও তাহার পরিজনবর্গের কুশল প্রশ্নে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সুজা বাঙ্গালার সুবাদারী কার্য্যে পুনর্নিয়োগের জন্য নূতন সম্রাটের নিকট নূতন 'ফার্ম্মাণ' (আদেশ পত্র) ভিক্ষা করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব স্বাভাবিক কপটতার সহিত তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, এ সম্বন্ধে নূতন ফার্ম্মান্ প্রদান তাঁহার পক্ষে শুধু অনাবশ্যক নহে, অন্যায়। কারণ, আওরঙ্গজেবও মোগল সিংহাসনে স্থায়ীভাবে অধিরূঢ় হন নাই, বৃদ্ধ সম্রাটের কঠিন পীড়ার জন্য প্রতিনিধি স্বরূপ আছেন মাত্র। যদিও তাহাতে শাহ জাহানের সকল রাজকার্য্য নিজ হস্তে সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য হইয়াছে, তথাপি তন্নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারীদের পুনর্নিয়োগের কোনই প্রয়োজন হয় নাই। এ উত্তর সুজার সন্তোষজনক বোধ না হইলেও এ অবস্থায় এতদধিক সন্তোষজনক উত্তরও তিনি আশা করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন ও আওরঙ্গজেব দারা প্রভৃতি শত্রুবর্গকে দলিত করিয়া সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন।

অবশেষে সুজা কপট মৈত্রীর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের ভাগ্যলক্ষ্মীর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন। যাঁহারা এ যুদ্ধের বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিবরণ পাঠ করিতে কৌতুহলী তাঁহাদিগকে এলিয়ট্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত কাফি খাঁর ইতিহাসের (মুন্তে খুব্-বাল্ লেব্বুব্, বা 'উত্তম সার-সংগ্রহ') ও ডাউ ও ষ্টুয়ার্ট্ সাহেবের ভাস্বর বর্ণনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এ স্থলে আমাদের এ যুদ্ধ ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার স্থান হইবে। ১৬৫৯ খৃঃ সুজা বাঙ্গালা হইতে সেনা সংগ্রহ করিতে করিতে এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেনাবাহিনী বৃহৎ হইলেও নূতন সংগৃহীত ও নূতন শিক্ষিত বলিয়া বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ শিক্ষিত, বাদসাহী ফৌজের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্পূর্ণ অপারগ। এই ত গেল সুজার প্রধান অসুবিধা। ঐতিহাসিক ডাউ (Dow) সাহেব যে সুজার বীরত্ব ও সৈনাপত্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন তৎসত্ত্বেও উপস্থিত ঘটনা সমূহ আলোচনা করিলে বরঞ্চ বিপরীত সাক্ষ্যই দিতে হয়। কারণ, যখন সুলতান শা সুজা এই বিপুল সেনাবাহিনী লইয়া এলাহাবাদের প্রায় ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী খড় গোয়া নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তখন শীঘ্রই আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ কর্ত্তৃক পরিচালিত বাদশাহী ফৌজের অগ্রভাগের সেনা সমূহ দেখা দিল। সুজা নিজের সেনাকে সম্মুখে ও বামপার্শ্বে গভীর খাদ খনন করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, দক্ষিণদিক্ খরস্রোতা নদীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। শত্রু অপেক্ষা উচ্চতর ভূখণ্ডে তাঁহার সেনা সংস্থাপিত ও পরিরক্ষিত। কাফি খাঁ উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বাদসাহী সেনার অন্যতম প্রধান সেনানায়ক যশোবন্ত সিংহ সুজার সহিত সুজার সাহায্য করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে "সেই বিশ্বাসঘাতক হতভাগা" বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ধর্ম্মান্ধ ঐতিহাসিক কাফি খাঁ আমোদপ্রিয় সুজা বা ধর্ম্মমতে শিথিল দারার অপেক্ষা আওরঙ্গজেবের উপর পক্ষপাতের জন্য যে এ কুৎসা রটনা করিয়াছেন, এ কথা সহজেই অনুমেয়। কারণ, যশোবন্তের সহিত পূর্ব্ব হইতে সুজার ষড়যন্ত্র থাকিলে এ যুদ্ধের ফল সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইত, এ কথা আমরা ষ্টুয়ার্টের সহিত অবশ্য বলিতে বাধ্য। তবে উপস্থিত ঘটনাবলী আলোচনা করিলে এরূপ বুঝা যায় যে, যশোবন্ত সিংহ, যিনি এ যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের অধীনে রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দু সেনাসমূহ সেনানায়কের ভার লইয়াছিলেন, তিনি নিজের স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাদসাহী শিবির লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত, এরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার এ অকৃতজ্ঞ বিসদৃশ ব্যবহারের যথার্থ কারণ কেবল কাফি খাঁ ব্যতীত কোন ঐতিহাসিকই নির্দ্দেশ করেন নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কাফি খাঁর কারণ আমরা স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত নহি। আমরা ইহার এক কারণ নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইয়াছি। যশোবন্তের মত প্রবীণ বহুযুদ্ধে অভিজ্ঞ

চতুর ভবিষ্যৎদর্শী সেনাপতির এ কথা বেশ জানা ছিল যে প্রথম যুদ্ধে পরাজয় সুজাকে মোগল সিংহাসনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। আর ধর্ম্মান্ধ হিন্দুদ্বেষী আওরঙ্গজেব অপেক্ষা সুজা যে হিন্দু প্রজাদের স্বার্থ দেখিবেন, এটা তাঁহার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা স্বরূপ অবস্থান সময়েই প্রকাশ। সুতরাং সমক্ষে পত্রাদি দ্বারা ষড়যন্ত্র করিবার অবসর বা সুবিধা না পাইয়া পরোক্ষে এ হিন্দু সেনাপতি সুজার সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এরূপ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু এত করিয়াও সুজা এ যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলেন না। সুজা উচ্চতর ভূখণ্ডে সেনা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার গোলা ও গোলন্দাজ সৈন্যেরা তথা হইতে আওরঙ্গজেবের সৈন্যব্যূহের একেবারে মধ্যভাগে গোলাগুলি ফেলিয়া সৈন্য শ্রেণী বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল, তাহার উপর যশোবন্ত সিংহের এরূপ শিবির আক্রমণে বাদশাহের সৈন্য মধ্যে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলতা দেখা দিল। সে সময় যদি সুজা সুদক্ষ সেনাপতির মত সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া উচ্চ ভূখণ্ড রাত্রে অধিকার ও সুরক্ষিত করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে সেদিনকার যুদ্ধে তাঁহার ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব ছিল। তাহা না করিয়া নিশাগমে সে সমস্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিজের খাদিত পরিখার সীমার মধ্যে সৈন্য হস্তী কামান গুলি রাখিলেন। কাফি খাঁ বলেন যে, "আওরঙ্গজেব স্বীয় শিবিরে যুদ্ধ বিজয়ের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় ব্যস্ত আছেন, এমন সময়ে রাত্রির চতুর্থ প্রহরে তুমুল কোলাহল তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। ক্রমে তিনি জানিতে পারিলেন যে, সেই "হতভাগা বিশ্বাসঘাতক" যশোবন্ত সিংহ শত্রুর নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিল যে, সে অতি প্রত্যূষে বাদশাহী ফৌজ আক্রমণ ও বাদশাহী শিবিরের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিবে। আওরঙ্গজেব নিশ্চয়ই এ সময় আমাকে আক্রমণ করিতে আসিবে, এ সুযোগে আপনি সত্বর বাদশাহী সৈন্য আক্রমণ করিবেন।" ষ্টুয়ার্ট, ডাউ, এল্ফিন্ষ্টোন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা এ যুদ্ধে যশোবন্ত সিংহের সহিত সুজার পূর্ব্ব হইতে ষড়যন্ত্র ছিল, এ কথা স্পষ্টাক্ষরে কেহই বলেন না। তবে যে কোন কারণেই হউক তিনি এ যুদ্ধে ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন, এ কথা এক প্রকার স্থির। কিন্তু এত সুবিধা থাকিতেও সুজা এ যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তিনি নিজের অধিকৃত উচ্চ ভূখণ্ডগুলি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র সৈন্য সংস্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া অবসর বুঝিয়া আওরঙ্গজেবের সুদক্ষ সেনাপতি মীর জুম্‌লা সুজার এ মহৎ ভ্রম সংশোধন করিয়া লইলেন। রাত্রির মধ্যেই তৎক্ষণাৎ তিনি সে স্থান নিজের বাছা বাছা পদাতিক সৈন্য, কামানের শ্রেণী ও পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া লইলেন।

প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বেই সুজার শিবিরে অবরোধ মধ্যে তাঁহার স্ত্রীমণ্ডলীর ক্রন্দনের উচ্চরোল শ্রবণে তাঁহার চৈতন্য হইল। নিজের বিষম ভ্রম দেখিয়া সাতিশয় অনুতপ্ত হইলেন, কিন্তু তাহার প্রতিবিধান তখন তাঁহার সাধ্যাতীত। দেখিলেন শত্রুপক্ষের গোলা গুলি শিবির ভেদ করিয়া অবরোধের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। তিনি অগত্যাই নিজের শিবির সৈন্য শ্রেণীর অপরাংশে সন্নিবেশিত করিলেন।

আওরঙ্গজেবও শত্রু পক্ষে এরূপ বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া নিজের সুসজ্জিত হস্তীদের পরিখার খাত নষ্ট ও পরিখার পার্শ্বস্থ প্রাচীর পদদলিত ও উন্মূলিত করিতে অনুমতি করিলেন। এ সঙ্কট সময়ও সুজার সৈন্যপক্ষও কিন্তু পূর্ণোদ্যমে কয়েক ঘণ্টা ঘুরিয়া শত্রু সেনাকে হটাইয়া দিয়া তাহাদিগকেই আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুজা স্বয়ং হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া দূর হইতে ভ্রাতাকে হস্তী সমারূঢ় দেখিয়া এক মুহূর্ত্তে ভাগ্যলক্ষ্মীর পরিবর্ত্তন করিবার মানসে তাঁহার দিকে বেগে স্বীয় হস্তী চালিত করিলেন। প্রভুর এরূপ সঙ্কট অবস্থা দেখিয়া আওরঙ্গজেবের একজন হস্তী ও গজারূঢ় ওমরাহ বেগে স্বীয় হস্তীকে চালিত করিয়া আনিয়া সুজার হাতীকে ধাক্কা দিল। সহসা

এরূপ বেগে অভিধাবিত হইয়া উক্ত ওমরাহ স্বীয় হস্তী হইতে পড়িয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সুজার হস্তীও ধাক্কা খাইয়া ভীত হইয়া পবনচালিত অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল ও কিছুতেই আওরঙ্গজেবের হস্তীর সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। দৈববিড়ম্বিত সুজা নিজের এরূপ বিরূপ ভাগ্যে একান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সঙ্কটের মুহূর্ত্তে সুজার রণহস্তীদের চালক একজন অনুচর আওরঙ্গজেবের হস্তীকে ধাক্কা দিয়া প্রায় পাতিত করিয়াছিল। আওরঙ্গজেব নিজ অবস্থায় ভীত হইয়া হস্তী হইতে অবতরণ করিতে উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি সেনাপতি মীর জুম্‌লা স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আওরঙ্গজেব, সাবধান, হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণের অর্থ সিংহাসন হইতে অবতরণ।" চতুর সম্রাট নিজ অগ্রজ দারার অবস্থা স্মরণ করিয়া স্বীয় হস্তীপৃষ্ঠে স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার জনৈক অনুচর সুজার অনুচরের হস্তীপককে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল ও আওরঙ্গজেবের হস্তী রণভূমি হইতে পাছে অকালে পলায়ন করে এজন্য হস্তীর পদদেশে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল।

এরূপ প্রায় দেখা যায় যে, যুদ্ধে জয় পরাজয় অতি অল্প কারণের উপরেই নির্ভর করে, এ যুদ্ধে তাহাই ঘটিল। আওরঙ্গজেবের এরূপ স্থিরবুদ্ধিও অটলভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার সেনারা এইরূপ স্থির করিয়াছিল যে, তিনি সংগ্রামে বিজয়ী হইতে কিম্বা প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, এ জন্যই তাহারা তাঁহার পক্ষ হইয়া দৃঢ়চিত্তে শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সেদিনকার যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী আওরঙ্গজেবের করতলগত করিয়া দিল। এদিকে সুজা নিজ সৈন্যদের সংগ্রামে পরাঙ্মুখ ও স্বীয় হস্তীকে অবাধ্য দেখিয়া নিজের একজন অনুচর আলিবর্দ্দী খাঁর পরামর্শে হস্তী হইতে অবতরণ করিলেন। ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, আওরঙ্গজেব প্রভূত উৎকোচ দানে সুজার এ অনুচরকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্টের এ অনুমান ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়। এ অনুমান সত্য হইলেও সুজার বুদ্ধির আদৌ প্রশংসা করা যায় না। কারণ ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে আওরঙ্গজেবের দৃষ্টান্তে দেখিয়াও তিনি ত শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন! "বিপত্তিকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ!" কিন্তু এই বিপরীত বুদ্ধিতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিল। কারণ হস্তীপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে অবতরণ করাতে তাঁহার সমীপস্থ পার্শ্বচরেরাই কেবল তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিল। কিন্তু দূরস্থ সৈন্যেরা তাঁহার 'আম্ভারী' (?) (চন্দ্রাতপযুক্ত হাওদা) শূন্য দেখিয়া তাঁহাকে সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন স্থির করিয়া বিশৃঙ্খল ও ভগ্নোদ্যম হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিল। তজ্জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে ডাউ সাহেব যে সুজার সৈন্যাপত্যের বহু প্রশংসা ও পরাজয়ের জন্য তাঁহার সৈন্যের সমস্ত দোষ দিয়াছেন, স্থিরভাবে সমস্ত ঘটনার আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, যশোবন্তের নিজের ও তাঁহার হিন্দু সেনার সাহায্যে সুজা স্বচ্ছন্দে এ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিতেন। প্রথমতঃ, উচ্চ ভূখণ্ডে সৈন্যদের সুরক্ষিত না করিয়া, দ্বিতীয়তঃ, হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া নিতান্ত অপটু সেনাপতি ও অপরিণামদর্শী নৃপতির ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। এ যুদ্ধে পরাজয় যে কেবল তাঁহারই অপটুতায় ঘটিল, এ কথায় তখনকার লোকের এত দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সমসাময়িক লোকেদের মধ্যে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হইয়াছিল যে,—

"সুজা জীৎ বাজি আপ্‌নে হাঁথ হারা"

অর্থাৎ সুজা যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া বিজয়লক্ষ্মীকে নিজহস্তে অন্যের অঙ্কে তুলিয়া দিয়াছিলেন।*

(আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

* লেখকের শীঘ্র প্রকাশ্য "তাজমহল" নামক মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস গ্রন্থের এক অধ্যায়।

তপন-স্তোত্র।*

১

কালি সেই দুর্য্যোগ রজনী—
সে যে কি ভীষণা ভয়ঙ্করী,
কি বজ্র গর্জ্জন মেঘে, মারুত উন্মত্ত বেগে,
বিশ্ব দিলে ভেঙে চূরে
চূরমার করি!

২

মহাকায় মহীরুহ যত
যুঝি যুঝি পাতি দিল শির,
যত কিছু ছিল যার, সাহস বিক্রম ভার,
মহারণে দিল ঢালি
যত মহাবীর!

৩

দিগন্ত গলিয়া যেন রোষে
বহাইল মুষলের ধারা,
আজন্ম সঞ্চিত ধন, বিনাশিতে প্রয়োজন,
উন্মত্তা প্রকৃতি ভীমা
ক্রোধে দিশাহারা!

৪

যাদঃপতি পরশিতে ব্যোমে
ছুটাইলা তরঙ্গ ভীষণ,
কালের বিষাণ-রবে, আতঙ্কে অধীর সবে,
আঁধারে ডুবিয়া গেল
সমস্ত ভুবন।

৫

দেবতার সাধের বাগানে
প্রবেশিয়া দারুণ অসুর,
শত অত্যাচার করি, উল্লাস সৌন্দর্য্য হরি,
কেড়ে নিল মধুরতা
পাষাণ নিঠুর!

৬

কিম্বা যথা পাণ্ডব শিবিরে
পশি অশ্বত্থামা দুরাচার,
সুপ্ত-সুপ্ত বীর দলে, বিনাশিল কুকৌশলে,
মানব-কলঙ্ক পাপী
দ্বিজ কুলাঙ্গার!

৭

কিন্তু আজি পুনঃ স্বর্ণাচলে
তরুণ অরুণ শোভমান,—
তোমা হেরি মৃতা ধরা, আবার জীবনী ভরা,
জয় জয় বিশ্বনেত্র
নমো বিবস্বান!

৮

দেখ দেব! গত কথা ভুলি
আলোময়ী আবার অবনী,
বিহঙ্গ খুলিয়া প্রাণ, গাহে "আগমনী" গান,
আগে যথা ছিল সব
এখনো তেমনি।

৯

দেখ অই—বাঁচিয়াছে পুনঃ
সূর্য্যমুখী নিরখি তোমায়,
যেমতি সাবিত্রী সতী, পুনঃ পেলে প্রিয় পতি—
কালের কবল হ'তে
বিধির কৃপায়!

১০

দেখ সেই ভগ্ন উপবনে
তরুলতা জাগিছে আবার,
তব হেতু দিননাথ! হেরিনু এ সুপ্রভাত,
গেছে যেন মুছে যুচে
সে ঘোর আঁধার!

* দুর্য্যোগ রাত্রির পরদিন সূর্য্যোদয়ে লিখিত।

১১

এ জগত ব্যাকুল নয়নে
ছিল তব আসা পথ চাহি—
সেই যে নীরব স্বর, ভেদিয়া মরণ স্তর—
পশিল কি তব কাছে
সেই "পরিত্রাহি" ?

১২

তুমি তা'কি বুঝিছ সৌরেশ,
আজি তুমি নহ সে "তপন"
কালিকার সে বিপদে, বিরাট সম্রাট পদে
তোমারে বিপন্ন বিশ্ব
করেছে বরণ ?

১৩

বুঝিয়াছে আত্মত্যাগ তব,
বুঝিয়াছে আয়াস সকলে,
শৌর্য্যবীর্য্য দেবশক্তি, প্রীতি-প্রেম অনুরক্তি,
বিলাইছ মৌন যোগী,
নিখিল মঙ্গলে।

* * * *

১৪

যা' হবার হয়ে গেছে কালি—
না হয় যা' হয় পরে হবে,
আজি শুভ জয়ধ্বনি, স্বাগত হে দিনমণি
আজি তো বাঁচিল বিশ্ব
তোমারি গৌরবে।

শ্রীমানকুমারী বসু।

খাদ্য।

আমাদের আহার্য্য বস্তু সাধারণতঃ চারি প্রকার অতি আবশ্যকীয় পদার্থ ধারণ করে; যথা, শ্বেতসার (পালো), শর্করা, তৈল এবং প্রোটিড্। প্রথম তিন প্রকারের খাদ্য এক ধর্ম্মাবলম্বী, ইহাদের দ্বারা আমাদের শরীরের উষ্ণতা রক্ষা হয় এবং প্রোটিড্ দ্বারা দেহের মাংস প্রভৃতি সার অংশ প্রস্তুত হয়। সুতরাং প্রোটিড্ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান খাদ্য। প্রত্যেক বয়োপ্রাপ্ত মনুষ্যের প্রত্যহ ৩০ তোলা প্রোটিড্ ভক্ষণ করা আবশ্যক।

ঘৃতে বল বৃদ্ধি হয় না। ইহা ও অন্যান্য তৈলময় পদার্থ শরীরের উত্তাপ এবং তজ্জন্য আভ্যন্তরীণ যন্ত্রদিগকে কর্ম্মশীল করিয়া থাকে। প্রয়োজনাধিক তৈলময় পদার্থ সঞ্চিত হইয়া দেহ পুষ্টি করে; এবং এই তৈলময় পদার্থ অন্নাভাব ও পীড়ার সময় দেহ রক্ষার জন্য সাহায্য করে। কিন্তু অধিক মাত্রায় তৈলময় পদার্থ ভক্ষণ করিলে দেহ এমন অসাধারণ স্থূল হইতে পারে যে ঐ ব্যক্তি আর কখনও শ্রান্তি-জনক কর্ম্ম করিতে পারে না। সাধারণতঃ পরিশ্রমী ব্যক্তিগণ ভুক্ত দ্রব্যের সহিত দৈনিক ৯ তোলা তৈলময় পদার্থ এবং ৪০ তোলা শ্বেতসার ও শর্করা গ্রহণ করিতে পারেন। পরিশ্রমহীন ব্যক্তির পক্ষে এই খাদ্যের এক তৃতীয়াংশ মাত্র আবশ্যক হয়। এক ভাগ তৈলময় পদার্থ, শ্বেতসার বা শর্করার দ্বিগুণের কিঞ্চিদধিক (২·৩) গুণ বিশিষ্ট।

আমাদের সাধারণ আহার্য্য বস্তু সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিমাণে প্রোটিড্ প্রাপ্ত হওয়া যায়:—

গমে	শতকরা	৯—১২
যবে	,,	৮
খইয়ে	,,	৮
চাউলে	,,	৭
ভুট্টায়	,,	৯
জুয়ারে	,,	৮
ডাইলে	,,	১৬—২৪
দুগ্ধে	,,	৩½

ডিম্বে	শতকরা	১৩
মৎস্যে	,,	৯—১০
মাংসে	,,	১৪—১৫
আলুতে	,,	২
সাধারণ তরকারীতে	,,	১
ফলে	,,	১

ডাইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রোটিড্ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু সবল ব্যক্তিও ইহার এক তৃতীয়াংশের অধিক প্রোটিড্ জীর্ণ করিতে সক্ষম হয় না। কেবল পচনীয় প্রোটিডের পরিমাণ অনুসারে খাদ্যের মূল্য নিরূপণ করা যায় না। সুস্বাদ সুগন্ধ দ্বারাও মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। সুস্বাদু ও সুগন্ধী খাদ্য দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ হয়।

মোটের উপর ডাইল পরিপাক করা সুকঠিন। বঙ্গদেশের জল পান করিয়া দৈনিক অর্দ্ধ পোয়ার অধিক ডাইল ভক্ষণ করা সাধারণতঃ সম্ভবপর নয়। বাঙ্গালীগণ সাধারণতঃ দৈনিক অর্দ্ধ সের চাউল গ্রহণ করে। চাউল অপেক্ষা গমের ময়দা দেড়গুণ বলকারক খাদ্য। সহ্য হইলে রাত্রিকালে ভাতের বদলে রুটি আহার করা বিধেয়। ময়দা অল্প জলে মাখিয়া ছোট ছোট তাল করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া লইয়া উহার দ্বারা রুটি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে ইহা সুপাচ্য হয়। ইদানীং মৎস্য ও দুগ্ধের যেরূপ অভাব তাহাতে পরিমিত রসদ সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন। যে স্থানে মাংস সুলভ, তথায় প্রত্যহ এক বেলা মাংস গ্রহণ কর্ত্তব্য। বাঙ্গালিগণ হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। কিন্তু উপযুক্ত আহারের অভাবে তাহারা অচিরাৎ বলহীন হইয়া অকালে কালের হস্তে পতিত হয়। মাছ মাংস ভক্ষণ ব্যয়-সাধ্য, ইহা সাধারণের পক্ষে ব্যবস্থা করা যায় না। সাধারণ লোকের দৈনিক পাঁচ পোয়া চাউলের অন্ন ও অর্দ্ধ পোয়া ডাইল ভক্ষণ না করিলে চলিবে না। খাস বাঙ্গালায় কদাচিৎ গম উৎপন্ন হয়, সুতরাং ময়দা সাধারণের পক্ষে দৈনিক খাদ্যরূপে প্রবর্ত্তন করা কঠিন ব্যাপার। যাহাদের চলে তাহাদের দৈনিক অর্দ্ধ সের মাছ মাংস গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মাছ অপেক্ষা মাংস অধিক পরিমাণে পরিপাক করা যায়। কিন্তু অধিক মশলা দ্বারা রন্ধন করিলে মাংসও দুষ্পাচ্য হয়। অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম্ব সহজে জীর্ণ হয়। মাছে জিলোটিন অধিক থাকায় ইহা মাংসের মত সুপাচ্য নহে। মাছ মাংস ভক্ষণে বুদ্ধি শক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি হয়। মাংসাশী জীবজন্তু অতিশয় সুচতুর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইহারা অতি দ্রুততার সহিত স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। নিরামিসভোজী জন্তুর এ সব গুণ নাই। ইহারা স্বভাবতঃ ভীরু ও সাধারণতঃ অলস। গঠন ও প্রকৃতি তত্ত্বানুসন্ধান করিলে আমিস ও নিরামিস উভয়বিধ খাদ্যই মনুষ্যের প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুমান করা যায়। সুতরাং দেহ রক্ষা কিম্বা দেহের উন্নতি বিধানার্থ বিভিন্ন রুচির ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মাছ মাংস ভক্ষণ কখনও নিন্দনীয় হইতে পারে না। খাদ্য জিনিসের প্রতি সঙ্কীর্ণ ভাব থাকায় ভারতবর্ষে সর্ব্বদা হিন্দু ও মুসলমান বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। এমন কি ইহারই জন্য পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ, বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণকে ঘৃণার চক্ষে দেখে।

আমরা বিভিন্ন অবস্থার ও বিভিন্ন রুচির ব্যক্তির নিমিত্ত নিম্নস্থ দৈনিক রসদ ব্যবস্থা করিতেছি। ইহা উল্লেখ করা উচিত যে, সকলের পক্ষে একরূপ খাদ্য ব্যবস্থা করা যায় না। ভাত অতিশয় লঘুপাচ্য খাদ্য কিন্তু ইহাও কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী হয় না; কিন্তু সেই ব্যক্তি সহজে গুরুপাচ্য রুটি পরিপাক করিতে পারে। দুগ্ধের ন্যায় লঘু পথ্যও কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে। অপ্রবৃত্তির সহিত সুখাদ্য গ্রহণ করিলেও ইহা বিষ-তুল্য হইতে পারে। আবার অভ্যাসে অরুচিকর খাদ্যও রুচিকর হইয়া থাকে।

মধ্যবর্ত্তী অবস্থাপন্ন এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দৈনিক রসদ:—

খাদ্য বস্তুর নাম	পরিমাণ	প্রোটিডের পরিমাণ
চাউল	২০ তোলা	১½ তোলা
ময়দা	২০ ,,	২ ,,
মৎস্য	২০ ,,	২ ,,

খাদ্য বস্তুর নাম	পরিমাণ	প্রোটিডের পরিমাণ
মাংস	২০ তোলা	৩ তোলা
ডিম্ব (২টা)	১০ „	১ „
ডাইল	৫ „	½ „
দুগ্ধ	২০ „	½ „
তরকারী ও ফল		½ „
ঘৃত ও তৈল	৮ „	
শর্করা	১০ „	

যাঁহার রুটি সহ্য হয় না, তাঁহার দুই বেলায় তিন পোয়া চাউলের অন্ন গ্রহণ করা উচিত, এবং যিনি মাংস আহার করেন না, তাঁহার মৎস্য ডিম্ব ও দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। যিনি নিরামিষ আহার করেন, তাঁহার পক্ষে রুটি অপরিহার্য্য। সম্ভব হইলে দুই বেলার পরিবর্ত্তে তিন বেলা আহারের ব্যবস্থা করা উচিত।

বঙ্গদেশীয় সাধারণ লোকের দৈনিক রসদ :—

খাদ্য বস্তুর নাম	পরিমাণ	প্রোটিডের পরিমাণ
চাউল	১০০ তোলা	৭ তোলা
ডাইল	১০ „	২ „
তরকারী	২০ „	½ „
তৈল ঘৃত শর্করা		

বঙ্গদেশীয় সাধারণ লোক ক্রয় করিয়া মাছ মাংস কিম্বা দুগ্ধ গ্রহণ করিতে অক্ষম। যে স্থানে মৎস্য প্রচুর তথায় তাহারা নিজেরাই মৎস্য ধরিয়া লয়। মৎস্য দুষ্প্রাপ্য হইলে পাঁচ পোয়া চাউলের ভাত না খাইলে চলিবে কেন? দুইবারে পাঁচ পোয়া চাউলের ভাত গ্রহণ করিতে না পারিলে তিনবারে ইহা গ্রহণ করিতে হইবে। এতদ্দেশীয় কৃষকগণ তিন বেলা আহার করে, ইহা উত্তম। কিন্তু ইহা বক্তব্য যে খাদ্যে প্রোটিড্ ও প্রোটিড্হীন পদার্থের অনুপাত অনুসারে মনুষ্য ও অন্য জন্তুর শক্তি বা স্বাস্থ্য নির্ভর করে। মনুষ্যের একমাত্র চাউল উপযুক্ত হইতে পারে না। চাউলের সহিত অধিক সারবান খাদ্য গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। * ময়দার সহিত অন্য কোন খাদ্য যোগ না করিলেও চলিতে পারে। এইজন্য ভেত বাঙ্গালী অপেক্ষা হিন্দুস্থানী লোক অধিক বলবান। বঙ্গদেশীয় অনেক লোকের নিকট রুটি ও ডাইল আশ্চর্য্য সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং অভাবে একমাত্র চাউলের দ্বারাই প্রোটিডের মাত্রা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। পরিমিত চাউলও না জুটিলে লেখক নাচার।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী।

* লেখক প্রণীত কৃষি রসায়ন পাঠ করিলে বিভিন্ন খাদ্য বস্তুর উপাদান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান জন্মিবে বলিয়া আশা করা যায়। লেখক।

নন্দকুমার।

(প্রত্যুত্তর)

ভক্তিভাজন নিখিল বাবু আমার অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ পড়িয়া অনুগ্রহ প্রকাশে উত্তর দিয়াছেন। প্রত্যুত্তরে আমি সামান্য ২।১টী মাত্র কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। এই বক্তব্য বলিবার পূর্ব্বে আমি বলিতে চাই যে, নন্দকুমার প্রবন্ধ ছাপা হইবার পূর্ব্বে আমি শ্রীযুক্ত নিখিল বাবুকে তাহা পাঠাইয়া দেই এবং তৎসহ পত্রে আমি আমার বক্তব্য জানাই। অজ্ঞাত ব্যক্তির পত্রোত্তর না দেওয়াতে আমি জিজ্ঞাসু ভাবেই কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রবন্ধ 'সুপ্রভাতে' পাঠাই। এইক্ষণ তিনি অনুগ্রহ করিয়া উত্তর করিয়াছেন এবং এই অনভিজ্ঞ তরুণ লেখককে Sir William Jonesর যে উপদেশের পুনরুক্তি করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়া আমার কথা সংক্ষেপে বলিবার প্রয়াস করিতেছি। এ স্থলে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, নিখিল বাবু পরলোকগত ঘোষ মহাশয়কে যেরূপ বলিয়াছিলেন,

সে তুলনায় আমি অতি অল্পেই নিষ্কৃতি পাইয়াছি।

যে কয়েকটী কথা বলিতেছি, তাহা আমার নিজের কথায় বলিব না। গত বৎসর Bengalee কার্য্যালয় হইতে Trial of Maharaja Nandakumar বলিয়া একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। জনপ্রিয় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, মিত্র সাহেব এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন। আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ভূমিকা দেখিতে পাই নাই। আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরে এই পুস্তক আমার হস্তগত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয় এই ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অবশ্য অনেক পড়িয়াই লিখিয়াছেন, সুতরাং আমার উক্তি অপেক্ষা তাঁহার উক্তির মূল্য অনেক বেশী সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। ব্যারিষ্টার মহাশয় এই ভূমিকায় নন্দকুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছেন। আমি জীবনী হইতে মাত্র কতকগুলি লাইন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, আমাপেক্ষা অনেক বিদ্বান লোক নন্দকুমারকে 'পাষণ্ড' ব্যতীত অন্য কিছুই বিবেচনা করেন না।

He was an unscrupulous and aspiring statesman whose sole aim was self-aggrandizement *unredeemed by a single noble or lofty idea.* He was a man with an iron will, all the more terrible for its not being controlled by anything like principle. In his stupendous selfishness, in his utter contempt of all principle, he resembled those statesmen princes of Mediaeval Italy whose boast it was that no woman ever escaped their lust nor no man their revenge. In the pursuit of the end which he had in view his deadened conscience never turned aside from any crime however atrocious." নিখিল বাবু আমার প্রবন্ধের উত্তরে লিখিয়াছেন যে, "তিনি যদি কেবল মুতাক্ষরীণের বর্ণনার উপর নির্ভর না করিয়া নন্দকুমার সম্বন্ধে যাবতীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন ও নিজে সমস্তগুলির বিচার করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহা হইলে তাহা আমাদের মতবিরুদ্ধ হইলেও আমরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতাম না।" আমার উপর তিনি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন কিন্তু মিত্র মহাশয়ের উপরোক্ত উক্তিতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন কি না জানি না।

"নন্দকুমার সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন মত আছে, এবং উভয় মত সম্বন্ধেই ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।" ইহা আমি অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু "It is none the less true that it was his treachery which enabled the English to take possession of Chandernagore, it is none the less true that it was his faithlessness which enabled Clive to execute his famous march on Plassey unmolested" ("Bengalee" office Reprint), এ কথা যদি সত্য হয় তবে নিখিল বাবু নন্দকুমারকে Hero বলিতে পারেন, তবে অন্য মতাবলম্বীর সংখ্যাও বোধ হয় কম হইবে না। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিলের কলিকাতা কাউন্সিলের সভার বিবরণে লিখিত আছে যে,—

"We the servants of the East India Company should always be grateful to that noble-minded and wealthy native-merchant of Calcutta—Omichand. It was through his agency that we succeeded to secure the assistance and co-operation of Dewan Nun Coomar foujdar of Hughli. A body of Subadar's troops was stationed within the bounds of Chandernagor previously to our attack of that place. These troops belonged to the garrison of Hughly and were

under the command of Dewan Nun Coomar. If these troops had not been withdrawn, it would have been highly improbable to gain the victory." কাউন্‌সিলের এই মন্তব্যের উপরে শ্রীযুক্ত পি, মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—

"Maharaja Nanda Coomar betrayed his master for shekles of gold and shekles of silver. He was a military Judas, for whom the most ignominious death would not have been an adequate punishment". ইহার উত্তরে আমি কিছু বলিব না তবে নবকৃষ্ণ যে এ দোষে দোষী নহেন তাহা সকলেই বলিবেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত পি, মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে, নন্দকুমার যদি এরূপ কার্য্য না করিতেন, তাহা হইলে ক্লাইভ কিছুতেই পলাশী ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতেন না এবং মিত্র মহাশয়ের মতে ("It is only reasonable to hold that Nanda Kumar knew of the conspiracy formed by the English to dethrone his master from his friend Omichand") যে "ইহাও বিশ্বাস হয় যে, নন্দকুমার উমিচাঁদের নিকট হইতে সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার পরামর্শের বিষয় অবগত ছিলেন।" ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলিতে পারি না তবে মিত্র মহাশয়ের মতে—

"He committed this series of atrocious crime from no other motive but that of a sordid lore of gain."

নিখিল বাবু যে ক্ষেত্রে নন্দকুমারকে নির্লোভী করিতেছেন, সেই ক্ষেত্রে অন্য একজন প্রথিতনামা লেখক তাঁহাকে সেই দোষে দোষী করিতেছেন।

তৎপর রেন্না খাঁর সম্বন্ধে নিখিল বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক; তবে তহবিল তছরুপাত সম্বন্ধে এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, "The political chaos was accompanied by a social and moral chaos which were equally tremendous and equally apalling" এবং তৎকালে বোধ হয় অনেকেই এই প্রকার নানারূপ কার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নতুবা অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহারাজা নন্দকুমারই বা কি প্রকারে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন?

মুতাক্ষরীণ রচয়িতা ইংরাজদিগের প্রতি যে সদয় ছিলেন না, তাহা সর্ব্বজনবিদিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উক্ত পুস্তক পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, "কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের সহিত মুতাক্ষরীণকারের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তিনি ইংরাজদের বড় একটা কসুর করেন নাই। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ইংরাজ বিদ্বেষ পাওয়া যায়।

এ প্রত্যুত্তর দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না; আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসুর ন্যায় নিখিল বাবুর "Read and you will know" এই প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিবারই চেষ্টা করিতেছি। তবে তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই নন্দকুমার সম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ ছিল, "সেই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য অন্যত্র চেষ্টা করিয়া" (নিখিল বাবুর কথা) দেখিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত পি, মিত্র ব্যারিষ্টার মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাই সুপ্রভাতের পাঠকবর্গের সম্মুখে কৈফিয়ৎ স্বরূপ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। আশা করি, শ্রীযুক্ত নিখিল বাবুর উপদেশানুযায়ী কার্য্য করাতে তিনি আমার উপর রুষ্ট হইবেন না।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

একান্নবর্ত্তী পরিবার ও স্ত্রীশিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সমদর্শিতা এই প্রথার মেরুদণ্ড। সঙ্গীতে যেমন এক এক রাগিণীতে এক একটা বাদী সুর থাকে, যাহাকে হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণ 'জান্' বলেন, সমদর্শিতাও সেইরূপ এই প্রথার বাদী সুর বা 'জান্'। রাগিণীর যেমন 'জান্' বাদ দিলে কিছুই থাকে না, মেরুদণ্ডহীন জীবদেহ যেমন দণ্ডায়মান হইতে পারে না, সমদর্শিতা না থাকিলে এই প্রথাও একেবারেই দাঁড়াইতে পারে না, সামান্য ফুৎকারেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া যায়। এই সমদর্শিতার প্রতি দৃষ্টি রাখা এ ক্ষেত্রে নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

একান্নবর্ত্তী পরিবার সকলের অধিকার সমান নহে। পরিবারের মধ্যে পিতা বর্ত্তমানে তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। এই পরিবাররূপ রাজ্যের তিনিই একচ্ছত্র সম্রাট্। তদভাবে তাঁহার ভ্রাতা প্রভৃতি থাকিলে তাঁহারা, তদভাবে তাৎকালিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়া পরিবারের মধ্যে স্বীয় ক্ষমতা পরিচালনা করেন। অন্তঃপুরে মাতা, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতিই গৃহিণী পদে প্রতিষ্ঠিতা। পুরুষগণের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠগণ যথাক্রমে বয়োজ্যেষ্ঠগণের অধীন এবং তাঁহাদের পুত্র স্থানীয়; স্ত্রীগণের মধ্যেও কন্যা ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি রমণীগণ কন্যা স্থানীয়া। বাহিরের প্রত্যেক কার্য্যই কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে নিষ্পন্ন হইবে, কর্ত্তার অনুমতি অথবা অভিপ্রায় ভিন্ন কোন কার্য্যই সাধিত হইতে পারিবে না। অন্তঃপুরেও গৃহিণীর নির্দেশ মতই সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। অতএব বাধ্যতা এই প্রথার একটী প্রবল ও অপরিহার্য্য অঙ্গ। কর্ত্তা বা গৃহিণী ইচ্ছা করিলে বয়ঃকনিষ্ঠগণের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন, কিন্তু শেষে তাঁহার মতেই সকলকে চলিতে হইবে; তাহাই মান্য করিতে হইবে। এইখানে স্বীয় স্বাধীনতাকে সংযত করার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয়। হিন্দু হৃদয়ে সামাজিক ও পারিবারিক কার্য্য প্রণালীতে সমত্ব ভাব স্থান পায় না। অতএব সম্বন্ধের উচ্চতা এবং বয়সের গৌরব অনুসারে বাধ্যবাধকতার ভাবই পরিস্ফুট হয়। তবে বয়ঃকনিষ্ঠ কোন ব্যক্তি যদি বিশেষ বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলিয়া খ্যাতাপন্ন হন তাহা হইলে কর্ত্তা ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সাংসারিক ব্যবস্থার ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিতে পারেন এবং অনেক স্থলেই তাহা করিয়াও থাকেন।

যখন পরিবারস্থ সকলকেই কর্ত্তা ও গৃহিণীর অধীন হইয়া থাকিতে হয়, তাঁহাদের উপরই যখন তাঁহাদের সকলের সুখ শান্তি নির্ভর করিতেছে তখন এই প্রথায় তাঁহাদের পদও যেমন উচ্চ, দায়িত্বও তেমনিই অতি গুরুতর। ইঁহাদের উভয়ের প্রত্যেকের চরিত্রই আদর্শ হওয়া আবশ্যক। সমদর্শিতা গুণ ইঁহাদের প্রত্যেক রক্ত কণিকাতে অণু প্রবিষ্ট হওয়া চাই। পরিবারস্থ প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকের প্রতি তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য এবং প্রত্যেক ব্যবহার ঠিক ন্যায়ের তুলাদণ্ডে সমভাবে তুলিত হওয়া আবশ্যক। পরিবারস্থ কেহই যেন তাঁহাদের ব্যবহারের ন্যূনাতিরেক একটু মাত্রও উপলব্ধি করিতে না পারে। অশন বসন অলঙ্কারাদি যখনই দেওয়া হউক, একই শ্রেণীর প্রত্যেককেই সমভাবে দিতে হইবে, অথবা কাহাকেও দিতে হইবে না।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা অপেক্ষাও গৃহকর্ত্রীর বুদ্ধি বিবেচনা, বিচারশক্তি, অপক্ষপাত ইত্যাদি গুণাবলী অধিক পরিমাণে থাকা আবশ্যক। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে প্রধানতঃ পরিবারস্থা রমণীগণের অসন্তুষ্টি হইতেই ক্রমে ক্রমে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি

হইয়া থাকে। এই অসন্তুষ্টির প্রধান কারণ অনেক সময়ই গৃহকর্ত্রীর অবিবেচনা এবং পক্ষপাত হইতেই সঞ্জাত। গৃহিণী তাঁহার পুত্র, কন্যা, পৌত্র দৌহিত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে যে ভাবে আহার, পান, বস্ত্র অলঙ্কারাদি দান করেন, দেবর বা অন্যান্য আত্মীয়ের পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে সেরূপ দেন না, সময় সময় নিজের ছেলেদের মধ্যেই কাহাকেও বেশী কাহাকেও কম দেন; ইহা হইতেই ক্রমে বিষ বৃক্ষের বীজ উপ্ত হয় এবং শেষে তাহার তিক্তফলে অন্তরাত্মা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে থাকে। কিন্তু গৃহিণী যদি সদ্বিবেচক হন, তিনি যদি সকলকে সমান ভাবে দেখেন, তাঁহার ন্যায়পরতার প্রতি যদি অধীন ও অধীনাগণের দৃঢ় প্রত্যয় থাকে, তাহা হইলে আর সে অসন্তুষ্টি আসিতে পারে না, পরিবার কলের মত নীরবে স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়া যায়। কলের প্রত্যেক অঙ্গ নীরবে সুষ্ঠু চালাইতে হইলে যেমন তাহাতে সর্ব্বদা স্নেহ প্রলেপ দিতে হয়, পরিবাররূপ যন্ত্রও সুন্দরভাবে চালাইতে হইলে তাহারও প্রত্যেক অঙ্গে স্নেহ প্রলেপ প্রদান সর্ব্বদা প্রয়োজনীয়। সর্ব্বদা স্নেহ প্রলেপে মসৃণ থাকিলে আর তাহাতে কোন কলঙ্ক দাগ পড়িতে পারিবে না। ইহাতে কৃতিত্ব লাভ, কর্ত্তাপেক্ষা গৃহিণীর পক্ষেই বেশী প্রয়োজনীয়। কারণ অন্তঃপুরের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী গৃহিণী, তিনি কর্ত্তাকে যাহা বুঝাইবেন, কর্ত্তাও তাই বুঝিবেন; তাঁহার মন নির্ম্মল, উদার, প্রশস্ত, নিঃস্বার্থ অপক্ষপাত না হইলে কর্ত্তাকেও অনেক বিষয়ে ভ্রমে পড়িয়া ভুল বিচার করিয়া ফেলিতে হয়। সুতরাং গৃহিণী অব্যবস্থিতচিত্তা, অবিমৃষ্যকারিণী, স্বার্থপরায়ণা হইলে সে পরিবারে এই প্রথার সুফল দূরে থাকুক, অশেষ কুফলই প্রসূত হইয়া থাকে। অতএব তাঁহাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকা নিতান্তই আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে একটি আদর্শ একান্নবর্ত্তী পরিবারের একটি বৃত্তান্ত মদীয় কোন বন্ধু প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রুত হইয়াছি, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি। বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলের কোনও স্থানে একটি পরিবার কয়েক পুরুষ ধরিয়া একান্নবর্ত্তীতার অধীনেই বাস করিতেছিল। পরিবারের বয়োবৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকেই কর্ত্তা ও গৃহিণীর আসন গ্রহণ করিতে হইত। যৎকালের কথা বলিতেছি, তখন খুল্লতাতও তৎপত্নী পরিবারের রাজা ও রাণী ছিলেন; পরিবারের জনসংখ্যা সর্ব্ব সমেত প্রায় তিন শত। ষোড়শী বধূই ২০।২৫ জন ছিল। ইঁহাদেরই একজনের স্বামী নব্যযুবক কলিকাতায় চাকুরী করিতেন, তিনি একবার শীতকালে দুর্ম্মতিবশতঃ তাঁহার স্ত্রীর জন্য ১৫৲ টাকা মূল্যের সিল্কের বডিস্ ক্রয় করিয়া আনিয়া রজনী যোগে পত্নীকে গোপনে দান করেন। পরদিন গৃহিণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। চতুরা গৃহিণী তৎক্ষণাৎ কর্ত্তার নিকট গিয়া বলেন "সংসারে আগুনের ফুল্‌কি পড়েছে গো! জ্বলে গেল বলে।" কর্ত্তা বলিলেন, "ব্যাপার কি?" গৃহিণী সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। বৃদ্ধ 'বটে' বলিয়া তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, সেই বডিস্ অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখে আনীত হউক, এবং সে যুবককেও ডাকা হউক। তদীয় আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। কর্ত্তা গৃহিণীকে একখানি কাঁচি আনিতে বলিলেন এবং বাড়ীতে ঐ বয়স্কা বধূ কয়জন তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন; গৃহিণী বলিলেন, "২৪ জন"। কর্ত্তা তৎক্ষণাৎ কাঁচি দিয়া সেই সুন্দর বডিস্‌টীকে সমান ২৪ খণ্ডে কাটিয়া গৃহিণীর হস্তে দিয়া বধূগণকে ভাগ করিয়া দিতে বলিলেন; যুবককে বলিলেন, যদি কখন সকলের জন্য আনিতে পার আনিও, নতুবা আজই পৃথক বাটী করিয়া স্বীয় পরিবার লইয়া বাস কর।" যুবক অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন বলিয়া স্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপ অপক্ষপাত ও সমদর্শিতা না থাকিলে এক ন্নবর্ত্তী পরিবার অনেক সময়েই অসুখের কারণ হয়। আমার মনে হয় যে, পরিবারস্থ উপার্জ্জন সক্ষম যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা যদি পারেন তবে প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তানগণের জন্য বস্ত্র অলঙ্কারাদি না ক্রয় করিয়া অন্য ভ্রাতা বা তৎসদৃশ আত্মীয়ের সন্তানগণের জন্য যদি তাহা আনিয়া দেন,

আবার তাঁহার সন্তানগণকে যদি অন্যে দেন তবে সে ব্যবস্থাও যেন মন্দ হয় না। যিনি সেরূপ উপার্জ্জনক্ষম নন, তাঁহার সন্তানগণের ব্যবস্থা অন্যেরা করিবেন। অন্ততঃ এইটুকু ঠিক থাকা দরকার যে, নিজ নিজ সন্তানগণের জন্য কেহ কিছু বিশেষভাবে দিবেন না; কর্ত্তা ও গৃহিণীই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন; এই প্রণালীতে আত্ম স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। উপার্জ্জকগণ প্রত্যেকে মনে করিবেন, তাঁহাদের উপার্জ্জিত অর্থ তাঁহাদের নহে, সংসারের; তাঁহাদের নিজ ব্যয় বাদে যাহা থাকিবে, তাহা সংসারের জিনিস, কর্ত্তার ইচ্ছাক্রমে তাহার ব্যবস্থা হইবে। তাঁহারা পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু কর্ত্তা তদনুসারেই কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন না। সংসারের উন্নতির জন্য সংসারের সুনামের জন্য প্রত্যেকেই যত্নবান হইবেন। নিজ নিজ পত্নী, পুত্র কন্যাদিও সংসারেরই বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

এই প্রথায় পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের যাহা কিছু সম্পত্তি, তাহা স্থাবর হউক কি অস্থাবর হউক, সংসারেরই সম্পত্তি। সংসারের যাবতীয় লোকেরই তাহাতে অধিকার আছে, তাহার উন্নতি বা অপচয়ে সকলেরই ক্ষতি, সুতরাং সকলেরই তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। দায়াধিকার তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেও এ বিষয়ে মহর্ষিগণের সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই প্রণীত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ হয় না। পরিবারস্থা দাসীগণের সন্তানের জন্যও একটা স্বত্ব স্থির করিতে তাঁহারা ভুলেন নাই। পিতা পাছে বহুবিবাহ করিয়া অথবা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়া সেই প্রিয়া ভার্য্যার প্ররোচনায় সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধে অবিচার, অন্যায় ও পক্ষপাত করেন, সেজন্য তাঁহারা সন্তানগণের অধিকার একেবারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য সকলের অধিকার এবং দায় তত্ত্ব আলোচনা করিলেও ঋষিগণের এ প্রথার সুফল স্থিতি সম্বন্ধে যে প্রযত্ন ও সমদর্শিতা ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। আমি আইনজ্ঞ নহি, আর এ প্রবন্ধে ব্যবহার শাস্ত্রের তন্ন তন্ন আলোচনারও প্রয়োজন দেখা যায় না, এজন্য এ আলোচনার ভার আমাদের মাননীয় কুশাগ্রধী উকীল বাবুগণের উপরই ন্যস্ত থাকিল। তবে সাধারণ ভাবে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, তবে স্ত্রৈণ পিতার দ্বারা যাহাতে অন্য স্ত্রীর সন্তানের অধিকার বিনষ্ট না হয়, উচ্ছৃঙ্খল যুবক পুত্র কর্ত্তৃক যাহাতে বৃদ্ধ পিতা মাতা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া বার্দ্ধক্যে কষ্ট না পান, অথবা ঐরূপ পুত্র ইচ্ছামত সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইয়া তাহা নানা ব্যসনে উড়াইয়া দিয়া শেষে নিজ নিজ শিশু পুত্র কন্যাগণকে দারিদ্র্য কষ্টে না ফেলিতে পারে, বালবিধবা বধূগণের যাহাতে অন্নবস্ত্র সংস্থানের ক্লেশভোগ না করিতে হয়, দুর্ব্বৃত্তা গৃহিণীর হস্তে সম্পত্তি যাহাতে বিধ্বস্ত না হয় ইত্যাদি অশেষ প্রকার সুব্যবস্থা দ্বারা তাঁহারা পরিবারের সাধারণ সম্পত্তি সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের দূরদর্শিতা এবং সার্ব্বজনীন মঙ্গলেচ্ছার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বর্ষা-আরতি।

১

এস কুঞ্জ-কুটীরে পুঞ্জ মেঘের
অঞ্চলখানি ছড়ায়ে,
এস আকাশের কোণে বিজলী রেখার
নবীন নিশান উড়ায়ে!
এস গম্ভীর ঘন মেঘ-হুঙ্কারে
দৈত্য শিশুর প্রায়,
এস নিদাঘ গর্ব্ব করিয়া খর্ব্ব
মত্ত অশনি ঘায়।
এস সিঞ্চি সুধীরে ধরণীর পরে
স্নিগ্ধ শান্তিধারা;
এস ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে মহিমা তোমার
ছুটে যাক্ দিশাহারা!

২

ওই পশ্চিম নভ ব্যাপ্ত করিয়া
আঁধার এসেছে নামি,—
গ্রামের প্রান্তে মাঠের অন্তে
লুটায় ধরণী চুমি'।
ওই আম্র কাননে দিবালোক সনে
তিমির করিছে খেলা;
মাতায়ে গগন গাহে আবাহন
ধবল হংসমালা।
ওই শ্যাম বনপথে ময়ূরীর সাথে
ময়ূর উঠেছে নাচি;
প্রকৃতি দিয়াছে নবীন তৃণের
শ্যামল শয়ন রচি'।

৩

ওগো নন্দনে যবে নিদাঘ অন্তে
কহিলা বর্ষপতি,
তুমি খুলি নভদ্বার বক্ষে ধরার
নামিলে ত্বরিতগতি।
ওগো বারিধি তোমারে পূজিবার তরে
দিয়াছে অর্ঘ্যভার,
আর মলয় তোমারে শীতল সমীরে
দে'ছে প্রীতি-উপহার।
তুমি রসালের শিরে ঢেলেছ গো ধীরে
তোমার আশীষ রাশি,
তাই মধুর মন্দ মুকুল গন্ধ
পবনে আসিছে ভাসি।

৪

এস কাননে কাননে গগনের কোণে
ত্রিদিব মাধুরী ধরিয়া,
এস বনভূমি মাঝে সলিল রেখার
রজত মেখলা পরিয়া।
এস কুটীরে দুয়ারে শ্যাম ধরাপরে
শুভ্র কুসুম ফুটায়ে;
এস দুকূল প্লাবিনী তটিনীর বুকে
মত্ত লহর ছুটায়ে!
এস ঘন সুনিবিড় জলদের জালে
বিশ্ববিমান ধরি,
এস শষ্প শ্যামল আবরণ টানি
ধরার বক্ষ' পরি।

৫

ওগো রুদ্ধ আমার অন্তর দ্বার,
ছিন্ন বীণার তার,
তব সঙ্গীত মত মেঘ মল্লারে
বাজে না ত কভু আর!
ওগো অন্ধ তামসে সুপ্ত স্বদেশ,
নির্জ্জীব দেহ প্রাণ,
আজি পশে না শ্রবণে, দুর্ব্বল মন
ক্ষীণ জাগরণ গান।
ওগো বহি ল'য়ে মম আহ্বান বাণী
দুর্জ্জয় তব পবনে,
তুমি দিগ্‌দিগন্তে দাও ছড়াইয়া
নিখিল বিশ্ব-ভুবনে!

শ্রীসন্তোষকুমার বসু।

কারাকাহিনী।

(সকল সত্ব সংরক্ষিত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমার নির্জ্জন কারাগৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ ছয় ফুট প্রস্থ ছিল, ইহার জানালা নাই, সম্মুখ ভাগে বৃহৎ লোহার গরাদ, এই পিঞ্জরই আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইল। ঘরের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র উঠান, পাথরের জমী, ইঁটের উচ্চ দেওয়াল, সাম্‌নে কাঠের দরজা। সেই দরজার উপরিভাগে মানুষের চক্ষুর সমান উচ্চতায় ক্ষুদ্র গোলাকার রন্ধ্র, দরজা বন্ধ হইলে শান্ত্রী এই রন্ধ্রে চক্ষু লাগাইয়া সময় সময় দেখে, কয়েদী কি করিতেছে। কিন্তু আমার উঠানের দরজা প্রায়ই খোলা থাকিত। এইরূপ ছয়টি ঘর পাশাপাশি, সেই গুলিকে ছয় ডিক্রী বলে। ডিক্রীর অর্থ বিশেষ সাজার ঘর—বিচারপতি বা জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুমে যাহাদের নির্জ্জন কারাবাসের দণ্ড নির্দ্ধারিত হয়, তাহাদেরই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে থাকিতে হয়। এই নির্জ্জন কারাবাসেরও কম বেশী আছে। যাহাদের বিশেষ সাজা হয়, তাহাদের উঠানের দরজা বন্ধ থাকে; মনুষ্য সংসার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া শান্ত্রীর চক্ষু ও পরিবেশনকারী কয়েদীর দুবেলায় আগমন তাহাদের জগতের সঙ্গে একমাত্র সম্বন্ধ। আমা হইতেও হেমচন্দ্র দাস সি. আই, ডি-র আতঙ্কস্থল বলিয়া তাহার জন্য এই ব্যবস্থা হইল। এই সাজার উপরও সাজা আছে,—হাতে পায়ে হাতকড়া ও বেড়ী পরিয়া নির্জ্জন কারাবাসে থাকা। এই চরম শাস্তি কেবল জেলের শান্তিভঙ্গ করা বা মারামারির জন্য নয়, বারবার খাটুনীতে ত্রুটি হইলেও এই শাস্তি হয়। নির্জ্জন কারাবাসে মোকদ্দমার আসামীকে শাস্তি স্বরূপ এইরূপ কষ্ট দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ, তবে স্বদেশী বা "বন্দে মাতরম্" কয়েদী নিয়মের বাহিরে, পুলিসের ইচ্ছায় তাহাদের জন্যও সুবন্দোবস্ত হয়।

আমাদের বাসস্থান ত এইরূপ ছিল, সাজ সরঞ্জামের সম্বন্ধেও আমাদের সদয় কর্ত্তৃপক্ষ আতিথ্য সৎকারের ত্রুটি করেন নাই। একখানা থালা ও একটী বাটী উঠানকে সুশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সর্ব্বস্ব স্বরূপ থালা বাটির এমন রূপার ন্যায় চাকচিক্য হইত যে, প্রাণ জুড়াইয়া যাইত এবং সেই নির্দ্দোষ কিরণময় উজ্জ্বলতার মধ্যে "স্বর্গজাত" নিখুঁত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উপমা পাইয়া রাজভক্তির নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে, একটু জোরে আঙ্গুল দিলেই তাহা আরবিস্থানের ঘূর্ণমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন এক হাতে আহার করা, এক হাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘোরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুষ্টান্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটিটাই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিষ ছিল। ইহা জড় পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিস সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেন সর্ব্বকার্য্যে স্বভাবজাত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা আছে, জজ, শাসনকর্ত্তা, পুলিস, শুল্ক বিভাগের কর্ত্তা, মিউনিসিপ্যালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ধর্ম্মোপদেষ্টা, যাহা বল, তাহাই বলিবামাত্র হইতে পারে,—যেমন তাঁহার পক্ষে তদন্তকারী, অভিযোগকর্ত্তা, পুলিস বিচারক, এমন কি সময় সময় বাদীর পক্ষের কৌন্‌সিলীরও এক শরীরে এক সময়ে প্রীতি সম্মিলন হওয়া সুখসাধ্য, আমার আদরের বাটিরও তদ্রূপ। বাটির জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া সেই বাটীতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ডাল বা তরকারী দেওয়া হইল, সেই বাটিতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্ব্ব কার্য্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের

জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাটি আমার এই সকল সাংসারিক উপকার করিয়া যোগ সাধনের উপায় স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। ঘৃণা পরিত্যাগে এমন সহায় ও উপদেষ্টা কোথায় পাইব? নির্জ্জন কারাবাসের প্রথম পালার পরে যখন আমাদের এক সঙ্গে রাখা হয়, তখন আমার সিভিলিয়ানের অধিকার পৃথকীকরণ হয়,—কর্ত্তৃপক্ষেরা শৌচক্রিয়ার জন্য স্বতন্ত্র উপকরণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু একমাসকালে এতদ্দারা এই অযাচিত ঘৃণা সংযম শিক্ষালাভ হইল। শৌচক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই যেন এই সংযম শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত। বলা হইয়াছে, নির্জ্জন কারাবাস বিশেষ শাস্তির মধ্যে গণ্য এবং সেই শাস্তির মূলতত্ত্ব যথাসাধ্য মনুষ্য সংসর্গ ও মুক্ত আকাশ সেবা বর্জ্জন। বাহিরে শৌচের ব্যবস্থা হইলে এই তত্ত্বভঙ্গ হয় বলিয়া ঘরের ভিতরেই দুইখানা আল্‌কাতরা মাখান টুকরী দেওয়া হইত। সকালে ও বিকাল বেলায় মেহতর আসিয়া তাহা পরিষ্কার করিত, তীব্র আন্দোলন ও মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিলে অন্য সময়েও পরিষ্কার করা হইত, কিন্তু অসময়ে পায়খানায় যাইলে প্রায়ই প্রায়শ্চিত্তরূপে কয়েক ঘণ্টা দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হইত। নির্জ্জন কারাবাসের দ্বিতীয় পালায় এই সম্বন্ধে কতকটা রিফরম্ হয়, কিন্তু ইংরাজের রিফরম্ হইতেছে পুরাতন আমলের মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া শাসন প্রণালী সংশোধন। বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র ঘরে এমন ব্যবস্থা থাকায় সর্ব্বদা, বিশেষতঃ আহারের সময় এবং রাত্রিতে বিশেষ অশোয়াস্তি ভোগ করিতে হইত। জানি, শোবার ঘরের পার্শ্বে পায়খানা রাখা, স্থানে স্থানে বিলাতী সভ্যতার অঙ্গবিশেষ, কিন্তু একটী ক্ষুদ্র ঘরে শোবার ঘর, খাবার ঘর ও পায়খানা—ইহাকেই too much of a good thing বলে। আমরা কুঅভ্যাসগ্রস্ত ভারতবাসী, সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে পৌছা আমাদের পক্ষে কষ্টকর।

গৃহ সামগ্রীর মধ্যে আরও ছিল একটি স্নানের বাল্‌তী, জল রাখিবার একটী টিনের নলাকার বাল্‌তী এবং দুটী জেলের কম্বল। স্নানের বাল্‌তী উঠানে রাখা হইত, সেইখানে স্নান করিতাম। আমার ভাগ্যে প্রথমতঃ জলকষ্ট ছিল না কিন্তু তাহা পরে ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ পার্শ্বের গোয়াল ঘরের কয়েদী স্নানের সময় আমার ইচ্ছামত বাল্‌তীতে জল ভরিয়া দিত, সেইজন্য স্নানের সময়ই জেলের তপস্যার মধ্যে প্রত্যহ গৃহস্থের বিলাসবৃত্তি ও সুখপ্রিয়তাকে তৃপ্ত করিবার অবসর। অপর আসামীদের ভাগ্যে ইহাও ঘটে নাই, এক বাল্‌তীর জলেই তাহাদিগকে শৌচক্রিয়া বাসন মাজা ও স্নান সম্পন্ন করিতে হইত। মোকদ্দমার আসামী বলিয়া এই অতিমাত্র বিলাস করিতে দেওয়া হইত, কয়েদীদের দুই চারি বাটি জলে স্নান হইত। ইংরাজেরা বলে, ভগবৎ প্রেম ও শরীরের স্বচ্ছন্দতা প্রায়ই সমান ও দুর্লভ সদ্‌গুণ, তাহাদের জেলে এই জাতীয় প্রবাদের যাথার্থ্য রক্ষণার্থ অথবা অতিরিক্ত স্নানসুখে কয়েদীর অনিচ্ছাজনিত তপস্যায় রসভঙ্গ ভয়ে এই ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আসামীরা কর্ত্তৃপক্ষদের এই দয়াকে কাকের স্নান বলিয়া তাচ্ছিল্য করিত। মানুষমাত্রই অসন্তোষ প্রিয়। স্নানের ব্যবস্থা হইতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আরও চমৎকার। তখন গ্রীষ্মকাল, আমার ক্ষুদ্র ঘরে বাতাসের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু মে মাসের উগ্র ও প্রখর রৌদ্র অবাধে প্রবেশ করিত। ঘরটি উত্তপ্ত উনুনের মত হইয়া উঠিত। এই উনুনে সিদ্ধ হইতে হইতে অদম্য জলতৃষ্ণা লাঘব করিবার উপায় ওই টিনের বাল্‌তীর অর্দ্ধ উষ্ণ জল। বার বার তাহা পান করিতাম, তৃষ্ণা ত যাইতই না বরং স্বেদ নির্গমন এবং অল্পক্ষণে নবীভূত তৃষ্ণাই লাভ হইত। তবে এক একজনের উঠানে মাটির কলসী রাখা ছিল, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যা স্মরণ করিয়া নিজেকে ধন্য মানিতেন। ইহাতে ঘোর পুরুষার্থবাদী ও অদৃষ্ট মানিতে বাধ্য হইতে হয়, কাহারও ভাগ্যে ঠাণ্ডা জল জুটিত, কাহারও ভাগ্যে তৃষ্ণা লাগিয়াই থাকিত, সব কপালের জোর। কর্ত্তৃপক্ষেরা কিন্তু সম্পূর্ণ পক্ষপাত শূন্য হইয়া কলসী বা টিন বিতরণ করিতেন। এই যদৃচ্ছালাভে আমি সন্তুষ্ট হইলে বা না হইলেও আমার জলকষ্ট জেলের

সহৃদয় ডাক্তার বাবুর অসহ্য হয়। তিনি কলসী যোগাড় করিতে উদ্যোগী হন, কিন্তু এই সব বন্দোবস্তে তাঁহার হাত নাই বলিয়া তিনি অনেক দিন তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, শেষে তাঁহারই কথায় মুখ্য জমাদার কোথা হইতে কলসী আবিষ্কার করিল। তাহার আগেই আমি তৃষ্ণার সঙ্গে অনেক দিনের ঘোর সংগ্রামে পিপাসামুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এই তপ্ত-গৃহে আবার জেলে তৈয়ারী করা দুইটী মোটা কম্বলই আমাদের বিছানা। বালিস নাই, কাজেই একটী কম্বল পাতিয়া আর একটী কম্বল পাট করিয়া বালিস বানাইয়া শুইতাম। যখন গরমের ক্লেশ অসহ্য হইয়া আর থাকা যাইত না, তখন মাটীতে গড়াইয়া শরীর শীতল করিয়া আরাম লাভ করিতাম। মাতা বসুন্ধরার শীতল উৎসঙ্গ স্পর্শের কি সুখ, তাহা তখন বুঝিতাম। তবে জেলে সেই উৎসঙ্গ স্পর্শ বড় কোমল নয়, তদ্দ্বারা নিদ্রার আগমন বাধা প্রাপ্ত হইত বলিয়া কম্বলের শরণ লইতে হইত। যেদিন বৃষ্টি হইত, সেদিন বড় আনন্দের দিন হইত। ইহাতেও একটী এই অসুবিধা ছিল যে, ঝড়বৃষ্টি হইলেই ধূলা পাতা ও তৃণসঙ্কুল প্রভঞ্জনের তাণ্ডব নৃত্যের পর আমার খাঁচার মধ্যে ছোট খাট একটি জলপ্লাবন হইত। তাহার পরে রাত্রিতে ভিজা কম্বল লইয়া ঘরের কোণে পলায়ন ভিন্ন উপায় ছিল না। প্রকৃতির এই লীলা বিশেষ সাঙ্গ হইলেও জলপ্লাবিত মাটি যতক্ষণ না শুকাইত, ততক্ষণ নিদ্রার আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তার আশ্রয় লইতে হইত, কেন না শৌচক্রিয়ার সামগ্রীর নিকটই একমাত্র শুষ্কস্থল থাকিত কিন্তু সেই দিকে কম্বল পাতিতে প্রবৃত্তি হইত না। এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও ঝড়ের দিনে ভিতরে প্রচুর বাতাস আসিত এবং ঘরের সেই তপ্ত উনুন-তাত বিদূরিত হইত বলিয়া ঝড় বৃষ্টিকে সাদরে স্বাগত করিতাম।

আলিপুর গবর্ণমেণ্ট হোটেলের যে বর্ণনা করিলাম, এবং ভবিষ্যতে আরও করিব, তাহা নিজের কষ্টভোগ জ্ঞাপন করিবার জন্য নয়;—সুসভ্য বৃটিশ রাজ্যে মোকদ্দমার আসামীর জন্য কি অদ্ভুত ব্যবস্থা, নির্দ্দোষীর দীর্ঘকালব্যাপী কি যন্ত্রণা হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য এই বর্ণনা। যে সব কষ্টের কারণ দেখাইয়াছি, সে সব ছিল বটে, কিন্তু ভগবানের দয়া দৃষ্টি ছিল বলিয়া কয়েকদিন মাত্র এই কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার পরে—কি উপায়ে তাহা পরে বলিব—মন সেই দুঃখের অতীত হইয়া কষ্ট অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। সেই জন্য জেলের স্মৃতি মনে উদয় হইলে ক্রোধ বা দুঃখ না হইয়া হাসিই পায়। যখন সর্ব্ব প্রথম জেলের বিচিত্র পোষাক পরিয়া আমার পিঞ্জরে ঢুকিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত দেখিলাম, তখন এই ভাবই মনে প্রকাশ পাইল। মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। আমি ইংরাজ জাতির ইতিহাস ও আধুনিক আচরণ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের বিচিত্র ও রহস্যময় চরিত্র অনেক দিন আগে বুঝিয়া লইয়াছিলাম; সেই জন্য আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত বা দুঃখিত হইলাম না। সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে অতিশয় অনুদার ও নিন্দনীয়। আমরা সকলে ভদ্রলোকের সন্তান, অনেকে জমীদারের ছেলে, কয়েকজন বংশে, বিদ্যায় গুণে, চরিত্রে ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় লোকের সমকক্ষ। আমরা যে অভিযোগে ধৃত, তাহাও সামান্য খুন চুরি ডাকাতি নয়; দেশের জন্য বিদেশী রাজপুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ চেষ্টা করা বা সমরোদ্যোগের ষড়যন্ত্র। তাহাতেও অনেকের দোষের সম্বন্ধে প্রমাণের নিতান্ত অভাব, পুলিসের সন্দেহই তাহাদের ধৃত হইবার একমাত্র কারণ। এইরূপ স্থলে সামান্য চোর ডাকাতদের মত রাখা—চোর ডাকাত কেন, পশুর ন্যায় পিঞ্জরে রাখিয়া পশুর অখাদ্য আহার খাওয়ান, জলকষ্ট, ক্ষুৎপিপাসা, রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত সহ্য করান, ইহাতে বৃটিশ রাজপুরুষদের ও বৃটিশ জাতির গৌরব বৃদ্ধি হয় না। ইহা কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় চরিত্রগত দোষ। ইংরাজদের দেহে ক্ষত্রিয়োচিত গুণ থাকিলেও শত্রু বা বিরুদ্ধাচরণকারীর সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় তাঁহারা ষোল আনা বেণে।

আমার কিন্তু তখন বিরক্তি ভাব মনে স্থান পায় নাই, বরং আমার ও দেশের সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই দেখিয়া একটু আনন্দিত হইয়াছিলাম, অধিকন্তু এই ব্যবস্থা মাতৃভক্তির প্রেমভাবে আহুতি দান করিল। একে বুঝিলাম যোগ শিক্ষা ও দ্বন্দ্বজয়ের অপূর্ব্ব উপকরণ ও অনুকূল অবস্থা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমি চরমপন্থী দলের একজন, যাহাদের মতে প্রজাতন্ত্র এবং ধনী দরিদ্রে সাম্যতা জাতীয় ভাবের একটী প্রধান অঙ্গ। মনে পড়িল সেই মতকে কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য বলিয়া সুরাট যাত্রার সময় সকলে এক সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়াছিলাম, ক্যাম্পে নেতারা নিজেদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না করিয়া সকলের সঙ্গে একভাবে এক ঘরে শুইতাম। ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, বাঙ্গালী, মারাঠা, পাঞ্জাবী, গুজরাটি দিব্য ভ্রাতৃভাবে এক সঙ্গে থাকিতাম, শুইতাম, খাইতাম। মাটিতে শয্যা, ডাল ভাত দহিই আহার, সর্ব্ব বিষয়ে স্বদেশী ধরণের পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। কলিকাতা ও বোম্বে সহরের বিলাত ফেরৎ ও মান্দ্রাজের তিলককাটা ব্রাহ্মণ সন্তান এক সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। এই আলিপুর জেলে বাসকালীন আমার দেশের কয়েদী, আমার দেশের চাষা, লোহার, কুমার, ডোম বাগ্দীর সমান আহার, সমান থাকা, সমান কষ্ট, সমান মানমর্য্যাদা লাভ করিয়া বুঝিলাম, সর্ব্বশরীরবাসী নারায়ণ এই সাম্যবাদ, এই একতা, এই দেশব্যাপী ভ্রাতৃভাবে সম্মত হইয়া যেন আমার জীবন ব্রতে স্বাক্ষর দিয়াছেন। যেদিন জন্মভূমিরূপিণী জগজ্জননীর পবিত্র মণ্ডপে দেশের সর্ব্ব শ্রেণী ভ্রাতৃভাবে একপ্রাণ হইয়া জগতের সম্মুখে উন্নতমস্তকে দাঁড়াইবেন, সহবাসী আসামী ও কয়েদীদের প্রেমপূর্ণ আচরণে এবং রাজপুরুষদের এই সাম্যভাবে এই কারাবাসে হৃদয়ের মধ্যে সেই শুভ দিনের পূর্ব্বাভাস লাভ করিয়া কতবার হর্ষান্বিত ও পুলকিত হইতাম। সেই দিন দেখিলাম, পুনার Indian Social Reformer আমার একটী সহজ বোধগম্য উক্তি লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, "জেলে ভগবৎসান্নিধ্যের বড় ছড়াছড়ি হইল দেখিতেছি!" হায়, মানসম্ভ্রমান্বেষী অল্প বিদ্যায়, অল্প সদ্‌গুণে গর্ব্বিত মানুষের অহঙ্কারও অল্পতা! জেলে, কুটীরে, আশ্রমে, দুঃখীর হৃদয়ে ভগবৎ-প্রকাশ না হইয়া বুঝি ধনীর বিলাস মন্দিরে বা সুখান্বেষী স্বার্থান্ধ সংসারীর আরামশয্যায় তাহা সম্ভব? ভগবান বিদ্যা, সম্ভ্রম, লোকমান্যতা, লোক প্রশংসা, বাহ্যিক স্বচ্ছন্দতা ও সভ্যতা দেখেন না। তিনি দুঃখীর নিকটেই দয়াময়ী মাতৃরূপ প্রকাশ করেন। যিনি মানব মাত্রে, জাতিতে, স্বদেশে, দুঃখী গরীব, পতিত পাপীতে নারায়ণকে দেখিয়া সেই নারায়ণের সেবায় জীবন সমর্পণ করেন তাঁহারই হৃদয়ে নারায়ণ আসিয়া বসেন। আর উত্থানোদ্যত পতিত জাতির মধ্যে দেশ সেবকের নির্জ্জন কারাগারেই ভগবৎ-সান্নিধ্যের ছড়াছড়ি সম্ভব।

জেলর আসিয়া কম্বল ও থালা বাটীর বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলে পর আমি কম্বলের উপরে বসিয়া জেলের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। এই নির্জ্জন কারাবাস লালবাজার হাজত হইতে অনেক ভাল বোধ হইল। সেখানে সেই প্রকাণ্ড ঘরের নির্জ্জনতা যেন বিশাল বপু ছড়াইবার অবকাশ পাইয়া আরও নির্জ্জনতা বৃদ্ধি করে। এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়াল সঙ্গীস্বরূপ যেন নিকটে আসিয়া ব্রহ্মময় হইয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। সেইখানে দোতালার ঘরের অতি উচ্চ জানালা দিয়া বাহিরের আকাশও দেখা যায় না, এই জগতে গাছপালা মানুষ পশু পক্ষী বাড়ী ঘর যে আছে তাহা অনেকবার কল্পনা করা কঠিন হয়। এই স্থানে উঠানের দরজা খোলা থাকায় গরাদের নিকট বসিলে বাহিরে জেলের খোলা জায়গা ও কয়েদীদের যাতায়াত দেখা যায়। উঠানের দেওয়ালের গায়ে একটী বৃক্ষ ছিল, তাহার নয়নরঞ্জক নীলিমায় প্রাণ জুড়াইতাম। ছয় ডিক্রীর ছয়টি ঘরের সাম্‌নে যে শান্ত্রী ঘুরিয়া থাকে, তাহার মুখ ও পদশব্দ অনেকবার পরিচিত বন্ধুর ঘোরা ফেরার মত প্রিয় বোধ হইত। ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সম্মুখ দিয়া গরু চরাইতে লইয়া যাইত। গরু ও গোপাল নিত্য প্রিয়দৃশ্য ছিল। আলিপুরের নির্জ্জন কারাবাসে অপূর্ব্ব প্রেম শিক্ষা পাইলাম। এইখানে আসিবার আগে মানুষের মধ্যেও আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতিশয় ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল এবং পশু পক্ষীর উপর রুদ্ধ প্রেম স্রোত প্রায় বহিত না। মনে আছে রবি বাবুর একটি কবিতায় মহিষের উপর গ্রাম্য বালকের গভীর ভালবাসা বড় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে, সেই কবিতা প্রথম পড়িয়া কিছুতেই তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ভাবের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও অস্বাভাবিকতা দোষ দেখিয়াছিলাম। এখন পড়িলে তাহা অন্ত চক্ষে দেখিতাম। আলিপুরে বসিয়া বুঝিতে পারিলাম, সর্ব্ব প্রকার জীবের উপর মানুষের প্রাণে কি গভীর ভালবাসা স্থান পাইতে পারে, গরু পাখী পিপীলিকা পর্য্যন্ত দেখিয়া কি তীব্র আনন্দ স্ফুরণে মানুষের প্রাণ অস্থির হইতে পারে।

কারাবাসের প্রথম দিন শান্তিতে কাটিয়া গেল। সবই নূতন, তাহাতে মনের স্ফূর্ত্তি হইল। লালবাজার হাজতের সঙ্গে তুলনা করিয়া এই অবস্থাতেই প্রীতিলাভ করিলাম এবং ভগবানের উপর নির্ভর ছিল বলিয়া এখানে নির্জ্জনতা বোধ হয় নাই। জেলের আহারের অদ্ভুত চেহারা দেখিয়াও এই ভাবের ব্যাঘাত হয় নাই। মোটা ভাত, তাহাতেও খোলা কঙ্কর, পোকা, চুল, ময়লা ইত্যাদি কত প্রকার মশলা দেওয়া,—স্বাদহীন ডালে জলের ভাগ অধিক, তরকারীর মধ্যে ঘাস পাতা শুদ্ধ শাক। মানুষের আহার যে এত স্বাদহীন ও নিঃসার হইতে পারে, তাহা আমি আগে জানিতাম না। এই শাকের বিমর্ষ গাঢ় কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়াই ভয় পাইলাম, দুই গ্রাস খাইয়া তাহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিয়া বর্জ্জন করিলাম। সকল কয়েদীর ভাগ্যে একই তরকারী জোটে, এবং একবার কোন প্রকার তরকারী আরম্ভ হইলে তাহা অনন্তকাল চলিতে থাকে। এই সময় শাকের রাজত্ব ছিল। দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, কিন্তু দুবেলা শাকের তরকারী, ঐ ডাল, ঐ ভাত। জিনিসটা বদলান দূরের কথা, চেহারারও লেশমাত্র

পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহার ঐ নিত্য সনাতন অনাদ্যনন্ত অপরিণামাতীত অদ্বিতীয় রূপ। দুই সন্ধ্যার মধ্যেই কয়েদীকে এই নশ্বর মায়া জগতের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মাইবে। এই বিষয়েও অন্ত আসামী হইতে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, তাহাও ডাক্তার বাবুর দয়ায়। তিনি আমার জন্ত হাস্পাতাল হইতে দুধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা কয়েকদিন শাক দর্শন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম।

সেই রাত্রে সকাল সকাল ঘুমাইলাম, কিন্তু নিশ্চিন্ত নিদ্রাভোগ করা নির্জ্জন কারাবাসের নিয়ম নয়, তাহাতে কয়েদীর সুখপ্রিয়তা জাগিতে পারে। সেই জন্য এই নিয়ম আছে যে, যতবার পাহারা বদলায়, ততবার কয়েদীকে ডাক হাঁক করিয়া উঠাইতে হয়, সাড়া না দিলে ছাড়িতে নাই। যাঁহারা যাঁহারা ছয় ডিক্রীতে পাহারা দিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ ছিলেন,—সিপাহীদের মধ্যে প্রায়ই কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞান অপেক্ষা দয়া ও সহানুভূতি ভাব অধিক ছিল, বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীদের স্বভাব এইরূপ। কয়েকজন কিন্তু ছাড়ে নাই। তাহারা আমাদিগকে এইরূপে উঠাইয়া এই কুশল সংবাদও জিজ্ঞাসা করিত, "বাবু ভাল আছেন ত?" এই অসময় রহস্য সব সময় প্রীতিকর হইত না, তবে বুঝিলাম, যাহারা এইরূপ করিতেছে তাহারা সরল ভাবে নিয়ম বলিয়া আমাদিগকে উঠাইতেছে। কয়েকদিন বিরক্ত হইয়াও ইহা সহ্য করিলাম, শেষে নিদ্রা রক্ষার জন্য ধমক দিতে হইল। দুই চারিবার ধমক দিবার পরে দেখিলাম, রাত্রে কুশল সংবাদ নেওয়া প্রথা আপনিই উঠিয়া গেল।

পরদিন সকালে চারিটা বাজিয়া পনর মিনিটে জেলের ঘণ্টা বাজিল। কয়েদীদের উঠাইবার জন্য এই প্রথম ঘণ্টা। কয়েক মিনিট পর আবার ঘণ্টা বাজে, তাহার পর কয়েদীরা ফাইলে বাহিরে আসে, হাত মুখ ধুইয়া লফ্‌সী খাইয়া খাটুনি আরম্ভ করে। এত ঘণ্টা বাজানোর মধ্যে ঘুম হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া আমিও উঠিলাম। ৫টার সময় গরাদ খোলা হয়,

আমি হাত মুখ ধুইয়া আবার ঘরে বসিলাম। অল্পক্ষণ পরে লফ্‌সী আমার দরজায় হাজির হইল কিন্তু সেই দিন তাহা খাই নাই, কেবল তাহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হইল। ইহার কয়েক দিন পরে প্রথমবার এই পরমান্ন ভোগ হয়। লফ্‌সীর অর্থ ফেণের সহিত সিদ্ধ ভাত, ইহাই কয়েদীর ছোট হাজরী। লফ্‌সীর ত্রিমূর্ত্তি বা তিন অবস্থা আছে। প্রথম দিন লফ্‌সীর প্রাজ্ঞভাব, অমিশ্রিত মূলপদার্থ, শুদ্ধ শিব শুভ্রমূর্ত্তি। দ্বিতীয় দিন লফ্‌সী হিরণ্যগর্ভ, ডালে সিদ্ধ, খিচুড়ি নামে অভিহিত, পীতবর্ণ, নানা ধর্ম্মসঙ্কুল। তৃতীয় দিনে লফ্‌সীর বিরাট মূর্ত্তি অল্প গুড়ে মিশ্রিত, ধূসরবর্ণ, কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যের ব্যবহার যোগ্য। আমি প্রাজ্ঞ ও হিরণ্যগর্ভ সেবন সাধারণ মর্ত্ত্য মনুষ্যের অতীত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, এক একবার বিরাটের দুগ্রাস উদরস্থ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের নানা সদ্‌গুণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চ দরের humanatarianism ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে মগ্ন হইতাম। বলা উচিত লফ্‌সীই বাঙ্গালী কয়েদীর একমাত্র পুষ্টিকর আহার, আর সবই সারশূন্য। তাহা হইলেও বা কি হইবে? তাহার যেরূপ স্বাদ, তাহা কেবল ক্ষুধার চোটেই খাওয়া যায়, তাহাও জোর করিয়া, মনকে কত বুঝাইয়া তবে খাইতে হয়।

সেদিন সাড়ে এগারটার সময় স্নান করিলাম। প্রথম চারি পাঁচ দিন বাড়ী হইতে যাহা পরিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই পরিয়া থাকিতে হইল। তবে স্নানের সময় যে গোয়ালঘরের বৃদ্ধ কয়েদী ওয়ার্ডার আমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি একটী এণ্ডির দেড় হাত চওড়া কাপড় যোগাড় করিয়াছিলেন, আমার একমাত্র বস্ত্র শুকান পর্য্যন্ত ইহা পরিয়া বসিয়া থাকিতাম। আমায় কাপড় কাচিতে বা বাসন মাজিতে হইত না, গোয়াল ঘরের একজন কয়েদী ইহা করিত। এগারটার সময় খাওয়া। ঘরের চুপড়ির সান্নিধ্য বর্জ্জন করিবার জন্য গ্রীষ্মের রৌদ্র সহ্য করিয়া প্রায়ই উঠানে খাইতাম। শান্ত্রীও ইহাতে বাধা দিতেন না। সন্ধ্যার খাওয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটার সময় হইত। তাহার পর আর গরাদ খোলা নিষিদ্ধ ছিল। সাতটার সময় সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজে। মুখ্য জমাদার, কয়েদী ওয়ার্ডারদের একত্র করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম পড়িয়া যান, তাহার পরে সকলে স্ব স্ব স্থানে যায়। শ্রান্ত কয়েদী নিদ্রার শরণ লইয়া জেলের সেই একমাত্র সুখ অনুভব করে। এই সময় দুর্ব্বলচেতা নিজের দুর্ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ জেল দুঃখ ভাবিয়া কাঁদে। ভগবদ্ভক্ত, নীরব রাত্রিতে ঈশ্বর-সান্নিধ্য অনুভব করিয়া প্রার্থনায় বা ধ্যানে আনন্দ ভোগ করেন। রাত্রিতে এই দুর্ভাগ্য পতিত সমাজ পীড়িত তিন সহস্র ঈশ্বর সৃষ্ট প্রাণীর সেই আলিপুর জেল স্বরূপ প্রকাণ্ড যন্ত্রণাগৃহ বিশাল নীরবতায় মগ্ন হয়।*

ক্রমশঃ।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

মুক্তি।

দীর্ঘ এক বর্ষব্যাপী যে জলদমালা,
রেখেছিল ঢেকে তব গৌরব গরিমা
সে আজ গিয়াছে চলে ঝটিকা নিশ্বাসে
বিকাশি প্রভাব তব নবীন মহিমা।

কোথা আজি অন্ধকার? দীপ্ত সমুজ্জ্বল
হাসে ফুল্ল অরবিন্দ প্রশান্ত গম্ভীর,
ও কি গো! নবীন জ্যোতি নব হাসি রেখা
উৎসবে প্রমত্ত বঙ্গ—আনন্দ অধীর।

আসিয়াছ কর্ম্মবীর, লাঞ্ছনা গঞ্জনা
সহিয়া আনত শিরে—এক লক্ষ্য ধরি,
বিপদে সম্পদে সুখে নির্লিপ্ত বাসনা
সংসারে সংসার হীন ঋষি ব্রহ্মচারী।

তুমি ধন্য—তুমি পূজ্য, তব যশোভাতি,
আঁধার এ বঙ্গভূমে জ্বালিয়াছে বাতি।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

* Right of translation and reproduction reserved.

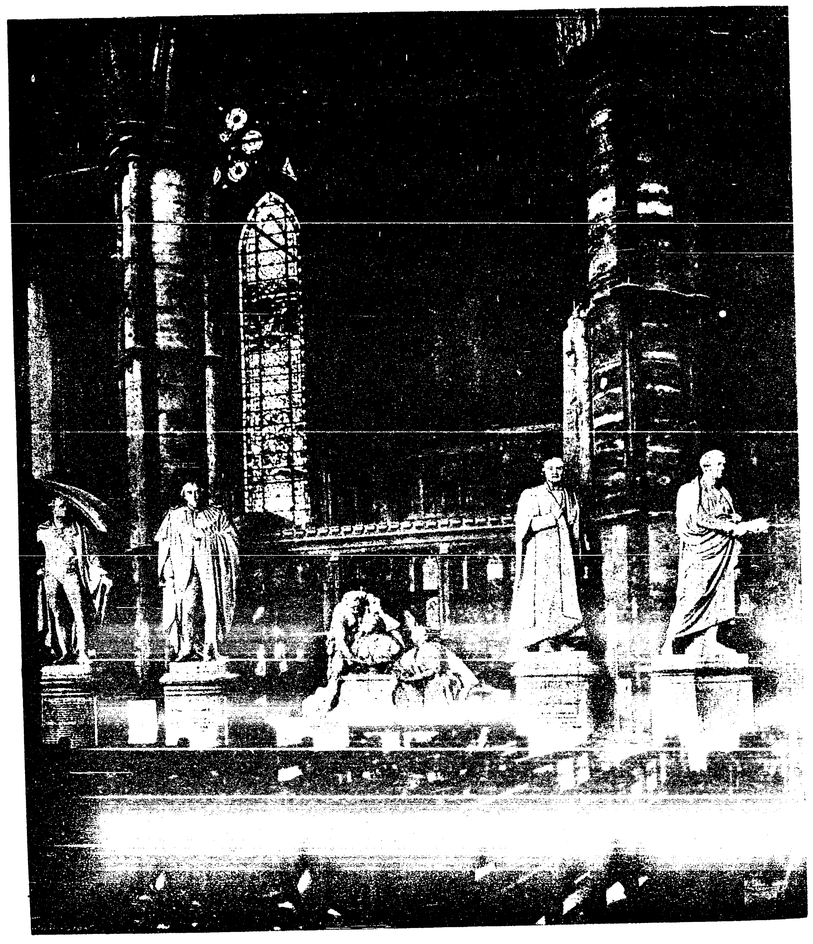

ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি।

স্বাগত।

যবে তুমি গিয়েছিলে আপনার স্নেহনীড় ছাড়ি,
জীবনের সুকঠিন পরীক্ষার মাঝে লয়েছিল কাড়ি।
নির্ম্মম কঠোর হস্ত; বক্ষ হতে আত্মীয় জনার,
প্রেমময় স্নেহময় হৃদয়ের তীব্র হাহাকার
তুচ্ছ করি; বেঁধেছিল লৌহময় কঠিন নিগড়ে
কর্ম্মপুত পুণ্যহস্ত; ও উন্নত উচ্চ শিরোপরে
চেয়েছিল ঢালিবারে কলঙ্কের পঙ্কিল কালিমা
হীন অপবাদ দিয়া; মুছে দিতে মহান্ গরিমা
বাঙ্গালীর চিত্ত হতে; হয়েছিল মহা আয়োজন
মর্ম্মাহত কোটি চিত্ত করিয়া নিষ্ঠুর বিদারণ,
তপ্ত শোণিতের ধারা নেত্র হতে পড়েছে ক্ষরিয়া
তীব্র অপমান দাহে ফেটে গে'ছ কোটি কোটি হিয়া
নির্দ্দোষীর নিপীড়নে; মনে মনে পুড়েছে কেবল
নিষ্ফল বেদনানলে শুধু; হায় মোরা অক্ষম দুর্ব্বল।
যেদিন অটলচিত্তে তুমি তুচ্ছ করি মান অপমান
জীবনের সুখ দুঃখ যশ বিধাতার আশীষ সমান
অম্লান প্রশান্ত মুখে ধীরে বহিয়াছ সব অমঙ্গল
মহা যোগী যোগেশের প্রায় কণ্ঠে তুলে নিয়েছ গরল
সে কলঙ্ক শোভেছিল বুকে নীলকণ্ঠ কণ্ঠমণি প্রায়,
অফুরন্ত যশরাশি তব ব্যাপ্ত হ'ল পূর্ণ মহিমায়।
সুদৃঢ় সে কারা লৌহদ্বার মুহূর্ত্তও পারেনি রোধিতে
অসংখ্য আশীষ বরষণ; ছিলে তুমি সবাকার চিতে
রাত্রি দিন; শয়নে স্বপনে সর্ব্ব গৃহ কাজে
তোমার লাঞ্ছনা কষা জ্বালা জ্বলেছিল অন্তরের মাঝে
সে লাঞ্ছনা শুধু নহে তব, সে লাঞ্ছনা সারা বাঙ্গালার,
সে লাঞ্ছনা সারা ভারতের, সে লাঞ্ছনা ভারত মাতার।
বিশুদ্ধ কাঞ্চন সম অবিকৃত অপরিবর্ত্তিত
জীবনের যজ্ঞানল হতে আজ তুমি উঠিয়াছ পুত
পবিত্র, পবিত্রতম পুণ্য, দীপ্ত তেজ হোমশিখানল,
ফিরিয়া এসেছ পুনঃ ঘরে,ভেঙ্গে গেছে অসত্য শৃঙ্খল।
এস সৌম্য! এস হে মহান্, এস ফিরে মায়ের মন্দিরে
করিয়া পূজার আয়োজন চারিদিকে ভক্তিনত শীরে
বসে আছে লক্ষ ভগ্নী ভ্রাতা, এস ভাই ভ্রাতা ভগিনীর,
এস পুত্র সহস্র মায়ের, এস ফিরে মিথ্যা জয়ী বীর!

শ্রীঅনুপমা দেবী।

বিলাতের প্রধান ধর্ম্ম-মন্দির "ওয়েষ্টমিনিষ্টর আবি।"

পার্লামেণ্ট হাউসের ঠিক পার্শ্বেই এই প্রকাণ্ড ধর্ম্ম মন্দিরটি অবস্থিত। এটি শুধু ভজনালয় নয়—ইহাতে ইংলণ্ডের যাবতীয় মহৎ লোকের সমাধি বা স্মৃতিচিহ্নও আছে। এই কারণে পৃথিবীর সকল জাতিরই এটি একটি মহা তীর্থস্থান।

একটি ক্রশ আকার ভিত্তির উপর এই হর্ম্মটি গঠিত কিন্তু বাহির হইতে দেখিতে একটি বৃহৎ গির্জ্জার মত। নানা রকমের ঢালু ছাত, বড় বড় চিত্র করা জানালা ও উচু উচু চূড়া বিশিষ্ট মন্দির। তার মধ্যে প্রধান চূড়াটির উপর একটি বড় ঘড়ি লাগান। উপাসনা কালে এই স্থান হইতে মধুর স্বরে ঘণ্টা বাজিয়া সুদূর অবধি জনসাধারণকে এ শুভ মুহূর্ত্তের কথা জানায়। যখনই শুনিতাম, আমার কাণে সে প্রশান্ত ধ্বনি মধু ঢালিয়া দিত।

রবিবার ছাড়া দর্শকবৃন্দদের প্রতি দিনই ১০টা হইতে প্রায় ৫টা অবধি দেখিবার নিয়ম আছে। রবিবারে শুধু উপাসনা হয়, তাতেও সকলেই নিমন্ত্রিত। প্রতিদিনও চারিবার উপাসনা হইয়া থাকে। তবে রবিবারের মত তাতে তত জনতা হয় না। সকাল বিকাল উপাসনার সময় ও দুপুর বেলা দেখার ব্যবস্থা।

সে স্থানটী আমার বড়ই প্রিয় স্থান ছিল, আমি

অবসর পাইলেই সেখানে যাইয়া অনেকক্ষণ কাটাইতাম। দেখিবার ও ভাবিবার কতই জিনিস সেই বহুদিনের মন্দিরে ও সমাধিস্থলে লুকান আছে।

মন্দিরটির চারিদিকেই রাস্তা। চারিদিক দিয়াই প্রবেশের ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। তার মধ্যে উত্তরের পথ দিয়াই অধিকাংশ লোকের যাতায়াত। প্রবেশের পথের উপর কুমারী মেরী শিশু কোলে দণ্ডায়মানা। এবং তার এক পাশে "আবি" সম্বন্ধেই নানারূপ গাইডবুক ও ছবি বিক্রয় হয়।

সিংহদ্বার দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেই এক অতি মহান্, অতি পবিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে, প্রায় পাঁচ শত ফুট লম্বা মধ্যকার হলের চারিদিকে বেঞ্চি ও চেয়ার সাজান। হলের মধ্যস্থানে ধর্ম্মযাজকের বেদী ও উপাসনার স্থান। তার একদিকে একটি বৃহৎ অর্গান। তাহার মিষ্ট স্বর শত শত মোটা মোটা নলে প্রতিধ্বনিত হইয়া স্বর্গের সঙ্গীত নরলোকে শুনায়। আর উপরকার উঁচু উঁচু অতি সুগঠন খিলনে তাহা আবার বার বার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া শ্রোতার মনে অনৈসর্গিক ভাব আনিয়া দেয়।

সেই হলেরই দুই পাশে সাদা মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তার মধ্যে ইংলণ্ডের সেই সব ক্ষণজন্মা পুরুষদের নিজ মূর্ত্তি ছাড়াও কত রকমের কাল্পনিক মূর্ত্তিও স্থাপিত আছে। নানা ভাবে গঠিত ও স্থাপিত সেই মূর্ত্তিগুলি সেই সব লোকের মহান জীবনের বিশিষ্ট কাহিনী বাক্যহীন ভাষায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে। এক একখানি টেবলেটে তাঁহাদের জন্ম বৃত্তান্ত ও জীবনী সংক্ষেপে লিখা আছে। এক একরূপ বিষয়ের কর্ম্মবীরেরা একই স্থানে রক্ষিত।

প্রথম ঢুকিয়াই দুই পাশের স্থানগুলিকে "Statesman's Aisle" বলে। অর্থাৎ সেখানে সকল রাজনৈতিক যোদ্ধা রাজসচিব, সুবক্তা, দেশহিতৈষী ইত্যাদি কর্ম্মবীরেরা অবস্থিত। এইখানেই সচিব ও সুবক্তা "আর্ল অফ চাথাম" ওজস্বী ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ইনি আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের দিনে সভায় বক্তৃতা করিতে করিতেই পড়িয়া মারা যান। আয়র্লণ্ডের সুবক্তা "গ্রাটন্" ও "ফকস্" প্রভৃতি ভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গেই এখন একত্র দাঁড়াইয়া আছেন দেখা যায়। তার পাশেই আর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী একত্রে অধিষ্ঠিত—সচিব গ্লাডষ্টোন ও ডিস্‌রেলী। ইঁহাদের কাহারও সঙ্গে স্ত্রী নাই, কেবল সচিব পামারষ্টেন ও গ্লাডষ্টোন এই দুইজন মাত্র সস্ত্রীক সমাধিস্থ। তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীর সঙ্গ ছাড়া তাঁহারা আবিতেও সমাধিস্থ হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের জন্য এই ব্যবস্থা।

সেই হলেরই এক অংশে পিটের ছবি অশেষ যত্নে রক্ষিত, তার চারিধারে নানারূপ কাল্পনিক মূর্ত্তি দিয়া তার জীবনের দেশহিতকর কার্য্যকলাপ সূচনা করিতেছে।

ইনি পূর্ব্বোক্ত আল অফ চাথামেরই পুত্র। অল্প বয়সে এত প্রতিভা হইয়াছিল যে চব্বিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম কালেই তিনি ইংলণ্ডের সচিব হন। তখন ভুবনবিজয়ী নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ হেতু ইংলণ্ডের বড়ই দুর্দ্দিন। নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের কার্য্য করিয়া ইনি নিঃস্ব অবস্থায় মরেন। অতিশয় কৃতজ্ঞতা হেতু দেশের লোক রাজ্য হইতে তাঁহার ধার শোধ দেয়। পিতার মত ইনিও একজন সুবক্তা ছিলেন—ছবিটি সেই অবস্থাতেই কল্পিত। স্বর্গের দূতরূপী "ইতিহাস" আসিয়া ইঁহার কীর্ত্তি কথা তুলি দিয়া লিখিতেছেন। আর অরাজকতা ও অশান্তি পদতলে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দলিত হইতেছে। সেই হলেরই অপর এক অংশে আর একটি সুন্দর ভাবমাখা ছবি দেখিলাম। ইনি একজন ধর্ম্মযাজকের বিধবা রমণী। নাম মিসেস্ ওয়ারেন্, ঠিক আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের মত কাপড় পরা। কাপড় খানি মোটা ও ছোট, হাঁটুর উপর উঠিতেছে, সকল রকমেই অতি দরিদ্র ভাবমাখা। একটি ঘুমন্ত শিশু কোলে করিয়া পথ চলিতে চলিতে বড়ই ক্লান্ত হইয়া নিজের কেবলমাত্র সম্বল একটি ছোট পুঁটলী ও লাঠিটী জমীতে রাখিয়া একটি ঢিপির উপর তিনি বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার অসীম পরোপকার ও দান-

শীলতার জন্য তাঁহার এখানে অধিষ্ঠান। তিনি ঠিক আমাদের দেশের নিরীহ মেয়েদের মত দেখিতে। এই ছবিটির পাশেই আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল "ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের" সমাধি। অনেকগুলি রমণী ও ভারতবর্ষীয় নরনারী তাঁর সমাধির উপর রোরুদ্যমান। এটি যে কতটুকু যথার্থ ভাব তা বুঝিলাম না। এবং ইহাঁরই পাশে সার হেনরী মেনের প্রতিমূর্ত্তি। আইন পড়িতে যে Ancient Law পড়িতে হয় তাহা ইহাঁরই লিখা। Village Punchayet বা গ্রাম্য সাধারণ-তন্ত্র ইহাঁর কাছে বড়ই প্রিয় ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইত। এই ছোট স্থানটীতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভারতবর্ষীয় ভাব মাখান দেখিলাম।

সেই হলেরই আবার অপর প্রান্তে একধারে Poets Corners অবস্থিত। এই স্থানেই যত সব ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কবি ও লেখকদের স্মৃতিস্তম্ভ রক্ষিত আছে। চসার হইতে টেনিসন প্রভৃতি কবিদের সকলেরই এইখানে ঠাঁই। এই স্থানটিই সর্ব্বাপেক্ষা জনতা পূর্ণ। এতগুলি কবির মধুর স্মৃতি একত্রে মনে উদয় হইয়া শরীর রোমাঞ্চিত হয়। দেখিলাম কত চিত্রকর এই স্থানে বসিয়া এই স্থানের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ছবি আঁকেন। সে ছবির সর্ব্বত্রই খুব আদর। নিকটবর্ত্তী একটি বড় জানালায় লাল নীল নানারূপ বড় বড় কাচ আঁটা ও তাতে নানারূপ ধর্ম্ম বিষয়ক ছবি আঁকা। বাহিরের আলোকরশ্মি সেই পথে আসিয়া চারিদিকের দৃশ্যকে আরও মহিমাময় করিয়া তুলে। এই স্থানটি বাস্তবিকই স্বপ্নরাজ্য।

কবিদের স্থানে যে সুধু কবিরাই আছেন তাহা নহে। সেই স্থানে ও তাহার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে অনেক গায়ক ও অভিনায়কেরও ঠাঁই আছে। রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা যেমন অল্পদিনে নাম কিনেন এত আর কেহই পারে না। এখানে ইরভিং ও গ্যারিকের মত বিখ্যাত অভিনেতারাও আছেন আবার হ্যাণ্ডেলের মত গায়কও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে Poets quarter নাম কেবল কবিত্ব রস লইয়া মাত্র দেওয়া, তা যে ভাবেই ব্যক্ত হোক না কেন।

নিম্নোক্ত কবিদের সেখানে স্মৃতি চিহ্ন আছে মাত্র, অনেকেরই সমাধি অন্য স্থানে। কবি কিনা—তাই তাঁহাদের টেবলেটের প্রায় অনেক স্থলেই কবিতা লেখা।

চসার ও স্পেনসরের স্মৃতিচিহ্ন খুব কাছে কাছে, তার পদতলে অনেক কবির টেবলেটগুলি ঠাঁই পাইয়াছে। সেক্সপিয়র, মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, স্কট সকলের ছবিই সযত্নে রক্ষিত। আমেরিকান কবি লঙ্গফেলোরও যথেষ্ট আদর। গোল্ডস্মিথ, বেন্‌জন্‌সন্ প্রভৃতি কবিগণের চির দরিদ্রতা তাঁদের সমাধিস্থানেও যেন প্রতীয়মান। টেনিসনের প্রস্তর ফলকটি তাঁর "ডোরা"ও "ইনক্ আর্ডেনের" মত ছোট। গ্রের প্রস্তর ফলকে লিখা আছে—

"Life is a jest and all things show it
I thought so once and now I know it"

দুই একটি মাত্র স্মৃতি স্তম্ভের কথা এই স্থানে বিশেষ করিয়া বলি। তা ছাড়া আর বেশী বলা এ স্থানে অসম্ভব। সময়ান্তরে বিস্তৃত ভাবে এই কবিদের স্থানের বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই রাজনীতিবিদ্‌দের ও কবিদের যেমন বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে—অন্যান্য বিষয়ের বীরেরা তত সৌভাগ্যবান হন নাই। তাঁদের সব অন্যান্য পার্শ্ব-বর্ত্তী স্থানে অধিষ্ঠান ঠিক হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদেরা পাশের গলিতে বা পথে স্থান পাইয়াছেন। সেই স্থানেই দারউইনের স্মৃতিস্তম্ভ তার পাশেই জুল। তার নিকটেই জ্যোতির্ব্বিদ হার্সেল ও নিউটনের স্থান। সে স্থানগুলি কিছু অন্ধকার ও অপরিষ্কার। এই সঙ্কীর্ণ স্থানে ইঁহারা সব একত্রে গাদাগাদি করিয়া সন্নিবিষ্ট। ইংলণ্ড কর্ম্মযোগীদের বড়ই পক্ষপাতী, জ্ঞানযোগীদের সে দেশে তত আদর নাই। এই একটি সে দেশের বিশেষত্ব। তাই কর্ম্ম জগতে তাঁহাদের এত প্রাধান্য।

কবির স্থানের দিক দিয়াও অন্যান্য অনেক দেখিবার স্থানে যাওয়া যায়। "এডওয়ার্ড দি

কন্‌ফেসর" ও "হেনরী দি সেভেন"এর চেপেলে ও রাজপরিবারের সমাধি স্থানে যাইতে হইলে এই পথেই যাইতে হয়। কিন্তু তার জন্য আলাদা ৬ পেণী দিতে হয়। এক একজন পুরোহিত ১৫ মিনিট অন্তর অনেকগুলি লোককে একত্রে সঙ্গে লইয়া এই সব স্থান দেখাইয়া বেড়ান ও সব বুঝাইয়া দেন। সে সকল স্থানগুলি দেখিতে আরও লোমহর্ষক, আরও পুরাকালের ভাবব্যঞ্জক ও বিস্ময়কর।

হেনরী দি সেভেন-এর চেপেলটির অতিশয় কারু-কার্য্য পূর্ণ গঠন। তার পাশে পাশে সরু পথ, তাকে ambulatory বা চলিবার পথ বলে। সেখানেও অনেক সমাধি আছে। চাপেলের উপরের ছাতগুলি সব খিলান করা। সে খিলানের এমন গঠন যে স্তোত্র গানগুলি তথায় লাগিয়া বার বার প্রতিধ্বনিত হয় ও তাহার শব্দ অনেকক্ষণ জাগাইয়া রাখিয়া মনে স্বর্গীয় ভাব আনে। সেই চাপেলেরই এক অন্যতম অংশে—মেরী কুইন অফ কফট্-এর সমাধি। নিজের অপরিসীম সৌন্দর্য্যে, এই স্কটরাণী, রাজ্যে কতই না অশান্তি ঘটাইয়া—উনিশ বৎসর কারারোধের পর এখন নিহত হইয়া শান্তভাবে এই অন্ধকার ঘরে ঘুমাইতেছেন। অপর দিকে রাণী এলিজাবেথ, মেরী ও এডওয়ার্ড দি ফোর্থের যে দুটি ছেলে টাউ-য়ারে হত হয় সেই দুটি ছেলের হস্ত এখানে সমা-ধিস্থ আছে।

ইহার পাশেই এডওয়ার্ড দি কনফেসরের চেপেল। এইটী সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন স্থান ও পবিত্র। অনেক লোক এই মহাপুরুষের সমাধি স্থানটিকে তীর্থস্থান মনে করেন। মধ্যে তাঁহার কবর ও আশে পাশে চারিধারে অন্যান্য রাজা ও রাণীরও কবর আছে। এখানকার কবরগুলি সব মাটী হইতে উচ্চ। কবরের উপরকার মূর্ত্তিগুলি চিত অবস্থায় শয়ান ও হাতজোড় করা। নাইট টেম্পলারদের ছবিগুলি সব ওইরূপ। স্ত্রী ও পুরু একত্রে ঐরূপ অবস্থায় পাশাপাশি শয়ান। পঞ্চম হেনরীর এই স্থানে সমাধি আছে। মহাবীর ছিলেন বলিয়া তাঁহার বড়ই আদর। তাঁহার সেই সমাধির উপর তাঁহার প্রকাণ্ড ঢাল ও অতিশয় লম্বা তরবারি সাজান আছে। তৃতীয় এডওয়ার্ডেরও এখানে সমাধি স্থান। তিনিও মহাবীর ছিলেন। তাঁহারও বীর দেহ প্রায় ৬ ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চ ছিল।

এই স্থানেই সকল রাজা রাণীর রাজ্যাভিষেক হইয়া থাকে। আমাদের বর্ত্তমান রাজা সপ্তম্ এডওয়ার্ড, ইঁহারও এইখানে মুকুট পরান হয়। তজ্জন্য "করোনেশন" চেয়ার এই ঘরের মধ্যস্থানে রক্ষিত।

সে সামান্য কাঠের চেয়ারখানি দেখিলে তাহার কিছুই বিশেষত্ব উপলব্ধি হয় না; দেখিতে অনেকটা পুরাতন ভাব। রাজ্যাভিষেকের দিনে তাহা সোনার কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। উইলিয়ম ও মেরীর রাজ্যাভিষেকের সময় প্রথম এইখানি তৈয়ারী হয়, সেই দিন অবধি সকল রাজ্যাভিষেক এই খানির উপর বসিয়া হইয়া থাকে। একখানি অতি বৃহৎ আকার পাথরের উপর এই সিংহাসন খানি পাতা।

এই সামান্য পাথর খানির আবার অনেক ইতি-হাস আছে। এখানি সেই স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত "স্কোনসের" পাথর। সে কালে সে দেশের যত রাজা এইখানির উপরই দাঁড়াইয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন। যখন প্রথম জেম্‌স্ ইংলণ্ডেরও রাজা হন—সেখান হইতে এ পাথরখানি এখানে আনা হয়। এই পাথরখানির উপর দাঁড়াইয়া রাজা হওয়ার এখনও প্রথা চলিয়াছে, এই পাথরখানি সম্বন্ধে অনেক দিনের একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, যেখানে এখানি যাইবে, সেইখানে স্কটল্যাণ্ডের রাজত্ব বিস্তার হইবে। এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এখন ফলিয়াছে।

"আবির" এই সকল পুরাতন অংশের ভাব কতকটা আমাদের দেশের দেব মন্দিরের মত। তেমনি পুতুল ও দেব দেবীতে পূর্ণ। অন্ধকার অপরিষ্কার ও কতকটা সেইরূপই ভাব; সে সময়কার সংস্কারও কতকটা আমাদের দেশের সংস্কারের মত ছিল। এখন তার অনেকগুলি কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত হয়। তবুও মঙ্গল কাজে আমাদের

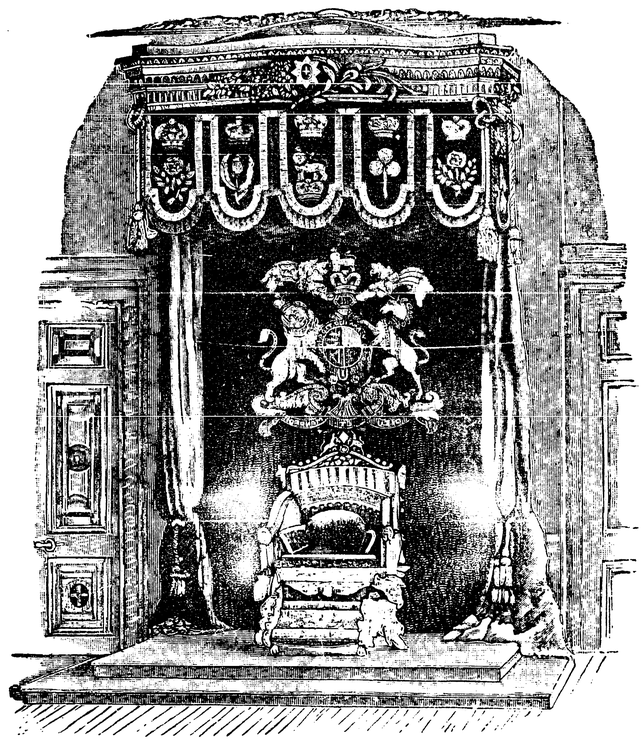

রাজ-সিংহাসন।

দেশেরই মত সবাই এমন কি রাজ্যের রাজারাও সে সবে মাথা পাতেন।

এই গেল মোটামুটি আবির আভ্যন্তরিক দেখিবার জিনিসের বর্ণনা। আবির অন্যান্য বিষয়েরও কিছু কিছু বলিবার আছে। ইহার ইতিহাস অতি পুরাতন। সাকসনদের সময়ে প্রথম ইহার ভিত্তিস্থাপন হইয়া সময়ে সময়ে অংশবিশেষ গঠিত হইয়াছে। আরও কথিত আছে—ইষ্ট সেকসন রাজ যখন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন, সেই উৎসবের সময় সেণ্টপিটার স্বয়ং আসিয়া এই মহৎ কার্য্যে রাজাকে সাহায্য করেন। আমাদের যেমন ভবানন্দ ঠাকুরের গৌরী মন্দির প্রতিষ্ঠার কথায় আছে যে, স্বয়ং ভগবতী পাটনীর নৌকায় নদী পার হইয়া আসেন এবং পার হইবার কাণ্ডারী স্বরূপ তাকে বর দেন—এই আবি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও এইরূপ একটি কথা আছে। সেণ্টপিটর নৌকা পার হইয়া মাঝিকে অনেক সুমিষ্ট "শামন" মাছ উপহার দেন। পরে এই স্থানে "বেণীডিকটাইন"; সন্ন্যাসীদের একটী মঠ স্থাপিত হয়। সেণ্ট "ডালনটন" তার নেতা ছিলেন।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলি অনেকটা অলীক গল্পের মত। সকল দেশেরই পুরাতন কথায় এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনার আধিক্য শুনা যায়। সঠিব খবর এডওয়ার্ড দি কনফেসরের রাজত্ব হইতে মিলে। এই ধর্ম্মমতি রাজাই প্রথম আবির অনেকাংশ তৈয়ারী করেন ও নিজে এই ধর্ম্ম মন্দিরে অনেক দিন ধর্ম্ম কর্ম্মে কাটাইয়া পরে এই স্থানেই সমাধিস্থ হন। তারপর আবির অন্য এক অংশ তৃতীয় হেনরী নির্ম্মাণ করেন। আর এক অংশ তৃতীয় এডওয়ার্ড নির্ম্মাণ করেন। পরে সপ্তম হেনরী আর এক অংশ নির্ম্মাণ করেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে এত বড় মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘরাও বিবাদের দিনে অযত্নে আবির অবস্থা অতি শোচনীয় হয়। পরে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়র সার ক্রাইষ্টোফার রেনের উপর ইহার সংস্কারের ভার পড়ে, ইনি একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়র। "সেণ্টপল" প্রভৃতি লণ্ডনের অন্যান্য অনেক বিখ্যাত স্থান ইঁহারই হাতের গড়া। বার বার প্লেগে তুগিয়া পরে আগুণ লাগিয়া যখন লণ্ডন সহর অর্দ্ধেক ধ্বংস হইয়া যায় তারপর ইঁহারই হাতে সহর পুনর্নির্ম্মাণ করার ভার পড়ে। সেই হইতেই লণ্ডন সহর এখন এত স্বাস্থ্যকর।

তৃতীয় জর্জ্জের পর হইতে এখানে এখন আর রাজাদের সমাধি হয় না। ইহা রাজ্যের সব বড় লোকদের সমাধিস্থান হইয়াছে।

সেই হইতেই আবির আধুনিক অবস্থাও আসিয়াছে। এই মন্দিরে একটি অংশে Jerusalem chamber নামক ঘরে অষ্টম হেনরী মারা যান। এ বিষয়েও একটি অনেক দিনকার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তিনি Jarusalemএ গিয়া মারা যাইবেন। অর্থ বিশেষে সেই বাক্যও ফলিত হইয়াছে।

বিলাতের সকল স্থানেরই সঠিক ইতিহাস সবিস্তারে লিখা আছে। গাইডবুক নামক পুস্তকে প্রতিদর্শন উপযোগী সকল স্থানেরই ইতিবৃত্ত ছাপা পাওয়া যায়। আবির সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক প্রকার পুস্তক আছে—সেই সব হইতেই তাহার সম্বন্ধে এত ইতিহাস জানা যায়। সে সস্তা ছোট পুস্তকগুলিতে সকল বিষয়েরই খবর আছে, যথা তাহার ইতিহাস ও দ্রব্যাদির সবিস্তারে বর্ণনা। প্রবেশ করিবার পথেই সে গুলি বিক্রয় হয়। তাতে অতি সুন্দর সুন্দর ছবি ছাপা। এই সকল বই হইতে ইতিহাস আদি সংবাদ সঙ্কলিত করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিলাম।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

নির্ব্বাসন।

"নির্ব্বাসন? এরি তরে
এত আয়োজন?"
কহিল ধীর গর্জ্জি উঠে
দীপ্ত রবি সম—
"অন্যায়ের ক্রূর জালে
কিবা প্রয়োজন?
সত্য তরে প্রাণ যাবে
এও কি নূতন?
ত্যাগ ধর্ম্মে বিজয়ী দৃপ্ত
ধন্য বঙ্গদেশ,
পুণ্য আশীষ স্বর্গ হতে
দেবের আদেশ।
জন্মভূমির ভক্ত সেবক
নিষ্কামের দাস,
মাতৃপ্রেমে হৃদি কাঁদে
তাতেই এত ত্রাস?
চিত্ত যার ব্রহ্ম যুক্ত
নিত্য মুক্ত রয়,
সকলত্র বিকলত্র
বিশ্ব হউক লয়।
তপস্যার পদ্মাসন
নির্জ্জন সাধন,
বিভুর কৃপায় তা'কি
হল উন্মোচন?
চল সেই পুণ্যধামে
মাতৃ অঙ্কে যাই,
চিদাকাশে ব্রহ্ম ভাসে
তুলনা যে নাই।"

বঙ্গনারী।

পুস্তক সমালোচনা।

আদর্শ ভারত গৃহিণী। শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত গোপাল দাস ঘোষ কর্ত্তৃক ঢাকা সূত্রাপুর রোড হইতে প্রকাশিত। ইহা একখানি পুস্তিকা। শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ এই প্রবন্ধটি লিখিয়া বঙ্গ-মহিলাগণের জন্য ব্রজমোহন দত্তের নামে স্থাপিত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি। প্রবন্ধের ভাষা সুন্দর ও তেজোপূর্ণ। প্রবন্ধ লেখিকা আদর্শ ভারত গৃহিণীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা উন্নত ও মহান্। সুশিক্ষা ব্যতীত মানবের উন্নতির অন্য পন্থা নাই, ইহা পুরুষ জাতির পক্ষে যেমন সত্য, নারী জাতির সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। যে হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত, যাহাতে জ্ঞানালোক প্রবেশ করে নাই, তাহা মলিন, সঙ্কীর্ণ, অনুদার। সুতরাং আদর্শ ভারত গৃহিণীর উপযুক্ত হইতে হইলে অন্যান্য সদ্‌গুণরাশির ন্যায় তাঁহাকে জ্ঞানালঙ্কারেও ভূষিত হইতে হইবে, সমুচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে হইবে। নতুবা লেখিকা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত Tennysonর কথায় বলিতেছি যে, নারী জাতি small, slight-natured, miser ableই থাকিবে, তাহা হইলে পুরুষ জাতির উন্নতিও অসম্ভব। লেখিকা ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নারী জাতির বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার এবং উপাধি ধারণের বিরোধী। লেখিকা নিজে সুশিক্ষিতা, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী নহেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উগ্র আলোকের নিকট পুরাকালের গৃহিণীর সেই অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী বেশ আজ হীনপ্রভ ও মলিন বোধ হইতেছে, গৃহ কর্ম্মের সৌষ্ঠব অনেক স্থলেই আজ নীচ কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং রন্ধনশালার চির পুরাতন চুল্লী পার্শ্ব ক্রমশঃই অপরিচিত হইয়া উঠিতেছে। এমন কি সন্তান সন্ততির লালন পালন আয়ার কর্ম্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে" ইত্যাদি। লেখিকা কি মনে করেন, যে সকল নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ এবং উপাধি ধারণ করেন নাই তাঁহারাই কেবল পুরাকালের গৃহিণীর সেই অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রীর বেশ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আর যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও উপাধি ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে অপারগ হইয়াছেন? বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে উপাধিধারিণী মহিলার সংখ্যা অতি অল্প, অধিকাংশ নারীই অল্প শিক্ষিতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী নহেন। আর যে দেশে এক শত জন স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবলমাত্র একজন লিখিতে ও পড়িতে জানেন, সে দেশে নারী জাতির শিক্ষার অবস্থা কিরূপ উন্নত হইয়াছে, তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে অল্পসংখ্যক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও উপাধি লাভ করিতেছেন, সুশিক্ষিতা মহিলাগণও যদি কোন কোন স্থলে তাঁহাদের আদর্শ হইতে পতনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁহাদের শিক্ষার অপযশ ঘোষণা করেন, তাহা অতীব দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। যে দেশে নারী জাতির শিক্ষার অবস্থা অদ্যাপিও অঙ্কুরে রহিয়াছে, তথায় নারী জাতির কোন প্রকারের শিক্ষার বিরোধী হওয়াই তাঁহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক স্বরূপ জ্ঞান করি। যিনি যে প্রকারে পারেন, শিক্ষালাভ করুন, কেহ তাহার অপযশ ঘোষণা করিয়া অথবা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নারী জাতির শিক্ষার গতিরোধ করিবেন না। আমরা এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী রমণী রত্নের বিষয় অবগত আছি যাঁহারা জ্ঞানে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সেবায় সেই আর্য্যনারীদিগেরই ন্যায় মহিয়সী। কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকিলেও তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ও উপাধির দোষে হয় নাই, তাহা তাঁহাদের গৃহের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার অভাবেই হইয়াছে। সন্তান পালন, রন্ধন, পতিপুত্রের ও

স্বজনবর্গের পরিচর্য্যা নারীর প্রধান কর্ত্তব্য কিন্তু একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। লেখিকার কথাতেই বলিতেছি যে ভারত রমণী যেদিন, "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"রূপে সুশিক্ষিতা হইবেন সেই দিন ভারতের উন্নতি চেষ্টাও সহজসাধ্য হইবে। স্বামীর সর্ব্বকার্য্যের সহকারিণী, সহযোগিনী ও সহধর্ম্মিণী হইতে হইলে অন্যান্য সদ্‌গুণ আহরণের সহিত ভারতনারীর সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিদ্যায়ও অলঙ্কৃতা হইতে হইবে। নারী হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই সকল বিদ্যারও প্রয়োজন আছে। কেবল পত্র লিখনে এবং ধোপার ও বাজার হিসাব রক্ষণেই যেন তাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত না হয়। গৃহে বসিয়া অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিয়া, যিনি যেপ্রকারে পারেন জ্ঞানার্জ্জন করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল করুন। নারীজাতি কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা, জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা লাভ করিয়া ভারতের পূর্ব্ব মহিমা ও গৌরব আনয়ন করুন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন চরিতের সমালোচনাকালে মিলের মনস্বিনী সহধর্ম্মিণীর উল্লেখ করিয়া সাহিত্য গুরু শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "কেবল সীতা এবং সাবিত্রী স্ত্রীজাতির আদর্শ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তদধিক উচ্চতর আদর্শ আছে। যে রমণী পতিপরায়ণা সে ভাল—কিন্তু যে পতির মানসিক উন্নতির কারণ, সে আরও ভাল।"

সম্মুখে যে স্বর্ণযুগ আসিতেছে তাহার আদর্শ ভারত রমণী ঈশ্বরের ভক্ত সেবিকা, সংসারের আরামদায়িনী, সন্তানের শিক্ষাপ্রদায়িণী, স্বামীর উপযুক্ত সহযোগিনী, সমাজের হিতসাধিনী এবং স্বদেশের কল্যাণকারিণী হইবেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র কেবল গৃহেই আবদ্ধ থাকিবে না, তাহা গৃহে, বাহিরে, সমাজে, স্বদেশে পরিব্যপ্ত হইবে। রমণীগণ সেই শুভদিন আনয়ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন।

স্বদেশ কুসুম। শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগচী প্রণীত। মূল্য দুই আনা। ইহা স্বদেশ সম্বন্ধীয় কতকগুলি ছেলে ভুলান ছড়ার সমষ্টি। শৈশব হইতেই সন্তানের হৃদয়ে স্বদেশ প্রেম অঙ্কুরিত করা কর্ত্তব্য। সুতরাং তদুদ্দেশ্যে এই প্রকার ছড়ার যতই প্রচলন হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগচী তরুণ বয়স্ক বালক, তাঁহার এই উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁহার ছড়াগুলি মৌলিক নহে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। ছড়াগুলি শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত স্বদেশ রেণুর অনুকরণ মাত্র। শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগচীর ক্ষমতা আছে, তিনি চেষ্টা করিলেই মৌলিক রচনায় কৃতকার্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ।
ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি

সুপ্রভাত

তৃতীয় বর্ষ। শ্রাবণ, ১৩১৬। ১ম সংখ্যা।

"স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যা দ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষা পূর্ব্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্য জাতি সমূহের মধ্যে গণ্য জাতি হইবে, এই মহৎ কল্পনা প্রসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন।"

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি,এ সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৵০ আনা।